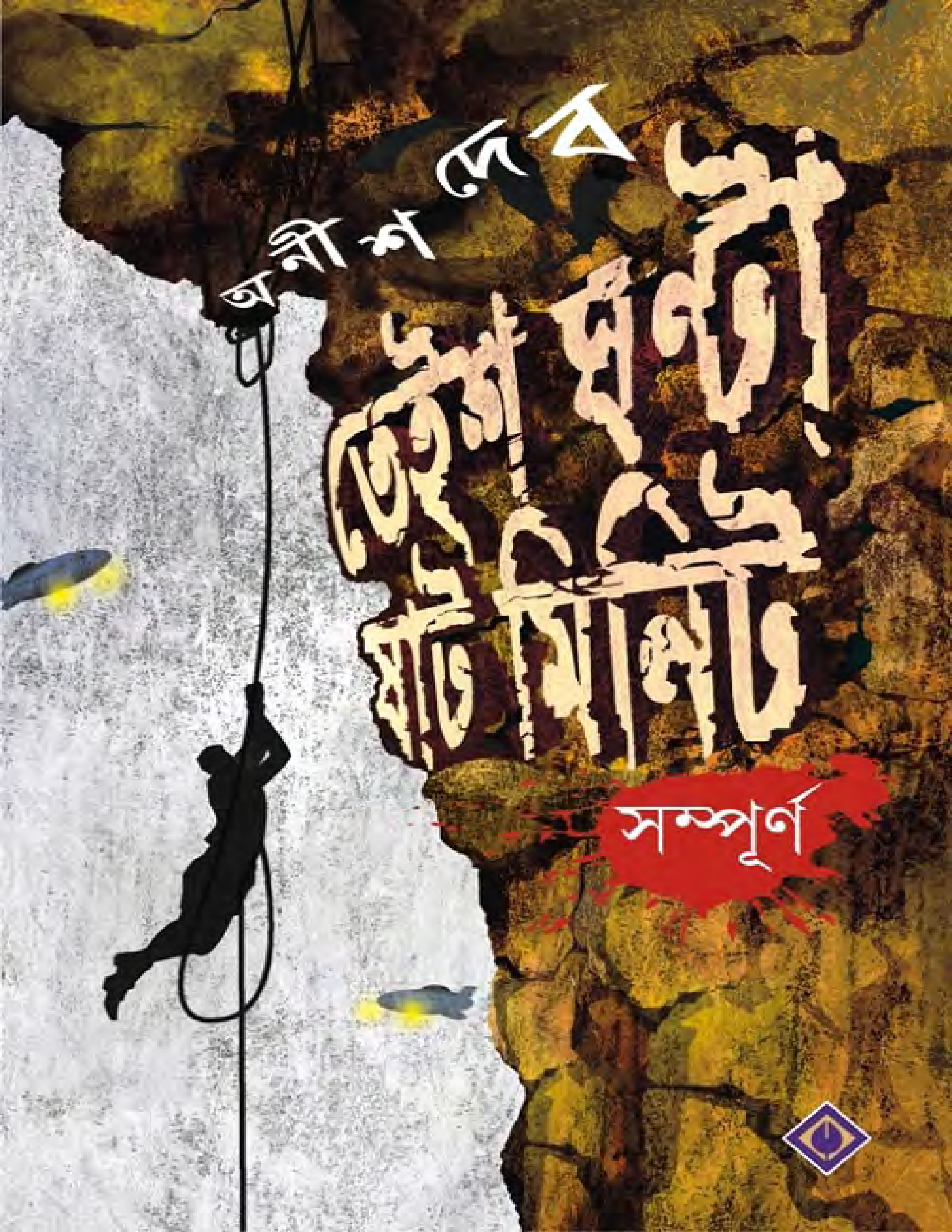
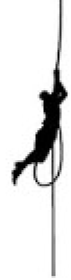

অনীশ দেব
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট
সম্পূর্ণ

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম একত্রে প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র
অলংকরণ সৌরীশ মিত্র ও সুদীপ্ত দত্ত

23 GANTA 60 MINIT SOMPURNO
by Anish Deb
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/PatraBharati

ISBN 978-81-8374-549-9

গান-বাংলার অনন্য গানওলা
নচিকেতা-কে

সূচি

লেখকের অন্যান্য বই

আগুন রঙের বুলেট
সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক (সম্পাদিত)
ভূতনাথের ডায়েরি
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভয়পাতাল
দু:খী রাজকুমার
বারোটি রহস্য উপন্যাস
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
পাই নিয়ে রূপকথা
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

'ধরা যাক, জঙ্গলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাঘ এবং একজন মানুষ। মানুষটির হাতে রাইফেল থাকলেও এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বাঘ হচ্ছে শিকার, আর মানুষ হচ্ছে শিকারি। ব্যাপারটা উলটোও হতে পারে।'

'থিয়োরি অফ গেম : হান্টার অ্যান্ড দ্য হান্টেড'
লেখক জেমস ডি. প্যাটারসন
প্রকাশক ফিউচার টেন্স, প্রকাশকাল ২৩১১

এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট

বইটা পড়া শুরু করার আগে যদি কয়েকটা কথা জেনে নেন তা হলে আমার খুব ভালো লাগবে।

ফিউচারিস্টিক থ্রিলার 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের পুজো সংখ্যায়। লিখতে বোধহয় অনেক সময় নিচ্ছিলাম, তাই লেখা শেষ হওয়ার আগেই পুজো সংখ্যা বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দেখে আশ্চর্য হলাম, লজ্জাও পেলাম। কারণ, লেখার শেষে ছাপা রয়েছে 'প্রথম পর্ব' সমাপ্ত। বন্ধু এবং সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় পুজো সংখ্যায় আমাকে জায়গা দিতে চেয়েছেন, তাই ব্যাকরণ না মেনে 'অসমাপ্ত' উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। এই ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করেছে।

কিন্তু তারপরই কীরকম যেন একটা আলোড়ন টের পেলাম। অনেক পাঠকই দপ্তরে ফোন করে প্রশ্ন করছেন, উপন্যাসটির পরবর্তী অংশ কবে বেরোবে। যেহেতু এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র লেখকই দিতে পারেন তাই দপ্তর থেকে আমার সেল ফোন নম্বর বহু পাঠককেই দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আমাকে প্রশ্নবাণে প্লাবিত করেছেন, কিন্তু আমি কাউকে সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। কোনওরকমে বলেছি ২০০৫ সালের পুজো সংখ্যায় লেখাটি শেষ হবে। একজন পাঠিকা, যতদূর মনে পড়ে তিনি নিজের নাম বলেছিলেন ঝুলন গাঙ্গুলি, আমাকে একাধিকবার ফোন করে অনুরোধ করেছিলেন, 'ফোনে আমাকে শেষটা বলে দিন না!' তখনও অসহায়ভাবে বলেছি, 'কী করে আপনাকে বলব? শেষটা তো আমি নিজেই জানি না!'

২০০৫ সাল এল। 'কিশোর ভারতী' পুজো সংখ্যাও বেরোল। কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করেও লেখাটা শেষ করতে পারলাম না। লেখাটা ক্রমেই যেন দৈর্ঘ্যে বেড়ে যাচ্ছিল। তাই প্রকাশিত হল 'দ্বিতীয় পর্ব'। লেখার শেষে ছাপার অক্ষরে পাঠক এবং সম্পাদকের কাছে মার্জনা চাইলাম, উপন্যাসটা শেষ করতে পারিনি বলে। কারণ, পুজো সংখ্যায় 'ধারাবাহিক' উপন্যাস ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং আমার লজ্জা অনেক বেড়ে গেল।

কিন্তু উপন্যাসটা 'নির্লজ্জভাবে' দৈর্ঘ্যে বেড়েই চলল। ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮-এর পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হল আরও তিনটি পর্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখাটা শেষ হল না। আমার তখন যে কী মর্মান্তিক অবস্থা, সে একমাত্র আমিই জানি! আমার তৈরি চরিত্রগুলো তখন আমাকে নিয়ে স্রেফ লোফালুফি খেলছে, যা খুশি তাই করছে। আমি প্রাণপণে লিখে চলেছি, কিন্তু কাহিনি কিছুতেই 'শেষ' পৃষ্ঠায় পৌঁছচ্ছে না। তখন আমার লেখার জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ করতে এবং আমাকে মানসিক 'যন্ত্রণা' থেকে বাঁচাতে অনেক আলোচনা ইত্যাদির পর সম্পাদক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের বন্দোবস্ত করলেন। তাই ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করল। সেপ্টেম্বর সংখ্যায় উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ইতি টানলাম। সেই লেখাটিই এখন বই হয়ে আপনার হাতে।

বিগত পাঁচ বছরে বহু পাঠক-পাঠিকা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে দপ্তরে খোঁজ নিয়েছেন। 'কবে শেষ হবে?' এই প্রশ্নও করেছেন বারবার। 'কলকাতা বইমেলা'-য় আমাকেও বহুবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু কখনও সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তাই আজ প্রথম খণ্ড আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে অনেকটা

হালকা লাগছে। এর পরবর্তী পর্যায় 'কিশোর ভারতী'-র পাতায় 'ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা' নামে ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

এই উপন্যাস যখন লিখতে শুরু করি তখন আমাদের এখানে টিভিতে রিয়েলিটি শো শুরু হয়নি। তবে 'রোজগেরে গিন্নি' গোছের নিরীহ গেম-শোগুলো টিভিতে দেখার সময় আমার মনে হত যে, প্রাইজ মানি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে অভাবী—অথবা, লোভী মানুষকে দিয়ে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো যেতে পারে—হয়তো প্রাণ নিয়ে খেলা করতেও তারা রাজি হয়ে যাবে। এই ভাবনা থেকেই এই উপন্যাসের শুরু।

সবশেষে আগ্রহী পাঠক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি—বা আপনারা—আগ্রহ এবং কৌতূহল না দেখালে এই লেখা যে-পথ ধরে এগিয়েছে সেই পথ ধরে চলতে পারত কি না কে জানে! আপনাদের নিয়মিত উৎসাহ আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাই এই ফিউচারিস্টিক থ্রিলার আপনার জন্য। এই বইটা শেষ করার পর যাতে আপনাকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে না হয় তার জন্য আমি অন্তত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব। নমস্কার—



জানুয়ারি ২০১০
ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০০৯

এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা

২০০৪ সালে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার পুজো সংখ্যার পাতায় শুরু হয়েছিল 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট'। প্রথম পর্ব প্রকাশের পর যা-যা হয়েছিল সে সবই আপনারা জানেন। 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' বইয়ের শুরুতে তার ফিরিস্তি দিয়েছি। তথ্যের জন্য শুধু এটুকু আবার জানাই যে, 'কিশোর ভারতী'-র পরপর চারটি পুজো সংখ্যায় উপন্যাসটির আরও চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে লেখাটি ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম খণ্ডে ইতি টানি। এবং সম্পাদকের পরিকল্পনা মতো ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী পর্যায়ের প্রকাশ শুরু হয়। তখন লেখাটির নাম দিই 'ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা'। উনচল্লিশ কিস্তিতে সেই লেখাটি শেষ হয়ে এখন বইয়ের চেহারায় আপনার হাতে। নায়ক জিশানকে নিয়ে লেখা আমার 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট' ফিউচারিস্টিক থ্রিলারের এইখানেই ইতি।

উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড যখন পত্রিকার পাতায় পর্বে-পর্বে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন আমি পাঠক ও সম্পাদকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম যে, এই একটি লেখা আমি মনের মতো করে শেষ করতে চাই। আমার আবেদনে দু-পক্ষই আন্তরিক সাড়া দিয়েছেন। এ ছাড়া 'কিশোর ভারতী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বহু পাঠক উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অনেকে ফোন করেছেন, কেউ-বা ই-মেলে মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বছর দেড়েক আগে জনৈক বয়স্ক প্রাজ্ঞ পাঠক সাক্ষাতে আমাকে উপন্যাসটি শেষ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। সম্পাদকের দপ্তরে বসে মোটামুটি যে-কথাগুলো তিনি বলেছিলেন সেগুলো এইরকম : 'এবারে ওটা শেষ করে দিন। আর টানার দরকার নেই।' সেই সময়ে হাসি পেলেও সৌজন্যের খাতিরে হাসি চেপে রেখেছিলাম। লেখা যে ঘুড়ি নয়, ইচ্ছেমতো 'টানা' বা 'ছাড়া' যায় না, সে-কথা ওই অ-লেখক প্রাজ্ঞ মানুষটিকে শেখাতে আমার সৌজন্যে বেধেছিল। সুতরাং, এই কথাটাই বলতে চাই যে, দু-খণ্ডের এই উপন্যাসটি আমি স্বাধীনভাবে লিখেছি—সবসময় সরস্বতীর 'চাকর' হয়ে থেকেছি। তাই এর সমস্ত ভুল-ত্রুটি-ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি আমার।

আর একজন উৎসাহী পাঠকের কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে। তিনি সোনারপুরের দেবসেনা নন্দী। উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশের সময় তিনি নিয়মিত ফোন কিংবা এস.এম.এস. করে ওঁর কৌতূহল এবং ভালো লাগা প্রকাশ করেছেন। দেবসেনা এবং আরও অন্যান্য পাঠকের উৎসাহ আমাকে প্রতি মুহূর্তে ভেতর থেকে ভালো, এবং আরও ভালো, লিখতে চাওয়ার শক্তি জুগিয়েছে।

গত মে মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমাকে নার্সিং হোমে ভরতি হতে হয়, দুরূহ অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তখন শরীর আর মন খুবই ভেঙে পড়েছিল। দু-মাস লেখালিখি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। উপন্যাসটা কীভাবে শেষ করব সেই দুশ্চিন্তায় আর শরীরের যন্ত্রণায় রাতের ঘুম উবে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও পাঠকদের পাশে পেয়েছি। আর পেয়েছি একইসঙ্গে বন্ধু এবং 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। সেই কারণেই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং বই হয়ে বেরোচ্ছে। এটা যে আমার পক্ষে কী তৃপ্তির আর আনন্দের সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

সব শেষে বলি একজনের কথা—আমার স্ত্রী শর্মিলা। একজন মৃতপ্রায় ভেঙে পড়া মানুষকে ডানা দিয়ে আগলে প্রতিটি মুহূর্তে যত্ন নিয়ে কীভাবে তিলতিল করে 'বাঁচিয়ে' তুলতে হয় সেটা ও দেখিয়েছে। ওকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনও মানে হয় না। ইতি—



ডিসেম্বর ২০১৩
ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০০৯

এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ

২০১০ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল ফিউচারিস্টিক থ্রিলার 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট'-এর প্রথম খণ্ড। উপন্যাসটির বাকি অংশ 'ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা' নামে ধারাবাহিকভাবে উনচল্লিশ কিস্তিতে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এবং বই হয়ে বেরোয় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে। দু-খণ্ডে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি আমার খুব প্রিয়—হয়তো প্রিয়তম। আমার খুব সাধ ছিল, উপন্যাসটির দুটি খণ্ড একসঙ্গে দু-মলাটের মধ্যে প্রকাশিত হোক। বন্ধু এবং প্রকাশক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই সাধ পূরণ করলেন—উপন্যাসটির অখণ্ড সংস্করণ 'তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ' প্রকাশিত হল।

উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই নানান আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রশংসা-নিন্দা ইত্যাদি এর সবসময়ের সঙ্গী। তবে তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পাঠকের কৌতূহল আর নিয়মিত উৎসাহ। উপন্যাসটা লিখে চলার কাজে পাঠকের উৎসাহই ছিল আমার অন্যতম মোটিভেশান।

অতএব আমার প্রিয়তম সম্পূর্ণ উপন্যাসটি এখন আপনার হাতে। দেখা যাক, এই উপন্যাস আপনারও প্রিয়তম উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে কি না। নমস্কার—

নভেম্বর ২০১৮
কলকাতা ৭০০ ০০৪
ইমেল : anishdeb2000@yahoo.co.in

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ

ওষুধের দোকানের কাছে পৌঁছে পকেটে হাত ঢোকাল জিশান। এবং সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠল। পকেটে টাকা নেই! অথচ একটু আগেই তো ছিল! একটা একশো টাকার নোট, একটা পঞ্চাশ টাকার নোট, একটা কুড়ি টাকার নোট, আর কিছু খুচরো পয়সা। এখন শুধু খুচরো পয়সাগুলো পড়ে আছে।

কী হবে এখন! বহু কষ্টে গতকাল দুশো টাকা রোজগার করেছে। তখনই ঠিক করেছে প্রথমেই শানুর জন্য একটা দুধের কৌটো কিনবে। ছ'মাসের বাচ্চাটা এ পর্যন্ত ছ'সপ্তাহের দুধ পেয়েছে কি না বলা মুশকিল। ওর খিদের কান্না জিশানকে পাগল করে দেয়। আর তার সঙ্গে জুড়ে যায় মিনির কান্না। বাচ্চার কষ্ট কোন মা-ই বা সইতে পারে!

কিন্তু তাই বলে মিনি কখনও জিশানকে দোষ দেয় না। কারণ, সাংঘাতিক অভাব-অনটনের কথা জেনেশুনেই তো ও জিশানকে বিয়ে করেছে। তখন জিশান একটা লোহালক্কড়ের কারখানায় কাজ করত—বিয়ের কয়েকমাস পরেই ওটা লকআউট হয়ে যায়। তারপর...তারপর থেকে জিশান রোজই কাজের খোঁজে বেরোয়। যা কাজ পায় তাই করে—শুধু কোনওরকমে কিছুটা টাকা জোগাড় করতে পারলেই হল।

বারকয়েক পকেট হাতড়ে দোকানের কাছ থেকে সরে এল জিশান। ওর নাকে একটা পোড়া গন্ধ এল। ও চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সেদিকে। কয়েকটা লোক রাস্তার পাশে একটা আবর্জনার ভ্যাটের কাছে তার পোড়াচ্ছে। লোকগুলোর পোশাক ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা। তার ওপর মাথার যা অবস্থা! কতদিন স্নান করেনি কে জানে!

লোকগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের প্লাস্টিকটা পুড়ে গেলে ভেতরের তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়ামটা ওরা ওজনদরে বেচে দেবে।

প্লাস্টিক পোড়া ধোঁয়া পাক খেয়ে-খেয়ে ওপরদিকে উঠছিল। মাথা তুলে ওপরে তাকাল জিশান। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় রাতের আকাশের সুন্দর কালো রংটাই আর নেই—কেমন যেন লাল আর হলুদের আভা মেশানো ঘোলাটে হয়ে গেছে।

না, শুধু এই তার পোড়ানো ধোঁয়ার জন্য নয়। এই শহরের নানান জায়গায় শুধু কলকারখানা, গাড়ি আর উনুনের ধোঁয়া। প্রায় ষোলো বছর ধরে জিশান এই ব্যাপারটা দেখছে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরা, যেখানে-সেখানে নোংরার স্তূপ, বাড়িগুলো জীর্ণ মলিন, রাস্তার বেশিরভাগ আলোই খারাপ—সারানোর কেউ নেই, পুলিশ-প্রশাসন বলেও কিছু নেই। সরু ঘিঞ্জি রাস্তায় যে-গাড়িগুলো চলে তাদের মডেল এত পুরোনো যে, ভিনটেজ কার বলা যায় অনায়াসে। আর তাদের যেরকম দোমড়ানো মোচড়ানো চেহারা তাতে সেগুলো যে এখনও চলছে সেটাই বড় কথা।

এককথায় শহরটা আর বেঁচে নেই। আর বেঁচে আছে বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তা হলে বলতে হয় শহরটার যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত এবং ক্যান্সার হয়েছে। সবাই এটাকে বলে 'ওল্ড সিটি', কিন্তু জিশান বলে 'ডেড সিটি'। এই শহরটা কেউ চালায় না—নিজে থেকে চলছে।

জিশান বাবার কাছে শুনেছে, নব্বই কি একশো বছর আগেও এই শহরের নাম ছিল কলকাতা। তারপর নতুন একটা শহর তৈরি হল তার পাশে। নাম হল 'নিউ সিটি'। নিউ সিটির গড়ে ওঠার কাজ চলতে লাগল, আর একইসঙ্গে অনাদরে অবহেলায় ভাঙতে লাগল ওল্ড সিটি।

এখন, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছরের ভাঙা-গড়ার খেলার পরে, ওল্ড সিটি যখন ধুঁকছে, নিউ সিটি তখন টগবগ করছে—সেখানে সবকিছুই নতুন, ঝাঁ-চকচকে, ব্যাপক।

মাথা তুলে আকাশে তাকাল জিশান। ধোঁয়াশা পেরিয়ে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেল। গত কুড়ি-বাইশদিন ধরেই দৃশ্যটা সবার চোখে পড়ছে। দুটো প্রকাণ্ড ধূমকেতু পাখনা মেলে ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে। একটার রং লালচে, আর অন্যটার আভা নীল। ওদের লেজদুটো ক্রমশ চওড়া হয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ওদের পাশে চাঁদের কুমড়োর ফালিটা কেমন ক্ষয়াটে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

আনমনাভাবে পথ হাঁটতে শুরু করল জিশান। বাড়িতে ফিরে কী বলবে মিনিকে? এরকম বোকার মতো টাকা হারানোর কোনও মানে হয়! শানুর কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

আর ঠিক তখনই একটা লোক ছুটে এসে জিশানকে ধাক্কা মারল।

জিশান পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল। তারই মধ্যে টের পেল, লোকটা ধাক্কা মারার সময় ওর পকেটে হাতটা ঢুকিয়েই আবার বের করে নিয়েছে। এবং একইসঙ্গে প্রাণপণ দৌড় লাগিয়ে ঢুকে গেছে একটা অন্ধকার গলিতে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখল জিশান। খুচরো পয়সা খানিকটা কমে গেছে। মনে-মনে ভীষণ রাগ হল ওর। পকেটমারি-চুরি-ছিনতাই এ-শহরে রোজকার ঘটনা। জিশান সবসময় সাবধান থাকে বটে, অথচ একটু আগে একশো সত্তর টাকা উধাও হওয়ার ব্যাপারটা ও একেবারেই টের পায়নি।



মুখে একটা তেতো ভাব, মনে একরাশ বিরক্তি—এই অবস্থায় জিশান এলোমেলো দিশেহারাভাবে হাঁটতে শুরু করল। না:, ওল্ড সিটিতে ওর বিরক্তি ধরে গেছে। এখানে শুধু অভাব আর অভাব। দিনের বেলা সূর্য উঠলেও আসলে চব্বিশ ঘণ্টাই অন্ধকার। ষোলো বছর আগে বাবা যদি হঠাৎ করে গরিব হয়ে না যেত তা হলে জিশানকে কোনওদিন ওল্ড সিটিতে আসতে হত না—নিউ সিটিতেই ওরা সুখে থাকতে পারত।

কিন্তু সেটা হয়নি। নিউ সিটিতে সবাই এত বড়লোক যে, সেখানে জীবন চালানোর খরচ অনেক বেশি। সবকিছুর দাম প্রায় আকাশছোঁয়া। চারিদিকে অঢেল সুখ আর আহ্লাদ। বাবার মুখেই এসব কথা শুনেছে জিশান। তখন ও খুব ছোট।

বাবা আর নেই। চোদ্দো বছর আগে বাবা চলে গেছে।

'অ্যাই, জিশু!'

কে যেন আচমকা ডাকল জিশানকে।

ফিরে তাকাল জিশান। দেখল, হনহন করে হেঁটে আসছে মালিক।

ওর ছোটবেলার বন্ধু জিশান। একসময় একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। দুটো পয়সা উপায় করার জন্য বাগজোলা খালে মাটিও কেটেছে দুজনে।

মালিকের লম্বা শক্তপোক্ত চেহারা—অনেকটা জিশানের মতোই। তবে জিশানের মতো ফরসা নয়—ঠিক উলটো—কুচকুচে কালো। হাসলে পর অন্ধকার রাতের তারার ঝিকিমিকির মতো দাঁতের সারি ঝলসে ওঠে। এখনও তাই হল।

একটু পা টেনে-টেনে চলে মালিক। কাছে এসে ও জিশানের কাঁধ চাপড়ে দিল : 'কী রে, মুখখানা এরকম আউল-আউল কেন?'

মালিক সবসময় পাখির নামগুলো ইংরেজিতে বলে। এককালে যে ওয়ার্ডবুক মুখস্থ করেছে সেটা কিছুতেই ভুলতে চায় না।

জিশান ওকে টাকা হারানোর গল্পটা বলল।

মালিক শব্দ করে থুতু ফেলল ঘেন্নায়, বলল, 'এই নোংরা শহরটায় সালা আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু নিউ সিটিতে যে যাব সে-ক্ষমতাও নেই। এমনই পোড়া কপাল!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মালিক বলল, 'তবে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করছি—দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

জিশান জানে, মালিক কী চেষ্টা করছে। নিউ সিটিতে অনেক গেম শো হয়। তাতে প্রচুর টাকার প্রাইজ মানি থাকে। আর প্রতিটি খেলা লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়। এই খেলায় একবার দাঁও মারতে পারলেই নবাব। দুনিয়া মুঠঠি মে। কিন্তু খেলাগুলোয় দারুণ ঝুঁকি রয়েছে। এক-একটা খেলা তো একেবারে দম বন্ধ করা ব্যাপার। খেলাগুলোর বেশিরভাগই চালায় 'সুপারগেমস কর্পোরেশন'।

যেমন, 'স্নেকস অ্যান্ড জেমস' নামের একটা খেলায় সাপের চৌবাচ্চায় নেমে জলে হাতড়ে ছড়ানো-ছিটানো হিরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। চৌবাচ্চায় ফুটখানেক ঘোলা জল। তার মধ্যে কিলবিল করছে বিষধর সাপ। আর জলের তলায় ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানান মাপের হিরে। যে-ক'টা হিরে নিয়ে যে বেঁচে উঠে আসবে সেগুলো তার। যদি সেই প্রতিযোগী হিরেগুলো বিক্রি করতে চায় তা হলে 'সুপারগেমস কর্পোরেশন' টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নেয়।

আর-একটা খেলার নাম 'ম্যানিম্যাল রেস'। ম্যান আর অ্যানিম্যাল—দুটো শব্দ জুড়ে তৈরি হয়েছে ম্যানিম্যাল। এই দৌড়ে অংশ নেয় কয়েকজন মানুষ আর একপাল তাগড়া বুনো কুকুর। এই দৌড়ে শুধু ফার্স্ট হলেই চলবে না, গায়ে কুকুরের আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন থাকা চাই। তবেই পাওয়া যাবে পুরস্কার। দু-লক্ষ টাকা।

প্রাইজ মানির অঙ্কটা শুনলেই জিশানের বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। কতবার যে ও স্বপ্নে দেখেছে, ও খেলায় জিতে পুরস্কার নিচ্ছে, আর মিনি শানুকে কোলে নিয়ে তার লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে! তারপর থেকে ওদের সংসারে অভাব আর নেই।

নিউ সিটির সুপারগেমস কর্পোরেশন এইসব বিপজ্জনক খেলার প্রতিযোগী খুঁজে পায় ওল্ড সিটি থেকেই। ওল্ড সিটির অনেকেই এই খেলায় জিতে ভাগ্য বদল করতে পেরেছে। তখন ওল্ড সিটি ছেড়ে তারা নিউ সিটির পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেছে। সেই কারণেই ওল্ড সিটির বহু বেপরোয়া যুবক এইসব হাই-রিসক গেমসে জেতার স্বপ্ন দ্যাখে।

ওল্ড সিটির সব জায়গাতেই টাঙানো রয়েছে ন্যানোটেকনোলজির প্লেট টিভি। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সেই টিভিতে প্রায় একশো চ্যানেল দেখানো হচ্ছে। তার মধ্যে গোটা চল্লিশ চ্যানেলে শুধু নানারকম গেম শো। কখনও লাইভ টেলিকাস্ট, কখনও পুরোনো বাঁধানো ফটোর মতো দেখতে হালকা এবং চ্যাপটা এই টিভিগুলো নিউ সিটির 'সিন্ডিকেট' টাঙিয়ে দিয়েছে ওল্ড সিটির কম করেও এক লক্ষ জায়গায়। চারঘণ্টা

সূর্যের আলো পেলেই একটা প্লেট টিভি বিনা ব্যাটারিতে চারশো ঘণ্টা চলতে পারে। গরিব এই শহরে বলতে গেলে এটাই সকলের একনম্বর মনোরঞ্জন।

মালিক প্রায়ই জিশানকে এই খেলার ব্যাপারে ওসকায়। বলে, 'চল, একটা রিসক নিই।'

জিশান অতটা সাহসী হতে পারে না। ও মালিকের মতো ঝাড়া হাত-পা হলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ওর কিছু হলে তখন মিনি আর শানুর কী হবে? তা ছাড়া মিনি এ ধরনের ফাটকা খেলা পছন্দ করে না।

মালিক বলে, 'তোর যদি লটঘট কিছু হয়, তা হলে প্রাইজ মানির টুয়েন্টি পার্সেন্ট তোর ফ্যামিলি পাবে। তুই জানিস না, খেলায় নামার আগে ওরা ''নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স'' কোম্পানি থেকে স্পেশাল ইনশিয়োরেন্স করিয়ে দেয়!'

হ্যাঁ, জানে জিশান। এবং এও জানে, সেই ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির মালিকও বকলমে সুপারগেমস কর্পোরেশন। কিন্তু তাও...।

'চল, আমাদের ওল্ড সিটির ফাইট গেম দেখবি চল।' জিশানের হাত ধরে টান মারল মালিক। নিউ সিটির দেখাদেখি ওল্ড সিটিতেও গেম শো-র হিড়িক পড়ে গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, হাতাহাতি লড়াই —'ফাইট গেম'।

মালিক বলল, 'লাস্ট উইকে আমি আড়াইশো টাকা জিতেছি।'

শুনে হাসি পেয়ে গেল জিশানের। যে লক্ষ-কোটি টাকার স্বপ্ন দেখছে সে মাত্র আড়াইশো টাকা জিতেছে! আড়াইশোকে কত দিয়ে গুণ করলে একশো কোটি হয়? কারণ, একশো কোটি টাকা হল সুপারগেমস কর্পোরেশনের সবচেয়ে বেশি প্রাইজ মানি। ওদের 'কিল গেম' খেলায় জিততে পারলে এই মাথা-ঝিমঝিম-করা টাকার অঙ্ক পুরস্কার পাওয়া যায়। জিততে পারলে মানে বাঁচতে পারলে। কারণ, খেলাটা সত্যি-সত্যিই বাঁচা-মরার খেলা। ওল্ড সিটির কত মানুষ যে এই খেলায় নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে! চব্বিশ ঘণ্টার এই খেলায় যে নাম লেখাবে, ওল্ড সিটি আর নিউ সিটির মানুষের কাছে সে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সুপারহিরো। কারণ, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও একশো কোটি টাকা পুরস্কারের লোভে এই খেলায় নাম লেখানো বড় সহজ কথা নয়! আর খেলাটা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে একটানা লাইভ টেলিকাস্ট করা হয় প্লেট টিভিতে। মাঝে-মাঝে থাকে বিজ্ঞাপনের ব্রেক।

জিশানকে হাত ধরে টানতে-টানতে এগোল মালিক। বলল, 'আজ শনিবার। খেলা ভালো জমবে। চাই কি তুইও দু-একদান লাক ট্রাই করে দেখতে পারিস। কে জানে, ফট করে জিতে গেলে হয়তো বাচ্চার দুধটা কিনে বাড়ি ফিরতে পারবি।'

'না রে, মিনি এসব জুয়া-ফুয়া পছন্দ করে না। তুই যা, আমি চলি—।'

জিশানের জামা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মালিক : 'আরে, একটু তো চল—না হয় একটা ফাইট দেখবি, তারপর কেটে পড়বি। তোর কোনও ভয় নেই—ক্রো-বার্ডও টের পাবে না।'

'কাকপক্ষী টের না পেলে কী হবে—মিনি ঠিক টের পাবে। ও খারাপ কাজের গন্ধ পায়। তা ছাড়া জুয়ায় জিতে সেই পয়সায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়াব! না:, আমায় ছেড়ে দে—আর-একদিন যাব।'

'আজ আমার কথা শুনতেই হবে তোকে। একটিবার, প্লিজ! তোকে খেলতে হবে না—শুধু আমার খেলা দেখবি। ব্যস, হয়েছে তো!'

সুতরাং নাছোড়বান্দা মালিকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল জিশান।

মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা 'শুটার' উড়ে গেল। নিউ সিটির পুলিশ ফোর্স আকাশে টহল দেওয়ার জন্য এই শুটার হাওয়াযান ব্যবহার করে। যন্ত্রটা নীল আর সাদা রঙের ডোরাকাটা একটা বড়সড় পটল যেন। তার গায়ে পাখনা লাগানো—লেজ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। রাতের আকাশে সেই আগুন স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

শুটারগুলো যখন হর্ন দেয় তখন মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ওদের হর্নের তীব্র শিসের মতো শব্দ কখনও-কখনও জানলার কাচও ভেঙে দেয়। শিস দিয়ে ওরা ওল্ড সিটির লোকজনকে সাবধান করে দেয়।

বিপজ্জনক ভিড় বা জটলা থাকলে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আর শিসে কাজ না হলে বুলেট চলে—কখনও রবার-বুলেট, কখনও মেটাল-বুলেট।

হাঁটতে-হাঁটতে মানিকতলার খালের কাছে পৌঁছে গেল মালিক আর জিশান। পথে নানান জায়গায় দেখল, মানুষজন ভিড় করে প্লেট টিভিতে গেম শো দেখছে। নানান কোম্পানি নানারকম গেম শো দেখালেও সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেমগুলোই সবার সেরা।

সে-কথাই মালিককে বলছিল জিশান।

মালিক তাতে হেসে বলল, 'ওল্ড সিটির ফাইট গেমটাও কিছু কম নয়। গেমটা একবার দেখ—নেশা ধরে যাবে।'

কথা বলতে-বলতে হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে একটা বিশাল কারখানার সামনে হাজির হল ওরা।

কারখানাটা উঠে গেছে বহুকাল। এককালে স' মিল ছিল—এখন তার ভাঙাচোরা কঙ্কাল পড়ে আছে। তার ভেতরে আলো-আঁধারিতে ঝুপড়ি বেঁধে আস্তানা গেড়েছে অসংখ্য লোক।

স' মিলের সামনের রাস্তায় পাইপ ফেটে ফিনকি দিয়ে জল বেরোচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে কয়েকজন মহিলা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। চার-পাঁচটা উনুন থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে লাল-নীল ধূমকেতুর দিকে।

স' মিলের অন্ধকার থেকে একটা মোটাসোটা ধেড়ে ইঁদুর বেরিয়ে এল। তারপর বেশ ধীরে-সুস্থে হেলেদুলে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল খালের দিকে।

একটা হইহই চিৎকার ওদের কানে আসছিল। আঙুল তুলে স' মিলের উলটোদিকের খালধারটা দেখাল মালিক, বলল, 'খালপাড়ে...নীচেটায়...ফাইট হচ্ছে। জলদি চল।'

খালধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘন আগাছা—মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ। কোনও-কোনও গাছের তলায় ফেলে যাওয়া শীতলা ঠাকুর। রোদ-জল-বৃষ্টিতে ঠাকুরের হতমান অবস্থা।

ওরকমই একটা ঠাকুরের পাশে প্রচুর লোহালক্করের ডাঁই। তার মধ্যে গোটাপাঁচেক জং-ধরা ভাঙা গাড়িও আছে। একটা গাড়ির মাথায় আর-একটা গাড়ি চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার পাশ দিয়ে এগিয়ে ঢাল বেয়ে খালের দিকে নামতে শুরু করল মালিক। জিশান ওর পিছু নিল।

একটা বড় গাছ পেরোতেই ঢালুভাবে নেমে যাওয়া খালপাড়টা জিশানের চোখে পড়ল। খালপাড়ের ঢালে—বেশ খানিকটা নীচে—একটা এবড়োখেবড়ো সমতল জায়গা। সেখানে আগাছার জঙ্গল সাফ করে ময়দান-এ-জঙ্গ তৈরি হয়েছে। তাকে ঘিরে অসংখ্য কেরোসিন কুপি, হ্যারিকেন আর মশালের আলো। ঠিক যেন মনে হচ্ছে দেওয়ালির রাত। আর সেই আলোর বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশকিছু দর্শক উত্তেজনায় চিৎকার করছে : 'খতম করো! খতম করো!'

লড়াইয়ের রিং-টা খালপাড়ের ঢালে বেশ খানিকটা নীচে হওয়ায় রাস্তা থেকে চোখে পড়ার উপায় নেই। ফলে এখন ওটা নজরে আসামাত্রই জিশান বুকে একটা ধাক্কা খেল।

রিং-এর ভেতরে তখন লড়াই চলছে।

•

জিশান এই ফাইট গেমের কথা আগে শুনেছে, কিন্তু কখনও দেখেনি। তাই ও অবাক হয়ে দেখছিল।

একটা কদমছাঁট চুল লম্বা ছেলে একজন বেঁটেমতন লোকের সঙ্গে লড়ছিল।

ছেলেটার গায়ের রং ময়লা, এককানে মাকড়ি, গলায় কালো সুতোর মালায় একটা চকচকে লকেট ঝুলছে। ওর পোশাক বলতে একটা বাদামি রঙের হাতকাটা ফতুয়া, আর ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট।

বেঁটেমতন লোকটার গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর একটা কালচে হাফপ্যান্ট। মাথায় বড়-বড় চুল। কুতকুতে চোখ।

লড়াই চলছিল আর একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে একজন রোগা-সোগা লোক মিহি গলায় ফিরিওয়ালার মতো চেঁচাচ্ছিল : 'ফাইট দারুণ জমে উঠেছে। দেখা যাক, কে জেতে—কার্তিক, না ছুন্না। একে চার, একে চার...।'

ফিরিওয়ালা লোকটার হাতে অনেকগুলো নোট। মুঠো করে ধরে বাতাসে নাড়ছে। কেউ-কেউ হাত বাড়িয়ে তার হাতে টাকা দিচ্ছে। লোকটা টাকা নিয়ে একটা ছোট স্লিপমতন দিচ্ছে।

টাকাগুলো দেখে জিশানের তেষ্টা পেয়ে গেল, শানুর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ আগে ওর পকেটের টাকাগুলো কেউ হাতিয়ে নিয়েছে।

হ্যারিকেন, কুপি, আর মশালের লাল-হলদে শিখা কাঁপছিল। সেই আলো ছিটকে পড়েছে দর্শকদের উল্লাস ভরা মুখে, লড়াকু কার্তিক আর ছুন্নার গায়ে।

আশপাশের লোকজনকে জিগ্যেস করে মালিক জানতে পারল, বেঁটেমতন ফাইটার হচ্ছে কার্তিক, আর জিনস পরা ছেলেটা ছুন্না। কার্তিক আগে অনেক ম্যাচ জিতেছে। সেই তুলনায় ছুন্না একেবারেই নতুন—শুধু আগের ম্যাচটা জিতেছে। সুতরাং ছুন্নার ওপরে যারা বাজি ধরেছে, ছুন্না জিতলে তারা একটাকায় চারটাকা পাবে। আর কার্তিক জিতলে দশটাকায় তিনটাকা।

রিং-এর ভেতরটা সাফসুতরো করা হলেও জমি এবড়োখেবড়ো, কোথাও-কোথাও কাদা রয়েছে। তারই মধ্যে ছুন্না আর কার্তিক জন্তুর মতো লড়ছিল। ছুন্নার পা চলছিল বেশি, আর কার্তিকের হাত। আর দুজনেই মাঝে-মাঝে বিশ্রী ভাষায় একে অপরকে গালিগালাজ করছিল।

ছুন্না মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কার্তিকের তলপেটে এক লাথি কষিয়ে দিল। 'ওঁক' শব্দ করে উঠল কার্তিক, ওর শরীরটা ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ছুন্না বেজির ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে উঠে খামচে ধরল কার্তিকের চুল—এক প্রবল হ্যাঁচকা টানে ওকে ছিটকে ফেলে দিল চারহাত দূরে। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে কার্তিক সপাটে এক ঘুষি কষিয়ে দিল ছুন্নার মুখে।

একটা ভোঁতা শব্দ হল। তারপরই ছুন্না চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আর কার্তিক শরীরটাকে গড়িয়ে ওর কাছে নিয়ে গেল। একখাবলা মাটি তুলে নিয়ে ঘুঁটে দেওয়ার মতো ঢঙে সজোরে থাবড়ে দিল ছুন্নার মুখে। এবং পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ছুন্নার একটা পা একটানে তুলে নিল। সেটাকে গোড়ালি ধরে মুচড়ে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চাপ দিতে লাগল। আর ছুন্না অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

বোঝা গেল, লড়াই শেষ।

দর্শক উল্লাসে জিগির তুলতে লাগল : 'কার—তিক! কার—তিক! কার—তিক!'

মালিক জিশানের কানে ফিসফিস করে বলল, 'সালা আমার তিরিশটা টাকা গেল।'

জিশান অবাক হয়ে মালিকের দিকে তাকাল। ও কখন ছুন্নার ওপরে বাজি ধরেছে কে জানে!

'তুই কখন টাকা লাগালি?'

'এখানে এসেই—।'

'এভাবে যখন-তখন বাজি ধরা যায়?'

'যায়। সেটা অ্যালাউ করবে কি না ঠিক করে রেফারি—ওই যে, ওই টিংটিঙে লোকটা—যে নোটের গোছা হাতে চেঁচাচ্ছে।'

রেফারি তখন বাজি জেতা লোকজনকে টাকা দিচ্ছে। কার্তিক আর ছুন্না একবালতি জল থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে রক্ত আর কাদা ধুয়ে নিচ্ছে। দু-তিনটে ছেলে ওদের সাহায্য করছে।

মিনিটপাঁচেক পরেই রেফারি আবার হাঁকতে শুরু করল : 'এবার পরের ফাইট। সব সরে যাও—এবার শুরু হবে পরের ফাইট। কে লড়বে বলো—কে লড়বে?'

জনতার মধ্যে তখন চাপা উত্তেজনা, জোর আলোচনা চলছে, কথাকাটাকাটিও হচ্ছে। কেউ বলছে, ছুন্নার মুখে কাদা লেপটে না দিলে কার্তিক মোটেই জিততে পারত না। আবার কেউ-বা বলছে, কার্তিকের গায়ে অসম্ভব জোর—আর প্রতিপক্ষের মার সহ্য করার ক্ষমতাও সাংঘাতিক।

রিং-এ কেউ ছিল না। হঠাৎই কার্তিক লাফিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর বক্সার কিংবা কুস্তিগিরদের ঢঙে নেচে-নেচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর রেফারি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, 'বন্ধুগণ, দোস্তোঁ, মাই ফ্রেন্ডস—কার্তিক আবার লড়তে রাজি আছে। আমাদের ফেবারিট ফাইটার কার্তিক। কে লড়বে ওর সঙ্গে? কে লড়বে? একজনও হিম্মৎদার ব্যাটাছেলে এখানে নেই? একটাও সালা বাপের ব্যাটা নেই?'

রেফারির চেঁচানি চলছিল, আর জনতার গুঞ্জনও চলছিল সমান তালে। মশাল, হ্যারিকেন আর কুপির আলোয় এ ওর দিকে তাকাচ্ছিল—চোখে প্রশ্ন : পয়সার লোভে কে কার্তিকের সঙ্গে লড়ার ঝুঁকি নেবে?

রেফারি তখন বুঝেছে বাজির দর না বাড়ালে কাউকে পাওয়া যাবে না। অথচ আর-একটা লড়াই হলে তার কমিশনটাও বাড়বে। তা ছাড়া এই ছন্নছাড়া গরিব মানুষগুলোর কাছে পয়সা বিরাট ব্যাপার। সুতরাং সে বাজির দর চড়াতে লাগল। বলতে লাগল, নতুন ফাইটার জিতলে একটাকায় ছ'টাকা। আর ফাইটারকে দেওয়া হবে একহাজার টাকা। ফাইটার যদি হেরে যায়, তা হলে পাবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

জিতলে একহাজার টাকা!

শ্বাস টানল মালিক। চাপা গলায় জিশানকে বলল, 'একহাজার টাকা মাইরি অনেক। লড়ে গেলে হয়।'

জিশান অবাক হয়ে তাকাল বন্ধুর দিকে। কী বলছে মালিক! কার্তিক পেশাদার ফাইটার—মালিক তার সঙ্গে কী করে পেরে উঠবে? মালিকের প্লাস পয়েন্ট একটাই—ওর জন্য চোখের জল ফেলার কেউ নেই। একমাত্র জিশান ছাড়া।

মালিক দিন-রাত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, নানান ফুর্তি-ফার্তা করে, টাকা ওড়ায়। গুছিয়ে বাঁচার ইচ্ছেটা ওর মধ্যে একদম নেই। ওর নীতি হচ্ছে, রঙ্গরৌলি করে জিন্দেগি কাটাও। কিন্তু তাই বলে কার্তিকের সঙ্গে ফাইট!

জিশান বলল, 'তুই কি খেপেছিস?'

'কিন্তু জিশু, ভেবে দেখ, একহাজার টাকা! একবার রিসক নিলে হয়...।'

'ধুৎ, তুই কার্তিকের সঙ্গে পারবি না—।'

'পারতেও তো পারি!'

আশপাশের কয়েকজন দর্শক ওদের কথাবার্তা শুনছিল। তাদেরই একজন বলে উঠল, 'লড়ে যাও। তোমার তো দারুণ বডি!'

আর-একজন বলল, 'শুনলে না, জিততে পারলে হাজার টাকা। ঢুকে পড়ো, রিং-এ ঢুকে পড়ো।'

আচমকা দুজন লোক মালিকের একটা হাত ধরে শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ লড়বে! এ লড়বে!'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে তুলকালাম ঘটে গেল।

টুলে দাঁড়ানো রেফারির কাছে পটাপট বাজির টাকা জমা পড়তে লাগল। জনতা নতুন লড়াই দেখার আশায় হইহই করে উঠল।

মালিক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল—কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। আর জিশান লোকদুটোর হাত থেকে মালিককে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, 'ও লড়বে না। ও লড়বে না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! কয়েকটা হাত প্রবল ধাক্কায় মালিককে ছিটকে দিল রিং-এর ভেতরে। মালিক চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে রেফারি একটা হুইসল বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'স্টার্ট!' আর হিংস্রভাবে নেচে বেড়ানো কার্তিক চুলের মুঠি ধরে মালিককে একটানে তুলে নিল। কয়েকপলক তাকাল গোল হয়ে ঘিরে থাকা দর্শকদের দিকে। তারপর এক ভয়ঙ্কর চাপড় বসিয়ে দিল মালিকের গালে—কিন্তু ওর চুলের মুঠি ছাড়ল না।

মালিকের মুন্ডুটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। অসহ্য ব্যথায় মনে হল চোয়ালটা বোধহয় এখনই খুলে পড়বে। কয়েক লহমার জন্য অসাড় হয়ে গেল মালিক। ওর চোখ বুজে গেল।

কিন্তু প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে একটা ব্যাপার আছে। বাঁচার তাগিদ কারও কিছু কম নেই। আত্মরক্ষার তাগিদও। হয়তো সেই তাগিদেই অনেকটা অটোমেটিক পুতুলের মতো কার্তিকের গলা টিপে ধরল মালিক। নদীতে ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ যেরকম প্রাণপণে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, অনেকটা সেই ঢঙে মালিক কার্তিকের গলা টিপে ধরেছিল—যেন বাঁধন আলগা করলেই ও জলে ডুবে মারা যাবে।

কিন্তু কার্তিক পেশাদার ফাইটার। এ-লাইনে পুরোনো পাপী। তাই মালিক গলা টিপে ধরতেই ও ডান হাঁটু দিয়ে মালিকের দু-ঊরুর মাঝে এক জোরালো গুঁতো মারল। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার শব্দ করে মালিক মাটিতে খসে পড়ল, শরীরটাকে কেন্নোর মতো গুটিয়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

জিশান চিৎকার করে উঠেছিল, 'কী হচ্ছে কী? এখনই লড়াই বন্ধ করো। এভাবে যেখানে-সেখানে মারার নিয়ম নেই। বন্ধ করো ফাইট।'

দর্শকরা জিশানের কথা কানেই তুলল না। রক্ত দেখার খিদেয় জন্তুর মতো চিৎকার করতে লাগল। কে একজন বলল, 'ফাইটের মাঝে আবার নিয়ম দেখাচ্ছ! ব্যাটা বুরবাক!'

জিশান দু-হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইল রেফারির কাছে। ধাক্কাধাক্কিতে একটা মশাল থেকে আগুনের কুচি ছিটকে পড়ল ওর গলার কাছে। পিন ফোটানোর মতো যন্ত্রণা হল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন গালাগাল দিল জিশানকে।

কোনওরকমে টুলে দাঁড়ানো রেফারির কাছে এসে পৌঁছল ও। লোকটা গভীর মনোযোগে মালিক আর কার্তিকের লড়াই দেখছে, একইসঙ্গে ফুকফুক করে বিড়ি টানছে।

জিশান চেঁচিয়ে অনেক কিছু বলছিল, কিন্তু লোকটা সেদিকে কোনও কানই দিচ্ছিল না।

রেফারির গায়ের তেলচিটে নোংরা পোশাকের বোটকা গন্ধ জিশানের নাকে আসছিল। ছুঁতে ঘেন্না করলেও শেষ পর্যন্ত ও মনের জোরে লোকটার প্যান্ট ধরে টান মারল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'এভাবে যেখানে-সেখানে মারার কোনও নিয়ম নেই—।'

লোকটা বিরক্ত হয়ে চোখ নামিয়ে তাকাল জিশানের দিকে। চোখের পলকে কুকুর-তাড়ানোর ভঙ্গিতে একটা লাথি চালাল জিশানের বুকে এবং দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল, 'ফোট, সালা—ফোট! এ-ফাইটে ইল্লিগাল বলে কিছু নেই।'

তারপরই আবার খেলা দেখায় মন দিল।

জিশান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন দর্শক অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল সামনে থেকে।

লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো সরে এল জিশান। ভিড় ঠেলে উঁকি মারল রিং-এর ভেতরে।

মালিকের অবস্থা তখন ভালো নয়। ওকে উপুড় করে একটা পা মুচড়ে ধরেছে কার্তিক। মালিকের অন্য পা-টা শূন্যে ছটফট করছে। সেই অবস্থায় কার্তিক কনুই দিয়ে মালিকের পিঠে গুঁতো মারছিল।

মালিক অতিকষ্টে পালটি খেল। কোনওরকমে জোড়া পায়ে ঝটকা দিয়ে ঠেলে দিল কার্তিককে। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

জিশান দেখল, মালিকের ঠোঁটের কোণ আর কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। ওর গায়ের রং কালো বলে ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে না। তবে জ্বলন্ত মশালের আগুনের আভায় গড়িয়ে পড়া রক্ত চকচক করছে।

জিশান বুঝতে পারছিল মালিকের হয়ে এসেছে। ও চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'মালিক! বেরিয়ে আয়—আর ফাইট করতে হবে না! চলে আয়...! মালিক! চলে আয়—!'

জিশানের গলার আওয়াজ পেয়ে মালিক সেদিক লক্ষ করে তাকাল। আলো-ছায়ার খেলার মাঝে জিশানকে খুঁজে নিতে চাইল।

মালিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যই ছুটে আসা কার্তিককে ও খেয়াল করেনি। যখন করল তখন দেরি হয়ে গেছে।

বুলেটের মতো ছুটে এসে কার্তিক মাথা দিয়ে গুঁতো মারল মালিকের পেটে। বুনো ষাঁড়ের মতো ওর শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে চলল রিং-এর ধারে দাঁড়ানো দর্শকদের দিকে।

প্রচণ্ড উত্তেজনার চিৎকার শোনা গেল। হুড়মুড়িয়ে দর্শকরা সরে গেল জায়গা থেকে—যাতে ফাইটারদের সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়। আর তখনই রিং-এর বাইরে লোহালক্কড়ের ডাঁইটা নজরে পড়ল জিশানের। এতক্ষণ দর্শকদের ভিড়ে ওগুলো আড়াল হয়ে ছিল।

জিশান আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। আর সেই বিস্ফারিত চোখের সামনেই মালিকের শরীরটা জং-ধরা লোহালক্কড়ের স্তূপে গিয়ে ধাক্কা খেল।

ঠিক কী যে হল ভালো করে বোঝা গেল না। বোঝা গেল একটু পরে—কার্তিক যখন সরে এল মালিকের কাছ থেকে।

মালিকের দেহটা তখনও বলতে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ বোজা। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে চিবুকটা প্রায় বুকে ঠেকে গেছে।

কার্তিক তখন রিং-এর মধ্যে নৃশংস উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে। ওর দেহের দু-চার জায়গা কেটে-ছড়ে গেলেও ও বিন্দুমাত্রও কাহিল হয়ে পড়েনি।

চারপাশে দর্শকদের হইচই চলছে। রিং-এর মধ্যে অনেকে ঢুকে পড়েছে। রেফারি সরু গলায় 'কার্তিক! কার্তিক!' বলে চেঁচাচ্ছে। সেই তালে-তালে দর্শকও চেঁচাচ্ছে, 'কার—তিক! কার—তিক!'

জিশান ছুটে গেল মালিকের কাছে। আর কাছাকাছি এসেই ওর মনে হল, মালিক বোধহয় আর বেঁচে নেই। হঠাৎই ক্রুশবিদ্ধ জিশুর ছবিটা ঝলসে উঠল ওর চোখের সামনে। ও হাত বাড়িয়ে মালিককে জড়িয়ে ধরল, টান মেরে তুলে নিতে চাইল বুকে, কিন্তু ওকে নড়াতে পারছিল না।

জিশান কেঁদে ফেলেছিল। বারবার মালিকের নাম ধরে ডাকছিল। তখন কয়েকজন দর্শক আর রেফারি মিলে জিশানের সঙ্গে হাত লাগাল। পিঠে গেঁথে যাওয়া লোহাগুলো অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে মালিককে বের করে নিয়ে এল ওরা। মালিকের শরীরের পিছনদিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জিশান ওকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। একহাজার টাকার জন্য এভাবে ঝুঁকি নিল মালিক!

কিন্তু মালিক তো ঝুঁকি নিতে চায়নি! উত্তেজনায় পাগল দর্শকের দল ওকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়েছে রিং-এর ভেতরে। প্লেট টিভির গেম শো-গুলোই সবার সর্বনাশ করেছে। রোজ-রোজ নতুন-নতুন গেম চালু হচ্ছে টিভিতে। কী করে পলকে বড়লোক হওয়া যায়—এই চিন্তাটাই ঢুকে গেছে সবার মনের ভেতরে।

নিউ সিটির সুপারগেমস কর্পোরেশনের ওপরে ভীষণ রাগ হল জিশানের। ওদের বিপজ্জনক খেলাগুলোয় সবসময় নাম দেয় ওল্ড সিটির লোকজন—যারা চট করে বড়লোক হতে চায়, যাদের জানের এমনিতে খুব একটা দাম নেই।

আর নিউ সিটির বড়লোকগুলো! এক-একটা সব ভিতুর ডিম! একটা গেম শো-তেও ওরা কেউ নাম দেয় না। ওরা শুধু বাড়িতে নিশ্চিন্তে বসে প্লেট টিভিতে খেলা দ্যাখে আর চিকেন-প্রন পকোড়ার সঙ্গে সুস্বাদু পানীয় খায়।

গেম শো-গুলোকে জনপ্রিয় করার জন্যই 'সিন্ডিকেট' অসংখ্য প্লেট টিভি বিনা পয়সায় লাগিয়ে দিয়েছে ওল্ড সিটিতে। টিভির ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোগ্রামে স্রেফ বোতাম টিপেই গেম শো-তে নাম দেওয়া যায়।

সেই গেম শো নকল করতে পাগল ওল্ড সিটি। নকল নবিশির জেরে শেষ হয়ে গেল মালিক। এর হিসেব সমান করবে কে? জিশান?

গেম শো নিয়ে ঘৃণা আর টানের ফাঁদে পড়ে গেল জিশান। ওর চোখ ফেটে জল বেরোচ্ছিল।

মালিকের শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল ও। হঠাৎই টের পেল, মালিকের শ্বাস পড়ছে। চোখের জল মুছে ও 'মালিক!' বলে ডেকে উঠল। ওর মুখের ওপরে আরও ঝুঁকে পড়ল।

মালিক ধীরে-ধীরে চোখ খুলে জিশানকে দেখল। অনেকক্ষণ ঘোলাটে নজরে তাকিয়ে থেকে তারপর খুব অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'জিশু, ভেবেছিলাম লড়ব যখন ফ্যালকনের মতো লড়ব...কিন্তু সালা স্প্যারোর মতো লড়লাম। তুই ওকে উড়িয়ে দে। ওই কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস!'

মালিকের চোখ বুজে গেল। আর শ্বাস পড়ছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। আশেপাশে ভিড় করে থাকা লোকজন এতক্ষণ 'হাসপাতাল...ডাক্তার...' এসব বলছিল। ওরা হঠাৎই চুপ করে গেল। কে একজন চিৎকার করে বলল, 'সালা টেঁসে গেছে। বডিটা খালাস করে দে।'

সঙ্গে-সঙ্গে দু-তিনজন লোক এসে মালিকের বডিটা টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল।

জিশান প্রথমটা আটকাতে গিয়েছিল—কিন্তু কী ভেবে ছেড়ে দিল। কী হবে মালিকের বডি নিয়ে? বডি নিয়ে কোথায় যাবে ও? শ্মশানে ছাড়া?

জিশানের হাতে-জামায় রক্ত। নাকে মালিকের গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছিল ও—বন্ধুত্বের গন্ধ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল জিশান। ঠিক তখনই একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর সামনে বাড়িয়ে ধরল কেউ।

মুখ তুলে তাকাল জিশান। ওর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে রেফারি। মালিকের হেরে যাওয়ার টাকাটা জিশানকে দিচ্ছে।

জিশানের বমি পেয়ে গেল। মুখে একগাদা থুতু উঠে এল পলকে।

টাকাটা জিশান নিতে চায়নি, কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হল, ওটা মালিকের স্মৃতি। তা ছাড়া মালিক মারা যাওয়ার আগে ফিসফিস করে যা বলে গেছে সেই কথাগুলো এখন দামামা হয়ে জিশানের কানে বাজছে: '...কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

মালিকের পাওনা টাকা আর পাওনা শপথের দায় এখন জিশানের।

জিশান আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল। ও ভালো করেই জানে, ওখানে গড বলে কেউ নেই—সেইজন্যেই আকাশটা দিনের বেলায় ফাঁকা আর রাতের বেলা অন্ধকার—এই নষ্ট শহরটার মতো অন্ধকার।

রঙিন ধূমকেতু দুটোর লাল-নীল আভা জিশানের চোখে পড়ল। ও মালিককে যেন আকাশে দেখতে পেল কোথায়। চোখ মুছে নজর নামাল জিশান। পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিল রেফারির কাছ থেকে। লোকটার সারা গা থেকে বিড়ির গন্ধ বেরোচ্ছিল, তার সঙ্গে বোটকা গন্ধ।

জিশান দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আর-একটা ফাইট হয়ে যাক। ওই কার্তিকের সঙ্গে আমি লড়ব।'

সঙ্গে-সঙ্গে রেফারির দু-চোখে ফস করে খুশির আলো জ্বলে উঠল। ডানহাত ওপরে তুলে লোকটা মিহি গলায় চেঁচাতে শুরু করল, 'কেউ চলে যেয়ো না। শুরু হচ্ছে নয়া ফাইট। কার্তিকের সঙ্গে লড়বে নতুন আনকোরা এক ইয়ং ফাইটার—' লোকটা চেঁচানো থামিয়ে নিচু গলায় জিশানকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'জিশান।'

'বন্ধুগণ, নতুন ফাইটার জিশান—আর আমাদের চ্যাম্পিয়ন কার্তিক।' আবার চেঁচানি শুরু হয়ে গেল : 'এটাই আজকের লাস্ট ফাইট। আজকের মারাত্মক লাস্ট ফাইট। জিশান ভার্সেস কার্তিক—দেখা যাক সালা কে জেতে—।'

চেঁচাতে-চেঁচাতে লোকটা চলে গেল ওর টুলের কাছে। প্রায় লাফিয়ে টুলের ওপরে উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকরা ওর দিকে হামলে পড়ল। নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

'একে বিশ, একে বিশ! জলদি করো! লাস্ট ফাইট—ঢিসুম-ঢিসুম—কাম অন, কাম অন...।'

মালিকের সঙ্গে লড়াই শেষ হওয়ার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা করছিল অনেকে। অনেকে আবার বাড়ির পথ ধরেছিল। মালিকের মারা যাওয়ার ব্যাপারটা ওদের মনে তেমন দাগ কাটেনি। কারণ, এই ফাইট গেমে মাঝে-মাঝেই দু-একজন মারা-টারা যায়। এই গেমে যে ঝুঁকি আছে সেটা সবাই জানে। আর ঝুঁকি আছে বলেই খেলাটায় এত রোমাঞ্চ, এত উত্তেজনা।

রেফারির চিৎকার শুনে দর্শকদের ভাব-ভঙ্গি পালটে গিয়েছিল। শান্ত হয়ে যাওয়া মানুষগুলো আবার যেন রক্তের খিদেয় পাগল হয়ে গেল। ছত্রখান জনতা চটপট নিজেদের গোল করে সাজিয়ে নিল—মাঝে জল-কাদা মাখা এবড়োখেবড়ো রিং। জনতার অনেকেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল রেফারির কাছে—ওকে মাছির মতো ছেঁকে ধরল। রেফারিও চটপট পেশাদারি ঢঙে বাড়িয়ে ধরা হাতগুলো থেকে ছোঁ মেরে টাকা নিয়ে ছোট-ছোট স্লিপ গুঁজে দিতে লাগল।

রিং-এর ভেতরে কার্তিক ততক্ষণে হিংস্র উল্লাসে লাফাতে শুরু করেছে। বড়-বড় লাফ দিয়ে দর্শকদের নাকের ডগা ছুঁয়ে গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে গালাগালির ফোয়ারা।

জিশান রিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ওর গায়ে গোলাপি-সাদা চেক কাটা হাফশার্ট। তার এখানে-সেখানে রক্ত লেগে রয়েছে—মালিকের রক্ত।

জিশান শার্টটা খুলতে শুরু করতেই মিহি গুঁড়োর মতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শার্টটা খুলতে-খুলতে দর্শকদের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল ও। আগ্রহে উত্তেজনায় ওরা কার্তিকের নাম ধরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে : 'কার—তিক! কার—তিক! কার—তিক!'

কার্তিক রিং-এ পাক খেতে-খেতে জিশানের গায়ে থুতু ছিটিয়ে গেল। জিশান তাকিয়ে দেখল শুধু—কিছু বলল না।

রেফারি একটা হুইসল বাজাল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'স্টার্ট!'

ব্যস, লড়াই শুরু হয়ে গেল।

জিশান দু-পা ফাঁক করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল—যেন এখনই শিকার লক্ষ্য করে লাফ দেবে। ওর ফরসা খালি গা, উজ্জ্বল চোখ, মাথার ঢেউ খেলানো চুল, রং-ওঠা জিনসের প্যান্ট, কোমরে কালো বেল্ট—দেখে মনে হয় না, ও ওল্ড সিটিতে থাকে।

আর কার্তিক! ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, নিরীহ ভেড়ার ছানাদের রিং-এ টেনে এনে কুচিকুচি করে জবাই করাটাই ওর পেশা।

ও জিশানকে ঘিরে স্লো-মোশান ছবির মতো পাক খাচ্ছিল, আর তীক্ষ্ণ নজরে প্রতিপক্ষকে মেপে নিচ্ছিল। ও বেঁটে হলে কী হবে, হাফপ্যান্টের নীচেই ওর ঊরুর শক্তিশালী পেশি চোখে পড়ছিল। মিহি বৃষ্টিতে ওর মাথায়, গায়ে, বৃষ্টির কণা চিকচিক করছিল।

আচমকা জিশানের দিকে ছুটে এল কার্তিক। আফ্রিকার আদিবাসী যোদ্ধাদের মতো কানফাটানো এক জিগির তুলে শূন্যে লাফ দিল। ওর পেশিবহুল শক্ত ডান-পাটা টান-টান করে সামনে বাড়ানো। ও তাক করেছে জিশানের গলা। একবার সংঘর্ষ হলেই লড়াই খতম।

জিশান শূন্যে ধেয়ে আসা হিংস্র কার্তিককে দেখল। ওর মনে পড়ল, এ-খেলায় নিয়ম বলে কিছু নেই, বে-আইনি বলে কিছু নেই।

তাই পলকে এক হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ল জিশান। কার্তিক তখন শূন্যে, ওর মাথার ওপরে।

কার্তিকের ঊরুসন্ধি লক্ষ করে লোহার মুঠি চালিয়ে দিল জিশান। সে-ঘুষির পিছনে ওর সমস্ত শক্তি একজোট করা ছিল।

কার্তিক সটান খসে পড়ল মাটিতে—যেন গুলি খাওয়া চড়ুইপাখি। আর বাজপাখি জিশান ছোঁ মেরে তুলে নিল ওর ছটফটে দেহটা। মাথার ওপরে তুলে এগিয়ে গেল লোহালক্কড়ের ডাঁইয়ের দিকে।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে দর্শকরা ভয়ে সরে গেল দুপাশে। কিন্তু ওরা পাগলের মতো চিৎকার করছিল, 'জি—শান! জি—শান! জি—শান!'

জিশানের সামনেই জং-ধরা লোহার স্তূপ—খোঁচা-খোঁচা লোহার শিক বেরিয়ে আছে সেখান থেকে।

মালিকের কথা মনে পড়ল জিশানের। অন্ধ রাগে ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, তারপরই কার্তিকের দেহটা ছুড়ে দিল লোহালক্কড়ের ওপরে।

জনতা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল।

ব্যস, ফাইট খতম।

কার্তিককে উড়িয়ে দিয়েছে জিশান। মালিকের আত্মা নিশ্চয়ই দেখেছে, কে ফ্যালকন, আর কে স্প্যারো! জিশানের শপথ পূর্ণ হয়েছে। এবার জিশান জল খেতে পারে।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল রিং-এর জল-কাদার মধ্যে। হাঁ করে তাকাল ওপর দিকে।

বৃষ্টির ফোঁটা এখন মাপে একটু বড় হয়েছে। সেগুলো টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে জিশানের হাঁ করা মুখের ভেতরে। আকাশ থেকে ছেটানো শান্তির জল।

পাবলিক তখন রেফারিকে ঘিরে ধরেছে। হইচই চেঁচামেচি হচ্ছে। আপসেট রেজাল্টে বেশিরভাগেরই মুখ ব্যাজার। যারা জিতেছে তাদের মুখে চওড়া হাসি। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে গান ধরেছে।

ভেজা গায়ে উঠে দাঁড়াল জিশান। রিং-এর একপাশে পড়ে থাকা দলাপাকানো ভেজা শার্টটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল। তারপর বোতাম লাগাতে-লাগাাতে রেফারির কাছে গেল। আড়চোখে লক্ষ করল, কার্তিকের দেহ অথবা মৃতদেহ ঘিরে বেশ বড়সড় জটলা তৈরি হয়ে গেছে।

ভীষণ আপসেট রেজাল্ট—এ-রেজাল্ট কেউ ভাবতেও পারেনি। তাই জিশানের হাতে অনেকগুলো টাকা ধরিয়ে দিল রেফারি। তারপর মিহি গলায় বলল, 'পরশু রাতে আবার ফাইট আছে। জরুর আসবে—সেদিন তোমার হয়ে মোটা মাল লড়িয়ে দেব...।'

টাকাগুলো নেওয়ার সময় জিশানের ডানহাতটা ব্যথা করছিল। ঘুষিটা কার্তিককে ও এত জোরে মেরেছে যে, এখনও কাঁধ পর্যন্ত টনটন করছে। কিন্তু ওইটুকু ব্যথা নিয়েও অনায়াসে এই রেফারি লোকটাকে একটা থাপ্পড় মারা যায়। কারণ, খানিকক্ষণ আগে এই লোকটাই জিশানকে কুকুরের মতো লাথি মেরেছিল।

যে-এলাকার যা নিয়ম।

জিশান প্রথমে রেফারির মুখে শব্দ করে থুতু দিল। তারপর সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল লোকটার গালে।

পটকা ফাটার মতো শব্দ হল এবং লোকটা চোখ উলটে ভিড়ের গায়ে ঢলে পড়ল।

জিশান আর দাঁড়াল না। দর্শকদের ভিড় ঠেলে খালপাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। ততক্ষণে বৃষ্টি আরও বেড়ে গেছে। কাদায় ওর পা পিছলে যেতে চাইছিল বারবার।

রাস্তায় উঠে এসে তাড়াতাড়ি পা চালাল জিশান। অনেক দেরি হয়ে গেছে মিনি চিন্তা করবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে ওর ভালো লাগছিল—পকেটে এখন অনেকগুলো টাকা। শানুর জন্য একটা কেন, ও এখন চাইলে দশটা দুধ কিনতে পারে।

ওষুধের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই কান্না পেয়ে গেল জিশানের। প্রথমে মালিকের জন্য। ও ভাবতেই পারছিল না, ওকে আর কেউ 'জিশু' বলে ডাকবে না। বিশৃঙ্খল এই শহরে উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটানোর জন্য কেউ তাকে আর বারবার করে লোভ দেখাবে না। ভাবতেই পারছিল না, মালিক আর নেই।

কিন্তু জিশানও কি আর আছে! আগের জিশান?

দ্বিতীয়বার কান্না পেয়ে গেল জিশানের। এবারে নিজের জন্য। রাগে দু:খে এ কী করে বসল ও! অভাবের তাড়না ওকে রোজ কোণঠাসা করে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে...!

পথ চলতে-চলতে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল জিশান। শুধু মালিক নয়, জিশানও আজ মারা গেছে। মারা যাওয়া অধ:পাতে যাওয়া এই জিশান এখন জুয়ায় জিতে সেই টাকায় ছেলের জন্য দুধ কিনতে যাচ্ছে।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভেতর থেকে কে যেন প্রতিবাদ করে উঠল : না, জুয়ায় জেতা টাকা নয়—পরিশ্রম দিয়ে উপার্জন করা টাকা। গায়ের শক্তি দিয়ে ও কার্তিককে হারিয়ে তারপর এই টাকা পেয়েছে।

তখনই ওর বুকের ভেতরে হেসে উঠল মালিক, বলল, 'জিশু, এ আমার প্রাণের দাম। এতে কোনও পাপ নেই। এ-টাকা দিয়ে তুই শানুর জন্যে দুধ কিনে নিয়ে যা...মেয়েদের মতো কাঁদিস না সালা—।'

জিশান যন্ত্রণায় চোখ বুজল। ওর দু-চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে ও ওষুধের দোকানে পৌঁছে গেছে।

•

রোজ বিকেলে শানুকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় জিশান। এক-একদিন মিনিও ওর সঙ্গে থাকে। যেমন আজ।

রাতের অন্ধকারে ওল্ড সিটির চেহারা একরকম—কেমন যেন অপার্থিব, ছমছমে রহস্যে ঢাকা। আর দিনের চড়া আলোয় শহরটা কী কুৎসিত, হতমান!

শহরের বেশিরভাগ গাছপালাই নেড়া, তাতে কোনও ফুল-পাতা নেই। শুধু কঙ্কালটা কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকী বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, হাটবাজার, সবই ধুঁকছে—সেই সঙ্গে শহরের মানুষগুলোও। তবে মানুষগুলোর মধ্যে এখনও স্বপ্ন আছে। বেশিরভাগেরই স্বপ্ন নিউ সিটিতে যাওয়ার।

কিন্তু জিশান বা মিনির স্বপ্ন পুরোপুরি সেটা নয়। ওরা চায়, এই শহরটা আবার বেঁচে উঠুক—গাছপালা, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, হাটবাজার, আর মানুষগুলোও বেঁচে উঠুক আবার। নানান রঙের ফুল আর পাখিরা ফিরে আসুক।

এখন তো পাখি বলতে শুধু কাক, চড়ুই, শালিখ, চিল আর শকুন—এ ছাড়া কখনও-কখনও ছিটকে চলে আসা দু-একটা পায়রা চোখে পড়ে। মউমাছি বা প্রজাপতি শেষ কবে দেখেছে জিশানের মনে নেই। আর ফুল? জংলা ঝোপ-ঝাড়ে দয়া করে যেটুকু যা ফুটে থাকে। নইলে রোজ বাগান করার শখের পয়সার জোগান দেবে কে!

নোংরা রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। সেই আলো পড়েছে পুবে দাঁড়ানো নিউ সিটির গায়ে। শহরটা ঝলমল করছে। তার মাথায় অল্পবিস্তর শেষবর্ষার মেঘ। তার কিনারায় বিকেলের রং লেগেছে।

সেদিকে তাকিয়ে মিনি বলে উঠল : 'কী দারুণ দেখাচ্ছে!'

জিশান বলল, 'একদিন আমাদের শহরটাও ওরকম হবে।'

'হবে তো?' জিশানের দিকে তাকাল মিনি। ওর চোখে স্বপ্ন।

'নিশ্চয়ই!' বলে শানুর গালে একটা চুমু খেল জিশান।

শানুর চোখে কাজল, কপালে টিপ। ও জুলজুল করে বাবাকে দেখতে লাগল।

একটা ঝরঝরে গাড়ি ছুটে যাওয়ার সময় বৃষ্টির জল-ভরা খন্দে পড়ে লাফিয়ে উঠল। জিশান চট করে সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পুরোটা এড়াতে পারল না। কাদা-জল ছিটকে এল ওর গায়ে।

মিনি বলল, 'ইস, ভালো জামাটা নষ্ট হয়ে গেল।'

জিশান কোনও জবাব দিল না। ওর ভালো জামা-প্যান্ট বলতে আজকের পোশাকটাই সম্বল। বাকি আর যা-কিছু আছে সেগুলো দিনের বেলায় না পরাই ভালো।

পোশাকের ব্যাপারে মিনির অবস্থাও একইরকম। তবে রাতে ওকে বেরোতে হয় না কখনও। কারণ, অন্ধকার হয়ে গেলে জিশানই ওকে বেরোতে দেয় না। ভয়ের এই শহরে রাতে মেয়েরা একরকম বেরোয় না বললেই চলে।

জিশানরা আনমনাভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। ডানদিকে, খানিকটা দূরে, একটা খাল। খাল না বলে পরিখা বলাই ভালো। কারণ, ওই পরিখা ওল্ড সিটি আর নিউ সিটিকে আলাদা করে রেখেছে। দুটো শহরের মধ্যে যোগাযোগ বলতে একটা ইস্পাতের সেতু—তার নাম 'মাস্টার ব্রিজ'। ব্রিজের দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড লোহার দরজা। দরকার পড়লে ওই দরজা খুলে নিউ সিটি থেকে 'পিস ফোর্স' আসে ওল্ড সিটিতে। এই শহরে ওদের অনেকগুলো যোগাযোগ অফিস আছে। আর একটা হেডঅফিস। সেই অফিসের মাধ্যমে ওরা নিউ সিটির জন্য 'কাজের লোক' জোগাড় করে। আর ইচ্ছে করলে ওইসব অফিসে যোগাযোগ করেও নানান গেম শো-তে নাম দেওয়া যায়।

মাস্টার ব্রিজের নিরাপত্তার জন্য পিস ফোর্সের লোক তো আছেই, তা ছাড়া আছে নানানরকম অটোমেটিক কন্ট্রোল। মাস্টার ব্রিজের কন্ট্রোল সিস্টেম অকেজো করে কারও পক্ষে ওই জোড়া লোহার দরজা ভেঙে নিউ সিটিতে ঢোকা সম্ভব নয়।

আর যদি কেউ সাঁতরে পরিখা ডিঙিয়ে নিউ সিটিতে যাওয়ার কথা ভাবে!

সেটাই হবে তার জীবনের শেষ ভাবনা।

কারণ, পরিখার দু-পাড়ের খাড়া দেওয়াল কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। আর জল শুরু হয়েছে পঁচিশ ফুট নীচে।

সেই জলে কিলবিল করছে বিষধর সাপ আর পিরানহা মাছ। ওরা সবসময় জল পাহারা দেয়। ওই জলের উষ্ণতা, নোনাভাব, সবকিছুই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

মাস্টার ব্রিজ কিংবা পরিখার নিরাপত্তার কথা ওল্ড সিটির বহু জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জাহির করা আছে—এই শহরের বাসিন্দাদের সাবধান করার জন্য।

সেইরকম একটা বিজ্ঞাপন পরিখার কিনারায় দেখতে পেল জিশান। বিশাল-বিশাল ফ্লুওরেসেন্ট হরফে রং-বেরঙের বিজ্ঞাপন।

নিউ সিটিতে এত নিরাপত্তা যে, ওল্ড সিটিতে তার ছিটেফোঁটাও নেই। এ-কথা ভেবে তেতো হাসি পেয়ে গেল জিশানের। ও মিনিকে জিগ্যেস করল, 'নিউ সিটিতে যেতে ইচ্ছে করে?'

মিনি তাকাল জিশানের দিকে। বলল, 'করে। মাঝে-মাঝে সত্যি যেতে ইচ্ছে করে।'

'বেড়াতে, না পাকাপাকিভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মিনি। চারপাশটা চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখল। তারপর ইতস্তত করে জিগ্যেস করল, 'আমাদের এই শহরটার আর কিছু হবে না, না?'

মিনি শহরটাকে নিয়ে সবসময় খুব ভাবে।

জিশান ওর কথায় হেসে ফেলল। শানুকে মিনির কোলে দিল। একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'হওয়া তো দরকার। শহরটা আর বেশিদিন এরকম থাকলে আমরা সবাই খারাপ হয়ে যাব, মিনি।'

শানু মুখে আঙুল ঢুকিয়ে অর্থহীন কয়েকটা শব্দ করে উঠল। জিশানের মনে হল, বাচ্চাটা যেন বলছে, 'ঠিক বলেছ!'

সত্যিই তো! এই বর্বর শহরটার চাপে পড়ে জিশানরা সবাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মিনি যদি পাশে না থাকত, এতদিনে জিশান কোথায় তলিয়ে যেত কে জানে! সেদিন যেভাবে কার্তিকের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারটা হুট করে হয়ে গেল...যেভাবে চলে গেল মালিক...জিশানের বুকের ভেতরে তিন-চারদিন ধরে এক

অস্থির তোলপাড় চলেছিল। মিনিকে আঁকড়ে ধরে অনেক চোখের জল ফেলেছে ও। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, এক জিশান আর-এক জিশানের জন্য চোখের জল ফেলছে।

মিনি এমনিতে খুব চাপা ধরনের মেয়ে। বুঝতে পারে সবকিছু, কিন্তু সহজে ওর মুখ ফোটে না। সংসারের অভাব নিয়ে জিশানের নানান অভিযোগ আছে, কিন্তু মিনির কোনও অভিযোগ নেই। ওর কথা ভাবলেই মনে কেমন একটা জোর পায় জিশান।

সূর্য যত হেলে পড়ছিল, বাদল মেঘ ততই আকাশের দখল নিচ্ছিল। দুটো শুটার তীব্র শিস দিয়ে মাথার ওপরে উড়ে গেল। মিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'এবার বাড়ি চলো। যদি পট করে বৃষ্টি এসে যায় তা হলে শানু ভিজে যাবে।'

জিশানও দেখল আকাশটাকে। এই একই আকাশ নিউ সিটির ওপরে। অথচ দুটো শহরে কত তফাত!

সামনেই একটা জটলা চোখে পড়ল ওদের। জটলাটা নিউ সিটির একটা ছোট ব্রাঞ্চ অফিসের সামনে।

শানুর পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে মিনি জিগ্যেস করল, 'কীসের ভিড় ওখানে?'

'কে জানে! হয়তো নিউ সিটিতে কিছু কাজের লোক নেওয়া হবে—তারই অন-লাইন ফর্ম ফিল-আপ চলছে।'

সত্যি, এই শহরটা যেন শুধু চাকরবাকরদের শহর হয়ে গেছে! ভাবল জিশান।

মিনি বলল, 'সুপারগেমস কর্পোরেশনের খেলায় নাম দেওয়ার ভিড়ও হতে পারে।'

'হতে পারে—।'

'চলো তো, কী খেলা দেখি। দেখি কত টাকা প্রাইজ মানি!'

জিশান ভেতরে-ভেতরে একটু দু:খ পেল। কৌতূহল আর লোভ। এই দুটো ব্যাপারকে উসকে দিয়ে সুপারগেমস কর্পোরেশন দিব্যি ব্যাবসা চালাচ্ছে। এ ছাড়া অভাব বড় সাংঘাতিক জিনিস। ভেতর থেকে মানুষকে ধীরে-ধীরে নরম করে দেয়।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে জটলার কাছে এগিয়ে গেল। আর তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

সুপারগেমস কর্পোরেশন একটা নতুন খেলা লঞ্চ করছে। খেলাটার নাম 'হাংরি ডলফিন'। প্লেট টিভিতে তারই প্রোমো দেখানো হচ্ছে। দুজন প্রেজেন্টার খেলাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রের মধ্যে প্রকাণ্ড মাপের একটা খাঁচা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একডজন ডলফিন। তার মধ্যে ছ'টা ডলফিন আসলে হাঙর—তাদের বৈজ্ঞানিক কায়দায় ডলফিনের ছদ্মবেশ পরানো হয়েছে। এমন নিঁখুত ছদ্মবেশ যে, বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই।

এবারে এই খাঁচার মধ্যে নেমে পড়ছে একজন খেলোয়াড়। তাকে সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াতে হবে সেই খাঁচায়। এবং ছদ্মবেশী হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। আত্মরক্ষার জন্য তাকে দেওয়া হবে দুটো ছুরি—একটা ছোট, একটা বড়। এ ছাড়া খেলোয়াড়ের কাছে থাকবে একটা ইলেকট্রনিক রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। সে রিমোট টিপে সংকেত পাঠালেই খাঁচার দরজা খুলে যাবে এবং খেলোয়াড় পালিয়ে বাঁচতে পারবে।

'হাংরি ডলফিন' খেলার মোট সময়সীমা কুড়ি মিনিট। যদি কোনও খেলোয়াড় কুড়ি মিনিট ওই খাঁচায় কাটিয়ে আহত কিংবা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে ফিরে আসতে পারে, তা হলে সে পাবে বিশলাখ টাকা। যদি কেউ তার আগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে তার পুরস্কার হল মিনিটপিছু এক লক্ষ টাকা। তবে কমপক্ষে পাঁচমিনিট খাঁচায় তাকে কাটাতেই হবে।

তারপরেই প্রেজেন্টাররা বলছে খেলার নানান শর্ত এবং নিয়মকানুন। বিশ লাখ টাকা প্রাইজ মানি দিয়ে নিউ সিটি থেকে কী-কী সুখ এবং আরাম কেনা যেতে পারে। কোথায়-কোথায় বেড়ানো যেতে পারে। কোন-কোন স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠতে পারে সফল প্রতিযোগীর জীবনে।

জিশান অবাক হয়ে দেখছিল।

সত্যি, সুপারগেমস কর্পোরেশনকে সেলাম জানাতে হয়। মাথা খাটিয়ে কী করে যে ওরা এতসব অদ্ভুত-অদ্ভুত খেলা বের করে কে জানে!

শানুকে কোলে নিয়ে এক্স-এক্স-এল সাইজের প্লেট টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল মিনি। ওর চোখের পলক পড়ছিল না। খেলোয়াড়দের লোভ দেখানোর কায়দাটা দারুণ। ডলফিনের ছদ্মবেশে হাঙর। মিনিটপিছু একলক্ষ টাকা। কোনওরকমে পাঁচমিনিট কাটাতে পারলেই পাঁচ লাখ।

মিনি এমনিতে এসব খেলায় নাম দেওয়াটা খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু বেশ কয়েকবছর ধরে অভাবের সঙ্গে লড়তে-লড়তে মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, এরকম দু-একটা খেলায় জেতার স্বপ্ন দেখলে ক্ষতি কী!

প্রেজেন্টার দুজন তখন 'বার গ্রাফ' আর 'পাই চার্ট' এঁকে খেলাটার অঙ্ক বোঝাচ্ছিল।

অর্থাৎ, একজন খেলোয়াড়ের প্রথম পাঁচমিনিট বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কত। তার পরের পাঁচমিনিটে সেই সম্ভাবনার মান কত হওয়ার সম্ভাবনা। কিংবা খেলোয়াড়ের আই. কিউ.-র সঙ্গে সারভাইভাল ফ্যাক্টরের সম্পর্ক কী। কী করে হাঙরের আক্রমণ এড়াতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব বিজ্ঞানের কচকচির পরই শুরু হল একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান: শার্ক ভার্সাস ডলফিন। একজন হাঙর বিশেষজ্ঞ এবং একজন ডলফিন বিশেষজ্ঞ মুখোমুখি বসে হাঙর এবং ডলফিনের আচার-আচরণ নিয়ে দুজন প্রেজেন্টারের সঙ্গে তুমুল আলোচনায় মেতে উঠলেন।

প্রোমোর সবশেষে টিভিতে ফুটে উঠল নিয়মাবলী।

তাতে রয়েছে খেলার নানান শর্ত এবং কীভাবে প্রতিযোগীরা খেলাটায় নাম দেবে তার সুলুকসন্ধান।

মিনির আশেপাশে ভিড় করে থাকা লোকজন হাঁ করে প্রোমো প্রোগ্রামটা গিলছিল। ওদের অনেকের চোখ দিয়ে লালা ঝরছিল।

নিউ সিটির যে-দুজন এজেন্ট টিভির পাশে চুপটি করে বসে ছিল, তাদের ছেঁকে ধরল কয়েকজন। 'হাংরি ডলফিন' গেম নিয়ে প্রশ্নে-প্রশ্নে পাগল করে তুলল।

জিশান জানে, খেলাটায় সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.61□ অর্থাৎ, না-বাঁচার সম্ভাবনা শতকরা ঊনচল্লিশ ভাগ। কিন্তু তা সত্বেও এই বিপজ্জনক খেলায় নাম দেবে অনেকে। তার কারণ, ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলতে চাওয়া লোকের সংখ্যা ওল্ড সিটিতে খুব একটা কম নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হল লোভ—টাকা দিয়ে সুখ এবং আরাম কেনার লোভ। এই লোভের টোপ বড় সাংঘাতিক জিনিস।

মিনি জিশানের জামা ধরে টান মারল, বলল, 'চলো, শানুর ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে আধ দুধ খেতে চাইবে না।'

জিশানের চোখ দেখে মিনির বুকটা কেঁপে উঠল। আশপাশের মানুষগুলোর চোখের সঙ্গে কিছুটা যেন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। না, আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়।

মিনি দোটানায় দুলতে-দুলতে হঠাৎই যেন ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠল। আর-একবার জিশানের হাত ধরে আলতো টান মারতেই জিশান বিরক্ত হয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল : 'আ:! একমিনিট দাঁড়াও না!'

ততক্ষণে প্রোমোর পরের অংশ শুরু হয়ে গেছে।

ওল্ড সিটির যেসব মানুষ সুপারগেমস কর্পোরেশনের অন্যান্য শো-তে নাম দিয়ে ভাগ্য ফেরাতে পেরেছে তাদের ফটোগ্রাফ দেখানো শুরু হল।

প্রথমে এল বছর পঁয়তিরিশ-ছত্তিরিশের একজন লোক। ঝকমকে পোশাক, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটে সিগারেট, মুখে চওড়া হাসি।

ভদ্রলোকের নাম সেন্টালি মজুমদার। একটা সোফায় আরাম করে বসে আছেন। পায়ের কাছে একটা লোমওয়ালা পুঁচকে কুকুর। সামনের টেবিলে কফির কাপ।

ক্যামেরা ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল। আর সেইসঙ্গে বলতে লাগল, সেন্টালি মজুমদার নিউ সিটির এই ফ্ল্যাটে কী আরামেই না আছেন! এই আরাম সেন্টালি কিনেছেন সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম শো-তে নাম দিয়ে। এবং জিতে।

জিশান এই প্রোমো দেখতে-দেখতে আরামের গন্ধ পাচ্ছিল। কয়েক লহমার জন্য আনমনা হয়ে গেল ও।

শুধু জিশান কেন, দর্শকদের আরও অনেকেই ওই আরামের সুবাস পাচ্ছিল।

প্রোমো দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটা ধাক্কা খেল জিশান।

কারণ প্রেজেন্টার মেয়েটি তখন বলছে, '...কিন্তু গেম শো-তে জেতার আগে কেমন ছিল সেন্টালি মজুমদারের জীবন? এবারে দেখুন, কোথা থেকে কোথায় এসেছেন তিনি!'

সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরা দেখাতে শুরু করেছে ওল্ড সিটির একটা জঘন্য বস্তি অঞ্চল। নোংরা, অন্ধকার, ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রার ভয়াবহ ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকসমেত প্রায় আধমিনিট ধরে সেগুলো দেখানো হল। তারপর টিভির ফ্রেমে ফিরে এল প্রেজেন্টার। দর্শকদের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনি কি চান না আপনার জীবনটাকে ফেরাতে? জীবন বদলানোর অধিকার সবার আছে—আপনারও। সেই বদলের জন্য নিতে হবে সামান্য ঝুঁকি। কী, পারবেন না একটু ঝুঁকি নিতে? আমাদের গেম শো-র সামান্য ঝুঁকির বিনিময়ে আমূল বদলে যেতে পারে আপনার জীবন।'

এরপর শুরু হল সেন্টালির ইনটারভিউ। গেম শো-তে ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষে অনেক ভালো-ভালো কথা বললেন সেন্টালি। শোনালেন 'মাই লাইফ উইথ আ টাইগার' গেম-এ তাঁর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের কাহিনি।

একটা বাঘের খাঁচায় তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল একটা ছোট হান্টিং নাইফ আর চোদ্দো কেজি মাংসের টুকরো। মোক্ষম সময়ে বাঘের মুখে বারবার মাংসের টুকরো ছুড়ে দিয়ে, খাঁচার জাল বেয়ে টিকটিকির মতো পালিয়ে বেড়িয়ে, তাঁকে একঘণ্টা বাঁচতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল সেন্টালির। মনের ওপরে কী সাংঘাতিক চাপই না পড়েছিল! একঘণ্টা পর যখন খাঁচার দরজা খুলে তাঁকে বের করা হয় তখন তিনি যন্ত্রণা আর টেনশানে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর তাঁর মনে হয়েছিল, বাঘের খাঁচার ব্যাপারটা সত্যি নয়—স্বপ্ন। কিন্তু খাঁচার ভেতরে তাকিয়ে দেখেছিলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটা তখন মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। সেটা কিন্তু মোটেই স্বপ্ন ছিল না।

এই খেলায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জিতেছেন সেন্টালি মজুমদার। তাঁর স্ত্রী আর দু-ছেলের তো আনন্দে পাগল হওয়ার জোগাড়। ওঁদের সবার জীবনটাই সেই মুহূর্ত থেকে বদলে গিয়েছিল।

ক্যামেরা এবার সেন্টালির পায়ের দিকে এগোল। সেন্টালি তাঁর প্যান্টের ডান পা-টা ওপরদিকে গোটাতে শুরু করলেন। ক্যামেরা ডান পায়ের ক্লোজ আপ শট দেখাচ্ছে। তাতে স্পষ্ট দেখা গেল, সেন্টালির ডান পায়ের গোলাপি রং চকচক করছে এবং সেই পায়ে একটাও লোম নেই।

পা-টা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলেন সেন্টালি। তাঁর ডান পা-টা হাঁটুর কাছ থেকে খুলে চলে এল হাতে।

প্লাস্টিকের নকল পা।

একঘণ্টা ধরে রয়্যাল বেঙ্গলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একটা পা খুইয়েছেন সেন্টালি। অবশ্য তার জন্য সুপারগেমস কর্পোরেশনের সিস্টার কোম্পানি নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স সেন্টালিকে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছে।

অর্ধেক ডান পায়ের দাম।

জ্ঞান ফিরে আসার পর সেন্টালি দেখেছিলেন, বাঘটা মাংস চিবোচ্ছে। আসলে বাঘটা তখন তাঁর কামড়ে কেটে নেওয়া ডান পা-টা চিবোচ্ছিল।

প্রোমো দেখতে-দেখতে এতক্ষণ বেশ ভালোই লাগছিল জিশানের। প্রোমোর সঙ্গে-সঙ্গে জাম্প কাট করে গেম শো-টার ফুটেজ দেখানো হচ্ছিল বারবার। মাঝে-মাঝে আবার স্লো মোশানে দেখানো হচ্ছিল, কী কায়দায় সেন্টালি বাঘের দাঁত-নখ এড়িয়ে বাঘকে ফাঁকি দিচ্ছেন।

টিভিতে সেসব দেখতে-দেখতে উত্তেজনা আর আনন্দে দর্শকরা হইহই করছিল, হাততালি দিচ্ছিল। কিন্তু একেবারে শেষে যখন সেন্টালির খোয়া যাওয়া পা-টা দেখানো হল, দেখানো হল বাঘের পা চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্য, তখন পলকে সব হইচই থেমে গেল।

জিশানের হাত ধরে হিংস্রভাবে টান মারল মিনি : 'এক্ষুনি চলে এসো বলছি!'

জিশানের হঠাৎই গা গুলিয়ে উঠল। ও তাড়াতাড়ি সরে এল টিভির সামনে থেকে। প্রেজেন্টার মেয়েটি তখন বলছে, 'ভাবুন তো! এ-খেলায় কী মারাত্মক থ্রিল! আর কী মারাত্মক পুরস্কার—প-ন-চা-শ ল-ক্ষ টা-কা! হোয়াও! আর তার সঙ্গে বোনাস ইনশিয়োরেন্সের তিন লক্ষ টাকা! ভাবা যায়!'

সত্যিই ভাবা যায় না! লোভের টোপ ফেলে সুপারগেমস কর্পোরেশন সেন্টালির ডান পায়ের অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছে। কে জানে, একটু এদিক-ওদিক হলে সেন্টালির প্রাণটাই হয়তো খরচের খাতায় জমা পড়ে যেত!

সেন্টালির পরই দেখা গেল আর-একজন সফল প্রতিযোগীকে। সে তার সাফল্যের সাতকাহন শুরু করতেই জিশান সরে এল। কারণ, মিনি ওকে টানতে-টানতে রাস্তা ধরে হাঁটা দিয়েছে। আর ওর ডান কাঁধের ওপরে মাথা রেখে ছোট্ট শানু ঘুমিয়ে পড়েছে।

আকাশের রং এতক্ষণে অনেকটা ছায়া-ছায়া ঘোলাটে হয়ে গেছে। ধূমকেতু দুটো ধীরে-ধীরে রঙিন এবং স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে জিশানের মন খারাপ হয়ে গেল। এইভাবে খেলতে-খেলতেই কি সবার জীবন শেষ হবে?

হাঁটতে-হাঁটতে ও মিনির দিকে তাকাল : 'মিনি—।'

'উঁ—।' আনমনাভাবে শব্দ করল মিনি। ও পথচলা দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বয়েস ওদের আট কি নয়। গায়ে ময়লা পোশাক। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে-করতে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের কথা যেটুকু শোনা গেল তাতে কানে আঙুল দিতে হয়।

কিন্তু আজকাল খুব একটা কেউ কানে আঙুল দেয় না—অনেকটা যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

জিশান আক্ষেপের একটা শব্দ করে বলল, 'হুঁ:, এই আমাদের পরের জেনারেশান!'

মিনি বলল, 'এর মাঝে আমাদের শানুকে বড় করে তোলা...আমার খুব ভয় করে।'

'জানো, আমাদের ছোটবেলাটা এরকম ছিল না...মানে, এতটা খারাপ ছিল না।'

মিনি ম্লান হেসে বলল, 'সব জানি।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর : 'তখন তো আর সুপারগেমস কর্পোরেশন ছিল না! আর এত প্রাইজ মানিও ছিল না।'

সত্যি, বাজি ধরা, জুয়া খেলা, যেন জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে! অথচ বাবা বলতেন, 'শ্রমের মর্যাদা কখনও নষ্ট করবে না।'

হুঁ:! কোথায় শ্রম আর কোথায় মর্যাদা!

হাঁটতে-হাঁটতে নিজের পাড়ায় পৌঁছে গেল জিশান।

ভাঙাচোরা গলিপথের ওপরে দুপাশ থেকে ঝুঁকে রয়েছে জরাজীর্ণ একতলা সব বাড়ির কাঠামো। বাড়িগুলোর সর্বত্র জোড়াতালি দেওয়া। কালচে দেওয়াল। ফাটল ধরা দরজা-জানলা। দেখেই বোঝা যায়, এখানে যে-মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম অভাব।

গলিতে টিমটিম করে কয়েকটা বালব জ্বলছিল। সামনের একটা টিনের চালের আড়ালে প্যাঁচা বাসা বেঁধেছে। মাঝে-মাঝে রাতবিরেতে ওটা ডেকে ওঠে। মিনি বলে, প্যাঁচাটা খুব জাগ্রত—বিপদের গন্ধ পেলেই ডাক ছেড়ে গলির সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়।

জিশান আর মিনি গলিতে পা রাখামাত্রই প্যাঁচাটা দুবার ডেকে উঠল।

মিনি কেঁপে উঠল। চকিতে তাকাল প্যাঁচাটার আস্তানার দিকে। অন্ধকারের ভেতরে সাদাটে পাখিটার নড়াচড়া অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ও।

জিশান এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। তাই মিনির মুখের চেহারা দেখে মজা করে হাসল।

ঠিক তখনই জিশান খেয়াল করল, আশেপাশের বাড়ির জানলা-দরজা ফাঁক করে কয়েকটা মুখ জিশানদের কৌতূহলে দেখছে।

কিন্তু কেন? ওরা তো জিশানদের প্রতিবেশী! রোজই দেখতে পায় জিশানদের। তা হলে আজ এত উঁকিঝুঁকি মারা কেন?

সেটা বোঝা গেল বাড়িতে ঢোকার পর।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে জিশান দ্যাখে, ওদের ঘরে চারজন লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে নীল দস্তানা এবং নীল রঙের অটোমেটিক পিস্তল।

•

চারজনের মধ্যে তিনজন কালো রঙের য়ুনিফর্ম পরে রয়েছে। পোশাকে সোনালি বিডের লাইনিং। বুকে লাগানো সোনালি হলোগ্রাম ব্যাজ থেকে আলো ঝলসে বেরোচ্ছে। তার মধ্যে সুন্দর হরফে লেখা 'পি.এফ.'—পিস ফোর্সের প্রথম দুটো অক্ষর। ওদের মুখগুলো মরা মানুষের মুখের মতো—অভিব্যক্তিহীন।

ওদের তিনজনের চোখই জিশানের দিকে। চোখের পাতা পড়ছে না।

চতুর্থজনের পোশাক ধবধবে সাদা। তাতে ঝকঝকে সোনালি বোতাম আঁটা। বুকপকেটের ওপরে জ্বলজ্বলে নীল হলোগ্রাম।

লোকটা সামান্য হেসে জিশানের দিকে দু-পা এগিয়ে এল। পিস্তলের নলটায় এমনভাবে আঙুল বোলাতে লাগল যেন পোষা কুকুরের গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করছে।

'গুড ইভনিং, মিস্টার পালচৌধুরী, এভাবে হানা দিয়ে আপনাকে আচমকা চমকে দেওয়ার জন্যে মাপ চাইছি। আর একইসঙ্গে সাফ জানাই, আমরা পিস ফোর্সের কাট-পিস। প্র্যাকটিক্যালি ফোর্স করে আমাদের চার পিসকে এখানে পাঠানো হয়েছে—সিন্ডিকেটের ইন্ডিকেশানে। আমার নাম শ্রীধর পাট্টা। নিউ সিটির পিস ফোর্সের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল। বোঝেনই তো হালচাল!'

শ্রীধর পাট্টা কথা বলছিলেন চিবিয়ে-চিবিয়ে, আর একইসঙ্গে হাসছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে অনেক ভাঁজ। সূচিতীক্ষ্ণ ভুরুর রেখা—দেখে মনে হয় প্লাক করা। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল এবং ঝকমক করছে। নিশ্চয়ই ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিক লাগিয়ে এসেছেন।

শ্রীধর কথা বলছিলেন মেয়েলি টানে সুর করে। ওঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো মসৃণ লম্বাটে মুখ আর লম্বা-লম্বা চুল মেয়েলি ভাবটাকে আরও জোরালো করেছে।

'আমরা আপনাকে রিফর্ম করতে এসেছি, জিশান—তাই আপনাকে একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে। ভে-রি সিম্পল...আপনার ওয়াইফের গালে তো হেভি নাইস ডিম্পল! কমপ্লিমেন্টস, ম্যাডাম—' মিনির দিকে ফিরে বললেন শ্রীধর, 'তা আপনার ছানাটি তো বেশ!...বেশ ঘুম-ঘুম ছানা। বদন চাঁদপানা। কী নাইস ঘুমিয়ে রয়েছে!'

জিশান আর মিনি হতবাক হয়ে শ্রীধরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। জিশানের মাথার ভেতরে বনবন করে একটা মেরি-গো-রাউন্ড ঘুরতে শুরু করে দিয়েছিল। পিস ফোর্সের লোকজন কেন ওর বাড়িতে এসেছে সেটাই বুঝতে পারছিল না জিশান। তা ছাড়া মার্শাল, শ্রীধর পাট্টা, ঠিক কী যে বলতে চাইছেন তাও মাথায় ঢুকছিল না।

ঘুমন্ত শানুর মাথায় হাত ছোঁয়ালেন শ্রীধর, বললেন, 'বে-বি! ছুইট বেবি। মিনিদেবী, আপনার পারমিশান নিয়ে আমি কি ওকে কোলে নিতে পারি?'

মিনি শ্বাস টানল শব্দ করে। শ্রীধরের ছোঁয়া থেকে এক ঝটকায় শানুকে সরিয়ে নিতে চাইল।

হেসে ফেললেন শ্রীধর। একঝাঁক কাচের চুড়ি এ ওর গায়ে ঢলে পড়লে যেমন রিনরিনে শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম শোনাল ওঁর হাসিটা। মিনির গালে দস্তানা পরা আঙুলের আলতো টোকা দিয়ে বললেন, 'ও মা গো! মা ভয় পেয়েছে গো! ও. কে.—দেন য়ু গো, গো। য়ু গো টু নেক্সট রুম! আমরা আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চাই—।'

মিনিকে ইশারা করে পাশের ঘরে যেতে বললেন শ্রীধর। পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করে তা থেকে দু-ফোঁটা তরল হাঁ করে মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে স্বাদ নিয়ে 'চকাস! চকাস!' শব্দ করলেন দুবার। তারপর পলকে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

জিশান আন্দাজ করল, ওই শিশিতে নেশা-ধরানো কোনও জিনিস রয়েছে। নিউ সিটিতে এরকম নতুন-নতুন বহু মাদক পাওয়া যায়।

মিনি জিশানের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার কাছে থাকব।'

জিশান ইশারায় ওকে শান্ত হতে বলল।

হঠাৎই মাথা ঝাঁকালেন শ্রীধর। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের কয়েকটা কাগজ বের করলেন।

কাগজগুলো দোমড়ানো মোচড়ানো। পাতা উলটে-উলটে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। আর মুখে 'উঁ-উঁ' শব্দ করতে লাগলেন।

অবশেষে একসময় শ্রীধর পাট্টা হেসে উঠে বললেন, 'গট ইট। আইটেম ভেরি হট। পড়ে ফেলি চটপট।'

একটা পৃষ্ঠা মুখের কাছে নিয়ে তিনি পড়তে শুরু করলেন।

'জিশান পালচৌধুরী। বয়েস আটাশ। ওল্ড সিটি। সিটিজেনশিপ নাম্বার কে বাই এইচ 21034□ ওয়াইফ মিনি। একমাত্র ছেলে অর্কনিশান—ডাকনাম শানু। চার্জ : উইলফুল মার্ডার অ্যান্ড ইল্লিগ্যাল গ্যাম্বলিং।'

থামলেন শ্রীধর। কালো য়ুনিফর্ম পরা তিনজনের একজনকে সদর দরজাটা দেখিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মরা মানুষটা রোবটের মতো এগিয়ে গেল ঘরের দরজার দিকে। রীতিমতো শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিল।

'এইবার আমরা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি। বাইরের কেউ আর আমাদের কথা শুনতে পাবে না—' শ্রীধর ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন, বললেন, 'আসুন, শ্রীপালচৌধুরী, বসে পড়া যাক এখানে-ওখানে। এখানে বসেই কাজের কথা হোক। আর শ্রীমতী পালচৌধুরী—' মিনির দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন শ্রীধর পাট্টা, 'আপনি স্বামীর কাছে থাকুন, তবে ছানাটাকে রেখে আসুন। নইলে কখন লোহার সঙ্গে খোকার ঠোকাঠুকি লেগে যায়...' হাতের পিস্তলটা নাচিয়ে দেখালেন : '...কে বলতে পারে!'

ঘরটার অবস্থা নোংরা, ছন্নছাড়া। এলোমেলো দড়িতে উলটোপালটা জামাকাপড় ঝুলছে। দেওয়ালের তাকে পুরোনো বইপত্র, অচল ঘড়ি, গায়ে মাখার সাবান আর প্লাস্টিকের খেলনা।

একটা ভাঙা টুল নিয়ে বসে পড়লেন শ্রীধর—পায়ের ওপরে পা তুলে মডেলদের ভঙ্গিতে বসলেন।

জিশান মেঝেতে বসে পড়ল।

মিনি শানুকে পাশের ঘরে রেখে ফিরে এল—বসল জিশানের পাশে।

প্যাঁচাটা তা হলে এমনি-এমনি ডাকেনি! ভাবল মিনি।

জিশান স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে মৃতদেহের দিকে একপলক তাকাল। তারপর শুকনো ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, স-স-স্যার!'

কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন শ্রীধর, বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই—আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এত সুন্দর যে, আপনার বউয়ের চেয়েও সুন্দর—ঠিক আছে? গত শনিবার রাতে মানিকতলার খালধারে আপনি ইল্লিগ্যাল একটা ফাইট গেমে নাম দিয়ে গ্যাম্বল করেছেন—বে-আইনিভাবে

জুয়া খেলেছেন। সেই সময়ে কার্তিক তপাদার নামে ওল্ড সিটির একজন সিটিজেনকে—সিটিজেনশিপ নাম্বার এল বাই ডি-76618—আপনি ইচ্ছে করে খুন করেছেন। উইলফুল মার্ডার।'

'মিথ্যে কথা! আমি জুয়া খেলিনি!'

'তাই?' কপট বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করলেন শ্রীধর পাট্টা, ন্যাকা ঢঙে বললেন, 'আমার নক্ষী ছোনা চাঁদের কণা! আমার ছোনা কি-চ্ছু করেনি! ন-এ ন্যাকা, আর ব-এ বোকা! শুনুন—' শ্রীধরের কথা বলার ঢং হঠাৎই বদলে গেল। রঙ্গপ্রিয় মেয়েলি ভাব উধাও হয়ে তিনি পুরোপুরি মার্শাল হয়ে গেলেন: 'শুনুন, পালচৌধুরী! আমাদের কাছে অনেক উইটনেস আছে। স্যাটেলাইট ডেটাও আছে। সেইসঙ্গে ডিজিটাল ফটোগ্রাফ। জুয়া আপনি খেলেছেন আর খুনও করেছেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। আমাদের সিন্ডিকেটকে নিগেট করে কখনও কিছু করা যায় না। আমাদের লক্ষ-লক্ষ চোখ।'

জিশান অবাক হয়ে ভাবছিল।

খালধারের ওই ফাইট গেম ইল্লিগ্যাল! তা হলে সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেমগুলো? সেগুলো সব লিগ্যাল!

'স্নেকস অ্যান্ড জেমস', 'মাই লাইফ উইথ আ টাইগার', 'ম্যানিম্যাল রেস', কিংবা 'হাংরি ডলফিন' গেম-এ কেউ যদি মারা যায় তা হলে সেটা উইলফুল মার্ডার নয়?

আর 'কিল গেম'? সেই খেলায় তো আজ পর্যন্ত বহু মানুষই মারা গেছে—ওল্ড সিটির সব মানুষ। তার বেলা?

মালিকের কথা মনে পড়ল জিশানের। কুচকুচে কালো, ঝকঝকে দাঁত, দিলখোলা হাসি, মিষ্টি মুখ।

ওর মৃত্যুটা তা হলে কী? ওটা উইলফুল মার্ডার নয়?

মিনির কান্নায় ঘোর কাটল জিশানের। মিনি হাতের পিঠ কামড়ে গুঙিয়ে কাঁদছে।

এখন তা হলে কী হবে? দিশেহারা পাগল হয়ে গেল জিশান। ওর ভেতরে একটা জংলি চিতা খেপে উঠল।

তখন শ্রীধর পাট্টা ধীরে-ধীরে বলছেন, 'এবার তা হলে আমরা পানিশমেন্টের কথায় আসি, মিস্টার পালচৌধুরী—।'

জিশান পাগলের মতো একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের ওপরে এবং শ্রীধর কাত হয়ে টুল থেকে পড়ে যেতে-যেতে গুলি চালালেন।

প্রচণ্ড শব্দে ছোট্ট ঘর থরথর করে কেঁপে উঠল। গুলিটা গিয়ে লাগল দেওয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো ছবিতে। ভাঙা কাচের টুকরো ফুলঝুরির মতো চারিদিকে ছিটকে গেল।

জিশান ভয় পেয়ে শ্রীধরকে ছেড়ে একপাশে লাফিয়ে পড়ল।

তিনজন গানম্যান পলকে পিস্তল উঁচিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা জিশানকে টিপ করে ফ্রিজ শট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। শ্রীধর না বললে ওদের গুলি চালানোর হুকুম নেই।

শ্রীধর পাট্টা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ডানহাতের পিস্তলটা জিশানের দিকে তাক করে হাসলেন : 'আপনি কি বাবু বুঝতে পেরেছেন যে, গুলিটা আমার মিস হয়নি—ইচ্ছে করে মিসফায়ার করেছি?' বাঁ-হাতে পোশাক ঝাড়তে লাগলেন শ্রীধর। তারপর ধীরে-ধীরে চুইংগাম চিবোনোর ঢঙে বললেন, 'তার কারণ, আপনাকে নিয়ে আমার অন্য প্ল্যান আছে, জিশান—মিস করেছি সেইজন্যে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। তারপর জিশানকে জাপটে ধরে ভয় পেয়ে কোণঠাসা আহত পশুর মতো হেঁচকি তুলে কাঁদছে।

'...তা নইলে খুলি আর মাটির ভাঁড় আমার কাছে একই—ওদের জন্মই হয়েছে চৌচির হওয়ার জন্যে।' হাসলেন শ্রীধর। পিস্তলটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাতুড়ি পেটার ঢঙে সবেগে বসিয়ে দিলেন জিশানের পাঁজরে।

জিশান কঁকিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় ওর শরীরটা কুঁকড়ে গেল।

মিনি ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের পায়ে। উপুড় হয়ে পায়ে মাথা ঘষতে-ঘষতে বলল, 'প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন। ও ইচ্ছে করে কাউকে খুন করেনি। ইচ্ছে করে কাউকে খুন করেনি...।'

'জানি তো, মা-মণি। শুধু-শুধু এমনধারা করছ কেন বলো তো? মরছ কেন মাথা খুঁড়ে আমার পায়ের পাতায়?' গায়ে জ্বালা ধরানো ন্যাকা মেয়েলি ভঙ্গিতে বললেন শ্রীধর পাত্রা। ঝুঁকে পড়ে মিনিকে ধরে তুললেন মেঝে থেকে। দস্তানা পরা আঙুলের ডগা দিয়ে বেশ সময় নিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

জিশান শুয়ে থাকা অবস্থাতেই দেখল দৃশ্যটা। ও ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ ইট! স্টপ ইট য়ু...।'

'স্টপ ইট য়ু কী? বাস্টার্ড? নাকি বাংলায় তালব্য শ দিয়ে খুব কমন একটা যে গালাগাল আছে, সেটা দিতে যাচ্ছিলেন?' কোমরে হাত রেখে তেরছা চোখে তাকালেন শ্রীধর পাত্রা : 'আমি তো আপনার বউকে ছুঁইনি, বাবু। আপনার বউয়ের চামড়া আর আমার চামড়ার মাঝে দস্তানার কাপড়ের লেয়ার রয়েছে না! ন্যাকাবোকা! কিচ্ছু বোঝে না মাইরি!'

মিনিকে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শ্রীধর বললেন, 'জিশান পালচৌধুরী, শোনো। তোমাকে নিয়ে আমার প্ল্যানটা এবারে বলি। তোমার এগেইনস্টে যা চার্জ তাতে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া ছাড়া সিন্ডিকেটের কাছে আর কোনও পথ খোলা নেই। তবে তোমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দেওয়া যায়...।'

থামলেন শ্রীধর পাত্রা।

আশায় মিনির চোখ চকচক করে উঠল। জিশানেরও।

'...তোমাকে ''কিল গেম''-এ নাম দিতে হবে।'

শ্রীধরের শেষ কথাটা যেন বরফের ছুরি হয়ে কেটে বসল জিশানের মগজে।

আর মিনি পাথর হয়ে গেল।

শ্রীধর পাত্রা চুপচাপ চোয়াল শক্ত করে বসে রইলেন। তারপর শব্দ করে থুতু ফেললেন ঘরের মেঝেতে। ভুরু উঁচিয়ে বললেন, 'ঘরটা যা নোংরা! এখানে ইজিলি থুতু ফেলা যায়, কী বলো?'

শেষ প্রশ্নটা জিশানকে লক্ষ করে। কিন্তু জিশান কোনও জবাব দিতে পারল না। কারণ, ও তখনও 'কিল গেম' নিয়ে ভাবছে।

'কিল গেম' খেলাটা গড়ে দু-মাসে একবার করে হয়। কারণ, সবসময় খেলোয়াড় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওই খেলায় শুধু খেলোয়াড় পেলেই হল না, তার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখা হয়। নানারকম ডাক্তারি ও অন্যান্য পরীক্ষার পর যদি সে পরীক্ষায় পাশ করে, তবেই তাকে 'কিল গেম'-এ নামার সুযোগ দেওয়া হয়।

খেলায় নামার আগে খেলোয়াড়কে বন্ড সই করতে হয়—যেমন করতে হয় অপারেশানের আগে। সেই বন্ডে লেখা থাকে : ' ''কিল গেম''-এ মৃত্যু হলে কিংবা অঙ্গহানি হলে সুপারগেমস কর্পোরেশন দায়ী নয়।'

এ ছাড়া খেলোয়াড়কে এক কোটি টাকার ইনশিয়োরেন্স করিয়ে দেয় নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি। খেলায় ক্যান্ডিডেটের ভালো-মন্দ কিছু হলে তার ফ্যামিলি ওই এক কোটি টাকা পায়।

'কিল গেম' খেলাটা হয় নিউ সিটির একটা নকল শহর 'গেম সিটি'-তে। শহরটার মাপ কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার। সেই শহরে রাত বলে কিছু নেই—সবসময়েই পড়ন্ত বিকেলের আলো চারশো বর্গকিলোমিটারের গেম সিটি-তে ছড়িয়ে আছে। সেই অদ্ভুত গোধূলি আলোয় গেম সিটি জেগে ওঠে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।

কী নেই সেই গেম সিটি-তে! পাহাড় আছে, ঝরনা আছে, জঙ্গল আছে, নকল নদী আছে, আছে বাড়ি-ঘর, যানবাহন, দোকানপাট। একটা আধুনিক শহরে যা-যা থাকে তার সবই আছে। শুধু নেই কোনও মানুষ।

'কিল গেম'-এ কোনও খেলোয়াড় 'স্বেচ্ছায়' নাম দিলে তখন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য শহরটা লোকজনে টগবগ করে। যেমন, জিশান এখন 'স্বেচ্ছায়' নাম দিতে বাধ্য হচ্ছে।

'কিল গেম' খেলাটার লম্বা প্রোমো টিভিতে বহুবার দেখেছে জিশান। প্রায় একঘণ্টা ধরে দেখানো হয় সেই প্রোমো।

যেদিন চব্বিশ ঘণ্টার খেলাটা শুরু হয় তার আগের দিন থেকেই গেম সিটি-কে সাজিয়ে ফেলা হয়। বাড়ি-ঘরগুলো 'বেড়াতে আসা' টুরিস্ট ফ্যামিলিতে ভরে যায়। দোকানপাট ভরে যায় লোভনীয় খাবারদাবারে। সেসব দোকানে তদারকি করে একদিনের নকল দোকানদাররা। আর রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় নানান গাড়ি। বহু গাড়ি এখানে-সেখানে দাঁড় করানো থাকে—যেন মনে হয়, গাড়িগুলো পার্ক করে মালিক বা ড্রাইভাররা এদিক-ওদিক কোথাও গেছে।

সব মিলিয়ে যে-ছবিটা তৈরি হয় সেটা আসল কোনও শহরের মতোই। তবে সমুদ্র নেই এই যা!

'কিল গেম' খেলার সময় গেম সিটি-তে যারাই থাকে তারা সবাই 'টুরিস্ট' হলেও 'কিল গেম'-এর পার্টিসিপ্যান্ট। খেলার আগের দিন তারা সবাই এসে খালি হাতে গেম সিটি-তে ঢুকে পড়লেই হল। বাকি সব ব্যবস্থার দায়িত্ব সুপারগেমস কর্পোরেশনের। ফলে পার্টিসিপ্যান্টদের জন্য সব ফ্রি। যেমন খাবারের দোকানে খেতে গেলে পয়সা লাগবে না, তেমনই গাড়ি চড়ে ঘোরা যাবে বিনাপয়সায়। অর্থাৎ, থাকা-খাওয়া-বেড়ানোর কোনও খরচ নেই।

অথচ পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ আছে।

আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার রয়েছে চারজনের জন্য।

তার মধ্যে আবার সেরা পুরস্কারের দাবিদার হবে জিশান। বাকি তিনজন পাবে সমান অঙ্কের দ্বিতীয় পুরস্কার।

কিন্তু খেলাটা কী?

খুবই সহজ-সরল। খেলার দিন খেলার হিরোকে ভোর ছ'টায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে গেম সিটি-তে। আর তার দু-ঘণ্টা পর হিরোকে 'শিকার' করতে তিনজন কিলার বেরিয়ে পড়বে। তারপর চলবে শিকার-শিকারি খেলা। বাইশ ঘণ্টা ধরে হিংস্র লুকোচুরি। যদি নায়ক খেলার শেষে বেঁচে থাকে, তবেই পাবে একশো কোটি টাকা। আর যদি...।

না:, আর ভাবতে চাইল না জিশান। ও ব্যথাতুর চোখে মিনির দিকে তাকাল। মিনির চোখে নজর পড়তেই জিশানের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। এত মায়া ওই রোগা মেয়েটার দু-চোখে! শেষ দেখার সময় লোকে বোধহয় এভাবেই তাকায়।

শ্রীধর পাট্টা ছোট্ট করে হাততালির শব্দ করলেন, গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বলো, বাবু, কী করবে? ধারা তিনশো দুই—না কিল গেম? অবশ্য অল দ্য সেম—শুধু ''কিল গেম''-এ বাঁচার সামথিং সম্ভাবনা আছে এই যা।'

জিশান উঠে বসল মেঝে থেকে। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

ও সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে তো? শুনতে পাচ্ছে তো ঠিকঠাক?

ওই তো মিনি! ওর পাতলা ঠোঁট কাঁপছে। চোখের কোলে জলের ফোঁটা।

জিশান এবার উঠে দাঁড়াল। কালো পোশাক পরা তিন প্রহরীর দিকে একবার তাকাল। ওরা পিস্তল নাড়িয়ে জিশানকে সতর্ক করে দিল।

জিশান সেসব ভ্রূক্ষেপ না করে শ্রীধর পাট্টার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। শান্ত গলায় জিগ্যেস করল, 'এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই?'

'না গো, নেই। এই খেলাটায় কী আর মেলা পাবলিক পাওয়া যায়! কোটিতে গুটি-গুটি। তাই তিনশো দুই, নয় তো ''কিল গেম''।'

'কখন যেতে হবে আমাকে?'

'আমরা তোমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে এসেছি, জিশান। এখান থেকে শুটারে চড়ে আমরা সোজা চলে যাব সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে। সেখানে কতকগুলো ফরমালিটি সেরে তারপর সোজা সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেমস বিল্ডিং। তারপর...।'

'তারপর?' প্রশ্নটা করে মনে-মনে নিজের ভবিষ্যতের ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করল জিশান।

হাসলেন শ্রীধর। পিস্তলটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, 'তারপর শুরু হবে প্রিলিমিনারি গেমস। এই গেমগুলো বলতে গেলে ''কিল গেম''-এর ট্রেনিং। এই ট্রেনিং চলবে দু-মাস। তারপর স্পেশাল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং-এর পর তুমি রেডি হলে গেমের ডেট অ্যানাউন্স করা হবে। প্লেট টিভিতে খবর পৌঁছে যাবে সব জায়গায়—ওল্ড সিটিতে, নিউ সিটিতে...।'

মিনি আর থাকতে পারল না। হিংস্রভাবে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীধরের ওপরে।

শ্রীধর পলকে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে লোহার আঙুলে মিনির টুঁটি টিপে ধরলেন।

'আঁক' শব্দ করে মিনির চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে। ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। ও হাঁ করে এক আঁজলা বাতাস টানার জন্য আইঢাই করতে লাগল।

জিশান লাফিয়ে পড়ল শ্রীধরের বাঁ-হাতের ওপরে। হাতটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু পারল না।

তার কারণ, জিশান হাতটা ধরে টানাটানি শুরু করতেই শ্রীধর ওঁর ডানহাতে ধরা পিস্তলটা প্রচণ্ড জোরে জিশানের কাঁধে বসিয়ে দিয়েছেন। আর জিশান সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ চেপে ধরে বসে পড়েছে মেঝেতে।

এক ধাক্কায় মিনিকে ছিটকে ফেলে দিলেন শ্রীধর। মেয়েটা ঘরের কোণে রাখা একটা ঝুড়ির ওপরে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীধর সঙ্গীদের ইশারা করলেন। ওরা তিনজন জিশানকে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে চেপে ধরল। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে।

চলে যাওয়ার আগে শ্রীধর মিনিকে লক্ষ করে বললেন, 'চলি, শ্রীমতী পালচৌধুরী। ভয় নেই...আপনার সঙ্গে আমাদের রেগুলার যোগাযোগ থাকবে। আমরা আপনাকে একটা ভিডিয়ো-মোবাইল সেট দিয়ে যাব। সেটা আমাদের স্পেশাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে। ওটা দিয়ে আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে কনস্ট্যান্ট কানেকশান রাখতে পারবেন।'

মিনি তখন ঘরের কোণে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে আছে শ্রীধরের দিকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, ওঁর কথার একটি বর্ণও মিনির মাথায় ঢুকেছে।

প্রহরী তিনজন চৌকাঠের বাইরে এসে শ্রীধর পাট্টার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক লহমা অপেক্ষা করছিল। তখন জিশান ঘুরে তাকাল ঘরের দিকে। দেওয়ালে টাঙানো বাবার ফটোর ওপরে চোখ পড়ল ওর।

বাবা তাকিয়ে আছে জিশানের দিকে। স্থির শান্ত চোখে এক অলৌকিক আত্মবিশ্বাস।

জিশান শ্বাস টানল, মিনির নাম ধরে ডাকল দুবার।

শ্রীধর পাট্টা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মিনিও ওঁর পিছন-পিছন ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

মিনির দিকে না তাকিয়েই শ্রীধর মসৃণ নরম গলায় তখনও ওকে বলে চলেছেন, 'টাকা-পয়সার জন্যে চিন্তা করবেন না, মা-মণি। অন্ন চিন্তাও করবেন না। ওসব ব্যবস্থা আমরা করব—যদি অবশ্য ''কিল গেম''-এ নাম দেয় আপনার হাজব্যান্ড। আন্ডারস্ট্যান্ড? আর যদি শ্রীপালচৌধুরী খেলায় জিতে যান, তা হলে একশো কোটি টাকা আপনাদের। তখন এই নোংরা জঘন্য মস্তিহীন বস্তিতে আপনাদের আর থাকতে হবে না। সুতরাং আপনাদের জন্যে ব্রাইট ফিউচার ওয়েট করছে। যদিও তাতে স্লাইট রিসক আছে।'

ওঁরা বস্তির গলিপথ ধরে হেঁটে রওনা দিলেন।

মলিন আলো-আঁধারি গলিতে দুপাশে ছায়া-ছায়া মুখ দেখতে পাচ্ছিল জিশান। পাড়াপড়শিদের কৌতূহলী ভিড়।

ছ'জনের মিছিলটা ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল গলির বাইরে। পিছনে উৎসাহী জনতার দল।

প্যাঁচর ডাক শুনতে পেল জিশান। শুনতে পেল মিনিও। ভয়ে ওর বুকটা দুরুদুরু করে উঠল।

কিন্তু জিশান প্যাঁচার ডাকটাকে পাত্তা দিল না। বরং ভাবল, যদি এই ডাকটা অশুভ হয়, তা হলে সেটা শ্রীধরের জন্যও হতে পারে।

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে অনেকটা ঘুরে আর-একটা রাস্তায় এল ওরা। রাস্তার একপাশে আবর্জনার স্তূপ। সেখানে নেড়ি কুকুরের ভিড়।

তারই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল তিনটে শুটার। নীল-সাদা ডোরাকাটা লম্বাটে চেহারা। হুড খোলা। সামনে লাগানো টার্বো-প্রপ।

ওরা সবাই শুটারের দিকে এগোল। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে পাড়াপড়শির ঝাঁকও সঙ্গে-সঙ্গে এগোল।

মিনি জিশানের হাত আঁকড়ে ধরল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমি আর শানু সবসময় তোমার কথা ভাবব।'

'আমিও তোমাদের কথা ভাবব। এ ছাড়া এই জীবনে ভাবার মতো আর কী আছে! তুমি বাড়ি যাও...শানু একা রয়েছে...।' কথা শেষ করতে গিয়ে জিশানের গলা ভেঙেচুরে গেল। ওর ভেতরটাও।

মিনি ঠোঁট টিপে কান্না আটকাতে চাইল। মাথা নাড়তে লাগল বারবার। যেন বলতে চাইল : 'যেয়ো না! তুমি যেয়ো না...।'

জিশান ভেতরের কষ্ট আর সইতে পারছিল না। এভাবেই তা হলে 'কিল গেম'-এর খেলোয়াড় জোটায় সুপারগেমস কর্পোরেশন! দু-মাস কি আড়াইমাস আগে 'কিল গেম'-এর যে-লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল তাতে ছেলেটা ষোলো ঘণ্টার পর মারা গিয়েছিল। ওর ফ্যামিলি বলতে কিছু ছিল কি না জিশান জানে না।

কিন্তু জিশানের?

জিশান শুধু ফ্যামিলি নয়, ওর প্রাণটাও রেখে যাচ্ছে এই বস্তিতে। আর ওর দেহটা যাচ্ছে 'কিল গেম'-এ লড়তে। যদি প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য ওর দেহটাকে ওই মরণখেলায় লড়তেই হয়, জিশান দেখিয়ে দেবে লড়াই কাকে বলে। চব্বিশ ঘণ্টা নয়, পুরোপুরি তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটই ও লড়বে। দরকার হলে তেইশ ঘণ্টা ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড। শিকার আর শিকারির খেলায় ও হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবে কে শিকার, আর কে শিকারি।

জিশানের নজর ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। চোখ মুছে নিয়ে ও তাকাল মিনির দিকে। ঠান্ডা গলায় বলল, 'তুমি বাড়ি যাও—শানু একা রয়েছে—ভয় পাবে।'

জিশানকে ধাক্কা মেরে শুটারে তুলল মার্শালের দলবল।

তারপর তীব্র সিটি দিয়ে তিনটে শুটার ছুটতে শুরু করল। কয়েকটা বাড়ির ময়লা জানলার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। একটু পরেই শুটারগুলো ভেসে উঠল শূন্যে। মিনি আর জটলা করা মানুষজন ছোট হয়ে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। একইসঙ্গে ওল্ড সিটিও।

আকাশে চোখ রাখল জিশান। কোথাও-কোথাও ছন্নছাড়া মেঘ থাকলেও চাঁদ এবং রঙিন ধূমকেতু দুটো চোখে পড়ছে। আরও নীচে...দূরে...বহু দূরে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য রঙিন আলোর বিন্দু...নেকলেসের মতো চিকচিক করছে। রাতের নিউ সিটি—যেখানে জিশান এখন যাচ্ছে।

মালিকের কথা মনে পড়ল জিশানের : '...কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

সুপারগেমস কর্পোরেশনকে কি কার্তিক বলে ভাবা যায়? যদি যায়, তা হলে ওর ঊরুসন্ধিটা কোথায়? জিশান জানে, 'কিল গেম' খেলার নিয়ম হচ্ছে, ওই খেলায় কোনও নিয়ম নেই। বাঁচার জন্য তুমি যা খুশি করতে পারো।

ও চোয়াল শক্ত করে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ষোলো বছর পর ও আবার নিউ সিটিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। যদি খেলায় ও হেরে যায় তা হলে নিউ সিটিতে আর থাকতে পারবে না। ফিরতে পারবে না ওল্ড সিটিতেও।

ওকে চলে যেতে হবে ওপরে।

পাশে বসা শ্রীধর মুখ ফিরিয়ে তাকালেন জিশানের দিকে, হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী বাবু, চুপচাপ কেন? ভয় করছে?'

জিশান সরাসরি তাকাল শ্রীধরের দিকে। ঠান্ডা পাথরের মতো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ভয় করছে—তোমার জন্যে।'

অন্ধকার আকাশ চিরে তিনটে শুটার শিস দিয়ে উড়ে চলল।

জিশানের হঠাৎই মনে হল, ওরা শিস দিয়ে গান গাইছে। মৃত্যুর গান।

•

রাতটা জিশানের কাটল ওল্ড সিটিতেই—পিস ফোর্সের হেড-অফিসের গেস্টহাউসে।

শ্রীধর পাট্টা নিউ সিটিতে যেতে চাইলেও যাওয়া হয়নি।

শুটারের পাইলটকে সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে উড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীধর। কিন্তু পাইলট হঠাৎই সমস্যার কথা জানিয়েছে। একটি শুটারের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ায় একটা টার্বোপ্রপ কাজ করছে না।

তখন শ্রীধর যে-ভাষায় পাইলটকে গালিগালাজ করলেন সেটা বোধহয় শুধু ওঁকেই মানায়। তারপর মোবাইল ফোন বের করলেন পকেট থেকে, চটপট হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করলেন।

সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। জিশান তার একবর্ণও বুঝতে পারল না।

অবশেষে ফোন ছেড়ে দিয়ে শ্রীধর তাকালেন জিশানের দিকে, হাসলেন: 'জিশান, আজকের রাতটা আমাদের পিস ফোর্সের এখানকার গেস্টহাউসে থাকতে হচ্ছে। সেখানেই হবে তোমার রেস্ট। সেটাই বোধহয় বেস্ট। আর কাল থেকে শুরু হবে তোমার টেস্ট।'

টেস্ট! কীসের টেস্ট?

জিশান শুনেছে কিল গেম-এ নামার আগে বড় মাপের ট্রেনিং আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সেগুলো ঠিক কী ধরনের পরীক্ষা জিশান জানে না।

শ্রীধরের অন্ত্যমিল মন্তব্যগুলোর কোনও জবাব দিল না ও।

ততক্ষণে শুটারের নাক ঘুরিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেছে ওল্ড সিটির পিস ফোর্সের হেডকোয়ার্টারের দিকে।

হেডকোয়ার্টারে নেমে সোজা গেস্টহাউসের ঘর।

এরকম আরাম জিশান শেষ কবে পেয়েছে মনে পড়ে না।

শোওয়ার জন্য গোটা একটা ঘর—তাও আবার মাপে বিশাল। চারপাশে ধপধপে সাদা দেওয়াল। রাজহাঁসের পালকের মতো বিছানা। শীতাতপের আরাম চারপাশে ভাসছে। খুব নিচু সুরে মনভোলানো বাঁশি বেজে চলেছে। বাতাসে একটা পাগল করা সুবাস।

সব মিলিয়ে মোলায়েম আরামে চোখ বুজে আসছিল জিশানের।

ওর চোখে-মুখে হতবাক ভাব দেখে শ্রীধর বলে উঠলেন, 'সিন্ডিকেটের গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাসের গেস্টহাউসে তোমার জন্যে থাকার ব্যবস্থা অনেকটা এইরকম। তবে এর চেয়েও ভালো।'

এর চেয়েও ভালো হওয়া সম্ভব! অবাক হয়ে ভাবল জিশান।

রাতে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে স্বপ্নের দেশে তলিয়ে গেল ও। বুঝতে পারল, এইসব বিছানায় স্বপ্ন অনেক সহজে আসে।

স্বপ্নে মিনি আর শানুকে দেখতে পেল। সেই স্বপ্ন ভাঙল ভোরবেলায়—ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে।

জিশান দেখল, শ্রীধর পাট্টা ওঁর টিপটপ পোশাক পরে জিশানের বিছানার সামনে হাজির। সঙ্গে কাঠখোদাই তিন প্রহরী।

ওকে নিয়ে ভোরের আকাশে ভেসে পড়ল তিনটে শুটার।

জিশান অবাক চোখে দূরের নিউ সিটির দিকে তাকিয়ে রইল। কতদিন পরে শহরটাকে ও দেখতে পাবে!

নিউ সিটিকে কখনও পাখির চোখে দেখেনি জিশান। শুটার থেকে এই প্রথম দেখল।

উঁচু-উঁচু আকাশছোঁয়া মিনার, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে আয়তাকার সবুজ কিংবা নীল।

সবুজগুলো পার্ক, কিংবা চাষের খেত। অথবা পরিকল্পনা করে তৈরি করা বনাঞ্চল। নিউ সিটিতে অবহেলায় পড়ে থাকা কোনও সবুজ মাঠ নেই। সব সবুজকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে।

আর নীলগুলো জল। কোনওটা সুইমিং পুল, কোনওটা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের দিঘি।

মাঝে-মাঝে হালকা নীল যে-চৌকোনা রং দেখা যাচ্ছিল সেগুলো খেলার মাঠ। মাঠে সিনথেটিক টার্ফ লাগানো। এইসব মাঠে ছেলেবেলায় খেলেছে জিশান।

এ-কথা মনে পড়তেই ও ছেলেবেলায় ঢুকে পড়ল পলকে।

ফিটফাট হয়ে জিশান স্কুলে যাচ্ছে। এয়ারকন্ডিশনড স্কুল বাস। বাস চলার কোনও শব্দ নেই। ধোঁয়ার দূষণ নেই—কারণ, বাসগুলো সব ব্যাটারি পাওয়ারড ভেহিকল। ছবির মতো পথ ধরে জিশানদের বাস স্কুলের দিকে ছুটে চলেছে।

অ্যাস্ট্রো টার্ফের ওপরে খেলছে জিশান। বন্ধুদের নাম ধরে চিৎকার করছে। রবিন, টুকাই, নোনা, বুকি। ওরা সব এখন কোথায় কে জানে! জিশানের মতো ওল্ড সিটিতে নিশ্চয়ই চলে যায়নি—কিংবা যেতে বাধ্য হয়নি।

না:, ছেলেবেলাটা খারাপ ছিল না। এই ছেলেবেলার গল্প মিনিকে কতবার শুনিয়েছে জিশান। আক্ষেপ করে বলেছে, শানুর ছেলেবেলাটা এরকম সুন্দর করতে পারলে কত ভালো হত।

হঠাৎই আঙুল তুলে নীচের দিকে দেখালেন শ্রীধর পাট্টা। বললেন, 'ওই যে, জিশানবাবু। ওটাই গেম সিটি। ওখানেই তুমি খেলবে কিটি-কিটি। বেড়াল আর নেংটি। হাইড অ্যান্ড সিক...হাইড অ্যান্ড সিক। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। তোমার লুকোচুরি খেলার লাইভ টেলিকাস্ট হবে...পাবলিক দেখবে। কী থ্রিলিং হবে মাইরি!'

শ্রীধর পাট্টার ন্যাকা সুরের কথা শুনতে-শুনতে জিশানের গা-রিরি করছিল। পাশে বসে থাকা লোকটার উত্তাপ টের পাচ্ছিল ও। লোকটা যে একইসঙ্গে হিংস্র এবং জঘন্য সেটা জিশান ক্রমশ বুঝতে পারছিল।

গেম সিটির দিকে তাকাল জিশান।

কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার মানুষ মারার কল। যেন এক বিশাল খাঁচায় বেড়ালের ইঁদুর ধরার খেলা। জিশান ইঁদুর। আর অজানা তিনজন শিকারি—তারা হল বেড়াল।

মিনি আর শানুর কথা মনে পড়ল জিশানের। ওরা এখন বাড়িতে একা। জিশান নেই। মিনির নিশ্চয়ই ভীষণ ফাঁকা লাগছে।

জিশান তাকাল শ্রীধরের দিকে।

নির্বিকার মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। চোয়ালের রেখা শক্ত। লাল টুকটুকে ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন।

'আমার ওয়াইফের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে—।' ঘষা গলায় আমতা-আমতা করে বলল জিশান।

শ্রীধর ওর দিকে তাকালেন। ঠোঁট ফাঁক না করে হাসলেন : 'এর মধ্যেই উতলা? হায়, মা শীতলা! ধৈর্য —ধৈর্য। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। স্পেশাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মাইক্রোভিডিয়োফোন পৌঁছে যাবে তোমার ওয়াইফ মিনির—তাই তো নামটা?—কাছে। তোমার কাছে থাকবে আইডেন্টিক্যাল আর-একটা হ্যান্ডসেট। তখন দশমিনিট ধরে যত প্রাণ চায় কথা বোলো—ফ্রি টকটাইম—কিল গেম পর্যন্ত। তারপর তো...' মুখে 'ফুস-স' শব্দ করে আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালেন শ্রীধর।

এই ইশারার অর্থ বুঝতে জিশানের অসুবিধে হল না। ও চুপ করে গেল। মাইক্রোভিডিয়োফোনটা হাতে পাওয়ার জন্য এখন থেকেই অপেক্ষা করতে শুরু করল।

মাথার ওপরে নীল আকাশ আর সোনালি রোদ। সূর্যের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ধূমকেতু দুটোর রং এখন বোঝা যাচ্ছে না। সূর্যের আলোয় হারিয়ে গেছে। ঝকঝকে রোদে নীচের নিউ সিটিকে গ্রাফিক আর্ট বলে মনে হচ্ছে। তারই মাঝে ঝিকিয়ে উঠছে বেতার সংযোগের বল অ্যানটেনাগুলো।

শুটার তিনটে স্ক্রুর প্যাঁচের মতো অদ্ভুতভাবে পাক খেয়ে নেমে এল অনেকটা নীচে। সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারটা দেখতে পেল জিশান।

বিশাল মাপের আকাশে-চুমু-খাওয়া বিল্ডিং। বিল্ডিংটার চারদিকেই রুপোর মতো ঝকঝকে পাত লাগানো। জানলা বলে কিছু চোখে পড়ছে না। বিল্ডিং-এর মাথার কাছটায় ধাতুর হরফে বড়-বড় করে লেখা :

The Syndicate HQ

আর লেখাটার নীচে সিন্ডিকেটের লোগো। লোগোটা গ্রাফিক ঢঙে আঁকা একটা 'S'।

মিনিটখানেক যেতে-না-যেতেই শুটারগুলো শিস দিয়ে নেমে পড়ল সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর মসৃণ ছাদে।

শ্রীধর মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর জিশানকে বললেন, 'কাম অন, বয়। আমরা এসে গেছি—।

'বয়' সম্বোধনটা জিশানের ভালো লাগল না। ও বিরক্তভাবে শ্রীধরের দিকে তাকাল শুধু।

শ্রীধর ঠোঁট বেঁকিয়ে তেরছা হাসলেন। জিশানের থুতনিতে কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'হরিদাসের দেখছি রাগ হয়েছে! এখনই এত রাগ করে না, সোনা। রাগ করার মতো এখনও প্রচুর ব্যাপার বাকি। রাগ করতে-করতে তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবে। তখন তোমার সব রাগ ওয়াটার হয়ে যাবে—ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া।'

কথাটা শেষ করেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন শ্রীধর। শুটারের একটা অংশে বাঁ-হাতের ভর দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শূন্যে লাফ দিয়ে শুটারের বাইরে নেমে পড়লেন।

দাঁতে দাঁত চেপে রইল জিশান। ধীরে-ধীরে নেমে এল শুটার থেকে।

বাকি তিনজন প্রহরীও নেমে পড়েছিল অন্য দুটো শুটার থেকে।

সবাই নেমে পড়তেই শ্রীধর পাইলটদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনটে শুটার শিস দিয়ে আবার ভেসে পড়ল আকাশে।

জিশান আগেই লক্ষ করেছিল, ছাদের মসৃণ মেঝেতে বড়-বড় মাপের খোপ কাটা—অনেকটা দাবার ছকের মতো। গোটা ছাদটা ছাই রঙের হলেও তার মধ্যে একটা খোপের রং কুচকুচে কালো।

সবাইকে ডেকে নিয়ে সেই খোপটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীধর। পা দিয়ে মেঝেতে তিন-চারবার শব্দ করলেন। অমনি সেই কালো অংশটা নামতে শুরু করল নীচের দিকে।

জিশান একপলকের জন্য চমকে উঠেছিল।

সেটা লক্ষ করে শ্রীধর মুচকি হেসে বললেন, 'অটোমেটিক প্লেট এলিভেটর—অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড।'

জিশান অবাক হয়ে ভাবছিল, ষোলো বছরে নিউ সিটিতে প্রযুক্তি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর ওল্ড সিটিতে সেটা দ্বিগুণ গতিতে পিছিয়ে গেছে।

এলিভেটর মসৃণভাবে নীচে নামছিল। এলিভেটর শ্যাফটের চার দেওয়াল থেকে হালকা নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছিল জিশানদের ওপরে। একটা দেওয়ালে বসানো অনেকগুলো আলোর বোতাম। এলিভেটরের সঙ্গে-সঙ্গে বোতামগুলোও সমান গতিতে নেমে চলেছে—অনেকটা উৎসবের আলোকসজ্জার চলমান টুনি বাতির মতো।

বোতামগুলোর ওপরে সংখ্যা লেখা রয়েছে।

শ্রীধর '23' লেখা বোতামটি টিপলেন। তারপর যেন আপনমনেই বললেন, 'টোয়েন্টি থার্ড ফ্লোরে রেজিস্ট্রেশান ডেসক। আমরা সেখান থেকে শুরু করব।'

•

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর সবকিছুই জিশানকে অবাক করছিল। মনে হচ্ছিল, ও বিশাল কোনও মহাকাশযানের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চারপাশে ঠান্ডা নরম আলো। ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা যাতায়াত করছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই—শুধু মসৃণ মেঝেতে জুতোর খটখট শব্দ। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

গোটা বাড়িটাই যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেটা জিশান শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল। এখন করিডর দিয়ে হাঁটার সময় ওর বেশ শীত-শীত করতে লাগল।

করিডরের দেওয়ালগুলো ধপধপে সাদা, আর মেঝেতে চকচকে বাদামি গ্র্যানাইট পাথর। কোথাও এককণা ময়লা নেই, একবিন্দু অনিয়ম নেই।

চারপাশটা এত ঝকঝকে পরিষ্কার যে, জিশানের নোংরা জামা-প্যান্ট আরও নোংরা দেখাচ্ছিল। সঙ্কোচে জিশান একটু কুঁকড়ে গেল।

করিডরে ওরা এতবার বাঁক নিল যে, জিশানের দিক গুলিয়ে গেল।

একটু পরেই ওরা এসে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। দরজার মাথায় একটা লুমিনাস হেডিং জ্বলছে : রেজিস্ট্রেশান।

পকেট থেকে একটা ম্যাগনেটিক স্মার্ট কার্ড বের করলেন শ্রীধর পাট্টা। সেটা দরজার পাশের একটা স্লটে ঢুকিয়ে টানলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা রেকর্ডেড ভয়েস বলে উঠল : 'থ্যাংকু য়ু।' এবং দরজার পাল্লাটা স্লাইড করে সরে গেল একপাশে।

প্রহরীদের হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করলেন শ্রীধর। ওরা অ্যাবাউট টার্ন করে করিডর ধরে হেঁটে রওনা হল।

জিশানকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীধর রেজিস্ট্রেশান রুমে ঢুকে পড়লেন।

বিশাল ঘর। ঘরের শেষ প্রান্তে গোটা দশ-বারো কাউন্টার। কাউন্টারের মাথায় জ্বলজ্বলে লাল আলোর হরফে নম্বর লেখা। প্রতিটি কাউন্টারে একটি করে ছিপছিপে মেয়ে বসে আছে। ওদের সামনে একটা করে কালো রঙের ল্যাপটপ কম্পিউটার।

কালো পোশাক পরা পাঁচজন সিকিওরিটি গার্ড ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দুজনের চোখে অদ্ভুত ধরনের কালো চশমা। কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট। বেল্টের একপাশ থেকে ঝুলছে গাঢ় নীল রঙের একটা রড, তবে তার হাতলের দিকটা কালো চামড়ায় মোড়া।

শ্রীধরকে দেখেই গার্ডগুলো টান-টান হয়ে দাঁড়াল। চোখ নামাল মেঝের দিকে।

শ্রীধর একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ণ চোখে তার পোশাকটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ওপরওয়ালার জরিপ-নজরের সামনে গার্ডটা একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গার্ডদের কালো পোশাকে সোনালি বিডের লাইনিং লাগানো। বুকে সোনালি ব্যাজ। ব্যাজের মনোগ্রামে সুন্দর ছাঁদে লেখা পি. এফ.।

গার্ডটির বুকের ব্যাজের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর পাট্টা। যেন চোখের তীব্র নজরে ব্যাজটাকে ভস্ম করে ফেলবেন। তারপর হাত বাড়িয়ে গার্ডের কোমর থেকে নীল রঙের রডটা তুলে নিলেন।

জিশান লক্ষ করল, রডটার কালো হাতলের কাছে একটা ছোট সুইচ রয়েছে।

সুইচটা অন করে চোখের পলকে রডের ডগাটা গার্ডটির পেটে চেপে ধরলেন শ্রীধর।

লোকটার শরীর স্প্রিং-এর মতো হেঁচকি তুলে ছিটকে লাফিয়ে উঠল। ওর মুখ দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল। চোখে লাগানো কালো চশমাটা ঠিকরে পড়ল দূরে।

শ্রীধর রডের ডগাটা ক্ষিপ্রভাবে আবার চেপে ধরলেন গার্ডের পাঁজরে।

থরথর করে কেঁপে উঠল লোকটা। তিনহাত পিছনে ছিটকে পড়ল। মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শ্রীধর, বললেন, 'খেয়াল করেছ, ওর বুকের ব্যাজটা একটু বেঁকাভাবে লাগানো রয়েছে? নিউ সিটিতে প্রতিটি মিসটেকের জন্যে হাই স্টেক। এমনিতে মস্তি, কিন্তু ভুল করলেই শাস্তি...।'

একটি গার্ডকে শাস্তি দেওয়ার কাজ যখন চলছিল, অন্য চারজন গার্ড তখন স্ট্যাচুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যেন ওদের চোখ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, ওদের কান কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

নীল রডের মতো জিনিসটা তখনও শ্রীধরের হাতে শক্ত করে ধরা ছিল। তিনি সেটার সুইচ অফ করে দিলেন।

রডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমতা-আমতা করে জিশান প্রশ্ন করল, 'এটা কী?'

'এটার নাম শকার।' হেসে বললেন শ্রীধর পাত্রা, 'শাসনের জন্যে দরকার। আর ওই কালো চশমাটা—ওই যে মেঝেতে পড়ে আছে...' আঙুল তুলে চশমাটা দেখালেন শ্রীধর : 'ওটা স্পেশাল এক্স-রে ভিশান স্পেক।'

জিশান তখনও রডটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মাঝে-মাঝেই ওর দৃষ্টি ছিটকে যাচ্ছিল মেঝেতে পড়ে থাকা হতভাগ্য লোকটার দিকে। লোকটা এখনও অল্প-অল্প নড়ছে। কাতরাচ্ছে।

'সুইচ অন করলে এটার মধ্যে ফোর হান্ড্রেড ভোল্টস এসি তৈরি হয়।' শ্রীধর তখনও বলছিলেন, 'তারপর কারও গায়ে চেপে ধরলে...ওই যে, নেংটি ইঁদুরটা মেঝেতে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে...।'

রডটা সামনে ধরে পড়ে থাকা লোকটার দিকে দেখালেন শ্রীধর পাত্রা।

জিশান যেন একটা ধাক্কা খেল।

ইউনিফর্মের বুকে লাগানো ব্যাজটা সামান্য বেঁকে আছে বলে চারশো ভোল্টের শক! শ্রীধর কি মানুষ?

শকারটা বগলে চেপে ধরে শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট শিশিটা বের করে নিলেন। শিশির মুখটা খুলে ওপরদিকে তাকিয়ে হাঁ করলেন। শিশি থেকে তিন ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চটপটি বাজির মতো 'চটাস! চটাস!' শব্দ করলেন কয়েকবার । জোরে-জোরে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকালেন। ওঁর দু-গালে লাল আভা দেখা গেল। ওঁকে এখন অনেক চাঙ্গা মনে হল জিশানের।

এইবার জিশানকে ইশারায় কাছে ডেকে নিলেন শ্রীধর। সোজা এগিয়ে গেলেন সাতনম্বর কাউন্টারের কাছে।

কাউন্টারের মেয়েগুলো এতক্ষণ ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে শ্রীধরের কীর্তিকলাপ দেখছিল। এখন শ্রীধর আর জিশানকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে সাতনম্বর কাউন্টারের মেয়েটির মধ্যে প্রাণ এল।

'কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট—' ঠোঁট প্রায় ফাঁক না করেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন শ্রীধর।

'কিল গেম' কথাটা শোনামাত্রই কম্পিউটার কিবোর্ডে খটখাট শুরু করল মেয়েটি। তারপর জিশানের দিকে না তাকিয়েই যান্ত্রিক সুরে প্রশ্নমালা শুরু করল।

'নাম?'

'জিশান—জিশান পালচৌধুরী।'

'বয়েস?'

'ছাব্বিশ।'

'হাইট? ওয়েট?'

'পাঁচ-এগারো। আর ওয়েট চুয়াত্তর কেজি বোধহয়—লাস্ট যখন ওয়েট নিয়েছিলাম।'

'নো প্রবলেম। এসব ডেটা আমরা আবার ক্রসচেক করে নেব—আমাদের রুটিন মেডিক্যাল চেক-আপ-এর সময়...।'

জিশান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ামাত্রই মেয়েটির আঙুল চলছিল কিবোর্ডে। জিশান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ও ঢুকিয়ে দিচ্ছিল কম্পিউটারের মগজে।

জিশান মেয়েটিকে লক্ষ করছিল।

ছিপছিপে ফরসা চেহারা। মুখের মাপের তুলনায় চোখগুলো বড়-বড়। মুখের দুপাশে চুলের ঢল নেমেছে—ফলে মুখটাকে আরও ছোট দেখাচ্ছে।

মেয়েটির প্রসাধন খুবই সাধারণ। অন্তত জিশানের তাই মনে হল।

ওর চোখে কাজলরেখা, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। আর পারফিউমের গন্ধ একটা নাকে আসছিল বটে, কিন্তু ওটা এমনই পালিয়ে-বেড়ানো ঢঙের যে, কে মেখেছে জিশান বুঝে উঠতে পারছিল না।

মেয়েটির গায়ে হালকা নীল টপ আর গাঢ় নীল স্কার্ট। অনেকটা ইউনিফর্ম পরা স্কুলের মেয়ের মতো লাগছে।

একঘেয়ে ভঙ্গিতে জিশানকে আরও অনেক প্রশ্ন করল মেয়েটি। যেমন, বাড়ির ঠিকানা, বাবার নাম, মায়ের নাম, বিয়ে করেছে কি না, এরকম আরও অনেক কিছু।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে জিশানের ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

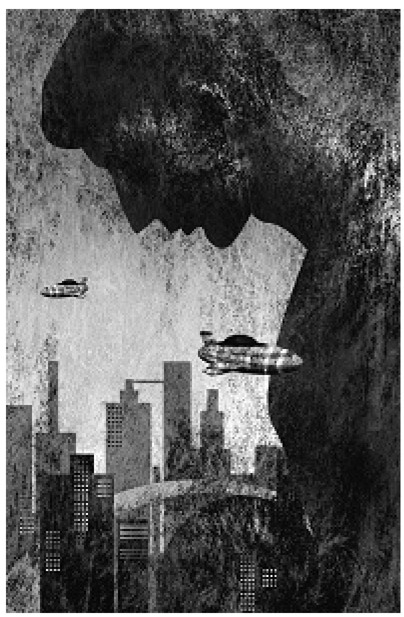
'কোনওরকম নেশা করেন—বা করতেন?'

'একসময় স্মোক করতাম—চারবছর হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'ওল্ড সিটির এয়ার পলিউশান কমানোর জন্যে।'

এই প্রথম জিশানের দিকে চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি। চোখে এককণা হাসল।



তারপর মেয়েটি বলল, 'মিস্টার পালচৌধুরী, আপনাকে এবার একটা স্ট্যাটুইটারি ওয়ার্নিং শোনাচ্ছি : কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর মাত্র 0.07 অর্থাৎ, পার্টিসিপ্যান্টদের শতকরা তিরানব্বই জনই মারা যায়। আপনি ইচ্ছে করলে এখনও নাম উইথড্র করতে পারেন।'

জিশান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শ্রীধরের দিকে। শ্রীধরের মুখে সাপের মতো ঠান্ডা অভিব্যক্তি।

জিশানের মনে পড়ল : '...তিনশো দুই, নয়তো কিল গেম।'

তা ছাড়া মিনি আর শানুর ওপরে পিস ফোর্সের নজরদারি রয়েছে। ওদের ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে জিশানকে দিয়ে শ্রীধররা অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারেন। জিশানের কিছু করার নেই। অন্তত এখন।

জিশান মেয়েটিকে বলল, 'থ্যাংক য়ু ফর দ্য অ্যাডভাইস। আমি স্বেচ্ছায় নাম দিচ্ছি।'

'ও. কে.। তা হলে আমি আপনাকে রেজিস্ট্রেশান কিট দিচ্ছি। তার মধ্যে আপনি কিল গেম-এর রুলস অ্যান্ড রেগুলেশানস পাবেন। ফ্যাক এবং তার উত্তর পাবেন। মানে, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস এবং তার আনসার। আপনার আগামী একমাসের ট্রেনিং শিডিউল পাবেন। গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাস—আমরা শর্টে বলি জিপিসি—সেখানে গেস্টহাউসে আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে কিল গেম ছাড়াও অন্যান্য খেলার অনেক পার্টিসিপ্যান্ট রয়েছে। রেজিস্ট্রেশান কিটে সব ডিটেইলস দেওয়া আছে।'

মেয়েটি একটা মোটা পলিথিনের প্যাকেট জিশানের দিকে বাড়িয়ে দিল। জিশান হাতে নিয়ে বুঝল প্যাকেটটা বেশ ভারী।

মেয়েটি এবারে একটা ফর্ম এগিয়ে দিল কাউন্টারের ওপরে। সঙ্গে একটা পেন।

জিশান ফর্মটা দেখল। ওর এইমাত্র দেওয়া তথ্যগুলো ফর্মে ছাপানো রয়েছে।

'এটায় আপনি সাইন করে দিন—দু-জায়গায়—এই যে, টিক দেওয়া আছে।'

জিশান পেনটা তুলে নিয়ে খসখস করে সই করে দিল।

ফর্মটা ফেরত নিয়ে মেয়েটি বলল, 'আপনার রেজিস্ট্রেশান কমপ্লিট, মিস্টার পালচৌধুরী। ফর ইয়োর ইনফরমেশান, জিপিসি গেস্টহাউস থেকে অন-লাইন নেটওয়ার্কে আপনি আমাদের টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হেলপলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার যে-কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে আমাদের হেলপলাইন সবসময় অ্যাকটিভ থাকে।'

একটু থামল মেয়েটি। ওর কথাগুলো ঠিক মুখস্থ করা পরীক্ষার পড়ার মতো শোনাচ্ছিল। জিশানের ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ করে মাঝপথে ওর মুখস্থ করা লাইনগুলো না গুলিয়ে যায়।

এইবার শ্রীধর পাট্টার দিকে কয়েকপলক তাকিয়ে মেয়েটি জিশানকে বলল, 'এরপর আপনার একটা বন্ড দেওয়ার ব্যাপার আছে—ইনডেমনিটি বন্ড। আর একটা রিসক ইনশিয়োরেন্স ফর্ম সাইন করতে হবে। নিউলাইফ ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির অথরাইজড এজেন্ট সময়মতো আপনাকে দিয়ে ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে নেবে। সমস্ত ইনফরমেশান আপনি ঘরে বসে অন-লাইনে পেয়ে যাবেন।'

জিশান ভাবল মেয়েটির কথা শেষ হয়ে গেছে। তাই ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। মেয়েটির ডাক শুনে ও থামল।

'মিস্টার পালচৌধুরী—।'

জিশান আবার ঘুরে দাঁড়াল কাউন্টারের দিকে।

মেয়েটি একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল ইলেকট্রনিক ম্যাজিক। পাশে রাখা একটা লাল-সাদা বাক্স থেকে একটা ছোট কার্ড লাফিয়ে বেরিয়ে এল—অনেকটা পপ-আপ টোস্টারের মতো।

কার্ডটা জিশানের দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটি। বলল, 'এটা রাখুন—এটা আপনার পার্সোনাল স্মার্ট কার্ড। জিপিসিতে থাকার সময় প্রতিটি স্টেপে এই কার্ডটা আপনার কাজে লাগবে। কার্ডটা হারাবেন না যেন...।'

জিশান কার্ডটা দেখল। ওর ফটো লাগানো ল্যামিনেট করা একটা সুদৃশ্য কার্ড। হঠাৎ দেখলে ক্রেডিট কার্ড বলে ভুল হতে পারে। কার্ডটায় একটা নম্বর লেখা আছে—জিশানের আই-ডি নম্বর। পি-2713444

কিন্তু ওর ফটোটা ওরা পেল কোথায়?

তখনই জিশানের খেয়াল হল, এখন যে-জামাটা ও পরে রয়েছে, ফটোতে সেই জামারই ছবি। তার মানে, এই কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কোনও লুকোনো ক্যামেরা ওর ফটো তুলে নিয়েছে।

জিশান মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'আমি কি এবার যেতে পারি?'

'অফ কোর্স। অল দ্য বেস্ট, মিস্টার পালচৌধুরী...।'

অল দ্য বেস্ট।
তার মানে কী?
যে-মেয়েটি জানাচ্ছে, কিল গেম-এ সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07, সে-ই আবার বলছে, 'অল দ্য বেস্ট।' মেয়েটি কি জানে না, এই মরণখেলায় 'অল দ্য বেস্ট' হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র সাত ভাগ!
নাকি এটাও স্ট্যাটুইটারি উইশ—ওই স্ট্যাটুইটারি ওয়ার্নিং-এর মতো?
জিশানের জিভ বিস্বাদ হয়ে গেল। একটা তেতো ভাব টের পেল ও। ওর রেজিস্ট্রেশান শেষ, স্মার্ট কার্ড পকেটে...অতএব এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই।
শ্রীধর ইশারায় ওকে ডাকলেন।
চারজন গার্ড একইরকমভাবে দাঁড়িয়ে। আর মাটিতে যে পড়ে ছিল সে পড়েই আছে।
জিশানকে নিয়ে বেরোনোর সময় শ্রীধর শকারটা ছুড়ে দিলেন পড়ে থাকা লোকটার গায়ে। এবং একইসঙ্গে ডানপায়ে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলেন লোকটাকে। চাপা গলায় বললেন, 'আরাম হারাম হ্যায়—।'
তারপর জিশানকে বললেন, 'চলো, বাবু, তোমাকে জিপিসিতে পৌঁছে দিই। তারপর আমার ছুটি। তুমি প্যাকেটের বইপত্তরগুলো ভালো করে স্টাডি করে নিয়ো। কাল থেকে শুরু হবে অ্যাকশান। তুমি তৈরি থেকো, বাবু...।'
শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে গলায় থুতুর দলা উঠে এল জিশানের। মনে হল, জঘন্য কাজ করার জন্য কিছু-কিছু জঘন্য লোকের জন্ম হয়।

•

জিমের নাম 'ডিজিটাল'।
কেন যে এরকম নাম জিশান প্রথমে বুঝতে পারেনি। সেটা ওকে বুঝিয়ে দিল মনোহর।
মনোহর সিং জিপিসিতে জিশানের সাতদিন আগে এসেছে। তাই ও এখানকার খোঁজখবর জিশানের চেয়ে বেশি জানে।
'ডিজিটাল' নাম লেখা জিমনাশিয়াম বিল্ডিংটা প্রায় তিনতলা উঁচু। গোটা জিমটা ঠান্ডা—এয়ারকন্ডিশনড। এই জিমে ব্যায়াম-ট্যায়াম কিছু হয় না। শুধু হয় কমপিটিশান।
পার্টিসিপ্যান্টদের নিয়ে নানান রকমের কমপিটিশানের ব্যবস্থা আছে এখানে। কমপিটিশান না বলে সহজ কথায় লড়াই বলাই ভালো। আর সে-লড়াইয়ের উত্তর সবসময়েই ডিজিটাল—অর্থাৎ, বাইনারি ওয়ান আর জিরোর মতো—হয় জেতো, নয় হারো—মাঝামাঝি কিছু নেই। তবে এখানকার কর্মীরা এই লড়াইগুলোকে কখনও 'ফাইট' বলে না। বলে 'কমপিটিশান' বা 'গেম'। এইসব গেম-এ প্রায়ই পার্টিসিপ্যান্টরা আহত হয়, বিকলাঙ্গ হয়, এমনকী মারাও যায়—কিন্তু তবুও এর নাম 'গেম'।
জিমে ঢুকে চারদিকে তাকালে একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।
যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই নানান যন্ত্রপাতি। তার সঙ্গে আধুনিক কন্ট্রোল প্যানেল। প্যানেলে কম্পিউটার মনিটর, রঙিন পুশবাটন আর ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প।
জিশান আর মনোহরকে নিয়ে মোট দশজন ঢুকেছে ডিজিটাল জিমে। ঢোকার সময় যে-যার পার্সোনাল স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করেছে। গেম শেষ হলে পর এখান থেকে নিজের পায়ে হেঁটে বেরোবে তিনজন। বাকি সাতজন বাতিল। কিল গেম-এর জন্য তাদের বলা হবে 'আনফিট'।
মনোহরের কাছে ব্যাপারটা শোনার পর জিশানের মনে আশা জেগেছিল। মানে, প্রাথমিক পরীক্ষায় হেরে গেলে পর আসল পরীক্ষায়—অর্থাৎ, কিল গেম-এ—আর বসতে হবে না।
এ-কথা মনোহরকে বলতেই ওর কী হাসি! পেট চেপে ধরে হাসছে তো হাসছেই।

হাসি থামলে পর মনোহর বলল, 'জিশান ভাইয়া, দুনিয়া এত সহজ নয়। তা হলে জিপিসিতে গেস্টহাউসে কিল গেম-এর আমরা যারা রয়েছি তারা সবাই একে-একে হেরে যাওয়ার চেষ্টা করবে আর সাতদিনেই খাঁচা খালি হয়ে যাবে। যখন কমপিটিশান চলে তখন সুপারগেমস কর্পোরেশনের কয়েকজন অবজার্ভার থাকে। ওরা গেমস কমিটিকে রিপোর্ট দেয়। যদি সেই রিপোর্টে কারও নামে এমন লেখা থাকে যে, সেই পাবলিক জেনুইন লড়েনি, তখন তাকে...।' কথা থামিয়ে মনোহর আচমকা জিশানকে প্রশ্ন করল, 'বলো দেখি, তাকে নিয়ে কী করে? বাতাও, কেয়া...?'

জিশান কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না। ও ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কী করে তাকে নিয়ে?'

হাসল মনোহর, বলল, 'তাকে ধরে হাংরি ডলফিন, ম্যানিম্যাল রেস—বা ওরকম কোনও ডেঞ্জারাস গেম-এ জোর করে নামিয়ে দেয়। ফারাক সিরফ দুটো ব্যাপারে : এই গেম-এ কোনও প্রাইজ মানি থাকে না, আর এই খেলার কোনও লাইভ টেলিকাস্ট হয় না। আভি সমঝে আপ?'

জিশান বুঝতে পারল—বেশ ভালো করেই বুঝতে পারল। ও মনোহরের ক্লেদহীন সরল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোলগাল মুখ। ভুরু দুটো খুব ঘন। মাথায় কদমছাঁট চুল। নাকটা অতিরিক্ত ছড়ানো। আর সামনের দাঁতে কালচে ছোপ।

হাসলে মনোহরকে একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো দেখায়।

রেজিস্ট্রেশান কিটের ম্যানুয়াল আর বইপত্রগুলো এর মধ্যেই জিশান অনেকটা করে পড়ে ফেলেছে। সবরকমের পার্টিসিপ্যান্টের কথা মাথায় রেখে ম্যানুয়ালগুলো বাইলিঙ্গুয়াল—বাংলা আর ইংরেজিতে ছাপা। সেগুলো পড়ে অনেক নিয়মকানুনের কথা জেনেছে জিশান। তবে সেখানে মনোহরের কাছে শোনা এই বিচিত্র 'শাস্তি'-র কথা লেখা নেই। তার কারণ, ম্যানুয়ালগুলো আগাপাস্তলা অফিশিয়াল এবং আইনমাফিক লেখা।

ডিজিটাল জিমে ঢুকে জিশান আর মনোহররা একপাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশাল মাপের জিমের নানান জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা সিকিওরিটি গার্ড, কোমরের বেল্টে ঝুলছে শকার।

জিশানদের সঙ্গে রয়েছেন একজন ইনস্ট্রাকটর। তাঁর গায়ে লাল ইউনিফর্ম। কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ল্যাপটপ কম্পিউটার, আর হাতে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের মতো একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

খেলাটা জিশানদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকটর বললেন, 'সবাই ওই স্ক্রিনটার দিকে তাকান। যে-গেমটা আমাদের খেলতে হবে তার সিমুলেশান ওই পরদায় আমি দেখাচ্ছি। আমার ল্যাপটপ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে ওখানে প্রোজেক্ট করছি। আপনারা দয়া করে টোটাল অ্যাটেনশান দেবেন। রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি—স্টার্ট!'

জিমের একপাশে দাঁড় করানো একটা বড় সাদা পরদায় গেমটার সিমুলেশান শুরু হল।

রঙিন ছবিতে দেখা গেল একটা বিশাল জিম। জিমটার নাম 'ডিজিটাল'।

ক্যামেরা প্যান করে জিমের ভেতরে ঢুকল। সেখানে দশজন খেলোয়াড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সকলের চেহারা একইরকম—ভিডিয়োগেমের ছবি যেমন হয়। আর তাদের প্রত্যেকের গায়ে একইরকম পোশাক—জিশানরা এখন যেমন পরে রয়েছে।

হলদে রঙের স্পোর্টস টি-শার্ট। বুকের ওপরে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো ছাপা। আর তার ঠিক নীচেই একটা বার কোড। এই কোড লেজার স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলেই প্রতিযোগীর নানান প্রয়োজনীয় তথ্য ফুটে উঠবে স্ক্যানারে লাগানো কম্পিউটারে।

জিশানদের গায়ে হলদে টি-শার্টের সঙ্গে রয়েছে কালো রঙের বারমুডা প্যান্ট। প্যান্টের একপাশে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো। তার নীচে আবার সেই বার কোড।

এ ছাড়া প্রত্যেকেরই পায়ে স্পোর্টস শু। আর জুতোর সোলের একপাশে লাগানো রয়েছে বার কোডের স্টিকার।

ওরা দশজন পরদার সিমুলেশানটা হাঁ করে গিলছিল। সিনেমা শেষ হলেই ওদের সত্যি-সত্যি সেরকম করতে হবে।

জিশানের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। ও মনে-প্রাণে চাইছিল, ওকে যেন মনোহরের মুখোমুখি না পড়তে হয়। জিপিসিতে এসে দু-দিন কাটিয়েই মনোহরকে ওর পছন্দ হয়ে গেছে।

মনোহর সংসারে একা। তিনকুলে ওর কেউ নেই। সেই কোন ছোটবেলায় ওর বাবা-মা ওকে রাস্তায় ফেলে পিঠটান দিয়েছে। তার পর থেকে ও রাস্তায়-রাস্তায় মানুষ। একটা সময়ে ঠেলাগাড়ি আর সাইকেল ভ্যান চালাত। তারপর ট্রেনের টিকিট ব্ল্যাক করত। এইভাবে বহুবার পেশা বদলে শেষ পর্যন্ত ফুটপাতে রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যাবসা করছিল। তখনই ও পিস ফোর্সের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।

একদিন রাতে বৃষ্টির মধ্যে ও যখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে আসছিল, তখন হঠাৎই দ্যাখে গিরিশ পার্কের কাছে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা শুটার দাঁড় করানো। আর পিস ফোর্সের দুটো গার্ড একটা মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে।

খানাখন্দ ভরতি বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় লোকজন যে একেবারেই ছিল না এমন নয়। কিন্তু যারা ছিল তারা কোনও ঝামেলায় নাক গলাতে চায়নি। ওল্ড সিটিতে এটাই সাধারণ স্টাইল। নিজের ঠিকঠাক বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি।

কিন্তু মনোহর ছোটবেলা থেকেই বেপরোয়া। এমনভাবে ও জীবন কাটিয়েছে যে, ওর পক্ষে ওল্ড সিটির সিটিজেনদের নির্লিপ্ত ঢঙের সঙ্গে লাগসই হয়ে যাওয়াটা মুশকিল।

তাই মনোহর গিয়ে পিস ফোর্সের দুই মস্তানের মুখোমুখি হয়েছে। এবং কোনও কথা না বলেই এক ঘুষিতে একটাকে রাস্তায় পেড়ে ফেলেছে। সেই ফাঁকে দ্বিতীয় গার্ডটা অটোমেটিক পিস্তলের বাঁট বসিয়ে দিয়েছে মনোহর সিং-এর মাথায়।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে মনোহর ঝাপসাভাবে দেখতে পেয়েছিল মেয়েটা ছুটে পালাচ্ছে।

অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে মনোহরের মন ভরে গিয়েছিল এবং ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তারপরই ওকে নিয়ে আসা হয়েছে সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টারে।

মনোহর মাঝে-মাঝেই এক-দু-কলি গান গেয়ে ওঠে আর জিশানকে বলে নিজের লক্ষ্যহীন জীবনের কথা।

'জিশান ভাইয়া, না কোই আগে, না কোই পিছে / উপর আসমা, ধরতী নীচে। তাই লাইফে আমার কোনও পিছুটান নেই। ব্যস, গুজরনা হ্যায়। এখানে এসে আমার ভালোই লাগছে...আগে জো হোগা ও রাম জানে!'

দম বন্ধ করে খেলাটা দেখছিল জিশান।

জিমের ঠিক মাঝখানে অনেক উঁচুতে একটা লম্বা লোহার রড—জিমের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে চলে গেছে। সেই রড থেকে সার বেঁধে ঝুলছে একজোড়া করে লোহার শিকল। একজোড়া শিকল থেকে পরের জোড়া শিকলের দূরত্ব পনেরো কি ষোলো ফুট।

শিকলগুলো নেমে এসেছে অনেক নীচে, তবে জিমের ফ্লোর থেকে ফুটদশেক ওপরে শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি শিকলে দশফুট দূরত্বে একটা করে লোহার চাকা লাগানো—অনেকটা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের মতো। ফলে শিকল ধরে এই চাকায় দু-পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায়।

খেলার শুরুতে একজোড়া শিকলের দুটো প্রান্তকে একটা অদ্ভুত যন্ত্র দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল বিপরীত দিকে—একেবারে জিমের সিলিং-এর উচ্চতায়। তারপর একটা অটো-এলিভেটর দুই প্রতিযোগীকে তুলে দিল বিপরীত দিকের দুটো প্ল্যাটফর্মে—শিকলের প্রান্তের একেবারে কাছে। তারা শিকলের প্রান্ত ধরে বসে রইল সেখানে।

এইরকমভাবে পাঁচজোড়া শিকল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে তৈরি হল পাঁচজোড়া খিলাড়ি।

তারপর জিমের উত্তরদিকের দেওয়ালে লটকানো প্রকাণ্ড মাপের একটা এলইডি ডট ম্যাট্রিক্স স্ক্রিনে শুরু হল কাউন্ট ডাউন : টেন, নাইন, এইট,...থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো।

কাউন্ট ডাউন শেষ হতে-না-হতেই খেলা শুরু।

মুখোমুখি প্ল্যাটফর্মে বসা প্রতিযোগী দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্ম থেকে। টারজানের মতো শূন্যে দোল খেয়ে তারা উল্কার মতো ধেয়ে এল পরস্পরের দিকে। জিমের মাঝামাঝি জায়গায় এসে ওদের মারাত্মক সংঘর্ষ হল।

তারপর চলতে লাগল দাঁত-নখ লড়াই।

আচমকা পরদায় প্রোজেকশান বন্ধ করে দিলেন ইনস্ট্রাকটর। বললেন, 'সবাই নিশ্চয়ই খেলাটা বুঝতে পেরেছেন?'

জিশান লক্ষ করল, ইনস্ট্রাকটরের জামায় বোতামের কাছে মউমাছির মতো ছোট্ট ক্লিপ-অন মাইক্রোফোন লাগানো। লুকোনো কোনও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে জিশানরা ওঁর কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিল।

'তাড়াতাড়ি বলুন, খেলাটা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কি না—।'

জিশানরা সকলেই হাতের ইশারায় জানাল, হ্যাঁ, ওরা বুঝতে পেরেছে।

'...খেলাটায় নিয়ম বলে কিছু নেই। শিকল ধরে প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝাঁপ দেওয়ার পর আপনারা যে যেমনভাবে খুশি লড়াই করতে পারেন। যদি কেউ শিকল শক্ত করে ধরে রাখতে না পেরে নীচে পড়ে যান তা হলে ডিসকোয়ালিফায়েড হওয়ার কোনও ভয় নেই। অটো-এলিভেটরের হেলপ নিয়ে আপনারা আবার শিকল ধরে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসবেন—ঝাঁপ দেবেন।' ইনস্ট্রাকটর ওদের দশজনকে একে-একে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, 'এই খেলাটায় সুবিধে হচ্ছে, এর কোনও টাইম লিমিট নেই। টেক ইয়োর ওন টাইম টু ফিক্স ইয়োর অপোনেন্ট।'

দু:খে হাসি পেয়ে গেল জিশানের। কোনও টাইম লিমিট নেই! শিকলে ঝুলতে-ঝুলতে পশুর মতো লড়ে যাও প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। শিকলে বাড়ি খাও, মাথা ফাটাও—নিজের অথবা অন্যের। শিকল থেকে পড়ে গেলেও কোনও অসুবিধে নেই। তখন আবার প্ল্যাটফর্মে চড়ে বসতে হবে। নতুন করে শুরু করতে হবে লড়াই। যদি অবশ্য জিমের মেঝেতে পড়ে গিয়ে শরীরটা আস্ত থাকে!

মোদ্দা কথা হল, ডিজিটাল রেজাল্ট চাই : এক অথবা শূন্য, জয় অথবা পরাজয়। আর এত সত্বেও এর নাম খেলা—গেম!

'ও.কে.। টেক ইয়োর পজিশন। যার-যার জায়গামতো দাঁড়িয়ে যান আপনারা। এদিকে পাঁচজন, আর ওদিকে পাঁচজন। কুইক—উঠে পড়ুন অটো-এলিভেটরে।'

জিমের যন্ত্রগুলো যন্ত্রের মতোই কাজ করতে লাগল। জিশান অনেক হিসেব কষে এমনভাবে একদিকে গিয়ে দাঁড়াল যাতে ওকে মনোহর সিং-এর মুখোমুখি না পড়তে হয়।

ও খেয়াল করল, মনোহরও বোধহয় একই চিন্তা করে জিশানের সঙ্গে একইদিকের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিশানের সঙ্গে মনোহরের চোখাচোখি হল। মনোহর হেসে চোখ মারল জিশানকে। তারপর 'দেখি, নসিবে কী আছে!' গোছের ভাব করে হাত আর ঠোঁট ওলটাল।

অটো-এলিভেটর জিশানদের তুলে দিল প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরের প্ল্যাটফর্মে। তারপর অদ্ভুত একটা যন্ত্র শিকলের প্রান্তগুলো ওপরে তুলে পৌঁছে দিল জিশানদের হাতের কাছে।

ইনস্ট্রাকটরের সিগনালের সঙ্গে-সঙ্গে ডিজিটাল কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল।

জিশান তাকাল বিপরীতদিকের মাচায় বসা ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

ছেলেটার নাম শিবপদ। শিকলের প্রান্তটা ধরে লাফ দেওয়ার জন্য ওত পেতে বসে আছে। দূরত্বটা অনেক বেশি হওয়ার জন্য স্পষ্ট করে ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আগে শিবপদকে লক্ষ করেছে জিশান। বেশ লম্বা, ফরসা, গাল ফোলা, কবজি দুটো শিরা-ওঠা—চওড়া, ঘন-ঘন চোখের পাতা ফ্যালে। আর গলায় একটা রুপোর চেন।

জিপিসিতে এসে থেকে জিশানরা রোজ নিয়মমাফিক ব্যায়াম করে। রোজকার সেই ওয়ার্কআউটের সময় জিশান লক্ষ করেছে, শিবপদ সবসময় চুপচাপ থাকে।

ওর সঙ্গে একবার আলাপ করতেও চেষ্টা করেছিল জিশান। ব্যায়াম করার ফাঁকে ওর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমার নাম জিশান...।'

ছেলেটা তখন পাওয়ার বিল্ডারে কাজ করছিল। যন্ত্রটায় হ্যাঁচকা মারা থামিয়ে ও চোখ পিটপিট করে তাকিয়েছিল জিশানের দিকে। তারপর থতিয়ে বলেছিল, 'আমি শিবপদ...আলাপ করে কী লাভ! বরং ঝামেলা বাড়বে।'

'ঝামেলা! কীসের ঝামেলা?' জিশান ওর কথাটা বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করেছিল।

তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে শিবপদ বলেছিল, 'আজ নয় কাল তো মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে হবে। বেশি আলাপ হয়ে গেলে তখন লড়তে প্রবলেম হবে।'

স্পষ্ট বিদায়ের ইঙ্গিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি জিশান। শিবপদর চোখদুটোকে বড় করুণ বলে মনে হয়েছিল ওর। তাই আবার প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

'বলব না।' সরাসরি আপত্তি করেছিল শিবপদ, 'দয়া করে নিজের জায়গায় যাও...মন দিয়ে ওয়ার্কআউট করো...শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার চেষ্টা করো।'

কথা শেষ করে শিবপদ আবার ব্যায়ামে মন দিয়েছিল। পাওয়ার বিল্ডারের রড ধরে দ্রুত ছন্দে হাপর টানার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

জিশানের যে কী জেদ চেপে গিয়েছিল!

ও নাছোড়বান্দার মতো জানতে চেয়েছিল, 'বাড়িতে কে-কে আছে তোমার?'

'বলব না!'

তারপর জিশানের প্রশ্নবাণের হাত থেকে বাঁচার জন্য চেঁচিয়ে একজন ইনস্ট্রাকটরকে ডেকেছিল, 'স্যার, আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন...।'

জিশান আর দাঁড়ায়নি। সরে এসেছিল শিবপদর কাছ থেকে।

এখন শিবপদকে দেখে জিশানের মনে হল, ও ঠিকই বলেছিল : বেশি আলাপ হয়ে গেলে লড়তে প্রবলেম হবে।

ডিজিটাল কাউন্ট ডাউন খুব তাড়াতাড়ি শূন্যের দিকে ছুটছিল।

জিমের টঙে বসে জিশান দেখল, মাথায় কালো টুপি আর সাদা ট্র্যাক-সুট পরা তিনজন লোক ঢুকে পড়েছে জিমে। ওদের ভুঁড়ির কাছে ঝোলানো ল্যাপটপ কম্পিউটার। আর ট্র্যাক সুটের বুকের কাছটায় লাল হরফে লেখা 'Observer'।

কাউন্ট ডাউন শূন্যে পৌঁছল এবং জিশান শূন্যে ঝাঁপ দিল।

সত্যিই ব্যাপারটা গাছের শিকড় ধরে টারজানের লাফ দেওয়ার মতো।

শোঁ-শোঁ করে বাতাস কেটে দীর্ঘ ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ এঁকে ভেসে চলল জিশান। যতই ও নীচে নামছিল ততই ওর গতি বাড়ছিল।

এ যেন ঠিক রূপকথার গল্পের মতো। জাদুকার্পেট কিংবা রূপকথার ঢেঁকিতে চড়ে আকাশে ভেসে বেড়ানো। অথবা পরিদের মতো পিঠে ডানা গজিয়ে যাওয়া।

নিজেকে রূপকথার গল্পের নায়ক ভাবছিল জিশান। আরামে ওর চোখ বুজে আসতে চাইছিল।

হঠাৎই ও দেখল, আয়নার প্রতিবিম্বের মতো বিপরীত দিক থেকে আর-একটা জিশান সমান গতিতে, সমান তালে, ছুটে আসছে ওর দিকে।

প্রতিবিম্বটা খুব কাছে আসতেই জিশান বুঝতে পারল ছায়াটা শিবপদর মতো দেখতে।

এই উপলব্ধির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সংঘর্ষটা হল।

জিমের ভেতরে পৃথিবীর অভিকর্ষের কোনও রকমফের নেই। তাই আরও চারজোড়া প্রতিযোগী একইরকম বেগে নেমে এসে একই মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটিয়েছে।

লোহার সঙ্গে লোহার টক্করে আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোল। ঝনঝন শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল জিমের ভেতরে। সংঘর্ষের শব্দে জিশানের কানে তালা লেগে গেল।

সংঘর্ষ শুধু লোহায়-লোহায় হয়নি, শরীরের সঙ্গে শরীরেরও হয়েছে। তবে সেই ভোঁতা শব্দগুলো লোহার সংঘর্ষের তীব্র শব্দে চাপা পড়ে গেছে।

শব্দের অনুভূতির পরই জিশান টের পেল ব্যথার অনুভূতি। ওর বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল অসংখ্য হলদে ফুল।

কারণ, শিবপদর কাঁধের সঙ্গে ওর মাথার সংঘর্ষ হয়েছে।

ধাক্কা লাগার পরই জিশান আর শিবপদর শরীরটা লাট্টুর মতো পাক খেতে শুরু করেছে। সেই অবস্থায় দুলতে-দুলতে ওরা ছিটকে সরে গেছে দূরে—কিন্তু আবার ছুটে আসছে কাছে। কারণ, অভিকর্ষের নিয়মের হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

জিশানের মাথা ঘুরছিল। ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটা প্রকাণ্ড এক উলের বল। এক্ষুনি বোধহয় হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাবে ওপরে।

সেই অবস্থাতেই জিশান চেন ধরে খানিকটা ওপরে উঠে যেতে চাইল, যাতে ওপর থেকে শিবপদকে লাথি মারার সুযোগটা পায়।

শিবপদর শরীরটা তখনও লাট খাচ্ছিল। ওই লাট খাওয়া অবস্থাতেই শিবপদ ভেসে আসছিল জিশানের দিকে।

পায়ের নাগালে ওর শরীরটা আসতেই জিশান জোড়া পা চালাল।

জিশানের স্পোর্টস শু-র ডানপাটিটা ধাক্কা খেল শিবপদর কোমরে। আর বাঁ-পা-টা গিয়ে লাগল শিকলের লোহায়।

বাঁ-পায়ের গোড়ালি থেকে মাথা পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী জিশান ছিটকে গেল দূরে। যন্ত্রণায় চোখ বুজে ফেলল।

তখনই মিনিকে দেখতে পেল জিশান। একরাশ হলদে ফুলের মধ্যে মিনির মুখটা টলটল করছে।

আরও ভালো করে দেখার চেষ্টায় ও চোখ ছোট করে সামনে ঝুঁকে পড়ল।

তখন দেখতে পেল মিনির কোলে ছোট্ট শানু হাত-পা ছুড়ছে।

জিশান একগাল হেসে শানুকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে আছড়ে পড়ল জিশানের চোয়ালে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল জিশান। মনে হল ওর চোয়ালটা বেঁকে গেছে।

অনেক চেষ্টা করে চোখ খুলতে পারল ও। দৃষ্টি ঝাপসা। শুধু কানে আসছে লোহার ঠনঠন শব্দ আর টুকরো-টুকরো চিৎকার।

আশেপাশে ঝুলন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের তীব্র লড়াই চলছে।

জিশান হাঁপাতে লাগল। যে-করে-হোক মিনি আর শানুর কাছে ওকে ফিরতে হবে—ফিরতেই হবে।

জিশান টের পেল, ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে গোঁফের ওপর, তারপর ঠোঁটে, তারপর থুতনির দিকে।

জিভ বের করে ঠোঁট চাটল। এতদিনের শোনা কথাটা সত্যি প্রমাণ হল: রক্তের স্বাদ নোনা।

চোখের পলকে কী একটা হয়ে গেল জিশানের ভেতরে। শিবপদ হঠাৎই যেন কার্তিক হয়ে গেল।

ডানহাত ওপরে তুলে শিকলটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল জিশান। তার ঠিক ওপরেই ছিল গাড়ির স্টিয়ারিং-এর মতো একটা লোহার চাকতি। শিবপদর মাথাটা যে চাকতি বরাবর সেটা জিশান খেয়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ-হাতে শিবপদর গেঞ্জি খামচে ধরল জিশান। আর প্রবল শক্তিতে ডানহাত চালিয়ে লোহার চাকাটা ভয়ংকরভাবে ঠুকে দিল শিবপদর মাথায়।

কিছু একটা ফেটে যাওয়ার শব্দ হল। শিবপদর মাথার একপাশটা হাঁ হয়ে গেল। ঠিক যেন স্টেজের কালো পরদা সরে গিয়ে ভেতরের কুশীলবদের দেখা গেল। ওরা সবাই লাল পোশাক পরে রয়েছে।

শিবপদর চোখ উলটে গেল। শিকল থেকে ওর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। ওর লম্বা দেহটা চিত হয়ে নীচে পড়তে লাগল।

জিশানের মনে হল, ও স্লো মোশানে কোনও সিনেমা দেখছে।

অবলম্বনহীন শিবপদ শূন্যে হাত-পা ছড়িয়ে নীচে পড়ছে-তো-পড়ছেই।

যেখানে ওদের লড়াই চলছিল সেখান থেকে মেঝেটা প্রায় বিশ ফুট নীচে। অভিকর্ষের টানে সেই দূরত্ব পেরোতে শিবপদর যেন একশো বছর লাগল। তারপর ওর ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল জিমের মেঝেতে। পড়ে খানিকটা লাফিয়ে উঠল। আবার পড়ল। মাথাটা এপাশ-ওপাশ খানিকটা নড়ল। তারপর সব শেষ।

জিশানের মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। তবে শুনে মনে হল, চিৎকারটা ওর মুখ থেকে বেরোয়নি—বেরিয়েছে কোনও জন্তুর মুখ থেকে।

জিশান ভেবে অবাক হল যে, আওয়াজটার কোনও সঠিক চরিত্র নেই। ওটা দু:খের, হতাশার, নাকি জয়ের জিগির—জিশান কিছুই বুঝতে পারল না।

ও ঘামছিল, হাঁপাচ্ছিল। তাকিয়ে ছিল নীচে পড়ে থাকা শিবপদর শরীরটার দিকে।

ওর হলদে গেঞ্জিতে লালের ছোপগুলোকে বাটিকের প্রিন্ট বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটার দু-চোখ বন্ধ—মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুতভাবে হাত-পা ছড়িয়ে হঠাৎই ঘুমিয়ে পড়েছে।

জিশান কেঁদে ফেলল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল ওর। কিল গেম-এর দিকে ও একধাপ এগিয়ে গেছে। একইসঙ্গে মানুষ থেকে পশুর দিকেও।

এইভাবে ধাপে-ধাপে ও কিল গেম-এর জন্য তৈরি হবে, আর ধাপে-ধাপে হিংস্র পশু হয়ে উঠবে। হায় ভগবান!

জিশান কাঁদতে-কাঁদতেই শিকল বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল। আশেপাশে তখনও ঝনঝনাৎ শব্দ উঠছে, শোনা যাচ্ছে হিংস্র চিৎকার। লড়াই চলছে পুরোদমে।

শিকলের শেষ প্রান্তে এসে লাফ দিল জিশান। এসে পড়ল শিবপদর পাশে।

এমনসময় ভারী অথচ ভোঁতা একটা শব্দ জিশানের কানে এল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

দূরের একটা শিকল থেকে খসে পড়েছে একজন প্রতিযোগী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন শিকল ধরে ঝুলছে। বিজয়ের উল্লাসে চিৎকার করে এক হাত ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে।

আরও একজনের ভাগ্যরেখা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। বিষণ্ণভাবে ভাবল জিশান। তারপর শিবপদর দেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'শিবপদ! শিবপদ!'

কোনও সাড়া নেই।

'শিবপদ!' কান্না-ভাঙা গলায় আবার ডাকল জিশান।

তখনই শিবপদর গলা থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ওর মাথাটা নড়ে উঠল।

জিশান আরও ঝুঁকে পড়ল শিবপদর ওপরে। দু-হাত দু-গালে চেপে ওর রক্তাক্ত মুখটাকে সোজা করে ধরল। শিবপদকে কি এখন মালিকের মতো দেখাচ্ছে?

নিয়তির এ কী অদ্ভুত মায়া! একই মানুষ—কখনও সে কার্তিক, কখনও মালিক।

জিশানের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ও মমতা ভরা গলায় ডাকল, 'শিবপদ! শুনছ?'

শিবপদর বোজা চোখ সামান্য ফাঁক হল। ধ্যানমগ্ন শিবের মতো দেখাচ্ছিল ওকে।

জিশান আবার ডাকল।

শিবপদ এবার বিড়বিড় করে কথা বলল।

'আমার বাড়ি বরানগরে...একচালা ঘরে...থাকতাম।' হাঁ করে কয়েকবার দম নিল শিবপদ। ওর বুকটা ওঠা-নামা করল। তারপর জিশানকে খামচে ধরল।

জিশান দেখল, ওর চোখ আরও খুলে গেছে, কিন্তু চোখের উজ্জ্বল ভাব কমে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে। শিবপদ ঠিক যে কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

'জি-জিশান...আমার ছোট বোন আছে...ভাই আছে...মা আছে... আর...আর হাঁ-করা অভাব আছে। দু-বেলা খাবার জুটত না আমাদের...।'

কথা বলতে-বলতে শিবপদ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছিল। কে জানে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ওর হাড়গোড় কতটা ভেঙেছে!

জিশান ওর কপালে হাত বোলাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কপালের একপাশটা রক্তে মাখামাখি—ভালো করে হাত বোলানো যাচ্ছে না। কান্নার দমক উথলে উঠল জিশানের বুকের ভেতর থেকে। এই রক্তাক্ত কপাল জিশানের দান। নিজের প্রতি ঘেন্নায় বমির ওয়াক উঠতে চাইল। দেখল, শিবপদকে ঘিরে কয়েকটা মাছি উড়ছে, রক্তের ওপরে বসছে—আবার উড়ে এসে বসছে জিশানের গায়ে।

শিবপদ ঘোলাটে চোখে জিশানকে ফোকাস করতে চাইল। বলল, 'কেঁদো না...এ তো হতই...হয় তুমি...নয় আমি...।' আবার দম নেওয়ার জন্য থামল শিবপদ। বড়-বড় শ্বাস টেনে বলল, 'একদিন...একদিন দেখি...স্টেশানে...আমার ভাই আর বোন ভিক্ষে করছে। আমাকে দেখেই...দে ছুট...।'

'আর কথা বোলো না। চুপ করো। আমি ওদের ডাক্তার ডাকতে বলছি—।'

'না! ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক এসে গেছে—।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল শিবপদ। খামচে ধরল জিশানের কোমর।

জিশানের ব্যথা করছিল। ও মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সিকিওরিটি গার্ড।

জিশান চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে, শুনছেন! একজন ডাক্তার ডাকুন—একে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন!'

পিস ফোর্সের গার্ডটি জিশানের দিকে একবার দেখল। তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে রোবটের ঢঙে দাঁড়িয়ে রইল।

শিবপদ আবার কথা বলল।

'সেইদিন...সেইদিন ঠিক করলাম...কিছু একটা আমাকে...আমাকে...করতে হবে। তাই...তাই...কিল গেম...একশো কোটি টাকা...।' এইবার কেঁদে ফেলল শিবপদ। কয়েকবার হেঁচকি তুলল। তারপর অত্যন্ত নিচু পরদায় বলল, 'আমার...আমার গলার... চেনটা...মাকে দিয়ো। ওদের...ওদের আর কেউ রইল না...রইল না।'

জিশান বলতে পারল না, 'আমি তো আছি!' কারণ, ও জানে না শেষ পর্যন্ত ও থাকবে কি না। ও হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করল।

শিবপদ কথা বলার ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছিল। হঠাৎই ও মরণ খিঁচুনিতে জিশানকে আঁকড়ে ধরল।

জিশান আকুল হয়ে ওর নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল।

কিন্তু কোনও সাড়া নেই। ঘোলাটে চোখ তাকিয়ে আছে জিমের সিলিং-এর দিকে।

জিশান শিবপদকে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। লক্ষ করল, শিবপদর চোখের পাতা পড়ছে না। আর ঠিক তখনই একটা মাছি গিয়ে বসল শিবপদর খোলা চোখের ওপরে।

এবারেও শিবপদর চোখের পাতা পড়ল না।

বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ফেলল জিশান। শিবপদর ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর গলার চেনটা খুলে নিল। জিশান ওর বাড়ি চেনে না। তা হলে কী করে ওর মাকে গিয়ে চেনটা দেবে? কিন্তু তবুও এটা থাক ওর কাছে। স্মৃতি হিসেবে।

শিবপদকে ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। ঝাপসা চোখে দেখল, শূন্য শিকলগুলো ঝুলছে। তার মধ্যে কয়েকটা তখনও পেন্ডুলামের মতো অলসভাবে দুলছে। তিনজন প্রতিযোগী জিমের মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর বাকি পাঁচজন জিমের একপাশে ইনস্ট্রাকটরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে মনোহরও রয়েছে। জিশানের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ও বোঝাতে চাইল, ও জিতেছে।

অবজার্ভার তিনজন এখন একজায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের ল্যাপটপের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করছিল। এ-ওর কম্পিউটারের পরদায় উঁকি মারছিল।

জিশান হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল, প্যান্টে হাত ঘষে হাতের রক্ত মুছল। তারপর চেনটা পকেটে গুঁজে শ্রান্ত পা ফেলে এগোল মনোহরদের দিকে।

যেতে-যেতে শিবপদর মৃতদেহের দিকে একবার ফিরে তাকাল জিশান। শিবপদর ছোট বোন আর ছোট ভাইটার কথা একঝলক মনে পড়ল। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। শিবপদ ঠিকই বলেছিল, জিপিসিতে এসে আলাপ করলেই ঝামেলা বাড়বে। কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই পাপ।

এমনসময় স্পিকারে ইনস্ট্রাকটরের গলা শোনা গেল।

কারা-কারা এই ডিজিটাল কমপিটিশানে কোয়ালিফাই করেছে তাদের নাম শোনা গেল।

প্রথমেই জিশান পালচৌধুরী, তারপর মনোহর সিং—আর সবশেষে রণজিৎ পাত্র।

নাম ঘোষণার পর ওদের তিনজনকে একপাশে লাইন করে দাঁড়াতে বলা হল। তখন জিশান রণজিৎকে ভালো করে দেখল।

কালো দশাসই চেহারা। মোটা গোঁফ। সবকিছুতেই গলা ফাটিয়ে হা-হা করে হাসে। মাথায় চুল কম। মাঝখানটায় তো রীতিমতো টাক পড়ে গেছে।

ব্যায়াম করার সময় জিশানের সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে। ওর মুখে সবসময় একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। তা ছাড়া ব্যায়ামের যন্ত্রের একটু-আধটু দখল নিয়ে এর-তার সঙ্গে ঝগড়া আর খিচখিচ করছিল।

ছেলেটাকে দেখে জিশানের কেন জানি না ভালো লাগেনি। তাই আলাপ বেশি দূর গড়ায়নি ও।

ওরা তিনজন একপাশে লাইন করে দাঁড়াতেই বাকি তিনজন ঈর্ষার চোখে ওদের দেখতে লাগল।

স্পিকারে ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশ শোনা গেল।

'গার্ডস, যারা উন্ডেড কিংবা ফিনিশড তাদের বডি সরিয়ে ফ্যালো—কুইক।'

সঙ্গে-সঙ্গে রোবট গার্ডগুলো নড়েচড়ে উঠল। যান্ত্রিক দক্ষতায় কাজ শুরু করল।

জিমের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে সার বেঁধে অনেকগুলো ফর্ক লিফট দাঁড়িয়ে ছিল। একজন গার্ড পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফোন করতেই চারটে ফর্ক লিফট গড়গড় করে এগিয়ে এল। ওদের সামনের চাকার ঠিক ওপরে দুটো লম্বা স্টিলের পাত চামচের মতো সামনে বাড়ানো। চারজন ফর্ক লিফট অপারেটর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে মেঝেতে পড়ে থাকা দেহগুলো চটপট তুলে নিল স্টিলের পাতের ওপরে। তারপর চারটে যন্ত্র সার বেঁধে বেরিয়ে গেল জিম থেকে। দুজন গার্ড তার পিছন-পিছন দৌড়ল।

একমিনিটেরও কম সময়ে দেহ এবং মৃতদেহ—সবই সরিয়ে ফেলল ওরা।

তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ছোট হুড খোলা সাদা গাড়ি ঢুকে পড়ল জিমে। গাড়িটার গায়ে বড় হরফে একটা লাল রঙের যোগচিহ্ন আঁকা। তার নীচে ছোট করে লেখা 'মেডিকেল ইউনিট'।

সাদা গাড়ি থেকে নেমে এল দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ওদের হাতে ডাক্তারি বাক্স। ওরা চটপট জিশান, মনোহর আর রণজিতের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করল।

পাঁচ কি সাতমিনিট—তার মধ্যেই ওদের কাজ শেষ। তারপর ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল জিম থেকে।

জিশানের হঠাৎই খেয়াল হল, মেডিকেল ইউনিটের কেউই কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

ইনস্ট্রাকটর এবার একটা কম্পিউটার প্রিন্টআউট দেখে বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশানস, জিশান। কনগ্র্যাচুলেশানস, মনোহর। কনগ্র্যাচুলেশানস, রণজিৎ। আপনারা কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডের প্রথম খেলায় কোয়ালিফাই করলেন। এই প্রিলি রাউন্ডের প্রথমটায় কোয়ালিফাই করার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে সুপারগেমস কর্পোরেশন দেবে তিরিশ হাজার টাকা। আপনারা এখন গেস্টহাউসে ফিরে যাবেন। আপনাদের যা ডেইলি রুটিন সেটাই কনটিনিউ করবেন। সেকেন্ড রাউন্ডের গেম যখন শিডিউলড হবে তখন আপনাদের সব ডিটেইলস অন-লাইনে জানিয়ে দেওয়া হবে। এনি কোয়েশ্চেনস?'

কথা শেষ করে প্রশ্ন করলেন ইনস্ট্রাকটর।

জিশানরা সবাই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : না, ওদের কোনও প্রশ্ন নেই।

'ও.কে., থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর পার্টিসিপেশান। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট!'

আবার উইশ! এটাকে উইশ না বলে ডেথউইশ বলাই ভালো। ভাবল জিশান।

•

জিশানের মাইক্রোভিডিয়োফোনের ছোট রঙিন পরদায় মিনির ছবি ভেসে উঠতেই বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল ও।

মিনি 'হ্যালো' বলতেই জিশানের বুকের ভেতরে খুশির বাজনা বেজে উঠল। ও ফোনটা পরম আদরে গালে চেপে ধরল। তারপর ধরা গলায় জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

মিনি বলল, 'একটুও ভালো নেই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না—।'

জিশান মোবাইল ফোনটা চোখের সামনে ধরল।

পরদায় মিনি কাঁদছে, ওর চোখ থেকে মুক্তো গড়িয়ে পড়ছে।

জিশান জিগ্যেস করল, 'শানু কেমন আছে?'

'ও ভালো আছে। ও এখন ছোট...কিছু বোঝে না...তাই ভালো আছে।' কান্না চেপে মিনি বলল। তারপর ওর ফোনের ক্যামেরাটা শানুর দিকে তাক করে ধরল।

ছবিতে ছেলেকে দেখতে পেল জিশান। ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে গুঁজে দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জিশানের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কবে আবার ওকে কোলে নিতে পারবে কে জানে!

'ওরা কখন ফোন দিয়ে গেল তোমাকে?'

'এই তো, আজ সকালে—।'

শ্রীধর পাট্টা তা হলে কথা রেখেছেন! জিশান চলে আসার দু-দিন পরে হলেও ফোনটা দিয়েছেন!

সিন্ডিকেট হেডকোয়ার্টার থেকে জিপিসিতে আসার পর শ্রীধর জিশানকে এই এমভিপি সেটটা দিয়েছেন। তখন থেকেই জিশান মিনিকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে—কিন্তু পাচ্ছে না। এখন বুঝতে পারল কানেকশান না পাওয়ার কারণ।

তারপর মিনিকে অনেক কথা বলল জিশান। ওর দিন-রাতের জীবনের খবর নিল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

মিনিও অনেক কথা বলল জিশানকে। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'কিল গেম-এ তোমাকে জিততে হবে। আমি এখন টিভিতে সবসময় কমপিটিশানগুলো দেখছি। ওরা মাইক্রোভিডিয়োফোনের সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্লেট টিভিও দিয়ে গেছে বাড়িতে।'

জিশান রোজ কী করছে সে-কথা জানতে চাইল মিনি। জিশান সময় নিল। ধীরে-ধীরে সব বলল মিনিকে।

জিশানের মনে পড়ে গেল ডিজিটাল জিমের ইনস্ট্রাকটরের কথা : গেস্টহাউসে ফিরে এসে ডেইলি রুটিন কনটিনিউ করতে বলেছেন তিনি।

এখানে আসার পর থেকে এদের ডেইলি রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে জিশান।

ভোর ঠিক ছ'টায় একটি সুরেলা মেয়েলি গলা জিশানকে নাম ধরে ডাকে—ওর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত ডেকেই চলে।

বিছানায় উঠে বসামাত্রই চোখ পড়ে দেওয়ালে লাগানো প্লেট টিভির রঙিন পরদায়। সেই পরদায় একজন সুন্দরী মেয়ের মুখ—ঠোঁটে ওর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের হাসি। এই মেয়েটিই জিশানকে ডাকছিল।

জিশানের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলেছে, 'গুড মর্নিং, জিশান। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও। শার্প ছ'টা পনেরোয় ওয়ার্কআউট—প্রথম অ্যানালগ জিমে, তারপর আউটডোরে। আজ ঠিক সওয়া ন'টায় তোমার ওয়ার্কআউট শেষ হবে। তারপর...।'

জিশান অবাক হয়ে মেয়েটিকে দ্যাখে। এমনভাবে ও কথা বলছে যেন ওর ঘরেই সশরীরে হাজির রয়েছে। আসলে এই ঘরে কোথাও একটা লুকোনো ক্যামেরা রয়েছে। সেই ক্যামেরার চোখ প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ রাখছে জিশানের ওপরে। এবং ওর ছবি নির্ঘাত পৌঁছে যাচ্ছে জিপিসির কন্ট্রোল রুমে। সেখানেই হয়তো বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

এখানে গেস্টহাউসে যে-ক'জন প্রতিযোগী আছে তাদের সকলের জন্যই একইরকম নজরদারির ব্যবস্থা। সেটা জিশান অন্যদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে।

ঘরের প্লেট টিভিটার সঙ্গে লাগানো রয়েছে ব্ল্যাক কিবোর্ড। অর্থাৎ, দরকারে ওই টিভি পরদাই হয়ে যেতে পারে কম্পিউটারের মনিটর। এবং জিশান ওর যত রাজ্যের প্রশ্নের চটজলদি উত্তর পেয়ে যেতে পারে চব্বিশ ঘণ্টার হেলপলাইনে।

যে-জিমে শুধু ব্যায়াম-ট্যায়াম করা হয় তাকে বলা হয় অ্যানালগ জিম। অ্যানালগ জিমেই শিবপদর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল জিশানের।

অ্যানালগ জিমে একঘণ্টা ব্যায়ামের পর আধঘণ্টা বিশ্রাম। তখন ওদের ফলের রস, কাজুবাদাম, গ্লুকোজ, ওট মিল এসব খেতে দেওয়া হয়। সেসময় চার-পাঁচজন ছেলে ওদের পরিচর্যা করে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দেয়, হাত-পা টিপে দেয়। তাদের নাম 'জিম বয়'।

অ্যানালগ জিমে জিম বয় ছাড়াও আছে 'জিম গার্ল'। ওরা প্রতিযোগীদের খাওয়া-দাওয়ার দিকটা দ্যাখে আর টুকটাক ফাইফরমাশ খাটে।

বিশ্রাম শেষ হলে আউটডোর ওয়ার্কআউট।

কতরকম অভিনব ব্যবস্থা সেখানে! মাঠের ওপরে দৌড় প্র্যাকটিস, তারপর বালির ওপরে দৌড়, আর সবার শেষে জলের ওপরে দৌড়।

জলের ওপরে দৌড় বলতে একটা বিশাল মাপের চৌবাচ্চা। তার একপ্রান্তে দাঁড়ালে অন্য প্রান্তের মানুষকে এত ছোট দেখায় যে, ভালো করে চেনা যায় না। চৌবাচ্চায় দেড় ফুট মতন জল আছে। প্রতিযোগীদের সেই জল ভেঙে দৌড়তে হয়। কিছুক্ষণ দৌড়নোর পর বিশ্রাম—তারপর আবার দৌড়।

ব্যায়ামের পর্ব শেষ হলে গেস্টহাউসের ঘরে ফিরে আসে জিশান। শীতাতপ ঘরগুলোর ব্যবস্থা এমনই যে, ফাইভ স্টার হোটেলকেও হার মানায়। সেই ঘরের আরামে কাটে ঘণ্টাখানেক। তারপর টিভিতে পাওয়া নির্দেশ অনুসারে যেতে হয় লেকচার হলে। সেখানে রোজই একজন করে অভিজ্ঞ বক্তা আসেন—ভিডিয়ো

ফিল্ম দেখিয়ে আর্মড কমব্যাট আর আনআর্মড কমব্যাট শেখান। তারই মধ্যে শেখানো হয় কতরকমের আর্মস আর অ্যাম্যুনিশানস আছে—কীভাবে কোন-কোন পরিস্থিতিতে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। আরও শেখানো হয় গেরিলা যুদ্ধ।

সবচেয়ে জিশানের যেটা অবাক লাগে সেটা হল, কখনও কোথাও কিল গেম-এর নাম করতে চায় না কেউ। এমনকী ইনশিয়োরেন্সের ফর্ম ফিল-আপ করার সময়েও কিল গেম না লিখে নির্দেশমতো লিখতে হয়েছিল হাই রিসক গেম। শুধুমাত্র বন্ড সই করার সময় কিল গেম নামটা ফর্মে দেখতে পেয়েছিল জিশান।

লেকচার হলে ক্লাস শেষ হলে জিশানরা ফিরে আসে গেস্টহাউসে। খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়। তারপর বিকেলে যায় মাঠে খেলতে। সেখানে ভলিবল কিংবা ফুটবল খেলা হয়—নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ারকি চলে। তবে না চাইলেও কারও-কারও সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ জমে যায়।

কথা বলে জিশান জেনেছে, পার্টিসিপ্যান্টদের সকলের রেজিস্ট্রেশান কিল গেম-এ নয়। অন্যান্য গেম-এও অনেকের রেজিস্ট্রেশান রয়েছে। তবে যেহেতু সব খেলাতেই বডি স্কিল দরকার সেহেতু অ্যানালগ জিম, আউটডোর ওয়ার্কআউট, খেলাধুলো—এগুলো সকলের জন্য।

সন্ধেবেলা জিশানদের শিডিউল হল ফিল্ম শো। জিপিসির এ.সি. অডিটোরিয়ামে সন্ধেবেলা যত রাজ্যের অ্যাকশান ফিল্ম দেখানো হয়। পুরোনো আমলের অ্যাকশান ফিল্মও নিয়ে আসা হয় ফিল্ম আর্কাইভ থেকে।

এই ফিল্মগুলো দেখার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার জিশান লক্ষ করেছে। যে-কোনও অ্যাকশান সিকোয়েন্স দেখানো হয়ে যাওয়ার পরই সেটাকে আবার স্লো-মোশানে দেখানো হয়। যাতে অ্যাকশান দৃশ্যের খুঁটিনাটি সব দর্শক ভালো করে বুঝতে পারে।

সিনেমা দেখার পালা শেষ হলে কিল গেম পার্টিসিপ্যান্টদের জন্য দিনের শেষ প্রোগ্রাম আর্মস একজিবিশান অ্যান্ড ট্রেনিং। আর্মস একজিবিশানে নানান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয়। সেগুলো কেমন করে কাজ করে সেটাও দেখিয়ে দেয় একজন ডেমনস্ট্রেটার। তার পাশেই থাকে একান্ন ইঞ্চি পরদার প্লেট টিভি। ডেমনস্ট্রেটারের ডেমো শেষ হলে টিভির পরদায় অডিয়োভিশুয়াল ডেমো শুরু হয়। তাতে দরকার মতো ক্লোজ-আপ ছবি থাকে। কারও বুঝতে অসুবিধে হলে অসুবিধের জায়গাটা রিপ্লের ব্যবস্থা আছে।

লাইভ ডেমো আর টিভি ডেমো শেষ হলে শুরু হয় হ্যান্ডস-অন ট্রেনিং। জিশানদের নিয়ে যাওয়া হয় শুটিং রেঞ্জে। সেখানে একটি ঘণ্টা ঘাম-ঝরানো ট্রেনিং-এর পর ওদের ছুটি। তখন জিশানরা গেস্টহাউসের ঘরে বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। প্লেট টিভিতে নানারকম হালকা এবং মজার প্রোগ্রাম দ্যাখে। তারপর রাতের খাওয়া এবং ঘুম।

জিশানদের একটা দিন শেষ।

সব শোনার পর মিনি বলল, 'জিশান, ভাবতে কী অবাক লাগে, না? মানুষকে কীভাবে মারতে হয় সেটা শেখানোর জন্যে এত চেষ্টা, এত খরচ!'

'মিনি, এখানে বাঁচা শিখতে হলে মারতে শিখতে হয়। ফিরে গিয়ে তোমাকে আমি শিবপদর কথা শোনাব।'

'কে শিবপদ?'

'একজন কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট...ও মারা গেছে...আজ সকালে... আমার হাতে...।' জিশানের গলা ভেঙে গেল।

'কী বলছ তুমি! তোমার হাতে মারা গেছে! তুমি খুনি হয়ে গেছ!'

'হ্যাঁ, মিনি, হ্যাঁ। ওকে না মারলে ও আমাকে মেরে ফেলত। তুমি আমার সঙ্গে এমভিপিতে আর কথা বলতে পারতে না...।' জিশান শত চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পর ও নরম গলায় জিগ্যেস করল, 'মিনি, তুমি চাও না আমি তোমার কাছে ফিরে যাই? তুমি চাও না, ছোট্ট শানু দু-হাত সামনে বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক আমার কোলে?'

'হ্যাঁ—চাই, চাই, চাই!' উত্তেজিতভাবে কথা বলতে গিয়ে মিনির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

মাথা নিচু করে জিশান বলল, 'যদি তাই চাও, তা হলে আমাকে খুনি হতে হবে। বেশ কয়েকজনকে খতম করতে হবে। তুমি জানো না, কিল গেম-এ সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর মাত্র 0.07 খুব উঁচুদরের খুনি না হলে এ-খেলা থেকে বেঁচে ফেরা ইমপসিবল। তোমার আর শানুর জন্যে আমাকে হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করতে হবে...।'

'তাই করো...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মিনি, '...পরের খেলাগুলোয় জেতার চেষ্টা করো। তোমার আজকের খেলাটা টিভি পাইনি বলে দেখতে পারিনি। পরেরগুলোর লাইভ টেলিকাস্ট দেখব। তুমি মনে রাখবে, আমি তোমার গেম শো দেখছি। মনে রাখবে তো? তোমাকে জিততেই হবে, জিশান...।' কেঁদে ফেলল মিনি। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। নিজেকে সামলে নিতে সময় নিল কিছুক্ষণ। তারপর গোটা-গোটা চোখ মেলে তাকাল জিশানের দিকে। ইতস্তত করে বলল, 'এই জঘন্য ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ করা যায় না?'

'কে জানে! হয়তো যায়। কিন্তু অভাব আর লোভ বড় অদ্ভুত কম্বিনেশান। ওল্ড সিটির মানুষরা এত অভাবের মধ্যে আছে...তার ওপর দিন-রাত প্লেট টিভিতে ওদের লোভ দেখানো হচ্ছে। দিনকেদিন আমাদের অবস্থাটা খুব কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে...।'

'কিছু একটা করা যায় না?' ফিসফিস করে জিগ্যেস করল মিনি।

জিশানের মনে হল, প্রশ্নটা মিনি ওকে করেনি—বরং ছুড়ে দিয়েছে সকলের দিকে।

ও বলল, 'দশমিনিট হয়ে গেছে, মিনি। রাখছি। নইলে ওরা মাঝপথে কানেকশান অফ করে দেবে। ভালো থেকো...।'

মিনি কিছু বলার আগেই কানেকশানটা সত্যি-সত্যি অফ হয়ে গেল।

জিপিসিতে প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য এমভিপিতে কথা বলার রোজকার বরাদ্দ সময় মোট দশমিনিট। কেউ যদি একমিনিট করে কথা বলে, তা হলে দিনে সে দশবার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। তবে জিশানের পছন্দ একসঙ্গে দশমিনিট খরচ করা। তাতে ও মিনির কাছাকাছি আসার তৃপ্তি পায়।

ফোনটা কেটে যেতেই সারা দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল জিশানের ওপরে। একইসঙ্গে ও যেন জিপিসির বাস্তবে ফিরে এল।

আরাম দিয়ে ঘেরা হারাম বাস্তব।

•

বিকেলে খেলাধুলোর সময় জিশান চুপচাপ মাঠের একপাশে বসে ছিল।

বিশাল মাঠকে ঘিরে বিমূর্ত জ্যামিতিক ধাঁচের অনেকগুলো লম্বা-লম্বা বাড়ি। তার মধ্যে একটা জিশানদের গেস্টহাউস।

কাচ বা আয়নায় ঢাকা সুন্দর ছাঁদের বাড়ি ছাড়াও রয়েছে সাজানো বাগান আর দিঘি। ওপরের নীল আকাশে কখনও-কখনও চোখে পড়ছে শিস দিয়ে উড়ে যাওয়া শুটার।

সবমিলিয়ে জায়গাটা এত সুন্দর যে, ওল্ড সিটির কোনও বাসিন্দার কাছে এসব নেহাতই স্বপ্ন। তবে সেই স্বপ্নের আড়ালে রয়েছে মৃত্যুর গন্ধ।

জিশান জানে, যতই সাজানো-গোছানো হোক, ব্যাপারটা আসলে আধুনিক জেলখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গত দু-দিন ধরে জিশান কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। বুঝতে চাইছিল, আর ক'জন প্রতিযোগী এখনও কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডে রয়েছে। আর্মস একজিবিশান অ্যান্ড

ট্রেনিং প্রোগ্রামে আরও জনাদশেক ছেলেকে ও দেখেছে—কিন্তু ওরাই কি সব? ওদের মধ্যে রণজিৎ পাত্র আর মনোহর সিং-কে ও চেনে। বাকিদের নাম-ধাম পরিচয় কিছুই জানে না।

মাঠের ধারে বসে খেলোয়াড়দের মুখগুলো লক্ষ করছিল ও। সকলের মুখেই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যেন খেলাটাই ওদের জীবন।

মনোহর আর রণজিৎ ফুটবল খেলছিল। খেলতে-খেলতে মনোহর বারবার তাকাচ্ছিল জিশানের দিকে—হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছিল। আর জিশান হাত নেড়ে ইশারা করে বোঝাছিল যে, না, ওর খেলতে ভালো লাগছে না।

জিশানের কাছাকাছি একজন গার্ড পাথরের মতো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আবার একইসঙ্গে খুব নিচু গলায় গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছিল।

ব্যাপারটা জিশানকে অবাক করেছিল, কারণ এ ক'দিনে পিস ফোর্সের গার্ডগুলোকে ও রোবট বলে ভাবতে শিখেছে। ওরা তা হলে মানুষ! শখ করে গান গায়!

জিশান গার্ডটাকে ভালো করে দেখল।

মেদহীন টান-টান শরীর। ফরসা। বয়েস তেইশ কি চব্বিশ। গাল দুটো সামান্য বসা। কালো আর সোনালি ইউনিফর্মে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। কোমরে ঝোলানো নীল রঙের শকার বিকেলের আলোয় ঝকঝক করছে।

গার্ডটা সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ একটুও না ঘুরিয়ে ও আড়চোখে জিশানের দিকে তাকাল। গুনগুন থামিয়ে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী? শরীর খারাপ?'

জিশান বলল, 'না—।'

'তা হলে? খেলছ না?'

'খেলতে ভালো লাগছে না।'

'কী করে ভালো লাগবে? সামনে বিপদ...।'

জিশান অবাক চোখে গার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল। পিস ফোর্সের একজন গার্ড জিশানদের বিপদ নিয়ে ভাবে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গার্ডটা বলল, 'তোমার আসল খেলার ডেট কবে?'

'এখনও জানি না।'

'কোন খেলায় নাম দিয়েছ?'

'কিল গেম।' একটু থেমে জিশান আবার যোগ করল, 'আমি নাম দিতে চাইনি। ওরা জোর করে নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে...।'

'জানি।' গার্ডটা একচিলতে বিষণ্ণ হাসল : 'ওরা এইরকমই করে—সবাইকেই। তোমার বাড়িতে কে-কে আছে?'

জিশান বলল।

শুনে গার্ডটা জিশানের দিকে একবার তাকাল, তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল সামনের দিকে।

ঠিক তখনই মনোহরদের ফুটবলটা লাফাতে-লাফাতে চলে এল জিশানের কাছাকাছি। জিশান উঠে গিয়ে বলটা ধরে ফেলল।

একটা ছেলে ছুটতে-ছুটতে এল জিশানের কাছে। বলটার জন্য হাত বাড়াল। জিশান বলটা ওকে ছুড়ে দিল।

হাঁপাতে-হাঁপাতে 'থ্যাঙ্কস' বলল ছেলেটা। তারপর বলটা হাতে নিয়ে ছুটে চলে গেল 'থ্রো-ইন' করতে।

গার্ডটা আড়চোখে একবার দেখল জিশানের দিকে। জিশান এখন ওর অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে ওর দিকেই।

গার্ডটা বলল, 'কেয়ারফুল। এখানে নানান জায়গায় লুকোনো ক্যামেরা লাগানো আছে। ওদের নজরকে ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

এ-কথায় জিশান অন্যদিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু গার্ডটার সঙ্গে দূরত্ব কমাল না। হয়তো কথায়-কথায় ওর কাছ থেকে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তাতে লাভ কতটুকু হবে জিশান জানে না—তবে কৌতূহল খানিকটা মিটবে।

গার্ডটা চাপা গলায় বলল, 'তুমি যদি শেষ পর্যন্ত ছেলের কাছে ফিরে যেতে পারো তা হলে সেটা ফ্যানট্যাসটিক ব্যাপার হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ—।' একটু থেমে তারপর : 'কেউ কি ফিরে যেতে পেরেছে আজ পর্যন্ত?'

'আমি তো কাউকে দেখিনি। আমার চাকরি প্রায় পাঁচবছর হয়ে গেল...।'

'ওরা যে বলছে, কিল গেম-এ সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07—মানে, একশোজনের মধ্যে সাতজন বেঁচে যায়...।'

গার্ড হেসে ফেলল : 'ওদের সবকথা তুমি বিশ্বাস করো নাকি! আইনের মারপ্যাঁচ বুঝে-শুনে তারপর ওদের অফিশিয়াল গেমস প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। শ্রীধর পাট্টা—আমাদের পিস ফোর্সের মার্শাল—লোকটা একটা কসাই। তার ওপরে মহা ধুরন্ধর। ওই সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টরটা যদি আসলে 0.0 হয় তা হলেও আমি অবাক হব না।'

গার্ড বলে কী!

জিশানের খুব ইচ্ছে করল, গার্ডটার দিকে ঘুরে তাকায়, এ নিয়ে আরও প্রশ্ন করে। কিন্তু লুকোনো ক্যামেরার কথা ভেবে পারল না। রাগে ওর চোয়াল শক্ত হল শুধু।

গার্ড আবার বলল, 'তুমি মন খারাপ কোরো না। আমি ফস করে সত্যিটা বলে ফেললাম। কিল গেম-এ কেউই খুব একটা আশা নিয়ে আসে না। তবে সিন্ডিকেট চায় লড়াইটা খুব জমে উঠুক। তা হলে লড়াই চলবে অন্তত পনেরো কি কুড়ি ঘণ্টা। তাতে পাবলিকের যেমন বেশিক্ষণ ধরে এনটারটেইনমেন্ট হবে, তেমনই বিজ্ঞাপনের ইনকাম অনেক বেড়ে যাবে।' গার্ড নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করল : 'বুঝলে, এরা সবকিছু পয়সা দিয়ে মাপে। এমনকী দোকানে মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনতে গেলে বলে না ''এক লিটার কি দু-লিটারের বোতল দাও।'' বলে, ''ষাট টাকার জল দাও।'' নয়তো ''একশো টাকার জল দাও।'' স্কুল-কলেজেও সেইরকমই শেখায়। অসহ্য!'

'অসহ্য লাগছে তাও এখানে চাকরি করছ?'

'হ্যাঁ, করছি। দু-বেলা খেতে হবে তো! নিউ সিটিতে সিন্ডিকেটই শেষ কথা। আমাকে ওরা চাকরি দিয়েছে। মাসে-মাসে মাইনে পাচ্ছি, খেতে-পরতে পাচ্ছি—ব্যস। চাকরিটা না করলে হয়তো আমাকে ওল্ড সিটিতে গিয়ে দু-বেলা অভাবের মধ্যে কাটাতে হত।'

জিশান বলল, 'ওল্ড সিটিতে অভাব আছে—কিন্তু স্বাধীনতাও আছে।'

'হুঁ:!' ব্যঙ্গে ঠোঁট বেঁকাল গার্ড : 'স্বাধীনতা! সেটা আবার কী—গায়ে মাখে, না মাথায় দেয়? এখানে চাকরি করতে-করতে তোমার মতো অনেক স্বাধীন নাগরিককেই তো দেখলাম! একটার-পর-একটা চোখের সামনে খরচ হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বেঁচে ফিরছে, সেগুলো কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা জিতে নিউ সিটিতে থেকে যাচ্ছে—সিন্ডিকেটের পোষা কুকুর হয়ে যাচ্ছে।'

'এর কি কোনও শেষ নেই?' বিভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করল জিশান।

'কী করে শেষ হবে! সবাই তো ভগবানের ভরসায় বসে আছে। ভগবান ওখানে আছে কি না আমি জানি না—' ছোট্ট ইশারা করে আকাশের দিকে আঙুল তুলল গার্ড, বলল, 'তবে সোজাসাপটা যা বুঝি, যা করার মানুষকেই করতে হবে...।'

গার্ডটাকে ভারি অদ্ভুত লাগছিল জিশানের। ঠিক এই কথাগুলোই ও একা-একা কতবার ভেবেছে। কিছু একটা করা দরকার। ওল্ড সিটির মুষড়ে পরা গুঁড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কথা মনে পড়ল জিশানের। পচে যাওয়া মানুষের শরীরে যেসব জঘন্য পোকামাকড় বাসা বাঁধে তাদের মতো নোংরা ক্লেদাক্ত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে জিশানরা। অসহ্য এই জীবন।

জিশান ঠিকই বলেছিল মিনিকে : লোভ আর অভাব বড় অদ্ভুত কম্বিনেশান। এই কম্বিনেশানের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ নয়। তা সত্বেও মিনির কথাটা বারবার মনে পড়ছিল জিশানের : 'কিছু একটা করা যায় না?'

গার্ড ঠিকই বলেছে। যা করার মানুষকেই করতে হবে।

জিশান ওকে বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমরা কিছু করছি না, তাই আমাদের কপাল ফিরছে না। কিন্তু তুমি কি এখানে খুব সুখে আছ?'

জিশানের দিকে আড়চোখে চাইল গার্ড, বলল, 'শোনো ভাই, এখানে এমনিতে সুখে থাকলেও মনে শান্তি নেই। আমি তো ঠিক করেছি, আর পাঁচবছর চাকরি করব এখানে। তারপর চাকরি ছেড়ে জমানো টাকা সঙ্গে নিয়ে সোজা কেটে পড়ব দেশের বাড়িতে।'

'কোথায় তোমার দেশ?'

'নাহাইতলা গ্রামে—মেদিনীপুর স্টেশানে নেমে আরও বাইশ কিলোমিটার উত্তরে যেতে হয়।'

'তোমার দেশ কেমন? ভালো?'

'ভালো মানে! একেবারে ছবির মতো গ্রাম। কী সুন্দর! শান্ত, নরম।'

কোনও গ্রাম যে 'নরম' হতে পারে সেটা জিশানের জানা ছিল না। কিন্তু তবুও ওর মনে হল, গার্ড কী বলতে চাইছে সেটা ও বুঝতে পেরেছে।

গার্ডের সঙ্গে কথা বলে জিশানের ভালো লাগছিল। মানসিক চাপটা কিছুটা কমে গেছে বলেও মনে হল। কিল গেম-এর চ্যালেঞ্জটাকে নতুনভাবে দেখতে চাইছিল জিশান। ভাবল, রাতে ও মিনির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে।

'তোমার কি সারা দিন ডিউটি?' গার্ডকে জিগ্যেস করল জিশান।

'না, শিফট ডিউটি। এখন দুটো-দশটার ডিউটিতে আছি। নেক্সট উইক থেকে ছ'টা-দুটো।'

'তোমার সঙ্গে কাল দেখা হবে?'

'কেন হবে না? এখানেই ডিউটিতে থাকব আমি। পরের সপ্তাহ থেকে অ্যানালগ জিমে ডিউটি। ওই দ্যাখো—খেলা শেষ।'

জিশান দেখল, খেলা শেষ করে মনোহর-রণজিৎরা ফিরে আসছে।

জিশান গার্ডকে বলল, 'আজ আসি—।'

গার্ড পাথরের মতো মুখ করে সামনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'কাল দেখা হবে।'

জিশান নাহাইতলা গ্রামের ছেলেটার দিকে একপলক তাকিয়ে মনোহরের দিকে এগিয়ে গেল।

ও মনোহরের কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিল মনোহর। জিশানও হাত বাড়িয়ে দিল।

মনোহর জোরালো মুঠোয় জিশানের হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল, 'জিতে গেছি, জিশান ভাইয়া।'

জিশান তখনও বোধহয় একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ও ভাবল, সিন্ডিকেটের সঙ্গে লড়াইয়ে মনোহর জিতে গেছে। তাই বিড়বিড় করে বলল, 'আর তা হলে আমাদের কোনও ভয় নেই। এবার থেকে আর অন্যের ফুর্তির জন্যে মানুষ মরবে না।'

জিশানের কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারল না মনোহর সিং। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল জিশানের দিকে।

কিছুক্ষণ পর মনোহর বলল, 'কী সব আনসান বকছ, জিশান ভাইয়া। আমরা ফুটবল খেলায় জিতে গেছি। তিন-দুই গোলে। অব সমঝে আপ?'

জিশান ঘোর কাটিয়ে মাটিতে নেমে এল। একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'সরি, মনোহর। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কনগ্র্যাচুলেশানস।'

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলল গেস্টহাউসের দিকে। জিশান পিছন ফিরে গার্ড ছেলেটিকে একবার দেখল। তারপর মনোহরকে বলল, 'তোমাকে একটা খবর দেব...।'

'কী খবর?' বাচ্চা ছেলের কৌতূহল নিয়ে জিশানের মুখের দিকে তাকাল মনোহর।

'কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টরটা 0.07 নয়। এটা হয়তো সিন্ডিকেটের বানানো। আসল সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর জিরোও হতে পারে—।'

মনোহর সিং-এর মুখটা পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কী করে জানলে?'

জিশান বলল।

শুনে শব্দ করে মাটিতে থুতু ফেলল মনোহর, বলল, 'ইয়ে লোগ বহত কামিনা হ্যায়।'

জিশান কোনও কথা বলল না। ওরা পায়ে-পায়ে চলে এল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর ভেতরে।

ভেতরটা যথারীতি এয়ারকন্ডিশানড। একেবারে সুপারস্টার হোটেলের মতো সাজানো। সব জায়গাতেই ঝকঝকে মার্বেল—সেখান থেকে প্রতিফলিত আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। জিপিসির এই বিশাল বিল্ডিং-এর আটাশ, উনতিরিশ আর তিরিশ—এই তিনটে ফ্লোর নিয়ে পার্টিসিপ্যান্টদের গেস্টহাউস। বাকি ফ্লোরগুলোয় নানান কন্ট্রোল রুম আর অফিশিয়াল গেস্টদের জন্য সুপারকমফোর্ট পেন্টহাউস। নিরাপত্তার কারণে সুপারগেমস কর্পোরেশনের এমপ্লয়ি আর গেস্টদের ঢোকার-বেরোনোর পথ জিশানদের থেকে আলাদা। গেমস পার্টিসিপ্যান্টদের স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করলে যেসব দরজা খুলে যায় সেগুলো দিয়ে অবাধে তারা যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ এলাকার কোনও দরজাই তাদের স্মার্ট কার্ড টেনে খোলা যায় না।

এইরকম ঝিকিমিকি ফ্যাশানদুরস্ত লবিতে জিশানদের হলদে গেঞ্জি আর কালো বারমুডা প্যান্ট বেশ বেমানান লাগছিল। তার ওপর পোশাকের এখানে-সেখানে কাদা-মাখানো ফুটবলের রাবার স্ট্যাম্প। কিন্তু যেহেতু এই গেস্টহাউসে সব গেমস পার্টিসিপ্যান্টরাই রয়েছে, সেহেতু জিশানদের অস্বস্তি হওয়ার কোনও কারণ নেই।

পিস ফোর্সের গার্ডরা তাদের জায়গামতো কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে।

জিশানরা কয়েকজন অটো-এলিভেটরে উঠল। আটাশ নম্বর বোতাম টিপল।

আগাপাস্তলা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি বিশাল মাপের এলিভেটর। তবে এটা অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড নয়। এর ভেতরে অন্তত বিশজন এঁটে যায় অনায়াসে। কিন্তু একটা মেটাল প্লেটে সবচেয়ে বেশি আঠেরোজন যাত্রীর কথা লেখা আছে।

জিশান দেখল, পিস ফোর্সের একজন গার্ড ভেতরে মোতায়েন হয়ে দাঁড়িয়ে। জিশানরা গার্ডের কাছ থেকে দূরত্ব রেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অটো-এলিভেটরে করে ওপরে ওঠার সময় জিশান লক্ষ করল, রণজিৎ পাত্রও ওদের সঙ্গে উঠেছে। বারবার অন্যদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বোধহয় আঁচ করতে চাইছে, এরপর ওকে কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ওকে দেখতে পেয়েই জিশান মুখে কুলুপ আঁটল। রণজিতের সঙ্গে কথা বলতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া রণজিতের স্বভাবই হচ্ছে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানো। ঝগড়া বেধে যাওয়ার পর ও হাত চালাতে ভালোবাসে।

মনোহর সিং রণজিৎকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তাই ওর সঙ্গে মনোহরের তেমন মাখামাখিও নেই, আবার ঝগড়াও নেই। রণজিৎ যে একইসঙ্গে এলিভেটরে উঠেছে সেটাও বোধহয় ভালো করে খেয়াল করেনি

মনোহর।

ও জিশানকে লক্ষ করে বলল, 'ঘরের কী খবর? বিবি, বাচ্চা সব ঠিক আছে তো?'

জিশান হেসে ঘাড় নাড়ল—মুখে কিছু বলল না।

মনোহর বলল, 'আমি পিস ফোর্সের একজন ডেপুটিকে বলেছিলাম, আমার তো ঘরে কথা বলার কেউ নেই—তো আমার কোটার দশমিনিট জিশান পালচৌধুরীর কোটায় লাগিয়ে দিন—ও ফ্যামিলি ম্যান আছে—টাইমটা ওর কাজে লাগবে। তো সালা বলল যে, নামুমকিন—নহি হো সকতা...।'

মনোহরের কথায় মজা পেলেও হাসতে পারল না জিশান। কারণ, অটো-এলিভেটরে ওদের সঙ্গে পিস ফোর্সের গার্ড রয়েছে। ও সতর্ক চোখে গার্ডটার দিকে তাকাল।

না, মনোহরের 'শালা' শব্দটা গার্ডটাকে বিশেষ বিচলিত করেনি।

কিন্তু রণজিৎ বোধহয় বিচলিত হয়েছিল। কারণ, ও হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

অটো-এলিভেটরের সবাই অবাক হয়ে রণজিতের দিকে তাকাল।

জিশান আগেই লক্ষ করেছিল, এলিভেটরে পিস ফোর্সের গার্ড ছাড়া আর ছ'জন পার্টিসিপ্যান্ট রয়েছে। জিশান, মনোহর আর রণজিৎকে বাদ দিলে বাকি যে-তিনজন, তার মধ্যে একজন, খোকন, মনের দিক থেকে মনোহরের কাছাকাছি, আর বাকি দুজন রণজিতের। জিপিসিতে যে একটা চাপা দলবাজির ব্যাপার আছে সেটা দ্বিতীয় দিন থেকেই টের পেয়েছে জিশান—অনেকটা জেলখানার দলবাজির মতো। এখন সেটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল।

রণজিতের হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর বাকি দুজন জিগরিও দাঁত বের করেছিল। সেটা দেখে জিশানের গা জ্বলে যাচ্ছিল। যদিও ওরা কেন হাসছে সেটা জিশান বা মনোহর কেউই বুঝতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত রণজিৎ অতিকষ্টে অট্টহাসি থামিয়ে বলল, 'ফ্যামিলি ম্যান আবার কিল গেম কী লড়বে! কী রে, হাসান! কী রে, পাপুয়া! বল...।'

হাসান আর পাপুয়া জিশানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছিল। পাপুয়া হাসির ফাঁকে-ফাঁকে বলল, 'ওস্তাদ, এ মালটা আবার ফাস্ট রাউন্ডে পাশ হয়ে গেছে।'

মনোহর মারমুখী হয়ে রণজিতের দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, জিশান ওর হাত ধরল—চাপ দিল—ওকে থামতে ইশারা করল।

রণজিৎ ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। ও হঠাৎ মনোহরের সামনে এসে জোড়হাত করে আচমকা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। ভিক্ষে চাওয়ার সুরে ইনিয়েবিনিয়ে বলল, 'ক্ষমা, স্যার, ক্ষমা। প্লিজ, মারবেন না। আমার ভয় করছে। আর কোনওদিন এরকম করে হাসব না, স্যার—।'

ব্যাপারটা দেখে জিশান আর মনোহর হতভম্ব হয়ে গেল। কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল।

রণজিৎ যে আসলে মনোহরকে ব্যঙ্গ করে ভয় পাওয়ার অভিনয় করছে এটা বুঝতে জিশান বা মনোহরের পাঁচ-দশ সেকেন্ড সময় লেগে গেল।

ব্যাপারটা যে আসলে কী সেটা ওরা বুঝতে পারল হাসান আর পাপুয়ার লবঙ্গলতিকা হাসি দেখে। ওরা দুই সখীর মতো হাসতে-হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সেইসঙ্গে বলছে, 'আবে, আমাদের বস রেগে গেছে। চল, গিয়ে ক্ষমা চাই...।'

গার্ডটাকে পাত্তা না দিয়েই হাসান আর পাপুয়া প্রায় ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মনোহরের পায়ের কাছে—রণজিতের দুপাশে।

কাঁদুনে সুরে হাসান বলল, 'আর করব না, স্যার। ভুল হয়ে গেছে। আমাদের মারবেন না—প্লিজ।'

জিশান আর মনোহর কিছুটা পিছিয়ে গেল। খোকন ওদের পাঁচজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। আর পিস ফোর্সের গার্ড তার শকারটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিল। তারপর সুইচটা অন করে অটো-এলিভটরের একপ্রান্তে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। এবার সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। যদি পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা হলে শকার ব্যবহার করবে। আর তাতেও যদি হালে পানি না পাওয়া যায় তা হলে এলিভেটরের ইমার্জেন্সি হেলপ বোতাম টিপবে।

হঠাৎই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রণজিৎ।

ওঠার সময় ও ঝুঁকে পড়েছিল মনোহরের দিকে। হিসেবটা এমন ছিল যাতে ওর মাথাটা মনোহরের থুতনির ঠিক নীচে ধাক্কা খায়।

রণজিতের হিসেবে ভুল ছিল না। ওর মাথার সঙ্গে মনোহরের থুতনির সংঘর্ষ হল। আর একইসঙ্গে ও পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মনোহরের গালে।

মনোহর এসবের বিন্দুবিসর্গ আঁচ করতে পারেনি। তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খেল। ওর শরীরটা হেলে পড়ল এলিভেটরের দেওয়ালে। আর থাপ্পড়ের চোটে মাথাটা এক ঝটকায় ঘুরে গেল একপাশে। ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্তের রেখা গড়িয়ে নামতে লাগল চোয়ালের দিকে।

এখানেই শেষ নয়।

রণজিতের দুই দোস্ত তখনও এলিভেটরের মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে ছিল। ওরা দুজন পশুর মতো চিৎকার করে মনোহরের দু-পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সামনের দিকে।

মনোহরের খাড়া শরীরটা পলকে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা রণজিৎ স্পোর্টস শু দিয়ে জব্বর লাথি বসিয়ে দিল মনোহরের পেটে।

এতক্ষণ পরে যন্ত্রণায় একটা 'আঁক' শব্দ বেরিয়ে এল মনোহরের মুখ থেকে। ওর চোখ দুটো কেমন যেন ঘষা কাচের মতো হয়ে গেছে। গাড়ি চাপা পড়া কুকুরের মতো দেহটা নেতিয়ে পড়ে আছে।

জিশান স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। যেন হলে বসে কোনও অ্যাকশান ফিল্ম দেখছে।

খোকনও তাই। নির্বাক দর্শক।

আর গার্ডের মুখে মুচকি হাসি। হাতের নীল শকার অল্প-অল্প দুলছে।

রণজিতের দুই শাগরেদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। শব্দ করে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ছে আর হাসছে।

জিশান ওদের পাশ কাটিয়ে গার্ডটার কাছে গেল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমার বন্ধুকে এরকমভাবে মারল...কিছু বললে না?'

জিশানের দিকে রূঢ়ভাবে তাকাল গার্ডটা, বলল, 'অর্ডার নেই।'

গার্ডটার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, চোখের পলকে ওর হাত থেকে শকারটা ছিনিয়ে নিল জিশান। এবং ওটা নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরল গার্ডের গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে এক প্রবল ঝটকা মেরে গার্ডটার দেহ খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

সেই মুহূর্তে নিজেকে শ্রীধর পাট্টা বলে মনে হল জিশানের। এখন ও হিংস্রভাবে যা খুশি করতে পারে।

ঠিক তাই করল জিশান।

হাসান বোধহয় মাথায় একটু মাটো। অথবা শকারের ক্ষমতা সম্পর্কে উদাসীন। কারণ, জিশানের হাতে শকার দেখেও ও এতটুকু ভয় পেল না। বরং জিশানের ঊরুসন্ধি লক্ষ করে প্রচণ্ড শক্তিতে পা চালাল।

হাসানের চাপদাড়ি, কালো চোয়াড়ে মুখ, গালের কাটা দাগ, দড়ি পাকানো কঠিন চেহারা বলে দিচ্ছিল যে, হাসান এসব মারপিটের কাজে অভ্যস্ত। হয়তো ও টাকার লোভে পড়েই কিল গেম বা অন্য কোনও গেম-এ নাম দিয়েছে। এবং জিতবে বলে হয়তো আশাও রাখে।

কিন্তু এখানে এসে থেকে জিশান যা করছে তা আসলে জিশানের কাজ নয়—ভেতর থেকে অন্য কেউ ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। যেমন এখন।

চকিতে একপাশে সরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় হাতের শকারটা হাসানের চাপদাড়িতে চেপে ধরল। লোম আর চামড়া পুড়ে যাওয়ার গন্ধ বেরোল। তারপর রডটাকে ও জোরে-জোরে ঘষে দিল কয়েকবার। ততক্ষণে হাসানের লাথিটা ওর কোমরের কাছে এসে লেগেছে।

ঘুষি মারতে একটা হাত শূন্যে তুলেছিল হাসান। কিন্তু শকারের হাই ভোল্টেজ শক খাওয়ার পর ওর হাত তোলা অবস্থাটা অনেকটা 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ভঙ্গির মতো দেখাল। ওর শরীরের ভারকেন্দ্রটা সেই মুহূর্তে একটু পিছনদিকে থেকে যাওয়ায় হাসান পিছনদিকেই উলটে পড়ল।

জিশান কোমরে ব্যথা পেয়েছিল, তবে তেমন জোরালো নয়।

রণজিৎ পড়ে-যাওয়া হাসানকে সামাল দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

সেই সময়ে জিশান অনায়াসেই রণজিৎকে শকার দিয়ে কাবু করতে পারত, কিন্তু করল না। ও রণজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। আড়চোখে লক্ষ করল, পাপুয়ার মুখে আতঙ্কের ভাঁজ পড়েছে। ওর মুখ থেকে লাফাঙ্গা-হাসি মিলিয়ে গেছে। শকার থেকে যতটা সম্ভব সরে গিয়ে ও লিফটের দেওয়ালে নিজেকে পোস্টারের মতো সাঁটিয়ে রেখেছে।

হাসানকে ধরতে গিয়ে রণজিৎ অনেকটা হেলে পড়েছিল। সেই অবস্থায় জিশানের দিকে চোখ পড়তেই ও স্ট্যাচু হয়ে গেল। তারপর জিশানের দিকে নজর স্থির রেখে খুব ধীরে-ধীরে শরীরটাকে সোজা করে দাঁড় করাল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু অটো-এলিভেটর ওপরে ওঠার মৃদু গুনগুন শব্দ।

জিশান পায়ে-পায়ে সরে এল এলিভেটরের বোতামের কাছে। রণজিতের দিকে সতর্ক চোখ রেখে বাঁ-হাতে বোতাম টিপে এলিভেটর থামাল। তারপর এক নম্বর বোতামটা টিপে দিল। এবং এলিভেটর নামতে শুরু করল।

এতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। ভাবল জিশান। এলিভেটর ওঠা-নামা করিয়ে সময় তৈরি করে এই মোকাবিলাটা খতম করতে হবে।

রণজিৎ ধূর্ত চোখে শকারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এককণা সুযোগ খুঁজছিল ও। সেটুকু সুযোগ পেলেই ও শুয়োরের বাচ্চাটাকে তুলোধোনা করতে পারবে।

জিশান রণজিতের মতিগতির কিছুটা বোধহয় আঁচ করতে পারছিল। ও শকারটা রণজিতের মুখের সামনে ধীরে-ধীরে দোলাল। যেন কোনও জাদুকর তার জাদু-দণ্ড দুলিয়ে কাউকে ঘুম পাড়াতে চাইছে।

জিশান জিগ্যেস করল, 'ভয় করছে? ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে?'

রণজিৎ চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে ছিল জিশানের দিকে। বুঝতে চাইছিল, ঠিক কী ধরনের উত্তর এই পাগল ছেলেটাকে খুশি করতে পারে।

'আমি মারব বলে ভয় করছে না তো?' ঠান্ডা গলায় আবার জানতে চাইল জিশান।

তারপর রণজিতকে অবাক করে দিয়ে শকারের সুইচটা অফ করে দিল।

জিশানের পায়ের কাছে মনোহর সিং তখন নড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে যন্ত্রণার 'উ:! আ:!' কাতরানি। খোকন মারমুখী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে পাপুয়ার দিকে। হাসান জলে-ডোবা মৃতদেহের মতো অসাড়, অসহায়। চোখদুটো বন্ধ—যেন ঘুমিয়ে আছে।

খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে জিশান জিগ্যেস করল, 'আমি মারব বলে ভয় করছে না কি?'

রণজিৎ ওর গোদা-গোদা দাঁত বের করে হাসল। কারণ, জিশান যে শকারের সুইচটা অফ করে দিয়েছে সেটা ও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

তবে ওটা যে জিশানের টোপ সেটা বুঝতে পারেনি।

সুতরাং রণজিৎ হাত চালাল।

আর জিশানও চোস্ত খেলোয়াড়ের মতো শকারটাকে সামনে বাড়িয়ে জোরালো গুঁতো মারল রণজিতের পেটে।

সুইচ অফ করা অবস্থায় অস্ত্র হিসেবে শকারের গুণমান কাঠের রুলের চেয়ে একটু বেশি, লোহার রডের চেয়ে একটু কম। ফলে শকারের গুঁতোয় বেশ ভালোই কাজ হল।

রণজিতের দেহটা ভাঁজ হয়ে গেল সামনে। মাথাটা নিচু হয়ে যাওয়ায় চাঁদির তেলতেলে টাকটা এসে পড়ল জিশানের কাছাকাছি। জিশান নিজের মাথাটা ঝাঁকিয়ে মুগুরের মতো বাড়ি মারল রণজিতের টাকে। তারপর বাঁ-হাতের মুঠোয় সাপের মতো পোঁচিয়ে ধরল রণজিতের ডানহাতের মধ্যমা।

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল রণজিৎ। হেঁড়ে গলায় চাপা গর্জন করে চলল—সঙ্গে তীব্র ফোঁসফোঁসানি।

জিশান রণজিতের আঙুলে হিংস্র মোচড় দিল। রণজিতের গলা থেকে যন্ত্রণার সা-রে-গা-মা বেরিয়ে এল। এবার শকারটা জিশান সপাটে বসিয়ে দিল রণজিতের পিঠে।

রণজিৎ পড়ে গেল বটে, কিন্তু কাবু হল না।

ও যে কিল গেম লড়তে এসেছে, সেকথা ভুললে চলবে না। ওর শরীরের রস-কষকে খাটো করে দেখলে চলবে না। মনে-মনে ভাবল জিশান।

রণজিৎ আবার উঠতে যাচ্ছিল, জিশান ব্যঙ্গের ঝাঁজালো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্ষমা, স্যার, ক্ষমা—।' এবং পলকে সুইচ অন করে শকারটা চেপে ধরল রণজিতের পাঁজরের কাছে।

গেঞ্জির কাপড় পুড়ে যাওয়ার গন্ধ বেরোল। আর কোনও গন্ধ নাকে ভালো করে ঠাহর করার আগেই এলিভেটরের মেঝেতে পড়ে গেল রণজিৎ।

জিশান ঘুরে তাকাল পাপুয়ার দিকে। শকারটা হাতে খোলা তরোয়ালের মতো ধরা।

পাপুয়া সটান জিশানের পায়ে বডি ফেলে দিল : 'মাপ করো, বস, মাপ করো! আর এরকম হবে না। ক্ষমা, বস, ক্ষমা...।'

জিশান শকারটার সুইচ অফ করে পাপুয়ার পিঠে ঠেকাল। সঙ্গে-সঙ্গে পাপুয়া আতঙ্কে হাঁউমাঁউ করে উঠল।

জিশান হেসে বলল, 'সালা, ডরপোক—ইঁদুরের বাচ্চা।' জিশান ওর কোমরে একটা হালকা লাথি কষাল।

এলিভেটর তখন চারনম্বর ফ্লোর পার হচ্ছিল। এলিভেটরের প্যানেলের কাছে গিয়ে জিশান বোতাম টিপে যন্ত্রটাকে থামাল। তারপর আটাশ নম্বর বোতাম টিপে দিল।

জিশান, মনোহর, খোকনরা গেস্টহাউসের আটাশ নম্বর ফ্লোরে থাকে। আর রণজিৎরা থাকে উনতিরিশে।

ওপরে উঠতে এলিভেটরের বেশ সময় লাগবে। সেই ফাঁকে জিশান এলিভেটরের ভেতরটা গোছাতে লাগল। খোকন ওর সঙ্গে হাত লাগাল।

প্রথমেই শকারটা গার্ডের শিথিল শরীরের পাশে রেখে দিল জিশান। তারপর ও আর খোকন মিলে মনোহরকে দাঁড় করাল। ওর গালে আলতো চাপড় মেরে সাড় ফেরাতে চাইল।

পাপুয়া তখন ঝুঁকে পড়ে হাসান আর রণজিতের সেবা করছে।

এলিভেটর যখন আটাশ নম্বর ফ্লোরে এসে থামল তখন মনোহর জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ও ফ্যালফ্যালে চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেয়া হুয়া, জিশান ভাইয়া?'

জিশান ছোট্ট করে বলল, 'লাফড়া।'

তারপর খোকনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এর মাথাটা গেছে। চলো, ভালো করে জল-টল না ছেটালে এর কিচ্ছু মনে পড়বে না...।'

খোকন বলল, 'ঠিক বলেছ!'

জিশান ভাবল, এই যে শকার নিয়ে ও লড়াই করল—এটা কি কিল গেম-এর আর-একটা প্রিলিমিনারি রাউন্ড? ও কি তা হলে আর-একটা রাউন্ডে কোয়ালিফাই করল? আর সেইসঙ্গে মানুষ থেকে পশুর দিকে এগিয়ে গেল আর-একটা ধাপ?

হঠাৎই জিশানের মনে হল, এলিভেটরে ওদের এই দাঙ্গাহাঙ্গামা কেউ দেখে ফেলেনি তো? দেখলেই সর্বনাশ! তখন কী শাস্তি পেতে হবে কে জানে!

এলিভেটরের সিলিং-এর দিকে তাকাল জিশান।

দুটো ছোট্ট টিভি ক্যামেরা ওর নজরে পড়ল।

•

জিশান কতক্ষণ ঘুমোতে পেরেছিল ঠিক মনে নেই। হঠাৎই কেমন একটা অস্বস্তি টের পেল ও। মিনি আর শানুকে নিয়ে যে-স্বপ্নটা দেখছিল সেটা জলের নীচে ডুবে থাকা ছবির মতো ভাসতে-ভাসতে তলিয়ে গেল। একটা মেয়েলি গলা ওকে যেন বারবার ডাকছিল : 'জিশান! জিশান!'

প্রথমে গলাটা মিনির মতো ঠেকল। তারপর বদলে গেল সেই মেয়েটার গলায় যে রোজ ভোরবেলা ছ'টা বাজলেই ওকে প্লেট টিভির ভেতর থেকে ডাকে—মিষ্টি সুরেলা গলায় ডেকে-ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়।

চোখ কচলে বিছানায় উঠে বসল জিশান। অবাক হয়ে দেখল, ওর ঘরের আলোগুলো জ্বলছে।

ও কি তা হলে আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়েছিল?

না তো! স্পষ্ট মনে আছে, ও সবক'টা আলোর সুইচই অফ করেছে।

তা হলে আলোগুলো অন করল কে?

হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। এই জিপিসি-র গেস্টহাউসে প্রায় সবকিছুই অটোমেটিক। এবং তার সমস্ত মাস্টার কন্ট্রোল সিন্ডিকেটের হাতে। সুতরাং, খুশিমতো ওরা জিশানের ঘরের আলো জ্বালতেই পারে।

ঘরের দেওয়ালে ইনসেট করা ডিজিটাল ঘড়ির দিকে চোখ গেল জিশানের। সময় দুটো। পাশে বাঁকা চাঁদের ছবি—মানে রাত। প্রতিদিন সূর্য যখন ওঠে ঠিক তখন চাঁদের ছবিটা পালটে সূর্য হয়ে যায়। আর সূর্য ডুবলেই সূর্যের ছবি মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে চাঁদের ছবি।

এখন যে রাত দুটো সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝার জন্য পুবদিকের কাচের জানলাটার দিকে তাকাল জিশান।

সেখানে এখন রাতের অন্ধকার। অন্ধকারে তারা চোখে পড়ছে। আর তার সঙ্গে লাল-নীল জোড়া ধূমকেতুর লেজের কিছুটা করে অংশ।

এবার প্লেট টিভির চেনা সুন্দরীর দিকে তাকাল। মেয়েটি তখন বলছে, 'ঘুম ভাঙাতে হল বলে দু:খিত, জিশান। কিন্তু তোমাকে এখুনি তৈরি হয়ে নিতে হবে। একটা ইমার্জেন্সি কলে পিস ফোর্সের গার্ডরা তোমাকে নিতে আসবে। ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল শ্রীধর পাট্টা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। তৈরি হওয়ার জন্যে তোমার হাতে মাত্র পাঁচমিনিট সময় আছে, জিশান। তোমার সময় শুরু হচ্ছে এখন...। ও. কে.। গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক যু—।'

প্লেট টিভির পরদা থেকে মেয়েটি পলকে উধাও হয়ে গেল। টিভিটাও বোধহয় রিমোট কন্ট্রোল টেকনিকে আবার অফ হয়ে গেল।

জিশানের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শ্রীধর পাট্টা! দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন?

ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল জিশান। ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে চটপট পোশাক বদলাতে শুরু করল। হাতে মাত্র পাঁচমিনিট—কিংবা তার কম—সময় আছে।

জিপিসি-র গেস্টহাউসে পার্টিসিপ্যান্টদের জামাকাপড়ের কোনও অভাব নেই। জিশানকে দেওয়া ম্যানুয়ালে স্পষ্ট করে লেখা আছে ট্রেনিং, কমপিটিশান বা গেমের সময় কী ধরনের পোশাক পরতে হবে। এ ছাড়া বাকি সময় ক্যাজুয়াল ড্রেস।

এখন ক্যাজুয়াল ড্রেসই পরবে ঠিক করল জিশান। কারণ, মাঝরাতে শ্রীধর পাট্টা হঠাৎ ডেকে পাঠালে কী পোশাক পরে যেতে হবে সে-কথা ম্যানুয়ালে লেখা নেই। তা ছাড়া ওর ভেতরে কেমন যেন একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

জিশানের বারবার হাই উঠছিল। হাই তুলতে-তুলতেই একটা বাদামি রঙের কর্ডের প্যান্ট আর একটা নেভি ব্লু হাফশার্ট পরে নিল ও। শার্টটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে নিয়ে কোমরে বেল্ট পরে নিল। তারপর হাই

তাড়াতে টয়লেটে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল। এখানে জল নিছক জল নয়—তার সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ মেশানো।

ঠিক তখনই দরজায় পাখি-ডাকা সুরে বেল বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলল জিশান। পিস ফোর্সের দুজন গার্ড দরজায় দাঁড়িয়ে।

জিশান ভালো করেই জানে, গার্ডরা যখন-তখন যে-কোনও গেমস পার্টিসিপ্যান্টের ঘরে দরজা খুলে ঢুকে পড়তে পারে। সে-চাবিকাঠি ওদের কাছে আছে। তা সত্বেও ওরা যে এখন বেল বাজাল সেটা নিছকই ভদ্রতা।

জিশান বাইরে বেরিয়ে এল। লক্ষ করল, দুজন গার্ডের শকারের সুইচ অন করা। মানে, শ্রীধর পাট্টা কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

দরজা টেনে বন্ধ করল জিশান। তারপর দুই পাথরের মূর্তির সঙ্গে মসৃণ করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল। ওর মন বলছিল, এলিভেটরের টিভি ক্যামেরা দুটোর জন্যই যত সর্বনাশ।

খানিকটা হেঁটে গিয়ে ওরা তিনজন একটা অদ্ভুত এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল। এলিভেটরটা কালো কাচের তৈরি। তার মাথার কাছটায় সবুজ আলোর ফুটকি দিয়ে লেখা : H-Elevator মানে, হরাইজন্টাল এলিভেটর।

এ ক'দিনের অভিজ্ঞতায় জিশান জেনেছে, এই স্পেশাল এলিভেটর শুধু অনুভূমিক তল বরাবর যাতায়াত করতে পারে। অর্থাৎ, এর ওপরে-নীচে ওঠা-নামার কোনও ক্ষমতা নেই...অথচ এর নাম 'এলিভেটর'।

এইচ-এলিভেটরে ঢুকেই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। হরাইজন্টাল, তবু এলিভেটর। একেই বোধহয় বলে নাম মাহাত্ম্য! হঠাৎই ও খেয়াল করল, ওর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে গার্ড দুজন অবাক হয়ে ওকে দেখছে।

এলিভেটরের ভেতরে ঢুকেই একজন গার্ড কন্ট্রোল প্যানেলের টাচ স্ক্রিন বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কালো কাচ ঢাকা একটা ছোট্ট জানলায় এলিভেটরের স্থানাঙ্ক পালটাতে লাগল। অর্থাৎ, এলিভেটর চলছে। কিন্তু চলার কোনও শব্দ নেই। শুধু খুব মনোযোগে কান পাতলে ভোমরার মিহি গুনগুন শোনা যাচ্ছে।

একটা স্থানাঙ্কে পৌঁছে এইচ-এলিভেটর থামল। তার দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। ঠান্ডা কাচের বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে ওরা একটা করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল।

এখানেও করিডরে আয়নার মতো চকচকে বাদামি গ্র্যানাইট আর দেওয়াল খরগোশের মতো ধপধপে সাদা।

পনেরো-ষোলো পা এগিয়ে গার্ডরা ডানদিকে ঘুরল।

সামনে ঘষা কাচের একটা বিশাল দু-পাল্লার দরজা। তাতে লম্বা পাইপের মতো দুটো পিতলের হাতল—সোনার মতো ঝকঝক করছে।

একজন গার্ড একটা স্মার্ট কার্ড বের করল পকেট থেকে। দরজার পাশে লাগানো একটা স্লটে মসৃণভাবে সেটা টানল। তারপর দুজনে দুটো হাতল টেনে ধরে দরজা ফাঁক করল। ওদের অন্য হাত দুটো জিশানকে ঠেলে দিল ভেতরে। এবং হাতল দুটো ছেড়ে দিল। স্প্রিং দেওয়া দরজা সঙ্গে-সঙ্গে নি:শব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরে যে-ঘরটা জিশানকে প্রায় গিলে নিল সেটা ঘর না ইনডোর ফুটবল মাঠ জিশান বুঝতে পারল না। ওটার চেহারা অনেকটা জিশানের দেখা ডিজিটাল জিমের মতো। তবে ঘরের উচ্চতা তার তুলনায় অনেক কম।

ঘরের একপাশে অন্তত পঞ্চাশটা সোফা সাজানো। সোফাগুলোর উঁচু হাতল লাল রঙের গদি মোড়া। তার ওপরে সোনালি জরির কাজ। যেন মহারাজাদের বিশ্রামের জন্য তৈরি।

সোফাগুলোর বিপরীতদিকে একটা ফুটখানেক উঁচু প্ল্যাটফর্ম—অনেকটা ডান্স ফ্লোরের মতো। সেখানে একটা প্রকাণ্ড কাচের বল একটা ধাতব ফ্রেমে দাঁড় করানো।

জিশান অনুমানে বুঝল, বলটার ব্যাস প্রায় দশ-বারো ফুট হবে। কিন্তু জিনিসটা কী কাজে লাগে সেটা ওর মাথায় ঢুকল না।

হঠাৎই কে যেন বলে উঠল, 'এক্ষুনি বুঝতে পারবে, জিশান, কী এই বলের টান—।'

অন্ত্যমিল সংলাপ, মেয়েলি ঢঙের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গের মিশেল...জিশান সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারল, কথাগুলো বলছেন শ্রীধর পাট্টা—সিআরডি-র মার্শাল।

শব্দ লক্ষ করে চমকে মুখ ফেরাল জিশান।

মাঝের সারির একটা সোফায় শরীর ডুবিয়ে বসে আছেন শ্রীধর। সোফার হাতলের ওপর দিয়ে ওঁর মাথার খানিকটা, কপাল, আর ছোট-ছোট চোখ দেখা যাচ্ছে। সরু-সরু দুটো পা টান-টান করে সামনের সোফার পিঠের ওপরে রাখা।

পা নামিয়ে শরীরটাকে পলকে সামনে ঝুঁকিয়ে এক মসৃণ মোচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীধর। ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিকে রাঙানো টুকটুকে ঠোঁটে বাঁকা হাসি। মুখের ভাঁজগুলো সাইডলাইটে আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

'ওয়েলকাম, বয়। তোমার মতো ফাইটার কেউ নয়। য়ু ওয়্যার শিয়োরলি ব্রাইটার, ইনসাইড দ্য এলিভেটর।'

ও, জিশানের অনুমানই তা হলে ঠিক। এলিভেটর ফাইটের ভিডিয়ো রেকর্ডিং শ্রীধর দেখেছেন। কিন্তু তার জন্য কী মিলবে? পুরস্কার, না তিরস্কার?

মনে-মনে হঠাৎই হেসে ফেলল জিশান। অন্ত্যমিল রেখে সংলাপ বলাটা কি ছোঁয়াচে রোগ? পুরস্কার, তিরস্কার। ওর ওপরে কি শ্রীধর ভর করেছেন?

শ্রীধর পাট্টার পরনে সেই একইরকম সাদা পোশাক। তাতে সোনালি বোতাম আর নীল হলোগ্রাম।

জিশানের দিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন শ্রীধর। পকেট থেকে ছোট্ট মাপের একটা যন্ত্র বের করে বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে গেল অলৌকিক কাণ্ড।

একটা দেওয়ালের খানিকটা অংশ নি:শব্দে সরে গিয়ে আটজন মানুষ ঢুকে পড়ল ঘরে। তাদের মধ্যে যে ছ'জন গার্ড সেটা তাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারল জিশান। বাকি দুজনের পরনে সাদা ফুলশার্ট, সাদা প্যান্ট—আর শার্টের ওপরে কমলা রঙের হাতকাটা জ্যাকেট। জ্যাকেটের ওপরে রুপোলি হরফে লেখা : MEDIC মানে, ওরা ডাক্তার। ওদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্রিফকেস ঝুলছে।

ছ'জন গার্ড যান্ত্রিক পায়ে হেঁটে কাচের বলটার কাছে গেল। বলটাকে ঘিরে পজিশন নিল। জিশান লক্ষ করল, ওদের সকলের কোমরে ঝুলছে শকার।

মেডিক দুজনকে ইশারা করলেন শ্রীধর। ব্যালে ডান্সারের ভঙ্গিতে বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে জিশানকে নির্দেশ করে বললেন : 'ব্লাড প্রেশার এবং ব্লাড শুগার, চেক করুন ইচ দুবার।'

শ্রীধরের ছন্দ-বাণীতে মেডিক দুজন মোটেই অবাক হল না। বোঝা গেল, ওরা শ্রীধরকে চেনে।

হতভম্ব জিশানের দুপাশে এসে দাঁড়াল দুজন ডাক্তার। ব্রিফকেস খুলে অচেনা চেহারার দুটো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বের করল। গ্যাজেটগুলোর দুপাশে স্ট্র্যাপ বেরিয়ে আছে। দুটো যন্ত্রই ওরা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল জিশানের কবজিতে। তারপর একইসঙ্গে দুজনে দুটো বোতাম টিপে দিল।

ব্লাড শুগার পরীক্ষার জন্য শরীরে পিন ফুটতে পারে ভেবে জিশান ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে যন্ত্রণার মোকাবিলার জন্য তৈরি হল। তখন সেই যন্ত্রের দায়িত্বে থাকা মেডিক বলল, 'নরমাল হোন। এ-পিন ফুটলে টের পাবেন না। ন্যানো প্রোব...ন্যানোটেকনোলজিতে তৈরি...রোমকূপের ভেতর দিয়ে সড়সড় করে ঢুকে যাবে...মাইনিউট ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে নেবে। স্মুদ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট।'

তাই হল। দুটো যন্ত্রেরই ডিসপ্লে প্যানেলে জিশানের ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড শুগার লাল আর সবুজ আলোয়ফুটে উঠল।

শ্রীধর কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। গলা বাড়িয়ে প্রেশার এবং শুগারের মান দেখলেন। নিচু গলায় বললেন, 'গুড...গুড...।'

মেডিকরা দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল। আবার ফুটে উঠল ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড শুগারের মান। সেগুলো দেখে দ্বিতীয়বার সন্তুষ্ট হলেন শ্রীধর। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'চমৎকার। কোনও প্রবলেম নেই। এবার বাবু জিশানকে রোলারবলে ঢুকিয়ে দাও...প্লাস্টিকের আড়ালে লুকিয়ে দাও...।'

'রোলারবল' শব্দটা শোনামাত্রই অদ্ভুত বলটার দিকে চোখ গেল জিশানের।

ও, বলটা তা হলে প্লাস্টিকের?

মেডিক দুজন ওর হাত থেকে যন্ত্রের স্ট্র্যাপ খুলে নিল। যন্ত্রগুলো ব্রিফকেসে রেখে ব্রিফকেস দুটো মেঝেতে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর জিশানকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল বলটার দিকে।

জিশান এবার ভয় পেল। একমুহূর্তের জন্য ওর মনে হল বিদ্রোহ করবে। তাই শরীর শক্ত করল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুঝল ব্যাপারটা হঠকারিতা হয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীর শিথিল হয়ে গেল।

পিছন থেকে শ্রীধর পাট্টার বক্তৃতা শোনা যাচ্ছিল : 'এলিভেটরের মধ্যে এনার্জি নষ্ট, এতে আমাদের বড় কষ্ট। তোমরা এমন লড়বে, সবাই হাঁ করে দেখবে। তোমাদের জয়-বিজয়, সবাই করবে এনজয়। অযথা এনার্জি ক্ষয়, তার কোনও মানে হয়! তাই নাও কোমল শাস্তি, এ ছাড়া উপায় নাস্তি....।'

বলের নীচে এসে পড়ল জিশান। একজন গার্ড একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে মিহি শব্দ করে বলের নীচের দিকের খানিকটা অংশ খুলে গেল। দুজন মেডিক আর দুজন গার্ড জিশানকে তুলে ধরল ওপরে। একজন আদেশের সুরে বলল, 'বলের ভেতরে ঢুকে পড়ুন। কুইক!'

জিশান কথা শুনল। ও ভেতরে ঢোকার পরই আবার রিমোটের বোতামে চাপ। খোলা অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। জিশান বন্দি হয়ে গেল প্লাস্টিকের বলের ভেতরে।

শ্রীধর পাট্টা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। পকেট থেকে নেশার ছোট্ট শিশিটা বের করে মুখ হাঁ করে ওপরদিকে তাকালেন। খুব সাবধানে তিন ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভে তৃপ্তির শব্দ করে জোরে-জোরে কয়েকবার শ্বাস টানলেন। তারপর ঠোঁট চওড়া করে হাসলেন।

হঠাৎই মিলিটারি আদেশের সুরে হাত শূন্যে ছুড়ে শ্রীধর তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টার্ট অপারেশান। স্টেপ ওয়ান : ড্রপ দ্য স্টিল বলস—।'

বলের ভেতরে ঢুকে পড়ার পর জিশান পরীক্ষা করে বুঝল, বলটা নতুন ধরনের কোনও শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি। ও গোলকের ভেতরের তলে হাত বুলিয়ে দেখছিল। তলটা মসৃণ নয়—সাবুদানার মতো ছোট-ছোট বুটি রয়েছে। অনেকটা পদ্মকাঁটার মতো। কিন্তু তা সত্বেও গোলকের ভেতর থেকে বাইরেটা দেখতে ওর কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছিল না।

স্বচ্ছ গোলকের ভেতর থেকে শ্রীধর পাট্টাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল জিশান—তবে ওঁর কোনও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, এবং সেটাই বোধহয় শ্রীধরের 'কোমল' শাস্তি।

ঠিক তখনই শ্রীধর হাত ছুড়ে কী যেন বললেন আর সঙ্গে-সঙ্গে গোলকের ওপরদিকের একটা ছোট্ট জানলা খুলে দশটা স্টেইনলেস স্টিলের বল টপাটপ করে খসে পড়ল ভেতরে। কানে তালা লাগার মতো খটাখট শব্দ হল।

ঝকঝকে বলগুলোর মাপ টেনিসবলের মতো। গোলকের দেওয়ালে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিশান। একটা বল হাতে তুলে নিল। টেনিসবলের মাপের স্টিলের বল যতটা ভারী হওয়া উচিত ঠিক ততটাই ভারী।

কিন্তু এই বলগুলো দিয়ে কী করতে চান শ্রীধর?

উত্তর পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। কারণ, শ্রীধর পাট্টা চিৎকার করে দ্বিতীয় আদেশ দিলেন : 'স্টেপ টু : স্টার্ট রোলিং দ্য বল। আর. পি. এম. টুয়েন্টি—।'

রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপল একজন গার্ড। সঙ্গে-সঙ্গে প্লাস্টিকের বিশাল বলটা ঘুরতে শুরু করল।

ক্রমশ বলটার গতি বাড়তে লাগল। এবং শ্রীধরের নির্দেশ মতো ওটার গতি মিনিটে কুড়ি পাকে পৌঁছে গেল।

শ্রীধর পাট্টা একটা সোফার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। পায়ের ওপরে পা তুলে আধশোয়া ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে ঘুরন্ত বলটাকে দেখতে লাগলেন। সেইসঙ্গে স্বচ্ছ বলের ভেতরে জিশানের হেনস্থাও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

বলটা ঘুরপাক শুরু করতেই জিশানের দুনিয়াটা বদলে গেল। ওর শরীরটা বলের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করেছিল, কিন্তু বলের গতি বাড়তেই স্থিতিজাড্যের প্রভাবটা স্পষ্ট হল। বলের তুলনায় অনেক কম গতিতে ঘুরপাক খেতে লাগল জিশান। ফলে বলের প্লাস্টিকের তলে সাবুদানার মতো বুটিগুলো কেন রয়েছে তার কারণ স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। এ ছাড়া স্টিলের বলগুলোও তাদের কাজ করছিল। প্লাস্টিকের বলের ভেতরে ছুটোছুটি করছিল। এলোমেলো ঠোক্কর খাচ্ছিল গোলকের প্লাস্টিকের তলে আর জিশানের গায়ে। চটপটি বাজির মতো ঠকাঠক শব্দ হচ্ছিল।

সাবুদানার ঘষায় জিশানের শার্ট ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেল। শরীর জ্বলতে লাগল। ও লাট খেয়ে পড়ে গেল বলের নীচের দিকে। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টা হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর মিলিটারি হুকুম ছুড়ে দিলেন বাতাসে : 'স্টেপ থ্রি : চেঞ্জ দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশান কনটিনিউয়াসলি।'

সঙ্গে-সঙ্গে বলের ঘূর্ণনের অক্ষ বদলাতে শুরু করল। জিশানের শরীরটা যে বলের নীচের দিকে চলে গিয়ে অস্থির যন্ত্রণা থেকে খানিকটা রেহাই পেয়েছিল সেটা উলটে গেল পলকে। এবং ওর শরীরটা নিয়ে বলটা বলতে গেলে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

আবার হাতঘড়ি দেখলেন শ্রীধর। চিৎকার করে বললেন, 'লাস্ট স্টেপ: ভ্যারি দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইর‍্যাটিক্যালি—ফ্রম হান্ড্রেড আর. পি. এম. টু টুয়েন্টি আর. পি. এম.—।'

এবার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রইল না।

ঘুরপাক খাওয়া বলের গতিবেগ মিনিটে একশো পাক থেকে কুড়ি পাকের মধ্যে যাচ্ছেতাইভাবে পালটাতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘূর্ণনের অক্ষও বদলে যাচ্ছিল বেহিসেবিভাবে। আর ইস্পাতের বলগুলো পাগলা বুলেটের মতো জিশানের শরীরে আঘাত করছিল। কোনওটা ঠোঁটে এসে লাগছে, কোনওটা চোখে। যন্ত্রণায় বারবার সিঁটিয়ে যাচ্ছিল ও। আর শরীর থেকে যে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা ও বুঝতে পারছিল প্লাস্টিকের বলের গায়ে লেপটে যাওয়া তাজা রক্তের দাগ দেখে।

এরকম শাস্তির কথা জীবনে কখনও কল্পনা করেনি জিশান। ওর শরীর থেঁতো হচ্ছিল। মনটাও ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। যন্ত্রণা আর কষ্ট ভুলে থাকার জন্য ও প্রাণপণে মিনি আর শানুর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওদের মুখগুলো বারবার ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছিল।

শেষ পর্যন্ত অসাড় প্রাণহীন একদলা কাদার মতো পড়ে রইল জিশান। বলটা ঘুরছে-তো-ঘুরছেই। ও কখন যে অজ্ঞান হয়ে গেছে সেটা ওর আর খেয়াল নেই।

শ্রীধর পাট্টা হাতঘড়ি দেখে নির্দেশ দিলেন, 'স্টপ অপারেশান।'

সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছু থেমে গেল। ঘরটা ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেল।

শ্রীধর খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হাঁটুতে চাপড় মেরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আ গ্রেট জব! আ গ্রেট জব! এতে জিশান পালচৌধুরীর শাস্তি হল, আবার খানিকটা ফিজিক্যাল ট্রেনিংও হল। ওর বডিটা নিয়ে যাও। ছাদে রেখে এসো। জ্ঞান ফিরলে ও নিজে থেকেই ঘরে ফিরে যেতে পারবে। আর কাল গেমস পার্টিসিপ্যান্টদের জিশানের শাস্তির ভিডিয়ো রেকর্ডিংটা দেখাবে। অ্যানালগ জিমে যখন সবাই ব্যাচ ধরে ট্রেনিং করবে তখন দেখিয়ো। নাও, বডিটা এবার বের করো—দেখা যাক, কতটা ছাতু হয়েছে।'

•

বিকেলের খেলাধুলো শেষ হলে মনোহর সিং আর খোকন জিশানের ঘরে এল। জিশান তখন ওর ফ্ল্যাটের লাগোয়া বারান্দায় বসে পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আকাশ রাঙানোর লীলা দেখছে। আর হয়তো আধঘণ্টার মধ্যেই সন্ধে পরিপাটিভাবে নেমে আসবে।

মনোহরদের নিয়ে ঘরে ঢুকে এল জিশান। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে গায়ের ব্যথাগুলো আর-একবার চাগিয়ে উঠল।

ভোরবেলা ক্লান্তির ঘুম ভাঙার পর কোনওরকমে ও ঘরে ফিরে এসেছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথাটা যেন লোহার তৈরি—বয়ে বেড়াতে কষ্ট হচ্ছে। গতকাল রাতের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ও। শাস্তি দেওয়ার ওই যন্ত্র—মানে, রোলারবলের আইডিয়াটা যদি শ্রীধর পাট্টার মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে তা হলে বলতেই হবে শয়তানটার এলেম আছে। সত্যি, মাত্র দশমিনিটের মধ্যে একটা সা-জোয়ানকে তুলোধোনা করে তুলতুলে করার ব্যাপারে রোলারবলের জুড়ি নেই।

রাতে জিশানের যখন জ্ঞান ফিরেছিল তখন ওর মনে হচ্ছিল ও কোনও আকাশযানে চড়ে শূন্যে ভেসে চলেছে। ওর মাথার ওপরে ঘোর কালো আকাশ, তারই মাঝে চাঁদ-তারার হলদে আলো, আর একজোড়া ধূমকেতুর লাল আর নীল লেজের ছটা।

জিশানের মনে হচ্ছিল, ও আর বেঁচে নেই। কোন এক অলৌকিক উপায়ে ওর মৃতদেহ চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ইহলোক ছেড়ে ভেসে চলেছে অন্য কোনও 'লোক'-এর দিকে।

মনোহর সিং আর খোকনকে দেখে খুশি হল জিশান। ওর শাস্তির খবর মনোহররা সকালবেলাতেই পেয়েছে। শ্রীধর পাট্টার শয়তানির কথা ভেবে রাগে ওদের গা চড়চড় করছিল, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করেনি। কারণ, জিপিসি-তে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে লুকোনো ক্যামেরার চোখ।

এখনও জিশানের ঘরে কথা বলতে এসে প্রথমেই ক্যামেরার কাচের চোখগুলো খুঁজে বের করতে চাইল মনোহর। সিলিং-এর আনাচেকানাচে তাকাল।

সেখানে দুটো ক্যামেরা খুঁজে পেল ও। জিশান ইশারায় বোঝাল, দুটো নয়, আরও অনেক ক্যামেরা লুকোনো আছে। পরে সুযোগ পেলে বলবে।

জিপিসি-র গেস্টহাউসে ফ্ল্যাটগুলো একই ছাঁদের হলেও ক্যামেরাগুলো একই নিয়মে বসানো নয়। এটা জিশান যেমন জানে, মনোহরও তেমনই জানে।

ঘরে ঢুকে জিশান বিছানায় বসল।

মনোহর আর খোকন দুটো সোফায় বসল।

জিশান বালিশের পাশে রাখা রিমোট ইউনিট নিয়ে বোতাম টিপল। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই একজন অ্যাটেনড্যান্ট এসে হাজির হল। জিশান তাকে তিনকাপ কফির অর্ডার দিল। সঙ্গে ফিঙ্গার চিপস। জিশান জানে, এই গেস্টহাউসের সার্ভিসের গতি অবাক করে দেওয়ার মতো।

মনোহর জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ, জিশান ভাইয়া?'

জিশান হেসে বলল, 'যেমনই থাকি, দু-তিনদিনের মধ্যে ফিট হয়ে উঠতে হবে। তার জন্যে এরাও কম চেষ্টা করছে না....।'

'তার মানে?' ভুরু কপালে তুলল মনোহর।

'সকালে দু-দুবার মেডিকরা আমাকে দেখে গেছে। ইনজেকশান দিয়ে গেছে। ''গেট ওয়েল সুন'' লেখা রঙিন কার্ড পাঠিয়েছে—সঙ্গে ফুলের তোড়া...।' ইশারায় বালিশের পাশে রাখা কার্ড আর ফুলের তোড়া

দেখাল জিশান। একগুচ্ছ গোলাপ। এখনও সতেজ। ওদের রঙের রোশনাই দেখিয়ে জিশানকে যেন বলছে, 'ভালো হয়ে ওঠো।'

'এসবের মতলব?' মনোহরের ভুরু এখন কুঁচকে গেছে।

'মতলব আর কী! সিন্ডিকেট মনে করছে আমি কিল গেম-এর একজন পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট। আমি থাকলে ফাইট জমবে...।'

খোকন বলল, 'পোটেনশিয়াল মানে?'

জিশান খোকনের দিকে তাকাল। সত্যি, পোটেনশিয়াল শব্দটার মানে ওর জানার কথা নয়। ও এসেছে চিৎপুরের খালধারের বস্তি থেকে। হাংরি ডলফিন গেম-এ ও নাম দিয়েছে। মনে অনেক আশা যে, ও জিতে যাবে।

খোকনের চোখ টানা-টানা। কেমন যেন একটা কবি-কবি ভাব। নাক টিকলো। গাল একটু ভাঙা। হঠাৎ করে ওর দিকে তাকালে মনে হয়, ওর চোখ দুটো দূরের কোনও স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে।

খোকন যখন হাংরি ডলফিন গেম-এ নাম দিয়ে ওল্ড সিটি ছেড়ে চলে আসে তখন ওর মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ওরা খোকনকে পিছু ডাকছিল বারবার। কিন্তু খোকন ওদের চোখের জলে বা ডাকে ফিরে তাকায়নি।

দিন-দশেক আগে এক বৃষ্টির রাতে খোকনের বাবা রাস্তায় গুণ্ডার দলের পাল্লায় পড়েছিল। মুশকো চেহারার মোটরবাইক গুন্ডার দল তাড়া করেছিল ওর বাবাকে। প্রাণভয়ে ছুটতে-ছুটতে সে শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারেনি। খানা-খন্দ আর বৃষ্টির কাদা-জলে ভরতি নোংরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাড়া করে আসা প্রথম মোটরবাইকটা খোকনের বাবাকে চাকার তলায় চেপে ধরে। লোকটার বাইকের ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করছিল আর চাকার নীচে চাপা পড়া উরুর ভেতরে থেকে-থেকেই বিদ্যুৎঝলকের মতো শকওয়েভ ঠিকরে উঠছিল। খোকনের বাবার কাতর চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল, কিন্তু তাকে সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসেনি—না ঘুষ খাওয়া, নেশা করা, ধুঁকে-ধুঁকে বেঁচে থাকা পুলিশের কেউ, না আমজনতার কেউ।

মাতাল গুন্ডার দল গলা ফাটিয়ে হাসছিল। বাতাসে ভেসে উঠছিল মদের গন্ধ। ওদের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল মোটরবাইকের নীচে কোনও মানুষ চাপা পড়েনি—চাপা পড়েছে একটা দুর্গন্ধওয়ালা ছুঁচো।

খোকনের বাবার পকেটে একশো দশ টাকা মতো ছিল—আর কিছু খুচরো পয়সা। গুণ্ডার দল খুচরো পয়সা সমেত সব টাকা কেড়ে নিয়েছিল। এমনকী পরনের জামা-প্যান্টটাও খুলে নিয়েছিল মজা করার জন্য।

হেনস্থা আর অপমান সহ্য করে মাঝবয়েসি মানুষটা জল-কাদা মাখা অবস্থায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। পরনে শুধু জাঙ্গিয়া আর গেঞ্জি। খোকনের বেশ মনে আছে, জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে খুব চাপা গলায় মায়ের নাম ধরে ডেকেছিল বাবা। খোকন সে-ডাক শুনতে পেয়েছিল। মা ছুটে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে স্বামীর ওই দুর্দশা দেখে চাপা চিৎকার করে উঠেছিল। আলনা থেকে একটা শাড়ি টেনে নিয়ে চুপিচুপি চলে গিয়েছিল বাইরে।

সেই শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে বাবা বাড়িতে ঢুকেছিল। তখন খোকন, ওর ভাই, আর ছোটবোন বাবাকে ওই অদ্ভুত পোশাকে দেখেছিল। ওদের দিকে চোখ পড়তেই বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। মায়ের নাম ধরে ডেকে উঠে কান্না-ভাঙা গলায় বলেছিল, 'জানো, শান্তা, এ শহরে আর কোনও মানুষ নেই—সব জানোয়ার। তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের মতো কিছু ইঁদুর, ছুঁচো, আর পোকামাকড়। আমি এত চিৎকার করলাম...একটা লোকও আমাকে বাঁচাতে ছুটে এল না! একটা লোকও না! শান্তা, এ-শহরের মানুষগুলো সব মরে গেছে। আমরা কেউই আর বেঁচে নেই, বুঝলে? অনেকদিন আগেই আমরা মরে গেছি।'

খোকনের মনে আছে, সেদিন সারারাত ও ঘুমোতে পারেনি। আরও মনে আছে, পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা বাবার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না সারারাত ধরে ওর বুকের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। বারবার ওর

কানে বাজছিল বাবার কান্না মেশানো কথাগুলো : '...এ-শহরের মানুষগুলো সব মরে গেছে...।'

প্লেট টিভিতে দেখানো নানান ধরনের খেলা খোকনকে বরাবর নেশার মতো টানত। সেইসঙ্গে টাকার অভাবটা ওকে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিত। সেই রাতের পর ও মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে করে হোক, বাবার চোখের জল ও মুছবেই।

সাঁতারে খোকন ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ। ওয়াটার পোলো ও ভালোই খেলে। তাই ওর মনে হল, হাংরি ডলফিন খেলাটাই ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

হাংরি ডলফিন গেম-এ নাম দিয়ে যখন ও ওল্ড সিটি ছেড়ে চলে আসে তখন ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ও মুখ ফুটে বাবাকে বা মা-কে বলতে পারেনি, 'তোমাদের চোখের জল মোছার জন্যেই আমি নিউ সিটিতে যাচ্ছি—।' ওর খুব সাধ, বিশলাখ টাকা প্রাইজ জিতে মা-বাবাকে ও প্রাইজ দেবে। দেখিয়ে দেবে, খোকন ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে পারে।

ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিল জিশান। খোকনই ওকে সব বলেছে। বলেছে, দু:খের কথা, বলেছে স্বপ্নের কথাও।

কাল বিকেলের পর থেকে জিশান খোকনের কাছে 'জিশানদা' হয়ে গেছে। এলিভেটর ফাইটটা জিশানকে খোকনের কাছে হিরো করে দিয়েছে।

খোকন আবার জিগ্যেস করল, 'জিশানদা, পোটেনশিয়াল মানে?'

জিশান হেসে বলল, 'পোটেনশিয়াল মানে যে হেভি লড়বে—সহজে হারবে না।'

খোকন মনোহরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিন্ডিকেট তা হলে ঠিকই ভেবেছে। কী বলো, মনোহরদা?'

মনোহর বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল : 'হুঁ—।'

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে অ্যাটেনড্যান্ট ঢুকল। হাতের ক্রিস্ট্যাল ট্রে-তে সাজানো তিনকাপ কফি আর ফিঙ্গার চিপস।

সোফার সামনে রাখা টেবিলে কফি আর ফিঙ্গার চিপস সাজিয়ে দিয়ে অ্যাটেনড্যান্ট চলে গেল।

ফিঙ্গার চিপস তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসাল মনোহর। চোখ বুজে চিবোতে-চিবোতে বলল, 'এরা রান্নাগুলো দারুণ করে, জিশান ভাইয়া।'

জিশান ছোট্ট করে 'হুঁ' বলল। কিন্তু মনে-মনে বাবার কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা ভাবছিল। বহু যুগ আগে দেবতাদের সামনে পশুবলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। তখন বলির ঠিক আগে পশুটিকে প্রাণভরে তার প্রিয় খাদ্য খাওয়ানো হত।

সে-কথা ভাবতে-ভাবতে মনোহরের দিকে দেখছিল জিশান। বাচ্চা ছেলের মতো তৃপ্তিতে ফিঙ্গার চিপস খাচ্ছে আর ধোঁয়া ওঠা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

জিশানেরও একই দশা, কিন্তু ও মনোহরের মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে কই?

জিশান আবারও মনে-প্রাণে চাইল, ওকে যেন মনোহরের সঙ্গে মরণপণ মোকাবিলায় না নামতে হয়।

খোকন চুপচাপ কফি খাচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'মনোহরদা, জিশানদাকে পুনিয়ার কথা বলো...।'

জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল। পুনিয়া? কে পুনিয়া?

ও সে-কথাই জিগ্যেস করল মনোহরকে।

মনোহর বলল, 'পুনিয়া আমাদের গ্রুপের না—অন্য গ্রুপের। ওর পুরো নাম পুনিয়া সরকার—খিদিরপুরে থাকত...।'

'থাকত মানে?'

'কাল রাতে লাস্ট রাউন্ডে মারা গেছে।'

জিশান বুঝতে পারল। পুনিয়া কিল গেম-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডগুলোর লাস্ট রাউন্ডে মারা গেছে।

কিল গেম পার্টিসিপ্যান্টদের নিয়ে নানান কোয়ালিফাইং রাউন্ডে যে এতরকম বিপজ্জনক 'খেলা' আছে সেটা জিশান জানত না। কারণ, সুপারগেমস কর্পোরেশন কোনওদিনই টিভিতে এসব নিয়ে প্রচার করেনি। এগুলো হয়তো সিন্ডিকেটের ট্রেড সিক্রেট।

কফি খেতে-খেতে মনোহরের মুখে পুনিয়ার কথা শুনল জিশান।

পুনিয়া জিশান-মনোহর-খোকনদের গ্রুপে নয়—অন্য গ্রুপে। ও জিশানদের অনেক আগেই জিপিসি-তে এসেছিল। পেটানো স্বাস্থ্য, লড়াকু ছেলে। ছোটবেলা থেকে খতরনাক পাড়ায় মানুষ। মারপিট করতে-করতেই বড় হয়েছে।

কিল গেম-এর অন্য সব রাউন্ডগুলোয় পুনিয়া অনায়াসেই জিতেছে। কিন্তু কাল রাতে ছিল ওর 'পিট ফাইট'। একটা বিশাল গর্তের মধ্যে দুজন ফাইটারের লড়াই। অনেকেই সেই লড়াই দেখতে যায়। মনোহর আর খোকনও গিয়েছিল।

জিশান পিট ফাইট নিয়ে আগে কিছু শোনেনি। তাই ওই ফাইট দেখার কোনও উৎসাহ ওর ছিল না। তবে এখন খোকনের কাছে শুনল, পিট ফাইট শুধু গায়ের জোরের লড়াই নয়—মনের জোরেরও লড়াই।

গতকাল রাতে পুনিয়া অন্য আর একটা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান জাব্বা নামে এক ফাইটারের হাতে মারা গেছে। এ নিয়ে জাব্বার হাতে মোট দুজন পার্টিসিপ্যান্ট খতম হল। মনোহর আর জিশান যদি পরের দুটো রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে তা হলে ওরা লাস্ট রাউন্ডে যাবে। তখন ওরা পিট ফাইটে কার মুখোমুখি হবে কে জানে!

এখানে কোনও পার্টিসিপ্যান্ট শুধু নানান রাউন্ডে জিতলেই কিল গেম-এ তাকে নেওয়া হবে না। ওদের ট্রেনিং শিডিউল-এর নানান ধাপে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্কিল, আর্মস স্কিল, রিঅ্যাকশন টাইম—এসবের ওপরে নম্বর দেওয়া হয়। সেইসব নম্বর যোগ করে তারপরই বেছে নেওয়া হবে একজনকে—কিল গেম-এর জন্য।

জাব্বাকে দেখে মনোহর আর খোকন বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

মনোহর ভয় পেয়েছে নিজের আর জিশানের জন্য, আর খোকন ভয় পেয়েছে মনোহরের জন্য—আর কিছুটা জিশানের জন্যও।

মনোহর বলল, 'জিশান ভাইয়া, জাব্বার চোখ দুটো খুনির মতো। সবাই বলাবলি করছে, লোকটা নাকি তিন-চারবার জেল খেটেছে। আর জাব্বা বলছে, কিল গেম-এ ও চান্স পাবেই—আর তারপর ওই তিনটে খতরনাক কিলারকে ধরে ও মটমট করে ঘাড় মটকে দেবে—পাটকাঠির মতো। তারপর লুটে নেবে একশো কোটি টাকা।'

জিশান কোনও কথা বলল না। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশের আলো কমে গিয়ে অন্ধকার নামছে। হঠাৎই ওর মনে হল ওর জীবনটা আকাশেরই মতো।

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও ভেতরে-ভেতরে কী একটা হিসেব মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হঠাৎই ও বলে উঠল, 'আচ্ছা জিশানদা, পরের দুটো রাউন্ডে তুমি আর মনোহরদা হেরে গেলে কেমন হয়? তা হলে তোমাদের আর জাব্বার মুখোমুখি পড়তে হয় না...।'

খোকন এই কথা বলামাত্রই জিশান কাশতে শুরু করল। কাশতে-কাশতে মাথা নিচু করে মুখে হাত চাপা দিল ও।

মনোহর আর খোকন একটু অবাক হয়েই জিশানকে দেখতে লাগল।

জিশান অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে খোকনের দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'হারার কথা বোলো না, খোকন। আমি আর মনোহর ডরপোক না। জাব্বাকে হাতে পেলে আমরা গুঁড়ো করে দেব...।'

খোকন তা সত্ত্বেও বিড়বিড় করে বলল, 'জাব্বাকে তুমি তো দ্যাখোনি, তাই এ-কথা বলছ। মনোহরদা দেখেছে—।'

জিশান নেমে পড়ল বিছানা থেকে। আবার কাশতে শুরু করল। বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে কোনওরকমে খোকনকে বলল, 'খোকন, শিগগির বাথরুমে চলো। আমার—আমার মাথা চাপড়ে একটু জল ঢেলে দেবে। ও:, গলায় কী যেন একটা আটকে গেছে—।'

প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল জিশান। ওর পিছন-পিছন ঢুকল খোকন। আর উদ্বেগ নিয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল মনোহর।

বাথরুমে কোনও টিভি ক্যামেরা নেই। জিশান সেটা ভালো করেই জানে। তাই বাথরুমে ঢুকেই ওর কাশি আর হাঁপানি থেমে গেল। ব্যাপারটা যে অভিনয় ছিল সেটা খোকন এখন বুঝতে পারল।

জিশান চাপা গলায় বলল, 'তোমার মতো হদ্দ বোকা আর দেখিনি। তুমি জানো না, এখানে কোয়ালিফাইং রাউন্ডগুলোয় ইচ্ছে করে হেরে যাওয়ার চেষ্টা করলে কী হয়? সিন্ডিকেটের লোকরা প্রত্যেকটা গেমের ভিডিয়ো রেকর্ডিং দ্যাখে—স্লো মোশানে। তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, কে ইচ্ছে করে কোন গেম হারছে। তখন কপালে জুটবে রোলারবল, শক ট্রিটমেন্ট, হাংরি ডলফিন বা ম্যানিম্যাল রেস—উইদাউট প্রাইজ মানি—অথবা সবচেয়ে খারাপ শাস্তি—ডগ স্কোয়াড। তোমার কথাগুলো টিভি ট্রান্সমিশানে চলে যাচ্ছে সিন্ডিকেটের কাছে। সেইজন্যেই আমি কাশির অ্যাকটিং করে তোমাকে থামাতে চেয়েছি...।'

'সরি, জিশানদা—আমার খেয়াল ছিল না...।'

খোকনের অপরাধী-অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল জিশান, আর শাস্তিগুলোর কথা ভাবছিল।

রোলারবল তো ও নিজেই চেখে দেখেছে। বাকি শাস্তিগুলোর কথা ও অন্য কম্পিটিটারদের মুখে শুনেছে। শুনেছে, এই সব শাস্তিতে নাকি বেশ কয়েকজন আগে মারা গেছে।

যেমন, শক ট্রিটমেন্টে ষোলোটা ইলেকট্রোড শরীরে লাগিয়ে বিভিন্ন তীব্রতার ভোল্টেজ শক দেওয়া হয়। আর ডগ স্কোয়াড শাস্তির বেলা থাকে আটটা ক্ষুধার্ত অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তারা অপরাধীকে মরজি মতন ছিন্নভিন্ন করে।

জিশান খোকনকে তাড়া মেরে বলল, 'এখন শিগগির আমার মাথায় জল ঢালো। মনে রেখো, তোমার হাতও ভিজে থাকতে হবে—কারণ, আমাদের দুজনের অ্যাকটিংই ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। সিন্ডিকেটের গোপন চোখ সবকিছু খুঁটিয়ে নজর করে...।'

ভেজা মাথা নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল জিশান। আপাতত অ্যাকটিং করে ও সিন্ডিকেটের টিভি ক্যামেরাকে বোকা বানাল বটে, কিন্তু জাব্বার চিন্তাটা ওর মাথার ভেতরে বাসা বেঁধে রইল।

•

দেখতে-দেখতে পরের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের দিন এসে গেল। সাতদিন বিশ্রাম পেয়ে জিশান এখন পুরোপুরি সুস্থ, শরীরে আগের মতন জোর ফিরে পেয়েছে। স্টেয়ার ফ্লেয়ার ব্যায়ামটা ও অনায়াসেই ষাটবার করে ফেলতে পারছে। পায়ের কাফ মাসল বা লিগামেন্টে কোনও স্ট্রেইন টের পাচ্ছে না।

স্টেয়ার ফ্লেয়ার ব্যায়ামটা একটু অদ্ভুত ধরনের। মেঝের ওপরে কংক্রিটের তৈরি ছ'ধাপ সিঁড়ি তৈরি করা আছে। ব্যায়াম যে করবে তাকে ছ'ধাপ সিঁড়ি উঠে আবার পিছনদিকে নেমে আসতে হবে। ব্যায়াম করতে-করতে তাকে ক্রমশ এই ওঠা-নামার গতি বাড়াতে হবে।

ব্যায়ামের দ্বিতীয় ধাপটা বেশ কঠিন। ওপর থেকে ছ'ধাপ নীচে নেমে আবার পিছনদিকে ছ'ধাপ উঠতে হবে। এবং আগের মতোই ওঠা-নামার গতি ধীরে-ধীরে বাড়াতে হবে।

শেষ ধাপে এসে ব্যায়ামটা অদ্ভুত বাঁক নিয়েছে।

এবারে সিঁড়ি ওঠা-নামার কাজ করতে হবে পাশ থেকে। তবে একবার সিঁড়ির দিকে মুখ করে, আর-একবার পিছন ফিরে।

জিশান এই শেষ ধাপটাই অনায়াসে ষাটবার করে ফেলতে পারছিল। তাতে ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাউন্ডটা ও সহজেই পার হয়ে যাবে।

দুপুর আড়াইটের সময় ওরা গেম পয়েন্টের দিকে রওনা হল। ওদের পরনে সেই একই পোশাক : হলদে টি-শার্ট আর কালো বারমুডা প্যান্ট।

জিশান গুনে দেখল : মাত্র এগারোজন পার্টিসিপ্যান্ট। নির্লিপ্ত মুখে সবাই হেঁটে চলেছে গেম পয়েন্টের দিকে। ওদের সামনে-পিছনে রয়েছে পিস ফোর্সের চারজন গার্ড। তাদের প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে শকার। এ ছাড়া সামনে হেঁটে চলেছে লাল ইউনিফর্ম পরা দুজন ইনস্ট্রাকটর। কোমরে ল্যাপটপ, হাতে রিমোট ইউনিট।

গেম পয়েন্টটা বেশি দূরে নয়, তাই ওরা সবাই সার বেঁধে হেঁটে চলেছে। দূরে হলে ওরা গেমস মোবাইলে চড়ে রওনা হত। গেমস মোবাইল সাপের মতো লম্বা মোটরগাড়ি। একটা গাড়িতে পাইলট-কেবিনের সঙ্গে আরও ন'টা সিট একজনের পিছনে আর-একজন করে সাপের মতো জোড়া আছে। গাড়িটা এমন অদ্ভুতভাবে তৈরি যে, বাঁক নেওয়ার সময় গাড়ির পিছনের অংশটা অপকেন্দ্র বলে ছিটকে গিয়ে দুর্ঘটনা বাধায় না। জিশানকে একজন ইনস্ট্রাকটর বলেছে, গাড়ির প্রত্যেকটা ক্যারেজে ভেলোসিটি আর কার্ভেচার সেন্সর লাগানো আছে। তা দিয়ে ভেলোসিটি আর রেডিয়াস অফ কার্ভেচার সেন্স করে ক্যারেজের দশটা অটো ব্রেকিং মেকানিজম কাজ করে।

মসৃণ রাস্তা ধরে জিশানরা হেঁটে যাচ্ছিল। মনোহর সিং রয়েছে লাইনের সামনের দিকে, আর জিশান পিছনের দিকে। মনোহর মাঝে-মাঝে জিশানের দিকে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে জিশান চারপাশটা দেখছিল। চারদিকে সব ছবি সাজানো। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই কোন অলৌকিক রূপকার বিমূর্ত জ্যামিতিক ছাঁদে ছবির মতো করে সবকিছু তৈরি করেছে।

এই চোখজুড়োনো পরিবেশে এত হিংস্রতা, এত নৃশংসতা!

মাথার ওপরে চোখ তুলে তাকাল জিশান। নীল আকাশে গনগনে সূর্য। এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে শুটার। ওদের ধাতুর শরীরে রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে।

জিশান চোখ নামাল। ওর মনে হল, 'আমরা যাচ্ছি এগারোজন—কিন্তু কমপিটিশানের পরে এই পথ ধরে ফিরে আসব ক'জন?'

জিশানের আরও মনে হল, যারা আর ফেরে না, তাদের নিয়ে কী করে সুপারগেমস কর্পোরেশন?

এমন সময় হঠাৎই ওর খেয়াল হল, সুরেলা মিষ্টি গলায় কে যেন বলছে, 'টা-টা...টা-টা...।'

এখানেও প্লেট টিভির যন্ত্রণা! জিশান চোখ ফেরাল না—সামনের প্রতিযোগীর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওর মনে হল, ওদের চলার পথের দুপাশে মিহি ঘাসে ছাওয়া সবুজ লন। লন ছাড়িয়ে সুন্দর-সুন্দর বাড়ি। ওগুলো জিপিসি-র নানান কর্মীদের কোয়ার্টার। এখানে আলটপকা প্লেট টিভি আসবে কোথা থেকে!

অতএব চোখ ফিরিয়ে তাকাল জিশান। এবং ওর চোখ আটকে গেল।

বাঁ-দিকের একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। গায়ে লেসের কাজ করা উজ্জ্বল গোলাপি ফ্রক। মাথায় দুটো ছোট-ছোট বিনুনি, তার প্রান্তে গোলাপি ফিতের ফুল।

বছর ছয়েকের এই ফুটফুটে দেবশিশু জিশানদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাত নাড়ছে, আর 'টা-টা' বলছে।

সঙ্গে-সঙ্গে শানুর কথা মনে পড়ে গেল। চোখে জল এসে গেল জিশানের। এই বাচ্চা মেয়েটা কি গুনতে জানে? তা হলে ওদের ফেরার সময় দেখবে এগারোজন আর নেই। এমন তো হতেই পারে, সেই হারিয়ে

যাওয়া কয়েকজনের মধ্যে জিশান পালচৌধুরী থাকবে! মেয়েটির সঙ্গে জিশানের আর কোনওদিনই দেখা হবে না! শানুর সঙ্গেও আর দেখা হবে না কোনওদিন!

জিশানের অন্তর ফুঁপিয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরই ওর বুকের ভেতরে কীরকম একটা উথালপাথাল হয়ে গেল।

না, জিশান ফিরবেই! এই পথ দিয়েই ও ফিরবে। এই মেয়েটিকে আবার ও দেখতে পাবে। শানুকেও দেখবে আবার। মিনিকেও।

সামনে যতই কঠিন খেলা থাকুক, জিশান তার চেয়েও কঠিনভাবে লড়বে।

জিশান হাত তুলে বাচ্চাটির 'টা-টা' ফিরিয়ে দিল। দেখল, ওদের মধ্যে আরও কেউ-কেউ বাচ্চাটাকে 'টা-টা' করছে।

বাচ্চাটার মিষ্টি হাসির উত্তরে হাসল জিশান। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন শানুর সঙ্গে ইশারায় খেলা করছে।

ওরা এগিয়ে যেতে লাগল। একটু দূরে ছোটখাটো গাছপালার ভিড় চোখে পড়ল। তার পাশে একটা একতলা বাড়ির মতন। সেখানে পৌঁছে সবাই থামল।

জিশান দেখল, গাছপালাগুলো যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটা বিশাল লোহার গেট। গেটের ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা : 'KOMBAT PARK'।

জিশানের অল্পবিস্তর পড়াশোনা থাকলেও প্রথম শব্দটার মানে ও বুঝতে পারল না।

একজন ইনস্ট্রাকটর চেঁচিয়ে ওদের থামতে বললেন।

'সবাই থামুন। আমরা কমব্যাট পার্কে পৌঁছে গেছি। আমাদের এই রাউন্ডটা এখানেই হবে। এটা হচ্ছে সারপ্রাইজ রাউন্ড...।'

সারপ্রাইজ রাউন্ড? জিশানের অবাক লাগল। ও পার্কটাকে দেখছিল। নিউ সিটির অন্য সবুজের মতো অতটা সাজানো-গোছানো নয়। বরং ভেতরের গাছপালাগুলো বেশ এলোমেলো। তবে অনেক উঁচু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। এর ভেতরে কী আছে কে জানে!

সেটা জানা গেল একটু পরেই।

ওদের নির্দেশ দিলেন ইনস্ট্রাকটর : 'পাশের হলঘরটায় সবাই ঢুকে পড়ুন—।'

ওরা একে-একে ঢুকে পড়ল সেই একতলা বাড়িটার হলঘরে।

হলঘরের দরজায় লেখা : 'Kombat Park Control Room'। ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা, চুপচাপ। একদিকে সারি-সারি গোটা চল্লিশ সবুজ রঙের চেয়ার। আর তার বিপরীতে সাদা পরদা—অনেকটা সিনেমাহলের মতন।

ইনস্ট্রাকটরের কথামতো ওরা সিটে বসে পড়ল। একটু পরেই ঘর অন্ধকার করে পরদায় সিনেমা শুরু হল। সঙ্গে বাংলা ধারাবিবরণী। তবে একজন ইনস্ট্রাকটর চেঁচিয়ে বললেন যে, প্রত্যেক সিটের সঙ্গে ট্রানস্লেটর হেডফোন আছে। সেটা ব্যবহার করলেই পছন্দসই ভাষায় ধারাবিবরণী শোনা যাবে।

সিনেমার প্রথমে কমব্যাট পার্কের নানান তথ্য জানানো হল। সঙ্গে হেলিকপ্টার কিংবা শুটার থেকে তোলা পার্কের ছবি।

পার্কের বেশ কিছু জায়গায় ছোট-ছোট ডোবা রয়েছে। এ ছাড়া আছে গাছপালা আর উঁচু-নিচু ঢিবি।

পার্কের বন্যপ্রাণী মাত্র চাররকম। আর, পাখি আছে সতেরোরকম।

বন্যপ্রাণীদের প্রথম তিনটি হল হরিণ, বুনো শুয়োর এবং ছাগল।

আর চতুর্থটি হল কোমোডো ড্রাগন।

এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্যামেরা জুম করে চলে এল নীচে—একেবারে পার্কের মাটিতে। দেখা গেল, প্রায় দশফুট লম্বা একটা কোমোডো ড্রাগন ধারালো দাঁতে একটা চিতল হরিণের পেট খাবলে খাচ্ছে।

প্রাণীটার ভয়ঙ্কর চেহারা জিশানকে কাঁপিয়ে দিল। ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ধারাবিবরণী ঠিকমতো ওর কানে ঢুকছিল না।

'...জায়ান্ট মনিটর বা কোমোডো ড্রাগন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাপের লিজার্ড স্পিসিজ। একসময়ে এই ড্রাগন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল, কিন্তু পরিবেশবিদ আর প্রাণিবিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আবার এরা সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় দশ-বারো ফুট পর্যন্ত হয়, আর ওজন একশো কুড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ কেজি মতন। এরা জোরে ছুটতে পারে—টিকটিকির মতো। আর ওদেরই মতো চটপট গাছ বেয়ে উঠতে পারে।

'একসময় এই ড্রাগন শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় কোমোডো, রিনটজা, পাডার আর ফ্লোরেস দ্বীপে পাওয়া যেত। কোমোডো দ্বীপ থেকেই এদের নাম কোমোডো ড্রাগন হয়েছে। আর ইংরেজি ''Komodo'' এবং ''Combat'' শব্দ জুড়ে আমরা Kombat শব্দ তৈরি করেছি। যার মানে হল, কোমোডোর সঙ্গে লড়াই...।'

এটাই তা হলে সারপ্রাইজ রাউন্ড!

জিশান ভয়ের চোখে প্রাণীটাকে দেখছিল।

গোসাপের মতো দেখতে কিন্তু গোসাপের চেয়ে মাপে অনেক বড়। খসখসে ধূসর চামড়া—তাতে পদ্মকাঁটার মতো বুটি। শক্ত চোয়াল, বড় মাপের ধারালো দাঁত। তেমনই ধারালো পায়ের নখ।

জিশান দেখছিল, জমিতে লাঙল দেওয়ার মতোই প্রাণীটার দাঁত কত সহজে ঢুকে যাচ্ছে হরিণের পেটে। তারপর মাথার এক ঝাঁকুনিতে টেনে বের করে নিচ্ছে মাংস আর নাড়িভুঁড়ি। ওটার দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরো আটকে রয়েছে, ঝুলছে নাড়িভুঁড়ির অংশ।

জিশানের গা ঘিনঘিন করছিল।

সিনেমার ভাষ্যকার তখন বলছে, '...কোমোডো ড্রাগন কখনও তেড়ে গিয়ে মানুষকে আক্রমণ করেছে এমন শোনা না গেলেও কমব্যাট পার্কে বহুবার এই ঘটনা দেখা গেছে। কারণ, কোমোডোগুলো ক্ষুধার্ত। সবাই বলে হিংস্রতায় কোমোডো কুমিরের চেয়ে কম—কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, খুব একটা কম নয়...।'

এরপর ক্যামেরা পার্কের নানান অঞ্চল দেখাতে লাগল। গাছপালা, পাখি, হরিণ, ছাগল, দাঁতালো শুয়োর—আর অসংখ্য ছোট-বড় কোমোডো। জলায়, ডাঙায়, গাছে।

দেখতে-দেখতে জিশান ভাবছিল, এই পার্কে ঢুকে ওদের ঠিক কী করতে হবে? কীভাবে লড়াই করতে হবে কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে? হলের সাউন্ড সিস্টেমে তখন শোনা যাচ্ছে : '...কোমোডোর চোখের নজর খুব সাংঘাতিক—প্রায় তিনশো মিটার দূর থেকেও ওরা দেখতে পায়। তবে ওদের রেটিনায় রড না থাকায় ওরা অল্প আলোয় ভালো করে দেখতে পায় না। এ ছাড়া ওদের শোনার ক্ষমতা মানুষের তুলনায় বেশ কম। মানুষ যেখানে 20 থেকে 20,000 হার্ৎজ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায় সেখানে কোমোডো ড্রাগনের শব্দ শোনার কম্পাঙ্ক-সীমা হল 400 থেকে মাত্র 2000 হার্ৎজ।

'ওদের হলদে রঙের চেরা জিভ একটি আশ্চর্য যন্ত্র...।'

ক্যামেরা একটি কোমোডোর ক্লোজ-আপ দেখাল। প্রাণীটা বারবার সাপের মতো চেরা জিভ বের করছে আর মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে।

'এই জিভ দিয়ে ওরা বাতাস থেকে ঘ্রাণ নেয়—ঠিক সাপের মতো। তারপর জিভ ভেতরে ঢুকিয়ে ওরা টাকরায় ঠেকায়। সেখানে আছে জ্যাকবসনস অরগ্যান। এই অঙ্গটি বাতাস থেকে পাওয়া ঘ্রাণরেণুর রাসায়নিক চরিত্র বিচার করে কোমোডোর কাছে সংকেত পৌঁছে দেয় যে, কাছাকাছি কোনও শিকার কাছে কিনা...।'

হঠাৎই জিশানের কানের কাছে ফিসফিস করে কে বলে উঠল, 'বেফায়দা এই বকবকানির কী মানে আছে, জিশান ভাইয়া? তার চেয়ে জলদি বলে ফ্যালো পার্কমে হামকো কেয়া করনা হ্যায়...।'

জিশান পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মনোহরকে চিনতে পারল। ও কখন যেন জিশানের ঠিক পিছনের সিটটাতে এসে বসেছে।

জিশান অন্ধকারেই হাসল, বলল, 'সিরফ জিন্দা রহেনা হ্যায়, মনোহর। স্রেফ বেঁচে থাকতে হবে। সে কোমোডো ড্রাগনই হোক কি ডাইনোসর—।'

পরদায় এবার কোমোডোর চোয়াল আর দাঁতের ক্লোজ-আপ দেখাল। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা মাংসের টুকরোও দেখা গেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল ভাষ্যকারের গলা : '...কোমোডোর কামড় খেয়েও যদি কোনও হরিণ বা ছাগল পালিয়ে বেঁচে যায় তা হলে এটা নিশ্চিত যে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। কারণ, কোমোডোর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা মাংসের টুকরো পচে গিয়ে সেখানে নানান ব্যাকটিরিয়া তৈরি হয়। সেইসব ব্যাকটিরিয়ার ইনফেকশানে কোমোডোর কামড় খেয়েও বেঁচে যাওয়া শিকার কিছুদিন পর মারা যায়। তবে কোমোডোর নিজের শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই এইসব ব্যাকটিরিয়ার প্রতিষেধক আছে। কারণ, কোমোডোরা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কামড় খায়, আহত হয়, বা ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন তাদের কোনওরকম ইনফেকশানই হয় না—দিব্যি বেঁচে থাকে।

কোমোডো ড্রাগনরা...।'

আরও মিনিট-পনেরো কোমোডো-কাহিনি চলল। তারপর জিশানরা সিমুলেশান দেখতে পেল। অর্থাৎ, কোমোডোর সঙ্গে কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টরা কীভাবে লড়বে তার ভিডিয়ো গেম।

কমব্যাট পার্কের লোহার গেট খুলে গেল। তার একপাশে দাঁড় করানো একটা বাক্সের গায়ে হলদে গেঞ্জি পরা কতকগুলো মানুষ-পুতুল তাদের স্মার্ট কার্ড টানল। তারপর ঢুকে পড়ল পার্কে।

চারটে শুটার পার্কের আকাশে উড়তে লাগল। পুতুলগুলোর ওপরে নজর রাখতে লাগল।

ভিডিয়ো সিমুলেশানে প্রতিযোগীদের নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেখানো হল। ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটছে—উঁচু-নিচু ঢিবি পেরিয়ে, জলাভূমি পেরিয়ে, লতা-পাতার আড়াল সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আর ওদের তাড়া করে চলেছে অসংখ্য ক্ষুধার্ত কোমোডো।

একজন ইনস্ট্রাকটর তখন বলছেন, 'আজকের এই কমপিটিশানের জন্যে পার্কের কোমোডোগুলোকে গত দশদিন ধরে ছাগল, হরিণ বা শুয়োর সাপ্লাই করা হয়নি। ওরা একটা শিকার ধরে তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। তাতে যে-ক'টা কোমোডো মারা গেছে সেগুলোকে বাকিরা দিব্যি ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন খিদের জ্বালায় ওদের সাংঘাতিক অবস্থা। আপনারা সবাই প্রাণপণে ছুটবেন, দরকার হলে গাছ বেয়ে উঠবেন—কি জলে ঝাঁপ দেবেন। কারণ, আপনাদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই : কমব্যাট পার্ক থেকে বেঁচে বেরোতে হবে—যদিও বেরোনোর ব্যাপারটা একটু ঝামেলার।

সিমুলেশানের দিকে আপনারা লক্ষ রাখুন...।' জিশানরা লক্ষ রাখছিল।

মানুষ-পুতুলগুলো ছুটে পালাচ্ছিল, লাফাচ্ছিল, কখনও-বা গাছ বেয়ে উঠে পড়ছিল। আর ওদের পাগলের মতো ধাওয়া করছিল কোমোডোর দল। সিমুলেশানে দেখা গেল, পার্ক থেকে বেরোনোর গেট একটাই। তবে সেই গেটটা একটা ঢিবির ঢালের চূড়ায় বসানো—আর সেখানে পৌঁছনোর পথটা সরু এবং শ্যাওলায় ঢাকা।

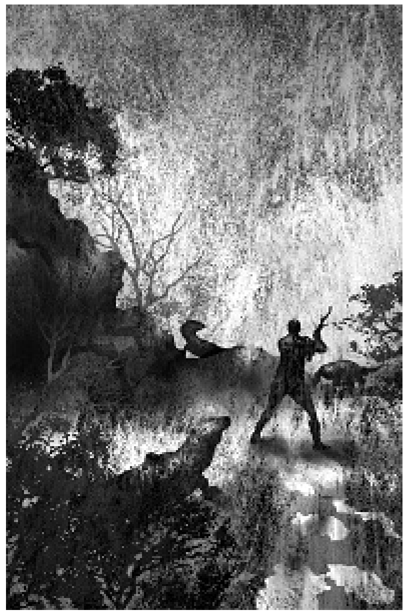
প্রতিযোগীরা যখনই সেই পথ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে, বাঁচার চেষ্টা করছে, তখনই হয় তারা শ্যাওলায় পা পিছলে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, অথবা অন্য প্রতিযোগীরা তাদের পা ধরে টেনে নীচে ফেলে দিয়ে নিজেরা গেটের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছে।

সিমুলেশান দেখতে-দেখতে জিশান ঠোঁট কামড়াচ্ছিল।

বাঁচার লড়াইটা এতই জঘন্য যে, হয়তো মনোহরকে পা টেনে ফেলে দিয়ে জিশানকেই গেটের কাছে পৌঁছতে হবে। অথবা এর উলটোটা। আর মিনি এই নিষ্ঠুরতার লাইভ টেলিকাস্ট বাড়িতে বসে-বসে দেখবে। ছি:!

না, জিশান বরং মনোহরকে সঙ্গে টেনে নিয়ে বেরোতে চেষ্টা করবে। এটা ঠিকই, মনোহরের তিনকুলে কেউ নেই। কিন্তু একজন বন্ধু কি তিনকুলের মধ্যে পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে! জিশান সিমুলেশান দেখতে-দেখতে মনকে তৈরি করছিল।

ঠিক পাঁচমিনিট পরেই জিশানরা সিমুলেশানটা সিমুলেট করতে লাগল। কমব্যাট পার্কের মধ্যে ওরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। আর ওদের তাড়া করে বেড়াতে লাগল জায়ান্ট মনিটরের দল। মাথার ওপরে উড়তে লাগল আধডজন শুটার।



ছুটতে-ছুটতে তেতো হাসি পেল জিশানের। সিমুলেশানের নকল ছবি দেখে এবার ওরা আসল কাজটা করছে। নকলের সিমুলেশান!

জিশান লাফিয়ে একটা গাছে উঠল। ওর পা থেকে ঠিক দু-ফুট দূরে চোয়ালে-চোয়াল ঠোকার শব্দ হল। একটা কোমোডো অল্পের জন্য জিশানের পায়ের নাগাল পায়নি।

জিশান হাঁপাচ্ছিল। গাছের গোড়ায় এসে পৌঁছনো কোমোডোটার দিকে নজর রাখছিল। ওটা বারবার ওর চেরা জিভ বাইরে বের করছে আর ঢোকাচ্ছে। ওটা কি এখন গাছ বেয়ে উঠতে চেষ্টা করবে?

জিশানের সারা গায়ে মাথায় কাদা-মাখা। মিনি এই অবস্থায় ওকে দেখলে নিশ্চয়ই হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর শানুও নির্ঘাত ভয়ে ওর কোলে আসতে চাইত না।

মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। গোটা পার্কে কড়া রোদের আলো-ছায়া। একটু দূরেই একটা জলার ঘোলাটে জল চিকচিক করছে। জলার ধারে তিনটে কোমোডো মাথা ঝুঁকিয়ে জল খাচ্ছে।

হঠাৎই পাখির শিস শুনতে পেল জিশান। কিন্তু এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পাখিটাকে কোথাও দেখতে পেল না। গাছের গোড়ায় ওত পেতে থাকা কোমোডোটার কথা খেয়াল হতেই আবার তাকাল নীচের দিকে। জন্তুটা সবে ওর সামনের দুটো পা গাছের গুঁড়িতে তুলেছে।

কী করা যায় এখন? জিশানের মাথার ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ভেবেও মাথা থেকে কিছু বের করতে পারছিল না। কেমন যেন পাগল-পাগল লাগছিল ওর।

কোমোডোটা ধীরে-ধীরে উঠে আসছে ওপরে।

জিশানের গায়ে কাঁটা দিল। এরপর কী হবে?

গাছের ওপরের দিকে তাকাল জিশান। দু-তিনফুট ওপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে সরু ডাল। ওগুলো জিশানের ভার সামলাতে পারবে না। তা ছাড়া এই কমব্যাট পার্কে সব গাছই ছোট মাপের—কোনওটাকেই মহীরুহ বলা যায় না। এরকমটা যেন ইচ্ছে করেই করেছে সিন্ডিকেট। এটা কমপিটিশানের ডিজাইনের একটা অংশ। মানুষ মারার নকশা।

তা হলে এখন বাঁচার জন্য কী করবে জিশান?

নিরস্ত্র জিশান মরিয়া হয়ে একটাই পথ দেখতে পেল। ডালপালা ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর প্যান্টের জিপ খুলে কোমোডোটার মুখে পেচ্ছাপ করতে লাগল।

চকিতে অচেনা গন্ধের ঢেউ কোমোডোটাকে ভাসিয়ে দিল। হিংস্র প্রাণীটার নখের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। ওটা খসে পড়ল মাটিতে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

জিশান আর দেরি করল না। প্যান্টের চেন লাগিয়ে নিয়ে কী ভেবে গাছের একটা মাঝারি মাপের ডাল সজোরে আঁকড়ে ধরল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে।

ও যা ভেবেছিল তাই হল। পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা ডালটা সটান মটকে গিয়ে চলে এল জিশানের হাতে। ডালটাকে কয়েকটা জোরালো মোচড় দিল ও। ডালটা গাছের গা থেকে খুলে এল—হয়ে গেল হাতের লাঠি। আপাতত এটাই অস্ত্র হোক। ক্ষুধার্ত সরীসৃপগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই আঁকাবাঁকা লাঠিটা কম কী!

বিভ্রান্ত কোমোডোটাকে পিছনে ফেলে জিশান ছুটতে শুরু করল।

প্রতিযোগীদের সুবিধের জন্য কমব্যাট পার্কের নানান জায়গায় বেরোনোর পথের নিশানা দেওয়া আছে। সেইসব সাইনবোর্ড দেখে-দেখে জিশান উদভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগল। শরীরের বহু জায়গায় ছড়ে গেছে, নুনছাল উঠে রক্ত বেরোচ্ছে, জ্বালা করছে—কিন্তু থামার কোনও উপায় নেই।

ছুটতে-ছুটতে ও শুনতে পেল অন্য কোনও খেলোয়াড়ের আর্তচিৎকার। শব্দ লক্ষ করে কয়েকটা গাছের আড়াল পেরিয়ে খানিকটা এগোতেই জিশান দৃশ্যটা দেখতে পেল।

একজন হাট্টাকাট্টা জোয়ান অসহায়ভাবে পড়ে আছে পার্কের মাটিতে। ছোট-বড় মাপের প্রায় সাত-আটটা কোমোডো লোকটাকে ছেঁকে ধরেছে। লোকটা চিৎকার করছে, হাত-পা ছুড়ছে। আর প্রাণীগুলো ধারালো দাঁত-নখে তাকে ছিন্নভিন্ন করছে। একইসঙ্গে নিজেদের মধ্যেও খেয়োখেয়ি করছে।

জিশান ছুটতে লাগল। একটা জলা জায়গা পেরোতেই দুটো কোমোডো দুপাশ থেকে ওর দিকে ছুটে এল। পাগলের মতো গাছের ডাল চালাল ও। একবার, দুবার, বারবার। ভোঁতা সংঘর্ষের শব্দ হতে লাগল। সংঘর্ষের তীব্রতায় ওর কবজি আর কনুই ঝনঝন করে উঠল।

ছুটতে-ছুটতে ও পৌঁছে গেল বেরোনোর গেটের কাছে। সেখানে একলহমা থমকে দাঁড়াল।

সিমুলেশানে যেমন দেখানো হয়েছিল বেরোনোর পথটা একটা ঢালের ওপরে। সেখানে বেয়ে ওঠার সরু শ্যাওলা-মাখা পথে দুজন খেলোয়াড় তখন হাঁকপাঁক করে ওপরে উঠতে চাইছে। পা পিছলে গেলে পথের দুপাশের আগাছার ঝুঁটি ধরে সামলে নিচ্ছে।

বেয়ে ওঠার পথের নীচেই অপেক্ষা করছে ছোট মাপের তিনটে কোমোডো। ওরা তাকিয়ে আছে ওপরদিকে—কখন প্রতিযোগী দুজন পা পিছলে পড়ে।

জিশানের চোখ মনোহরকে খুঁজছিল—কিন্তু খুঁজে পেল না। মনোহর কি আগে বেরিয়ে গেল, নাকি পিছনে পড়ে আছে?

আর ভাবার সময় পেল না জিশান। একটা কোমোডো ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। চেরা জিভ মুখের বাইরে বেরোচ্ছে আর ঢুকে পড়ছে।

জিশান আর দেরি করল না। পিছনদিকে ছুট লাগল। অনেকটা গিয়ে তারপর থামল। এবং ঘুরে দাঁড়াল।

হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে এবার গেট লক্ষ করে ছুটতে শুরু করল। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ও পোলভল্ট প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে।

জিশান সত্যিই তাই করল। ছুটতে-ছুটতে ঢালের কাছাকাছি এসে পড়ল। তারপর গাছের ডালটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে মাটিতে ভর দিয়ে শূন্যে লাফ দিল।

সময় মতো লাঠিটা ছেড়ে দিল জিশান। আকাশে একটা বৃত্তচাপ তৈরি করে ও একেবারে গেটের মুখে এসে আছড়ে পড়ল। মাটিতে কয়েকবার পাক খাওয়ার পর ওর শরীরটা থামল।

সামনেই খোলা গেট। মুক্তি। এবারের মতো চ্যালেঞ্জ রাউন্ড শেষ। লাইভ টেলিকাস্ট শেষ।

জিশান উঠে দাঁড়াল। প্রায় টলতে-টলতে এগিয়ে গেল খোলা গেটের দিকে। এতক্ষণ ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এখন ঘোর কাটতেই দুনিয়ার ক্লান্তি ওকে জড়িয়ে ধরল। একইসঙ্গে ক্ষতবিক্ষত শরীরের জ্বালা-পোড়া তীব্রভাবে টের পেল।

ও: ভগবান! চরম পরীক্ষার আগে আর কত পরীক্ষা দিতে হবে ওকে!

গেটের বাইরে মেডিক্যাল ইউনিটের লোকজন অপেক্ষা করছিল। তারা জিশানকে দেখামাত্রই ছুটে এল। অ্যালুমিনিয়াম আর পলিমারের তৈরি স্ট্রেচারে ওকে চটপট শুইয়ে দিল। তারপর ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ছোট দোতলা বাড়িতে।

বাড়িটার নাম 'পোস্টগেম কেয়ার'। জিশান বুঝল, ব্যাপারটা অনেকটা নার্সিংহোম টাইপের। চ্যালেঞ্জ রাউন্ড শেষ হওয়ার পর প্রতিযোগীদের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছে এরা।

স্ট্রেচারে চিত হয়ে শুয়ে এগিয়ে চলার সময় জিশান নার্সিংহোমের সাদা ধপধপে সিলিং আর দেওয়াল দেখতে লাগল। একইসঙ্গে ও মনোহরের কথা ভাবতে লাগল। মনোহর এখন কোথায়? কমব্যাট পার্কে, নাকি এই পোস্টগেম কেয়ার বিল্ডিং-এ?

জিশানকে একটা বড় এসি রুমে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঘরটার সবক'টা দেওয়ালই কাচের। ধপধপে সাদা আলোয় ঝকঝক করছে। ঘরে প্রায় কুড়ি-বাইশটা বেড। তার কয়েকটায় পেশেন্ট শুয়ে আছে। মেডিকরা তাদের তদারকি করছে।

জিশানকে একটা বেডে শুইয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে-সঙ্গে দুজন ডাক্তার আর একজন সিস্টার ওকে ঘিরে ধরল। ওর যত্ন নিতে লাগল।

জিশানের তেমন মারাত্মক কোনও চোট ছিল না। তবে একজন ডাক্তার ওকে বলল যে, কোমোডোর কামড় খাওয়ার পর ইনফেকশানের হাত থেকে রেহাই পেতে একটা অ্যান্টিডোট সব কমপিটিটরকেই ইনজেক্ট করা হয়। ইনজেকশানটা নেওয়ার সময় একটু ব্যথা লাগবে। জিশান যেন কিছু মনে না করে।

হাসি পেয়ে গেল জিশানের।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও একের-পর-এক মরণখেলা খেলে চলেছে। এইমাত্র ও ভয়ঙ্কর কোমোডো ড্রাগনের ধারালো দাঁতের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে। আর ইনজেকশানটা দেওয়ার সময় একটু ব্যথা লাগবে বলে আগেভাগেই ডাক্তার বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছে! আশ্চর্য!

মিনিট-কুড়ি পরেই বেডে উঠে বসল জিশান। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে, তবে একটু ঘুম-ঘুম ভাব লেগে রয়েছে। হয়তো ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধপত্রের জন্য, কিংবা ওই অ্যান্টিডোট ইনজেকশানের জন্য।

জিশান দেখল, ওকে নিয়ে ঘরে মোট পাঁচজন পেশেন্ট। তার মানে এই রাউন্ডটায় এই পাঁচজন কোয়ালিফাই করেছে। এরপর আর-একটা রাউন্ড। আর তারপরই পিট ফাইট।

হঠাৎই ঘরে ঢুকল দুজন ইনস্ট্রাকটর। জিশান তটস্থ হয়ে তাদের দিকে তাকাল। একজন ইনস্ট্রাকটর ল্যাপটপের বোতাম টিপে এলসিডি স্ক্রিনে ফুটে ওঠা লেখা দেখে বলতে লাগল, 'এই রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেছে পাঁচজন পার্টিসিপ্যান্ট। তাদের প্রত্যেকের জন্যে পুরস্কার পঞ্চাশহাজার টাকা। কনগ্র্যাচুলেশানস...। আর ফর ইয়োর ইনফরমেশান, বাকি ছ'জনের কয়েকজন মারা গেছে—আর কয়েকজন ইনডিসপোজড... মানে, অকেজো হয়ে গেছে।'

জিশান একটা ধাক্কা খেল। খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে কী সহজেই না আহত-নিহতদের পরিসংখ্যানটা জানিয়ে দিল লোকটা! বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়ল। জিশানরা ফেরার সময় পাঁচের বেশি ওকে গুনতে হবে না।

ইনস্ট্রাকটর তখন বিজয়ী পাঁচজনের নাম বলছিল। তারপর বলল, 'থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর পার্টিসিপেশান। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট। ঠিক আধঘণ্টা পর আমরা জিপিসি-র গেস্টহাউসের দিকে রওনা হব। য়ু প্লিজ গেট রেডি বাই দেন...।' ইনস্ট্রাকটর দুজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জিশান ইনস্ট্রাকটরের শেষদিকের কথাগুলো আর শুনছিল না। ও বেডে শুয়ে থাকা অন্য চারজন পেশেন্টের দিকে দেখছিল। কোথায় মনোহর? কারণ, ইনস্ট্রাকটরের বলা পাঁচজনের নামের মধ্যে মনোহর সিং-এর নাম আছে।

হঠাৎই একটা বেডে একজন পেশেন্ট সোজা হয়ে বসল। জিশানকে লক্ষ করে ডেকে উঠল, 'এ জিশান ভাইয়া!'

জিশান চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল।

মনোহর সিং। মুখে একগাল হাসি। কালচে ছোপধরা দাঁত দেখা যাচ্ছে। একপায়ে হাঁটুর নীচে ব্যান্ডেজ।

জিশান বেড থেকে নেমে ওর কাছে এগিয়ে গেল। পায়ের ব্যান্ডেজের দিকে আঙুল দেখাতেই মনোহর উঠে বসল। কোমরের নীচে ইনজেকশানের জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষতে-ঘষতে বলল, 'একটা গিরগিটি আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে—।'

জিশান মনোহরকে দেখে খুব খুশি হয়েছিল। হেসে বলল, 'গিরগিটি নয়—কোমোডো।'

'ওই একই হল। সালা আমিও একটা গিরগিটিকে কামড়ে দিয়েছি...।'

জিশান আঁতকে উঠল। মনোহর বলে কী! একটা কোমোডো ড্রাগনকে ও কামড়ে দিয়েছে!

সে-কথা জিগ্যেস করতে মনোহর বলল, 'হ্যাঁ, জিশান ভাইয়া। আমার পায়ে কামড় দিয়ে জানোয়ারটা ছাড়ছিল না। তখন আমি লড়তে-লড়তে ওটার লেজে কামড় দিয়েছি। ও:, কী বাজে টেস্ট!' নাক কুঁচকে ঘেন্নায় মাথা ঝাঁকাল মনোহর।

জিশান আবার হেসে ফেলল। তবে সেই হাসির মধ্যে কিছুটা দু:খ মেশানো ছিল। সুপারগেমস কর্পোরেশন কী চমৎকারভাবেই না মানুষকে ধীরে-ধীরে পালটে দিচ্ছে পশুতে! একটা মানুষ পশুর গায়ে কামড় বসিয়ে লড়াই করছে—পশুর মতো!

অন্যান্য বেডের বাকি তিনজন তখন বিছানায় উঠে বসেছে। নিজেদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। পঞ্চাশহাজার টাকার প্রাইজ মানি কে কীভাবে খরচ করবে তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে মনোহর সিং বলল, 'জিশান ভাইয়া, তোমার তো মোট প্রাইজ মানি হল আশিহাজার টাকা। তুমি এই টাকাটা নিয়ে কী করবে ঠিক করেছ?'

জিশান বলল, আজ রাতে অন-লাইন নেটওয়ার্কে বোতাম টিপে বলে দেব টাকাটা আমার ওয়াইফের কাছে পাঠিয়ে দিতে। মিনি ঠিক করবে এই টাকা দিয়ে ও কী করবে। আমার তো এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনও ঠিক নেই...বুঝতেই পারছ...।'

'ফিরতে তোমাকে হবেই, জিশান ভাইয়া। তোমার বিবি-বাচ্চার সঙ্গে মিলতে হবে। ওরা ওয়েট করছে...।'

জিশানের মনটা পলকে উড়ে গেল ওল্ড সিটিতে। মিনি আর শানুর কাছে। ওদের কাছে যদি ও আর কখনও ফিরতে পারে তখন কি আর ও মানুষ থাকবে? ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটার কথা ভেবে ভয় পেল জিশান।

মনোহর তখন হাসিমুখে বলছে, 'আমার টাকাটা নিয়ে কী করব সেটা আমিও ভেবে ফেলেছি।'

'কী করবে?'

'তিরিশহাজার আমি রাখব, আর বাকিটা আমার ভাতিজাকে দেব—।'

'ভাতিজা?' অবাক হয়ে বলল জিশান, 'এই যে বলো, তোমার আগে-পিছে কেউ নেই!'

'আগে ছিল না—এখন আছে।' মুচকি হেসে বলল মনোহর, 'একজন দাদা আছে, একজন ভাবী আছে, আর একজন ভাতিজা আছে।'

'মানে?'

মনোহর ঝুঁকে পড়ে জিশানের হাত চেপে ধরল : 'জিশান ভাইয়া, তুমি আমার দাদা আছ। আর শানু মেরা ভাতিজা। আমার আগে তো রিশতেদার কেউ ছিল না—এখন আছে। ওই পঞ্চাশহাজার টাকা আমি ভাতিজা শানুর জন্যে রাখব। তোমার কোনও ''না'' শুনব না। তুমি আজ আমার ঘরের কম্পিউটার থেকে টাকাটা ট্রান্সফারের বেওস্থা করে দেবে। ওয়াদা?'

জিশানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও চাপা গলায় বলল, 'পাক্কা ওয়াদা।'

ও মনে-মনে চাইছিল, পিট ফাইটে কিছুতেই যেন ওকে মনোহরের মুখোমুখি না পড়তে হয়। যদি পড়ে, তা হলে জিশান লড়বে না—কিছুতেই না। তার জন্য শ্রীধর পাট্টা যে-শাস্তিই দিক জিশান মেনে নেবে। হোক সে রোলারবল, কিংবা প্রাইজ মানি আর লাইভ টেলিকাস্ট ছাড়া হাংরি ডলফিন কি ম্যানিম্যাল রেস—অথবা ডগ স্কোয়াড।

মনোহরের হাতে চাপ দিয়ে জিশান ধরা গলায় বলল, 'আশ্চর্য, মনোহর, আমরা এখনও ইনসান আছি—পুরোপুরি জানবর হয়ে যাইনি।'

আর পাঁচ-দশমিনিটের মধ্যেই ইনস্ট্রাকটর দুজন ঘরে ঢুকে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'ও. কে. গাইজ—লেটস গো।'

ওরা পাঁচজন চটপট লাইন দিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘর থেকে রওনা হল।

মনোহর জিশানের ঠিক সামনেই ছিল। সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। ও জিশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বহত ভুখ লাগছে, জিশান ভাইয়া—।'

'আমারও—। তবে চিন্তা নেই, গেস্টহাউসে গিয়েই মহাভোজ পেয়ে যাবে।'

'এর পরের রাউন্ডের আগে আমাদের রেস্ট দেবে তো? আমার পায়ের যা অবস্থা...।'

'নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু পরের রাউন্ডে কী গেম রেখেছে কে জানে!'

'আমি শুনেছি, জিশান ভাইয়া। পরের রাউন্ডের গেমটার নাম ''স্নেক লেক''। তার পরে লাস্ট রাউন্ডের ''পিট ফাইট''...।'

'স্নেক লেক?'

'হ্যাঁ। জহরিলা সাপে কিলবিল করছে এমন একটা লেকের মধ্যে দিয়ে আমাদের ছুটতে হবে...।'

'লেকের মধ্যে দিয়ে ছুটতে হবে মানে?' জিশান অবাক হয়ে জানতে চাইল। লক্ষ করল, লাইনের বাকি তিনজন গলা বাড়িয়ে ওদের চাপা কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে।

'লেকে বেশি জল নেই। আধহাঁটু জল। আমি ফকিরচাঁদের কাছে শুনেছি। ওর ভাই আমিরচাঁদ স্নেক লেকে ছুটতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে...।'

জিশান আর কোনও কথা বলল না। আজকের কমব্যাট পার্ক রাউন্ডেও হয়তো দু-চারজন মারা গেছে। এই মৃতদেহগুলো কোথায় যায়? সিন্ডিকেট কি এই ডেডবডিগুলো সৎকার করার চেষ্টা করে?

হঠাৎই জিশানের মনে হল, এটা খুবই মামুলি প্রশ্ন। যারা নিয়মিত মনুষ্যত্বের সৎকার করে চলেছে তাদের কাছে ডেডবডির নিয়মিত বন্দোবস্ত করাটা কোনও ব্যাপারই নয়।

আজ রাতে মিনির সঙ্গে কথা বলবে জিশান। প্রাণভরে দশমিনিট ধরে কথা বলবে। বলবে, কীভাবে ও আজ জিতেছে। কীভাবে মানুষ থেকে জানোয়ারের দিকে আরও একধাপ এগিয়েছে। বলবে মনোহর সিং-এর কথাও।

পড়ন্ত বেলায় জিশানরা যখন লাইন করে হেঁটে ফিরছে তখন দেখল পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

জিশানের বুক থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস বেরিয়ে এল। সূর্য ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা ওর ভালো লাগল না।

•

মাইক্রোভিডিয়োফোনে মিনির ছবি ভেসে উঠতেই জিশান কেমন যেন হয়ে গেল। ওর মনের ভেতর থেকে নিউ সিটির ছবি মিলিয়ে গেল পলকে। ও ভুলে গেল নিউ সিটির 'সিটিজেন'-দের অফুরন্ত ভোগ আর আহ্লাদের কথা, সুপারগেমস কর্পোরেশনের বিপজ্জনক এবং হিংস্র খেলাগুলোর কথা, শ্রীধর পাট্টার কথা, এমনকী কিল গেম-এর কথাও।

ওর মন সিনেমার জাম্প কাটের মতো একলাফে পৌঁছে গেল ওল্ড সিটিতে—ওর সস্তা, ভাঙাচোরা, নোংরা ঘরে। ও মিনির গায়ের গন্ধ পেল। একইসঙ্গে নাকে এল ছোট্ট শানুর হিসি করে ভিজিয়ে দেওয়া প্যান্টের গন্ধও।

'কেমন আছ, মিনি?' ধরা গলায় জানতে চাইল জিশান।

'যেমন থাকা যায়—তোমাকে ছেড়ে।' মিনির চোখে জল এসে গেল।

'শানু কেমন আছে? ওকে একবার দেখাও—।'

'ও তো বাচ্চা, তাই আমার চেয়ে ভালো আছে। একমিনিট ওয়েট করো—ওকে নিয়ে আসছি—।'

একটু পরেই এমভিপিতে শানুকে দেখতে পেল জিশান। ছোট-ছোট জীবন্ত চকচকে চোখ, মুখে হিজিবিজি শব্দের টুকরো, বারবার এমভিপির স্ক্রিনের দিকে থাবা বাড়াচ্ছে।

জিশানের মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল। ও অর্থহীন ভাষায় ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল।

শানুকে রেখে এল মিনি। চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না...।'

জিশান বলল, 'মন খারাপ কোরো না। আমি তো এখানে লড়াই করছি...তোমাকেও ওখানে লড়াই করতে হবে।' কথা বলতে-বলতে চোখ মুছল জিশান: 'আজ আমাদের কমব্যাট পার্কে সারপ্রাইজ রাউন্ড ছিল। আমরা পাঁচজন জিতেছি—পঞ্চাশহাজার টাকা করে...।'

'হ্যাঁ—প্লেট টিভিতে দেখেছি। জন্তুগুলো যা বীভৎস দেখতে—উফ, ভাবা যায় না।' মিনি শিউরে উঠল।

'মনোহরভাইয়াও জিতেছে। ও ওর প্রাইজ মানি শানুকে গিফট করবে। আমার কোনও বারণ শুনছে না।' বলে মনোহরের সঙ্গে আজ পোস্টগেম কেয়ার বিল্ডিং-এ যা-যা কথা হয়েছে সব জানাল।

জিশানের কাছে মনোহর সিং-এর কথা আগে শুনেছে মিনি। এখন এইসব কথা শোনার পর ওর ঠোঁটে একচিলতে হাসির রেখা ফুটল। ও নরম গলায় বলল, 'জিশান, সিন্ডিকেট দেখছি এখনও তোমাদের পুরোপুরি অমানুষ করতে পারেনি! যার তিনকুলে কেউ নেই—মনোহরদা—তার মধ্যেও দ্যাখো, এখনও কেমন স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা রয়েছে।'

বরাদ্দ দশমিনিট সময় ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। জিশান আজকের সারাদিনের গল্প শোনাতে লাগল মিনিকে। শোনাল ছোট্ট মেয়েটার কথা—যে জিশানদের হাসিমুখে 'টা-টা' করছিল। জিশান বলল, এর পরের রাউন্ডে স্নেক লেক। আর তারপর পিট ফাইট। ও ইচ্ছে করেই জাব্বার কথা চেপে গেল। এখন ওসব শঙ্কা-আশঙ্কার কথা মিনিকে বলে ওর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। যখন মিনি ওসব গেম-এর লাইভ টেলিকাস্ট দেখবে তখন যা দেখার দেখবে।

বাড়ির খবর নেওয়া ছাড়াও পাড়াপড়শিদের খবর নিল জিশান। তারপর দশমিনিটের কোটা শেষ হয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চাইল।

মিনির চোখে জলের ফোঁটা। সেই অবস্থাতেই পুরোনো কথাটা আবার বলল।

'জিততে তোমাকে হবেই। এখানে আমরা সবাই খুব আশা করে আছি। তবে শুধু জেতা নয়—তুমি জিতলে এই জঘন্য ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ করার ব্যবস্থাও করতে হবে তোমাকে। তোমাকেই।'

'পারব কি না জানি না—তবে চেষ্টা তো একবার করবই।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জিশান। ওর মালিকের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল শিবপদর কথা। কষ্ট করে ঢোঁক গিলল দুবার। তারপর নিচু গলায় মিনিকে বলল, 'এবার আসি। কাল কথা বলব আবার। লাভ য়ু...।'

মিনির সঙ্গে কথা শেষ হলে চুপচাপ বিছানায় বসে রইল জিশান। ও চোখ বুজে ভাবতে চাইল যে, ও ওল্ড সিটিতে নিজের ঘরে মিনি আর শানুর কাছে বসে আছে। কিন্তু কয়েকসেকেন্ড পরেই কল্পনার ছবিটা নড়েচড়ে ঘেঁটে গেল। ওর মাথার মধ্যে পরের রাউন্ডের বিপজ্জনক গেমগুলোর কথা ঘুরতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে একটা বিরক্তির শব্দ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল জিশান। সামনের ছোট টেবিলে পড়ে থাকা গোল বলের মতো চেহারার রিমোট ইউনিটটা তুলে নিল। বোতাম টিপে ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিল। এখন ওর অন্ধকারে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করছে।

ডিজিটাল ঘড়ির দিকে চোখ গেল জিশানের। রাত বারোটা দশ। অন্ধকার ঘড়িতে শুধু ডিজিটাল অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে—পাশে উজ্জ্বল নকল চাঁদের ছবি।

জিশানের আসল চাঁদ দেখতে ইচ্ছে করল। ও উঠে চলে বারান্দায়। রেলিং-এ হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল। প্রাণপণে অস্থির মনটাকে শান্ত করতে চাইল।

কালো আকাশময় ছোট-ছোট তারার ছিটে। মিটমিট করে জ্বলছে। সেই পটভূমিতে তুলির টান দিয়েছে লাল এবং নীল ধূমকেতুর আলো।

হঠাৎই একটা শুটারের আলো চোখে পড়ল জিশানের। ওটার হেডলাইটের তীব্র সাদা বর্শা সামনের অন্ধকারকে চিরে দিয়ে ছুটে চলেছে। আবছা শিসের শব্দ জিশানের কানে আসছে। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

একই আকাশ ছেয়ে আছে ওল্ড সিটিকে। অথচ আকাশের নীচের ছবিটা কী বিশ্রীভাবে দুরকম। ওল্ড সিটিতে অভাবের অভাব নেই, আর নিউ সিটিতে অভাব খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

কিন্তু অভাব নেই বলেই কি নিউ সিটির স্বভাব বিগড়ে গেছে? অবাক হয়ে ভাবল জিশান। ওর মনে হল, সব মানুষের জীবনেই কিছুটা অভাব জড়িয়ে থাকা ভালো। তা হলে স্বভাবটা বোধহয় আর ততটা খারাপ হবে না।

হঠাৎই একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে এল জিশানের।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দটা শুনে মানুষের কান্না বলেই মনে হল। কিন্তু কে কাঁদছে এত রাতে?

বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাল জিশান। জিপিসি-র গেস্টহাউসের চারপাশটা আলোয় আলো। কিন্তু উনতিরিশ তলার উচ্চতা থেকে নীচের চাতালে কাউকে নজর করাটা সহজ নয়। তবুও কালো ফুটকির মতো একটা মানুষের মাথা দেখতে পেল। কান্নাটা বোধহয় সেদিক থেকেই আসছে।

জিশানের মনে হল, অস্থির মনটাকে শান্ত করতে কোনও একটা কাজ নিয়ে মেতে ওঠা দরকার। কারণ, এখন ওর মনের যা অবস্থা তাতে বিছানায় গিয়ে শুলেও ঘুম আসবে না। তাই কান্নার শব্দটা তলিয়ে দেখাটাকেই ও 'কাজ' হিসেবে বেছে নিল।

ঘরে এসে পোশাক পালটে নিল জিশান। একটা বাদামি রঙের টি-শার্ট আর নীল জিনসের প্যান্ট পরে নিল। মাথার চুলে দুবার চিরুনি চালাল। তারপর সোজা ঘরের বাইরে এসে পা বাড়াল অটো-এলিভেটরের দিকে।

শুনশান করিডর। সামনে-পিছনে তাকালে কাউকে চোখে পড়ে না। শুধু পিস ফোর্সের দুজন গার্ড করিডরের দুটো বাঁকের মুখে বসে আছে। হঠাৎ করে দেখলে ওদের পাথরের মূর্তি বলে ভুল হতে পারে।

জিশানকে দেখে ওরা একচুলও নড়ল না। তাতে জিশান অবাক হল না। কারণ, ওর রেজিস্ট্রেশান কিটের ভেতরে জিপিসি-র 'রুলস অ্যান্ড রেগুলেশানস'-এর একটা বই ছিল। তাতে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায় গেমস পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাসের সবরকম নিয়মকানুন লেখা ছিল। জিশান সেগুলো পড়ে দেখেছে। তাতে বলা আছে, ডেইলি রুটিনের মধ্যে যে-সময়টা প্রতিযোগীর নিজের—মানে, যখন তার অবসর সময়—তখন সে ক্যাম্পাসের মধ্যে যখন খুশি যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে জিপিসি-র কোনও নিয়ম ভাঙা যাবে না।

হাসি পেয়ে গেল জিশানের। খাঁচার মধ্যে স্বাধীনতা!

সত্যি, সুপারগেমস কর্পোরেশনের কাজকর্ম এত নিখুঁত যে, যেসব প্রতিযোগী লেখাপড়া জানে না, তাদের জন্য ওরা মাইনে করা লোক রেখেছে। তারা নিয়মিত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশানস-এর ক্লাস নেয়। জিপিসি-র নিয়মকানুনের প্রতিটি ধারা বুঝিয়ে দেয়। প্রতিযোগীরা ইচ্ছে করলে সেই ক্লাস করতে পারে। ফলে কোনও প্রতিযোগীই কোনও 'বেআইনি' কাজ করে বলতে পারবে না যে, সে নিয়ম জানত না। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

অটো-এলিভেটরে ঢুকে পড়ল জিশান। সেখানেও পিস ফোর্সের একজন গার্ড বসে আছে—হাতে নীল রঙের শকার।

গার্ডটা ঝিমোচ্ছিল। জিশান ঢুকতেই নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়া লালা মুছে নিল। শকারের হাতলে হাত রেখে জিশানের দিকে সতর্ক নজরে তাকিয়ে রইল—কিন্তু কোনও কথা বলল না।

জিশান বোতাম টিপতেই এলিভেটর নীচে নামতে শুরু করল।

একটু পরেই গেস্টহাউসের সদর দরজায় পৌঁছে গেল ও। কাঠের ফ্রেমে লোহার গ্রিল আর বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি বিশাল শৌখিন দরজা। পকেট থেকে স্মার্ট কার্ড বের করে দরজার ফ্রেমের পাশে বসানো যন্ত্রে সোয়াইপ করল জিশান। 'বিপ' শব্দ হল। একটা সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলে উঠল। তারপর হাতের চাপ দিতেই দরজার পাল্লা খুলে গেল। এবং কান্নার শব্দটা জোরালোভাবে শোনা গেল।

শীতাতপের এলাকা ছেড়ে বাইরে বেরোতেই প্রকৃতির উষ্ণ বাতাস জিশানকে জড়িয়ে ধরল। বাতাসে একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল জিশান। বোধহয় রাত-ফুলের গন্ধ।

বিল্ডিং-এর বাইরে সাদা মার্বেল বাঁধানো চাতাল। ভেপার ল্যাম্পের আলোয় ঝকঝক করছে। চাতালের দুপাশে সুন্দর বাগান আর ঘাসে ছাওয়া লন। আর মাঝখানে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এক বিমূর্ত ভাস্কর্য। তাকে ঘিরে লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙিন জলের ফোয়ারা।

ফোয়ারার রঙিন জলের ধারা এসে পড়ছে পাদদেশের জলাশয়ে। সেখানে সব রং মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক বিচিত্র গাঢ় রঙের জল।

জলাশয়ের চারদিকে প্রায় দু-ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে নানান কারুকাজ করা, আর তাকে ঘিরে ছোট-ছোট মার্বেল পাথরের টবে সুন্দর-সুন্দর গাছ।

কিন্তু জিশান এসব ভালো করে দেখছিল না। ও তাকিয়ে ছিল জলাশয়ের পাঁচিলের ওপরে ভিজে ন্যাকড়ার মতো শিথিলভাবে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে।

লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। গায়ে নীল হাফশার্ট আর ছাই রঙের প্যান্ট। পায়ের চটি খসে পড়ে আছে মার্বেল পাথরের মেঝেতে। ওর একটা হাত জলাশয়ের জলের ভেতরে ডোবানো, অন্য হাতটা পাঁচিলের এপাশে ঝুলছে। দেখে হঠাৎ করে মনে হতে পারে ও আর বেঁচে নেই। কিন্তু কান্নার আওয়াজটা জানিয়ে দিচ্ছে ও বেঁচে আছে—অন্তত এখনও।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পিস ফোর্সের দুজন গার্ডকে দেখতে পেল জিশান। ওরা টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে শকার ঝুলছে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, সামনে পড়ে থাকা মানুষটার অস্তিত্ব

ওরা টের পাচ্ছে।

জিশান গার্ড দুটোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফোয়ারার কাছে এগিয়ে গেল। দুটো টবের মাঝে দাঁড়িয়ে লোকটার শরীরটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল।

জিশানের হাতের ছোঁয়া পেয়েই লোকটা কান্না থামিয়ে চট করে উঠে বসল। ঘুরে তাকাল জিশানের দিকে—চোখেমুখে লড়াকু ছাপ। কিন্তু জিশানকে দেখেই ওর ভাবভঙ্গি নরম হল। 'ও—' বলে জলাশয়ের পাড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অবসন্নভাবে বসে রইল। ওর গলা দিয়ে কান্নার মিহি গোঙানি বেরিয়ে আসতে লাগল। শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

লোকটাকে ভালো করে দেখল জিশান।

লম্বাটে মুখ। পোড়খাওয়া তামাটে রং। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ছোট কিন্তু চওড়া ভুরু। চোখ দুটো নরম—ভালোবাসার কবিতার মতো। সেই চোখে জল।

লোকটার মুখে আলোছায়ার খেলা। চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

'তুমি কাঁদছ কেন?' লোকটার পিঠে হাত রেখে জিশান জিগ্যেস করল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। এমনকী জিশানের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

জিশান আবার জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

লোকটা এবার কান্না থামাল। দু-হাতে চোখ মুছে জিশানের দিকে তাকাল। ওর চোখে লালচে আভা, চোখের কোল ফোলা। ভাঙা গলায় পালটা প্রশ্ন করল, 'তোমাকে বলে কী ফায়দা?'

জিশান ওর পাশে বসে পড়ল। বলল, 'তেমন লাভ কিছু হবে কি না জানি না, তবে তোমার দু:খ একটু কমতেও পারে...।'

'হুঁ:!' বলে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করল লোকটা : 'দু:খ কমলেও আমার ভাই তো আর ফিরবে না...।'

'তোমার ভাইয়ের কী হয়েছে?'

'ও মারা গেছে। ''স্নেক লেক'' গেমটায় নাম দিয়েছিল। সাপের কামড়ে মারা গেছে—।'

'কবে?'

'আটদিন আগে। দুটো সাপ পায়ে কামড়েছিল।' আবার ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল : '...আসলে ও রেসটা শেষ করেছিল। সেকেন্ড হয়েছিল। তখনও বুঝতে পারেনি ওকে সাপে কেটেছে। কয়েকমিনিট পর ছটফট করতে-করতে পড়ে গেল। এদের ডাক্তার নার্স আসতে-আসতেই সব শেষ। ভাইয়া চলে গেল...আমাকে ছেড়ে চলে গেল....।'

জিশান একটু অবাক হল। আটদিন আগে যে-ভাই মারা গেছে তার জন্য লোকটা আজ হাপুস নয়নে কাঁদছে! সবাই জানে, সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম শো-তে নাম দিলে সাধারণত প্রাণের ঝুঁকি থাকে। ফলে প্রিয়জন হারানোর শোকটা কখনও আচমকা আসে না—তার একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। তার ওপর দু:খের ঘটনাটা ঘটেছে আটদিন আগে। তাই কোথায় যেন একটা খটকা লাগছিল জিশানের।

ও লোকটাকে বলল, 'চলো ভাই, আমরা মেন গেটের কাছে যাই। ওখানে ঘাসের ওপরে বসে একটু গল্প করি। আমিও এখানকার গেম-এ নাম দিয়েছি। টেনশানে ঘুম আসছিল না। তোমার কান্না শুনে নীচে নেমে এলাম। চলো...দু:খ তো লাইফে থাকবেই...।' কথা বলতে-বলতে জিশান উঠে দাঁড়াল।

লোকটা জিশানের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। দু-হাতে ঘষে-ঘষে চোখ মুছল। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ওরা পাশাপাশি পা ফেলে মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল। জিশান লোকটাকে নিজের কথা বলতে লাগল। বলল, কীভাবে ও নিউ সিটিতে এসে পৌঁছেছে। কীভাবে ব্ল্যাকমেল করে ওকে কিল গেম-এ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিজের কাহিনি শেষ করে জিশান জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

লোকটা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'ফকিরচাঁদ।'

জিশানের মনে পড়ল মনোহরের কথা। আজ বিকেলে 'কমব্যাট পার্ক' থেকে ফেরার সময় মনোহর তা হলে এর কথাই বলছিল!

মেন গেটের দুপাশে সবুজ লন। একটু দূরে সুন্দর জ্যামিতিক কায়দায় সাজানো ঝাউগাছ আর পামগাছ।

এদিকটায় আলো কম। তাই অনেকটা যেন খোলামেলা পার্কের কোমল আবহাওয়া। সবুজ ঘাসের মোলায়েম আসনে বসে জিশানের মনেই হল না ও আর ফকিরচাঁদ আসলে নিউ সিটির 'বন্দি'।

ওরা দুজনে কথা বলতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল, মেন গেটের বাইরে দুজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। ওরা জিশানদের দিকে একপলক তাকিয়েই নজর সরিয়ে নিল। মেন গেটের বাইরে না আসা পর্যন্ত ওদের কাছে জিশানদের কোনও গুরুত্ব নেই।

বুক ভরে বাতাসের গন্ধ নিচ্ছিল জিশান। রাতের প্রকৃতিকে দু-চোখ ভরে দেখছিল।

ফকিরচাঁদ ওর ভাই আমিরচাঁদের কথা বলছিল।

অভাবের তাড়নায় খারাপ পথে চলে গিয়েছিল আমির। বুড়ো মা-বাপ আর ছোটবোন জেবার কষ্ট সইতে না পেরে ও নিয়মিত চুরি-ছিনতাই করতে শুরু করেছিল। তারপর একদিন দু-চারজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে 'স্নেক লেক'-এ নাম দেয়।

ছোটভাইকে দারুণ ভালোবাসত ফকির। তাই ভাইয়ের দেখাদেখি ও-ও নাম দেয় 'হাংরি ডলফিন' গেম-এ। ওরা দু-ভাই একসঙ্গে এই নিউ সিটিতে আসে। কম্পিটিশানের দুটো রাউন্ডে পরপর জিতেও যায় দুজনে। তারপর...তারপর আসে আমিরচাঁদের গেম-এর পালা : স্নেক লেক।

বাঁ-হাতে ঘাসের ওপরে হাত বোলাচ্ছিল ফকিরচাঁদ। কথা বলতে-বলতে কখন যেন ওর গলা ভারি হয়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ধরে না-করা প্রশ্নটা এইবার উচ্চারণ করল জিশান : '...আটদিন আগে ভাই মারা গেছে...সেজন্যে আজও তুমি কাঁদছ?'

জিশানের দিকে মুখ ফেরাল ফকিরচাঁদ। কয়েকসেকেন্ড অপলকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডানহাতে মাথার চুলে আঙুল চালাল। থেমে-থেমে বলল, 'আমি কাঁদছি আমিরের ডেডবডির জন্যে, জিশানভাইয়া...।'

'ডেডবডির জন্যে?' অবাক হয়ে গেল জিশান।

'হ্যাঁ, জিশানভাইয়া। অনেক চেষ্টা করে দুজন সিকিওরিটি গার্ডকে প্রাইজ মানির টাকা থেকে ঘুষ দিয়ে ভাইকে দেখার একটা বন্দোবস্ত করেছিলাম...।' ওরা চোখে পটি বেঁধে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে...ভাইয়ের কাছে...।'

'তার মানে? তোমার ভাই তো মারা গেছে—।'

'হ্যাঁ—মারা গেছে। কিন্তু মারা যাওয়ার পর তো ভাইকে আর আমি দেখিনি—।'

আঙুল দিয়ে চোখের কোণ মুছল ফকিরচাঁদ : 'তাই মরা ভাইকে ফুল দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...কিন্তু সেই...সেই কবরস্তানে গিয়ে...যা দেখলাম তাতে মনটা ভেঙে গেল। আমিরচাঁদ যে এত বদনসিব ছিল বুঝতে পারিনি। সে-কথা মনে পড়লেই আমার কান্না পায়।'

হঠাৎই কোথা থেকে দুজন গার্ড এসে হাজির হল জিশানদের সামনে। একজন লম্বা, একজন বেঁটে। লম্বা গার্ডটা ঠান্ডা গলায় বলল, 'অর্ডার এসেছে। তোমরা যার-যার রুমে চলে যাও। এখুনি।'

জিশান হকচকিয়ে গেল। তা হলে কি পার্টিসিপ্যান্টদের অসময়ে কথাবার্তা বলার সময় বাঁধা আছে? নাকি ওরা কোনও ওপরওয়ালার নজরে পড়ে যাওয়ায় এই দুজন গার্ডের কাছে 'অর্ডার' এসেছে?

জিশান আর ফকিরচাঁদ উঠে দাঁড়াল। জিশান দেখল গার্ড দুজনের দিকে। ভাবলেশহীন পাথরের মুখ। দেখে মনে হয় যন্ত্রেরও অধম। কিন্তু খেলার মাঠে আলাপ হওয়া নাহাইতলার সেই গার্ড বলেছিল, '...এরা সবকিছু

পয়সা দিয়ে মাপে।' তা হলে জিশান কি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে? ওর হাতে আছে প্রাইজ মানির আশিহাজার টাকা। এ ছাড়া মনোহরের কবুল করা গিফট পঞ্চাশহাজার টাকা।

টাকা খরচ হয় হোক, জিশান ওই কবরস্থানটা একবার দেখতে চায়। আজই না জিশান ভাবছিল, কম্পিটিশানে 'খরচ' হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে নিয়ে সিন্ডিকেট কী করে? সেটা নিজের চোখে একবার দেখা যায় না?

লম্বা গার্ডটা ফকিরচাঁদকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। ভাঙাচোরা মানুষটা চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল।

জিশান আর দেরি করল না। বেঁটে মতন গার্ডটাকে বলল, 'ভাই, কবরস্থানটা আমাকে একবার দেখাতে পারো? আমার কাছে প্রাইজ মানির অনেক টাকা আছে। কাল তোমাকে তার থেকে দশ হাজার টাকা দেব...।'

গার্ডটা জিশানের কবজি ধরতে যাচ্ছিল—থমকে গেল। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী বললে? দশহাজার?'

জিশান ওর চোখে লোভের ঝিলিক দেখতে পেল। একইসঙ্গে ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল। তাই ঝুঁকি নিয়ে ওর দু-হাত চেপে ধরল। অনুনয় করে বলল, 'ভাই, একটিবারের জন্যে কবরস্থানটা আমাকে দেখাও। দশহাজার দেব। কাউকে বলব না। প্লিজ...।'

গার্ডটা এদিক-ওদিক তাকাল। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল ওর ভেতরে লোভের সঙ্গে ভয়ের লড়াই চলছে। শ্রীধর পাট্টাকে সবাই যমের চেয়েও বেশি ভয় পায়।

কয়েকবার ঢোঁক গিলল গার্ডটা। তারপর বলল, 'না, না—উইদাউট পারমিশানে ওখানে যাওয়াটা খুব রিসকি। তার চেয়ে আমি একটা সাজেশান দিই। তুমি যদি ওই দশহাজার টাকাটা দাও তা হলে পারমিশান করিয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জান লড়িয়ে দেব...।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে জিশানের দিকে চেয়ে রইল প্রহরী। জিশান এই প্রস্তাবে রাজি হলে তবেই ও পরের ধাপে এগোবে।

দু-চারসেকেন্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিশান। বলল, 'তাই হবে। আজ রাতে যদি কবরস্থানটা আমাকে দেখাও তা হলে কাল ক্যাশ দশহাজার টাকা তুলে তোমাকে দিয়ে দেব—।'

তখনই জিশান দেখল, ফকিরচাঁদকে পৌঁছে দিয়ে দ্বিতীয় গার্ডটা ফিরে আসছে।

প্রথম গার্ড সঙ্গে-সঙ্গে চলে গেল সঙ্গীর কাছে। দুজনে মিলে কিছুক্ষণ কীসব আলোচনা করল। তারপর প্রথমজন জিশানের কাছে এসে বলল, 'তোমার পার্টিসিপ্যান্ট আই-ডি নাম্বারটা বলো—।'

জিশান বলল।

পকেট থেকে ছোট ওয়্যারলেস সেট মতন কী একটা যন্ত্র বের করে নম্বরটা স্টোর করে নিল গার্ড। তারপর হাতের ইশারা করে বলল, 'তুমি এখানে ওয়েট করো। আমরা পারমিশানের ব্যাপারটা ট্রাই করতে যাচ্ছি। আমাদের ইন-চার্জকে এ-কথা বলব যে, তোমার এক বন্ধুর কবরে তুমি ফুল দিতে যাবে। যদি পারমিশান পেয়ে যাই তা হলে আমরা জেনারেল স্টোর থেকে সাদা ফুল নিয়ে আসব। চিন্তা কোরো না...আমরা কুড়িমিনিট কি বড়জোর আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। তুমি ওয়েট করো। অন্য কোনও গার্ড কিছু জিগ্যেস করলে বলবে, তোমার এখানে ওয়েট করার অর্ডার আছে। ও.কে.?'

জিশান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে গার্ডটা চলে গেল তার সঙ্গীর কাছে। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে ঢুকে পড়ল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর ভেতরে।

জিশান চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওর মনে হল, ফকিরচাঁদকেও সঙ্গে নিলে হত—যদি অবশ্য অনুমতি পাওয়া যায়।

মিনিটকুড়ি কি পঁচিশ পর গার্ড দুজন ফিরে এল। ওদের ঠোঁটের হাসি দেখেই জিশান বুঝল, অনুমতি মিলেছে। সেই ধারণাটা নিশ্চিত হল একজনের হাতে একটা সাদা ফুলের তোড়া দেখে।

প্রথমজন নিচু গলায় জিশানকে বলল, 'পারমিশান পাওয়া গেছে। মেন গেট খোলার অথরাইজড স্মার্ট কার্ড দিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া একটা কিউ-মোবাইল-এরও ব্যবস্থা করা গেছে। আমাদের সময় দিয়েছে একঘণ্টা।' হাতঘড়ি দেখল : 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেন গেটে একটা কিউ-মোবাইল এসে দাঁড়িয়ে যাবে—।'

দ্বিতীয় গার্ড ফুলের তোড়াটা জিশানের হাতে দিয়ে বলল, 'দশহাজার টাকাটা কাল মনে করে দিয়ো কিন্তু। চাইতে যেন না হয়।'

জিশান বলল, 'দেব। চাইতে হবে না। তবে একটা রিকোয়েস্ট আছে...।'

'আবার কী রিকোয়েস্ট?' রুক্ষভাবে জানতে চাইল দ্বিতীয়।

'ফকিরচাঁদকে নিয়ে এসো। ওকে আমার সঙ্গে নেব। ও ওর মরা ভাইকে যদি দেখতে চায়...।'

গার্ড দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর ওরা ফকিরচাঁদকে সঙ্গে নেওয়া অনেক ঝামেলার বলে জিশানের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক জুড়ে দিল। কিন্তু জিশান গোঁ ধরে রইল। এ-কথাও শুনিয়ে দিল যে, দশহাজার টাকা নেহাত কম নয়।

প্রায় পাঁচমিনিট তর্ক-বিতর্কে খরচ হওয়ার পর ওরা নিমরাজি হল। একজন গার্ড জিশানের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, আর-একজন গেল ফকিরচাঁদকে নিয়ে আসতে।

ফকিরচাঁদ এলে ওরা চারজন মেন গেটের দিকে হাঁটা দিল। ফকিরচাঁদকে দেখে ক্লান্ত অবসন্ন মনে হল। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ও নেশা করেছে। ও ক্লান্ত গলায় বিড়বিড় করে বলছিল, 'আমিরের ওই ডেডবডি আমি আর দেখতে চাই না...দেখতে চাই না...।'

কেন এই ডেডবডি দেখার আতঙ্ক জিশান বুঝতে পারল না। তা ছাড়া, এতদিন পরও ডেডবডি দেখবে কেমন করে?

মেন গেটে পৌঁছে একজন গার্ড স্লটে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করল। যন্ত্রে 'বিপ' শব্দ হল। সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। হাতের চাপ দিতেই কম্পাউন্ডের গেট খুলে গেল। জিশানরা বেরিয়ে এল গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর বাইরে।



গেটের বাইরে মোতায়েন থাকা দুজন গার্ড এতটুকুও বিচলিত হল না। ওরা জানে, অথরাইজড স্মার্ট কার্ড ছাড়া মেন গেট খুলবে না।

জিশানরা বাইরে এসে দাঁড়ানোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদ্ভুত ধাঁচের গাড়ি ওদের কাছে এসে থামল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দটা মউমাছির গুঞ্জনের মতো শোনাল।

জিশান গাড়িটাকে ভালো করে দেখল। মেন গেটের জোরালো বাতির রোশনাই গাড়িটার স্টেইনলেস স্টিল বডিতে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। গাড়ির বনেটের ওপরে গাঢ় নীল রঙে সিন্ডিকেটের লোগো আঁকা।

গাড়িটার আকৃতি অনেকটা কম্পিউটারের মাউসের মতো। তবে সামনের দিকটা ছুঁচলো। গতিবেগ বাড়ানোর জন্য আধুনিক এরোডায়ানামিক ডিজাইনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গাড়ির দুপাশে হাঙরের কানকোর মতো ভেন্টিলেটর। আর ছাদের দুপাশে দুটো খাটো অ্যানটেনা লাগানো।

হঠাৎই গাড়িটার চারটে দরজা পাখির ডানার মতো খুলে গেল—উঠে গেল ওপরের দিকে। একজন গার্ডের নির্দেশে ওরা বসে পড়ল গাড়িতে।

এরকম গাড়ি নিউ সিটির রাস্তায় আগেও দেখেছে জিশান। তবে কখনও তার দরজা খুলতে দেখেনি। এ-গাড়ির নাম কেন কিউ-মোবাইল সেটা ওর মাথায় ঢুকল না।

গাড়ির পাইলট কী একটা বোতাম টিপতেই চারটে দরজা নেমে এল। 'ক্লিক' শব্দ করে লক হয়ে গেল। এবং কিউ-মোবাইল চলতে শুরু করল।

জিশান আর ফকিরচাঁদ পিছনের সিটে বসেছিল। আর গার্ড দুজন বসেছিল পাইলটের পাশে। গাড়ি চলা শুরু করতেই একজন গার্ড পাইলটকে বলল, 'আমরা নেকরোসিটি যাব...।'

'ও. কে.।' মাথা নেড়ে বলল পাইলট। একইসঙ্গে ড্যাশবোর্ডের টাচস্ক্রিনের কয়েকটা উজ্জ্বল আইকনে আঙুল ছোঁয়াল।

কিউ-মোবাইল যে সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাঁক নিল সেটা বেশ টের পেল জিশান। ও গাড়ির জানলার কাচ ভেদ করে বাইরে তাকাল।

সুন্দর মসৃণ রাস্তা। কোথাও কোনও খানাখন্দ নেই। যেন একটা ইস্পাতের কালো ফিতে সামনে বিছানো রয়েছে।

ওল্ড সিটি ওরফে ডেড সিটির কথা মনে পড়ল জিশানের। সেখানকার সব পথঘাটই ভাঙাচোরা গর্তে ভরা। অথবা বলা যায় পুরোটাই খানাখন্দ—তার মধ্যে কোথাও-কোথাও রাস্তা। জিশান স্বপ্ন দ্যাখে সেই গুটিবসন্তে ভরা রাস্তা একদিন ঝকঝকে মোলায়েম হবে। তার ওপর দিয়ে এতটুকুও শব্দ না করে ছুটে যাবে শানুর ঝকঝকে গাড়ি।

বিষণ্ণ হাসল জিশান। স্বপ্ন দেখার অসুখ ওর এখনও গেল না! কিন্তু যাবেই বা কেন? দু:খ কষ্ট আছে বলে কি স্বপ্ন থাকবে না?

হঠাৎই ফকিরচাঁদ ওর হাত চেপে ধরাতে জিশানের চটকা ভাঙল।

'নেকরোসিটিতে আমি যাব না, জিশানভাইয়া।'

মুখ ফেরাল জিশান। দেখল, ফকিরের চোখে জল।

'কেন, যাবে না কেন?'

'আমার ভাইয়ের ওই হেনস্থা সহ্য করা যায় না। ও:...।'

জিশান কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামনের সিট থেকে একজন গার্ড বলে উঠল, 'আমরা নেকরোসিটিতে এসে গেছি—।'

প্রায় একইসঙ্গে কিউ-মোবাইল থেমে গেল। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকাল জিশান। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ওর চোখ আটকে গেল।

সামনেই গোটা পথ জুড়ে এক বিশাল তোরণ। তার চেহারা ওলটানো 'w' অক্ষরের মতো। তোরণের সর্বত্র নীল রঙের আলোকসজ্জা। আর মাথার ওপরে নীল রঙের নিওন সাইনে বড়-বড় করে লেখা 'ওয়েলকাম টু নেকরোসিটি'। তার ঠিক নীচে ছোট হরফে লেখা আছে : 'নো এন্ট্রি উইদাউট ভ্যালিড অথরাইজেশান।'

রাস্তাটা তোরণ পেরিয়ে সোজা চলে গেছে। তবে তোরণ পেরোনোমাত্রই রাস্তার দুপাশের আলোর রং সাদার বদলে নীল হয়ে গেছে। এবং সামনে যতদূর চোখ যায়, যতগুলো আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে, সবগুলোর রংই নীল।

নীলনগরী। মনে-মনে ভাবল জিশান। মৃত্যুর প্রতীকী রং নীল—হয়তো সেইজন্যেই নেকরোসিটি নীল আলোয় সাজানো।

একজন গার্ডের নির্দেশে পাইলট কিউ-মোবাইলের দরজা খুলল। দরজা খুলতেই একজন গার্ড নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। জিশানদের লক্ষ করে বলল, 'তোমরা গাড়িতেই বোসো। আমি সিকিওরিটি গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে কার্ড টেনে আসছি—।'

জিশান দেখল, তোরণের একপাশে একটা ছোট মাপের ঘর—সিকিওরিটি চেকপোস্ট। গার্ড সেদিকেই এগিয়ে গেল।

একটু পরেই গার্ড ফিরে এল গাড়িতে। আবার চলতে শুরু করল কিউ-মোবাইল। এবং কয়েকমিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল আসল জায়গায়।

কিউ-মোবাইলের দরজা খুলে গেল। গার্ডদের নির্দেশে জিশান আর ফকির নেমে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে নাম-না-জানা কোনও ফুলের এক মনোরম সুগন্ধ জিশানের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিল। আর চোখের সামনে যে-দৃশ্য ও দেখল, সেটাও চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো।

ফকিরচাঁদ জিশানের বাহু আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তবে অবাক চোখ মেলে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। বোঝা গেল, এ-দৃশ্য আগে ও দেখেনি।

জিশানের সামনে এক অন্ধকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই অন্ধকারে হাজার-হাজার মোমবাতি উজ্জ্বল নীল শিখায় জ্বলছে। মোমবাতির মায়াময় নীল আলো আর সুগন্ধী বাতাস জিশানকে মুগ্ধ করে দিল, স্তব্ধ করে দিল।

একজন প্রহরী জিশানের হাত ধরে টান মারল। বলল, 'চলো, ভেতরে চলো—নেকরোসিটি দেখে তোমার দশহাজার টাকা উশুল করো...।'

ওরা চারজন আলোকমালার দিকে এগিয়ে চলল। জিশান তখনও বুঝতে পারছিল না ফকিরচাঁদ কেন অকারণে কাঁদছে।

বেঁটে গার্ডটি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল—বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল। ও ওর সঙ্গীর সঙ্গে চাপা গলায় কিছু পরামর্শ করে তারপর হঠাৎই বলল, 'এখানে চ্যালেঞ্জ গেম খেলতে এসে যে ক'জন পার্টিসিপ্যান্ট মারা গেছে তাদের মাথাপিছু একটা করে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।'

জিশান একটা ধাক্কা খেল। এত মোমবাতি! এত পার্টিসিপ্যান্ট মারা গেছে এখানে! ভাবা যায় না।

চারপাশে দেখল গার্ডটি। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল। চাপা হেসে বলল, 'উফ, ''নো স্মোকিং'' নিয়মের ঠেলায় দম আটকে মারা যাওয়ার জোগাড়। সিগারেট খাওয়া বারণ তো সিগারেট বিক্রি বন্ধ করে দে। তা না, ওদিক থেকেও ট্যাক্সের পয়সা লুটবে আর আমাদেরও নেশায় বাঁশ দেবে। ওই শ্রীধর পাত্ত্রা—সালা শুয়োরের বাচ্চা—যত নষ্টের গোড়া...।'

জিশান তাজ্জব হয়ে গেল। এসব কী শুনছে ও! শ্রীধর পাত্ত্রার নামে এই বেপরোয়া গালাগাল! নেশার ঘোরে আসল কথাগুলো কি বেরিয়ে আসছে?

গার্ডটির লম্বা সঙ্গী প্রায় ছুটে গিয়ে ওর মুখে হাত চাপা দিল : 'এসব কী বলছিস তুই! চুপ—চুপ! কেউ শুনতে পেলেই কেলেঙ্কারি হবে। তুই—।'

এক ঝটকায় সঙ্গীর হাত সরিয়ে দিয়ে বেঁটে গার্ডটি বলল, 'ছাড় তো! সালা কেলেঙ্কারির নিকুচি করেছে। এরা হাজার-হাজার লোককে কোতল করে মোমবাতি জ্বেলে দিল তাতে কিছু না—আর আমি দুটো সত্যি কথা বললেই দোষ!'

চৌকশ কেতায় প্যাকেটে সিগারেটটা কয়েকবার ঠুকে ঠোঁটে ঝোলাল গার্ড। ছোট্ট ইলেকট্রিক লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা সামনে বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'আর কেউ ধরাবে?'

ফকিরচাঁদ মাথা নাড়ল : 'না।'

দ্বিতীয় গার্ড কিছু বলল না।

জিশান বলল, 'না। ধন্যবাদ। তবে...' একটু ভেবে আরও যোগ করল: 'এখানে... মানে, এই কবরস্থানে...সিগারেট খাওয়াটা ঠিক নয়...।'

এ-কথা শুনে প্রথম গার্ডের কী হাসি! হাসতে-হাসতে পেটে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ল ও। হাসতেই লাগল।

সঙ্গীর এই পাগলামি দেখে দ্বিতীয় ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। পিস ফোর্সের কেউ এসব কথা শুনছে না তো—এসব কাণ্ড দেখে ফেলছে না তো!

হাসির দমক থামিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটে কষে টান দিল প্রথম। জিশানের গায়ে তাচ্ছিল্যের ঠেলা মেরে বলল, 'কে বলেছে এটা কবরস্থান? কে বলেছে ওইসব মোমবাতির নীচে ডেডবডি আছে? সব ঢপের কেত্তন। ওগুলো সব ফলস। আসল ডেডবডি আছে এই নকল লোকদেখানো কবরস্থানের পেছনে। সেখানে একটা ডেডবডির ডোবা আছে। জল-টল কিছু নেই—শুধু পচা-গলা ডেডবডি। সেগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে হায়েনা, শেয়াল, নেকড়ে আর শকুন।'

ফকিরচাঁদ ডুকরে কেঁদে উঠল। জিশানের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। ওর দেহটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

প্রথম তখন সিগারেটে ঘন-ঘন টান দিচ্ছে। মাথা নাড়তে-নাড়তে ও বলল, 'চাকরির সারাক্ষণই তো শ্রীধর পাট্টার ভয়ে চুপ করে থাকি। কত আর চুপ করে থাকব?' জিশানের বুকে আঙুল ঠুকে বলল, 'তোমার কাছ থেকে যখন ঘুষ কবুল করেছি তখন তার এক্সচেঞ্জে সার্ভিস দেব, নেকরোসিটির সব কেলো ফাঁস করব...।'

সারি-সারি মোমবাতির মাঝখান দিয়ে সরু হাঁটা পথ। জিশান আর ফকিরকে মাঝখানে রেখে নিয়ে গার্ড দুজন হেঁটে চলল। জিশান অবাক হয়ে মোমবাতির নীল শিখাগুলো দেখছিল। এই বিচিত্র মোমবাতি এরা পেল কোথায়? সে-কথাই ও জিগ্যেস করল প্রথমকে।

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে প্রথম বলল, 'কোথায় আর পাবে! হয় বিদেশ থেকে আনিয়েছে, নয়তো এই নিউ সিটিতেই তৈরি করেছে।' সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছিল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গার্ড বলল, 'এই যে নাকে মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ এটা মেশিনে তৈরি। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা স্প্রেয়ারের নল থেকে স্প্রে করা হচ্ছে। বাইরে থেকে যখন নামিদামি লোকজন নিউ সিটি ভিজিট করতে আসে তখন এইসব ব্যবস্থা দেখে ওদের মাথা ঘুরে যায়। ভাবে, মারা যাওয়া মানুষগুলোর জন্যে সরকারের কত না দরদ, কত না শ্রদ্ধা। হুঁ:! আসল কাণ্ড তো আছে পেছনদিকটায়। বাইরের কাউকে ওদিকটায় নিয়ে যাওয়া বারণ। তুমি টাকা দেবে বলেছ, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি...।'

কবরস্তানের নানান জায়গায় বড়-বড় গাছ লাগানো। আবছা আলোয় সেই অন্ধকার গাছগুলোকে অপার্থিব দানব মনে হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে জোনাকির ঝাঁক দেখতে পেল জিশান। চলে বেড়ানো নীল আলোর ফুটকি।

ফকিরচাঁদ জিশানের পাশে-পাশে হাঁটছিল। ওর গা থেকে ঘামের গন্ধ পাচ্ছিল জিশান। সেইসঙ্গে শোকের গন্ধও।

প্রথমের কথার খেই ধরে দ্বিতীয় গার্ড জিশানকে বলল, 'তোমার হয়তো মনে হচ্ছে...আমরা তোমার কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছি...আমরা দুজন ঘুষখোর। আসলে ব্যাপার কী জানো...' অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল দ্বিতীয়: 'এই

নিউ সিটিতে ওপরমহলেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি। ওই শ্রীধর পাট্টা...আমাদের মার্শাল...ওটাই সবচেয়ে বড় হারামজাদা। নেকরোসিটির আইডিয়াটা ওরই। রেগুলার এত লোক গেম সিটিতে এসে মারা যাচ্ছে...এত ডেডবডির গতি হবে কী করে! কে রোজ এত ডেডবডি কবর দেবে? কে-ই বা দাহ করবে? তার চেয়ে অনেক ভালো...।'

দ্বিতীয় গার্ডের কথা শেষ হল না—ওদের কানে এল হিংস্র গর্জন।

জিশানের খেয়াল ছিল না, কথায়-কথায় ওরা কখন যেন মোমবাতির মিছিল পেরিয়ে গেছে। এখন ওরা এসে পড়েছে এক গাঢ় অন্ধকার এলাকায়।

প্রথমজন একটা টর্চ বের করে আলো জ্বালল। সেই আলোয় পথ দেখে-দেখে ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে দুজন গার্ড আচমকা ওদের সামনে হাজির হল। ওদের হাতে বাগিয়ে ধরা অদ্ভুত ধরনের খাটো পিস্তল। ওদের একজন কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'এখানে এসেছ কেন বলো। অথরাইজেশান দেখানোর জন্যে সময় দিলাম দশসেকেন্ড...।'

জিশানদের সঙ্গী দ্বিতীয় গার্ড চটপট স্মার্ট কার্ড বের করে দেখাল। বলল, 'স্পেশাল পারমিশান আছে...।'

দুটো পিস্তলই খাপে ঢুকে গেল। গার্ড দুজন জিশানদের সঙ্গে এগোল।

হিংস্র গর্জন আরও জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে একটা বিকট পচা গন্ধ এসে ওদের নাকে ঝাপটা মারল। ফকিরচাঁদ শিউরে উঠে 'ওয়াক' শব্দ তুলল। জিশান নাক টিপে দম বন্ধ করে গন্ধটা সামাল দিতে চাইল।

আর কয়েক পা এগোতেই ওরা দেখল সামনে একটা লোহার জালের বেড়া। বেড়ার মাঝে একটা ইস্পাতের দরজা।

জিশানদের পাহারাদার গার্ড দুজনের একজন একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে বোতাম টিপল।

ইস্পাতের দরজায় দুটো সবুজ আলো জ্বলে উঠল এবং দরজা খুলে গেল।

রিমোট ইউনিটটা পকেটে রেখে গার্ড বলল, 'ভেতরে ঢুকে পাঁচটা স্টেপের বেশি এগোবে না। তখনই আমরা আলো জ্বেলে দেব—।'

জিশানরা এগোল।

ফকিরচাঁদ ভাঙা গলায় জিশানকে বলল, 'জিশানভাইয়া, এবার আমি চিনতে পেরেছি। আমাকে ওরা চোখ বেঁধে এখানেই নিয়ে এসেছিল। দুজন ডেডবডি হ্যান্ডলার আমিরচাঁদের বডিটা খুঁজে বের করে দিয়েছিল। সেটার যা অবস্থা দেখেছি...' ফুঁপিয়ে উঠল ফকিরচাঁদ: 'বাঁ-কানের একটা দুল দেখে ওকে চিনতে পেরেছিলাম। ওর নাক-চোখ কিছু ছিল না...সব খোবলানো। ফুলের তোড়াটা আমি ছুড়ে দিয়েছিলাম আমিরের দিকে...' দু-হাতে চোখ মুছে ফকির বলল, 'ও আটদিন আগে সাপের কামড়ে মারা গেছে। সে-দু:খ যা পেয়েছি, পেয়েছি। কিন্তু ওর ডেডবডিটার কথা মনে পড়লেই আমার সবসময় কান্না পায়, জিশানভাইয়া। নিজেকে আমি আর রুখতে পারি না।'

জিশানরা ইস্পাতের দরজা পেরোনোর সময় ফকিরচাঁদ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমি এখানেই থাকব—ভেতরে আর যাব না।'

জিশান ওর করুণ মুখের দিকে একবার দেখল শুধু—কিছু বলল না। তারপর সামনে এগোল। কারণ, যতই বীভৎস দৃশ্য সামনে থাক জিশানকে দেখতেই হবে। যতই কটু দুর্গন্ধ ওর নাকে এসে ঝাপটা মারুক ওকে সেটা উপেক্ষা করতেই হবে। জিশান যদি স্নেক লেক, পিট ফাইট কিংবা কিল গেম-এ হেরে যায়, মারা যায়, তা হলে ওর যেখানে ঠাঁই হবে সেই জায়গাটা জিশান দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়।

গেস্টহাউস থেকে আসা গার্ড দুজনও ইস্পাতের দরজা পেরিয়ে আর এগোল না। নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়ে জিশানকে ইশারা করল এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

জিশান কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল সামনে। চার পা এগিয়েই ও থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই ওর সামনের জায়গাটা আলোর বন্যায় ভেসে গেল। উজ্জ্বল আলোয় জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

সামনে যে-দৃশ্য ও দেখল তাকে এককথায় মর্মান্তিক ছাড়া আর কী বলা যায় জিশান জানে না।

একটা বিশাল পুকুরের কিনারায় জিশান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুরটার পাড় কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। পুকুরে জল নেই। শুধু নগ্ন মানুষের মৃতদেহে পুকুরের অর্ধেকটা ভরতি। সেইসব মৃতদেহের বেশিরভাগই পচা-গলা। টুকরো-টুকরো হাত-পা, কিংবা মাথা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নেকড়ে, হায়েনা, শেয়ালের দল। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। কখনও-কখনও হিংস্র গর্জন করে উঠছে। চোয়ালে চোয়াল ঠোকার 'খটাস' শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া শকুনের পাল জটলা করে আছে নানান জায়গায়।

ওরা সবাই মিলে নরমাংস নিয়ে মহোৎসবে মেতে আছে।

চড়া আলোয় ঝকঝকে নোংরা দৃশ্যটা জিশানকে কাঁপিয়ে দিল। ও দেখল, পুকুরের ওপাশটায় গভীর জঙ্গল শুরু হয়েছে। ক্ষুধার্ত বন্যপ্রাণীগুলো সেই জঙ্গল থেকে আসা-যাওয়া করছে। ওরা জানে, এই পুকুরে নিয়মিত মহাভোজের ব্যবস্থা রাখা আছে ওদের জন্য।

জিশান নাক-মুখ চেপে অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্যটা সহ্য করছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর পারল না। সাদা ফুলের তোড়াটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। কয়েকবার 'ওয়াক' তুলে ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল কংক্রিটের মেঝেতে। দু-হাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল। প্রবল হেঁচকি তুলে বিকট শব্দে বমি করতে শুরু করল। সেই শব্দগুলো জিশানের কানে জন্তুর ডাকের মতো শোনাল।

জিশানের মনে হল, এই জঘন্য ভয়ংকর জায়গায় কিছুতেই ও আসতে চায় না। মৃতদেহ হিসেবেও নয়।

সুতরাং এখানে না আসার জন্য ওকে দাঁত-নখ দিয়ে ভয়ংকর লড়াই করতে হবে।

বমির দমক শেষ হলে কয়েকবার থুতু ফেলল জিশান। মুখের ভেতরটা টক হয়ে গেছে। কিছুটা তেতোও। শ্রীধর পাট্টার কথা মনে পড়ল ওর। সুট-বুট পরা কেউটে সাপ। এখানে হাজির থাকলে নিশ্চয়ই ছড়া কেটে বলতেন, 'এই যে বাবু জিশান। এই হল আমাদের শ্মশান।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল জিশান। চারপাশের কটু গন্ধটা এতক্ষণে নাকে অনেকটা সয়ে এসেছে। যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গেছে। এবার ফিরতে হবে। তারপর... ক'দিন পর...স্নেক লেক।

জিশানের ভেতরে হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই গেমটায় ও কোয়ালিফাই করবেই। করতে ওকে হবেই।

ও টের পেল, স্নেক লেক গেমটার মোকাবিলার জন্য ও কোন ম্যাজিকে যেন চনমনে হয়ে উঠল।

•

নিয়মমাফিক পার্টিসিপ্যান্টদের স্নেক লেক গেম-এর কম্পিউটার সিমুলেশান দেখানো হল।

কমব্যাট পার্কের মতো এখানেও গেম সাইটের কাছাকাছি গেম কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং। সেই বিল্ডিং-এর এয়ারকন্ডিশনড হলে বসে জিশানরা স্নেক লেক গেম-এর সিমুলেশান দেখল।

অগভীর জলের বিস্তীর্ণ আয়তাকার পুকুর। মাপ একশো মিটার বাই তিরিশ মিটার। সেই পুকুরে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় নানান বিষধর সাপ। সাপগুলো ঠিক কী-কী ধরনের সেগুলো ছবিসমেত বোঝানো হচ্ছিল। সাপগুলোর চলাফেরা, আচরণ, শিকার ধরা বিশদভাবে বোঝানো হচ্ছিল। তিনজন সাপবিশেষজ্ঞ পালা করে সবকিছু ব্যাখ্যা করছিলেন। সাপগুলোর বিষগ্রন্থি, তাদের বিষদাঁতের মাপ ও আকার, বিষের তেজ, ছোবল মারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অত্যন্ত যত্ন আর নিষ্ঠা নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন তাঁরা। এবং তারই মাঝে-মাঝে জাম্প কাট করে গেম-এর সিমুলেশানটা দেখানো হচ্ছিল।

জিশানের মনে হল, সাপ নিয়ে কোনও তথ্যচিত্র দেখেও বোধহয় ব্যাপারটা এত ভালো করে বোঝা যেত না।

বিষধর সাপের তালিকায় সাতরকমের সামুদ্রিক সাপের নাম ও ছবি দেখানো হল। সাঁতার কাটার সুবিধের জন্য প্রকৃতি ওদের লেজের দিকটা আচমকা চ্যাপটা করে দিয়েছে—অনেকটা মাছের লেজের মতো। একইসঙ্গে জিশানদের জানানো হল, প্রায় সব সামুদ্রিক সাপই মারাত্মকরকম বিষধর।

সিমুলেশান শেষ হওয়ার পর মিনিটপাঁচেক ধরে চলল প্রশ্নোত্তরের পালা। জানানো হল যে, এই গেম-এর সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.36

সবশেষে গেম ইনস্ট্রাকটর ঘোষণা করলেন, এই খেলায় প্রাইজ মানি চল্লিশহাজার টাকা।

জিশান ভাবছিল, এরপর বোধহয় ওদের বিল্ডিং-এর বাইরে বেরোতে হবে। সার বেঁধে হাঁটা দিতে হবে স্নেক লেকের দিকে। কিন্তু অডিয়ো সিস্টেমে শোনা গেল একটি বিশেষ ঘোষণা ঃ 'পার্টিসিপ্যান্টদের এবারে ''ভেনম হাউস'' দেখানো হবে। যেহেতু আসল গেম-এর সময় সাপগুলো থাকবে ঘোলাজলের আড়ালে, সেহেতু পার্টিসিপ্যান্টরা সাপগুলোকে দেখতে পাবে না। তাই ''ভেনম হাউস''-এ সেই প্রজাতির সাপগুলো কাচের বাক্সে রাখা আছে—যাতে খেলায় নামার আগে তারা সাপগুলোকে ভালো করে দেখে নিতে পারে। ''ভেনম হাউস'' রয়েছে এই বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে...নর্থ-ইস্ট কর্নারে।

'নাউ স্টার্ট। হলের দরজায় ''ভেনম হাউস''-এর গাইড আপনাদের জন্যে ওয়েট করছে। ''ভেনম হাউস'' দেখার জন্যে আপনাদের সময় দেওয়া হল তিরিশমিনিট। তার মানে, কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটায় আমরা এই গেম কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর মেন গেটে জড়ো হব। তারপর স্টার্ট দেব স্নেক লেকের দিকে। ও. কে., প্রসিড গাইজ...।'

জিশানরা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হলের দরজার দিকে এগোল।

সেখানে একজন গাইড আর পিস ফোর্সের দুজন গার্ড ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গাইডের গায়ে নীল রঙের স্লিভলেস জ্যাকেট। জ্যাকেটের বুকের দিকটায় প্যাঁচানো একটা সাপের ছবি—ফণা তুলে আছে। আর জ্যাকেটের পিঠের দিকে সাদা ইংরেজি হরফে লেখা 'ভেনম হাউস'।

গাইডকে অনুসরণ করে জিশানরা সার বেঁধে এগোল। চোরা-দৃষ্টিতে সারির সামনে-পিছনে তাকিয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যাটা গুনে নিল জিশান। মোট ষোলোজন। তার মধ্যে মনোহর সিং-ও আছে।

প্রায় পনেরো সেকেন্ড হেঁটে কয়েকটা করিডর বদল করে ওরা 'ভেনম হাউস'-এ পৌঁছে গেল।

সহজ কথায় বলতে গেলে ব্যাপারটা সাপের চিড়িয়াখানা। আধুনিক ছাঁদে সাজানো বিশাল মাপের ঘর। ঘরের চারদেওয়ালে নানান মাপের কাচের বাক্স। নেমপ্লেট লাগানো সেইসব বাক্সে রাখা আছে জীবন্ত সাপ। যে-সাপগুলো একটু আগেই জিশানরা তথ্যচিত্রে দেখে এসেছে।

কী সাপ নেই এখানে! কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শাখামুটি থেকে শুরু করে ব্ল্যাক মাম্বা, ঝুমঝুমি সাপ পর্যন্ত সবই হাজির।

এই সাপগুলোর পাশেই সার বেঁধে রাখা আছে অ্যাকোয়ারিয়াম। তার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের সাপ। একটা সাপের নাম পড়ল জিশান—অলিভ সি স্নেক। সেই নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা Alpysurus laevis

জিশানের গা-টা কেমন শিউরে উঠল। মনে হল, সাপগুলো ওর পোশাকের নীচে কিলবিল করছে।

গাইড তখন মেগাফোনে ভরাট গলায় বলছে, '...এই সাপগুলোই থাকবে ওই লেকের জলের ভেতরে। আপনারা ভালো করে দেখে নিন কী-কী ধরনের সাপের কামড় আপনাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। অবশ্য রেসের ফিনিশ লাইনের পর এক্সপার্ট মেডিক্যাল ইউনিট হাজির থাকবে। ওরা সাপের কামড় খাওয়া পার্টিসিপ্যান্টদের দেখভাল করবে।'

কাচের বাক্সের ভেতরে সাপগুলো অলসভাবে নড়াচড়া করছিল। আর কতকগুলো সাপ অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে সাঁতার কাটছিল। ওদের আকর্ষণীয় রং মুগ্ধ হয়ে দেখছিল জিশান। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, ওই

বিচিত্র রঙের আড়ালে রয়েছে মারাত্মক বিষ।

জিশান চোয়াল শক্ত করল। গত কয়েকদিন ধরে বালির ওপরে দৌড় আর জলের ওপরে দৌড় ও কম প্র্যাকটিস করেনি। আজ আসল পরীক্ষায় বোঝা যাবে ওর প্র্যাকটিস ঠিকমতো হয়েছে কি না।

'ভেনম হাউস' দেখা শেষ করে এগারোটার দু-মিনিট আগেই গেম কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর মেন গেটে ওরা সবাই এসে জড়ো হল। তারপর ঠিক এগারোটা পাঁচে সার বেঁধে হাঁটা দিল স্নেক লেক-এর দিকে। ওদের ষোলোজনকে আগলে নিয়ে চলল চারজন গার্ড। তার মধ্যে সেই বেঁটেমতন গার্ডটাকে দেখতে পেল জিশান। ওর হাতেই ও ঘুষের দশহাজার টাকা তুলে দিয়েছিল।

গার্ডটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও ছোট্ট করে হাসল। তারপর চোখের ইশারায় বলতে চাইল যে, পরে জিশানের সঙ্গে ও কথা বলবে।

আজ সকালে সূর্য নিয়মমতোই উঠেছে। সোনা রোদে ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক। গাছপালায় সারারাত ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে খাবারের খোঁজে। সকালে ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেইসব পাখিদের দেখছিল জিশান। দেখতে-দেখতে মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। পাখিরা কত স্বাধীন! ওদের কাছে ওল্ড সিটি আর নিউ সিটির মাঝে কোনও বাধা নেই। পাখি হলে ও এখুনি উড়ে চলে যেত মিনি আর শানুর কাছে। কে জানে, আজ রাতে ও মিনির সঙ্গে কথা বলতে পারবে কি না! স্নেক লেক গেম-এর সাপের ছোবল বাঁচিয়ে ও কি আজ গেস্টহাউসে ফিরতে পারবে?

মন-প্রাণ দিয়ে রোদের তাপ নিচ্ছিল জিশান। কে জানে, কাল যদি আর সূর্যের সঙ্গে ওর দেখা না হয়। সেইজন্যই হয়তো চারপাশের দৃশ্যটাকে ও ব্লটিং পেপারের মতো হৃদয়ে শুষে নিতে চাইছিল।

ওদের চলার পথের পাশ দিয়ে চলে গেছে মসৃণ রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে ছুটে যাচ্ছে কিউ-মোবাইল আর গেমস মোবাইল। রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান, লন। এ ছাড়া কোথাও-কোথাও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ গাছের সারি। তাদের ফাঁকে-ফাঁকে ছবির মতো আঁকা নীল আকাশের টুকরো। দেখে বোঝাই যায় না, এসবের আড়ালে চলেছে প্রাণ নিয়ে খেলা।

কখন যে বেঁটেমতন গার্ডটি জিশানের পাশাপাশি এসে পড়েছে জিশান খেয়ালই করেনি।

জিশানের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

জিশান সামনের দিকে চোখ রেখে পথ চলতে-চলতে ছোট্ট করে বলল, 'ভালো।'

'আমি জানতাম আজ তোমার স্নেক লেক আছে। আমাদের কোনও গেম-এ ডিউটি দেওয়ার সময় পার্টিসিপ্যান্টদের আই-ডি নাম্বারের লিস্ট দিয়ে দেয়। কবরস্তানে তোমাদের নিয়ে যাওয়ার পারমিশান করানোর সময় তোমার আই-ডি নাম্বার নিয়েছিলাম মনে আছে?'

জিশান মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ, মনে আছে—।'

'তোমার নাম্বারটায় লাস্টে পরপর তিনটে ফোর ছিল। সেটা দেখেই আইডিয়া করলাম তোমার আজ স্নেক লেক আছে...।'

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

'তুমি লোক খারাপ না। একটা সামান্য কাজের জন্যে এককথায় দশহাজার টাকা দিয়ে দিয়েছ। তাতে আমাদের দুজনের খুব হেলপ হয়েছে। তাই তোমাকে হেলপ করা উচিত...।'

জিশান চমকে গার্ডের দিকে তাকাল। হেলপ করার ছুতোয় আবার টাকা চাইবে না কি?

গার্ডটা জিশানের মনের কথা আঁচ করতে পেরে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, কোনও টাকাপয়সার ব্যাপার না। এমনি তোমাকে একটা স্পেশাল খবর জানাতে চাই...।'

'কী?'

জিশানের সামনের আর পিছনের প্রতিযোগীর দিকে তাকাল গার্ড। জিশানের কাছ থেকে ওদের দূরত্ব প্রায় তিনফুট। সেটা চোখের নজরে মেপে নিয়ে জিশানের আরও কাছ ঘেঁষে এল। চাপা গলায় বলল, 'লেকের

জলে যে-সাপগুলো ছাড়া আছে সেগুলো সাধারণ সাপ না...।'

'তার মানে?'

'জানো তো, সাপ কখনও তেড়ে এসে কামড়ায় না। কেউ গায়ে পা দিলে, বা হঠাৎ কাছাকাছি চলে গেলে, ছোবল মারে। লেকের সাপগুলো সেরকম না। ওদের বডিতে একটা স্পেশাল ড্রাগ ইনজেক্ট করা আছে। সেজন্যে ওরা কিছু দেখতে পেলেই তেড়ে গিয়ে কামড়াবে। ওই ড্রাগের জন্যে ওরা ভীষণ হিংস্র হয়ে যায়...।'

সাপের সঙ্গে 'হিংস্র' শব্দটা যে কখনও জোট বাঁধতে পারে এটা জিশান স্বপ্নেও ভাবেনি। তা হলে লেকে দৌড়নোর সময় বিষধর সাপের কামড় খাওয়াটাই স্নেক লেক কমপিটিশানের প্রতিযোগীদের ভবিতব্য! তা হলে সারভাইভাল ফ্যাক্টর যে 0.36 বলা হয়েছে সেটাও আগাপাশতলা মিথ্যে! এই লোডেড গেম-এর লাইভ টেলিকাস্ট দেখবে নিউ সিটির বাসিন্দারা! দেখবে আর আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়বে!

গেম কন্ট্রোল বিল্ডিং-এ সিমুলেশান ইত্যাদি দেখানোর সময় সাপগুলোকে যে ড্রাগ ইনজেক্ট করা থাকবে এ-তথ্য জানানো হয়নি। এটা শোনার পর জিশান এত দমে গেল যে, ও ধরেই নিল, আজ রাতে মিনির সঙ্গে ওর আর কথা বলা হবে না।

ওর মুখে যে একটা বিষাদের পরদা নেমে এসেছে সেটা বোধহয় গার্ডের নজরে পড়ল। ও নিচু গলায় বলল, 'তোমাকে একটা পাউচ দিচ্ছি—এটা লুকিয়ে রেখে দাও। প্যান্টের কোমরে-টোমরে গুঁজে নাও।'

কথা বলতে-বলতে মুঠো করা একটা হাত জিশানের দিকে বাড়িয়ে দিল গার্ড।

জিশান ইতস্তত করছিল। সেটা লক্ষ করে গার্ড বলল, 'নাও, নাও। বললাম তো—কোনও পয়সা লাগবে না...।'

জিশানের বাঁ-হাত গার্ডের ডানহাতের মুঠোর কাছে চলে গেল। সকলের চোখ এড়িয়ে একটা ছোট পলিথিন পাউচ জিশানের হাতে চলে এল।

জিশান চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কী আছে এতে?'

'স্নেক রিপেলান্ট অয়েল,' গার্ড বলল, 'এটা গায়ে মেখে নিলে সাপ আর কাছে আসবে না। এই তেলটা এমন পিকিউলিয়ার যে, শুধু সাপ এর গন্ধ পায়—মানুষ পায় না। আমাদের ''ভেনম হাউস''-এর স্নেক হ্যান্ডলাররা এই তেলটা রেগুলার ইউজ করে। স্নেক লেক গেম-এর পার্টিসিপ্যান্টদের মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড তাদের আমরা এই পাউচ বিক্রি করি—অবশ্যই লুকিয়ে-চুরিয়ে। তবে তোমার কাছ থেকে টাকা নেব না...।'

'থ্যাংকস—' বলে ছোট্ট পাউচটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে ফেলল জিশান।

গার্ড বলল, 'লেকে নামার আগে পা চুলকানোর ভান করে ওই পাউচের তেলটা পায়ে মেখে নেবে...হাঁটু পর্যন্ত। কোনও সাপ যদি জল থেকে লাফিয়ে হাঁটুর ওপরে কামড়ায় তা হলে তোমার আর কিছু করার নেই...ভগবান যা করার করবে। যাকগে, জেতার চেষ্টা করো। তুমি জিতলে আমার খারাপ লাগবে না। ওই শ্রীধর পাট্টা আর তার চ্যালাচামুণ্ডাগুলোকে যদি টাইট দিতে পারতাম তা হলে আমার হাড়ে বাতাস লাগত। ওই শুয়োরের বাচ্চার দল ছাপোষা মানুষগুলোকে ধরে এনে ছারপোকার মতো টিপে-টিপে মারছে। কোনও প্রতিবাদ নেই, কোনও আন্দোলন নেই। বুঝলে, আমরা সব ভেড়া হয়ে গেছি। এই দু:খেই আমি মাল খাই, আর ঘুষ খাই। আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক, জিশান। তোমার ব্যাপারে আমি খোঁজ নিয়েছি। তুমি হয়তো কিছু একটা করতে পারবে। তুমি জিতলে আমার মনে হবে আমিই জিতেছি।' হঠাৎই সামনের দিকে তাকিয়ে গার্ড বলল, 'আমরা এসে গেছি। ওই যে স্নেক লেক। বেস্ট অফ লাক, ভাই। মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই...।'

কথা বলতে-বলতে গার্ড চলে গেল।

কিন্তু জিশানের বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে জিশানকে কী বলে গেল ঘুষখোর লোকটা! 'মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই।'

মিনি বারবার বলছে, ওকে জিততে হবে। এই অসভ্য মরণখেলার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে।

মনোহর সিং চাইছে জিশান জিতুক।

ওকে ঘিরে এতরকম মানুষের এত আশা!

গার্ড বলে গেল, '...আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক...।' গার্ড চাইছে, এইসব হেরে যাওয়া পাবলিকদের হয়ে জিশান লড়বে—এবং জিতবে।

জিশান ঘাড় ঘুরিয়ে গার্ডকে খুঁজল। ও তখন প্রতিযোগীদের সারির একেবারে পিছনে গিয়ে পজিশন নিয়েছে। কয়েকসেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইল জিশান—যদি একটিবারের জন্য চোখাচোখি হয়।

চোখাচোখি হল। এবং হওয়ামাত্রই জিশান ঠোঁটের কোণে হাসল, আর বাঁ-হাতে 'থামস আপ' দেখাল। মনে-মনে বলল, 'আমি তোমাকে জেতানোর জন্যে শেষ দম পর্যন্ত লড়ব।'

জিশানদের নিয়ে যাওয়া হল লেকের সামনে। ওদের সবার গায়ে কমপিটিশানের চেনা পোশাক : হলদে টি-শার্ট আর কালো বারমুডা। টি-শার্টের বুকে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো আর তার নীচে বার কোড।

য়ুনিফর্ম পরা চারজন 'স্নেক হ্যান্ডলার'-কে দেখতে পেল জিশান। ওদের গায়ে কমলা রঙের জ্যাকেট। জ্যাকেটের পিঠের দিকে ইংরেজিতে লেখা : 'স্নেক হ্যান্ডলার'। এ ছাড়া মেডিকেল ইউনিটের হুডখোলা সাদা গাড়িও চোখে পড়ল ওর। না, কোনও ব্যবস্থাতেই কোনও ফাঁক নেই।

খেলাটা লাইভ টেলিকাস্টের জন্য টিভি চ্যানেলের ক্রু লেকের চারকোণে আর মাঝামাঝি দুটো জায়গায় যন্ত্রপাতিসমেত পজিশন নিয়েছে। একটা উঁচু ফ্রেমে ক্যামেরা বসিয়ে লেকের টপভিউ নেওয়ার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। সব আয়োজনই এমন নিখুঁত যাতে উত্তেজনা ও আনন্দের মাত্রা ঠিকঠাক রেখে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত 'জীবন্তভাবে' পৌঁছে দেওয়া যায় টিভি দর্শকদের কাছে।

একজন ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশে জিশানরা প্রত্যেকে জুতো খুলে ফেলল—যাতে জলের মধ্যে জোরে দৌড়তে সুবিধে হয়। তারপর সাঁতারের প্রতিযোগিতার মতো ওদের পরপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

ওদের সামনে একটা ধাতব পাঁচিল—তিনফুট মতো উঁচু। পাঁচিলটা ডিঙোলেই লেক। লেকের জলের রং সাদা, ঘোলাটে। জলে কি মিশিয়েছে কে জানে!

জিশানের ডানদিকে চারজন প্রতিযোগীর পর মনোহর সিং। ও মাঝে-মাঝে উঁকি মেরে জিশানের দিকে দেখছিল। ওর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল জিশানের। ওর কাছে স্নেক রিপেলান্ট অয়েল রয়েছে—মনোহরের কাছে নেই। কিন্তু ওই তেলটা তো পায়ে মাখতে হবে!

হঠাৎই জিশান একজন গার্ডকে ডেকে বলল, 'আমাকে টয়লেটে যেতে হবে। খুব জোর পেয়ে গেছে।'

গার্ডটার মুখে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। জিগ্যেস করল, 'ছোট, না বড়?'

'ছোট।'

'বাঁচালে—।' গার্ড ওর কাছে এগিয়ে এল। আঙুল তুলে দেখাল : 'ওই যে—ওইদিকে।'

জিশান ইশারা লক্ষ করে তাকাল। পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে অদ্ভুত ছাঁদের একটা একতলা ঘর।

ও তাড়াতাড়ি পা চালাল সেদিকে।

টয়লেটের দরজায় দুজন গার্ড। ওদের বলে ভেতরে ঢুকল জিশান। ঢুকেই বুঝল বাথরুমটা এয়ারকন্ডিশনড এবং আধুনিক ঢঙে সাজানো। আরামের ব্যবস্থার বহর দেখে ওর তেতো হাসি পেল। তবে আর সময় নষ্ট না করে কোমর থেকে অয়েল পাউচটা বের করে নিল। চটপট পাউচ ছিঁড়ে তেলটা বের করে দু-পায়ে ভালো করে মাখতে লাগল—গোড়ালির গাঁট থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

তেল মাখা শেষ হলে ও ছেঁড়া পাউচটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। এটা এখানে পড়ে থাকা ঠিক নয়। গার্ডদের কারও নজরে পড়ে যেতে পারে।

ওটা লুকোনোর জায়গা খুঁজতে গিয়ে কাচের জানলায় লাগানো ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের দিকে চোখ গেল জিশানের। তাড়াতাড়ি একটা জানলার কাছে গিয়ে ব্লাইন্ডের প্লাস্টিকের পাতের আড়ালে পাউচটা লুকিয়ে ফেলল।

তখনই ব্লাইন্ড টানার দড়ির দিকে নজর পড়ল ওর। কী ভেবে দুটো জানলা থেকে চটপট দুটো সিনথেটিক দড়ি খুলে নিল। দড়িদুটো দলা পাকিয়ে জাঙ্গিয়ার ভেতরে গুঁজে দিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, পোশাকের ওপর থেকে দড়ির ব্যাপারটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। তারপর টয়লেট থেকে বেরিয়েই লেকের দিকে ছুটতে শুরু করল।

সেখানে পৌঁছে দ্যাখে একজন ইনস্ট্রাকটর পোর্টেবল অডিয়ো সিস্টেমে পার্টিসিপ্যান্টদের আই-ডি নম্বর অ্যানাউন্স করে সেটা ল্যাপটপে চেক করে নিচ্ছেন।

জিশান পৌঁছনোর দু-মিনিটের মধ্যেই কমপিটিশান শুরু হয়ে গেল। ওদের সামনের ধাতব পাঁচিলটা নি:শব্দে ঢুকে গেল মেঝেতে। এবং ওরা স্টার্টারের বন্দুকের শব্দ শোনামাত্রই লেকে নেমে পড়ল। দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করল।

লেকের দুপাশে দর্শকের ভিড়। তারা এই অদ্ভুত রেস দেখছে আর উত্তেজনায় হইহই করছে। ওদের বেশিরভাগই পিস ফোর্সের গার্ড, সুপারগেমস কর্পোরেশনের স্টাফ, আর বিভিন্ন গেমে নাম দেওয়া সব পার্টিসিপ্যান্ট। নিউ সিটির বাসিন্দারা এখানে নেই। তারা ঘরের কিংবা অফিসের আরামে বসে এই মারাত্মক খেলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে। যারা এখন দেখার সময় পাচ্ছে না তারা পরে সুবিধেমতো এর ভিডিয়ো রেকর্ডিং ডাউনলোড করে দেখে নেবে।

ওল্ড সিটিতেও এই গেমের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে বহু মানুষ। তাদের বেশিরভাগেরই চোখে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু মিনি টিভির সামনে বসে আছে জিশানের জন্য। আর জিশানকেও জিততে হবে মিনির জন্য। ওই ভয়ংকর শ্মশানের ওই হতভাগ্য মরা মানুষগুলোর জন্য। এবং ওই গার্ডের জন্য।

স্নেক রিপেলান্ট অয়েলটা ঠিকঠাক কাজ করবে কি না এ নিয়ে জিশানের মনে এককণা হলেও সংশয় ছিল। তাই ও প্রাণপণে ছুটছিল। ও পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ছপছপ শব্দ হচ্ছিল, জল ছিটকে উঠছিল। ওর সামনে-পিছনে বাকি পনেরোজনও একইরকম শব্দ তুলছিল। ছিটকে ওঠা জলের পরদায় প্রতিযোগীদের চেহারা আড়াল হয়ে যাচ্ছিল।

তারই মধ্যে দুটো সাপকে শূন্যে ছিটকে উঠতে দেখল জিশান। হয়তো কোনও পার্টিসিপ্যান্টের পায়ের টানে ওপরদিকে ছিটকে গেছে।

ছুটতে-ছুটতে তিনবার পায়ের নীচে নরম শরীর টের পেল ও। সাপের গায়ে পা পড়েছে ভাবতেই ওর গা-টা শিরশির করে উঠল। কিন্তু সেসব নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই। ছুট—ছুট—ছুট।

জিশান দেখল, এর মধ্যেই ছ'জন লেকের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ছিটকে ওঠা জলের ফোয়ারার জন্য মনোহরকে ও দেখতে পাচ্ছিল না। ও এখনও ছুটছে তো?

সামনেই লেকের পাড় দেখা যাচ্ছে—দৌড়ের ফিনিশ লাইন। জিশান পাগলের মতো ছুটতে লাগল। এবং কিনারার কাছাকাছি এসে সামনে প্রচণ্ড এক লাফ দিল।

লেকের ফিনিশ লাইনের পরই ঘাসে ঢাকা লন। ছুটন্ত প্রতিযোগীরা যখন রেস শেষ করছে তখন লাফিয়ে এসে পড়ছে এই লনে। জিশানের শরীরটা ঘাসের ওপর পড়ে দুবার ভল্ট খেয়ে গেল। তারপর একপাক গড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রইল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল জিশান। ওর বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিল। দর্শকদের উল্লাসের চিৎকার কানে আসছিল। আকাশে তিনটে পাখি উড়ে যেতে দেখল ও। তখনই যেন ওর মনে পড়ল, ও বেঁচে আছে। স্নেক লেক রাউন্ডে ও কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। আর একইসঙ্গে পিট ফাইটের মুখোমুখি চলে এসেছে।

হঠাৎই মনোহরের কথা খেয়াল হল ওর। ও চট করে উঠে বসল। চারপাশে তাকাতে লাগল। কোথায়? কোথায় মনোহর?

সব পার্টিসিপ্যান্টের পোশাক একইরকম হওয়ায় মনোহরকে খুঁজে নিতে জিশানের অসুবিধে হচ্ছিল। ও উঠে দাঁড়াল। বাজপাখির চোখে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল মনোহরকে।

হঠাৎই দেখতে পেল।

মনোহর সিং ঘাসের ওপরে শুয়ে ছটফট করছে। ওর কাছাকাছি কেউ নেই। ওর দিকে তেমন করে কারও নজর পড়েনি।

মনোহরের দিকে ছুটে গেল জিশান। 'মনোহর—' বলে চিৎকার করে উঠল।

ওর কাছে গিয়ে জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

'মনোহর! মনোহর!'

চোখ মেলে জিশানকে দেখতে পেল। যন্ত্রণা মেশানো গলায় বলল, 'জিশানভাইয়া...সালা হমে ডস দিয়া...।'

সাপে কেটেছে মনোহরকে।

ওকে পাশ ফেরাতেই জোড়া দাঁতের দাগ দেখতে পেল জিশান। বাঁ-পায়ের ডিমের ওপরে পাশাপাশি দুটো দাঁতের দাগ।

জিশান চিৎকার করে মেডিকেল ইউনিটের লোকজনকে ডাকতে লাগল। ওরা তখন সাপের কামড় খাওয়া অন্য প্রতিযোগীদের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

কাছাকাছি পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন গার্ডকে জিশান ডাক্তার ডাকার জন্য বারবার বলতে লাগল। একইসঙ্গে জাঙ্গিয়ার ভেতরে হাত ঢোকাল। ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডের দড়ি দুটো বের করে নিল। তারপর মনোহরকে চটপট ফাঁস বেঁধে দিল—একটা হাঁটুর নীচে, আর-একটা হাঁটুর ঠিক ওপরে।

মনোহর চিত হয়ে শুয়ে হাঁ করে মুখ দিয়ে 'আ—আ:—' শব্দ করতে লাগল।

এর মধ্যেই টিভি ক্যামেরা নিয়ে লোকজন চলে এসেছে মনোহরের কাছে। কী করে একটা মানুষ সাপের কামড়ে ধীরে-ধীরে মারা যাচ্ছে তারই 'সিধা প্রসারণ' নিউ সিটির বড়লোকদের দেখাতে লাগল। মিনিও নিশ্চয়ই এই লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে।

জিশানের মাথার ভেতরে সুপারনোভা ঘটে গেল। ও ভুলে গেল শ্রীধর পাট্টার কথা, রোলারবলের শাস্তির কথা, ভুলে গেল মিনি আর শানুর কাছে ওকে ফিরতে হবে।

ও উঠে দাঁড়াল। তিন-চার পা ফেলেই পৌঁছে গেল টিভি ক্যামেরায় চোখ সেঁটে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কাছে। ওর জামার কলার আর কোমরের বেল্ট দু-হাতে খামচে ধরে ওকে তুলে নিল শূন্যে। লোকটার শরীর জিশানের কাছে পালকের চেয়েও হালকা বলে মনে হচ্ছিল। ওর মনে পড়ে গেল ওল্ড সিটিতে কার্তিকের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা।

চারপাশের লোকজনদের কেউ-কেউ এই কাণ্ড দেখে হইহই করে উঠল।

একজন গার্ড ছুটে এল জিশানের কাছে। শকার উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ওকে নামাও! এক্ষুনি! নইলে...।' শকারটা জিশানের নাকের ডগার কাছে এনে কয়েকবার নাড়াল।

জিশান মনে-মনে হিসেব কষল।

ক্যামেরাম্যান লোকটাকে ও অনায়াসে ছুড়ে দিতে পারে গার্ডের দিকে। তা হলে শকারের সাধ্য নেই জিশানকে ছোঁয়। একইসঙ্গে জিশান জিমের 'লেগ পুশ' ব্যায়ামের মতো গার্ডটাকে পা দিয়ে এক প্রবল ধাক্কা মারতে পারে। তাতে গার্ডটা নির্ঘাত ছিটকে গিয়ে পড়বে স্নেক লেক-এ। তারপর জহরিলা সাপ তার মহান দায়িত্ব পালন করবে।

জিশান জানে, এই কাজগুলো ও সহজেই করতে পারে। তেত্রিশদিন হল ও জিপিসি-তে এসেছে। এখানকার ব্যায়ামের রুটিন ওর শরীরটাকে এর মধ্যেই কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত বানিয়ে দিয়েছে। নিজের

শরীরটার ওপরে ওর ভরসা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু মনোহরের কথা ভেবে কাজগুলো করল না জিশান। গার্ডের চোখে চোখ রেখে ক্যামেরাম্যানকে মাথার ওপর থেকে ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়ে দিল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ভয়-পাওয়া লোকটাকে বলল, 'যদি নিজে ছবি না হতে চাও তা হলে আমার বন্ধুর ছবি তুলবে না। তুললে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না...।'

লোকটার চোয়ালে আলতো করে দুবার চাপড় মারল জিশান: 'যাও, অন্য লোকদের ছবি-টবি তোলো...।'

লোকটা দু-চোখে ভয় নিয়ে ছিটকে চলে গেল ওর সঙ্গীসাথীর কাছে। যাওয়ার সময় পিছন ফিরে বারবার দেখতে লাগল জিশানের দিকে।

এবার গার্ডের দিকে তাকাল জিশান। ওর চোখে চোখ রেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারপর ঘুরে হাঁটা দিল মনোহরের দিকে। মেডিকরা তখন মনোহর সিং-কে ঘিরে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে—ওর শুশ্রূষা করছে।

জিশান মনে-মনে চাইল, মনোহর যেন ভালো হয়ে যায়। ওর মতো ভালোমানুষের ভালো হয়ে যাওয়া উচিত।

•

জিশান অ্যানালগ জিমে ব্যায়াম করছিল।

জিমের চারটে স্পেশাল কিউবিকলের নাম 'সোলো জিম'। পিট ফাইটের যারা পার্টিসিপ্যান্ট তাদের এখন সোলো জিম-এ ওয়ার্কআউট করতে হয়। সকালে একঘণ্টা, বিকেলে একঘণ্টা। এটাই নির্দেশ।

সোলো জিম-এর মাপ বারো ফুট বাই বারো ফুট। এয়ার কন্ডিশানড। বডি টেম্পারেচারের সঙ্গে-সঙ্গে রুম টেম্পারেচার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিজে থেকেই বদলায়। জিমের ভেতরের দেওয়ালগুলো সব আয়না। এমনকী সিলিং-ও।

একটা সোলো জিমে জিশান 'ইউনিভার্সাল ক্রাঞ্চ' মেশিন নিয়ে ব্যায়াম করছিল। শরীরের নানান অংশের মাসলকে হাইপার অ্যাক্টিভ করে তোলার জন্য এই মেশিনের জুড়ি নেই। তা ছাড়া জিশান বুঝতে পারছিল, পিট ফাইটের আগে পার্টিসিপ্যান্টদের ফিট করার জন্য মার্শাল শ্রীধর পাট্টার কেন এত মাথা ব্যথা। যাতে ওয়ান-টু-ওয়ান লড়াইগুলো জমে। রাফনেস আর টাফনেসের চূড়ান্ত স্কেলে পৌঁছে যায়। লড়াই দেখে যেন মনে না হয় দুটো মানুষ খালি হাতে লড়ছে। বরং যেন মনে হয়, দুটো নেকড়ে দাঁত-নখ দিয়ে মরণপণ লড়াই করছে, একটা আর-একটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খতম করতে চাইছে। তবেই না নিউ সিটির মানুষ লাইভ টেলিকাস্ট দেখে সত্যিকারের থ্রিল আর এক্সাইটমেন্ট এনজয় করবে! তবেই না মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো কোটি-কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেবে!

তাই প্রতিটি কণা মাসলের প্রতিটি কণা শক্তি এখন জিশানের দরকার। সেই সুপার লেভেল শক্তি নিয়ে পিট ফাইট। এবং সেটা ডিঙোতে পারলেই সুপার-ডুপার লেভেলের শক্তি চাই—সঙ্গে আর্মস—যার যেমন পছন্দ। তারপর কিল গেম। শেষ লড়াই। লড়াই শেষ। নাকি জীবনও?

জিশান ব্যায়াম করছিল, আর আয়নায় নিজেকে দেখছিল। ওর মধ্যে একটু জানোয়ার-জানোয়ার ভাব এসেছে না? বাইসেপ, ট্রাইসেপ, ল্যাট—সব মাসলগুলো কেমন যেন পাথরের মতো দেখাচ্ছে। দু-গাল বসে গিয়ে চোয়াড়ে লাগছে। উজ্জ্বল চোখ দুটোকে ধূর্ত আলোর বিন্দু মনে হচ্ছে।

এ কোন জিশান?

আয়নার জিশানকে চিনতে ওর কষ্ট হল। একইসঙ্গে কান্না পেল। এই চেহারায় কোন মুখে মিনির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ও? অথচ এখানকার ভয়ংকর গেমগুলোতে জিততে হলে এই চেহারাটাই জরুরি।

সোলো জিমে একঘণ্টা ব্যায়াম করার পর দরজা খুলে বেরোল জিশান।

বাইরে একজন জিম বয় স্টপওয়াচ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঘড়ি দেখে হিসেব কষল একঘণ্টা হয়েছে কি না। যদি পাঁচমিনিটের বেশি এদিক-ওদিক হয় তা হলে সে সঙ্গে-সঙ্গে অ্যানালগ জিমের চিফ ইনস্ট্রাকটরকে মোবাইলে ফোন করে জানাবে। তারপর ডিসিপ্লিন ভায়োলেট করার জন্য জিশানকে 'শিক্ষা' দেওয়া হবে। যেমন, ওকে মাঝরাতে ডেকে তুলে টানা তিনঘণ্টা ব্যায়াম করার হুকুম দেওয়া হতে পারে। অথবা অন্য কিছু।

জিশান শুনেছে, সুপারগেমস কর্পোরেশনে নতুন-নতুন শাস্তির টেকনিক আবিষ্কার করার জন্য নাকি চারজন এক্সিকিউটিভের একটা টিমকে প্রচুর মাইনে দিয়ে পোষা হয়।

অ্যানালগ জিমের দরজার দিকে হাঁটা দিল জিশান। একইসঙ্গে ও মনোহরের কথা ভাবছিল। তিনদিন হয়ে গেল, ও এখনও জিপিসি-র নার্সিংহোমে। অ্যান্টিভেনম দিয়ে ওর চিকিৎসা চলছে। তার সঙ্গে ফলমূল, হেলথ পাউডার আর হেলথ ড্রিংক। ডাক্তাররা বলছে চাঙ্গা হয়ে উঠতে মনোহরের এখনও চার-পাঁচদিন লেগে যাবে।

মনোহর সিং-এর কথা ভাবতে গিয়েই জিশান একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই লোকটাকে ও খেয়াল করেনি। খেয়াল যখন করল তখন দেখল লোকটার গায়ে লাল ইউনিফর্ম। অর্থাৎ, অ্যানালগ জিমের একজন ইনস্ট্রাকটর।

জিশানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে মাটিতে ছিটকে পড়েছে।

জিশান 'সরি' বলে ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলতে যাবে, হঠাৎই কে যেন পাশ থেকে ওর পাঁজরে সপাটে লাথি চালিয়ে দিল। একইসঙ্গে নোংরা ভাষায় খিস্তি করে উঠল।

লাথি চালানো পায়ে কালো চামড়ার জিম-বুট পরা ছিল। এবং বুটের তীক্ষ্ণ ডগাটা জিশানের পাঁজর যেন ফুটো করে দিল। একটা অসহ্য যন্ত্রণা ওর বুকের ভেতরে তৈরি হয়ে বেতার তরঙ্গের মতো শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় চিনচিন করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জিশানের হাত থেকে তোয়ালে ছিটকে পড়ল। ও পড়ে গেল জিমের প্যাড দেওয়া মেঝেতে। সেই অবস্থাতেই শরীরটা আধপাক ঘুরিয়ে চিত করে নিল। তারপর আক্রমণকারীকে দেখতে চেষ্টা করল।

জিমের সিলিং-এ শৌখিন সাদা আলো। তার ফ্রস্টেড কাচের ঢাকনায় অসংখ্য হিরের কুচি চিকচিক করছে। সেই আলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে আক্রমণকারীর অন্ধকার মুখটা ঠাহর করতে চাইল ও।

লোকটার টাক মাথা চকচক করছিল।

'কী রে শুয়োরের বাচ্চা! ট্রেনারের গায়ে হাত তুললি!' কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বুট পরা পায়ের সোল নেমে এল জিশানের মুখের ওপরে।

জিশান এক ঝটকায় মাথাটা ঘুরিয়ে নিতে চাইল। লাথিটা এসে লাগল ওর বাঁ-গাল আর কানের ওপরে। শরীরের বাঁ-দিকটা ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল।

লোকটা এবার নিচু হল। জিশানের বাঁ-রগের ওপর পরপর দুটো মারাত্মক ঘুষি মারল।

জিশানের মাথার ভেতরে যেন বোমা ফাটল। ওর চোখের সামনে অ্যানালগ জিম ঝাপসা হয়ে গেল। সিলিং-এর ঠান্ডা সাদা আলো ঘোলাটে হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পলকে একটা উজ্জ্বল আকাশ হয়ে গেল যেন।

তারপরই জিশানের আর কিছু মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগে ও আক্রমণকারীকে চিনতে পেরেছে। লোকটা যখন ঘুষি মারার জন্য ওর ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল তখনই পাশ থেকে ছিটকে আসা আলোয় একঝলক দেখতে পেয়েছিল জিশান। ওর চেতনা ঝাপসা হয়ে গেলেও রণজিৎ পাত্রকে চিনতে ও ভুল করেনি।

রণজিৎ যে বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজবে সে তো জানা কথা! কিন্তু যে-বুদ্ধিটা রণজিৎ ব্যবহার করেছে তার প্রশংসা করতে হয়। ও জিশানকে সবসময় চোখে-চোখে রাখছিল। এখন সামান্য সুযোগ পেতেই জিম ট্রেনারের পক্ষ নিয়ে জিশানের ওপরে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ব্যাপারটা কেউই ঠিকমতো খেয়াল করেনি। তাই রণজিৎ পাত্র যখন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সবাইকে বলছিল জিশান কীরকম বদবুদ্ধি ধরে এবং জিম ইনস্ট্রাকটরকে হেনস্থা করার জন্য ও বহুদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল, তখন সকলেই রণজিতের কথা বিশ্বাস করছিল।

'...জানেন, ও আমাকে কতবার ওর প্ল্যানের কথা বলেছে? কিন্তু আমি রাজি হইনি। ওকে বুঝিয়েছি। বলেছি, ভাই, আমরা এখানে কম্পিটিশান লড়তে এসেছি—তার বাইরে আর কোনও লড়াই নেই। কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! আপনারা তো নিজের চোখে...।'

রণজিৎকে ঘিরে চার-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে পিস ফোর্সের দুজন গার্ডও ছিল। কোমরে শকার। তাদের একজন মোবাইল ফোন বের করে ব্যস্তভাবে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, জিশানের বেয়াদপির ব্যাপারটা নিয়েই সে কোনও ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে।

ইনস্ট্রাকটরকে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে যে-দুজন তারা হাসান আর পাপুয়া। ওরা দুজন ইনস্ট্রাকটরের গা থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছিল। এবং অভিনয়টাকে জোরদার করার জন্য জিশানের হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইছিল।

জিশানের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বাঁ-দিকে রগের কাছের অসহ্য ব্যথা। অজান্তেই হাত চলে গেল সেখানে।

'উ:!'

জায়গাটা চটচট করছে। হাত চোখের সামনে এনে ধরল।

রক্ত।

রাগে ফুঁসে উঠল জিশান। ওই তো রণজিৎ! ভিড় করে দাঁড়ানো লোকগুলোকে কাঁড়ি-কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে এখনও।

জিশান উঠে বসার চেষ্টা করল। ও এবার চেঁচিয়ে সত্যি কথাটা সবাইকে বলবে। ফাঁস করে দেবে রণজিতের নোংরা চালাকি। তারপর সুযোগ পেলে লাথি এবং ঘুষি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দেবে। পারলে তার চেয়েও কিছু বেশি।

কিন্তু পারল না। মাথাটা টলে গেল। শরীরটা বাঁকিয়ে মাথাটা শূন্যে ফুটখানেক তুলেছিল—সেখান থেকেই ওর মাথা খসে পড়ল। মেঝেতে প্যাডের লাইনিং থাকায় তেমন শব্দ হল না।

জিশান শূন্য চোখে রণজিতের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি ঘটনাটা কেউ খেয়াল করেনি ভেবে ওর ভীষণ মনখারাপ লাগছিল।

একজন কিন্তু সত্যি ঘটনাটা খেয়াল করেছিল। তবে জিশান সেটা খেয়াল করেনি।

অ্যানালগ জিম মাপে বিশাল। জায়গাটা শুধু যে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো তা নয়। সাজানোর ঢংটাও রীতিমতো আধুনিক।

পুরো ঘরটায় চিলিং এসি। ঘরের বাতাসে রুম ফ্রেশনারের সুগন্ধ। দেওয়ালের বেশিরভাগটাই আয়নায় ঢাকা। সিলিং-এ মোলায়েম সাদা আলো। ব্যায়ামের ছন্দ ঠিকঠাক রাখার জন্য জিমের হল জুড়ে হালকা মিউজিক ভেসে বেড়াচ্ছে।

পার্টিসিপ্যান্টদের ড্রেস হলদে রঙের স্লিভলেস ভেস্ট আর কালো শর্টস। হাতে আঙুল কাটা কালো চামড়ার দস্তানা। প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে একটা করে সাদা তোয়ালে। সবাই আপনমনে ব্যায়াম করছে. কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। যেটুকু কথাবার্তা বলার ইনস্ট্রাকটররা বলছে।

অ্যানালগ জিমে ঢোকার সময় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করতে হয়। আর ঢোকার পর একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। ফর্মটার নাম ডেইলি ওয়ার্কআউট অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম। কী-কী ব্যায়াম করতে হবে, কতক্ষণ ধরে করতে হবে, ফর্মে তার খুঁটিনাটি হিসেব আর নির্দেশ দেওয়া আছে। ফর্ম ফিল আপের বেশিরভাগ কাজটাই অবশ্য বক্সে টিক মারা।

জিমের দরজার কাছাকাছি একটা বড় মাপের আধুনিক টেবিলে একটি ছিপছিপে মেয়ে বসে আছে। ওর সামনে রাখা একগোছা ফর্ম। তার পাশেই বসানো একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। তার নীচের তাকে একটা লেসার প্রিন্টার।

মেয়েটির গায়ে হালকা নীল টপ। আর গাঢ় নীল স্কার্ট। বুকে কোড নম্বর লেখা একটা স্টিকার। গলায় একটা সরু নীল ফিতে বয় স্কাউটের ঢঙে বাঁধা। চুল বয়কাট। যদিও মুখটা ভীষণ মেয়েলি। এবং মিষ্টি।

ওর ফরসা মুখে দুটো টানা-টানা চোখ কী সুন্দর মানিয়ে গেছে! চোখের তারা দুটো যেমন উজ্জ্বল, তেমনই চঞ্চল। প্রতিদিন অ্যানালগ জিমে ঢুকে ফর্ম ফিল আপ করার সময় জিশানের মনে হয়, এত সুন্দর প্রাণচঞ্চল মেয়েটি এই নিষ্ঠুর দেশে কী করছে?

জিশান খেয়াল করেছে, ফর্ম ফিল আপ করার সময় মেয়েটি সবার সঙ্গেই গায়ে পড়ে টুকটাক কথা বলে। অন্তত বলার চেষ্টা করে। যারা নেহাতই খিটখিটে গম্ভীর তারা মেয়েটির কথা গ্রাহ্য করে না। ফর্মের রুটিন সেরে তারা জিমের যন্ত্রের কাছে এগিয়ে যায়। কিন্তু তাতে মেয়েটি মোটেই উৎসাহ হারায় না। পরের প্রতিযোগী ঢুকলেই নতুন উদ্যমে ওর কথা শুরু হয়ে যায় আবার।

'আজ কেমন আছেন?'

'ভালো—।' ফর্মের নানান খোপে টিক মারতে-মারতে জিশান বলল।

'এক্সারসাইজের মুড আছে তো?'

'কেন থাকবে না?'

'না, অনেক সময় দেখি সামনে কোনও টাফ কমপিটিশান থাকলে পার্টিসিপ্যান্টদের মুড অফ হয়ে যায়। মেঘ করলে আকাশের যা অবস্থা হয়...।' কথা শেষ করে হাসল।

জিশান চমকে চোখ তুলে দেখল ওকে। মেয়েটা কবি-টবি নাকি?

ওল্ড সিটিতে কবিতা লেখা কবে উঠে গেছে। অন্তত পত্র-পত্রিকাগুলো উঠে গেছে। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষ এখনও পথে-ঘাটে কবিতা আবৃত্তি করে বেড়ায়, গান গেয়ে বেড়ায়। সবাই তাদের পাগল বলে। কিন্তু জিশানের মনে হয় ওই পাগলগুলো মরা শহরটাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে, ফুল-পাখি ফিরিয়ে আনতে চাইছে, ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলছে চাইছে।

চাইছে অনেকেই। জিশান আর মিনিও চাইছে। তাই ওরা কবিতা ভালোবাসে। ওরা চায় কোনও এক অলৌকিক ম্যাজিকে ওল্ড সিটিটা কবিতা হয়ে যাক। এই চাওয়ায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু পাওয়া বোধহয় এখনও অনেক দূরে।

নিউ সিটিতে কবিতা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ নয়। তবে শ্রীধর পাট্টা আর তাঁর তৈরি ভয়ংকর সব নিয়মকানুন দেখলে মনে হয় কবিতা বোধহয় নিষিদ্ধর চেয়েও কিছু বেশি।

জিশান নিচু গলায় বলল, 'মুড অফ হলে তো চলবে না। ট্রেনিং-এর নিয়মে নড়চড় হওয়ার জো নেই।'

'সেটা ঠিক। তবে...' মাথার চুলে হাত চালাল মেয়ে : 'তবে আমরাও তো মানুষ...।'

'দেখে তো মনে হয় না।'

'তার মানে!' রাগ ঢুকে পড়ল গলায় : 'আমি কি জিমের ওইসব যন্ত্র নাকি?'

'হতেই পারে—।' ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল জিশান। তারপর একটু হেসে সরে এসেছিল টেবিলের কাছ থেকে।

দূর থেকে ও লক্ষ করেছিল মেয়েটি তখনও অখুশি চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে আছে।

দু-দিন আগে জিমে ঢোকার সময় মেয়েটি জিশানকে বলেছিল, 'আপনার নাম তো জিশান...।'

'হ্যাঁ—কেন?'

'কনগ্র্যাচুলেশানস। আপনি কাল স্নেক লেক কমপিটিশানে জিতেছেন।'

জিতেছি এবং মৃত্যুর দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেছি হয়তো। মনে-মনে ভাবল জিশান। কিন্তু মুখে বলল, 'থ্যাংকস।'

জিশান ওর নাম জিগ্যেস করল না। শিবপদর কথা মনে পড়ে গেল। নাম জেনে কী লাভ! ঝামেলা বাড়বে।

'অল দ্য বেস্ট উইশেস ফর ইয়োর নেক্সট গেম—।'

'কেন? হঠাৎ আমাকে উইশ করছেন কেন?' ভুরু কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল জিশান।

চকচকে সাদা আলো ওর মিষ্টি মুখে একটা অদ্ভুত আভা তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে, এই মুখটা যিনিই তৈরি করে থাকুন তিনি প্রচুর সময় এবং ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করেছেন। এই শহরে এরকম প্রাকৃতিক অলীক সৌন্দর্য বেমানান। এখানকার যত সৌন্দর্য সব কৃত্রিম—মানুষের তৈরি। আর প্রতিটি সুন্দরের পিছনে বুদ্ধি, যুক্তি, পরিশ্রম, আর উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন, নেকরোসিটির নীল আলো জ্বলা মোমবাতির আড়ালে রয়েছে মানুষের মৃতদেহের ভাগাড়।

মেয়েটি হেসে বলল, 'আমি সবাইকেই উইশ করি। আমি চাই সবার ভালো হোক। সবাই জিতুক—।'

জিশানের মধ্যে তর্ক করার সাধ জেগে উঠল। বহুদিন ও কারও সঙ্গে প্রাণ ভরে তর্ক করেনি। তাই ও ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'এই ইমপসিবল উইশের কোনও মানে নেই। একটা গেম-এ সবাই কখনও জিততে পারে?'

'না, পারে না।' মাথা ঝাঁকাল মেয়ে : 'জানি—এটা অবাস্তব। কিন্তু তাই বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না? যদি এমন হত, কমপিটিটাররা সবাই মিলে সুপারগেমস কর্পোরেশনের এগেইনস্টে রুখে দাঁড়াত, ওদের ডেডলি গেমগুলো চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দিত, তা হলে কী ফ্যানট্যাসটিক হত! তখন কি বলা যেত না যে, গেমটায় সবাই ফার্স্ট হয়েছে! বলুন?'

জিশান কোনও কথা বলতে পারল না। হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। এ কী রূপকথা শোনাচ্ছে সোনার মেয়েটা?

গার্ডের কথা মনে পড়ে গেল। স্নেক লেক কমপিটিশানের আগে যে ওকে স্নেক রিপেলান্ট অয়েলের একটা পাউচ দিয়েছিল। বলেছিল, '...আমরা সব ভেড়া হয়ে গেছি। আমরা সব হেরে যাওয়া পাবলিক, জিশান...। তুমি জিতলে আমার মনে হবে আমিই জিতেছি...। মনে রেখো, আমাকে জেতানো চাই...।'

জিশানকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা বলল, 'আমি ভীষণ স্বপ্ন দেখি, জিশান। এখানকার কেউই—এমনকী নিউ সিটির মার্শালও আমার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারবে না। রিয়েল লাইফে যদি নাও পারি রূপকথায় অন্তত মানুষের মতো বাঁচব। তাই আমি সবাই জিতেছে এমন স্বপ্ন দেখি। আপনিও স্বপ্ন দেখুন, জিশান। স্বপ্ন দেখার অসুখটা খারাপ না। আমি বলছি, রূপকথার মধ্যেই মানুষের আসল জীবন লুকিয়ে আছে। আমরা দেখতে চাই না, তাই দেখতে পাই না...।'

সেদিন থেকে জিশান মনে-মনে ওর নাম দিয়েছিল রূপকথা। কসাইয়ের দেশে ও রূপকথা বিক্রি করতে চাইছে। ওর সাহস তো কম নয়!

জিশানের সঙ্গে ইনস্ট্রাকটরের সংঘর্ষের ঘটনাটা রূপকথা দেখতে পেয়েছিল।

কারণ, ওর হাতে তখন কোনও কাজ ছিল না। তাই টেবিলে বসে ও এমনিই জিমের পার্টিসিপ্যান্টদের দিকে তাকিয়েছিল। ও জানে, এরা ক্রমশ সংখ্যায় কমছে। আরও কমবে।

সোলো জিম থেকে জিশানকে ও বেরোতে দেখেছিল। সংঘর্ষটাও ভালো করে খেয়াল করেছিল। তাই জটলা এবং হইচই দেখে ও জিশানের কাছে ছুটে এল। ততক্ষণে চিফ ইনস্ট্রাকটরও সেখানে চলে এসেছে।

রূপকথা উত্তেজিতভাবে তাকে বলল, 'স্যার, আমি সব দেখেছি। ব্যাপারটা পিয়োরলি অ্যাকসিডেন্ট। যেভাবে ওরা বলছে...' রণজিৎ পাত্রের দিকে আঙুল দেখাল : 'সেটা ঠিক নয়। আমি...।'

চিফ ইনস্ট্রাকটর হাতের ইশারায় রূপকথাকে চুপ করতে বলল। তারপর রণজিৎ ও তার দুই সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনারা প্লিজ নিজেদের কাজে চলে যান। আমরা এখানে কোনওরকম হইহল্লা বা জটলা চাইছি না।'

জিপিসি-র ডিসিপ্লিন এমনই যে, অনুরোধ মানে আদেশের চেয়েও কিছু বেশি। রণজিৎ সেটা জানে। হাসান আর পাপুয়াও। তাই চোখের পলকে ওরা তিনজন সরে গেল। বাড়তি যে দু-তিনজন উৎসাহী পার্টিসিপ্যান্ট ছিল তারাও চিফ ইনস্ট্রাকটরের কথা শেষ হওয়ামাত্রই পা চালাল।

যার সঙ্গে জিশানের ধাক্কা লেগেছিল সেই ইনস্ট্রাকটর আর পিস ফোর্সের দুজন গার্ড অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। চিফ ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রূপকথা জিশানের তোয়ালেটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ওর দিকে হাত বাড়াল। জিশান হাতটা ধরল। শরীরটা বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতে কপালের পাশ থেকে রক্ত মুছে নিল।

রক্তে লাল হয়ে যাওয়া হাতের আঙুলগুলো দেখল জিশান। আজ থেকে দেড়-দু-মাস আগে এভাবে রক্ত দেখলে ওর মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া হত আজ তেমন হল না। জিশান একটু অবাক হলেও বুঝল, এটাই হওয়ার ছিল। জিপিসি-তে যারা গেম খেলতে আসে তাদের সবারই এরকম হয়। ধীরে-ধীরে রক্ত-টক্ত সব গা-সওয়া হয়ে যায়।

রূপকথা চিফ ইনস্ট্রাকটরকে আকুল গলায় বলল, 'স্যার, হি ইজ ব্লিডিং। দ্যাট গডড্যামড গাই হিট হিম সো হার্ড...।'

চিফ ইনস্ট্রাকটর হাতের ইশারায় ওকে আশ্বস্ত করে জিশানের স্মার্ট কার্ড দেখতে চাইল। চার-পাঁচ-সেকেন্ড সেটায় চোখ বুলিয়ে কার্ডটা জিশানকে ফেরত দিল। জিমের চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে কোমর থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাউকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করল।

পরপর কয়েকবার চেষ্টা করে লাইন 'বিজি' পাওয়ায় বিরক্ত হল। তখন চিফ একজন গার্ডকে বলল, 'একে মেডিক রুমে নিয়ে যাও। চিফ মেডিকের ফোন বিজি। যখনই ফোন করি ফোন বিজি। কার সঙ্গে এত বকবক করে কে জানে!'

'আমি সঙ্গে যাব, স্যার?' রূপকথার চোখে অনুনয়। ও তখন জিশানের ডানহাতের ওপরদিকটা আঁকড়ে ধরে আছে। ওর বোধহয় মনে হয়েছে, জিশান হঠাৎ টলে পড়ে যেতে পারে।

চিফ ইনস্ট্রাকটর বেশ কয়েকসেকেন্ড মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাতের ইশারায় দুজন গার্ডকে চলে যেতে বলল।

ওরা রোবটের মতো নির্দেশ পালন করল।

চিফ এবার জিশানের দিকে তাকাল। ওর নজর দেখে বোঝা যাচ্ছিল জিশানের শরীরের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে।

জরিপের কাজ শেষ হতেই চিফের নজর গেল সামান্য দূরে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইনস্ট্রাকটরের দিকে।

লোকটা মাথা নিচু করল। যেন জিশানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাওয়াটা ওর পক্ষে মর্মান্তিক অপরাধ হয়ে গেছে।

'এবার দয়া করে ডিউটিতে যাও—।' ঠান্ডা গলায় চিফ বলল।

লোকটা খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া ইঁদুরের মতো পালাল।

চিফ তাকাল রূপকথার দিকে। রূপকথা আবার বলল, 'আমাকে এই পেশেন্টের সঙ্গে থাকার পারমিশান দিন, স্যার। প্লিজ...। আমার রিকোয়েস্টটা রাখুন। প্লিজ...।'

'পেশেন্ট?' ছোট্ট করে উচ্চারণ করল চিফ, 'রিকোয়েস্ট? তোমার কত রিকোয়েস্ট রাখব বলো তো, রিমিয়া? তুমি আমার রিকোয়েস্ট রাখো?'

রূপকথা—রিমিয়া—চুপ করে রইল। চিফের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিশান চিফকে ভালো করে দেখছিল। এমনিতে লোকটার মুখে শয়তানির ছাপ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল ছাপ পড়েছে। হাসলও লোকটা। হাসিতে আশা-প্রত্যাশা।

রূপকথা ঠোঁট কামড়াল : 'কী রিকোয়েস্ট, বলুন?'

চিফ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিশানকে দেখল। মুখে গম্ভীর ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বলল, 'পেশেন্টকে নিয়ে এখন যাও—তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব...।'

রূপকথা আর দেরি করল না। জিশানের হাত থেকে গ্লাভস খুলে নিল। তারপর গ্লাভস আর তোয়ালেটা গারমেন্টস বিন-এ ফেলে দিয়ে জিশানকে নিয়ে রওনা হল।

চিফ ওদের চলে যাওয়া দেখছিল। দেখতে-দেখতে মোবাইল ফোন কানে দিল। কারও সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

অ্যানালগ জিমের বাইরে এসে ডানদিকের করিডরে ঘুরল মেয়ে। সামনেই একটা ঘর। ঘরের দরজায় সুন্দর করে লেখা : PHYSICAL REDRESSAL□ দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে একজন গার্ড। অল্পবয়েসি ছেলে। রোগা চেহারায় বেমানান মোটা গোঁফ। দুটো তরুণ চোখে চনমনে কৌতূহল।

রূপকথা জিশানকে নিয়ে গার্ডের কাছে গেল। আলতো গলায় বলল, 'পেশেন্ট।' একইসঙ্গে ইশারা করল জিশানের রক্তাক্ত বাঁ-গালের দিকে।

গার্ড পকেট থেকে একটা রিমোট বের করল। দরজার দিকে তাক করে রিমোটের বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল।

রূপকথা জিশানকে জিগ্যেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

জিশান হাসতে চেষ্টা করল : 'ততটা নয়।'

একটু চুপ করে থেকে তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনার নাম রিমিয়া?'

ঘুরে তাকাল : 'হ্যাঁ।'

'অদ্ভুত নাম। অবশ্য আমি অন্য একটা নাম রেখেছি।'

'কী নাম?'

ততক্ষণে দুজন মেডিক এবং দুজন নার্স ওদের কাছে চলে এসেছে। জিশানকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর বিছানায় বসিয়ে দিয়েছে।

জিশান চারপাশটা জরিপ করে দেখছিল। জায়গাটা আসলে নার্সিংহোম হলেও দেখতে একেবারে আলট্রা-টিপটপ, অন্যরকম।

বিশাল মাপের চৌকোনা ঘর। দেওয়ালের রং হালকা নীল। বিছানাগুলো মেঝেতে লুডোর ছকের ঢঙে ছোট-ছোট বর্গাকারে সাজানো। চারটে বিছানা একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে। এরকম পাশাপাশি দুটো বর্গক্ষেত্রের মাঝে গাঢ় নীল রঙের অ্যাক্রিলিকের পার্টিশান।

বিছানার চাদর কিংবা পিলো কভারের রং দেওয়ালের মতোই হালকা নীল। তবে বেডকভারগুলো সব গাঢ় নীল রঙের।

চার দেওয়ালে প্লেট টিভি আর পেইন্টিং সুন্দর করে সাজানো। একটা টিভি, তারপরই একটা পেইন্টিং—তারপর আবার টিভি। এইরকমভাবে সারিটা চলে গেছে এক দেওয়াল থেকে আর-এক দেওয়ালে।

জিশান লক্ষ করল, পেইন্টিংগুলোর একটাতেও প্রকৃতির ছবি নেই। সবই বিমূর্ত। ছন্নছাড়া রঙের খেলা।

বেশিক্ষণ সময় লাগল না। প্রাথমিক চিকিৎসার ঢঙে জিশানের যত্ন নিল মেডিকরা। ওকে বিছানায় বসিয়ে ওরা ঘিরে ধরেছিল। কাটা জায়গায় ওষুধপত্র লাগিয়ে দেওয়ার পর একজন নার্স একটা স্প্রে-গান তাক করল জিশানের দিকে। বোতাম টিপতেই সাদা ধোঁয়ার মতো স্প্রে ছিটকে বেরোল। বাঁ-রগের কাছে কাটা জায়গাটা পলকে একটা চকচকে সাদা পরদায় ঢেকে গেল।

নার্স মেয়েটি স্প্রে-গানের সুইচ অফ করে বলল, 'ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট লেয়ার পেস্ট করে দিলাম। স্নান করার সময় জল-টল লাগলেও কোনও প্রবলেম নেই। পারফেক্টলি সেফ। ও.কে.?'

'ও.কে.। থ্যাংকস।' ঘাড় নাড়ল জিশান। ওর মনে হল, দপদপানি ব্যথাটা এখনই যেন অনেকটা কমে গেছে।

রূপকথা এতক্ষণ চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নার্স আর মেডিকদের শরীরের ফাঁকফোকর দিয়ে জিশানকে দেখতে চেষ্টা করছিল।

জিশান বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। ডাক্তার-নার্সদের আর-একবার ধন্যবাদ জানিয়ে রূপকথার কাছে এগিয়ে এল।

এবার ওদের ফিজিক্যাল রিড্রেসাল রুম থেকে বেরিয়ে অ্যানালগ জিমে ঢুকতে হবে। আজকের মতো জিশান হয়তো ব্যায়াম থেকে ছুটি পাবে—তারপর কাল থেকে আবার একই রুটিন। টার্গেট : পিট ফাইট।

কিন্তু ওর রূপকথার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।

রূপকথা ওর কাটা জায়গাটার দিকে তাকাল। এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চকচকে সাদা প্লাস্টিকের মতন কিছু দিয়ে ঢাকা।

ও জিগ্যেস করল, 'আর কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'না—।' মাথা নাড়ল জিশান।

ওরা দরজার দিকে এগোল।

'আমার কী নাম রেখেছেন বললেন না তো?' রূপকথা জিগ্যেস করল।

এতক্ষণ ধরে জিশানের কথাটা ও মনে রেখেছে!

জিশান লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, থাক। শুনলে আপনার হাসি পাবে।'

'হাসতে আমার ভালো লাগে—।'

জিশান চুপ করে রইল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। রূপকথাকে একপলক দেখে নিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে বলল, 'এখানে চাকরি করতে আপনার ভালো লাগে?'

রূপকথা ঘুরে তাকাল। বুঝল জিশান এখন নামটা বলতে চাইছে না। একটু চুপ করে থেকে ভাবল উত্তর দেবে কি দেবে না। তারপর বলল, 'না—একেবারেই না।'

'তা হলে করছেন কেন? টাকার জন্যে?'

হাসল রূপকথা : 'হ্যাঁ—সবাইকে তাই বলি।'

'আসল কারণটা তা হলে কী?'

আবার তাকাল জিশানের দিকে। চোখের ওপরে কুয়াশা নেমেছে মনে হল যেন। কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই কুয়াশা সরিয়ে রোদের ঝিলিক দেখাল মেয়ে। হাসল।

'আসল কারণটা সিক্রেট।'

জিশান চুপ করে গেল।

ওরা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাদামি গ্রানাইটের ওপরে পা ফেলে এগিয়ে চলল অ্যানালগ জিমের দরজার দিকে।

দরজার কাছাকাছি এসে জিশান বলল, 'আমাকে নিশ্চয়ই এখন আর জিম করতে হবে না...।'

'না। এখন রেস্ট। আপনার ডেইলি অ্যাসেসমেন্ট ফর্মটায় আমি নোট দিয়ে দিচ্ছি।'

তারপরই কি অ্যানালগ জিম থেকে বিদায়? জিপিসি-র গেস্টহাউসে চলে যেতে হবে? ভাবল জিশান। রূপকথার সিক্রেট কারণটা ওর জানতে ইচ্ছে করছিল। তার সঙ্গে 'রূপকথা' নামটাও বলতে ইচ্ছে করছিল।

অ্যানালগ জিমে ঢুকল ওরা। রূপকথা জিশানকে নিয়ে গেল ওর টেবিলের কাছে। বিমূর্ত জ্যামিতি দিয়ে তৈরি একটা সুন্দর চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন। ফর্মটায় নোট দিয়ে দিই...।'

জিশান চারপাশে তাকাল একবার। সবাই ব্যায়াম নিয়ে ব্যস্ত। ডিসিপ্লিন। এখানে ডিসিপ্লিনই প্রথম এবং শেষ কথা। ও চুপচাপ বসে রইল।

রূপকথা কাজ করছিল, জিশান ওকে মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল। এই নিউ সিটিতেও স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা যায়। শুধু স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকার গোপন কৌশলটা জানতে হয়।

জিশান এক অদ্ভুত দোটানায় পড়ে গেল। একদিকে নিষ্ঠুর বাস্তব—হাই রিসক রিয়্যালিটি গেমস। আর-একদিকে স্বপ্ন আর প্রকৃতি। ওর মনে হল, আকাশের সুন্দর চাঁদ, তারা, সূর্য যেমন সত্যি, ওই লাল-নীল আলো ছড়ানো অশুভ ধূমকেতুগুলোও সত্যি।

এই জিপিসি-তে আসার পর থেকে জিশান রোজ বদলাচ্ছে। মানুষ থেকে গুটিগুটি করে হেঁটে চলেছে অমানুষের দিকে। এটা ওর পছন্দ নয়। কিন্তু যদি ও না বদলায় তা হলে কিল গেম জেতার জন্য তৈরি হবে কী করে? বাঁচবে কী করে? আগে তো ও বাঁচুক—তারপর বাঁচার মতো বাঁচতে চেষ্টা করবে।

মিনির কথা মনে পড়ল জিশানের। ওর মধ্যেও সেই একই টানাপোড়েন। যেরকম স্বামীকে ও চায় না, কখনও চায়নি, স্বামী যদি সেরকম না হয় তা হলে স্বামীকে ও আর কখনও ফেরত পাবে না। মানুষটাকে ফেরত পাওয়ার জন্যই মানুষটাকে অমানুষ হতে হবে।

'কী ভাবছেন?'

জিশানকে আনমনা দেখে রূপকথা জিগ্যেস করল।

জিশান তাকাল ওর দিকে। ছোট্ট করে হেসে বলল, 'সিক্রেট।'

'প্রতিশোধ নিলেন?'

'না—তা না। বলব—যদি আপনারটা বলেন।'

'আর আপনার রাখা নামটা?'

'সেটাও বলব।'

'গিভ অ্যান্ড টেক?'

'জানেন, রিমিয়া, আমাদের ওল্ড সিটিটা একসময়ে গিভ অ্যান্ড গিভ ছিল। ওখানকার সিনিয়ার সিটিজেনদের কাছে শুনেছি। এখন ব্যাপারটা ঘেঁটে গেছে। আর আপনাদের এই নিউ সিটি? মোস্টলি টেক অ্যান্ড টেক। গিভ বলতে এরা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'কেন, আমার সিক্রেটটা বললে আপনি বুঝি আমাকে টাকা দেবেন?'

'না, আপনার কথা বলছি না। আপনি আলাদা।'

জিশান রূপকথাকে দেখল। রূপকথাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কয়েকসেকেন্ড পর হেসে ফেলল দুজনেই।

জিশান বলল, 'আপনার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো হত। এখানে কোথাও চা-কফি পাওয়া যায়? আপনাদের ক্যান্টিন নেই?'

'আছে। ক্যান্টিন নয়—ফুড প্লাজা। এমপ্লয়িদের জন্যে। কোনও গেস্ট সঙ্গে থাকলে স্পেশাল পারমিশান করাতে হয়—সেকশনাল চিফের কাছ থেকে। চলুন, যাবেন?' রূপকথার চোখে খুশি।

জিশানও চাইল, আজ কিছুটা সময় অন্তত অন্যরকমভাবে কাটুক।

রূপকথা টান-টান হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় কোনও লড়াইয়ের জন্য মনে-মনে নিজেকে তৈরি করল। মোবাইল ফোন বের করে পটাপট বোতাম টিপল, ফোন কানে চেপে ধরল।

'স্যার, রিমিয়া হিয়ার।'

... ...

'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আপনি জিমের কোথায় আছেন?'

... ...

'আমি এখুনি যাচ্ছি—।'

কানেকশান কেটে দিয়ে জিশানকে তাড়া দিল রিমিয়া : 'শিগগির চলুন। চিফ ইনস্ট্রাকটর একেবারে লাস্টের সোলো জিমের কাছে আছে। আপনি সঙ্গে না গেলে হবে না। আপনার স্মার্ট কার্ডের নাম্বারটা চিফের লাগবে...।'

তাড়াতাড়ি পা ফেলে ওরা দুজন পৌঁছে গেল চিফের কাছে।

চিফ ইনস্ট্রাকটর একটা ছোট্ট কিউবিকল-এ বসেছিল। একটা হেক্সাগনাল শেপের ট্রান্সপ্যারেন্ট সিপিং ওয়াটার বটল থেকে সিপ করে জল খাচ্ছিল। রূপকথাকে দেখে বাঁকানো সিপারটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল। সিপিং ওয়াটার বটলটা সামনের টেবিলে রাখল। কপালে ভাঁজ ফেলে ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারায় বলতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

'একটা রিকোয়েস্ট আছে।'

'আবার রিকোয়েস্ট?' ভুরু আরও কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ—এই রিকোয়েস্টটা রাখুন। আমিও আপনার রিকোয়েস্টের ব্যাপারে সিরিয়াসলি ভাবব।' রূপকথার কথাগুলো কেমন কাঠ-কাঠ শোনাল। কিন্তু ও ঠোঁটে হাসছিল।

এটাই তা হলে লড়াই? এর জন্যই ও একটু আগে মনে-মনে নিজেকে তৈরি করছিল! ভাবল জিশান।

চিফের ঠোঁটে হাসি তৈরি হল। গালের পেশি নড়াচড়া করল। জিশানের দিকে একবার দেখল। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে রূপকথার গালে আঙুল ছোঁয়াল। আলতো করে বলল, 'আই ফিল ফর য়ু, রিমিয়া। সেই ফিলিংটা তোমার কাছে এক্সপ্রেস করতে চাই। আই হোপ য়ু নো দ্যাট—ডোন্ট য়ু?'

রিমিয়া রোবটের মতো হাসল। ওর ঠোঁটের চামড়া যেন মোটা প্লাস্টিকের তৈরি। চোখের তারায় কোনও আলো নেই।

'জানি, স্যার। আই ডু রেসপেক্ট ইয়োর ফিলিং...।'

'থ্যাংকস।' চিফ বড় করে হাসল : 'এবার বলো, তোমার কী রিকোয়েস্ট আমি রাখতে পারি।'

রূপকথা তখন বলল যে, জিশানকে নিয়ে ও ফুড প্লাজায় বসে একটু কফি খেতে চায়। বড়জোর আধঘণ্টা। কারণ কথায়-কথায় ও জানতে পেরেছে যে, জিশান ওর হাজব্যান্ডের বন্ধু।

হাজব্যান্ড? জিশান অবাক হল। ওর হাজব্যান্ডের বন্ধু জিশান!

রূপকথা জিশানের দিকে একবারও তাকায়নি। ও তখন ওর রিকোয়েস্টের সঙ্গে মিষ্টি হাসি মাখিয়ে দিতে ব্যস্ত।

কাজ হল খুব তাড়াতাড়ি। চিফ জিশানের স্মার্ট কার্ডটা চেয়ে নিল। পার্টিসিপ্যান্ট আই-ডি নম্বরটার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে ওটা বোধহয় কয়েকবার আওড়ে নিল। তারপর মোবাইলের বোতাম টিপে কাকে যেন ফোন করল। লাইন পেয়ে গেল কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই। কথা বলতে লাগল : '...হ্যাঁ, অ্যানালগ জিমের রিমিয়া। এমপ্লয়ি কোড সি-ওয়ান ওয়ান টু সেভেন ফাইভ। ও ফুড প্লাজায় যাচ্ছে। সঙ্গে একজন গেস্ট। পার্টিসিপ্যান্ট। আই-ডি নাম্বার পি-টু সেভেন ওয়ান থ্রি ফোর ফোর ফোর—হ্যাঁ, ট্রিপল ফোর। একটু আগে মেডিকেল ট্রিটমেন্টহয়েছে। ওরা ফুড প্লাজায় থাকবে আধঘণ্টা—একজ্যাক্টলি হাফ অ্যান আওয়ার—থারটি মিনিটস। নট মোর দ্যান দ্যাট। প্লিজ অ্যালাও। ও.কে.?'

ওপাশ থেকে কিছু একটা শুনল চিফ। তারপর ফোন কেটে দিয়ে রিমিয়ার চোখে তাকিয়ে চওড়া হাসল। রিমিয়ার গাল টিপে দিল ছোট্ট করে : 'কী, স্যাটিসফায়েড?'

'থ্যাংক য়ু, স্যার।'

'ও.কে.। বাট রিমেমবার—থারটি মিনিটস। অলসো রিমেমবার মাই রিকোয়েস্ট।'

'অফ কোর্স, স্যার।' হাসল রিমিয়া। তারপর জিশানকে ডেকে নিয়ে রওনা হল।

রূপকথা খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছিল। জিশানও ওর পিছন-পিছন তাল মিলিয়ে হাঁটা দিল। ওর মাথার মধ্যে তখনও 'হাজব্যান্ড' শব্দটা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

অ্যানালগ জিমের চেঞ্জ রুমে গিয়ে জিশান জিম ভেস্ট ছেড়ে একটা টি-শার্ট পরে নিল। বাইরে আসতেই বোঝা গেল সূর্য আকাশে ঠিকঠাক আলো দিচ্ছে। কারণ জিমের ভেতরে, এমনকী ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিটেও, দিনের আলোর কোনও জায়গা নেই। তার বদলে হাইটেক ইলিউমিনেশান টেকনিক নকল আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছে।

গায়ে রোদ লাগতেই জিশানের ভালো লাগল। গরমে বিরক্ত হওয়ার কথা ও ভুলে গেল।

ওরা মসৃণ রাস্তা ধরে হাঁটছিল। এ-রাস্তা শুধু হাঁটার জন্য। কারণ, রাস্তার দুপাশে ইংরিজিতে লেখা সাইনবোর্ড : WALKERS ONLY তার নীচে একটা গাড়ির ছবি। তার ওপরে লাল রঙের ‘X’ চিহ্ন আঁকা।

রাস্তার দুপাশে সবুজ লন। লনে মিহি পালকের মতো ঘাস। দেখে মনে হয় সবুজ ভেলভেট। বা অনেকগুলো বাচ্চা টিয়াপাখি চুপ করে শুয়ে আছে।

কিন্তু এর নীচেই হয়তো লুকোনো রয়েছে রুক্ষ পাথর। জিশান ভাবল। এখানে বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের চেহারার এত গরমিল!

জিশান রিমিয়ার পাশে-পাশে হাঁটছিল। চাপা গলায় বলল, 'চিফ ইনস্ট্রাকটর লোকটা সুবিধের নয়।'

'হুঁ।' ছোট্ট করে জবাব দিল রূপকথা।

'আপনি ম্যারেড?' কৌতূহল চাপতে না পেরে জিগ্যেস করল।

'হুঁ—।'

'চিফ কীসব ফিলিং-টিলিং-এর কথা বলছিলেন...।'

রূপকথা ইশারায় জিশানকে চুপ করতে বলল। আঙুল তুলে দেখাল সামনেই ফুড প্লাজা। বিল্ডিং-এর গায়ে সিন্ডিকেটের লোগো। সুদৃশ্য গেটের সামনে পিস ফোর্সের দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে।

রূপকথা এগিয়ে গিয়ে একজন গার্ডের সঙ্গে কথা বলল। তারপর জিশানকে ইশারায় কাছে ডেকে দরজার স্লটে নিজের স্মার্ট কার্ডটা সোয়াইপ করল।

ওরা ভেতরে ঢুকল।

ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল জিশান। ভেতরের চেহারাটা যেমন বিচিত্র তেমনই সুন্দর। প্লাজার মেঝেটা ডানদিক থেকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে।

জিশান গুনল। পাঁচটা পাক—পাঁচটা লেয়ার। লেয়ারের নতি কোণ এতই কম যে, সিঁড়ির ধাপের কোনও দরকার হয়নি।

প্লাজার দু-দিকের দেওয়াল স্বচ্ছ প্লাস্টিক কিংবা কাচ দিয়ে তৈরি। সেটার রং সামান্য নীল হওয়ায় রোদের তেজ কমানোর কাজ যেমন হয়েছে, তেমনই ভেতরে একটা নীল মায়া ছড়িয়ে দেওয়া গেছে। তার সঙ্গে রং মিলিয়ে ভেতরের অন্যান্য আলোও নীল।

প্লাজার মাপের তুলনায় লোকজন অনেক কম। তাদের কথাবার্তা এমনই নিচু গলায় চলছে যে, সবমিলিয়ে কোনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না। শুধু সাউন্ড সিস্টেমে চাপা মিউজিক বেজে চলেছে। চারদিকে একটা শান্ত আনন্দের ভাব।

রূপকথা জিশানের হাত ধরল। নিচু গলায় বলল, 'এখানে নানান জায়গায় স্পাই-ক্যামেরা লাগানো আছে। তা ছাড়া প্লেইন ড্রেসে গার্ডরাও ঘোরাফেরা করে। নজর রাখে যে, সিন্ডিকেটের এগেইনস্টে কোনও ছক কষা হচ্ছে কি না। সো বি কেয়ারফুল। আসুন—।'

সেকেন্ড লেয়ারের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। চিলিং এসিতে জিশানের একটু শীত-শীত করছিল।

জিশান অবাক হয়ে দেখল, ওদের টেবিলে একটা চৌকোনা অংশে স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে। সেখানে অনেকগুলো ব্যাক লাইটেড ছোট-ছোট খোপ—সেই খোপে আই-ফোনের রঙিন আইকনের মতো এক-একটা খাবারের ছবি। ছবির নীচে খাবারের নাম লেখা।

ধোঁয়া ওঠা কফির কাপের ছবিতে আঙুল ছোঁয়াল রূপকথা—দুবার। বলল, 'অবাক হবেন না। এটাই অর্ডার দেওয়ার সিস্টেম। হাইটেক সব ব্যাপার। এই প্লাজায় যখন যে-যে আইটেম অ্যাভেইলেবল তখন সেইসব খাবারের নাম আর ছবি এই টাচস্ক্রিন অ্যাকটিভেটেড আইকন মেট্রিক্স-এ ফুটে ওঠে। আইকনগুলো টাইম টু টাইম আপডেটেড হয়।'

'এবার স্টার্ট করুন।' বলল জিশান, 'গিভ অ্যান্ড টেক।'

'না, প্রথমে আপনি। বিকজ য়ু স্টার্টেড দ্য হোল গেম। বলুন, কী নাম রেখেছেন আমার—।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়াল জিশান। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলছি। তবে আগেই বলে রাখছি, ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নেবেন। ও.কে.?'

'ও.কে.।' হাসল।

'নাম রেখেছি রূপকথা। নামটা খারাপ?'

রিমিয়া অদ্ভুত চোখে জিশানের দিকে তাকাল। একটু পরে বিষণ্ণ গলায় বলল, 'খুব ভালো নাম। আমি সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, রূপকথার মধ্যেই মানুষের আসল জীবন লুকিয়ে আছে। আমরা দেখতে চাই না, তাই দেখতে পাই না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'সেইজন্যেই এই নাম দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

টিপটপ ড্রেস পরা একজন বেয়ারা কফি নিয়ে এল। ট্রে থেকে কফির কাপ নামিয়ে দিল টেবিলে।

ফ্রস্টেড ক্রিস্টালের তৈরি কাপ-প্লেট। তার মধ্যে নীল আর গোলাপি রঙের ছটা।

বেয়ারা চলে যেতেই রূপকথা বলল, 'অর্কপ্রভও বলত, আমি খুব আজব পাবলিক। সবসময় গল্পের বইয়ের সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রূপকথার দেশে বাস করি। কোনও বাস্তব বুদ্ধি নেই..। কিন্তু একইরকম দেশে অর্কপ্রভও বাস করত। আমাদের জুটিটা ভারি অদ্ভুত ছিল।

'কে অর্কপ্রভ?' কফিতে চুমুক দিয়ে জিশান জিগ্যেস করল। ওর অর্কনিশানের কথা মনে পড়ল—ছেলে শানুর কথা।

'আমার হাজব্যান্ড—ডেড হাজব্যান্ড।' মাথা নিচু করল রিমিয়া। ওর কফির কাপটাকে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে লাগল। জিশান ওর চোখ দেখতে পাচ্ছিল না।

হঠাৎই কফির কাপের ওপারে জলের ফোঁটা পড়ল।

'সরি, রিমিয়া। আমি আপনাকে হার্ট করতে চাইনি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি।'

মুখ তুলল। হাসছে। কিন্তু চোখের কোণে জলের কণা।

'আপনার হাজব্যান্ড কবে মারা গেছেন?'

'বেশিদিন নয়।' রুমাল বের করে চোখের কোণে চেপে ধরল : 'অ্যাবাউট ফোর মান্থস...।' স্কার্টের পকেটে রুমাল রেখে দিল।

'কী হয়েছিল?'



জোর করে হাসল রূপকথা। মাথা ঝাঁকিয়ে কফির কাপে চুমুক দিল। জিশানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, 'বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও এখানকার কমপিটিশানে নাম দিয়েছিল। হাংরি ডলফিন। গেমটার নাম শুনেছেন তো?'

জিশান মাথা নাড়ল : হ্যাঁ, শুনেছে। শুধু শুনেছে নয়, গেমটার ভিডিয়ো রেকর্ডিংও টিভিতে দেখেছে।

'...তো সেই গেমটায় হাঙরের পেটে চলে গেল। হাঙরটাকে ডলফিন ভেবে ভুল করল। ব্যস, এন্ড অফ দ্য গেম...।'

কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই চুপ করে রইল। শুধু কফির কাপে চুমুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সাউন্ড সিস্টেমের মিউজিকটাকে দু:খের সুর বলে মনে হচ্ছিল।

ধীরে-ধীরে পুরো গল্পটা শুনল জিশান।

অর্কপ্রভ ওল্ড সিটি থেকে এসেছিল। রিমিয়া তখনও এই অ্যানালগ জিমেই চাকরি করত। সেখানেই অর্কর সঙ্গে আলাপ।

অর্ক পড়াশোনা জানা ব্রাইট ইয়াং ম্যান ছিল। অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখত। ওল্ড সিটিতে সাঁতারে বহুবার ফার্স্ট হয়েছে। ওর ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জার পারসোনালিটি ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ছিল ভীষণ গরিব। তাই হাংরি ডলফিন।

জিপিসি-তে অর্কপ্রভ ছিল একমাস মতন। তার মধ্যেই রিমিয়ার সঙ্গে পরিচয়, দুরন্ত আলাপ—এবং বিয়ে।

ওকে বিয়ে করতে চেয়ে শ্রীধর পাট্টার কাছে অ্যাপিল করেছিল রিমিয়া। সিন্ডিকেটের অনুমতি না পেলে কোনও এমপ্লয়ির সঙ্গে কোনও পার্টিসিপ্যান্টের বিয়ে মানে একটা ক্রাইম। সোজা কথায় পারমিশান ছাড়া এ ধরনের বিয়ে অসম্ভব।

শ্রীধর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে এও বলেছিলেন, অর্কপ্রভর নাম হাংরি ডলফিন গেম থেকে কিছুতেই উইথড্র করা যাবে না।

অর্কটা বোধহয় কিছুটা পাগল ছিল। কোনও নেগেটিভ ব্যাপারকে ও পাত্তা দিত না। সবসময় বলত, 'রিমিয়া, আমি জিতব। জিতবই।'

প্রথম কয়েকটা ছোটখাটো গেম-এ জিতে প্রাইজ মানি পেয়েছিল অর্ক। সেইসব টাকা ও রিমিয়াকে দিয়েছিল। রিমিয়া আর ও মিলে রিমিয়ার কোয়ার্টার সাজাতে শুরু করেছিল সংসার পাতবে বলে।

অর্ক বলত, 'হাংরি ডলফিন গেমটায় জিতলে বিশ লাখ টাকা! ভাবা যায়? বিশমিনিটে বিশলাখ। আর বিশমিনিটের আগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলে একলাখ টাকা পার মিনিট। আমরা সত্যিকারের বড়লোক হয়ে যাব, রিমিয়া! ক্যান য়ু বিলিভ ইট?'

অর্ক খুব অপটিমিস্ট ছিল।

কিন্তু হাংরি ডলফিন গেম ওকে শেষ করে দিল। ডলফিনের ছদ্মবেশ নেওয়া টাইগার শার্কের ঝাঁক ওকে খতম করে দিল। একইসঙ্গে ওর স্বপ্নও খতম।

কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে আবার রুমাল বের করল রিমিয়া। চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'অর্ক চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আরও বেশি করে স্বপ্ন দেখি। জোর করে স্বপ্ন দেখি। তাই ভালো না লাগলেও এই চাকরিটা আমি ছাড়িনি। সবসময় ভাবি, অর্ক আমাকে এই স্বপ্ন দেখার বিরাট দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। আমাকে স্বপ্ন দেখতেই হবে। সব্বাইকে উইশ করতে হবে। সব্বাইকে জেতাতে হবে—শুধু ইচ্ছে দিয়ে জেতাতে হবে। আমি পারব না?'

শেষ প্রশ্নটা জিশানকে লক্ষ্য করে।

জিশানের খারাপ লাগছিল। অর্কপ্রভকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল ও। জিশান যেন পিট ফাইট-এ লড়ছে আর দর্শকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে অর্ক আর রূপকথা ওকে পাগলের মতো চিয়ার করছে, চেঁচাচ্ছে তারস্বরে : 'জি—শান! জি—শান!'

'আমি পারব না, জিশান?' রূপকথা আবার জিগ্যেস করল।

জিশান ঘাড় হেলাল। আলতো করে বলল, 'পারবেন। আপনি পারবেন।'

নাক টানল রিমিয়া। ছোট্ট করে কেশে নিয়ে বলল, 'এই চাকরির যে কী অসুবিধে তা তো আপনি খানিকটা দেখেছেন। চিফের ওই হতচ্ছাড়া রিকোয়েস্ট। আমার হাজব্যান্ডের মৃত্যুতে উনি নাকি সাংঘাতিক মুষড়ে পড়েছেন। তাই ওঁর ফিলিং এক্সপ্রেস করতে আমার কোয়ার্টারে আসতে চান। আপনি বলুন তো, জিশান, আমি সবসময় কী নিয়ে ভাবি, আর ওই লোকটা কী নিয়ে ভাবে! ও ভাবে আমি সবার গায়ে পড়া। পার্টিসিপ্যান্ট দেখলেই আমার চোখ দিয়ে লালা ঝরে। থু:।' মাথা ঝাঁকাল রিমিয়া। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আসলে সবাইকে আমি অর্কপ্রভ ভাবি। তাই সবাইকে আমি জেতাতে চাই। এটা কি চিফ কখনও বুঝতে পারবে? ওর চিন্তা এত নোংরা, এত ছোট...।'

জিশান নতুন চোখে রূপকথাকে দেখছিল। পিট ফাইটে জিততে হলে এইরকম একজন সাপোর্টার ভীষণ দরকার। জিশানের চোখে রূপকথার বাইরের সুন্দর আর ভেতরের সুন্দর একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

ও এবার মিনির কথা বলল রিমিয়াকে। বলল ছোট্ট শানুর কথা।

রিমিয়া মন দিয়ে শুনল। বলল, 'কাল আমাকে ওদের ফটো দেখাবেন?'

'দেখাব।' জিশান জানে মাইক্রোভিডিয়োফোন থেকে কীভাবে ছবি স্টোর করা যায়। তারপর ইউ. এস. বি. কেবল দিয়ে ওর ঘরে রাখা টার্মিনাল থেকে সহজেই তার প্রিন্ট বের করা যায়।

কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে হাতঘড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল রিমিয়া। হঠাৎই ও বলল, 'আমাদের হাতে আর দেড়মিনিট আছে...।' এবং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা স্পাইরাল বেয়ে নেমে এল। ক্যাশ কাউন্টারে এসে স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করে বিল মেটাল রিমিয়া।

ফুড প্লাজার দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় ও জিগ্যেস করল, 'কবে আপনার পিট ফাইট?'

'আর সাতদিন পর—এই রোববারের পরের রোববার।'

'আমি ওটা দেখতে যাব। চিফ ইনস্ট্রাকটরকে বলে স্পেশাল লিভের ব্যবস্থা করব। চিফের রিকোয়েস্ট রাখব এই আশায় চিফ আমার অনেক রিকোয়েস্ট রাখে। বোধহয় ছুটি পেয়ে যাব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল জিশান। বলল, 'আপনি দেখতে গেলে আমার খুব জিততে ইচ্ছে করবে।'

•

পিট ফাইটের গর্তটার কাছে পৌঁছে জিশান দৃশ্যটাকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

এই সাতদিনে পিট ফাইট নিয়ে আরও অনেক কিছু জেনেছে ও। এখন সেই তথ্যগুলোর সঙ্গে বাস্তবটাকে মনে-মনে যোগ করছিল।

নানানজনের মুখে ও শুনেছিল পিট ফাইটের বাঁধাধরা কোনও সময় নেই—দিনের যে-কোনও সময় হতে পারে। কিন্তু এখন যখন ওর নিজের লড়াইয়ের পালা এসেছে তখন ও এই প্রথম জানল পিট ফাইট রাতেও হতে পারে। যেমন, ওর লড়াই শুরু হবে ঠিক রাত একটায়।

এই রাতটাকে জিশান অন্য চোখে দেখছিল।

পিস ফোর্সের গার্ডের দল রাত ঠিক বারোটায় ওকে গেস্টহাউস থেকে নিতে এল। গার্ডরা ওর ঘরের কম্পিউটার টার্মিনাল অ্যাক্টিভেট করে দিতেই শ্রীধর পাট্টার ছবি ফুটে উঠল। সেইসঙ্গে জিশানের প্রতি নির্দেশও শোনা গেল : 'বাবু জিশান, কুইক। চটপট রেডি হয়ে নাও। কাম, কাম—ওয়েলকাম টু স্টেডিয়াম। পিট ফাইট। সি য়ু...।'

জিশানের ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। কিন্তু ও ব্যস্তভাবে তৈরি হতে লাগল।

জিপিসি-র গেস্টহাউস থেকে কিউ-মোবাইলে রওনা হওয়ার সময় জিশান আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সেই একই আকাশ। একই চাঁদ-তারা, ধূমকেতুর একই লাল-নীল রঙিন আলো। তবু আজকের রাতই ঠিক করে দেবে কাল সকালে সূর্য ওঠা জিশান দেখবে কি না।

পিট ফাইটের স্টেডিয়ামটা জিশানকে অবাক করল। ছোট মাপের আধুনিক স্টেডিয়াম। মেটাল-হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো রাতকে দিন করে দিয়েছে। স্টেডিয়ামের ঠিক মাঝখানে তিরিশ ফুট ব্যাসের একটা গর্ত। গর্তটা মোটেই আধুনিক নয়। গোল করে কবর খুঁড়লে যেরকম কাদা-মাটির জমি পাওয়া যায়, ব্যাপারটা ঠিক তাই।

স্টেডিয়ামে এখনও দর্শক ঢোকানো শুরু হয়নি। পিস ফোর্সের চারজন গার্ড ফাঁকা স্টেডিয়ামে জিশানকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে যে নেতা গোছের সে জিশানকে গাইডের ট্যুরের ধারাবিবরণী শোনাচ্ছিল।

গর্তটা প্রায় দশফুট গভীর। তার ভেতরে নামার কিংবা বেরিয়ে আসার কোনও ব্যবস্থা নেই। আর খালি হাতে গর্তের খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করাটা স্রেফ বোকামি। তা সত্বেও যদি কেউ ভাগ্যের জোরে গর্তের কিনারায় হাত ছোঁয়াতে পারে তা হলে তার কপালে জুটবে ইলেকট্রিক শক—একহাজার ভোল্টের। কারণ, একটা সরু তার গর্তের কিনারায় ছোট-ছোট পোর্সিলেন বুশিং-এর ওপরে বসানো রয়েছে। ঠিক যেন একটা তারের পাঁচিল।

জিশান কমেন্টেটর গার্ডকে জিগ্যেস করল, 'কার সঙ্গে আমার লড়াই?'

গার্ড বলল, 'জানি না। ওটা শেষ মুহূর্তে সিন্ডিকেটের মার্শাল ঠিক করবেন।'

শ্রীধর পাট্টা ঠিক করবেন জিশানের প্রতিদ্বন্দ্বী!

জিশান একটু অবাক হল। এই যে গার্ডরা ওকে স্টেডিয়াম এবং যুদ্ধের জায়গাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছে, সেরকম তো দেখানো উচিত ওর প্রতিদ্বন্দ্বীকেও! তা হলে তাকে কখন দেখানো হবে?

সে-কথাই ও গার্ডকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে হাসল গার্ড : 'তোমার মতো আরও দুজনকে এরকম ঘুরিয়ে দেখানো হবে। একজন-একজন করে। অনেক সময় কী হয়, পিট ফাইটে নামার ঠিক আগে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। প্যান্টে হিসি করে ফ্যালে। একবার তো একজন ফাইটার গর্তে নামার আগে পটি করে ফেলেছিল—' জোরে হেসে ফেলল গার্ড। ওর তিনজন সঙ্গীও ছোট করে হাসল।

গার্ড বলে চলল, 'তোমার বেশ কয়েকটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হয়েছে না?'

জিশান মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, হয়েছে। তবে টেস্টের কারণ জিশানকে বলা হয়নি।

'সেই টেস্টগুলো থেকে বোঝা যায় কার নার্ভ কতটা স্ট্রং। তুমি ওইসব টেস্টে ঠিকঠাক পাশ করে গেছ। তোমাকে নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। যারা পাশ-ফেলের বর্ডারে থাকে তাদের নিয়েই যত প্রবলেম। তবে তাদের কেউ-কেউ টিকে যায়। পিট ফাইটে নামে। অনেক সময় লাকের জোরে জিতেও যায়। আবার কারও-কারও ব্রেকডাউন হয়ে যায়। কান্নাকাটি করে। প্যান্টে ওইসব করে ফ্যালে। সেইসব ক্যান্ডিডেটকে নামালে লড়াই জমে না। তখন...।'

তখন কী হবে জিশান জানে।

স্টেডিয়ামে দর্শক হবে না। টিকিট বিক্রি হবে না। লাইভ টেলিকাস্ট জমবে না। বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া রেভিনিউ অনেক কমে যাবে।

তা হলে কে-কে নামবে জিশানের এগেইনস্টে? সাইকোলজিক্যাল টেস্টগুলোয় আর কে ঠিকমতো পাশ-টাশ করেছে?

জিশান স্টেডিয়ামটা ভালো করে দেখছিল। বড়জোর দশহাজার দর্শকের জায়গা হতে পারে সেখানে। স্টেডিয়ামের চারদিকে একইরকম ডিজাইনের শৌখিন চেয়ার জ্যামিতিক ঢঙে সাজানো। তবে স্টেডিয়ামের এক-এক অংশে চেয়ারের রং এক-একরকম। সাদা, নীল, কমলা, সবুজ, আকাশি আর লাল।

এখন সব চেয়ার খালি। তবে একটু পরেই ভরতি হয়ে যাবে। পিট ফাইট স্বচক্ষে দেখার জন্য নিউ সিটির বাসিন্দাদের আগ্রহ কম নয়। কারণ, সুপার গেমস কর্পোরেশনের এই একটিমাত্র খেলাই গ্যালারিতে বসে দেখা যায়, ঠিকমতো এনজয় করা যায়। এই খেলাটা দেখার জন্য মানুষের আগ্রহ যে ফেটে পড়ে তার কারণ, সবাই জানে এর পরের ধাপই হল কিল গেম। যে-গেম-এর প্রাইজ মানি একশো কোটি টাকা। সেই গেম-এর খেলোয়াড়কে আগাম দেখা, এবং খালি হাতে লড়তে দেখা, কিছু কম উত্তেজনার ব্যাপার নয়।

পিট ফাইট যাতে দর্শকরা ভালোভাবে দেখতে পায় তার জন্য স্টেডিয়ামের দুপাশে গ্যালারির মাথায় দুটো জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন। এ ছাড়া স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করে থাকা দর্শকদের জন্য আরও দুটো জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা আছে।

সবমিলিয়ে সবাইকে উত্তেজনার শরিক করে তোলার ব্যাপারে সিন্ডিকেটের বন্দোবস্তের কোনও ঘাটতি নেই।

আলো-ঝলমলে ফাঁকা স্টেডিয়ামটা জিশান ঘুরে-ঘুরে দেখছিল আর কল্পনায় উত্তেজিত দর্শকদের হিংস্র উল্লাসের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। আধুনিক প্রযুক্তি আর আদিম প্রবৃত্তির কী অদ্ভুত মিলন! একটু পরেই ওই কাদা-মাটির গর্তের মধ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জিশানকে মরণপণ লড়তে হবে—জানোয়ারের মতো। যেমন করে হোক বেঁচে থাকতে হবে। তা হলে পাওয়া যাবে প্রাইজ মানি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, আর একশো কোটি টাকার গেম-এ ঢোকার ছাড়পত্র।

বাইরে থেকে জমায়েত দর্শকদের চিৎকার ভেসে আসছিল। স্টেডিয়ামের গেট এখনও খোলা হয়নি বলে ওরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

জিশানের গাইডেড ট্যুর শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই গার্ডরা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল পিট ফাইট প্যাভিলিয়নে।

প্যাভিলিয়নে এক-একজন পার্টিসিপ্যান্টের এক-একটা আলাদা এয়ারকন্ডিশানড ঘর। ঘরগুলো পার্টিশান ওয়াল দিয়ে এমনভাবে আলাদা করা যে, একজন খেলোয়াড় আর-একজনকে মোটেই দেখতে পাবে না। তবে প্রতিটি ঘরের দরজা দিয়ে বেরোলেই লম্বা করিডর। সাদা গ্রানাইট বসানো সেই করিডর চলে গেছে সোজা স্টেডিয়ামের ভেতরে—গর্তের কাছে।

প্যাভিলিয়নের তিন নম্বর ঘর জিশানের। অন্যান্য ঘরে কারা আছে ও জানে না। ওর ঘরে ফার্নিচার বলতে একটা সোফা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা আয়না, একটা প্লেট টিভি, আর একটা ফ্রিজ। এ ছাড়া ঘরের এককোণে আছে আয়না বসানো একটা মিনি জিম—অনেকটা সোলো জিমের মতো। সেখানে পরীক্ষার আগে শেষ মুহূর্তের পড়ার মতো লড়াইয়ের আগে শেষ মুহূর্তের ব্যায়ামের জন্য হালকা কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে। জিশান পনেরোমিনিটের জন্য গায়ের জামাটা ছেড়ে চেইন-পুলি আর বাটারফ্লাই ক্রাঞ্চ করে নিল। তারপর তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে চলে গেল উলটোদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ফ্রিজের কাছে।

ফ্রিজ খুলে দেখতে পেল দু-গ্লাস হেলথ ড্রিংক—ফাইবারের গ্লাসে রাখা। একটা গ্লাস নিয়ে খেয়ে নিল জিশান। ওর পিট ফাইট কোচ খেলার আগে এই ড্রিংক একগ্লাস খেতে বলেছে। এসি থাকায় এই ঘরের মধ্যে গরম কম। বাইরে ওই কাদা-মাটির গর্তের মধ্যে গরম নিশ্চয়ই অনেক বেশি।

খালি গ্লাসটা ফ্রিজের ভেতরে ফিরিয়ে দিল জিশান। ফ্রিজের পাশেই টেবিলে রাখা ছিল একটা গোলাপি রঙের সিপিং ওয়াটার বটল। সিপারে ঠোঁট লাগিয়ে জল খেল ও। তারপর দেওয়ালে টাঙানো পাঁচকোনা আয়নায় নিজেকে একবার দেখল। ওর মনে হল আয়নার ওই পেশিবহুল চেহারাটা যেন অন্য লোকের। আর সেই অচেনা মানুষটার কাঁধের ওপরে জিশানের চেনা মুন্ডুটা বসানো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় বসে পড়ল জিশান। একটু পরেই লড়াই শুরু হবে। বুকের ভেতরে একটা চাপ টের পেল। দম যেন আটকে যেতে চাইছে। এ খেলায় হারলে খেল খতম। আর জিতলেও তাই। মাঝে শুধু কিল গেম-এর ছলনার ব্যবধান।

হঠাৎই হইহই আওয়াজ শুনে চোখ তুলল। তাকাল উলটোদিকের দেওয়ালে টাঙানো প্লেট টিভির দিকে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে রিমোট তুলে নিল। ভলিয়ুমটা একটু বাড়িয়ে দিল।

স্টেডিয়ামে দর্শকরা ঢুকতে শুরু করেছে। লাউডস্পিকারে অদ্ভুত একটা মিউজিক বাজছে। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা কমেন্টেটর তারই মধ্যে বকবক করে চলেছে।

'...একদিকে রয়েছে জিশান পালচৌধুরী। হাই স্কোরিং ফাইটার। আগের সবক'টা গেম-এ জিশান যে শুধু কোয়ালিফাই করেছে তা নয়—দারুণ স্কোরও করেছে। স্পেশালিস্টদের ধারণা ওর মধ্যে ব্যাপক পোটেনশিয়াল রয়েছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কে লড়বে? কে সেই সারপ্রাইজ ফাইটার?'

জিশানের মনে পড়ে গেল মালিকের কথা, ছুন্নার কথা, কার্তিকের কথা, খালধারের সেই অন্ধকার রাতের ফাইটের কথা। টিভির কমেন্টেটরদের কথাবার্তাগুলো যেন খালধারের সেই টিংটিঙে রেফারির সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।

'...আপনাদের একটা দারুণ খবর দিই। আজ স্টেডিয়ামে হাজির রয়েছেন আমাদের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত মার্শাল শ্রীধর পাট্টা...।'

টিভি ক্যামেরা শ্রীধর পাট্টাকে দেখাল। জোরালো আলো পড়েছে ফরসা ছিপছিপে মানুষটার মুখে। ঠোঁট জোড়া এতই লাল যে, মনে হয় এইমাত্র পান অথবা রক্ত খেয়ে এসেছেন।

'...সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' কমেন্টেটর উত্তেজিতভাবে বলল, 'আমাদের মার্শালের অনারে আজ আসল ফাইটের আগে একটা সারপ্রাইজ ফাইট হবে। ডগ ফাইট।

'এই ফাইটটার পরেই হবে পিট ফাইট। দুটো ফাইট দেখার পর আপনারা কমপেয়ার করতে পারবেন লড়াইয়ের ব্যাপারে মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে কী-কী মিল, আর কী-কী তফাত। ব্যাপারটা কি দারুণ ইন্টারেস্টিং নয়?...তোমার কী মনে হয়, রাজশ্রী?'

মহিলা কমেন্টেটর—যার নাম রাজশ্রী—ধারাবিবরণীর খেই ধরে বলল, 'ইট ইজ অ্যান একসিলেন্ট আইডিয়া, মণীশ। এরকম কমপ্যারিজন-এর স্কোপ আমরা আগে কখনও পাইনি, তাই না? সো লেট আস ওয়াচ, গাইজ...।'

ক্যামেরা গর্তটাকে বারবার দেখাচ্ছিল। দেখাচ্ছিল স্টেডিয়ামের দর্শকদেরও। এরপর মণীশ আর রাজশ্রী গর্তটার মেক্যানিক্যাল ডেটা টিভির দর্শকদের বলতে শুরু করল। তারই ফাঁকে-ফাঁকে পুরোনো পিট ফাইট-এর ভিডিয়ো ক্লিপিং দেখানো হতে লাগল। গত সাতদিন ট্রেনিং-এর সময় জিশানদের এইসব ফাইটের ভিডিয়ো দেখানো হয়েছে। পিট ফাইট কোচরা ফাইটার তৈরির কাজে সত্যিই আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন।

বড় করে শ্বাস ফেলল জিশান। এখন যদি ডগ ফাইট হয় তা হলে বধ্যভূমিতে যেতে জিশানের এখনও কিছুটা দেরি আছে। একইসঙ্গে ওর মনে হল, ওল্ড সিটির জোড়াতালি দেওয়া ঘরে বসে মিনিও নিশ্চয়ই এই লাইভ টেলিকাস্ট দেখছে।

জিশানের হঠাৎ ইচ্ছে হল, এই ডগ ফাইটটা ও লাইভ টেলিকাস্ট-এ নয়—লাইভ দেখবে। কারণ, তার পরের ডিজিটাল লড়াইটার জন্য ওর মনটা আরও হিংস্র আরও নৃশংস হওয়া দরকার। নিজেকে তৈরি করার জন্য ডগ ফাইটের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি টুকরো ওকে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে হবে। কিল গেম-এ মারা যাওয়াটা যদি ভবিতব্যও হয়, তা হলেও পিট ফাইটটা জিশান জিততে চায়। কারণ, এই লড়াইটা ও নিজের জন্য নয়—অনেকের জন্য লড়ছে, অনেকের হয়ে লড়ছে।

ডগ ফাইটটা স্বচক্ষে দেখার তেষ্টায় জিশানের বুক হঠাৎ শুকিয়ে গেল যেন। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেবিলে রাখা ওয়াটার বটল থেকে আবার অনেকটা জল খেল। তারপর দেওয়ালে গাঁথা কলিংবেলের পুশ বাটন-এ চাপ দিল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই কোমরে শকার ঝোলানো একজন গার্ড ঘরে এসে ঢুকল। এই গার্ডকে জিশান আগে দেখেনি।

গার্ড বলল, 'কী দরকার বলো?'

হঠাৎই হাসি পেয়ে গেল জিশানের। শকার ঝোলানো গার্ডটাকে কেমন জোকারের মতো লাগছে না? ইচ্ছে করলে জিশান লোকটাকে এখুনি স্রেফ একহাতে মেরে ফেলতে পারে। ওর হাত-পাগুলো পাটকাঠির মতো পটপট করে মটকে ভেঙে দেওয়াটাও তেমন কঠিন নয়—তবে তখন আর একহাতে হবে না, দু-হাত লাগবে। তারপর কোথায় শকার, আর কোথায় গার্ড! মেঝেতে সব টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে। অথচ গার্ড বেচারা এসব বুঝতেও পারছে না। ভাবছে, শকার কোমরে ঝুলিয়ে ও কত শক্তিশালী!

ওর ভেতরে যে শক্তি টগবগ করে ফুটছে তার বুড়বুড়ির শব্দ পেল জিশান। শক্তিকণাগুলো পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে। বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেদের ব্যবহার করতে চাইছে।

জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল। ও গার্ডকে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি স্টেডিয়ামে বসে ডগ ফাইট দেখব—টিভিতে দেখব না।'

গার্ডটা জিশানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। 'দেখছি কী করা যায়—' বলে চট করে চলে গেল।

পাঁচ থেকে দশসেকেন্ডের মধ্যেই গার্ড ফিরে এল। সঙ্গে একটি লম্বা রোগামতন মেয়ে। গায়ে সিন্ডিকেটের ইউনিফর্ম। হাতে একটা মোবাইল। কারও সঙ্গে কথা বলছে।

'...হ্যাঁ, স্যার। নিয়ে যাচ্ছি। স্পেশাল এনক্লেভে সিট আছে। সেখানেই বসাচ্ছি, স্যার। ও. কে., স্যার...।'

ফোন কেটে দিয়ে জিশানকে লক্ষ করে বলল, 'চলুন। পারমিশান গ্রান্টেড। লেটস গো—।'

জিশান শার্টটা আবার গায়ে চড়িয়ে নিল। মেয়েটির সঙ্গে ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

টিভির পরদায় তখন রাজশ্রী বলছে, 'শুরু হচ্ছে ডগ ফাইট। দুটো গ্রেট ডেন কুকুরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সঙ্গে তাদের ট্রেনার অভিজিৎ আর কমলেশ্বর। গ্রেট ডেন আসলে ম্যাস্টিফ আর আইরিশ উলফহাউন্ডের ক্রস। এই দুটো ব্লাডলাইন মিশিয়ে ব্রিড করার জন্যে গ্রেট ডেনের সাইজও যেমন বড়, শক্তিও অসাধারণ। সো উই এক্সপেক্ট আ গ্রেট ফাইট। আ গ্রেট সাইট। হোয়াট ডু য়ু সে, মণীশ?'

মণীশ কী বলল সেটা জিশানের আর শোনা হল না। ও আর মেয়েটি তখন নির্জন করিডরে প্রতিধ্বনি তুলে হেঁটে চলেছে।

স্পেশাল এনক্লেভে আকাশি রঙের সিটে জিশানকে বসানো হল। চারপাশের দর্শকদের উত্তেজনার শোরগোলটা যেন মাইকে শোনা মউমাছির গুঞ্জন। একবার চোখ বুলিয়েই জিশান বুঝল দর্শকে স্টেডিয়াম টইটম্বুর। অসম্ভব জেনেও ওর চোখ রিমিয়াকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। চেনার সুবিধের জন্য ও রিমিয়াকে বলেছিল লাল ড্রেস পরে আসতে।

রিমিয়াকে খুঁজে পেল না জিশান। চোখ ফিরিয়ে গর্তের দিকে তাকাল। ওর সিট থেকে গর্তটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আর যেটুকু জ্যামিতির জন্য আড়াল হচ্ছে সেটুকু ষোলোআনার বেশি পুষিয়ে দিচ্ছে জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন।

গর্তের কিনারায় দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অভিজিৎ আর কমলেশ্বর।

অভিজিতের গায়ে টকটকে লাল রঙের ফুলহাতা শার্ট, আর পায়ে কালো প্যান্ট। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ওর গ্রেট ডেন। লম্বা-চওড়া কুকুর। হালকা বাদামি রং। কান দুটো ভাঁজ হয়ে ঝুলছে। মুখের ডগাটা কালচে। চোয়ালের নীচে চামড়া সামান্য ঝুলে আছে।

কুকুরটার পেটের কাছে দু-দিকেই লাল রঙের একটা করে গোল ছাপ। মাপে টেনিস বলের মতো।

গর্তের ওপারে, অভিজিতের ঠিক বিপরীতে, দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ্বর। গায়ে ক্যাটক্যাটে হলদে রঙের শার্ট আর পায়ে কালো প্যান্ট। ওর পাশে দাঁড়ানো গ্রেট ডেনটার পেটে গোল হলদে ছাপ।

লাউডস্পিকারে মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাবিবরণী চলছিল। ওরা বলছিল, দুটো কুকুর যেহেতু একইরকম দেখতে সেহেতু কোনটা অভিজিতের আর কোনটা কমলেশ্বরের কুকুর সেটা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্যই ওই লাল আর হলদে ছাপ।

দুটো কুকুরের গলাতেই চামড়ার কলার, সঙ্গে স্টিলের চেইন। দুজন ট্রেনারই চেইনটা হাতে পাকিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে। কুকুর দুটো চেইন টেনে সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। চাপা গর্জন করছিল।

মাইকে কুকুর দুটোর নাম-ধাম পেডিগ্রি শোনা যাচ্ছিল। হলদে ছাপওয়ালা কুকুরটার নাম ইয়েলো, আর অন্যটার নাম রেড। রং অনুযায়ী নাম, অথবা নাম অনুযায়ী রং। ওদের বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। যখনই নিউ সিটিতে কোনও ডগ ফাইটের ব্যবস্থা করা হয় তখন কুকুর আনা হয় বিদেশ থেকে। ফাইটের আগে এখানে ওদের অ্যাক্লাইমেটাইজ করা হয় এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়। অভিজিৎ ও কমলেশ্বর খুবই নামি ট্রেনার। ওরা এ-বিষয়ে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

ধারাবিবরণী চলছিল আর টিভি ক্যামেরা বারবার ট্রেনার দুজন এবং কুকুর দুটোর ক্লোজ আপ দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই স্টেডিয়ামের দুপাশের একটা ফোকর দিয়ে দুটো ক্রেনের ধাতব বাহু ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল। এসে থামল অভিজিৎ আর কমলেশ্বরের কাছে।

ক্রেনের বাহুর প্রান্তে একটা ছোট কেবিন। দুজন করে গার্ড ছুটে চলে এল কেবিনের কাছে। ট্রেনারকে কুকুরসমেত কেবিনে উঠতে সাহায্য করল। তারপর ক্রেন নিখুঁতভাবে ট্রেনার ও কুকুরকে নামিয়ে দিল গর্তের ভেতরে।

মাইকে তখন রাজশ্রীর গলা : '...শুনলে আপনাদের ভালো লাগবে—লড়াইটা যাতে থ্রিলিং হয়, এনটারটেইনিং হয় সেজন্যে ইয়েলো আর রেডকে আজ সারাদিন খেতে দেওয়া হয়নি। সো উই এক্সপেক্ট আ ভেরি থ্রিলিং ফাইট, আ ভেরি এনটারটেইনিং ফাইট, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন...।'

ট্রেনার দুজন কুকুর নিয়ে একইসঙ্গে কেবিন থেকে নেমে গেল গর্তের মাটিতে। কুকুর দুটোকে গর্তের দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড় করাল। গলা থেকে কলার খুলে নিল। খালি হাতে কুকুরটার ঘাড় ধরে রইল। তারপর মাইকে যেই শোনা গেল 'ওয়ান, টু, থ্রি—স্টার্ট।' ওমনি কুকুরটার গালে একটা থাপ্পড় মেরে ট্রেনার তার মুখটা সামনে ঘুরিয়ে দিল।

ইয়েলো আর রেড এখন মুখোমুখি। পরমুহূর্তেই দুই ট্রেনার লাফিয়ে উঠে পড়ল যার-যার কেবিনে। এবং ক্রেন কেবিনটাকে টেনে তুলে নিল শূন্যে।

শুরু হয়ে গেল ডগ ফাইট।

দুটো ক্রেন তখন দুজন ট্রেনারকে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে চলেছে।

ইয়েলো আর রেড মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ওদের ধারালো দাঁতের কামড়গুলো মাংস পেল না—পেল বাতাস। তাই চোয়ালের শব্দ হল।

জিশান অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল। কুকুর দুটো কোনও শব্দ করছে না। গরগর শব্দও নয়। নি:শব্দে লড়ছে। শব্দহীন যন্ত্রের মতো।

দ্বিতীয়বার যখন ইয়েলো আর রেড পরস্পরের দিকে ঝাঁপাল তখন ওদের মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি লাগল। ইয়েলো চিত হয়ে ছিটকে পড়ল। রেড হাঁ করে ধেয়ে গেল। কামড় বসাতে চাইল ইয়েলোর গলায়। কিন্তু ইয়েলো ঝটিতি মাথা তুলে রেডের নাকে কামড় বসাল। এবারে মাংসে দাঁত বসেছে।

দর্শক হইহই করে উঠল। মণীশের ধারাবিবরণী থেকে জিশান বুঝল, রেড আর ইয়েলোর মধ্যে কে জিতবে তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বাজি ধরা শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার খালপাড়ের সেই লড়াই।

রেড তখন ইয়েলোকে ছেঁচড়ে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গর্তের মধ্যে। ওর নাক থেকে কামড় ছাড়াতে চেষ্টা করছে। বারেবারেই মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে। টিভির ক্লোজ আপে দেখা যাচ্ছে রেডের রক্তাক্ত নাক।

শেষ পর্যন্ত মারাত্মক এক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের নাক ছাড়াতে পারল রেড। তবে নাকের খানিকটা অংশ ওকে খোয়াতে হল।

ইয়েলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রেডের ওপরে ঝাঁপাল। ওর হাঁ করা চোয়ালের কাছ থেকে চকিতে মাথা সরিয়ে নিল রেড। ইয়েলোর দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি হল। লালা ছিটকে বেরোল শূন্যে।

টিভি স্ক্রিনের দৌলতে লড়াইয়ের বীভৎস খুঁটিনাটিও নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছিল। দর্শকরা উত্তেজনায় পাগলের মতো চিৎকার করছিল। অভিজিৎ আর কমলেশ্বর গর্তের কিনারায় ছোটাছুটি করে ঘুরপাক খেয়ে যার-যার কুকুরকে চেঁচিয়ে নানান ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল।

রেড ইয়েলোর ডান কানটা কামড়ে ধরল। কামড়ে যে যথেষ্ট জোর ছিল সেটা বোঝা গেল প্রবল ঝাঁকুনির বহর দেখে। চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো রেড ইয়েলোকে যক্ষ্মা-ঝাঁকুনি দিয়ে চলল। ইয়েলোর অতবড় শরীরটা ক্রেনের হুকে ঝোলানো ভেজা তুলোর বস্তার মতো অসাড় হয়ে রইল, লাট খেতে লাগল।

কয়েকটা প্রবল ঝাঁকুনির পর ইয়েলোর কান চলে এল রেডের মুখে। সেখান থেকে টুকরোটা ছিটকে পড়ল ভেজা মাটিতে।

জিশানের গা গুলিয়ে উঠল। মনে হল, এই বুঝি বমি পাবে ওর। ও লড়াই থেকে চোখ সরিয়ে নিল। পরপর কয়েকটা ঢোক গিলে বমির দমকটা সামলে নিল।

টিভির পরদায় ইয়েলোর কানের টুকরোটার ক্লোজ আপ দেখাচ্ছিল। কমেন্টেটরের গলা তখন উত্তেজনায় উঁচু পরদায় পৌঁছে গেছে। মণীশ বলছে, '...ওই দেখুন, ইয়েলোর কান। রেড ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর কান ছিঁড়ে নিয়েছে। তা হলে বুঝে দেখুন, রেডের দাঁত কত ধারালো, ওর চোয়াল কত শক্তিশালী! গ্রেট ডেন কুকুর বলে কথা! এদের মধ্যে আইরিশ উলফহাউন্ডের জিন রয়েছে....।'

জিশানের মনে হচ্ছিল, ও নিজের লড়াইয়ের ধারাবিবরণী শুনছে। গর্তের মধ্যে যে-জিশান লড়ছে সে অন্য জিশান।

পাবলিকের চিৎকারে জিশানের কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। কুকুর দুটোর রক্তারক্তি লড়াই দেখে তারা সব উত্তেজনার তুঙ্গে। কখনও 'রেড! রেড!' চিৎকার শোনা যাচ্ছে, কখনও বা 'ইয়েলো! ইয়েলো!'

পুরো ব্যাপারটা জিশানকে পুরোনো আদিম ইতিহাসে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। যখন মানুষ আগুন জ্বালতে শেখেনি, চাকা আবিষ্কার করেনি। যখন মানুষ সোজা হয়ে ঠিকঠাক দাঁড়াতেও পারত না।

গর্তের মধ্যে কুকুর দুটো তুলকালাম লড়াই করছিল। এখন ওরা আর চুপচাপ নয়। ওদের গর্জন চিৎকার ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। ওরা শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে, গর্তের দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। ওদের শরীরের নানান জায়গায় কাদার ছোপ আর রক্তের দাগ।

অভিজিৎ আর কমলেশ্বর একনাগাড়ে উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটি করছে। চিৎকার করে নিজের-নিজের কুকুরকে নির্দেশ দিচ্ছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওরা গর্তের মধ্যে নেমে পড়বে।

হঠাৎই ইয়েলো প্রবল চিৎকার করে উঠল। জিশান চোখ ফেরাল গর্তের দিকে।

একমুহূর্তের সুযোগে রেড ইয়েলোকে চিত করে ফেলেছে। এবং অলৌকিক ক্ষিপ্রতায় ইয়েলোর পেটে এক ভয়ংকর কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

ইয়েলো মাথা তুলে রেডের গলায় কামড় বসাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর চোয়ালে বোধহয় আর ততটা ক্ষমতা ছিল না। কামড়গুলো রেডের লোমের ওপরে পিছলে যাচ্ছিল।

ততক্ষণে রেড ওর কাজ সেরে ফেলেছে। ইয়েলোর পেটে আরও একটা গভীর কামড় বসিয়েছে এবং চোয়ালের এক হ্যাঁচকায় ইয়েলোর নাড়িভুঁড়ির অনেকটাই বাইরে বের করে ফেলতে পেরেছে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। আর ইয়েলো যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল।

'দে, দে—খতম করে দে!' দর্শকের চিৎকার শোনা গেল।

'আরে মাথামোটা, গলা কামড়ে ধর!'

'শাবাশ, রেড! তুই কুত্তার বাচ্চা না—বাঘের বাচ্চা!'

এ ছাড়া সমবেত কণ্ঠে 'রেড! রেড!' বলে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। গোটা স্টেডিয়াম যেন টগবগ করে ফুটছে।

জিশান দেখল, প্রতিটি দর্শক সামনে ঝুঁকে বসেছে। ওদের লালচে মুখে ঘামের বিন্দু। চোখ উত্তেজনায় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। হিংস্র লালসা ছাপ ফেলেছে চোখে-মুখে। ওরা যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য গর্তে নেমে পড়েছে। গ্রেট ডেন কুকুর হয়ে গেছে নিজেরাই। টান-টান উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ উপভোগ করছে—অথচ কোনও যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে না।

ইয়েলোর পাগুলো শূন্যে সাইকেল চালানোর চেষ্টা করছিল। ওর ছটফটানি নিভে আসছিল।

দর্শকদের সমবেত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

'খতম কর! খতম কর! শেষ করে দে!'

'কিল হিম! কিল হিম!'

ইয়েলোর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রেড তখনও ওর ছেঁড়া পেটের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজে চলেছে।

হঠাৎই তীব্র এক হুইসল শোনা গেল। রাতের বাতাস ছুরি দিয়ে চিরে দিল যেন কেউ। তারপরই মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, লড়াই শেষ। রেড জিতেছে।

তখনই ক্রেনের বাহু দুটো স্টেডিয়ামের দু-দিকের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল। দুটো কেবিনে উঠে পড়ল দুই ট্রেনার—কমলেশ্বর আর অভিজিৎ। কেবিন দুটো গর্তের ভেতরে নামতে শুরু করল।

ততক্ষণে টিভির পরদায় ডগ ফাইটের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেছে। দুজন বিশেষজ্ঞ সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন। একইসঙ্গে পরের লড়াইটা কার ফেবারে যেতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করছেন।

দর্শকদের চিৎকার এখন কমে গেছে। তার বদলে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা আর গুঞ্জন। মাথার ওপরে খোলা আকাশ থাকলেও কেমন যেন একটা গুমোট ভাব জাঁকিয়ে বসেছে। কে জানে বৃষ্টি হবে কি না।

জিশান জায়ান্ট টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিল। না, কোনও ফাইটারের নাম ওঁরা বলছেন না। যা বলার জেনারেল টার্মস-এ বলছেন। যেমন, পিট ফাইট জেতার জন্য মেজর ফ্যাক্টরগুলো হল : বডি ওয়েট, স্পিড,

হাইট, রিচ, স্কিল, মাসল পাওয়ার আর সাইকোলজিক্যাল স্টেবিলিটি। আর এগুলোর মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে জরুরি।

টিভি ক্যামেরা এবার গর্তের ক্লোজ আপ দেখাল।

রেড এখনও ইয়েলোকে নিয়ে ব্যস্ত। অভিজিৎ ওর কাছে গিয়ে ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে একটু আদর করল। তারপর টেনে সরিয়ে নিয়ে এল। কমলেশ্বরকে বলল, 'আপনার কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে।'

কমলেশ্বর অভিজিতের কথার কোনও জবাব দিল না।

রেড অভিজিতের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। সারা গায়ে দাঁত-নখের চিহ্ন, রক্তের দাগ। ওর দিকে একবার তাকাল কমলেশ্বর। তারপর নিজের হেরে যাওয়া গ্রেট ডেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কার সঙ্গে যেন দশ-পনেরো সেকেন্ড কথা বলল।

কথা শেষ হতেই ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বের করে নিল কমলেশ্বর। ডাবল অ্যাকশন 0.44 ম্যাগনাম। স্টেইনলেস স্টিলের লম্বা নল। স্যান্টোপ্রিন-ওয়ান-এর তৈরি কালো গ্রিপ।

ইয়েলোর মাথা তাক করে পরপর তিনবার গুলি করল। ইয়েলোর শূন্যে উঠে থাকা পাগুলো একটুও কাঁপল না—শুধু একপাশে কাত হয়ে গেল। আর একইসঙ্গে কুকুরটা পটি করে দিল।

রেড কী বুঝল কে জানে! চট করে চলে এল ইয়েলোর ডেডবডির কাছে। মাথার কাছে মুখ নিয়ে বারকয়েক কী শুঁকল। তারপর পিছনের এক পা তুলে ইয়েলোর মুখে পেচ্ছাপ করে দিল। পেচ্ছাপের রং টকটকে লাল।

অভিজিৎ ওর কুকুরকে ডেকে নিয়ে ক্রেনের কেবিনে ঢুকল। ক্রেন ওদের তুলে নিল গর্ত থেকে—নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন মেডিক রেডকে নিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে চলে গেল। চিকিৎসা করে ওরা রেডকে সুস্থ করে তুলবে। অভিজিৎও তাদের সঙ্গে হাঁটা দিল।

কমলেশ্বরও কেবিনে চড়ে ওপরে উঠে এসেছিল। ও মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল। কথা বলতে-বলতেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে সুইপারদের ইউনিট এসে হাজির হল। ওরা দরকারি যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্রেনে চড়ে গর্তে নেমে গেল। পাঁচমিনিটের মধ্যেই জায়গাটা সাফ করে দিল। মরা কুকুর আর নোংরা হয়ে যাওয়া মাটির সিলড প্যাকেট নিয়ে ওরা ওপরে উঠে এল। পিট এখন আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি। এবার লড়বে মানুষ।

বাইরে শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও ভেতরে-ভেতরে জিশান উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। টের পাচ্ছিল ও ঘামছে। টেনশানটা কমানোর জন্য ও দর্শকের ভিড়ে আবার রূপকথাকে খুঁজল। ও বলেছিল, লাল ড্রেস পরে আসবে। এ-কথা ভাবতেই ওর রেডের কথা মনে পড়ল। আর তখনই মাইকে ঘোষণা করা হল : 'এইবার শুরু হবে আজকের পিট ফাইট। লড়বে এমন একজন ফাইটার যে এর আগে অনেকগুলো গেম জিতেছে। কিল গেম-এর একজন মেজর পার্টিসিপ্যান্ট। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, প্লিজ ওয়েলকাম আওয়ার ফেভারিট পার্টিসিপ্যান্ট জিশান পালচৌধুরী—।'

টিভি ক্যামেরা জিশানের মুখে জুম করল। জায়ান্ট স্ক্রিনের পরদা জুড়ে এখন জিশানের মুখ।

জিশানকে দেখেই দর্শকরা হইহই করে উঠল। কারণ, জিশান নিউ সিটির রিয়্যালিটি শো-র খুব চেনা মুখ। অনেকগুলো গেম-এ জিতেছে। কিল গেম-এ পার্টিসিপেট করার দৌড়ে রয়েছে।

দর্শক আবার পাগলের মতো চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। আওয়াজ উঠছিল : 'জি—শান! জি—শান!'

প্রথম থেকেই জিশান খেয়াল করেছিল আশপাশের দর্শকদের অনেকেই কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। ওর দিকে গোপন ইশারা করে দেখাচ্ছে।

এতক্ষণ যেটা ছিল দর্শকদের দোলাচলে ঘেরা অনুমান, এখন সেটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে বদলে দিয়েছে জায়ান্ট টিভি স্ক্রিন।

জোরালো স্পট লাইট এসে পড়ল জিশানের ওপর।

নীল ইউনিফর্ম পরা একটি ভারি চেহারার মেয়ে কোথা থেকে যেন চলে এল জিশানের কাছে। বুকে কোড নম্বর লেখা স্টিকার।

মেয়েটি বলল, 'জিশান, উড য়ু প্লিজ স্ট্যান্ড আপ ফর আ মিনিট?'

জিশান উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের তুমুল চিৎকার কয়েক ধাপ বেড়ে গেল।

জায়ান্ট স্ক্রিন তখন জিশানের ছবির পাশে স্ক্রোল করে দেখিয়ে চলেছে জিশানের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস : ওজন, উচ্চতা, বাহুর দৈর্ঘ্য, পায়ের দৈর্ঘ্য, বুকের মাপ, কোমরের মাপ ইত্যাদি। এবং তার সঙ্গে মণীশের ধারাবিবরণী।

তারপরই স্ক্রিনে দেখানো শুরু হল ওর নানান কমপিটিশানের ভিডিয়ো রেকর্ডিং-এর অংশ : শিবপদর সঙ্গে লড়াই, কোমোডোর সঙ্গে মোকাবিলা, স্নেক লেকের দৌড়। রেকর্ডিং-এর বিশেষ-বিশেষ অংশ আবার স্লো মোশানে দেখানো হচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক্সপার্ট কমেন্টস।

জিশান অবাক হয়ে দেখছিল, টিভির ছবিগুলো 'পশু' জিশানকে কী নিখুঁতভাবেই না দর্শকদের সামনে পেশ করছিল।

জিশান বসে পড়ল।

তারপরই ওকে অবাক করে দিয়ে টিভিতে দেখানো হল ওর এলিভেটরের লড়াই—রণজিৎ পাত্রের সঙ্গে। এবং সেই ছবির পরই রোলারবল এপিসোড।

রোলারবল এপিসোড দেখানোর সময় রাজশ্রী বারবার জিশানের অলৌকিক সহ্যশক্তির প্রশংসা করছিল। বলছিল, বহুদিন পর নিউ সিটি এমন একজন পার্টিসিপ্যান্ট পেয়েছে যে শুধু মারতে জানে না, মার খেতেও জানে।

জিশানের অডিয়ো-ভিশুয়াল পরিচয়ের পালা আরও কিছুক্ষণ ধরে চলল। তারপর রাজশ্রী বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, এইবার আপনাদের জানাব সেকেন্ড ফাইটারের নাম। এই নামটা এইমাত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। নামটা সিলেক্ট করেছেন আমাদের ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল মাননীয় শ্রীধর পাট্টা...।'

সঙ্গে-সঙ্গে টিভির পরদায় চলে এল শ্রীধর পাট্টার ছবি।

'...জিশানের সঙ্গে আজ পিট ফাইট যে লড়বে সেও কম নয়। এর আগে অনেকগুলো কমপিটিশানে সে জিতেছে। নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, লেট আস ওয়েলকাম দ্য গ্রেট ফাইটার মনোহর সিং...।'

জিশানের হাত থেকে একরাশ কাচের বাসন পড়ে গেল যেন। ওর সারা শরীর ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। একটা কান্নার দমক উথলে উঠল বুকের ভেতরে।

ও : ভগবান!

শেষ পর্যন্ত মনোহর সিং!

চোখের পলকে জায়ান্ট স্ক্রিনে মনোহর সিং-এর ছবি ফুটে উঠল। ক্যামেরা ওর হাত-পা-কাঁধের পেশির ক্লোজ-আপ দেখাতে শুরু করল। তারপর পৌঁছে গেল ওর মুখে।

কিন্তু এ কোন মনোহর সিং!

চাপ-চাপ লোহা দিয়ে তৈরি ওর শরীরের পেশি। মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। জীবনে অনেক দু:খ-কষ্ট থাকলেও মনোহরের সরল মুখে সবসময় হাসির ছোঁওয়া। ও অনেক কিছু পারে। এত অভাবের মধ্যে থেকেও ও প্রাইজ মানির পঞ্চাশহাজার টাকা জিশানের ছেলেকে উপহার দিতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোমোডো ড্রাগনের শরীরে কামড় বসাতে পারে।

সেই হাসিখুশি উদার অশিক্ষিত মানুষটা এখন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে জল। চোয়াল শক্ত করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। বলছে 'নহি! নহি!' কিন্তু অডিয়ো সিস্টেম লাগানো নেই বলে শুধু ওর ঠোঁট নাড়াটা দেখা যাচ্ছে।

মনোহরের ছবির সঙ্গে মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাভাষ্য চলছিল। গেম সিটিতে আসার পর থেকে মনোহর সিং লড়াইয়ে কী-কী ক্যারিশমা দেখিয়েছে, কোন-কোন কমপিটিশানে কীভাবে জিতেছে, সেসব কথা ওরা অনর্গল বলে চলেছে।

'...মনোহর সিং কোমোডো ড্রাগনের কামড় খেয়েছে, বিষধর সাপের ছোবল খেয়েছে—কিন্তু তাও ও হারেনি। হি ইজ আ বর্ন উইনার। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা...।'

জিশানের কানে টিভির ধারাবিবরণীর একটা শব্দও ঢুকছিল না। ও শুধু মনোহরের গাল বেয়ে নেমে আসা চিকচিকে জলের রেখা দেখছিল আর শ্রীধর পাট্টার সর্বনাশা বুদ্ধির শক্তি আঁচ করছিল। কিল গেম-এ যাওয়ার আগে শুধু গায়ের জোরের লড়াই নয়, মনের জোরের লড়াইও জিততে হয়!

জিশানের হাত-পাগুলো যেন রবারের হয়ে যাচ্ছিল। ও উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ওর শরীরের শিরা-উপশিরায় তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। একটা চিনচিনে জ্বালা ছড়িয়ে যাচ্ছিল প্রতিটি স্নায়ুতে।

জিশানের ভয় হচ্ছিল, ওর রবার হয়ে যাওয়া শরীর না গলে যায়! গলে কনডেনসড মিল্কের মতো গড়িয়ে যায় স্টেডিয়ামের মেঝেতে!

জিশান চিৎকার করে বলতে চাইল, 'মনোহরের সঙ্গে আমি লড়ব না—কিছুতেই না।' কিন্তু ওর ঠোঁট থরথর করে কাঁপল শুধু—কোনও শব্দ বেরোল না।

কিন্তু মনোহর সিং প্রতিবাদে ফেটে পড়ল।

ওর কোনও কথা শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু মূকাভিনয়ের মতো ব্যাপারটা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছিল।

মনোহর পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। টিভি ক্যামেরা খানিকটা পিছিয়ে যেতেই দেখা গেল চারজন গাঁট্টাগোট্টা সিকিওরিটি গার্ড মনোহরের দুটো হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মনোহর প্রবল শক্তিতে ট্যানাহ্যাঁচড়া করছে, ওদের বাঁধন ছাড়াতে চেষ্টা করছে। ওর গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

স্টেডিয়ামের দর্শক মনোহরের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারছিল। ওরা হইহই চিৎকারে মনোহরকে 'দুয়ো' দিতে লাগল। দর্শকের ক্ষিপ্ত গর্জনে টিভির ধারাবিবরণী ডুবে গেল।

জিশানের মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। একটা মানুষ জীবনের মূল্যবোধ বজায় রাখতে বলছে, 'জিশানের সঙ্গে লড়ব না।' আর সেই কারণে পাবলিক তাকে 'দুয়ো' দিচ্ছে!

নিউ সিটির মূল্যবোধের বিকৃত আকারটা জিশানকে আরও একবার ব্যথা দিল। মনোহরের করুণ অবস্থা দেখে ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ওর চোখ যে জলে ভরে উঠেছে সেটা জিশান টের পাচ্ছিল, কিন্তু চোখের জল ফেললে চলবে না। টিভি ক্যামেরার চোখ যে-কোনও মুহূর্তে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন স্টেডিয়ামের দর্শকরা, নিউ সিটির আরামের ফ্ল্যাটে টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকরা, দেখবে জিশান কাঁদছে—ফাইটার জিশান কাঁদছে।

জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। তারপর জোর করে রিমিয়ার কথা ভাবতে শুরু করল। কোথায় লাল ড্রেস পরা মেয়েটা? এই স্টেডিয়ামে ঠিক কোন জায়গাটায় বসে আছে ও? জিশানের দু:খ নিশ্চয়ই ওর চেয়ে বেশি নয়! স্টেডিয়ামের গিজগিজে দর্শকের ওপরে সন্ধানী চোখ বোলাতে লাগল। চোখজোড়া যে জ্বালা করছে সেটা ভুলতে চাইল।

হঠাৎই জায়ান্ট স্ক্রিনের দিকে চোখ গেল জিশানের। কারণ, এইমাত্র ও একটা অদ্ভুত অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতে পেয়েছে। মণীশ তখন বলছে, 'সারপ্রাইজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, সারপ্রাইজ! এইমাত্র আমাদের কাছে একটা স্পেশাল ইনফরমেশান এসে পৌঁছেছে। মনোহর সিং পিট ফাইট থেকে ব্যাক আউট করেছে বলে আমাদের মাননীয় মার্শাল শ্রীধর পাট্টা এইমাত্র ওর শাস্তি ঘোষণা করেছেন—খুব সহজ শাস্তি—''হাউন্ড

গেম''। নরম্যালি এই ধরনের ব্যাক আউটের কেসে সিন্ডিকেটের তরফ থেকে ''ডগ স্কোয়াড'' শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সেটাকে ইনজিনিয়াসলি মডিফাই করেছেন আমাদের মাননীয় মার্শাল। এবারে আপনারা তাঁর কথা শুনুন...।'

সঙ্গে-সঙ্গে জায়ান্ট টিভির পরদায় শ্রীধরকে দেখা গেল। তিনি চিবিয়ে-চিবিয়ে নিচু গলায় বলছেন, 'ওকে শাস্তি দেব। আর-একটা খেলা খেলব। ও জিশানের সঙ্গে লড়বে না। তাই শেম, শেম। হাউন্ড গেম। ওই গর্তে নামবে ও একা। সেইসঙ্গে পাঁচটা হাউন্ড যাবে দেখা...।'

ছন্দবাণী শেষ করে অদ্ভুতভাবে হাসলেন শ্রীধর। ওঁর ঠোঁট সামান্য চওড়া হল, চোখের কোণে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। মুখের আর কোনও পেশি নড়ল না। মরা মানুষ হাসতে পারলে বোধহয় এইভাবেই হাসত।

কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে শ্রীধর ঠান্ডা গলায় আবার বললেন, 'শেম, শেম! হাউন্ড গেম।'

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনার হিংস্র রসদ খোঁজা দর্শকের দল শ্রীধরের তালে তাল মিলিয়ে গর্জন করে উঠল, 'শেম, শেম! হাউন্ড গেম।'

শ্রীধরের কথার মধ্যে পদ্যের লুকোনো ছন্দ জিশানের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু ও কেমন যেন শক পেয়ে স্থবির চোখে টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে ছিল।

দর্শকদের উল্লাসের চিৎকার জিশানের ঘোর কাটিয়ে দিল। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল হাউন্ড গেম-এ কী হতে চলেছে। আর ঠিক তখনই মণীশের উত্তেজিত কমেন্ট্রি শোনা গেল।

'...একটা নতুন গেম। গর্তের ভেতরে পাঁচটা হাউন্ডের সঙ্গে লড়বে ফাইটার মনোহর সিং—ডাকাবুকো বর্ন ফাইটার মনোহর সিং...।'

লড়বে? নাকি মরবে? ভাবল জিশান।

ও দেখল, দুটো ক্রেন তাদের কাজ শুরু করেছে। কুচকুচে কালো রঙের পাঁচটা হিংস্র হাউন্ডকে একে-একে গর্তের ভেতরে নামিয়ে দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে কোনও ট্রেনার নেই। একটা নিরস্ত্র মানুষকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য কোনও ট্রেনারের দরকারও নেই।

ওরা গর্তের ভেতরে এলোমেলো ছুটোছুটি করতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টার ছবি সরে গিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে আবার ফিরে এসেছে মনোহর সিং-এর মুখ। এবার ওর অডিয়ো সিস্টেম কাজ করছে। শোনা যাচ্ছে ওর পাগলের মতো চিৎকার।

'...জিশান ভাইয়াসে ম্যায় নহি লড়ুঙ্গা। তুম লোগ ইয়ে কাম মুঝসে নহি করা সকতে। নহি লড়ুঙ্গা ম্যায় মেরে জিগরি দোস্তসে। অওর কোই ভি ফাইটার হমে মনজুর হ্যায়, পর জিশানভাইয়া? কভি নহি...।'

জিশান অবাক হয়ে সহজ-সরল মানুষটাকে দেখছিল। লোকটা ওই গর্তের মধ্যে এক্ষুনি টুকরো-টুকরো হতে চলেছে, অথচ এখনও শুধু একটা কথাই বলে চলেছে : জিশানের সঙ্গে ও লড়বে না।

মনোহরকে এবার সরাসরি দেখা গেল। প্যাভিলিয়নের করিডর ধরে ও স্টেডিয়ামে চলে এসেছে। ওর গায়ে টকটকে লাল রঙের জিম ভেস্ট আর কালো রঙের বারমুডা। পায়ে সাদা-কালো-রুপোলি স্পোর্টস শু। আর কালো মোজা। মনোহরের দুপাশে দুজন সিকিওরিটি গার্ড।

একটা ক্রেনের কেবিন ওদের কাছে এসে থামল। গার্ড দুজন ওকে ঠেলে তুলে দিল কেবিনে। তারপর নিজেরা উঠে পড়ল। ক্রেনের লম্বা হাত কেবিনটাকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গর্তের ওপর। গর্তের ঠিক কেন্দ্রে মনোহরকে নামিয়ে দিয়ে ক্রেন আবার উঠে গেল শূন্যে।

মনোহর অসহায় চোখে কুকুরগুলোর দিকে একবার তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচটা কালো বিদ্যুৎঝলক চাপা গর্জন করে মনোহরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মনোহর চিৎকার করতে লাগল।

শুরুর দিকে ও হাত-পা ছুড়ছিল, শ্রীধর পাট্টার নাম ধরে গালিগালাজ করছিল। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েকসেন্ডের জন্য।

কারণ, তারপরই ও হিংস্র কুকুরগুলোর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কুকুরগুলো এতই ক্ষিপ্র যে, পাঁচটা কুকুরকে দশটা বলে মনে হতে লাগল।

মনোহরের চিৎকার জিশানের কানে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর-একজন মালিক অথবা শিবপদকে ও দেখতে লাগল। মনোহরের কথা জায়ান্ট টিভির স্পিকারেও শোনা যাচ্ছিল। ও তখন জড়ানো গলায় কাটা-কাটাভাবে বলছে, 'জিশান! জিশানভাইয়া! ইন হারামি লোগোঁকো ছোড়না নহি। ইনকো সবক জরুর সিখানা। ছোড়না নহি সালোকো...।'

চিৎকার করতে-করতে মনোহর পড়ে গেল। ওর চিৎকার থেমে গেল। কুকুরগুলোর শরীরে ওর শরীর ঢাকা পড়ে গেল। জন্তুগুলো মনোহরের ভেস্ট, প্যান্ট আর জুতো-মোজা নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ির হরির লুঠের খেলা খেলতে লাগল। তারপর শুরু হল ওর চামড়া আর মাংস নিয়ে খেলা।

জায়ান্ট স্ক্রিন মাঝে-মাঝেই জাম্প কাট করে শ্রীধর পাট্টার মুখ দেখাচ্ছিল। ভাবলেশহীন মুখ। চকচকে চোখ। সরু পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁট। দেখে মোটেই মনে হয় না, তিনি কারও নৃশংস মৃত্যু দেখছেন।

উত্তেজিত জনতা প্রবল চিৎকার করছিল। নানান মন্তব্য করছিল। কেউ-কেউ শূন্যে রঙিন বেলুন ওড়াচ্ছিল। আর কুকুরগুলোর আক্রমণের তালে-তালে জনতার চিৎকার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করছিল।

অসম লড়াইটা শেষ হতে কুড়ি সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

কুকুরগুলো মনোহরকে ছেড়ে যখন সরে দাঁড়াল তখন মনোহরের শরীরের খুব একটা অবশিষ্ট নেই।

জায়ান্ট স্ক্রিনে সেই অবশেষের ক্লোজ-আপ দেখা গেল। অতিথি নেমন্তন্ন খেয়ে চলে গেলে পাতে এঁটোকাঁটা যেরকম পড়ে থাকে মনোহরের এঁটোকাঁটা ঠিক তেমনই গর্তের মাটির ওপরে পড়ে রয়েছে।

জিশানের চোখে জল এসে গেল আবার। গা গুলিয়ে উঠল। মনোহর আর নেই—এই সত্যিটা উপলব্ধি করার জন্য ও মাথার ওপরে কালো আকাশের দিকে তাকাল। ওপরওয়ালা এই মৃত্যুটা কি দেখতে পেয়েছেন? ওই অন্ধকার থেকে?

হা ঈশ্বর!

ওল্ড সিটিতে মালিক যখন ফাইটার কার্তিকের হাতে মারা যায় তখন ঘোলাটে চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে মালিক বিড়বিড় করে বলেছিল, '...তুই ওকে উড়িয়ে দে। ওই কার্তিক সালাকে না উড়িয়ে তুই জল খাবি না। গড প্রমিস।'

জিশান মনে-মনে শপথ নিয়েছিল। এবং কথা রেখেছিল।

এখনও তো এই একটু আগেই মনোহর বলল, '...জিশানভাইয়া! ইন হারামি লোগোঁকো ছোড়না নহি। ইনকো সবক জরুর সিখানা। ছোড়না নহি...।'

না, জিশান ছাড়বে না। এদের উচিত শিক্ষা অবশ্যই দেবে।

শরীরে যেন মন্ত্রশক্তি টের পেল ও। বিদ্যুতের হলকা ছুটে বেড়াতে লাগল ওর শরীরের শিরা-উপশিরায়। ও বিড়বিড় করে বলল, 'মনোহর, সালোকো হম সবক জরুর সিখাউঙ্গা। তু আশমানসে দেখতে রহেনা।'

জিশান এবার উঠে দাঁড়াল। চোয়ালে চোয়াল চেপে নিজের মনেই বলল, 'যদি এই পিট ফাইটে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে লড়তেই হয় তা হলে আমি এই গেমটার নাম দিলাম ''কিল গেম''—খতমের খেলা।'

টিভির বিশাল পরদায় শ্রীধর পাট্টাকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি তখন সুপারগেমস কর্পোরেশনের কঠোর নিয়মকানুনের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখছিলেন। ওঁর কথা বলা শেষ হতেই আবার শুরু হয়ে গেল জিশানের কীর্তির পাঁচালি। তার সঙ্গে চলতে লাগল নানান গেমের মানানসই চলমান ছবি। অর্থাৎ, ব্যাপারস্যাপার একটু আগে দেখানো পিট ফাইটের প্রোমোশনাল ট্রেলারের অ্যাকশান রিপ্লে বলে মনে হতে লাগল। সবমিলিয়ে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন মনোহর সিং-এর ঘটনাটা কখনও ঘটেনি। গর্তের মধ্যে মনোহর সিং নামে কেউ কখনও নামেনি, পাঁচটা কালো হাউন্ডও কেউ কখনও দ্যাখেনি।

জিশানের মাথার ভেতরে গরম তেল টগবগ করে ফুটতে লাগল।

মাইকে মণীশের কথা শোনা যাচ্ছিল। জিশানের ফাইটিং ক্যালিবার সবিস্তারে বুঝিয়ে বলার পর ও বলল, '...এখুনি আপনাদের সামনে আমরা নতুন একজন ফাইটারের নাম ঘোষণা করব। মাননীয় শ্রীধর পাত্রা নিজে সেই নাম আপনাদের জানাবেন। আর-একটু ধৈর্য ধরুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন...।'

গর্তের ভেতর থেকে পাঁচটা কুকুরকেই ক্রেন-কেবিনে তুলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গর্তের মাটি সাফ করে আবার ঠিকঠাকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন দাঁত-নখ লড়াইয়ের জন্য গর্ত আবার তৈরি।

জায়ান্ট স্ক্রিনে শ্রীধর পাত্রার মুখ ভেসে উঠল। ওঁর চোয়াল নড়ছে। কিছু একটা চিবোচ্ছেন যেন। চোখজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। মনে হয়, কোনও কিছুর প্রত্যাশায় একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে।

শ্রীধর হঠাৎই চিৎকার করে বললেন, 'জিশান! বাবু জিশান! কোথায় তুমি? আর যু রেডি?'

অন্য আর-একটা ক্যামেরা তাক করল জিশানের দিকে। জায়ান্ট স্ক্রিনে ইনসেটে দেখা গেল জিশানের মুখ।

ওর ঠোঁট কাঁপছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোয়ালের হাড় শক্ত।

জিশানকে দেখানোমাত্রই জনতা তীব্র গর্জন করে উঠল।

শ্রীধর পাত্রা ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে আমাদের প্রীতি উপহার/জাব্বার সঙ্গে তোমাকে মানাবে চমৎকার। হ্যাঁ, জিশান—এইবার দেখি কেমন করে ওড়াও তোমার নিশান। তোমার সঙ্গে পিট ফাইটে লড়বে জাব্বা, জাব্বা, জাব্বা। ওরে বাব্বা, বাব্বা, বাব্বা!'

শ্রীধরের ছড়া-কাটা ব্যঙ্গের খোঁচা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জায়ান্ট স্ক্রিনে জাব্বার ক্লোজ-আপ ভেসে উঠল। জিশান তাকাল সেই ভয়ংকর মুখের দিকে। শতকরা দুশো ভাগ একটা পোড়খাওয়া খুনির মুখ।

জিশানের মনে পড়ল, পিট ফাইটে জাব্বার হাতে পুনিয়া মারা গেছে—খিদিরপুরের পুনিয়া সরকার। এ ছাড়াও আর-একজন ফাইটারকে জাব্বা খতম করেছে। তার নাম জিশান জানে না।

মোট দুজন জান দিয়েছে। আজ কি সংখ্যাটা দুই থেকে তিনে যাওয়ার পালা?

টিভির পরদায় জাব্বার গুণকীর্তন চলছিল। ওর ওজন, উচ্চতা, বাহুর দৈর্ঘ্য, পায়ের দৈর্ঘ্য, বুকের মাপ ইত্যাদি জানানো হচ্ছিল। আর মাঝে-মাঝেই দেখানো হচ্ছিল ওর ক্লোজ-আপ।

জিশান লোকটাকে দেখছিল। এখনই জাব্বাকে পিট ফাইট চ্যাম্পিয়ন বলা যেতে পারে। দুজন ফাইটার ওর হাতে মারা গেছে। এ ছাড়া আর ক'জন হেরেছে জিশান জানে না। পিট ফাইটের এতগুলো রাউন্ড জাব্বাকে দিয়ে কেন লড়ানো হচ্ছে তাও জিশানের জানা নেই। হয়তো বাড়তি রাউন্ডগুলো সারপ্রাইজ রাউন্ড—কিংবা নিউ সিটির বাসিন্দাদের বাড়তি আনন্দ আর উত্তেজনা জোগান দেওয়ার জন্য।

জাব্বার গায়ের রং বেশ কালো। তবে তা থেকে একটা চকচকে আভা বেরোচ্ছে। মাথাটা বড়—প্রায় ফুটবলের মতো। মাথায় মিলিটারিদের মতো কদমছাঁট চুল। মুখে এত ব্রণ যে, মনে হচ্ছে ব্যাঙের চামড়া গ্রাফটিং করে লাগানো হয়েছে। চোখ গর্তে ঢোকানো কিন্তু জ্বলজ্বল করছে। ভুরু চওড়ায় ছোট, লোমশ। দাড়ি-গোঁফ চেঁছেপুঁছে কামানো। ডানকানের ঠিক পাশ ঘেঁষে একটা বড় আঁচিল। আর বাঁ-চোয়ালের ওপরে ইঞ্চিতিনেক লম্বা একটা কাটা দাগ।

সবমিলিয়ে কাউকে খুন করার ব্যাপারে বেশ সম্ভাবনাময় মুখ।

নীল ইউনিফর্ম পরা ভারী চেহারার মেয়েটি বোধহয় কাছাকাছিই ছিল—হঠাৎ চলে এল জিশানের কাছে।

'জিশান, এবার প্যাভিলিয়ানে চলুন। আপনাকে পিট ফাইট গেমটার জন্যে খুব কুইকলি রেডি হয়ে নিতে হবে। প্লিজ।'

জিশান মেয়েটার সঙ্গে হাঁটা দিল। আর মনে-মনে ভাবল, কী চমৎকার! পিট ফাইট গেম! হাউন্ড গেম! কিল গেম! এই নিউ সিটিতে মৃত্যুও একটা খেলা।

কোনও নিয়মকানুনের বালাই না মেনেই ঘেন্নায় পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেলল জিশান। মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে ভুরু কুঁচকে তাকাল জিশানের দিকে। বিরক্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিশান বলে উঠল, 'এটা থুতু ফেলার গেম, ম্যাডাম—।'

লাউডস্পিকারে তখন মিউজিক বাজানো শুরু হয়েছে। তার ঢং অনেকটা যুদ্ধের বাজনার মতো।

প্যাভিলিয়নে যাওয়ার টানেলে ঢোকার সময় স্টেডিয়ামের গ্যালারির দিকে তাকাল জিশান—রিমিয়ার লাল ড্রেসটা যদি ওর চোখে পড়ে। পড়ল না।

•

গর্তের ভেতরে মুখোমুখি দুজন।

একজন পুরুষ মাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল। তার নির্দেশমতো জিশান আর জাব্বা গর্তের দুটো বিপরীত কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

জিশানের গায়ে কালো রঙের জিম ভেস্ট আর লাল বারমুডা। পায়ে স্পোর্টস শু আর কালো মোজা।

জাব্বার পোশাক ঠিক উলটো : লাল জিম ভেস্ট আর কালো বারমুডা—মনোহরের মতো।

জিশান বুঝল, লড়াইয়ের সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠিকমতো চেনার সুবিধের জন্যই দুজনের পোশাক দুরকম।

জাব্বার শরীরের দিকে তাকিয়ে ওর শক্তি আঁচ করতে চাইছিল জিশান। ওর কালো শরীরের সর্বত্র শক্তিশালী পেশি ঢেউ খেলছে। নি:শব্দ চিৎকারে জানান দিচ্ছে, আমরাই সেরা, আমরাই পিট ফাইটের চ্যাম্পিয়ন।

জাব্বাকে দেখে মনে হচ্ছিল ও মানুষ নয়—কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি। কয়েকমাস আগে ও রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল। কিন্তু একটানা ভয়ংকর ট্রেনিং করার পর ও পাথর হয়ে গেছে।

নিজের শরীরেও পাথর টের পেল জিশান। পাথর, নাকি স্টেইনলেস স্টিল? মাসের-পর-মাস অ্যানালগ জিমের ব্যায়াম, বালির ওপরে দৌড় প্র্যাকটিস, জলের তলায় কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকা যায় তার অভ্যাস, তিরিশ কেজি বালির বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়নো, দড়ি বেয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা-নামা করা, পায়ে ওজন বেঁধে দৌড়নো, লেকে ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এককিলোমিটার পেরোনো—সেসব যাবে কোথায়?

তা হলে জিশান কি পারবে না তিরিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো ওই লোকটার কালো ঘাড়টা মটকে দিতে? শানু, মিনি—ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জিশানকে যে বেঁচে থাকতেই হবে!

ভগবান! ভগবান! তুমি মাথার ওপরে আছ তো?

মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল জিশান। চারপাশের উজ্জ্বল আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তবু চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলো দিয়ে ঘেরা একটা কালো গহ্বর। সেটাই আকাশ।

লাউডস্পিকারে হঠাৎই নতুন একটা গলা শোনা গেল। কোনও মেয়ের মিষ্টি গলা।

'জিশান—জাব্বা—আমি এই গেমের রেফারি। নিয়মের কোনও ভুলচুক হলে আমি তোমাদের ইনস্ট্রাকশন দেব। তোমরা সেটা খেয়াল রাখবে...।'

জিশান জায়ান্ট স্ক্রিনের দিকে তাকাল। অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। মিষ্টি গলায় সে-ই কথা বলছে।

'জিশান—জাব্বা—তোমরা দুজনে ওপরদিকে হাত তুলে দেখাও যে, তোমাদের সঙ্গে কোনও লুকোনো অস্ত্র নেই...।'

জিশান আর জাব্বা রেফারির কথা শুনল। দু-হাত ওপরে তুলল। আঙুলগুলো তালপাতার শিষের মতো ছড়িয়ে দিল।

না, ওদের হাতে কোনও লুকোনো অস্ত্র নেই। তবে যে-অস্ত্র রয়েছে সেটা সরাসরি দেখা যাচ্ছে : ওদের শক্ত শক্তিশালী আঙুল—চামড়া আর মাংস দিয়ে আড়াল করা আঙুলের হাড়—লোহা দিয়ে তৈরি হাড়।

জাব্বা ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল, হাত-পা ঝাঁকাতে লাগল, আর মরা মানুষের চোখে জিশানকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবছিল, এই ছোকরাটাকে মটাস করে ঘাড় ভেঙে মারতে ও ঠিক কতটা সময় নেবে।

লাউডস্পিকারে রেফারির গলা শোনা গেল : 'আর য়ু রেডি, জাব্বা?'

জাব্বা একটা হাত ওপরে তুলল। ওপর-নীচে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল যে, ও রেডি।

সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকের দল পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল।

রেফারি এবার চেঁচিয়ে জিশানকে জিগ্যেস করল, 'আর য়ু রেডি, জিশান?'

জিশান ডানহাতটা তুলে ধরল শূন্যে। মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, রেডি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে স্টেডিয়ামে আবার তুমুল চিৎকার।

রেফারি বলল, 'ওয়ান...টু...থ্রি...স্টার্ট।'

লাউডস্পিকারে শোনা গেল কানফাটানো রক মিউজিকের ঝলক।

জিশান আর জাব্বার পিট ফাইট শুরু হল।

ওরা দুজন কিছুক্ষণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দুটো হাত সামনের দিকে খানিকটা বাড়িয়ে গোল হয়ে পাক খেতে লাগল।

জাব্বা অদ্ভুত এক প্রশান্ত চোখে জিশানকে দেখছিল, আর মাঝে-মাঝেই দু-হাতের তালু ঘষছিল। কী এক কৌশলে ও যেন ওর জ্বলজ্বলে চোখের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে।

বৃত্তাকার পথে ওরা দুজন পাক খাচ্ছিল আর অদৃশ্য এক টানে ওদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব কমছিল।

পনেরোসেকেন্ডের মধ্যেই দূরত্বটা ছ'ফুটে এসে দাঁড়াল। তখনই জাব্বা হিংস্রভাবে চাপা গর্জন করে বলে উঠল, 'খতম!' এবং জিশানের দিকে থুতু ছেটাল।

জিশান কোনও পালটা জবাব দিল না। শরীরের প্রতিটি শক্তিকণা ও সঞ্চয় করে রাখতে চায় লড়াইয়ের জন্য। ও মনে-মনে মিনির কথা ভাবল। ভাবল শানুর কথা। যদি এই পিট ফাইটে জাব্বার হাতে ও শেষ হয়ে যায় তা হলে আর কোনওদিনও মিনি আর শানুর সঙ্গে ওর দেখা হবে না।

জিশানের হঠাৎ মনে হল, জাব্বার সঙ্গে ও নয়—মিনি আর শানু লড়ছে। আর ও বাইরে থেকে দেখছে। যদি ওরা জাব্বার হাতে খতম হয়ে যায় তা হলে জিশানের সঙ্গে ওদের আর কখনও দেখা হবে না।

দুটো ব্যাপার জিশানের কাছে একই বলে মনে হল। ওর মনে হল, মিনি আর শানুকে জাব্বার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ওকে লড়তে হবে। প্রাণপণ লড়তে হবে।

জিশানের নাকে গন্ধ আসছিল। মাটির গন্ধ, কুকুরের গন্ধ, রক্তের আঁশটে গন্ধ। হয়তো ওর আর জাব্বার লড়াই শেষ হওয়ার পর এই গর্তে মানুষের গন্ধও পাওয়া যাবে।

দর্শকের দল খ্যাপা নেকড়ের মতো চিৎকার করছিল। শূন্যে হাত-পা ছুড়ছিল। ওরা রক্ত দেখতে চাইছিল। হাতাহাতি শুরু হওয়ার এক-একসেকেন্ড দেরি ওদের কাছে এক-একঘণ্টা বলে মনে হচ্ছিল। ওদের ধৈর্যের সুতো ছিঁড়ে গেছে অনেকক্ষণ।

নানান সুরে গালাগালের টুকরো ছিটকে আসছিল জিশানদের দিকে। সেইসঙ্গে মাইকের ধারাবিবরণী। হিংসার চাহিদা যে এত তীব্র হতে পারে সেটা জিশান আগে কখনও ভাবেনি। ওর কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। মনে হচ্ছিল, শরীরের কাঠামোয় বসানো কতকগুলো জ্যান্ত খুলি রক্তের পিপাসায় পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

জিশান আর জাব্বার বৃত্ত এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এত ছোট যে, ওরা হাত বাড়ালেই একে অপরকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবে।

জাব্বা কথা বলছিল। প্রায় ফিসফিস করে বিড়বিড় করছিল। কথাগুলো শুনতে না পেলেও জিশান অনুমান করতে পারছিল। জাব্বা খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে।

হঠাৎই জাব্বা চোখের ইশারা করল। জিশানের বাঁ-পাশ দিয়ে যেন জিশানের পিছনে কারও দিকে তাকাল। বলল, 'দ্যাখ, কে এসেছে—।'

জিশান বুঝতে পারছিল এটা বহু পুরোনো লোকঠকানো প্যাঁচ। কিন্তু সেই মুহূর্তে কী যে হল! ও মাত্র পাঁচ কি দশ ডিগ্রি মাথাটা ঘুরিয়ে ছিল। তাও এক লহমার জন্য। তাতেই গন্ডগোল হয়ে গেল। জাব্বা ওর নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে গেল।

জাব্বার লাথিটা সপাটে এসে পড়ল জিশানের বুকে—ডানদিকে। জিশান ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা পাক খেয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে শরীরটাকে তুলে ধরল। ততক্ষণে জাব্বা ওর আরও কাছে চলে এসেছে। ফুটবল খেলার ফ্রি কিক শট নেওয়ার মতো পরপর তিনটে লাথি কষাল জিশানের মাথায় আর পাঁজরে।

জিশানের মনে হল বুকের ভেতরে পাঁজরের হাড়-টার বা কিছু একটা বোধহয় ভেঙে গেল। ছুঁচ ফোটানো ব্যথা টের পেল ও। তবু কোনওরকমে মাটিতে ভর দিয়ে মাতালের মতো হাঁচরপাঁচর করে টলতে-টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এই ওর লড়াইয়ের নমুনা! বাঁচা-মরার লড়াই লড়তে গিয়ে বস্তাপচা প্যাঁচে মাত হয়ে যাচ্ছে!

'শাবাশ, জাব্বা! শাবাশ!' একজন হিংস্র দর্শকের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।

'অ্যাই, জিশান! তোর জুতোর ফিতে খুলে গেছে. তাকা—পায়ের দিকে তাকা, সালা! মাথামোটা আলুরদম কোথাকার!' আর-একজন দর্শক। বোকা-বোকা লড়াই লড়ার জন্য জিশানকে ব্যঙ্গ করছে।

জিশান আন্দাজ করল, ওর আর জাব্বার লড়াই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাজি ধরাধরি চলছে। আর সুপারগেমস কর্পোরেশন নিশ্চয়ই এ থেকে ভালো পয়সা লুটছে। এক ঢিলে দু-পাখি—বিনোদন আর ফায়দা।

জাব্বা কুঁজো হয়ে দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মরা মাছের চোখ জিশানের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে ও বলল, 'বাঁচতে চাস তো এই গাড্ডা থেকে ফুটে যা। নইলে পাঁচমিনিটে তোকে টুটা-ফুটা সও টুকরা করে দেব। দাঁতগুলো গোটা-গোটা হাথে দিয়ে দেব। সালা...সুয়ার কা বাচ্চা!'

জিশানের মাথা ঘুরছিল। ও যেন জায়ান্টস হুইলে পাক খাচ্ছিল। কপালের পাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। নাক বেয়ে নেমে এসে ফোঁটা-ফোঁটা করে ঝরে পড়ছিল ঠোঁটের ওপর। ঝাপসা চোখে দেখছিল জাব্বা ওর কাছে এগিয়ে আসছে।

হাতের পিঠ দিয়ে রক্ত মুছে নিল। মনে-মনে ভাবল, এই গর্ত থেকে ওর বোধহয় আর বেরোনো হবে না। গর্ত নয়, আসলে একটা কবরের মধ্যে ও লড়াই করছে—জিশান পালচৌধুরীর কবর।

দলাপাকানো কাগজের বল ছিটকে আসছিল গর্তের ভেতরে। সেইসঙ্গে কিছু পেপার কাপ আর প্লাস্টিকের হালকা কৌটো। না, নিউ সিটির খেলায় এ ধরনের 'মিসাইল' ছোড়া বারণ নয়। কারণ, সুপারগেমস কর্পোরেশনের কর্তাদের মতে এগুলো উত্তেজনাময় খেলার একটা অঙ্গ। তাই অঙ্গহানি যাতে না হয় তার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে দর্শকরা।

হঠাৎই লম্বা মোটা দড়ির মতো কী যেন একটা উড়ে এসে পড়ল গর্তের ভেতরে। জিনিসটা এসে পড়েছে জিশান আর জাব্বার কাছ থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট দূরে। কিন্তু মেটাল ল্যাম্পের চোখধাঁধানো সাদা ঝকঝকে আলোর কৃপায় বস্তুটাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

প্রায় সাতফুট লম্বা একটা কালচে রঙের সাপ। নরম মাটিতে ছিটকে এসে পড়ার পর স্থির হয়ে রয়েছে।

সাপটা বোধহয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নড়াচড়া বন্ধ রেখেছিল। জিশান আর জাব্বারও তখন একই অবস্থা। কিন্তু চার-পাঁচসেকেন্ড পরেই সাপটা নড়ে উঠল। কিলবিল করে চলতে শুরু করল। তখন জিশান দুরকম শত্রুর ওপরে সতর্ক চোখ রেখে পায়ে-পায়ে সরতে লাগল। লক্ষ করল, জাব্বার নজরও দুই শত্রুর দিকে।

সাপটা হঠাৎ কোথা থেকে এল? কেন এল? সাপটা কি বিষধর?

জিশানের এইসব প্রশ্নের উত্তর দিল মণীশের ধারাবিবরণী।

'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! এক্সাইটিং! এক্সাইটিং! এক্সাইটিং! পিটের মধ্যে উড়ে গিয়ে পড়েছে জ্যান্ত আফ্রিকান ব্ল্যাক মাম্বা। এবার দুই ফাইটারের সঙ্গে চলবে জ্যান্ত সাপের কিলবিল। তবে ভয়ের কিছু নেই। ব্ল্যাক মাম্বা সাংঘাতিক বিষধর সাপ হলেও এই সাপটার বিষ দুয়ে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু ওর ধারালো বিষদাঁত জোড়া ইনট্যাক্ট রয়েছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট, এই সাপটা যদি জিশান কিংবা জাব্বাকে কামড় বসায় তা হলে সেই বাইটটা পেইনফুল হবে, কিন্তু ডেডলি হবে না। জিশান আর জাব্বা—তোমাদের বলছি—এই সাপটার বিষ নেই বটে, কিন্তু তবু ওটা সাপ। সাপটা এখন তোমাদের লড়াইয়ের প্যাকেজে ঢুকে পড়েছে। সো, কাম অন ফোকস, লেটস নাউ ওয়াচ দিস সুপার এক্সাইটিং ভেনোমাস গেম। হো—য়া—!'

মণীশের উল্লাসের চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খ্যাপা দর্শকের দল ক্ষিপ্ত গর্জন করে উঠল।

কোনও গেমকেই সুপারগেমস কর্পোরেশন কখনও একঘেয়ে হতে দেয় না। তাই এইসব সারপ্রাইজ হচ্ছে ওদের আস্তিনের তাস। নতুন-নতুন ধরনের গেম আর নতুন-নতুন ধরনের সারপ্রাইজ ডিজাইন করার জন্য সুপারগেমস কর্পোরেশনের কোর ডিজাইনার গ্রুপ রয়েছে। সেই গ্রুপের হাই আই-কিউ এক্সিকিউটিভরাই হচ্ছে গেম ডিজাইনের থিংক ট্যাংক। এই খেলায় সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর হিসেবে ওরা একটা নন-ভেনোমাস ব্ল্যাক মাম্বা অ্যাড করার কথা ভেবেছে।

ব্ল্যাক মাম্বাটা গর্তের কোণ ঘেঁষে সড়সড় করে চলে বেড়াচ্ছে। হয়তো জোরালো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে বলে সরীসৃপটা অন্ধকার কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লাউডস্পিকারের এবার শোনা গেল রেফারির গলা : 'জিশান! জাব্বা! ওই সাপটা তোমাদের। তোমরা ওটা নিয়ে যা খুশি করতে পারো। যেমন তোমরা তোমাদের রাইভালকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো। পিট ফাইটে কোনও রুল নেই। ফ্রি ফর অল। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। সো ক্যারি অন। আর তোমাদের তো আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পিট ফাইটের রাউন্ড একটাই—এবং তার কোনও টাইম লিমিট নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাট আ স্ট্রেচ লড়াই—একটাই রাউন্ড...।'

গর্তের ঠিক মাঝখানে জিশান আর জাব্বার আবার সংঘর্ষ হল।

জাব্বার ঘুসি তো নয়, যেন দু-দুটো কালো লোহার বল বারবার আছড়ে পড়ল জিশানের মাথার দুপাশে। গর্তটা ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে লাগল। গর্তের দেওয়াল যেন এখুনি ধসে পড়বে, জিশানকে কবর দিয়ে দেবে মাটির তলায়। ওকে একটানে শুষে নেবে অন্ধকার পাতালে।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছিল। সেই অবস্থাতেই মাথা ঝাঁকাল এপাশ-ওপাশ।

সাপটা কোথায়? কোথায় গেল ব্ল্যাক মাম্বাটা? ওটা শানুকে ছোবল মারবে না তো? শানু কোথায়? ওকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায় আমার ছোট্ট শানু? ওকে দেখার জন্যে আমাকে বাঁচতে হবে...।

সেই তীব্র ইচ্ছেটাই জিশানের ডানহাত মুঠো করে একটা লোহার ঘুসি তৈরি করে দিল। সেটা ও সজোরে চালাল ওপরদিকে। অনেকটা আন্দাজে ও ঘুসিটা চালালেও সেটা লাগল গিয়ে জাব্বার তলপেটে।

জাব্বার মুখ দিয়ে 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল। ও কুঁজো হয়ে গেল। এলোমেলো পা ফেলে খানিকটা পিছিয়ে গেল।

পাবলিক কানফাটানো গর্জন করে উঠল।

হঠাৎই জিশান দেখল, কালো সাপটা ওর কাছে এসে গেছে। ওটার গা চকচক করছে। যেন সারা গায়ে ভেসলিন মেখে এসেছে।

সাপটা ছোবল মারার আগেই জিশান ছোবল মারল। সাপটাকে এক ছোবলে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল জাব্বার দিকে। সাপটা ওর বুকের ওপর গিয়ে পড়ল। চাবুক মারার মতো শব্দ হল। জাব্বা খপ করে সাপটার হিলহিলে শরীর চেপে ধরল। সাপটা চকিতে ছোবল মারল জাব্বার কাঁধে।

পলকের জন্য চোখ কুঁচকে গেলেও জাব্বা সাপটার দিকে ফিরেও তাকাল না। রোবটের মতো যান্ত্রিকভাবে ওটাকে সজোরে ছুড়ে দিল গর্তের এবড়োখেবড়ো দেওয়ালে।

সাপটা জাব্বার কালো চামড়া ফুটো করে দিয়েছিল। ওর কাঁধ থেকে সরু রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ছিল।

জিশান বিদ্যুৎঝলকের মতো লাথি চালাল।

লাথিটা ও চালিয়েছিল জাব্বার দু-পায়ের জোড় লক্ষ্য করে। আঘাতটা এড়ানোর জন্য জাব্বা ওর কোমরটাকে একঝটকায় পিছিয়ে নিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে। ফলে লাথিটা যে-বৃত্তচাপ তৈরি করছিল সেটা থামল গিয়ে জাব্বার চোয়ালে।

জাব্বার শরীর হয়তো ইস্পাত দিয়ে তৈরি, কিন্তু জিশানের ইস্পাতও তো ফেলনা নয়! সুতরাং সংঘর্ষটা মেগাটন লেভেলের শোনাল। জাব্বার একটা দাঁত ছিটকে পড়ল মাটিতে। জাব্বা পিছনদিকে একটা ঝটকা খেয়েই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

জিশান ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপরে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে দু-হাত মুঠো করে পাগলের মতো রদ্দা মেরে চলল জাব্বার কালো মোটা ঘাড়ে। যেভাবেই হোক, শত্রুকে ও মাটিতে পেড়ে ফেলতে চায়।

হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই জিশান হঠাৎ একটু পিছিয়ে এল। একটা জোরালো লাথি কষানোর জন্য ডান পা-কে তৈরি করল। কিন্তু লাথিটা শুরু করার আগেই হাঁটুগেড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকা জাব্বা ডানহাতে ছোবল মারল জিশানের দু-পায়ের ফাঁকে। ওর সবচেয়ে দুর্বল প্রত্যঙ্গ আঁকড়ে ধরল। তারপর ইস্পাতের আঙুল দিয়ে পাথর গুঁড়ো করার শক্তিতে চাপ বাড়িয়ে চলল।

জাব্বার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল জয়ের গর্জন। আর জিশান যন্ত্রণায় এমন এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল যে, সে-চিৎকার শুনে ও নিজেও ভয় পেয়ে গেল।

গ্যালারির দর্শক একসঙ্গে গর্জে উঠল। গ্যালারি থেকে পঞ্চাশ-ষাটটা রঙিন বেলুন উড়ে গেল আকাশে।

জিশান প্রাণ বাঁচাতে জাব্বার মাথায় প্রাণপণে ঘুসি-বৃষ্টি করতে লাগল। তারপর দু-হাতে ওর গলা টিপতে চাইল। কিন্তু ঘাড়ের দিক থেকে গলা টেপার চেষ্টা করায় ও তেমন জুতসই বাঁধন পাচ্ছিল না। এদিকে যন্ত্রণার তীব্র স্রোত দু-পায়ের ফাঁক থেকে শুরু হয়ে কোমর-বুক বেয়ে জিশানের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছিল। সেখান থেকে ফেটে পড়ছিল যন্ত্রণার তীব্র চিৎকারে। সেই চিৎকার অ্যানটেনা থেকে বেরিয়ে আসা অদৃশ্য তরঙ্গের মতো আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। জিশানের মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সেই অবস্থাতেই জিশান টের পেল জাব্বা ওর শর্টস খামচে ধরা মুঠোটাকে ধীরে-ধীরে কাছে টানছে—ওর মুখের কাছে। ও কি মুঠোর বদলে এবার ওখানে কামড় বসাবে নাকি? একটা ভয়ের স্রোত মিশে গেল যন্ত্রণার স্রোতের সঙ্গে। বাঁচার ইচ্ছেটা জিশানের ভেতরে প্রবল হয়ে উঠল। ওর মনে পড়ল মালিকের কথা, মনোহর সিং-এর কথা। তারপরে মনে হল, জাব্বা ওর দুর্বল প্রত্যঙ্গ নয়, শানুর কচি গলাটা বজ্রমুঠিতে আঁকড়ে ধরেছে। এখন সেই নরম গলায় হিংস্র কামড় বসাতে চাইছে।

শানু আর মিনির ছবি পালা করে ঝলকে যেতে লাগল ওর চোখের সামনে।

•

সেই রাতটার কথা জিশান কোনওদিনও ভুলবে না।

যেমন ঝড়, তেমন বৃষ্টি। ঘরের ভেতর থেকে ঝড়-বৃষ্টির দাপট শুনলে মনে হয় প্রকৃতির দাঙ্গা চলছে। ঝোড়ো বাতাস পাগলের মতো ছুটে চলেছে। এ-রাস্তা সে-রাস্তায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে-মাঝেই বাজ পড়ছে।

সকাল থেকে শানুর জ্বর ছিল। তখন কতই-বা বয়েস বাচ্চাটার? বড়জোর মাসদেড়েক হবে। কিছুতেই খেতে চাইছে না। চোখ-মুখ লালচে। গাল দুটো ফোলা-ফোলা লাগছে। মিনি অস্থির হয়ে উঠেছে। কান্নাকাটি করছে।

ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে দিয়েছিল জিশান। সেটা খেয়ে জ্বরটা একটু কমেছিল। কিন্তু বিকেলের পর আবার বাড়তে শুরু করল।

যখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হল তখন মিনি জিশানকে বারবার বলতে লাগল, 'চলো, ওকে হসপিটালে নিয়ে চলো। এরপর আরও দেরি করলে আমার শানু আর বাঁচবে না...আর বাঁচবে না...।' কথা বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মিনি।

জিশান যে একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল তার কারণ তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া সন্ধের পর মিনিকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনোটা এ-শহরে মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ও ভাবছিল যদি আজকের রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কাল সকালে...।

কিন্তু শানুর জ্বর ক্রমশ বাড়তেই লাগল। বাইরের পাগল করা ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিনিও পাগল হয়ে উঠল। আর জিশান দোটানায় পড়ে অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ওরা যখন রাস্তায় বেরোল তখন প্রায় সাতটা। দুটো ছাতা নিয়ে ঘুমন্ত শানুকে পলিথিনে জড়িয়ে মাথা হেঁট করে ওরা সামনে এগোচ্ছিল। আর ট্যাক্সির খোঁজে উদভ্রান্তের মতো এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অনেকটা পথ পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভরা রাস্তার বেশিরভাগটাই পুকুরের চেহারা নিয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে কয়েকটা গাড়ি লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলেছে। ওদের হেডলাইটের আলো সেই তালে-তালে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

না, একটাও খালি ট্যাক্সি চোখে পড়ল না।

তিনটে ছেলে কাকভেজা হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের একজনের হাতে টর্চলাইট। জিশানদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা থমকে দাঁড়াল। টর্চের আলো ছুড়ে দিল মিনির মুখে। একজন বলে উঠল, 'চলে এসো, মা-মণি। দুজনে মিলে একটু ঝড় তুলি—তারপর বৃষ্টি।' বলেই খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল।

আর-একজন জড়ানো গলায় গান গেয়ে উঠল, 'এই রাত তোমার আমার...।'

তৃতীয়জন চাপা গলায় দুই সঙ্গীকে ধমক দিল, 'কী করছিস কী! দেখছিস না, কোলে একটা ছোট বাচ্চা রয়েছে! চল, চল—।'

সে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বাকি দুজনকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

যেতে-যেতে একজন একটা হাত ওপরে তুলে মাতালের গলায় বলল, 'সরি, হাজব্যান্ড। সরি...সরি...গুড বাই...।'

জিশান মিনিকে জড়িয়ে ধরে ছিল। সেইজন্যই টের পেল মিনি থরথর করে কাঁপছে। একইসঙ্গে ডুকরে কাঁদছে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে ওর চাপা কান্না ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না।

'মিনি, মিনি—' ওকে আশ্বাস দিতে গাঢ় গলায় ডাকল জিশান, 'ভয় পেয়ো না। এখুনি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব। জানোই তো, এ-শহরটা কেমন বাজে হয়ে গেছে। এটার দিকে আর কেউ তাকায় না। এটার কথা কেউ আর ভাবে না। সবাই জানে শহরটা একেবারে গোল্লায় গেছে।'

জিশান অস্থির হয়ে পড়ছিল। ছাতা মাথায় দিয়েও বৃষ্টির দাপট আটকানো যাচ্ছে না। শানুর হয়তো আরও ঠান্ডা লাগবে, জ্বর বাড়বে, এখুনি ও হয়তো জেগে উঠবে।

ওদের পাশ দিয়ে দুটো গাড়ি পরপর চলে গেল। জিশান রাইড পাওয়ার আশায় প্রবলভাবে হাত নেড়েছিল কিন্তু একটা গাড়িও দাঁড়াল না।

জিশান রাস্তা বরাবর নজর চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিল আর কোনও গাড়ি আসছে কি না। কিন্তু বৃষ্টির চিক ভেদ করে বেশিদূর নজর গেল না। তবে হেডলাইট জ্বেলে কোনও গাড়ি যদি এগিয়ে আসত তা হলে তার হলদে আভা আর বৃষ্টির ফোঁটার ঝিকমিক নিশ্চয়ই জিশানের চোখে পড়ত।

ঝোড়ো হাওয়ার বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল। কড়কড় করে দূরে কোথাও বাজ পড়ল। নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেল। তার পরেই কানফাটানো শব্দ। জিশান উদভ্রান্তের মতো এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। একটা

ট্যাক্সি...ইস, একটা খালি ট্যাক্সি।

রাস্তার দুপাশের ফুটপাথ ঘেঁষে বেশ কয়েকটা ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর মাথায় পলিথিনের চাল—তার ওপরে ইটের টুকরো, কাঠের তক্তা আর বাঁশ চাপা দেওয়া। কয়েকটার পলিথিনের চালের কোনা হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে, অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে : ফটফট, ফটফট। রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো দুটো বিশাল গাছ। গাছদুটো ঝোড়ো বাতাসে একটুও নড়ছে না। কারণ, গাছদুটোয় একটাও পাতা নেই। ধুলো-ময়লায় নোংরা এই শহরের বাতাস এতটাই নষ্ট প্রকৃতির যে, গাছের পাতা ক'দিন বাদেই ডাল থেকে খসে পড়ে।

আরও মিনিট-পনেরো-কুড়ি কেটে যাওয়ার পর মিনি কান্না-কান্না গলায় জিশানকে বলল, 'চলো, বাড়ি ফিরে যাই। রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিই। তারপর কাল সকালে...।'

মিনির কথা শেষ হওয়ার আগেই হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসা একটা গাড়ি জিশানের নজরে পড়ল। গাড়িটা ট্যাক্সি কি না কে জানে! উত্তাল সাগরে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো জিশান একছুটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। পাগলের মতো ওর ছাতা আর হাত নাড়তে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, এ-গাড়িটা যদি না দাঁড়ায়, ওদের না সাহায্য করে, তা হলে শানুকে আর বাঁচানো যাবে না।

গাড়িটা জিশানের কাছে এসে দাঁড়াল। জলে ভেজা জিশান হেডলাইটের আলোয় মাখামাখি। ঠিকরে পড়া আলোয় ও বুঝতে পারল গাড়িটা ট্যাক্সি নয়—করসিকা-এইট—প্রাইভেট কার আর জিপের মাঝামাঝি একটা মডেল।

গাড়ির বনেট রং চটা, তোবড়ানো। বাকি চেহারাটাও তার সঙ্গে মানানসই। গাড়ির ভেতরে কতকগুলো ছায়া-ছায়া মানুষ। তাদেরই একজন নেমে পড়ল জল-কাদায় মাখামাখি রাস্তায়। হেডলাইটের আলোর পিছনে লোকটার অন্ধকার বিশাল চেহারা জিশানের চোখে পড়ল।



'কী ব্যাপার? গাড়ি আটকালে কেন?' ভরাট গলা। শুনেই মনে হয়, এই মানুষটা সবসময় আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

'আমার...আমার বাচ্চাটার খুব জ্বর...' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল জিশান, 'এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে ছেলেটা মরে যাবে...' কথা বলতে-বলতে জিশান কেঁদে ফেলল। ব্যস্তভাবে হাত নেড়ে মিনিকে কাছে

ডাকল। তারপর কী মনে করে ও হাতজোড় করে বলে উঠল, 'আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান, স্যার। আমাদের একটু হাসপাতাল পৌঁছে দিন। প্লিজ। নইলে ছেলেটা মরে যাবে। আমাদের বাঁচান, স্যার...।'

লোকটা গাড়ির ভেতরে কাকে যেন ইশারা করল। অমনি গাড়ির হেডলাইট নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। জোরালো আলো ছিটকে এসে পড়ল জিশানের অসহায় মুখে, মিনির মুখে। মিনির মুখে আলোটা দু-চার সেকেন্ড বেশি রইল। তারপর ছায়ামানুষটা বলল, 'ভয় নেই—আমরা পুলিশের লোক। এসো, গাড়িতে ওঠো। তোমাদের হাসপাতালে নামিয়ে দিচ্ছি—।'

জিশান আর মিনি প্রায় দৌড়ে চলে এল গাড়ির কাছে। জিশান আবেগ জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাংক য়ু, স্যার...থ্যাংক য়ু...।'

লোকটা পিছনের দরজা খুলে ধরল। কোনওরকমে ছাতা দুটো বন্ধ করে পলিথিনে জড়ানো শানুকে সামলে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। প্রথমে মিনি, তারপর জিশান। আর সবশেষে উঠে পড়ল লোকটা।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। শানু কেঁপে উঠল মিনির হাতে। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

হেডলাইট জ্বলে উঠল। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি আর ভাঙাচোরা রাস্তা।

জিশানের পাশে বসা লোকটা জিশানকে জিগ্যেস করল, 'কোন হসপিটাল?'

'যেখানে হোক। আমার বাচ্চাটা যেন বেঁচে যায়, স্যার।'

'ঠিক আছে। ''সোলাস মেডিকেল কলেজ'' চলো।' ড্রাইভারকে লক্ষ করে শেষ কথাটা বলল লোকটা।

মিনি লক্ষ করল, গাড়ির সামনের সিটে দুজন—তার মধ্যে একজন গাড়িটা চালাচ্ছে। আর পিছনের সিটে ওরা তিনজন।

এই প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এই তিনজন পুলিশের লোক কোন কাজে বেরিয়েছে?

মিনি কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছিল। শানুকে আরও কাছে টেনে নিয়ে দোলা দিয়ে ও ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করল। হাতের পিঠ দিয়ে বাচ্চাটার জ্বর দেখল। ভয়ে ওর প্রাণটা বারবার কেঁদে উঠছিল। শানু ওদের সঙ্গে থাকবে তো? নাকি আকাশে একটা তারা কম আছে? সেখানে শানুকে খুব দরকার?

শানুকে একটু শান্ত করার পর মিনি জিশানের বাহু আঁকড়ে ধরল। ওকে কাছে টানল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কীরকম বিচ্ছিরি একটা গন্ধ...।'

জিশান ওর ঊরুতে চাপ দিয়ে ওকে চুপ করতে ইশারা করল। কারণ, গন্ধটা ও চিনতে পেরেছে।

মদের গন্ধ।

জিশানের মনে একটা আশঙ্কা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু শানুকে বাঁচানোর মরিয়া দায় সেই আশঙ্কার গলা টিপে ধরছিল। মিনির ঊরু থেকে ও হাতটা সরাল না। ওর মনে হল, মিনিকে ছুঁয়ে থাকলে ওর মনে উথলে ওঠা ভয়টা কমে যাবে।

গাড়ি ঝাঁকুনি তুলে ছুটে যাচ্ছিল। ঝমঝম বৃষ্টি। নির্জন রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কোথাও আলো আছে, কোথাও নেই।

জিশানের পাশে বসে থাকা লোকটা হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'কোথায় থাকো?'

জিশান মদের গন্ধের ঝাপটা টের পেল। লোকটার দিকে ফিরে তাকাল। বৃষ্টির ফোঁটা থেকে ঠিকরে আসা হেডলাইটের আলোর আভায় লোকটার আবছা মুখ দেখা যাচ্ছে।

জোরে শ্বাস টেনে জিশান বলল, 'মালির বাগানের বস্তিতে। যেখানে গাড়িতে উঠলাম তার কাছেই...।'

লোকটা আর কোনও কথা বলল না।

গাড়িটা এ-রাস্তা সে-রাস্তা ধরে বাঁক নিয়ে ছুটে চলল। কতকগুলো রাস্তায় এমন জল দাঁড়িয়ে গেছে যে, গাড়িটাকে জল ঠেলে এগোতে হচ্ছিল। ড্রাইভার মাঝে-মাঝেই বিরক্তির শব্দ করছিল।

মিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। ভাবছিল, সোলাস মেডিকেল কলেজ আর কতদূর। আর কতদূর? জিশানকে সে-কথা একবার জিগ্যেসও করল। জিশান চাপা গলায় বলল যে, সোলাস মেডিকেল কলেজ ও চেনে না।

একটু পরেই গাড়িটা একটা মাঝারি রাস্তায় ঢুকে পড়ল। রাস্তাটা নির্জন। দু-ধারে বড়-বড় ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ি। ফুটপাথে বেশ কয়েকটা রুগ্ন গাছ। তার নীচে দু-চারটে ঝুপড়ি।

রাস্তাটায় তেমন আলো নেই। গাড়ির হেডলাইটের আলোই একমাত্র ভরসা। সেই আলো জমে থাকা বৃষ্টির জলে নাচছে।

রাস্তার শেষে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় বিল্ডিং—চারতলা কি পাঁচতলা হবে। তার গায়ে একটা গ্লো-সাইন জিশানের নজরে পড়ল। নীল আর লাল আলোকরেখা দিয়ে লেখা 'সোলাস মেডিকেল কলেজ'। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা অক্ষর অন্ধকার—দাঁতের পাটি থেকে উধাও হয়ে যাওয়া দাঁতের মতো সেই রঙিন আলোর ভাঙাচোরা ছায়া রাস্তায় জমে থাকা জলে কাঁপছে।

মাঝারি রাস্তাটা শেষ হল সোলাস মেডিকেল কলেজে গিয়ে। জিশান দেখল, বিল্ডিং-এর দুপাশ দিয়ে দুটো সরু গলি অন্ধকারে ঢুকে গেছে।

গাড়িতে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে প্রায় কোনও কথাই বলেনি। শুধু জিশানের পাশে বসা লোকটা দু-চারবার ছোট্ট করে ড্রাইভারকে কী যেন বলেছে। সেইসব কথার মানে বুঝতে পারেনি জিশান। হয়তো সাদা পোশাকের পুলিশের কোনও সাংকেতিক ভাষা হবে।

হসপিটাল বিল্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে জিশানের একটু অবাক লাগছিল। কারণ, বিল্ডিং-এর নানান তলার কয়েকটা জানলায় খাপছাড়াভাবে আলো জ্বলছিল। বাকি সব জানলা অন্ধকার।

এখন রাত বেশি হয়নি। হাসপাতালের ব্যস্ততা এসময় কিছু কম হওয়া উচিত নয়। তা হলে...।

জিশান একটু অস্থির হয়ে পড়ছিল। মিনিকে ছুঁয়ে থাকায় ওর অস্থিরতাও টের পাচ্ছিল। ওদের করসিকা-এইট গাড়িটা গতি কমিয়ে হসপিটালের গাড়িবারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

কোনও কথা না বলে সামনের সিটে বসা দুজন দুপাশের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

জিশানের পাশের লোকটা জিশানকে বলল, 'নেমে পড়ো। আমরা এসে গেছি।' বলে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

জিশান নীচু গলায় মিনিকে বলল, 'এসো—।' তারপর নিজে নেমে দাঁড়াল।

শানুকে ভালো করে মুড়ে জিশানের হাতে দিল মিনি। সাবধানে গাড়ি থেকে নামল।

গাড়ির দরজাগুলো শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। জিশানের পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে চাপ দিল : 'চলো—।'

ওরা সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওদের পা ফেলার ছপছপ শব্দ বেশ জোরে শোনা গেল। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় জিশানের হঠাৎ শীত-শীত করে উঠল।

ওরা ভেতরে ঢোকার পর কেউ একজন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজের মুখে কেউ যেন রুমাল চেপে ধরল।

ভেতরের দৃশ্যটা জিশান আর মিনিকে অবাক করে দিল। এতটাই যে, ওরা হতবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারপাশটা দেখতে লাগল। একইসঙ্গে দেখতে লাগল তিনটে মানুষকেও—যারা এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে দেবতা হয়ে ওদের উপকার করেছে।

যে-ঘরটায় ওরা ঢুকেছে সেটা হসপিটালের রিসেপশান লাউঞ্জ। তবে এককালে ছিল—এখন আর নয়।

স্পেসটা মাপে বিশাল। দেখেই বোঝা যায়, বহুবছর ধরে অবহেলায় পরিত্যক্ত। দেওয়ালে তিনটে জানলা, দুটো দরজা। সবগুলোই বন্ধ। সদর দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে একটা করিডর ভেতর দিকে চলে গেছে।

সারাটা ঘর ধুলোয় ধুলোময়। চেয়ার, টেবিল, সোফা, রিসেপশান কাউন্টার সব এলোমেলোভাবে ঘরের নানান দেওয়াল ঘেঁষে ডাঁই করা। তার ওপরে কয়েকটা চেয়ার আর সোফা উলটো করে চাপানো। কয়েকটা

আসবাবপত্র সাদা পলিথিন শিট দিয়ে ঢাকা। শিটের ওপরে ধুলোর পুরু আস্তরণ।

ঘরের দেওয়ালে অন্তত গোটাদশেক টুইন টিউবলাইটের ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ফিটিং। তাই পরিত্যক্ত ঘরটা আলোয় ঝলমল করছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে একটা ডিজিটাল ঘড়ি। তার উজ্জ্বল লাল এল. ই. ডি. বাতিগুলো ভুল সময় দেখাচ্ছে।

রিসেপশান স্পেস-এ একটাও লোক নেই। জিশানের মনে হল, ঘরটা এতদিন ধরে পরিত্যক্ত যে, তা থেকে আরশোলা আর ছাতা-ধরা গন্ধ বেরোচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধুলোর গন্ধ আর মদের গন্ধ।

এর নাম হসপিটাল! আর এরাই-বা কেমন পুলিশ!

অবাক হওয়া ভয়ের চোখে মিনির দিকে তাকাল জিশান। কী এক অদৃশ্য সংকেতে সাড়া দিয়ে মিনিও সেই মুহূর্তে তাকিয়েছে স্বামীর দিকে। চোখে-চোখে ওদের কী কথা হল কে জানে! মিনি কেঁদে ফেলল। ছোট্ট শানুকে জিশানের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে আঁকড়ে ধরল বুকে। বাচ্চাটা বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল—এই ঝটকায় জেগে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল।

জিশান খুব ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল তিন দেবতার দিকে। ওদের ঠান্ডা পাথরে তৈরি মুখগুলো এখন অপদেবতার মতো লাগছে।

মুখগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল জিশান।

ওদের পোশাক জলে ভেজা। মাথার ভেজা চুল লেপটে রয়েছে কপালে, গালে। মুখের চেহারায় তিনজনের মিল না থাকলেও ওদের চোখজোড়া একইরকম : মরা মাছের চোখ।

ওদের তিনজনের দুজন বেঁটে, একজন বেশ লম্বা। উচ্চতার হিসেবেই জিশানের মনে হল, লম্বা লোকটাই গাড়িতে জিশানের পাশে বসেছিল।

প্রথম বেঁটে লোকটার মাথায় টাক। রোগা। রং কালো। মুখে গোঁফ-দাড়ির বালাই নেই। ফলে একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব ফুটে উঠেছে। লোকটা বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল। মিনির দিকে তাকিয়ে ছিল।

দ্বিতীয় বেঁটে লোকটা বেশ মোটা, গোলগাল লালটু মুখ। ফরসা। ঠোঁটের ওপরে পাতলা গোঁফ। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। দেখে মনে হয়, বয়েস ছাব্বিশ কি সাতাশের বেশি হবে না। চোখ দুটো ছোট-ছোট। ভেতরে ঢোকানো। বারবার নাক টানছে। বোধহয় জলে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে।

লম্বা লোকটাকে দেখে মনে হয় এটাই পালের গোদা। কখন যে সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে জিশান টের পায়নি। হয়তো রিসেপশান স্পেসের জরিপে ওর মন ব্যস্ত ছিল বলে সিগারেটের গন্ধ নাকে আসেনি।

লোকটার রং তামাটে। জলে ভেজা মুখ যেন কাঠখোদাই ভাস্কর্য। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। দু-গালে ব্রণের দাগ। কপালের ওপরে ভেজা চুল লেপটে আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিচ্ছে জিশানের দিকে। ওর কালচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের ভাঁজে সামান্য হাসির ছোঁওয়া থাকলেও চোখে তার লেশমাত্র ছিল না।

জিশানের বুকের ভেতরে দুরমুশ পড়ছিল। মিনির আতঙ্কের গোঙানি আর শানুর মিহি গলার কান্না ওর চিন্তা ওলটপালট করে দিচ্ছিল। কী করবে এখন? কী করবে?

জিশান লম্বা লোকটাকে প্রশ্ন করল, 'এটা...এটা হসপিটাল?'

লম্বা হাসল। সিগারেটে ছোট মাপের হ্যাঁচকা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। সোলাস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। এককালে হেভি নাম ছিল। ভালো-ভালো ব্রেনি ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ত। এখন আমরা পড়ি—।' সঙ্গী দুজনের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। ছোট্ট করে হাসল। ধোঁয়া ছাড়ল আবার।

অস্বাভাবিক জোরে বাজ পড়ার শব্দ হল। আলো ঝলসে গেল জানলায়। গোটা বিল্ডিংটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

'আমাদের ছেড়ে দিন। বাচ্চাটা মরে যাবে।' ওর গলা কান্নায় ভেঙে পড়ছে দেখে জিশান নিজেই অবাক হয়ে গেল : 'আপনারা তো পুলিশের লোক। দয়া করুন...।'

'হ্যাঁ, পুলিশের লোক। তবে আমরা দু-দিকেই আছি।' বলে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল লম্বা লোকটা।

মিনি গোঙানি মেশানো গলায় বলে উঠল, 'আমাদের একটা হসপিটাল কি নার্সিংহোমে নিয়ে চলুন। বাচ্চাটার আবার জ্বর এসে গেছে।'

লম্বা লোকটা সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে টুকরোটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মাথা নড়ল : 'হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব। কোনও চিন্তা নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই তোমাদের ছেড়ে দেব।'

জিশান ভয়ের চোখে মিনির দিকে তাকাল।

টাকমাথা বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে লম্বা লোকটা কী একটা যেন ইশারা করল। ইশারা বুঝতে পেরে বেঁটে রিসেপশান কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তার পিছনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল।

লম্বা লোকটা ফুসফুসে লুকিয়ে রাখা সিগারেটের ধোঁয়া একটু-একটু করে ছাড়ছিল। সেই কাজ করতে-করতেই জিশানকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'জিশান।'

হাসল লোকটা : 'ও. কে., জিশান। বাচ্চাটাকে এবার তুমি কোলে নাও। তোমার বউকে ফ্রি করে দাও।'

জিশান পাগলের চোখে লম্বার দিকে তাকাল। এসব কথার মানে কী? তোমার বউকে ফ্রি করে দাও! কেন?

লম্বাকে সে-কথাই জিগ্যেস করল ও।

'কেন?'

'কোশ্চেন কোরো না। যা বলছি তাই করো।' কথা শেষ করেই আর-এক সঙ্গীকে ইশারা করল লম্বা।

সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে-লালটু লোকটা মিনির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

লম্বা লোকটার দিকে অপলকে তাকিয়ে জিশান মনে-মনে একটা হিসেব কষছিল। ও কি পারবে না তিন ঘুষিতে এই লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে? যদিও-বা পারে, তারপর? আরও তো দুজন বাকি থাকবে।

জিশান হিসেব করে দেখল, ও পেরে উঠবে না। ও যখন লম্বার সঙ্গে লড়বে তখন বাকি দুজন ওকে পিছন থেকে আক্রমণ করবে। অথবা, আরও সহজ—ওরা মিনি আর শানুর দখল নিয়ে নেবে।

জিশান লম্বা লোকটার দিকে তাকিয়ে হিসেব কষছিল। তাই টাকমাথা বেঁটে লোকটার দিকে নজর রাখতে পারেনি। যদি পারত, তা হলে হিসেব কষার ব্যাপারটা ও মাঝপথেই থামিয়ে দিত।

লম্বার ইশারায় ও ঘাড় ঘুরিয়ে টাকমাথার দিকে দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীরের ভেতরে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

টাকমাথা লোকটার ডানহাতে একটা দু-ফুট লম্বা ঝকঝকে চপার। ওটা হাতে ঝুলিয়ে ও জিশানদের কাছে এগিয়ে আসছে।

মিনি অসহায়ভাবে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

লম্বা হেসে বলল, 'জোরে চেল্লালেও কোনও প্রবলেম নেই। এখানে আমরা ছাড়া শোনার মতো আর কোনও পাবলিক নেই।' জিশানের দিকে চোখের ইশারা করল : 'নাও। ঝটপট বাচ্চাটাকে নিয়ে বউকে ফ্রি করো। কাজের সময় এসব ক্যাওড়া কিচকিচ ভাল্লাগে না।'

টাকমাথা লোকটা তখন দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চপারটা শূন্যে তুলে বাতাস কেটে শ্যাডো প্র্যাকটিস করছে আর হাসছে।

জিশানের চোখের সামনে একটা দু:স্বপ্ন ভেসে উঠল। লালে মাখামাখি দু:স্বপ্ন। ও তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে শানুকে কোলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে মিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

লম্বা লোকটা জিশানকে বলল, 'গুড বয়। এবার ছেলেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যাও।' বেঁটে-লালটু লোকটাকে লক্ষ করে সে বলল, 'যা, বসকে খবর দে। বল মাল রেডি। কত নম্বর ঘরে ডেলিভারি দেব জিগ্যেস কর...।'

বেঁটে-লালটু রিসেপশান স্পেসের ডানদিকের একটা দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছিল। আর টাকমাথা লোকটা তরোয়াল খেলা থামিয়ে চপার তুলে জিশানকে ভেতরের করিডরের দিকে এগোতে ইশারা করল। মুখে বলল, 'জলদি। কুইক।'

মিনি বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে গুঙিয়ে কাঁদছিল। আর জিশানের বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। ওদের তিনজনের মামুলি জীবনে এরকম ভয়ংকর ঘটনা কখনও ঘটবে ও ভাবতে পারেনি। আজ রাতেই কি শেষ হয়ে যাবে ওদের তিনজনের জীবন?

তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেল জিশান। কোনও একটা সিঁড়ি ধরে একটা ভারী শরীর ধীরে-ধীরে নেমে আসছে।

জিশান থমকে দাঁড়াল। আওয়াজটা কোনদিক থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, বেঁটে-লালটু লোকটা যে-দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা ও খোলার আগেই দরজার ওপাশ থেকে পাল্লায় প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল কেউ।

সেই ধাক্কায় বেঁটে-লালটু ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পড়েই রইল। দড়াম শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো হাট হয়ে খুলে গেল। দু-দিকের দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে আধাআধি ফিরে এল, কাঁপতে লাগল।

যে-লোকটি ঘরে ঢুকল তাকে লোক না বলে পাহাড় বললেই মানায় ভালো।

লম্বায় অন্তত সাড়ে ছ-ফুট। মাথার চুল কীর্তনিয়াদের মতো ঘাড় ছাপিয়ে নেমে এসেছে। কপালের ওপরেও চুলের ঝালর। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে ছলছলে চোখ নজরে পড়ছে। ঈগলপাখির মতো নাক। তার নীচে মোটা গোঁফ। গোঁফের পরেই তামাটে রঙের পুরু ঠোঁট। ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। তীক্ষ্ণ চিবুকে একখাবলা দাড়ি।

রিসেপশান স্পেস-এ কয়েক পা ঢুকে পাহাড়ের মতো লোকটা থমকে দাঁড়াল। পলকে চোখ বুলিয়ে পাঁচজন মানুষকে চেটে নিল।

লোকটার গায়ে একটা ছেঁড়া টি শার্ট। তার রং কালো। পায়ে নীল রঙের জিনস। জিনসের পায়া দুটো দেড়ফুট করে ছিঁড়ে বাদ দেওয়া। তাই হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোমশ পা দেখা যাচ্ছে। তারপরই গাঢ় নীল রঙের স্নিকার—মোজার কোনও বালাই নেই।

লোকটার দু-হাতে নীল রঙের রিস্ট ব্যান্ড। আর ডানহাতে দুলছে একটা বাদামি রঙের বোতল।

এতক্ষণ যে-লোকটাকে জিশান পালের গোদা ভেবেছিল সে পাহাড়ের কাছে এগিয়ে গেল। মিনমিনে গলায় বলল, 'বস, নিয়ে এসেছি...।' কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে মিনির দিকে দেখাল।

পাহাড় মিনির দিকে দেখল। মিনির সারা গা বৃষ্টিতে ভেজা। পাতলা ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। ঘন-ঘন চোখের পলক পড়ছে। ওর ভয়ার্ত মুখটাকে জলরঙে আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে।

'হুঁ-উ-উ...।' মুখে অদ্ভুত এক শব্দ করল বস। মিনির দিকে পা বাড়াল। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বেঁটে-লালটুর বডিতে হোঁচট খেল।

বেঁটে-লালটুকে ভয়ংকর এক লাথি কষাল বস। 'ওঁক' শব্দ করে বেঁটে-লালটুর বডিটা কয়েক পাক গড়িয়ে গেল।

বিরক্তিতে গালাগাল দিল পাহাড়। শূন্যে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল : 'এ লালিপপের বাচ্চাটা এখানে পড়ে কেন?' যেন দরজার ধাক্কা খেয়ে বেঁটে-লালটু যে পড়ে গেছে সেটা পাহাড় খেয়ালই করেনি।

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে বাকি দুজন দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বেঁটে-লালটুর ওপর। ওর অজ্ঞান বডিটাকে চটপট টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দিল রিসেপশান কাউন্টারের দিকে।

ততক্ষণে বস মিনির দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে এসেছে।

মদের গন্ধটা এখন আর লুকোচুরি খেলছিল না—বরং সরাসরি নাকে এসে ধাক্কা মারছিল।

মিনির খুব কাছে এসে বস থমকে দাঁড়াল। ছলছলে মাতাল চোখে মিনিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'বিউটিফুল!'

মিনির মুখে মদের বাষ্পের হলকা এসে লাগল। ও ঝটকা মেরে মুখটা একপাশে সরিয়ে নিল।

পাহাড় হাসল। বাঁ-হাতের তর্জনি মিনির চিবুকে ছোঁয়াল। তারপর তর্জনির চাপে মিনির মুখটা ধীরে-ধীরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ ধরে মিনিকে দেখল। শেষে ভরাট গলায় বলল, 'যা কান্নাকাটি করার করে নাও। পরে আর প্যানপ্যান কোরো না যেন।'

রিসেপশান স্পেসের শেষ প্রান্তে জিশান পলিথিন মোড়া বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ও যেন এখানকার কেউ নয়। ও যেন বহু দূরে দাঁড়িয়ে একটা মর্মান্তিক সিনেমা দেখছে। ও দর্শক। ওর কিছু করার নেই।

পাহাড় থেমে-থেমে বলল, 'একে তিননম্বর ঘরে ডেলিভারি দে। ওটা পেয়িং বেড-এর ঘর। কন্ডিশন ভালো।'

জিশান আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল : 'না—।'

জিশান চায়নি, কিন্তু ওকে অবাক করে অবাধ্য চিৎকারটা কীভাবে যেন গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বস ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জিশানের দিকে। এক ঝটকায় ডানহাতের বোতলটা ছুড়ে দিল দেওয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল বোতলটা। বোতলের তরল ছিটকে পড়ল। মদের বিশ্রী গন্ধে চারিদিক ম-ম করে উঠল।

আচমকা এই কাণ্ডে মিনি চমকে কঁকিয়ে উঠেছিল। বস ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। মাথা দুলিয়ে জিগ্যেস করল, 'ও কে রে? হাজব্যান্ড? হাজব্যান্ড? না বয়ফ্রেন্ড?'

না, উত্তরের অপেক্ষা করল না। পাহাড় পায়ে-পায়ে জিশানের দিকে এগোতে লাগল। ঘরের প্রত্যেকে আশঙ্কায় পাথর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

টাকমাথা সঙ্গীর হাত থেকে এক হ্যাঁচকায় চপার ছিনিয়ে নিল। জিশানের আরও কাছে এগিয়ে এল। ওর শরীরে জিশানের শরীর মিনির চোখে ঢাকা পড়ে গেল।

জিশানের খুব কাছে এসে বাঁ-হাতে ওর চিবুক উঁচিয়ে ধরল পাহাড়। তারপর গলাটা যথাসম্ভব মিষ্টি করে জিগ্যেস করল, 'কীসের ''না'' রে? কী ''না'' বলছিস?'

জিশান কাঁপছিল। ওর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।

পাহাড় চপারটা শূন্যে তুলল। ওটার ফলাটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে জিশানের মাথায় পেতে রাখল। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, 'আমি বলছি। আজ কোনও ''না'' শুনব না। সব হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—।'

এমন সময় জোরে বাজ পড়ল। অসহায় চূর্ণবিচূর্ণ জিশান মদের বাষ্পের বিষবাতাসে শ্বাস নিতে-নিতে কেঁদে ফেলল। আর ওর কোলে ছোট্ট শানুও কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলল।

পাহাড় চমকে উঠল। চপারটা নামিয়ে বাচ্চার কান্নার উৎস আঁচ করে জিশানের কোলের দিকে তাকাল। কিন্তু পলিথিন আর কাপড়চোপড়ের আড়ালে শানুকে ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছিল না।

'কে রে? কে কাঁদছে?'

'আমাদের বাচ্চা।' কান্না ভাঙা গলায় জিশান বলল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাঁ-হাত বাড়াল পাহাড়। পলিথিন আর কাপড়ের আড়াল সরাল। পুঁচকে শানুকে দেখা গেল এবার। চোখ কুঁচকে কাঁদছে।

হাত থেকে চপার খসে পড়ে গেল। শানুর ওপর ঝুঁকে পড়ল পাহাড়। আঙুল দিয়ে ওর লালচে গাল ছুঁল।

'কাঁদে না, বাবু, কাঁদে না। লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী সোনা আমার—।'

জিশান অবাক চোখে কাছের মানুষটাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল,—'আমার ছেলেটার ভীষণ জ্বর। এখুনি হসপিটালে না নিয়ে গেলে মরে যাবে...।'

পাহাড় যেন বিদ্যুতের শক খেল। তাড়াতাড়ি শানুর কপাল ছুঁয়ে দেখল। তারপর নিজের মাথার চুলে হাত চালিয়ে আপনমনেই বলল, 'আমার...আমার বউটা মরে গেল। তারপর...তারপর...মা-কে না পেয়ে এইটুকুন ছেলেটাও মরে গেল। তারপর...।'

মিনি প্রায় ছুটে চলে এল শানুর কাছে। নিষ্ঠুর পাহাড়কে ভ্রূক্ষেপ না করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। পিঠ চাপড়ে দোলা দিয়ে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করল।

জিশান জিগ্যেস করল, 'আপনার ওয়াইফের কী হয়েছিল?'

পাহাড় মিনির কোলে শানুকে দেখছিল। বলল, 'সবই কপাল! এই জানোয়ার শহর। চারদিকে জংলি জানোয়ার ঘুরছে।...বউটাকে তুলে নিয়ে গেছিল। তারপর...ও ফিরে এসে সুইসাইড করল। তারপর বাচ্চাটা মরে গেল। ব্যস...সব খতম...শুধু আমি বাকি রয়ে গেছি।'

বাইরে বাজ পড়ল আবার।

পাহাড় ওর লম্বা শাগরেদের কাছে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। নোংরা খিস্তি দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দু-হাতে ওর দু-গালে একসঙ্গে চড় কষিয়ে দিল। ছোটবেলায় কাগজের ঠোঙা ফুলিয়ে হাতের চাপড়ে ফাটাত জিশান। এখন ঠিক সেইরকম কানফাটানো শব্দ হল। যমজ চড় খেয়ে লোকটা মেঝেতে খসে পড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল। বোধহয় বেঁটে-লালটুর মতো অজ্ঞান হয়ে গেল।

টাকমাথা লোকটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে একইরকম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পাহাড় ওর কাছে এগিয়ে গেল না। শুধু হুকুম ছুড়ে দিল, 'এক্ষুনি এদের গাড়ি করে নিয়ে যা। ''ক্যাপিটাল নার্সিংহোম''-এ পৌঁছে দে। দেরি করলে বাচ্চাটার বিপদ হয়ে যাবে। জলদি বেরিয়ে পড়—।'

টাকমাথা বুলেটের গতিতে সদর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাহাড় মিনির কাছে এগিয়ে এল। বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখ মুছে নিয়ে ছোট্ট করে বলল, 'সরি। ভুল হয়ে গেছে।'

জিশানের দিকে তাকাল পাহাড় : 'জলদি যাও। ছেলেটাকে বাঁচাও।'

জিশান আর মিনি তাড়াতাড়ি পা বাড়াল।

কিন্তু পাহাড় পিছন থেকে ডাকল : 'শোনো—।'

জিশান থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল।

পাহাড় লম্বা পা ফেলে ওর কাছে এগিয়ে এল। জিনসের পকেট থেকে খাবলা মেরে কী যেন তুলে নিয়ে জিশানের জামার পকেটে গুঁজে দিল।

জিশান তাকিয়ে দেখল। একগাদা টাকা।

ওর কান্না পেয়ে গেল। কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু পারল না। ঠোঁট কাঁপল শুধু।

মিনি জলভরা চোখে বিশাল মানুষটাকে দেখছিল।

পাহাড় জিশানকে ঠেলা মারল : 'দেরি কোরো না। ছেলেটাকে বাঁচাও।'

জিশান আর মিনি সোলাস মেডিকেল কলেজ থেকে বাইরের ঝড়-বৃষ্টিতে বেরিয়ে এল।

•

সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল শানু আর মিনি। তার সঙ্গে জিশানও। আজও শানু আর মিনিকে রক্ষা করতে জিশানকে অলৌকিক কিছু একটা করতে হবে—করতেই হবে।

জিশানের ভেতরে একটা মরিয়া রাগ তৈরি হল। শ্রীধর পাট্টা আর নিউ সিটির সিন্ডিকেটের প্রতি তীব্র ঘৃণা আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। বজ্রের শক্তি নিয়ে ওর ডানহাঁটু

আছড়ে পড়ল জাব্বার মুখে। জিশান জাব্বার মাথাটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল। তাই সংঘর্ষটা হল মারাত্মক।

জাব্বার নাক থেবড়ে গেল। রক্ত ছড়িয়ে গেল ঠোঁটে, দাঁতে। ওর শক্তিশালী তীব্র মুঠি পলকে ঢিলে হয়ে গেল। ও একঝটকায় কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

জিশান সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছিল, কিন্তু ওর মাথা টলছিল। সারা গায়ে নানারকম জ্বালা-যন্ত্রণা। নাকের পাশে যেখান দিয়ে রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়েছে সেখানটা চুলকোচ্ছে। মাথার ওপরে চক্রাকারে উজ্জ্বল আলো, মাইকে দ্রুতলয়ের ধারাবিবরণী, দর্শকদের উন্মত্ত ক্ষুধার্ত চিৎকার—সব মিলিয়ে কেমন একটা ঘোর তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

সেই অবস্থাতেই দর্শকদের আসনগুলোয় অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। অসম্ভব জেনেও লাল রঙের পোশাক পরা একটা মেয়েকে খুঁজল। কিন্তু পেল না।

জাব্বা কাদা-মাটিতে পড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু ও নি:শেষ হয়ে যায়নি। যাওয়ার কথাও নয়। ও একপাক গড়িয়ে শরীরটাকে চিত করে নিয়েছিল। তারপর সেই অবস্থাতেই ভয়ংকর এক গর্জন করে অদ্ভুত এক লাফ দিয়েছে। এবং জোড়াপায়ের প্রচণ্ড লাথি জিশানের তলপেটে বসিয়ে দিয়েছে।

জিশান ছিটকে উঠল শূন্যে। প্রায় উড়ে গিয়ে ছ'হাত দূরে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তারপর পক্ষাঘাতের রুগির মতো অসাড় শরীরে চিত হয়ে পড়ে রইল। ওর শূন্য চোখ চেয়ে রইল ওপরের কালো আকাশের দিকে। উজ্জ্বল আলোর ঝলসানি পেরিয়ে তারাগুলো এমনিতে চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু জিশানের চোখের সামনে প্রচুর তারা নাচানাচি করছিল। শরীরের কোনও যন্ত্রণাই ও আর টের পাচ্ছিল না।

জাব্বা তখন যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে মুঠি উঁচিয়ে গর্তের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর উল্লাসে পশুর মতো হুঙ্কার ছাড়ছে। গ্যালারিতে উত্তেজনা টগবগ করছে। আকাশে বাতাসে শব্দের খই ফুটছে।

প্রচুর শব্দ জিশানের কানে ঢুকে পড়ছিল। দর্শকদের মধ্যে যারা জিশানকে সমর্থন করছিল তারা ওর নাম ধরে গলা ফাটাতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে জাব্বাকে খতম করার জন্য হিংস্র গলায় ওকে উৎসাহ দিতে লাগল। কেউ-কেউ ওকে কাপুরুষ বলে দুয়ো দিতে লাগল। আর ওর বিরোধী পক্ষ জাব্বার নাম ধরে অদ্ভুত তালে চিৎকার করতে লাগল। তার সঙ্গে স্লোগান তুলল : 'জিশান—খতম! জিশান—খতম!'

জায়ান্ট টিভির পরদায় বিভিন্ন দর্শকের ক্লোজ-আপ দেখানো হচ্ছিল। মাঝে-মাঝে ভেসে উঠছিল শ্রীধর পাট্টার মুখ। তার সঙ্গে উত্তেজিত গলায় মণীশ আর রাজশ্রীর ধারাবিবরণী।

টিভিতে দেখা গেল, গ্যালারিতে জাব্বা আর জিশানের সমর্থক দু-দল দর্শকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে। সিকিওরিটি গার্ডের দল শকার হাতে সেই লড়াই নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। টিভির ধারাবিবরণী আর ছবি পিট ফাইটের জীবন্ত উত্তেজনা নিউ সিটির ঘরে-ঘরে নিখুঁতভাবে পৌঁছে দিচ্ছিল।



শুয়ে থাকা জিশানের মনে একটা আক্ষেপ তৈরি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও খুব ক্লান্ত—আর পারবে না। মিনি-শানুর কাছে ফিরতে পারবে না। মনোহরকে দেওয়া কথা রাখতে পারবে না।

ঠিক তখনই জাব্বা দেওয়ালের এক কোণ থেকে ব্ল্যাক মাম্বা সাপটা মুঠো করে তুলে নিয়েছে। ছুড়ে দিয়েছে জিশানের বুকের ওপরে।

কয়েক লহমা সাপটা ল্যাকপ্যাকে কালো পাইপের মতো জিশানের বুকের ওপরে পড়ে রইল। ওর কালো রঙের জিম ভেস্টের সঙ্গে সাপটা মিশে গেল। পরমুহূর্তেই ওটা ক্ষিপ্রগতিতে ছোবল মারল জিশানের গলায়।

জিশান যন্ত্রণায় ঝাঁকুনি খেল। সাপটার বিষ যে বের করে নেওয়া হয়েছে সে-কথা ভুলে গেল। চেতন আর অচেতন জগতের সীমারেখায় একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে জিশান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, ও আর পারবে না। প্রতি মুহূর্তে ও শেষ মুহূর্তের দিকে এগোচ্ছে।

এমন সময় এক তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল জিশান।

'জিশান! জিশা—ন!'

না, জায়ান্ট টিভি থেকে নয়—এই ডাক শোনা যাচ্ছে দর্শকদের গ্যালারি থেকে। একটা তীব্র মেয়েলি চিৎকার। সব হারানোর মুহূর্তে কেউ যেন জিশানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাগলের মতো মরিয়া চিৎকার করছে।

ঝাপসা চোখে জিশান মেয়েটিকে খুঁজে চলল। কোথায়? কোথায়?

একটা লাল ঝলক দেখতে পেল। গ্যালারি থেকে ছুটে নেমে আসছে লাল জামা পরা একটা মেয়ে। ওর বয়কাট চুল পিছনদিকে উড়ছে। ও সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে ছুটে নামার তালে-তালে সেই চুল লাফাচ্ছে।

রূপকথা!

কথা রেখেছে ও। সত্যি ও লাল ড্রেস পরে এসেছে। কোমর পর্যন্ত ফুলহাতা শার্ট একটা। তার সঙ্গে প্যান্ট। সেটার রং কালো বা নীল একটা কিছু।

মেয়েটা পলকে চলে এল গর্তের কিনারায়। জিশানের দিকে তাকিয়ে গর্তের কিনারা বরাবর দৌড়ে পাক খেতে লাগল। আর জিশানের নাম ধরে উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে লাগল।

কোনও সিকিওরিটি গার্ড রিমিয়াকে বাধা দেয়নি। বরং এই গেম শো-র জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য টিভি ক্যামেরা রিমিয়াকে ধরে ফেলল। জায়ান্ট টিভির পরদায় ওর ছবি ধরা পড়ল। ওর চিৎকার শোনা গেল

লাউডস্পিকারে।

'জিশান! জিশান! ওঠো! উঠে পড়ো! তোমাকে জিততে হবে, জিশান—উঠে পড়ো! তুমি বলেছিলে আমি এই খেলা দেখতে এলে তোমার খুব জিততে ইচ্ছে করবে। মনে নেই সে-কথা? আমি তো খেলা দেখতে এসেছি। এবার তুমি তোমার কথা রাখো। ট্রাই হার্ড টু উইন! কাম অন, জিশান! বি আ ম্যান—।'

রিমিয়া চিৎকার করে কথাগুলো বলছিল আর গর্তের পাড়ে পাগলের মতো পাক খাচ্ছিল। ওর লাল জামাটার ওপরে জিশান নজর রাখতে চেষ্টা করছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওটা ম্যাটাডরের লাল রেশমি রুমাল। আর বুল ফাইটের রিং-এর ভেতরে জিশান রক্তাক্ত আহত জেদি ষাঁড়।

রিমিয়াকে দেখতে-দেখতে—অথবা, ওর লাল জামাটা দেখতে-দেখতে—জিশানের ভেতরে একটা গোঁ মাথাচাড়া দিল। ওর না শপথ ছিল মরার আগে ও মরবে না! মালিক আর মনোহরকে ও কথা দিয়েছে না!

আচমকা ব্ল্যাক মাম্বার ছোবল এসে পড়ল জিশানের গালে। গালটা যেন জ্বলে গেল। রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ল ফরসা গাল বেয়ে।

কোন এক অলৌকিক শক্তিতে জিশান উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে গর্তের কিনারায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকা রিমিয়া থমকে দাঁড়াল। বাচ্চা মেয়ের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। 'জিশান! জিশান!' বলে খুশিতে চিৎকার করতে লাগল।

জিশানের গা থেকে সাপটা খসে পড়েছিল মাটিতে। ওটার দিকে তাকাল জিশান। হিংস্রতার ঢেউ হঠাৎই উথলে উঠল ওর শরীরে। চোখের পলকে সাপটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতের আঙুল বাঁকিয়ে কয়েক খাবলা মাটি তুলে সাপটার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে চাপড় মেরে বসিয়ে দিল। একবার—দুবার—বারবার।

আঠালো মাটির নীচে সাপটা জ্যান্ত কবরে চলে গেল। সেই কবরের ওপরে জিশান পা দিয়ে দুরমুশ করতে লাগল। সাপটাকে দম আটকে মরতেই হবে—মরতেই হবে।

এবার জাব্বা।

জাব্বার দিকে তাকাল জিশান। ও তখনও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে উল্লাসের অঙ্গভঙ্গি করছে। রিমিয়ার কাছাকাছি গিয়ে জাব্বা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুখ উঁচু করে ওর দিকে তাকিয়ে ইশারায় নিজের গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর জিশান...খতম!'

এতক্ষণ জাব্বা জিশানকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন পিট ফাইট শেষ হয়ে গেছে। জিশানের শক্তির শেষ বিন্দুটাও ও ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। তাই ও অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। আর সেটাই ওর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল।

জাব্বাকে লক্ষ্য করে আচমকা দৌড় শুরু করল জিশান।

চোখের কোণ দিয়ে আক্রমণটা খেয়াল করে জাব্বা যখন জিশানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ততক্ষণে কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেছে।

দুটো বলবান শরীরের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। শরীরে শরীর জট পাকিয়ে গর্তের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওরা ঠিকরে পড়ল মাটিতে। তারপর দু-দিকে ছিটকে গেল।

জিশান বুঝতে পারছিল, যা কিছু করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ, ওর ক্ষমতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে প্রায় শেষের দিকে। সুতরাং, এখনই—এখনই।

জাব্বা নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, জিশান সেই মুহূর্তে তিনপাক গড়িয়ে পৌঁছে গেল ওর কাছে। চিত হওয়া অবস্থায় শরীরের নীচের অংশটাকে একঝটকায় শূন্যে তুলে লাথি বসিয়ে দিল জাব্বার মুখে। আর প্রায় একইসঙ্গে ওর পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।

জাব্বা আবার পড়ে গেল, কিন্তু তারই মধ্যে জিশানের বাঁ-চোখে একটা মারাত্মক ঘুসি বসিয়ে দিল।

জিশান উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর চোখের সামনে পলকে সবকিছু মুছে গিয়ে অসংখ্য তারা ঝিলমিল করে উঠল আবার।

কিন্তু জিশান থামল না। ওই 'অন্ধ' অবস্থাতেই প্রতিরক্ষার পদক্ষেপ নিল। ক্ষিপ্রগতিতে জোরালো ঘুসি ছুড়ে দিল সামনে। এবং জাব্বার মুখ ঘুসির নাগালে পেয়ে গেল।

নজর পরিষ্কার করতে জিশান বারদুয়েক ঝটকা মেরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর চোখ খুলতেই বুঝতে পারল, ও এখন একটা চোখে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ওর অন্য চোখটা গেল কোথায়? এখন কোনদিকে তাকিয়ে আছে সেটা? চোখটা কোটরে আছে তো, নাকি বাইরে বেরিয়ে এসেছে?

প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় নেই। এখন শুধু প্রতিরক্ষা। মারের বদলা মার।

জিশান ঝাপসা নজরে তাকাল জাব্বার দিকে। এবং তাকিয়েই অবাক হল।

জাব্বা কোথায়? ওর সামনে শ্রীধর পাট্টার মুখ। সে-মুখে কাদা-মাটি লেগে রয়েছে। রয়েছে রক্তের ছাপ।

জিশান হুমড়ি খেয়ে পড়ল শ্রীধরের শরীরের ওপরে। পাগলের মতো ঘুসি মেরে চলল। ঘুসির পর ঘুসি। শ্রীধরের মুখটা আরও লাল হয়ে যেতে লাগল। হামানদিস্তের ভেতরে রসুনের কোয়া ছেঁচার মতো জিশানের লোহার হাত শ্রীধরের মুখ ছেঁচতে লাগল।

চোখের সামনে জাব্বার মুখটা ফিরে এল আবার। ও চিৎকার করছিল। ওর শরীরটা মাথা ছেঁচে দেওয়া মাগুরমাছের মতো ছটফট করতে লাগল। ওর হাতের আঙুল কখনও জিশানের বাহু, কখনও বাতাস আঁকড়ে ধরছিল।

জিশানের ডানহাতের আঙুলের গাঁট ছড়ে গিয়ে মাংস বেরিয়ে পড়েছে. হাতের মুঠো রক্তে মাখামাখি। বেশিরভাগটাই ওর রক্ত—বাকিটা জাব্বার। কিন্তু ওর শরীর এতটাই অসাড় হয়ে গেছে যে, কোনও যন্ত্রণা ও আর টের পাচ্ছিল না।

জাব্বা হঠাৎই জিশানের গলার নাগাল পেয়ে গেল। ওর সাঁড়াশির মতো আঙুল চেপে বসল গলার নরম মাংসে। জিশানের মাথার ভেতরে একটা শিরা দপদপ করতে লাগল। ওদের যুযুধান শরীর দুটো আহত কেন্নোর মতো পাকাতে লাগল, পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে এপাশ-ওপাশ মোচড় দিয়ে লড়াই করে চলল।

জিশান বুঝতে পারছিল ওর ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওকে লড়াই শেষ করতে হবে—অথবা, নিজে শেষ হয়ে যাবে। একটু আগে কবর দেওয়া সাপটার কথা মনে পড়ল ওর। জাব্বা সাপের চেয়ে কম কী!

মুহূর্তের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জমি থেকে একখাবলা মাটি তুলে নিল জিশান। এক প্রচণ্ড হুঙ্কার তুলে সেই মাটিসমেত হাত দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়ার ঢঙে আছড়ে দিল জাব্বার রক্তাক্ত মুখের ওপরে।

দম আটকে আসায় জাব্বার শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে গেল। জিশানের গলায় ওর হাতের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল। মুখে ঢুকে যাওয়া মাটি থু-থু করে ছুড়ে দিল শূন্যে। তারপর সবে ও যখন বড় করে একটা শ্বাস টানতে শুরু করেছে অমনি জিশানের মাটিসমেত হাতের থাবা ওর মুখে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয়বার। তৃতীয়বার। এবং আরও অনেকবার।

জিশান যেন পাগল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় 'সাপ'টাকে কবর দিতে চাইছে প্রাণপণে।

জাব্বার গলা দিয়ে চাপা ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল। একটানে ওর কাহিল শরীরটাকে উপুড় করে দিল জিশান। ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে শরীরের সমস্ত ওজন আছড়ে দিল ওর শিরদাঁড়ার ওপরে। তারপর ঘোড়ায় চড়ার মতো ওর পিঠে চেপে বসল। মাথাটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল পিছনদিকে।

জাব্বার ঘাড় ক্রমশ ভাঁজ হয়ে যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল, জিশান ওকে জোর করে আকাশ দেখাতে চাইছে, আকাশের তারা দেখাতে চাইছে।

একটা 'মট' শব্দ হল। হয়তো জাব্বার ঘাড়ের হাড়ের ঠোকাঠুকির শব্দ। একটু আগেই মুখের মাটি থু-থু করে ফেলে দিয়ে জাব্বা হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মুখ থেকে কোনও চাপা ঘড়ঘড় শব্দও বেরোচ্ছে না। ও হয়তো অক্ষম শরীরে শেষ মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছে।

জিশানও বুঝতে পারছিল আর মাত্র দু-এক ডিগ্রি। ঘাড়টাকে আর দু-এক ডিগ্রি পিছনদিকে বাঁকাতে পারলেই লড়াই খতম—জাব্বাও খতম।

কিন্তু হঠাৎই ওর সামনে ঝড়-বৃষ্টির সেই রাতটা ভেসে উঠল। পাহাড়ের মতো সেই ভয়াবহ মানুষটা সেদিন অনেক কিছুই করতে পারত—কিন্তু করেনি। করেনি বলেই আজ জিশান এখানে মিনি আর শানুর জন্য মরণপণ লড়াই করছে। পাহাড়ের মতো সেই মানুষটার শুধু শরীরটাই পাহাড় ছিল না, একপলকে ওর মনটাও হয়ে গিয়েছিল অনেক বড়—পাহাড়ের মতো। এখন জিশান কি সেরকম কিছু একটা...।

জাব্বার মাথাটা আচমকা ছেড়ে দিল জিশান।

গ্যালারি থেকে উন্মত্ত দর্শকের দল এতক্ষণ 'খতম! খতম!' বলে রণডঙ্কা বাজাচ্ছিল। জিশান জাব্বার মাথাটা ছেড়ে দিতেই সব চেঁচামেচি একলহমার জন্য থেমে গেল। গ্যালারি থেকে একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাসের 'ফোঁস' শব্দ শোনা গেল যেন। তারপরই জিশানের নামে গ্যালারির প্রতিটি বিন্দু কেঁপে উঠল।

জাব্বার শরীর ছেড়ে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল জিশান। ও হাপরের শব্দ করে হাঁপাচ্ছিল। জাব্বা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীর স্থির হলেও শ্বাসপ্রশ্বাসের সামান্য ওঠা-নামা চোখে পড়ছে। সেদিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে থুতু ছুড়ে দিল জিশান। টকটকে লাল রঙের থুতু দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল।

জায়ান্ট টিভির পরদায় সুন্দরী রেফারিকে দেখা গেল এবার। মিষ্টি গলায় ছত্রিশরকম উল্লাস ফুটিয়ে রেফারি চিৎকার করে বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, দ্য উইনার ইজ জিশা—ন। জিশান পালচৌধুরী।'

সঙ্গে-সঙ্গে গ্যালারিতে চিৎকারের নতুন ঢেউ ফেটে পড়ল। রিমিয়া গর্তের কিনারায় পাগলের মতো নাচতে শুরু করল। গ্যালারির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল প্রতিটি দর্শক এখন শুধু জিশানেরই সাপোর্টার।

লাউডস্পিকারে ব্যান্ডের বাজনা বেজে উঠল। গ্যালারিতে রঙিন বেলুন উড়তে লাগল, পটকা ফাটতে লাগল, হরেকরকম বাজির লাল-নীল-সবুজ আলোর রোশনাই ছড়িয়ে গেল রাতের আকাশে।

টিভিতে জিশানের কৃতিত্বের অডিয়োভিশুয়াল শুরু হয়ে গেল। ধারাভাষ্যকাররা বলতে লাগল, কিল গেম-এর জন্য এরকম হাই পোটেনশিয়াল ফাইটার সত্যিই আগে কখনও আসেনি।

জয়ীর অভিনন্দন কুড়োতে জিশান ওর রক্তাক্ত ডানহাতটা কোনওরকমে একবার ওপরে তুলল। তারপরই বাঁধভাঙা জলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া ক্লান্তির চাপে ও সটান খসে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইউনিট কাজে নেমে পড়ল। লুকোনো ক্রেন দুটোর ধাতব বাহু এগিয়ে এল গর্তের কেন্দ্রের দিকে। তার দুটো কেবিনে ছ'জন করে মেডিক। দক্ষ পরিচালনায় কেবিন দুটো গর্তের ভেতরে নামতে শুরু করল।

জায়ান্ট স্ক্রিনে একবার জিশানের ক্লোজ-আপ আর একবার জাব্বার ক্লোজ-আপ দেখানো হচ্ছিল। দেখানো হচ্ছিল ওদের পিট ফাইটের নানা অংশের স্লো মোশান ক্লিপিং। তারই মধ্যে ইনসেটে মেডিকদের তৎপরতা আর তদারকির লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল।

জিশান অসাড় হয়ে মাটিতে পড়েছিল বটে কিন্তু ও অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ওর চোখের পাতা এতটাই ভারি ঠেকছিল যে, শত চেষ্টা করেও ও চোখ খুলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল দুটো লোহার বাটখারা কেউ ওর চোখের পাতার ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ঘুম আসছিল না। কেমন একটা তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে সাবানজলের রঙিন বুদবুদের মতো ও যেন আলতোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ওর কানে নানান আওয়াজ ঢুকছিল। দর্শকদের চিৎকার, পটকার শব্দ, টিভির ধারাবিবরণী...সবই যেন স্বপ্নের মধ্যে শোনা শব্দের মতো ওর কানে আসছিল।

চোখ বুজেই জিশান শানুকে দেখতে পেল। বাচ্চাটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক নতুন-নতুন কথা শিখে গেছে। ওর হাসিটা এখন আরও শক্তিশালী চুম্বক হয়ে উঠেছে।

শানু ডাকল জিশানকে। যেন স্পষ্ট গলায় বলল, 'বাপি, চলে এসো।'

'যাই, সোনা। আর একটু—মাত্র একটা গেম। ব্যস, তারপরই আমি ফিরে যাব।'

'ওটা তো কিল গেম, বাপি?'

'হ্যাঁ, বাবা। ওটা কিল গেম। ওটা শেষ করেই আমি তোর কাছে ফিরে যাব...।'

'তাড়াতাড়ি এসো, বাপি। তোমাকে ছেড়ে আর ভালো লাগছে না।'

'আমারও...।'

তন্দ্রার মধ্যেই জিশান কেঁদে ফেলল। কতদিন ওর ছোট্ট সোনাকে ও দেখেনি!

লাউড স্পিকারে তখন মণীশের গলা শুনতে পাচ্ছিল জিশান।

'...এখন জিশান আর জাব্বাকে লেভেল ওয়ান ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হবে। এক্সট্রিম কেয়ার ট্রিটমেন্ট করা হবে ওদের। সুপার চ্যাম্পিয়ান জিশান সেরে উঠলে ওকে আবার কিল গেম ট্রেনিং-এ ফেলা হবে। পালা করে রেস্ট আর ট্রেনিং দিয়ে দু-মাসের মধ্যে ওকে সুপারফিট করে তোলা হবে। তারপর...।'

জিশান জানে তারপর কী। তারপর ছোট্ট দুটো শব্দ : কিল গেম।

•

স্মার্ট জিমের ন্যানোমিরারের সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীধর পাট্টা। ন্যানোস্ট্রাকচারের রিফ্লেকটিং পার্টিকল দিয়ে তৈরি বিশাল আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন। আধুনিক প্রযুক্তির এই আয়নায় শ্রীধরের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আয়নায় যা দেখলেন তাতে খুশি হলেন শ্রীধর।

ফরসা ছিপছিপে শরীর। মেয়েলি ঢঙে কথা বললেও শরীরটা মরদের মতো। পটল কিংবা কচি শশার মতো ছোট-ছোট পেশি দিয়ে তৈরি। ফরসা গায়ে লোমের কোনও চিহ্ন নেই। জিমে ব্যায়াম শুরু করার আগে মালটিভাইটালাইজার তেল মেখেছেন বলে চামড়া চকচক করছে। একইসঙ্গে চকচক করছে গলার খাটো চেনটা। অনেকটা ডগ চেনের মতো—প্লাটিনাম আর হিরের 'পুঁতি' দিয়ে তৈরি। শ্রীধরের শরীরের একমাত্র অলঙ্কার।

শ্রীধরের চুল তেল মাখানো—টান-টান করে পিছনদিকে আঁচড়ানো। বটগাছের ঝুরির মতো সেই চুল কাঁধ ছুঁয়ে ঝালর হয়ে ঝুলছে।

ডানহাত তুলে চুলের ঝালরে আঙুল বোলালেন শ্রীধর। মনে-মনে ভাবলেন, চুল নয়—সিংহের কেশর। আর লোমহীন এই শরীরটা সিংহ।

ঠোঁটের লাল টুকটুকে লিপস্টিকের দিকে তাকালেন। ফ্লুওরেসেন্ট রং দিয়ে তৈরি বলে তা থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কয়েকসেকেন্ডের জন্য ঠোঁট ছুঁচলো করলেন। খুঁটিয়ে দেখে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে গেলেন। সিংহের ঠোঁট। যার আড়ালে রয়েছে ধারালো দাঁত।

শ্রীধরের পায়ে কালো রঙের স্কিন-টাইট পলিট্রাউজার। কোমরে দেড়ইঞ্চি চওড়া মেটাল সেগমেন্টেড বেল্ট। মনে হচ্ছিল, শ্রীধর যেন কোনও কমপিটিশান বা গেমের জন্য তৈরি।

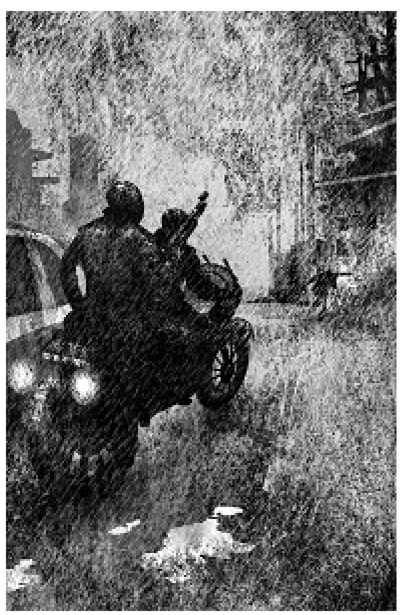
আয়নায় নিজের ছবির দিকে স্থির চোখে তাকালেন। তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের মূকাভিনয় শুরু করলেন।

কার সঙ্গে লড়ছেন শ্রীধর? ওঁর তো কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই! তাই সবসময় ওঁর লড়াই নিজের সঙ্গে। শ্রীধর নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। আর সেই চেষ্টা করেন বলেই নিউ সিটিতে শ্রীধর পাট্টাই শেষ কথা।

এই 'শেষ কথা' মানুষটার শুরুটা হয়েছিল ওল্ড সিটির নোংরা আবর্জনাময় ফুটপাথে। ছোটবেলা থেকেই এই লোকটা নিষ্ঠুর হিংস্র পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য লড়ছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরাটা ওর কাছে ছিল রোজকার ব্যাপার। তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি—কারণ, ওর বাড়ি বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু ছিল না। অন্যান্য বাড়িতে সাধারণত আর যারা থাকে—মানে, মা, বাবা, ভাই, বোন—ছেলেটার সেরকমও কেউ ছিল না।

আসলে জন্ম থেকেই ছেলেটা দেখছে ওর মা-বাবা নেই। ওর চারপাশে সব অচেনা মুখ আর অচেনা মানুষ। ওকে সবাই ডাকত পল্টন বলে। সেখান থেকে কীভাবে যেন নামটা 'পিলটু' হয়ে গিয়েছিল। দরমা আর পলিথিন শিটের আড়ালে ছেলেটা 'মানুষ' হচ্ছিল। ফুটবল খেলায় বাইশটা মানুষ মিলে একটা বলকে যেমন লাথি মারে, ঠিক সেইভাবে বাইশ কিংবা চুয়াল্লিশ পায়ের লাথি খেতে-খেতে ছেলেটা বড় হচ্ছিল। কখনও এ-বাড়িতে ঠাঁই হয় তো কখনও ও-বাড়ি। যদিও 'বাড়ি' মানে ছেঁড়া-ফাটা তালিমারা ঝুপড়ি।

ছেলেটার একটাই সম্পদ ছিল : গায়ের রং। ওইরকম টকটকে ফরসা হাতির দাঁতের মতো গায়ের রং ওর সঙ্গী-সাথী আর কারও ছিল না। ওকে সামনে রেখে বড়রা আলোচনা করত, নিশ্চয়ই ও খুব বড় ঘরের ছেলে—বাবা-মায়ের কোল থেকে ছোটবেলায় হারিয়ে গেছে। সেসব শুনে একটা অলীক আকাঙ্ক্ষা ছেলেটার ভেতরে লকলক করে উঠত। ও তখন থেকেই বুঝত 'বড় ঘর' মানে বড়লোক। আর বড়লোক মানে বড় ক্ষমতা। সেই বড় ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য ছেলেটা ভেতরে-ভেতরে নেড়ি কুকুরের মতো জিভ বের করে লোভে হাঁপাত।



পয়সা রোজগার করার জন্য ছেলেটা তখন নিয়মিত চুরি করত, পকেট মারত, আর কখনও-কখনও ভিক্ষে করত। একইসঙ্গে ও বুঝত, এইভাবে চললে এককোটি বছর পরেও ওর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। ততদিনে ওর লোভের জিভ কয়েকশো মাইল লম্বা হয়ে যাবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না।

অন্য কেউ হলে হয়তো হতাশ হয়ে পড়ত, হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু পিলটু অন্য ধাতুতে গড়া। ও প্রতি মুহূর্তে একটা সুযোগ খুঁজছিল। আর লড়াই করে বাঁচছিল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে যেন পিলটুকে দেখতে পেলেন শ্রীধর। সেইসঙ্গে ভাগ্যফেরানো সেই দিনটাকেও দেখতে পেলেন। দিনটা ছিল মেঘলা। কিন্তু তারই আড়ালে চোদ্দোবছরের ছেলেটার জীবনে মোড় ঘোরানো একটা সূর্য লুকিয়েছিল।

তখন দুপুর হলেও আকাশে জমে থাকা গাঢ় ছাইরঙের মেঘ দুপুরটাকে সন্ধে করে দিয়েছিল। তারই মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। একটা মাঝারি রাস্তার ধারে তিনটে প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত গাড়ির কবরখানা থেকে ওগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। রং চটা, তোবড়ানো, বডির নানান জায়গায় চকোলেট কিংবা সাদা রঙের পুডিং ঘষা।

গাড়ি তিনটেয় কোনও লোক ছিল না—ড্রাইভারও না। তাই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে এই তিনটে গাড়িকেই টার্গেট করেছিল পিলটু। ওর ঢোলা প্যান্টের পকেটে লুকোনো ছিল একটা বড় স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি। এই দুটো সাধারণ যন্ত্র দিয়েই ও গাড়ির হেডলাইট, টেললাইট, ড্যাশবোর্ডের মিটার, আরও অনেক কিছু খুলে নিতে পারে। গত কয়েক বছরে ও এই কাজটায় বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। পকেট মারার চেয়ে এই কাজটা অনেক নিরাপদ। তাই গাড়ির পার্টস চুরি করে বিক্রি করাটাই পিলটুর আসল পেশা। যখন পার্টস চুরি করার মতো কোনও গাড়ি কপালে জোটে না তখন ও ঝুঁকি নিয়ে পকেট মারার কাজে হাত দেয়। সেখানেও কিছু না জুটলে তখন নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা। শেষের কাজটায় গায়ের রংটা ওকে সাহায্য করে। কারণ ওর মতন টকটকে ফরসা ভিখারি ওল্ড সিটিতে বিলুপ্ত প্রজাতি।

মাঝের গাড়িটার লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ড্যাশবোর্ডের নীচে উবু হয়ে বসে চোরাশিকারির মতন কাজ সারছিল। আর মাঝে-মাঝে মাথা উঁচু করে জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছিল গাড়ির মালিক হতে পারে এমন কেউ গাড়ির দিকে আসছে কি না।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। কখনও-কখনও দু-একটা গাড়ি ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছে। পিলটুর গাড়ির চালে বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়ে শব্দ করে নাচানাচি করছে। ও একমনে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ড্যাশবোর্ডটা খুলছিল আর ভাবছিল ড্যাশবোর্ডে লাগানো তিনটে মিটার খুলে বেচে দিতে পারলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। সেই টাকায় ও টোস্ট আর কষা মাংস খেতে পারবে। কতদিন যে ও মাংস খায়নি!

জিভে জল এসে গেল। খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল।

আর ঠিক তখনই বেপরোয়া গতির কালো গাড়িটা মাতালের মতো এলোমেলো পথে ছুটে এল। চাকা আর ব্রেকের আর্তনাদ তুলে পার্ক করা তিনটে গাড়িকে নেহাতই ভাগ্যের জোরে এড়িয়ে রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল। ল্যাম্পপোস্টটা কাত হয়ে গেল। হেলে পড়তে গিয়েও কীভাবে যেন আটকে গেল।

গাড়ির ভেতর থেকে অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা দেখতে পেল পিলটু।

রাস্তায় লোকজন প্রায় ছিল না। কালো মেঘ আর বৃষ্টি বহু মানুষকেই বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে। তা ছাড়া পিলটু আগেই খেয়াল করেছিল, এ রাস্তায় বেশ কয়েকটা ভাঙাচোরা বাড়ি। চেহারা দেখে মনে হয় বাড়িগুলো সাপখোপ বাদুড় চামচিকের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস। সাধারণত এরকম নিরাপদ অঞ্চল দেখেই পিলটু রাস্তার ধারে পার্ক করা 'নিরাপদ' গাড়ি বেছে নেয়—তারপর কাজে হাত দেয়। সুতরাং অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা পিলটু ছাড়া আর কেউ খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ড্যাশবোর্ডের ওপরে চোখ তুলে পিলটু উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সতর্ক নজরে অ্যাকসিডেন্ট করা গাড়িটাকে দেখছিল।

যেটা ওর সবচেয়ে অবাক লাগল সেটা হল, গাড়িটা ঝাঁ-চকচকে। কালো বডির ওপরে নানান জায়গায় স্টেইনলেস স্টিল। এরকম ফ্যানট্যাসটিক মডেলের গাড়ি ছেলেটা আগে কখনও ওল্ড সিটিতে দেখেনি।

গাড়িটার সারা শরীর থেকে বিলাসিতা আর অহঙ্কার ফুটে বেরোচ্ছে। গাড়ির ছাদে গোল প্লেটের মতো কী একটা জিনিস খাড়া করে বসানো রয়েছে। প্লেট টিভিতে নিউ সিটির নানান প্রোগ্রাম দেখে পোড় খাওয়া ছেলেটার মনে হল, ওই প্লেটটা বোধহয় ডিশ অ্যানটেনা।

সবমিলিয়ে ছেলেটা সিদ্ধান্ত নিল, এই কালো গাড়িটা নিউ সিটির গাড়ি।

চাকা আর ব্রেকের শব্দ পেয়ে চমকে মাথা তুলে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। তারপর অ্যাক্সিডেন্টটা বলতে গেলে ওর চোখের সামনেই ঘটে গেছে। তখনই খেয়াল করেছে, গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।

তা হলে কি ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল? নইলে এভাবে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে এসে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারার কারণ কী?

নতুন ঝকঝকে গাড়িটা এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করায় ছেলেটার খুব খারাপ লাগল। আবার একইসঙ্গে ওর আনন্দও হল। কারণ, ড্রাইভারটা যদি এই ধাক্কার চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে ওর কপাল খুলে যাবে। এই গাড়িটার কিছু পার্টস ও ঝটপট হাতিয়ে নিতে পারবে। আর ড্রাইভারের পকেটে কিছু মালকড়ি থাকলে তাও চেটেপুটে সাফ করতে পারবে।

হাতের কাজ ফেলে রেখে ছেলেটা গাড়ি থেকে বাইরে বেরোল। তখনই ও দেখল, অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়িটা থেকে নেমে এল সুট-বুট পরা একজন মাঝবয়েসি মানুষ। তার হাতে একটা চওড়া ফোন—বোধহয় স্যাটেলাইট ফোন।

লোকটার কপাল গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। গায়ের ছাই-রঙা সুটে রক্তের দাগ। লোকটা বাঁ-হাতে রুমাল চেপে ধরেছে কপালে, আর পাগলের মতো ফোনের বোতাম টিপে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছে। উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

এমনসময় বিকট গর্জন তুলে একটা হাই-পাওয়ার মোটরবাইক ছুটে এল। বাইকটা ধুলো-কাদা মাখা। তার সামনে-পিছনে অনেকগুলো লাইট লাগানো। বাইকে বসে আছে দুজন লোক। মাথায় কালো হেলমেট, চোখে কালো সানগ্লাস। গায়ে কালো টি-শার্ট, পায়ে ফেডেড জিনস। পিছনে বসে থাকা লোকটার হাতে একটা লম্বা নলওয়ালা পিস্তল।

সুট-বুট পরা লোকটা টলতে-টলতে ছুটে গেল একটা ধসে পড়া বাড়ির দিকে। ততক্ষণে বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে দুজন লোক রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং ছুটে পালানো লোকটাকে তাক করে পিস্তলওয়ালা পরপর দুবার ট্রিগার টিপেছে।

'সুঁই—' করে দুবার শব্দ হল। পিলটু বুঝল পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে।

ছুটে পালানো লোকটার কপাল ভালো—ওর গায়ে গুলি লাগল না। ও কপালে রুমাল চেপে ভাঙাচোরা বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। আর বাইকের পাবলিক দুজন সানগ্লাস হেলমেট সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে শিকারকে তাড়া করল।

পিলটু তখন নিজের মতো করে অঙ্ক কষতে শুরু করল।

যদি ওই পোড়ো বাড়িটার ভেতরে গোলাগুলি চলে তা হলে দু-একটা লাশ পড়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর সব গন্ডগোল মিটে গেলে, আততায়ীরা চলে গেলে, লাশ অথবা লাশগুলো চলে আসবে পিলটুর দখলে। তখন তাদের পকেট সাফ করা যাবে। আর শরীরে আংটি, তাবিজ, লকেট যা কিছু পাবে সেগুলোও হাতিয়ে নেওয়া যাবে।

সুতরাং তিনজন মানুষ বাড়িটায় ঢুকে পড়ার পর ছেলেটাও চোরের মতো পা টিপে-টিপে ঢুকে পড়ল।

ভেতরটা অন্ধকার। দেওয়ালের ধসে পড়া ফাঁকফোকর দিয়ে যেটুকু দিনের আলো ঠিকরে আসছে সেটাই একমাত্র আলো। মেঝেতে রাজ্যের ধুলো আর রাবিশ। তারই ওপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে লোহার রড, কাঠের টুকরো। সিলিং-এর কাছাকাছি একটা বড় মাপের মাকড়সার জালও চোখে পড়ল।

বাড়িটার ভেতরে পুরোনো দুর্গন্ধ। ওরা চারজন ঢুকে পড়ায় যে-শব্দ-টব্দ হয়েছে তাতে লুকিয়ে থাকা বাদুড় আর চামচিকের দল ওড়াওড়ি শুরু করে দিয়েছে। দেখতে না পেলেও ওদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

যে-জায়গাটায় ওরা ঢুকেছে সেটা এককালে বোধহয় ঘর-টর কিছু ছিল। এখন ঘরের দেওয়ালগুলো প্রায় না থাকায় জায়গাটাকে বড়মাপের গোডাউন বা ফ্যাক্টরির শেড বলে মনে হচ্ছিল।

পিলটু খুব সাবধানে পা ফেলে অন্ধকারের আড়ালে-আড়ালে এগোচ্ছিল। তারপর একটা ভাঙা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল। চোরা নজরে উঁকি মেরে বাকি তিনজনকে খুঁজতে লাগল।

আধো-অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই ওদের দেখতে পেল।

কাছাকাছি আর-একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে প্রৌঢ় মানুষটি। ওর মুখে যে-সামান্য আলোর আভা দেখা যাচ্ছে তাতে পিলটু বুঝল লোকটা এখনও ফোনের বোতাম টিপে কাউকে ধরার চেষ্টা করছে. আর একইসঙ্গে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

কিলার দুজন খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে ইশারা করছে, পা টিপে-টিপে জায়গা বদল করছে, ইট-কাঠ-লোহা কিছু পায়ে ঠেকলেই সেদিকে না তাকিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাতে যে শব্দ হচ্ছে তা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

পিলটুর চোখের সামনে ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলতে লাগল।

হঠাৎই একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোছায়ামাখা পোড়ো ঘরের এখানে-সেখানে একটা হলদে আলোর বৃত্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিলারদের কেউ টর্চ জ্বেলেছে।

দেওয়াল থেকে ঠিকরে আসা আলোর আভায় দুজন কিলারকেই দেখতে পেল পিলটু।

প্রথমজন পিস্তল উঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলে উঁকিঝুঁকি মেরে শিকারকে খুঁজছে। আর দ্বিতীয়জন বাঁ-হাতে একটা টর্চ ধরে রয়েছে।

পিলটু নিজেকে অন্ধকার খাঁজে আরও মিশিয়ে দিতে চাইল। ওর একটু-একটু যে ভয় করছিল না তা নয়। ও টের পাচ্ছিল, ওর হাত-পায়ের পেশি দপদপ করছে, কাঁপছে। কিন্তু এখন তো পালিয়ে যাওয়া যাবে না! ওকে দেখামাত্রই ওরা গুলি করবে। কারণ, খুনের সাক্ষী না রাখাটাই দস্তুর।

আচমকা মোবাইল ফোনের সুরেলা রিং টোন শোনা গেল।

একটা ধসে পড়া দেওয়ালের পিছনে আলোর আভা চোখে পড়ল। জ্বলছে-নিভছে। সেই আভায় শূন্যে ভেসে থাকা একটা মুখের আদলও দেখা গেল।

প্রথম লোকটার স্যাটেলাইট ফোন।

লোকটা বোধহয় বোতাম টিপে ফোন কেটে দিল। কারণ, রিং টোনটা হঠাৎ থেমে গেল। আর ফোনের আলোটাও হারিয়ে গেল। হয়তো ফোনের আলো চাপা দিতে ফোনটাকে পোশাকের আড়ালে কোথাও চটপট লুকিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ততক্ষণে শব্দ এবং আলো লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি ছুটে গেছে। একবার নয়—অন্তত চারবার। চাপা 'সুঁই-সুঁই—' শব্দ হিসেব করে পিলটুর অন্তত তাই মনে হল।

একইসঙ্গে যন্ত্রণার আর্তনাদ শোনা গেল।

শিকারের গায়ে গুলি লেগেছে।

কিলার দুজন নিজেদের মধ্যে আঙুল তুলে ইশারা করল। পিস্তল হাতে লোকটা লম্বা-লম্বা পা ফেলে রাবিশ, লোহা, কাঠ ডিঙিয়ে আহত শিকারের দিকে ছুটে গেল। ভাঙা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে শিকারের ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

ঠিক তখনই রিভলভারের গুলির শব্দে গোটা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল। পরপর দুবার।

সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িটায় যেন হইচই শুরু হয়ে গেল।

অন্ধকারে আস্তানা গেড়ে থাকা চামচিকের ঝাঁক মিহি কিচকিচ শব্দ করে উড়তে শুরু করল। বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। টর্চের আলোয় বেশ কয়েকটা ছটফটে উড়ন্ত শরীর দেখা গেল। একবার যাচ্ছে, একবার আসছে।

দ্বিতীয় কিলারের টর্চের আলো গিয়ে পড়েছিল তার সঙ্গীর ওপরে। সে দেখতে পেল দুটো শরীর জট পাকিয়ে পড়ে আছে। ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে একটা ছোটমাপের রিভলভার বের করে নিল। তারপর এক-পা-এক-পা করে দুটো শিথিল শরীরের দিকে এগোতে লাগল।

পিলটু সবকিছুই লক্ষ করেছে। ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পড়ছিল। কী এক অজানা ভয়ে ও পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা বের করে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। তারপর ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎই উড়ন্ত দুটো চামচিকে ওর মুখে এসে ধাক্কা মারল। নিজের অজান্তেই ও হাতের ঝটকা দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটুকরো চিৎকারও বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেছে। দ্বিতীয় খুনিকে ছেলেটা আর দেখতে পাচ্ছিল না। হয়তো ওর চিৎকার শুনে অন্ধকারের ভাঁজে গা-ঢাকা দিয়েছে।

পিলটু এখন কী করবে? এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? টর্চ নিভিয়ে লোকটা গেল কোথায়? কোথায় গেল?

দ্বিতীয় খুনির সঙ্গে পিলটুর দূরত্ব ছিল মাত্র দশ-বারো ফুট। সুতরাং পিলটুর চিৎকার ও স্পষ্টই শুনতে পেয়েছে। আর সেইজন্যই আলো নিভিয়ে দিয়েছে। যাতে অন্ধকারে অচেনা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলাটা বেশ জটিল এবং কঠিন হয়ে ওঠে।

পিলটুর বুকের ভেতরে বিগ ড্রাম বাজাচ্ছিল কেউ। নিশাচর প্রাণীর মতো অন্ধকারে চোখ মেলে ও প্রাণপণে দেখতে চেষ্টা করছিল। বাড়িটার বোটকা দুর্গন্ধ ওর নাকে একেবারে চেপে বসছিল। চঞ্চল চামচিকেগুলো ওদের ওড়াউড়ি এখনও থামায়নি।

বাড়িটার সদরের দিকে নজর দিল পিলটু। সেদিকে তাকালে দরজার হাঁ করা ফ্রেমের মাপে দিনের মেঘলা আলো দেখা যাচ্ছে। পিলটু কি এখন সেদিক লক্ষ্য করে দৌড় দেবে? পকেট বা লকেট হাতানোর মতলব এখন মুলতুবি থাক। আগে নিজের প্রাণটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে সুরক্ষিত করা দরকার।

পিলটু খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল। এবারে শুরু হবে ওর বিপজ্জনক মরণছুট। ওয়ান—টু—থ্রি—।

কিন্তু ছুট শুরু হওয়ার আগেই ওর মুখে আচমকা টর্চের আলো এসে পড়ল। টর্চ হাতে দ্বিতীয় খুনি ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে। সিগারেট আর মদের গন্ধ পেল পিলটু।

'কে তুই?' জড়ানো গলায় খুনি ওকে জিগ্যেস করল।

সঙ্গে-সঙ্গে পিলটু স্ক্রু-ড্রাইভারটা খুনির পেটে ঢুকিয়ে দিল।

পিলটু কখনও মাখন খায়নি। মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে ঠিক কীরকম অনুভূতি হয় ও জানে না। কিন্তু তবুও ওর মনে হল, ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকম।

একইসঙ্গে পিলটু ভয়ার্ত পশুর মতো তীব্র চিৎকার করে উঠেছে এবং লোকটাকে প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মেরেছে।

অন্ধকারে ইট-কাঠের ওপরে উলটে পড়েছে খুনি। হাত থেকে টর্চ ছিটকে গেছে। ছোট পিস্তল থেকে 'গুড়ুম' শব্দ করে একটা গুলি ছুটে গেছে ঘরের ভাঙাচোরা সিলিং-এর দিকে।

প্রচণ্ড ভয় থেকে মানুষের মধ্যে একটা কোণঠাসা বেপরোয়া ব্যাপার জেগে ওঠে। চোদ্দোবছরের ছেলেটারও তাই হল। ও হুড়মুড় করে পৌঁছে গেল মেঝেতে পড়ে থাকা টর্চটার কাছে। ওটা তুলে নিয়ে হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিল খুনির মাথায়। সংঘর্ষের ঝটকায় টর্চ নিভে গেল।

স্ক্রু-ড্রাইভার পেটে বেঁধা অবস্থাতেই লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু টর্চের দ্বিতীয় আঘাত ওকে আবার মাটিতে পেড়ে ফেলল। একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে।

পিলটু বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিল। ওর এবার মনে হল পালানো দরকার। কারণ, এতবার গুলির শব্দ হয়েছে, চিৎকার-চেঁচামেচি হয়েছে যে, লোকজন এসে পড়তে পারে। বরং একটু পরে ও ঘুরেফিরে এখানে আবার আসবে। তখনও যদি বডিগুলো বেওয়ারিশভাবে পড়ে থাকে তা হলে চটপট ওর কাজ সেরে নেবে।

হাতের চর্চটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়াল। পনেরো-কুড়ি ফুট দূরেই হাঁ-করা সদর দরজা। সেই ফাঁক দিয়ে আলো আর বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা ইট-পাথর আর কাঠ ডিঙিয়ে ছেলেটা চার-ছ'পা এগোতেই মোবাইল ফোনের সুরেলা বাজনা শোনা গেল।

বাজনার সুরটা ছেলেটার চেনা। প্রথম লোকটার স্যাটেলাইট ফোন।

পিছন ফিরে তাকাল। দূরে অন্ধকারে রঙিন আলো জ্বলছে-নিভছে। কেউ ফোন করেছে লোকটাকে।

বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা লোভ ঝলসে উঠল মাথায়। পরে যখন কাজ সারতে আসবে, আসবে। এখন স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে চম্পট দিলে কেমন হয়?

লোভ আর আশঙ্কার লড়াইয়ে লোভ জিতে গেল।

পিলটু ঘুরে দাঁড়াল। পায়ে-পায়ে ফিরে চলল স্যাটেলাইট ফোনটার দিকে।

যখন ও ফোনের খুব কাছে পৌঁছে গেল তখনও ফোনটা বাজছিল। ফোনের আলোয় দেখল দুটো কাহিল শরীর এখনও জট পাকিয়ে পড়ে আছে। তারই একটার হাতের মুঠোয় ফোনটা ধরা।

ঝুঁকে পড়ে ফোনটার দিকে হাত বাড়াতে যাবে অমনি বোতাম টিপে কলটা রিসিভ করল কেউ। গোঙানির স্বরে কেউ 'হ্যালো! হ্যালো!' বলতে লাগল।

আবছা আঁধারে দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লাগছিল। জটপাকানো শরীর দুটোর দিকে তাকিয়ে পিলটু 'হ্যালো' বলা মুখটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ জটের বাইরে বেরিয়ে থাকা একটা হাত কলটা রিসিভ করেছে।

ফোন থেকেও যে কেউ 'হ্যালো! হ্যালো!' বলছে সেটাও ক্ষীণভাবে পিলটুর কানে আসছিল। ও কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কয়েকসেকেন্ডের দ্বিধা কাটিয়ে ও ফোনটা দুর্বল হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ওর মুখে ফোনের রঙিন আলো পড়ায় ফোনের আহত মালিক বোধহয় ওকে দেখতে পেল।

ভাঙাচোরা কাতর গলায় অন্ধকার মেঝের দিক থেকে কেউ বলে উঠল, 'খোকা, আমাকে বাঁচাও...।'

লোকটা এখনও বেঁচে আছে!

পিলটু অবাক হল। কলটা কেটে দেওয়ার জন্য ও আন্দাজে ফোনের নানান বোতাম টিপতে লাগল। ফোনের 'হ্যালো! হ্যালো!'টা হঠাৎই থেমে গেল।

ফোনটা এবার কণ্ঠস্বরের দিকে ফেরাল পিলটু। দেখল, গাড়ি থেকে নেমে আসা সেই সুট পরা মানুষটা। ওর কপাল মুখ সব রক্তে মাখামাখি। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। ওর বুকের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কালো টি-শার্ট পরা একটা দেহ। সেইজন্যই সুট পরা মানুষটা ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে 'হ্যালো' বলতে পারছিল না।

'আমাকে বাঁচাও! তুমি...তুমি যা চাও তাই দেব...তাই দেব।' কাতর অনুনয়ের সুরে প্রৌঢ় বলল।

পিলটু কী করবে ভেবে না পেয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার...নাম কী?'

কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'পিলটু...।'

'পিলটু, প্লিজ...আমাকে...আমাকে বাঁচাও। আমি নিউ সিটির পিস ফোর্সের...মার্শাল। ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্টের মার্শাল... বলধর পাত্রা। বলধর পাত্রা। আ-আমাকে বাঁচাও। আমার...আমার...গায়ে গুলি

লেগেছে। অনেকগুলো। আমাকে...বাঁচাও। প্লিজ। এখানে ফেলে...যেয়ো না। তুমি যা চাও...সব দেব। প্লিজ...।' যন্ত্রণায় মোচড় খাওয়া কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে মানুষটা প্রবল হাঁপাচ্ছিল। ফোনের আবছা আলোয় ওর চোখদুটো মরা মানুষের চোখের মতো লাগছিল।

কিন্তু এ কী শুনছে ছেলেটা!

বলধর পাট্টা! পিস ফোর্সের মার্শাল! চিফ! নিউ সিটিতে বলতে গেলে যার কথাই শেষ কথা! যার নামে বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে! শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নেমে যায়। গলা শুকিয়ে যায়! যার ধমকে অনেকেই প্যান্ট ভিজিয়ে ফ্যালে!

রাস্তায়-রাস্তায় বসানো অসংখ্য প্লেট টিভির দৌলতে বলধর পাট্টার কুখ্যাতির কথা পিলটুর অজানা ছিল না। ওল্ড সিটিতে সবাই বলে, বলধরের ডাকনাম হল 'শয়তান'। বলধর হিংস্রতায় এম. এ., পিএইচ. ডি. আর নিষ্ঠুরতায় ডি. এসসি.।

সেই 'সাক্ষাৎ যম' অমানুষটা কাতর অসহায়ভাবে পড়ে আছে ছেলেটার পায়ের কাছে! হদ্দ ভিখারির মতো প্রাণভিক্ষা চাইছে এই কিশোরের কাছে! বলছে, 'তুমি যা চাও তাই দেব...।'

পিলটুর শরীরে রোমাঞ্চ খেলে গেল। ও পলকে সিদ্ধান্ত নিল। ফোনটা পকেটে রাখল। তারপর ঝুঁকে পড়ে কালো টি শার্ট পরা বডিটাকে টেনে সরাতে লাগল।

কয়েকবারের চেষ্টাতেই বডিটা বলধরের শরীরের ওপর থেকে নামিয়ে দিল পিলটু। ওর দু-বগলে হাত ঢুকিয়ে টেনে ওকে সোজা করল। তারপর পিঠটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোনওরকমে বসাল।

বলধর যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। 'আ:! লাগছে...আস্তে...' এসব বলছিল।

পিলটুর হাত চটচটে কীসে যেন ভিজে গেল। আঁশটে গন্ধ নাকে এল।

'ফোনটা...ফোনটা...আমাকে দাও...।'

বলধরের মিনমিনে দুর্বল স্বর যেন বহুদূর থেকে পিলটুর কানে ভেসে এল।

ও কোনও কথা না বলে স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে বলধরের ডানহাতে ধরিয়ে দিল।

কাঁপা আঙুলে ফোনের বোতাম টিপল বলধর। তারপর ফোনটা কানে চেপে ধরল।

মেঘ বোধহয় কিছুটা পরিষ্কার হয়েছিল। কারণ, হঠাৎই পিলটু খেয়াল করল, দিনের আলো খানিকটা বেড়ে গেছে। চামচিকে কিংবা বাদুড়ের ওড়াউড়ির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শব্দ বলতে শুধু বলধর আর পিলটুর শ্বাস -প্রশ্বাসের শব্দ।

ও-প্রান্তে ফোনটা কেউ ধরতেই বলধর ক্লান্ত গলায় বলল, 'মার্শাল পাট্টা। পিস ফোর্স। এস. ও. এস। জলদি এসো। ইমার্জেন্সি—লেভেল থ্রি। জি. পি. এস. কো-অর্ডিনেট সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি বাই ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান। ওল্ড সিটি, ব্লক নাইন। ইমার্জেন্সি—লেভেল থ্রি। এস. ও. এস.। কাম রাইট নাউ। এখানে...আমি আর পিলটু আছি। পিলটু...ওল্ড সিটির ইয়াং বয়। কাম। মেক...ইট...কুইক। সেভ মি। সেভ মি...।'

স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে ফোনে একটানা কথা বলছিল বলধর। তারপর হঠাৎই চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো ওর কথা থেমে গেল। হাত থেকে ফোনটা খসে পড়ল। শরীরটা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল মেঝের দিকে।

পিলটু তাড়াতাড়ি বসে পড়ল ওর হেলে পড়া শরীরের কাছে। ওকে আরও হেলিয়ে দিয়ে ওর রক্তাক্ত মাথাটা প্রায় কোলে নিয়ে নিল। বেশ বুঝতে পারল ওর জামা-প্যান্টে রক্ত মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হোক। মার্শালের মাথা কোলে নিতে পারে ক'জন? মার্শাল ওকে বলেছে, ও যা চায় সব দেবে। সব।

বলধরের মাথা কোলে নিয়ে সেই 'সব'-এর আশায় বসে রইল পিলটু। ওল্ড সিটিতে অনেক হয়েছে। এবার নিউ সিটির স্বপ্নকে ছুঁতে চায় ও।

পিলটু বলধরকে ডাকল, 'স্যার! স্যার!'

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

বলধরকে নাড়া দিল পিলটু। তাতে বলধরের শরীরটা যেভাবে নড়ল পিলটু আন্দাজ করল মার্শাল বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এমনসময় মেঝেতে পড়ে থাকা ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

ফোনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেলেটা। কে ফোন করছে মার্শালকে?

ফোনটা তুলে নিল। আন্দাজ করে কল রিসিভ করার বোতামটা টিপল। তারপর ফোনে 'হ্যালো' বলল।

ওপাশ থেকে একটা ভারি গলা শোনা গেল : 'কে, পিলটু?'

থতমত খেয়ে ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ—।'

'স্যার তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।' কথা বলতে গিয়ে পিলটুর গলা কেঁপে গেল। ও বুঝতে পারল পিস ফোর্সের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে।

'তোমার কোনও ভয় নেই। আমাদের অ্যাকশন ফোর্স এক্ষুনি ওখানে পৌঁছে যাচ্ছে। ডোন্ট উয়ারি, ব্রেভ বয়! ওভার অ্যান্ড আউট।'

ফোন কেটে গেল। সব কথার মানে স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও ছেলেটা বুঝল পিস ফোর্স সামরিক পরিস্থিতির ঢঙে কাজে নেমে পড়েছে।

হলও ঠিক তাই। পিস ফোর্স সেই জরাজীর্ণ বাড়িটায় পৌঁছে গেল দশমিনিটের মধ্যেই।

আকাশ থেকে নীল-সাদা চারটে শুটার রাস্তায় নেমে এল। একইসঙ্গে কালো রঙের চারটে গাড়ি শব্দ করে ছুটে এসে তীব্রভাবে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃষ্টিভেজা রাস্তায়। ডিশ অ্যানটেনা লাগানো একটা সাদা ভ্যান তার পাশাপাশি এসে থামল। তার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইউনিট'। সেই ভ্যানের দরজা খুলে ছ'জন মেডিক নেমে পড়ল রাস্তায়। তাদের হাতে অক্সিজেন মাস্ক, ফাইবারের স্ট্রেচার আর 'এস. ও. এস.' মেডিকেল কিট। তারা ব্যস্তভাবে ছুটে গেল ভাঙা বাড়িটার দিকে। কেউ একজন চিৎকার করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল।

তারপরই অনেকগুলো হ্যালোজেন টর্চের আলোয় পিলটুদের 'যুদ্ধক্ষেত্র'টা ভেসে গেল। মেঝেতে, দেওয়ালে, সিলিং-এ সেই উজ্জ্বল সাদা আলো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় চলে বেড়াতে লাগল। ভারী বুটের শব্দে বাদুড় চামচিকেরা আবার সচকিত হয়ে উঠল। উড়ে বেড়াতে লাগল।

আলোর কাটাকুটি খেলার আড়াল থেকে কেউ একজন ডাকল : 'পিলটু—।'

'এই যে। আমি এখানে।'

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই সবক'টা দেহ আর মৃতদেহ পিস ফোর্সের দখলে চলে গেল।

এরপর যা হল তা পিলটু স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি।

শুটারে চড়ে ও আকাশপথে উড়ে চলল নিউ সিটির দিকে। নীচে, বহু নীচে, দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটির জরাজীর্ণ রুগ্ন চেহারা। একটা পুরোনো ঘা-এর মতো ছড়িয়ে রয়েছে শহরটা। আয়ু ফুরিয়ে আসা, বিছানায় মিশে থাকা, একটা রুগির মতো ধুকপুক করছে শহরটার হৃৎপিণ্ড। শ্রান্ত-ক্লান্ত শহরটা হাঁপাচ্ছে।

এই শহরে যদি আর ফিরতে না হয় তা হলে দারুণ হবে। সেই আশায় মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগল পিলটু। আর একইসঙ্গে চাপা উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা ধকধক করতে লাগল। ছলনাময়ী ভাগ্যশ্রী এখন ওর জন্য কী উপহার সাজিয়ে রেখেছে কে জানে!

শিসের শব্দ তুলে নীল সাদা রঙের শুটার আকাশপথে ছুটছিল। ছেলেটার পাশে একজন পিস ফোর্সের লোক। ঝকঝকে পোশাক দেখে মনে হয় ফোর্সের কেউকেটা একজন হবেন। আর সামনের সিটে দুজন—তার মধ্যে একজন শুটারের পাইলট।

শুটারটা স্বচ্ছ ডোমে ঢাকা। ভেতরটা এয়ারকন্ডিশনড। সিটে বসে নিউ সিটির মিনিয়েচার ছবি দেখতে পাচ্ছিল ছেলেটা। ঠিক যেন আর্কিটেক্টের তৈরি একটা ঝিনচাক শহরের মডেল। মডেল তো নয়—স্বপ্ন। যেন

সেই জীবন্ত স্বপ্নকে কেউ পরম যত্নে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে।

সেই স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ছেলেটা বিলাসিতার কল্পনা করছিল। আর ওর চোখের সামনে স্বপ্নটা খুব ধীরে-ধীরে বড় হচ্ছিল, সাকার হচ্ছিল। কারণ শুটার নামতে শুরু করেছিল।

স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ক্লান্তিতে ছেলেটা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ল্যান্ডিং জোনে শুটার ল্যান্ড করতেই ছেলেটার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর পিস ফোর্সের লোকজন ওকে নিয়ে যা শুরু করল তাতে ছেলেটার মনে হল ও কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি—অতিথি হয়ে নিউ সিটিতে এসেছে। এখানকার কর্মকর্তারা ওকে কোলে বসাবেন না মাথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছেন না।

পিস ফোর্সের লোকজন আর কর্মকর্তাদের কথাবার্তা শুনে ছেলেটা বুঝতে পারল, ওকে টপমোস্ট সিকিওরিটি জোনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে একটা গোল্ডেন পেন্টহাউসে টপমোস্ট কমফোর্ট লেভেলে ওকে রাখা হবে। পিস ফোর্সের ছ'জন স্টাফ চব্বিশঘণ্টা ওর তদারকিতে থাকবে।

ছেলেটার মনে হল, স্বপ্ন যখন সত্যি হয় বোধহয় এরকম হঠাৎ করেই হয়। আর সেইজন্যই ও ব্যাপারটাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

ঝকঝকে নতুন জামাকাপড় পরে পেন্টহাউসের বেডরুমে বিছানায় বসে ছিল ছেলেটা। ঘিয়ে রঙের সিল্কের চাদরে ঢাকা নরম বিছানা। তার ওপরে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে ও বুঝতে চাইছিল ব্যাপারটা স্বপ্ন, না বাস্তব।

বাস্তব হয়ে ওঠা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ছেলেটার দিন কাটতে লাগল। আর তারই মধ্যে চলতে লাগল জিজ্ঞাসাবাদ।

পিস ফোর্সের নানান স্তরের লোকজন ওর ঘরে আসতে লাগল। তারা পালা করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওকে প্রশ্ন করতে লাগল। সেদিন দুপুরে বলধর পাট্টাকে দেখা থেকে শুরু করে পিস ফোর্সের অফিসাররা অকুস্থলে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ওকে বারবার বলতে হচ্ছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পিলটুর কথা শুনে-শুনে ওরা ওর স্টেটমেন্টের রিয়েল টাইম ভিডিয়ো সিমুলেশান তৈরি করছিল। ওর ঘরের মধ্যে কমপিউটার এবং আরও কীসব যন্ত্রপাতি এনে তিনজন লোক সিমুলেশানের কাজে ব্যস্ত ছিল। আর দুজন অফিসার পিলটুকে একের পর এক প্রশ্ন করছিল।

পিলটুর উত্তর শুনে-শুনে ওরা সিমুলেশান তৈরি করছিল, কারেকশান করছিল, পিলটুকে বারবার ওটা দেখাচ্ছিল। এইভাবে চারদিন কেটে যাওয়ার পর অডিয়ো-ভিশুয়াল সিমুলেশানটা ঠিকঠাক তৈরি হয়েছে বলে ওদের মনে হল।

পিলটু যখন ফাইনাল সিমুলেশানটা দেখল তখন ও অবাক হয়ে গেল। সেইদিনকার ঘটনাগুলো নিয়ে কেউ যেন একটা সিনেমা তৈরি করেছে।

সেই সিনেমা শুরু হল। কমপিউটারের পরদার এককোণে সময় দেখা যাচ্ছে। ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে একসেকেন্ড-একসেকেন্ড করে সময় পালটে যাচ্ছে। পরদায় ঘটনা শুরু হল। ঝাঁ-চকচকে কালো গাড়িটা মাতালের মতো ছুটে এসে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল।

সিনেমাটা দেখে অবাক হয়ে গেল পিলটু। কোথাও কোনও ভুল নেই। ও যেমন-যেমন স্টেটমেন্ট দিয়েছে, নানান প্রশ্নের উত্তরে যা-যা বলেছে, ঠিক সেই-সেই ঘটনাগুলোর চলমান ছবি এঁকে ওরা ওর চোখের সামনে সাজিয়ে দিয়েছে।

একটা আশ্চর্য ভিডিয়ো গেম দেখছিল পিলটু। মানুষগুলো একটু পুতুলের মতো লাগছিল ঠিকই, তবে বাকি সবকিছু যেন আসলের মতো। গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, মোটরবাইকের শব্দ, গুলির আওয়াজ—এমনকী বাদুড় আর চামচিকের ডানা ঝাপটানোর শব্দটাও ওরা আসলের মতো তৈরি করে ঠিকমতো জুড়ে দিয়েছে।

পিলটুকে নিয়ে এসব যখন চলছিল তখন বলধর পাট্টা নিউ সিটির এক্সট্রিম মেডিকেল কেয়ার ইউনিটে সেরে উঠেছিল। তার সেরে ওঠার খবর পিস ফোর্সের অফিসারদের কাছেই শুনছিল পিলটু। বলধরের গায়ে

চারটে গুলি লেগেছে, কিন্তু এখন সে বিপদের আওতার বাইরে। চিফ মেডিক অন্তত তাই বলেছেন।

পিস ফোর্সের অফিসাররা বলধরের স্টেটমেন্টও নিয়েছেন। সেই স্টেটমেন্ট পিলটুর স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে তবেই ফাইনাল ভিডিয়ো সিমুলেশানটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা দেখে বলধর অ্যাপ্রুভ করেছে। সুতরাং এই ফাইনাল সিমুলেশানটাই এভিডেন্স আরকাইভে রাখা হবে।

মার্শাল বলধর পিলটুর সাহসের খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, 'ও আমার স্পেশাল গেস্ট। ওর আদর যত্নে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।'

না, কোনও ফাঁক নেই। কিন্তু সে তো মাত্র ক'দিন! তারপর, বলধরের এই রোমাঞ্চকর মামলার আঁচ মিটে গেলে, পিলটুকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওল্ড সিটিতে—ওর আগের জায়গায়, ছেঁড়া-ফাটা পলিথিনে ছাওয়া ঝুপড়ির নীচে। তখন একদিনের জন্য সত্যি হওয়া স্বপ্নটা আবার শুধু স্বপ্ন হয়ে যাবে। আবার ওকে ভিক্ষে করতে হবে, পকেট মারতে হবে, গাড়ির পার্টস চুরি করে বিক্রি করতে হবে।

স্ক্রু-ড্রাইভারটার কথা মনে পড়ল পিলটুর। পিস ফোর্সের অফিসাররা ওটা ওকে আর ফেরত দেননি। বলেছেন, ওটা নাকি ওঁদের এভিডেন্স আরকাইভে রেখে দেওয়া হবে। সুতরাং, হাতুড়িটা সঙ্গে থাকলেও পিলটুকে নতুন একটা স্ক্রু-ডাইভার কিনতে হবে। গাড়ির 'কাজ' শুরু করতে গেলে ওটা কেনা দরকার।

গোল্ডেন পেন্টহাউসে বসে পিলটু যখন এসব কথা ভাবছে তখনই ও খবর পেল, বলধর পাট্টা পুরোপুরি সেরে উঠে ওর বাড়িতে ফিরে গেছে। এর সঙ্গে আরও যে-খবরটা ওকে দেওয়া হল সেটা শুনে ওর বুকের ধুকপুকুনি আচমকা বেড়ে গেল। হাতুড়ি পেটার শব্দ হতে লাগল বুকের ভেতরে।

বলধর পাট্টা ওকে ডেকে পাঠিয়েছে নিজের বাড়িতে।

আস্তানা বদলে গেল ছেলেটার।

এক একর সবুজ জমির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক বিমূর্ত ছাঁদে তৈরি একটা তিনতলা ছোট বাড়ি। তাকে ঘিরে পার্ক, দিঘি, গাছপালা—আরও কত কী! এই বাড়িতে থাকে একজনমাত্র মানুষ। তাকে ঘিরে হুকুম তামিল করার জন্য আছে আরও বারোজন পুরুষ।

বলধর পাট্টা আর একডজন পুরুষ। পিলটু সেখানে গিয়ে মোট পুরুষের সংখ্যা চোদ্দোয় নিয়ে গেল।

আভিজাত্য আর অহঙ্কারে সাজানো একটা বিশাল মাপের ড্রইংরুমে বলধরের মুখোমুখি হল ছেলেটা। বলধরকে ভালো করে দেখল।

মেরুন রঙের ড্রেসিং গাউন পরা প্রৌঢ় কাঠামোটা টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার সামনের দিকে শতকরা প্রায় চল্লিশভাগ টাক পড়ে গেছে। বাকিটা কাঁচা-পাকা পাতলা চুলে ঢাকা। চোয়াল চওড়া। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখে বয়েসের ভাঁজ। তবে সেইসঙ্গে রুক্ষতার ছাপও আছে। ঠোঁটজোড়া বড় বেশিরকম লালচে। ড্রেসিং গাউনের হাতার বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতের শিরা ফুলে আছে। হাতের আঙুলগুলো যে শক্তিশালী সেটা চওড়া গাঁট আর খসখসে চামড়া থেকে আঁচ করা যায়।

পিলটু অবাক চোখে বসবার ঘরের জাঁকজমক দেখছিল। সেইসঙ্গে বিস্ময়ভরা চোখে বলধরকে দেখছিল। অগাধ ক্ষমতা এই মানুষটার। ক্ষমতার সাগরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এক লাইটহাউস। সেই লাইটহাউসের চূড়া থেকে ক্ষমতার অবিরাম বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

ভারী গলায় বলধর বলল, 'পিলটু—তাই তো নাম তোমার?'

বোবা পিলটু মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'পিলটু, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।' বলধর ধীরে-ধীরে বলল, 'তা ছাড়া তোমার সাহসও কম নয়। কারণ, সেইদিনকার ঘটনার ভিডিয়ো সিমুলেশানটা আমি দেখেছি। য়ু আর রিয়েলি ব্রেভ, পিলটু। আই অ্যাম রিয়েলি প্রাউড অফ য়ু।'

শেষের ইংরেজি কথাগুলোর অর্থ ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তবুও ও আন্দাজ করতে পারল যে, কথাগুলো প্রশংসার।

একটু থেমে বলধর পাট্টা আবার বলল, 'তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ, পিলটু। ওই বিপদের সময় আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি যা চাও সব দেব। আজ সে-কথা আমি ভুলে যাইনি। বলধর পাট্টা একবার যা বলে তার কখনও নড়চড় হয় না।' একটু থামল, পিলটুর কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল : 'বলো, তুমি কী চাও। কোনওরকম সঙ্কোচ বা লজ্জা করবে না। বলো...।'

কয়েকমুহূর্ত বলধরের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। ওর গলা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে তাকিয়ে ও ঘরের দেওয়ালের কারুকাজ দেখছিল, বিচিত্র আলোকসজ্জা দেখছিল, বাতাসে নাক টেনে কেমন এক সুগন্ধ টের পাচ্ছিল। আর বিস্ময়ে স্থবির হয়ে ভাবছিল, এটা পৃথিবী, না স্বর্গ?

'বলো, বলো—লজ্জা কোরো না।'

'আমি স্যার আপনার কাছে থাকতে চাই।'

তুবড়ির আগুনের ফুলকির মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাগুলো। কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পরই পিলটু ভয় পেল। বলধর রাগ করবে না তো! এক্ষুনি পিলটুকে গলা ধাক্কা দিয়ে ওর নরকে পাঠিয়ে দেবে না তো!

কিন্তু বলধর রাগ করল না—বরং হাসল।

'তোমার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ নেই—।'

'কেউ নেই?' বলধর পাট্টার ভুরু কুঁচকে গেল।

'কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই-বোন—কেউ নেই।' সাহসী স্পষ্ট গলায় বলল ছেলেটা।

বলধর সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথা পিছনে হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। বিশাল ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে সেই হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হাসির দমক থামলে চোখের কোণ থেকে জল মুছে নিল বলধর। বড়-বড় চোখে পিলটুর দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, 'আমারও কেউ নেই। মা, বাবা, ভাই-বোন—কেউ নেই।'

পিলটু আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাই চুপ করে রইল।

ওকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল বলধর। তারপর খুব ধীরে-ধীরে ওপর-নীচে মাথা নাড়ল।

ছেলেটার সাহস আছে। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার কেমন অনায়াসে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা জোয়ানের তলপেটে! যেখানে বলধরের কপালে নিশ্চিত মৃত্যু লেখা ছিল সেখানে এই ছেলেটা সেই কপাল-লিখন মুছে বলধরকে নতুন জীবন দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সুযোগ করে দিয়েছে।

না:, কোনও সন্দেহ নেই, ছেলেটা একটা তেজিয়ান কুঁড়ি। ওর গায়ে হয়তো রুক্ষ অভাবী জীবনের ধুলো-ঝড়-বৃষ্টির নোংরা মলিন প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু কুঁড়িটাকে চেনা যাচ্ছে। অন্তত বলধর চিনতে পারছে। এর ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে আগামীদিনের ক্ষমতার ফুলের পাপড়ি। ছেলেটা বাচ্চা হলেও সিংহের বাচ্চা।

ঠোঁটের কোনা কামড়ে বলধর ভাবছিল। ক্ষমতার যে-শীর্ষে বসে সে ক্ষমতার সতেজ তরঙ্গ প্রতিমুহূর্তে বিকিরণ করে চলেছে সেই শীর্ষাসন সে কাকে দিয়ে যাবে? এ-কথা ভেবে-ভেবে কয়েকবছর ধরে রাতে ঘুমোতে পারে না বলধর। তার চারপাশে যারা আছে তাদের মধ্যেও সে খুঁজেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছে বারবার। কিন্তু সমাধান মেলেনি। যোগ্য কোনও উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পায়নি বলধর। এদিকে ওল্ড সিটির গোপন ঘাতকদল বহুদিন ধরেই তাকে খুন করার জন্য ছক কষছে, সুযোগ খুঁজছে। দ্বিমুখী এই চিন্তার চাপ এতদিন বলধরের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

বোধহয় আজকের দিনটার জন্যই। সমাধানের এই মুহূর্তটার জন্য। গোপন ঘাতকরা ওকে গুলি করেছিল বলেই আগামীদিনের বলধর পাট্টাকে খুঁজে পেয়েছে বলধর। এই কুঁড়িটাকে অত্যন্ত যত্নে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পিলটুর চিবুকে আঙুল ছোঁয়াল। হেসে বলল, 'তুমি আমার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে নতুন নাম দেব। নতুন জীবন দেব। লেখাপড়া শেখাব। পিস্তল চালানো শেখাব। তোমাকে চ্যাম্পিয়ান তৈরি করব। লোকে জানবে তুমি আমার বহুবছর আগে হারিয়ে যাওয়া ভাই। হঠাৎ করে ওল্ড সিটিতে তোমাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। বুঝেছ?'

ছেলেটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও বলধরকে জড়িয়ে ধরল, আবেগে কেঁদে ফেলল। আর তারই মধ্যে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'স্যার, স্যার...। আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না, স্যার...।'

'স্যার নয়—দাদা, দাদা—।' ছেলেটার মাথায় আদরের হাত বোলাতে-বোলাতে বলধর বলল, 'পিলটু নামটা ভুলে যাও। এখন থেকে তোমার নাম শ্রীধর—শ্রীধর পাট্টা।'

শ্রীধর...শ্রীধর পাট্টা। নতুন নামটা ছেলেটা নি:শব্দে উচ্চারণ করতে লাগল বারবার।

সেই মুহূর্তে পিস ফোর্সের আগামীদিনের মার্শালের জন্ম হয়েছিল। নতুন এক বলধর পাট্টার জীবনরেখা শুরু হল।

জন্মদিনটা আজও মনে আছে শ্রীধরের। ১৯ মে, বুধবার, ২৩৩২ সাল। এক সিংহের আস্তানায় নতুন এক সিংহের জন্ম হয়েছিল।

আজ, এখন, এই সিংহটা ন্যানোমিরারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পল্টনের কথা ভাবছে। আর ভাবতে গিয়ে বারবার মনে হয়, ওটা যেন কোনও প্রাচীন যুগের এক আবছায়া স্বপ্ন। অথবা বড়জোর মনে-মনে কোনও কাল্পনিক কমপিউটারের মনিটরে কোনও আজব সিমুলেশান দেখছেন।

শ্রীধরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বলধর কোনওরকম খামতি রাখেনি। ওকে দিয়ে জিমে ব্যায়াম করিয়েছে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়েছে। শিখিয়েছে রাজনৈতিক কূটকৌশল—তার সঙ্গে হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা।

হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতায় বলধর যদি ছিল পিএইচ. ডি. আর ডি. এসসি., তা হলে শ্রীধর একেবারে নোবেল লরিয়েট।

বলধরকে 'দাদা' ডেকে বড় হতে লাগলেন শ্রীধর—আর সেইসঙ্গে 'দাদাগিরি'-তেও প্রশিক্ষণ নিতে লাগলেন। মানুষের শরীরকে কতরকমভাবে যন্ত্রণা দেওয়া যায় আজ শ্রীধর তা জানেন। তিনি জানেন কীভাবে ভয়কে ব্যবহার করতে হয়। জানেন আরও বহু গোপন কৌশল।

লড়াইয়ের শ্যাডো প্র্যাকটিস শেষ করলেন। এয়ারকন্ডিশনড জিম হওয়া সত্বেও শ্রীধরের শরীরে ঘামের একটা পাতলা স্তর তৈরি হয়েছিল। একটু দূরে দেওয়ালে রুপোর তৈরি একটা ডিজাইনার হ্যাঙার লাগানো ছিল। তাতে ঝুলছে খরগোশের লোমের মতো মোলায়েম একটা ঘিয়ে রঙের টাওয়েল। সেই টাওয়েলটা তুলে নিয়ে শরীর মুছলেন শ্রীধর। আয়নায় নিজেকে বারবার দেখলেন। প্রতিবিম্বের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রায় ভুলে-যাওয়া নামটা কয়েকবার আলতো করে ডেকে উঠলেন : 'পিলটু! পিলটু!...পল্টন...।'

নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কুড়িটা বছর বড় দীর্ঘ সময়। সেদিনের চোদ্দোবছরের কিশোর আজ চৌতিরিশ বছরের পোড়খাওয়া এক কুখ্যাত মার্শাল। নিউ সিটির লোকজন শ্রীধরের ভয়াবহতা বোঝাতে রসিকতা করে বলে, শ্রীধর যদি কোনও ফুলের বাগানে পা রাখেন তা হলে বাগানের সব ফুল পলকে শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে যাবে।

আজ বলধর নেই। সে মারা গেছে প্রায় আটবছর। প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার হয়ে খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। কিন্তু তার আগে বলধর তার কাজ সম্পূর্ণ করে গেছে। পুরোপুরি নিজের ছাঁচে শ্রীধর পাট্টাকে তৈরি করে গেছে। নিউ সিটিকে এক পূর্ণাঙ্গ মার্শাল উপহার দিয়ে গেছে। বলধরের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে দিয়েছেন শ্রীধর। বলধরের প্রাসাদে তিনি এখন একা থাকেন। তাঁর সঙ্গে থাকে তদারকির বারোজন পুরুষ।

বলধরের চিকিৎসায় চূড়ান্ত আন্তরিক ছিলেন শ্রীধর। কোনও মানুষের পক্ষে যা-যা করা সম্ভব তার সবটাই করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতায় বলধরের সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই 'বলধর যুগ' শেষ হল। শুরু হল

'শ্রীধর যুগ'। নিউ সিটির মানুষের চোখে শ্রীধর পাট্টা হলেন শহরের শৃঙ্খলা আর শাসনের দেবতা।

শ্রীধর নামে হয়তো পিস ফোর্সের মার্শাল। কিন্তু কীভাবে-কীভাবে যেন সুপারগেমস কর্পোরেশন আর সিন্ডিকেটের ওপরেও তাঁর ক্ষমতা কায়েম হয়ে গেছে। শহরের ক্ষমতা-সাম্রাজ্যের যে-অঞ্চলেই কোনও পুতুলনাচ দেখা যাক না কেন, তার সুতো আসলে বাঁধা রয়েছে শ্রীধরের আঙুলে।

গায়ের ঘাম মুছে তোয়ালেটা আবার হ্যাঙারে রেখে দিলেন। পায়ে-পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন একটা স্টেইনলেস স্টিলের কাবার্ডের কাছে। কম্বিনেশান লকের বোতাম টিপে-টিপে কাবার্ডের পাল্লা খুললেন। ভেতরে কয়েকটা তাকে নানান টুকিটাকি জিনিস।

তারই মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট শিশি তুলে নিলেন শ্রীধর। শিশিটা চোখের সামনে তুলে ধরে চকচকে নজরে তাকালেন ওটার দিকে। শিশির ভেতরে গাঢ় স্বচ্ছ তরল। ঢাকনা খুলে শিশিটা শূন্যে উঁচু করে ধরলেন। মুখ হাঁ করে তাকালেন ওপরদিকে। কয়েক ফোঁটা তরল ঢেলে দিলেন হাঁ-এর ভেতরে। মুখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন এপাশ-ওপাশ। জিভ দিয়ে টাকরায় তৃপ্তির শব্দ করলেন কয়েকবার। শ্রীধরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—সিংহের চোখের মতো। ঢাকনা এঁটে শিশিটা আবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই ওষুধটা এক অদ্ভুত এনার্জি সল। বিদেশ থেকে এই তরল আমদানি করেন শ্রীধর। শুধুমাত্র নিজের জন্য। নিউ সিটির আর কেউ জানে না এই তরলের রহস্য। সারাদিনে কয়েকবার এই ওষুধটা নেন শ্রীধর। এটা ওঁর শরীরে নতুন শক্তি তৈরি করে। এটা খাওয়ার পরই মনে হয় শরীরের ভেতরে অফুরান শক্তি বাজপাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে।

এই আশ্চর্য ওষুধের গোপন রহস্য শ্রীধরকে জানিয়ে গেছে বলধর। নিজের অভ্যাসের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে 'ছোট ভাই'-কে। এ ছাড়া বলধর আরও একটা 'অভ্যাস' শ্রীধরকে ধরিয়ে গেছে। লিপস্টিক। ফ্লুওরেসেন্ট লিপস্টিক। তবে ছড়া কেটে কথা বলার ব্যাপারটা শ্রীধরের নিজস্ব।

কাবার্ডের দরজা বন্ধ করলেন। তোয়ালে দিয়ে আর একবার গা মুছে জিমের লাগোয়া ড্রেসিংরুমে চলে এলেন।

নিজের শত্রুদের কথা ভাবতে লাগলেন শ্রীধর।

বলধরের শত্রু ছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক। ক্ষমতায় যদি কেউ থাকে তার শত্রু থাকবেই। সেই কারণেই বলধর নিজের জন্য বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। নিজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর সে ছড়িয়ে রেখেছিল নিউ সিটির মানুষজনের মধ্যে আর সিন্ডিকেটের নানান স্তরে—এমনকী সিন্ডিকেটের সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও মিশে ছিল বলধরের অনুচরের দল। তাদের সবাইকে বলধর নিয়মিত টাকা দিত। বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে বলধর সবাইকে টাকা চিনতে শিখিয়েছে। বোঝাতে চেয়েছে, টাকাই সব। বোঝাতে চেয়েছে, 'মূল্যবোধ' শব্দটার আসল অর্থ 'মূল্যের বোধ'—অর্থাৎ, অর্থমূল্যের বোধ। 'মূল্য' আর 'দাম' শব্দ দুটোর মধ্যে কোনও তফাত নেই। ঠিক যেমন ইংরেজি 'ভ্যালু' আর 'প্রাইস' শব্দ দুটোর মধ্যে কোনও তফাত নেই।

সেই পথেই পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন শ্রীধর। গুপ্তচর, টাকা ইত্যাদির বিনিময়ে নিজেকে সুরক্ষিত করার বন্দোবস্ত যেমন করেছেন তেমনই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানের জন্য নিজের আওতায় রেখেছেন স্পেশাল শুটার। তিনটে ইঞ্জিন লাগানো এই শক্তিশালী শুটার শ্রীধর নিজেই চালাতে পারেন। এই শুটারের মধ্যে লুকোনো রয়েছে অ্যান্টি-ডেসট্রাকশন স্টিল বক্স। থার্মাল ইনসুলেশান দেওয়া এয়ারটাইট এবং ওয়াটারপ্রুফ সেই বাক্সের ভেতরে রয়েছে শ্রীধরের ইমার্জেন্সি ফান্ড—কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলার।

যদি কখনও প্রয়োজন হয় শ্রীধর এই স্পেশাল শুটারে করে নিউ সিটি ছেড়ে উড়ে যাবেন পৃথিবীর যে-কোনও দেশে। সেখানে নিরাপদে জীবন কাটাবেন। একইসঙ্গে ক্ষমতায়নের পুনর্বাসনের অপেক্ষায় থাকবেন। তারপর প্রথম সুযোগেই ফিরে আসবেন নিউ সিটিতে।

কাবার্ডের পাল্লা বন্ধ করে আপনমনে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। হাসলেন। যতই এসব ব্যবস্থা থাকুক না কেন শ্রীধর জানেন, এসবের কোনও প্রয়োজন হবে না। শ্রীধর পাট্টা আছেন, এবং থাকবেন। কখনও-কখনও নিজেকে সত্যি অমর বলে মনে হয় শ্রীধরের। তিনি কখনও চান না নিউ সিটিতে তিনি ছাড়া আর কোনও 'হিরো' তৈরি হোক। যখনই শ্রীধর এরকম সম্ভাবনা দেখেছেন তখনই 'ব্যবস্থা' নিয়েছেন। দ্বিতীয় আর কোনও ব্যক্তিত্বকে মাথা তুলতে দেননি। জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিউ সিটির 'মালিক' কে।

কিন্তু জিশান? এই জিশান পালচৌধুরী ছেলেটা? ওল্ড সিটি থেকে কিল গেম-এর পার্টিসিপ্যান্ট খুঁজতে গিয়ে ওকে বেছে নিয়েছিলেন শ্রীধর। ভেবেছিলেন, নানান খেলায় ছেলেটা জিতবে, কিন্তু কিল গেম পর্যন্ত পৌঁছবে না। বড় জোর পিট ফাইট পর্যন্ত যাবে। তারপর...।

অথচ জাব্বার মতো বর্ন কিলারের হাতে ছেলেটা শেষ হয়নি। উলটে জাব্বাকে চুরচুর করেও ওকে খতম করেনি। ওকে জীবনভিক্ষা দিয়েছে।

সারা শহর এখন জিশান বলতে পাগল।

একের-পর-এক খেলায় জিতে ছেলেটা ধীরে-ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পিট ফাইটে ও জাব্বাকে বাগে পেয়েও খতম না করে ছেড়ে দেওয়ায় শহরবাসীরা অনেকে খুশি হয়েছে। তারা জিশানকে নিয়ে দিন-রাত চর্চা করছে।

নিউ সিটিতে ছড়ানো গুপ্তচরের মারফত সব খবরই পাচ্ছেন শ্রীধর।

টিভির নানান চ্যানেলে জিশানের নানান গেম-এর পারফরম্যান্স নিয়মিত রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে। ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের প্রোডাক্ট প্রোমোট করছে। দিন-রাত টেলিভিশানে শুধু জিশান আর জিশান।

শ্রীধর বুঝতে পারছিলেন, এই ছেলেটাকে নিয়ে শহরে 'হিরো ওয়রশিপ' শুরু হয়ে গেছে। জনগণ চাইছে কিল গেম-এ জিশান জিতুক। অসম্ভবকে সম্ভব করুক। জিশান পালচৌধুরী ওদের চোখে সুপারহিরো।

কিন্তু কিল গেম-এ তো আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচেনি!

এই গেম-এর আইডিয়াটা প্রথম শ্রীধরের মাথায় আসে। তারপর সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম ডিজাইনাররা গেমটাকে ফাইনাল শেপ দেয়। যদিও মিডিয়ার মাধ্যমে সবসময় প্রচার করা হয় কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07, শ্রীধর জানেন আসলে ওটা 0.0□ ননজিরো ইনডেক্সটা দেওয়া আছে শুধু ইনটারন্যাশনাল গেম কোডকে বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্য।

জিশানের সুপারহিরো হয়ে ওঠার ব্যাপারটা শ্রীধরের মনে কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল।

না। না। কিল গেম-এ জিশানকে হারতে হবে।

হারতেই হবে।

•

ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনটা উদাস হয়ে গেল।

এখন ক'টা বাজে? খুব বেশি হলে সাড়ে পাঁচটা। টিভির মেয়েটি ভোর ছ'টায় মিষ্টি গলায় ওকে ডেকে ওঠার অনেক আগেই জিশান ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে এলিভেটরের কাছে। ওর ভীষণ ছাদে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওখানে আকাশ অনেক বড়।

এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই পিস ফোর্সের একজন গার্ডকে দেখা গেল। কোমরে ঝুলছে শকার।

জিশানকে দেখে গার্ডের চোয়ালের রেখা নরম হল। মুখের রুক্ষ ভাব মিলিয়ে গেল।

গার্ড জিগ্যেস করল, 'এখন কেমন আছ?'

'আগের চেয়ে অনেক ভালো।'

জাব্বার সঙ্গে লড়াই শেষ হওয়ার পর জিশানকে লেভেল ওয়ান ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিটের এক্সট্রিম কেয়ার সেল-এ রাখা হয়েছিল। সেখানে আধুনিক চিকিৎসার চূড়ান্ত ম্যাজিক দেখেছিল জিশান। মেডিকদের

মুখে শুনেছিল, ওর পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে, বাঁ-পায়ের ঊরুর একটা পেশি মারাত্মক চোট পেয়েছে, ডান হাঁটুর মালাইচাকি সরে গেছে, ডানহাতের তর্জনি আর মধ্যমার হাড়ে চিড় ধরেছে। এসব সমস্যা ছাড়াও সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা আর যন্ত্রণা তো ছিলই!

জিশানকে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করতে ডাক্তারবাবুদের প্রায় কুড়ি দিন লেগে গেল। যখন ও ফিজিক্যাল রিড্রেসাল ইউনিট থেকে ছাড়া পেল তখনও ওর পাঁজরে আর ডানহাতের আঙুলে স্টিকিং পলিমার ড্রেসিং। এই ড্রেসিং ওয়াটারপ্রুফ—জল লাগলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

রিড্রেসাল ইউনিটের বেডে শুয়েই অনেক অভিনন্দন পেয়েছিল জিশান। ডক্টররা, নার্সরা ওকে 'কনগ্র্যাটস' জানিয়েছিল—এবং সেটা শুধু জাব্বাকে হারিয়ে জেতার জন্য নয়, জাব্বাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্যও। রিমিয়াও ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছোট্ট করে ওকে বলেছিল, 'জিশান, আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। য়ু ক্যান ডু ইট।'

জিশানের অবাক লেগেছিল। ওর মনে পড়ছিল পিট ফাইটের স্টেডিয়ামের কথা। সেই ভয়ংকর রাতে গ্যালারির মানুষগুলো রক্তের জন্য বীভৎস পিপাসায় গর্জন করছিল, হাত-পা ছুড়ছিল। তখন জিশান বুঝতে পারেনি সেখানে অন্যরকম মানুষও রয়েছে। এখন ও নতুন করে বুঝতে পারছিল বৈচিত্র মানুষের প্রধান ধর্ম। পয়সার অন্য পিঠটা ও অল্প-অল্প দেখতে পাচ্ছিল।

রিড্রেসাল ইউনিট থেকে জিশান যখন গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাস-এ ফিরে এসেছিল তখন পিস ফোর্সের বেশ কয়েকজন গার্ড ওকে দেখামাত্রই ওকে ঘিরে ধরে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিল।

'ওয়েলকাম, জিশানভাইয়া। ফাইটার নাম্বার ওয়ান।' একজন অচেনা গার্ড বলেছিল।

তারপরই চেনা দুজন গার্ডকে দেখতে পেয়েছিল জিশান। লম্বা এবং বেঁটে। জিশান আর ফকিরচাঁদকে নেকরোসিটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া স্নেক লেক কমপিটিশানের আগে বেঁটে গার্ডটি সকলকে লুকিয়ে জিশানকে স্নেক রিপেলান্ট অয়েল দিয়েছিল। সোজা কথায় বলতে গেলে জিশানের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

বেঁটে গার্ড ওর কাছে এগিয়ে এল। সন্ধের শুরুতেই লোকটার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। জিশানের বুকে দুটো চাপড় মেরে জড়ানো গলায় বলল, 'তুমি সত্যিকারের হিরো, জিশান। তুমি ইচ্ছে করলে জাব্বার গর্দানটা মটাস করে ভেঙে দিতে পারতে—কিন্তু দাওনি। তোমার দিল আছে। বুদ্ধিও। তুমি ভালো করেই জানো, জাব্বাকে মেরে এই খতমের খেলা বন্ধ করা যাবে না। তুমি শুধু হিরো না, ভাই, তুমি একেবারে হিরো নাম্বার ওয়ান।'

কথা শেষ করে জিশানকে জড়িয়ে ধরল। ওর বুকের কাছে একটা চুমু খেল। তারপর হাত তুলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে শুরু করল। অন্য গার্ডরা সঙ্গীর এই কাণ্ড হাততালি দিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

লম্বা গার্ড কোথা থেকে যেন ছিটকে চলে এল জিশানের সামনে। চাপা গলায় বলল, 'শাবাশ, জিশান, শাবাশ। তোমার জবাব নেই। তুমি বেঁচে থাকলে সবার ভালো হবে। কিন্তু...।'

জিশান বিষণ্ণ হাসল। সামনে কিল গেম। সুতরাং ওই 'কিন্তু'টাই আসল কথা।

লম্বা গার্ড চটপট জিশানের কাছ থেকে সরে গিয়ে ওর বেঁটে সঙ্গীর হাত চেপে ধরল: 'অ্যাই, কী করছিস কী! কেউ দেখে রিপোর্ট করলে কী হবে? চল, চল—শিগগির চল।'

এক ঝটকায় লম্বা বন্ধুর হাত ছাড়িয়ে নিল বেঁটে : 'কোন সালা রিপোর্ট করবে? কোন সালা?' টলোমলোভাবে মাথার ওপরে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'এখানে তো শুধু আমরাই আছি, নাকি? কী ভাই, তোমরা কি কেউ ওই শ্রীধরের বাচ্চাকে রিপোর্ট করবে? হ্যাঁ?'

আশ্চর্য! বাকি গার্ডরা এলোমেলো গুঞ্জন তুলে বলল, 'না, না—কীসের রিপোর্ট! জিশান আমাদের হিরো নাম্বার ওয়ান। শুরু থেকে তো আমরা ওর গেম দেখছি। ও একেবারে লা-জবাব।'

বেঁটে গার্ড উত্তেজিতভাবে লম্বা সঙ্গীর ইউনিফর্ম খামচে ধরল : 'দেখলি, সবাই কী বলছে! দেখলি!'

সবমিলিয়ে হইহট্টগোল বেড়ে উঠছে দেখে শেষ পর্যন্ত জিশানই সবাইকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করতে লাগল। তারপর কথা না বাড়িয়ে ও এগিয়ে গিয়েছিল এলিভেটরের দিকে।

জিশানের অদ্ভুত লাগছিল। এই সাধারণ মানুষগুলো, যারা এখানে স্রেফ দু-পয়সা আয়ের জন্য সিকিওরিটি গার্ডের চাকরি নিয়েছে, জিশানের জেতায় এতটা খুশি হয়েছে! এর একটা কারণ বোধহয় সিন্ডিকেট এবং শ্রীধর পাট্টার প্রতি ওদের ঘৃণা। থমথমে আতঙ্কের নিয়মিত শাসন আর মৃত্যু দেখতে-দেখতে ওদের ভেতর থেকে বমির ভাব উথলে উঠেছে। মুখের ভেতরে যে-থুতু আর জল টের পাচ্ছে তার স্বাদ টক।

নাহাইতলা গ্রামে থাকা গার্ডের কথা মনে পড়ল জিশানের। শান্ত, নরম, ছবির মতো ওর সেই গ্রাম। আর বছরপাঁচেক চাকরি করেই ও গ্রামে ফিরে যাবে। এখানে একটা মুহূর্তও ছেলেটার ভালো লাগছে না।

জিশান ক্রমশই যেন বুঝতে পারছিল, আসলে অনেকেই এখানে ভালো নেই।

জিপিসি-তে ফিরে আসার পর আরও দশদিন জিশানকে ডাক্তারদের নির্দেশ মতো চলতে হয়েছে। ওকে এখন সফট এক্সারসাইজ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে ফিজিয়োথেরাপি মেশিনের ট্রিটমেন্ট। আর সপ্তাহখানেক পর থেকেই ওর কিল গেম ওয়ার্ম-আপ ট্রেনিং শুরু হবে। তারপর...।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিশান। অবাক হয়ে খেয়াল করল, ওর মধ্যে এখন উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, আশঙ্কার তেমন কোনও ছায়াপাত নেই। নিউ সিটিতে আসার শুরুর দিকটায় এই আবেগগুলোই জিশানকে শাসন করত। তারপর কয়েকমাস ধরে নানান খেলায় অংশ নিয়ে জীবন-মরণের ওঠা-পড়া দেখতে-দেখতে এইসব আবেগ কবে জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে! জিশান এখন অনেক ধীর, স্থির, শান্ত।

এলিভেটরের ভেতরে ঢুকল জিশান। নি:শব্দে দরজা বন্ধ হল।

'কোথায় যাবে?' গার্ড জিগ্যেস করল।

'ছাদে যাব। ঘরের মধ্যে কেমন যেন দম আটকে আসছে।'

'হবেই তো! এতদিন ধরে ফ্যামিলি ছেড়ে এখানে একা-একা থাকা...।'

'তুমিও তো এখানে একা-একা আছ—।'

এলিভেটর উঠতে শুরু করেছিল। ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে একপলক তাকিয়ে জিশানের দিকে মুখ ফেরাল গার্ড। হেসে বলল, 'ফারাকটা বুঝতে পারলে না, ভাই! আমি এখানে একা আছি নিজের ইচ্ছেয়—চাকরি করছি, তাই। আর তুমি এখানে আছ শ্রীধর পাট্টার ইচ্ছেয়। মানে, বন্দি।'

মানুষটার এই সহজ ব্যাখ্যায় জিশান বেশ অবাক হয়ে গেল। ও গার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্যান্য গার্ডের তুলনায় এর বয়েস কিছুটা বেশি। সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হবে। ফরসা সুন্দর চেহারা। তবে মুখে যেন একটা আবছা লড়াইয়ের ছাপ রয়েছে।

গার্ড জিগ্যেস করল, 'তোমার সামনে তো কিল গেম?'

জিশান কোনও কথা বলল না—শুধু ওপর-নীচে মাথা নাড়াল।

'তোমাকে সবসময় টিভিতে দেখায়। তোমার গেমগুলো দেখায়—ট্রেনিং দেখায়। নিউ সিটির প্রায় সবাই তোমাকে চিনে গেছে।'

জিশান চুপ করে রইল। গার্ডকে দেখতে লাগল।

'মনোহর সিং তোমার দোস্ত ছিল?'

সঙ্গে-সঙ্গে জিশানের মনখারাপ হয়ে গেল। বুক ঠেলে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল।

গার্ড বলে চলল, 'হ্যাঁ...তোমাকে আমি টিভিতে কাঁদতে দেখেছি। পিট ফাইটে মনোহর সিং-এর সঙ্গে লড়াইয়ের অ্যানাউন্সমেন্টের সময়। তারপরে মনোহরকে যখন কুকুরগুলো ছিঁড়ে খেল, তখনও।'

জিশানের বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। মনোহর নামের হাসিখুশি অশিক্ষিত উদার মানুষটার স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর চোখের সামনে।

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। সামনে বিশাল ছাদ। ভোরের কোমল আলোয় স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। এই স্নিগ্ধ শূন্যতা জিশানকে আরও বিষণ্ণ করে তুলল।

গার্ড বলল, 'এখানে দশবছর চাকরি হয়ে গেল। অন্য কারও জন্যে কোনও ক্যান্ডিডেটকে চোখের জল ফেলতে দেখিনি। তোমার ভেতরে এখনও মানুষ আছে, ভাই। কিল গেম-এ তুমি জিতলে আমার খুব ভালো লাগবে।'

জিশান এবার বলল, 'কিন্তু শুনেছি কিল গেম-এ আগে কেউ জেতেনি—।'

'ঠিকই শুনেছ।' আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাল গার্ড : 'ওপরের ওই অদৃশ্য লোকটার কাছে অনেকেই তো অসম্ভব উদ্ভট অনেক কিছু চায়। কোনওদিন পাবে না জানে, তবু চায় তো!' হাসল। অনাবিল হাসি : 'তো আমিও তাই চাইছি।' একটু থেমে তারপর : 'আমি একা নয়—অনেকেই চাইছে তুমি কিল গেম-এ জেতো।'

জিশান হাসল। সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। বলল, 'লড়ব—জান কবুল করে লড়ব।'

গার্ড জিশানের দিকে হাত বাড়াল। জিশানও।

হ্যান্ডশেক করে গার্ড বলল, 'গুড লাক, জিশান।'

'থ্যাংক য়ু।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হল। জিপিসি-র গেস্ট হাউসের ছাদে জিশান একা। ওকে ঘিরে সুবিশাল ভোরের আকাশ।

জিশানের মনে হল, আকাশের এই বিশাল ক্ষমতা আর মমতা ওকে আগলে রেখেছে। কিল গেম-এর আঁচ থেকে আকাশ ওকে বাঁচাবে।

ছাদে দুজন গার্ড পাহারায় ছিল। জিশানকে দেখে ওরা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল। ওদের একজন ভুরু উঁচিয়ে ইশারায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার?'

জিশান বলল, 'কিছু না। ঘুম আসছে না। ঘরের ভেতরে ভাল্লাগছে না। তাই ছাদে পায়চারি করতে এলাম।'

'কী করে ভালো লাগবে! তোমার ওপরে যা ধকল গেছে।'

আর-একজন বলল, 'তোমার কথা পান্ডা আর মূর্তির কাছে শুনেছি। ওরা তোমার কথা খুব বলছিল।'

জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল : 'কে পান্ডা আর মূর্তি?'

'ওই যে—বেঁটে আর লম্বু মানিকজোড়। আমাদের মতো সিকিওরিটি গার্ড। বেঁটেটা পান্ডা। আর লম্বুর নাম মূর্তি।'

জিশান চুপ করে রইল।

প্রথমজন বলল, 'আমরা নিজেদের মধ্যে তোমার কথা বলাবলি করি। তুমি খুব হিম্মতওয়ালা।'

ওর সঙ্গী নীচু গলায় বলল, 'তোমার সামনে কিল গেম। তোমাকে হেলপ করা উচিত। যদি মনখারাপ না করো একটা কথা বলব?'

জিশান মনে-মনে মনখারাপ না করার জন্য তৈরি হল। জিগ্যেস করল, 'কী?'

'কিল গেম-এর সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.07 বলে সিন্ডিকেট যেটা ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রচার করে সেটা ফলস। ওটা আসলে 0.0 কিল গেম-এ, কেউ বাঁচে না। ওই গেম সিটি থেকে কেউ বেঁচে ফিরে আসে না।'

জিশান মলিন হাসল : 'জানি...।'

'তোমাকে আমরা যতরকমভাবে পারি হেলপ করব। কারণ, আমরা চাই তুমি জেতো। তবে কী করে জিতবে জানি না।'

জিশান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর কিছু সমর্থক আছে জেনে ওর ভালো লাগছে। তবে সেই সমর্থন ওকে কোথাও পৌঁছে দেবে না।

'না—তোমাকে আর ডিসটার্ব করব না।' বলে গার্ড দুজন সরে গেল। যার-যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পজিশন নিল।

জিশান ছাদের কিনারার দিকে হেঁটে গিয়ে পুব আকাশের দিকে তাকাল। ভোরের আলো ফুটে গেছে—এবার সূর্য ফোটার পালা।

রিহ্রেসাল ইউনিট থেকে জিপিসি-র গেস্টহাউসে ফেরার দিন গার্ডদের খুশির হইচই জিশানকে অবাক করেছিল। আজও গার্ড তিনজনের প্রতিক্রিয়া ওকে অবাক করল। ওরাও জানে, কিল গেম-এর সারভ্যাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.0 খাঁচার ভেতরে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। বেড়ালের হাতে ইঁদুর মরবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ছাদের সাঁইতিরিশ তলার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে নিউ সিটির 'ছবি' দেখছিল জিশান। নানান বাড়ির আকাশছোঁয়া কাঠামোগুলোয় অতি-আধুনিক স্থাপত্যের চিহ্ন। জিশানের বারো বছর বয়েসে নিউ সিটি যা ছিল এখন তা নেই। সময় গড়িয়ে চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার নাগরিক জীবনে বহুরকম নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। তারই একটা হচ্ছে বিনোদন—পুরুষালি বিনোদন। কে জানে, আগামী আট-দশবছরে সুপারগেমস কর্পোরেশনের গেম ইনভেন্টরসরা হয়তো শুধু মেয়েদের নিয়ে নানান ধরনের রোমাঞ্চকর খেলা আবিষ্কার করবেন। তারপর আসবে পুরুষ এবং মহিলাদের মিশিয়ে আরও নতুন ধরনের গেম-এর পরিকল্পনা। তারপর... তারপর...।

তার পরের ব্যাপারটা ভাবতেই জিশানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যদি শ্রীধর পাট্টা আর তাঁর গেম ইনভেন্টর সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁদের বিকৃত স্যাডিস্ট মনোভাব নিয়ে শিশু আর কিশোরদের জন্য আরও নোংরা চরিত্রের, আরও বেপরোয়া, সব মরণপণ 'খেলা' আবিষ্কার করেন? যদি ম্যানিম্যাল রেসে ক্ষুধার্ত ব্লাডহাউন্ডের সঙ্গে কিশোর প্রতিযোগীরা দৌড়য়? যদি অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ভয়ংকর কোমোডো ড্রাগন? যদি স্নেক লেক কমপিটিশানের কনটেস্ট্যান্ট হয় আট-ন' বছরের বালক-বালিকার দল?

জিশান আর ভাবতে পারছিল না। ওর বমি পাচ্ছিল। এ কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায় ওর মনে হচ্ছিল, এরকমটা হতেই পারে—যদি না কেউ সময়মতো বাধা দেয়।

কিন্তু কখন সেই সময়?

ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে জিশানের মনে হল, ওর বুকের ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিল : 'এখন! এখন! এখন!'

ততক্ষণে দিগন্তের ক্যানভাসে সূর্য উঠে পড়েছে।

•

বেশ কয়েকদিন ধরে একটা চিন্তা জিশানের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিন্তাটাকে অনেকবার তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল ও, কিন্তু চিন্তাটা যায়নি। বারবার ও নিজেকে বোঝাচ্ছিল যে, এটা একটা অবাস্তব আকাঙক্ষা, কিন্তু ওর ছেলেমানুষ মন মানতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ও পান্ডা আর মূর্তির শরণাপন্ন হল।

ওদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নিয়েই জিশান গেস্টহাউসের একতলার ফোয়ারার কাছে কয়েকদিন ধরে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছিল না। কে জানে, হয়তো ওদের জিপিসি থেকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে!

পরপর তিনদিন জিশানের উসখুসুনি দেখে একদিন রাতে একজন গার্ড জিশানকে কাছে ডাকল। জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো! ক'দিন ধরে তুমি এখানটায় ঘুরঘুর করছ কেন?'

জিশান ইতস্তত করতে লাগল।

তখন গার্ডটি বলল, 'আরে ইয়ার, তুমি কিল গেম-এ কোয়ালিফাই করেছ। তোমার জন্যে রুল-টুল আর অত স্ট্রিক্ট নেই। বলো, কী বলবে?'

'আমি...আমি পান্ডা আর মূর্তির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। খুব জরুরি ব্যাপার...।'

পিট ফাইটের আগে হলে এই গার্ডই হয়তো জিশানকে পাঁচটা প্রশ্ন করত। কিন্তু এখন কোনও কথা জিগ্যেস করল না। শুধু বলল, 'কোনও চিন্তা কোরো না। কাল সন্ধেবেলা সাতটা নাগাদ ঘুরতে-ঘুরতে এখানে চলে এসো। পান্ডা আর মূর্তি থাকবে। আমি খবর দিয়ে দেব।'

সেটাই হয়েছিল। পরদিন সন্ধেবেলা সেই দুজন গার্ডের সঙ্গে দেখা হল জিশানের। ওদের একপাশে ডেকে নিয়ে গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা বলল জিশান।

শুনে মূর্তি একেবারে আঁতকে উঠল। বলল, 'কীসব আজেবাজে বকছ! এ কী করে হয়! ধরা পড়লে বা জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হবে। অবশ্য সেই কেলেঙ্কারি দেখার জন্যে আমি বা পান্ডা কেউই আর বেঁচে থাকব না। শ্রীধর পাট্টা আমাদের বটিচচ্চড়ি করে খেয়ে নেবে।'

মূর্তির আতঙ্ক দেখে পান্ডা হাসল। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেশা করা জড়ানো গলায় সঙ্গীকে বলল, 'ওসব ফালতু কথা ছাড় তো! শ্রীধর পাট্টার চেয়ে আমার কি আই. কিউ. কিছু কম আছে? আমি এমন টেকনিকে কাজ হাসিল করব যে, পাট্টার বাপ-ঠাকুরদাও টের পাবে না।' জিশানের দিকে ফিরে বলল, 'কোনও ভয় নেই, জিশানভাইয়া—সব হয়ে যাবে...।'

জিশান চাপা গলায় বলল, 'আমি দশহাজার টাকা দেব।'

পান্ডা লাল চোখ বড়-বড় করে জিশানের দিকে তাকাল। যেন মঙ্গলগ্রহের প্রাণী দেখছে।

'টাকা? তোমার কাছ থেকে টাকা নেব?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করল পান্ডা। তারপর : 'যদি নিতেই হয় তা হলে নেব কিল গেম-এর পর। তুমি তখন একশো কোটি টাকার প্রাইজ মানি জিতবে। তার থেকে কিছু আমাদের দিয়ো...এই গরিব ভাই দুটোকে দিয়ো।'

জিশান বুঝল, পান্ডা আসলে কী বলতে চাইছে। ও কিল গেম-এ জিতলে তবে না পান্ডা আর মূর্তিকে টাকা দেবে! আসলে ওরা জিশানকে উইশ করছে।

জিশান কোনও কথা বলল না। মলিনভাবে হাসল। ফোয়ারার জলটাকে হঠাৎই ওর চোখের জল বলে মনে হল। ও চারপাশে তাকাল। রাতের আকাশ দেখল। বাতাসের ঘ্রাণ নিল। গেস্ট হাউসের উঁচুতলার দিকে তাকাল। তারপর পান্ডা আর মূর্তিকে দেখল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল : 'ছোটবেলায় আমি এই শহরে থাকতাম। তারপর...তারপর...এই শহর ছেড়ে ওল্ড সিটিতে চলে গেছি। বহুবছর এই শহরটাকে দেখিনি। তাই কিল গেম-এর আগে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে...ভীষণ ইচ্ছে করছে। সেইজন্যেই তোমাদের হেলপ চেয়েছি।'

পান্ডা অবাক হয়ে বলল, 'ও, তাই! তুমি এই শহরে ছিলে! যাকগে, কোনও প্রবলেম নেই। কাল সাড়ে সাতটায় তুমি এখানটায় চলে এসো—আমরা থাকব। তারপর তোমায় গোটা শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব...।'

জিশান ফোয়ারার জলের ধারার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মনে পড়ছিল মিনির কথা, শানুর কথা। মা-বাবার কথাও। এই শহরটা ছেড়ে যাওয়ার দিনে বাবার চোখের জলের কথা মনে পড়ে গেল জিশানের।

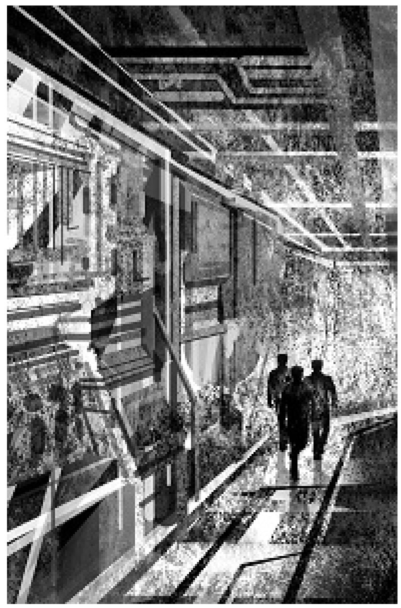
ও পান্ডার হাত চেপে ধরল। ছেলেমানুষের মতো অনুনয় করে বলল, 'আমার হাতে আর সময় নেই। কিল গেম-এ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে শহরটাকে একবার দেখতে চাই।'

পান্ডা চোখ বড়-বড় করে নেশাতুর দৃষ্টিতে তাকাল জিশানের দিকে : 'কিল গেম-এ শেষ? তুমি?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পান্ডা। তারপর হাসি থামলে বলল, 'জিশানের শেষ নেই।'

•

জিপিসি-র সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমে জিশানকে নিয়ে এল পান্ডা আর মূর্তি।

এরকম আধুনিক ঝকঝকে কন্ট্রোল রুম ফিউচারিস্টিক সিনেমাতেও দেখা যায় না। চারদিকে শুধু কাচ আর স্টেইনলেস স্টিল। এ ছাড়া ওয়াল মাউন্টেড কম্পিউটার আর অসংখ্য টাচ-স্ক্রিন ডিসপ্লে। বাঁ-দিকের বিশাল দেওয়ালের পুরোটাই একটা গ্রাফিক ডিসপ্লে স্ক্রিন। সেখানে জিপিসি-র নানান মনিটরড জোন দেখা যাচ্ছে। ছবির সঙ্গে-সঙ্গে জোনগুলোর নম্বর আর নাম চোখে পড়ছে। পাঁচ কি ছ'সেকেন্ড পরপর ছবিগুলো পালটে যাচ্ছে—ঠিক যেমন কম্পিউটার কার্ড গেমে তাস পালটে যায়।



কন্ট্রোল রুম-এর এসি এতটাই জোরালো যে, জিশানের শীত করতে লাগল।

ঘরে পাঁচজন সিকিওরিটি অফিসার বিভিন্ন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে একমনে কাজ করছিল। ওদের পরনে গাঢ় নীল ইউনিফর্ম—তার কোনও-কোনও জায়গায় সাদা বিডের লাইনিং।

এ ছাড়া আরও একজন অফিসার ঘরের ডানদিকের এককোণে একটা অল-গ্লাস কিউবিকলে বসে ছিল। তার সামনের টেবিলে একটা আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিন। লম্বা, ধনুকের মতো বাঁকানো তার এল. সি. ডি. পরদা।

জিশানরা ঘরে ঢুকতেই কিউবিকলের অফিসার চোখ তুলে তাকাল। এবং পরমুহূর্তেই চটপট আঙুল চালিয়ে কম্পিউটারের কিবোর্ডের কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। তারপর একগাল হেসে উঠে দাঁড়াল।

কিউবিকলের বাইরে বেরিয়ে এল অফিসার।

মাথায় কাঁচাপাকা চুল। তামাটে মুখে হাসির ভাঁজ। লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখে সিকিওরিটি অফিসার বলে সমীহ হয়।

ভদ্রলোকের কোমরে কালো রঙের পার্টিকল গান। এই বন্দুকের সুইচ টিপলেই হাই-এনার্জি পার্টিকল স্ট্রিম বেরিয়ে আসে। শত্রুকে অকেজো করে দেয়। পিস ফোর্সের উঁচু স্তরের অফিসাররা এই বন্দুক ব্যবহার করে।

'হাই, জিশান।' বলে জিশানের দিকে হাতে বাড়াল অফিসার : 'উইশ য়ু লাক ইন কিল গেম।'

হ্যান্ডশেক করে জিশান বলল, 'থ্যাংকস।'

এবার পান্ডা আর মূর্তির দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, 'তোমরা এ-ঘরে ঢোকামাত্রই এই গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর চারটে অডিয়ো-ভিশুয়াল সারভেইল্যান্স জোন আমি ডি-অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি। ফলে এখানে

জিশানকে কেউ ওয়াচ করতে পারবে না। তা ছাড়া সিকিওরিটি সেন্ট্রালের তিনটে অফিসে আমার কোর লিডারদের সঙ্গে কথা বলা আছে। ওরা তো এককথায় রাজি...।'

পান্ডা জিশানের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল। ছোট্ট করে বলল, 'জিশান ম্যাজিক।'

জিশান ঠোঁটে হাসল।

এরপর জিশানকে 'তৈরি' করার পালা।

পান্ডা আর মূর্তি জিশানকে খোলসা করে কিছু বলেনি। কিন্তু ওকে পাশের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে ওরা যা শুরু করল সেটা থিয়েটারের গ্রিনরুমকেও হার মানায়। অফিসারটির তত্বাবধানে আনমোল নামে একজন সিকিওরিটি গার্ড জিশানের ভোল পালটানোর কাজে হাত দিল।

পান্ডা আর মূর্তি নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। আর পান্ডা মাঝে-মাঝেই শ্রীধর পাট্টার মুণ্ডপাত করে উত্তেজিত সব মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছিল।

প্রথমে জিশানকে বলা হল, জামাকাপড় ছেড়ে সিকিওরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিতে।

অফিসার পান্ডাকে লক্ষ করে বলল, 'জানো, এই স্পেয়ার ইউনিফর্মটা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্টোর থেকে ম্যানেজ করতে হয়েছে। প্রত্যেকটা ইউনিফর্মে ম্যাগনেটিক সেন্সর লাগানো আছে। আমি রূপমকে বলেছিলাম। ও স্টোরের সারভেইল্যান্স চিফ। ও হেলপ না করলে হত না।'

জিশান ইউনিফর্মটা পরতে-পরতে অচেনা রূপমকে ধন্যবাদ দিল। ওর মনে হল, এই অন্যরকম প্রতিবাদী মানুষগুলো জিশানকে সাহায্য করেই সিন্ডিকেটের অবিচারের বিরুদ্ধে ওদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জিশান কিল গেমে কোয়ালিফাই করে গার্ডদের সহানুভূতি জিতে নিয়েছে। ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছে পূরণের মতোই ওরা জিশানের 'শেষ' ইচ্ছেগুলো পূরণ করে চলেছে।

গার্ডের সাহায্যে কয়েকমিনিটের মধ্যেই জিশানের পোশাক বদল শেষ হল। অফিসার ওকে শকার, স্মার্ট কার্ড সব দিল। হেসে বলল, 'ওই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। নিজেকে একবার দেখে নাও—।'

একটা মেটাল ক্যাবিনেটের খোলা পাল্লার ভেতরদিকে একটা ঝকঝকে আয়না লাগানো ছিল। জিশান আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কী আশ্চর্য! একটা কালো ইউনিফর্ম জিশানকে কী সাংঘাতিক পালটে দিয়েছে। এখন ও বলতে গেলে নিউ সিটির নিরাপত্তার যান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা অংশ হয়ে গেছে।

গার্ড জিশানের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর হাতে ছাই রঙের একটা মেকাপ বক্স। বলল, 'এবার একটু হালকা মেকাপ...ব্যস...।'

পান্ডা হেসে বলল, 'আনমোল একসময় যাত্রাদলের মেকাপম্যান ছিল। তারপর পেটের দায়ে এই বেশি মাইনের হতচ্ছাড়া চাকরিতে এসেছে। ওর মেকাপ কমপ্লিট হওয়ার পর তোমার ওয়াইফই তোমাকে আর চিনতে পারবে না—শ্রীধরের বাচ্চা তো কোন ছাড়!'

আনমোলের দিকে তাকাল জিশান। বয়েস তিরিশ ছুঁয়েছে কি না সন্দেহ। ফরসা মুখে ব্রণের দাগ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখ থেকে পেপারমিন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখ ছোট-ছোট, তবে নজর তীক্ষ্ণ।

দক্ষ হাতে জিশানের মুখে কাজ শুরু করল আনমোল।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির হিসেবে সময় লাগল উনিশ মিনিটের কয়েকসেকেন্ড বেশি। কিন্তু ওই অল্প সময়েই আনমোল জিশানকে পালটে দিল।

পান্ডা আর মূর্তি ওদের 'নাইট সাফারি'-র প্ল্যান নিয়ে অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করছিল। অফিসার বলল, 'বেশি রিসক নেওয়ার দরকার নেই। শুধু সেফ জায়গাগুলোই জিশানকে ঘুরিয়ে দেখাও। নানান জোনের গার্ডদের সঙ্গে ওকে মিশিয়ে দেবে। তা হলেই ওকে আর কেউ নজর করতে পারবে না। নইলে...বুঝতেই তো পারছ...যদি আমাদের মার্শাল কোনওরকমে ব্যাপারটা টের পায় তা হলে আমরা কেউই আর বাদ যাব না। একজন ধরা পড়লেই ও টরচার করে তার পেটের সব কথা বের করে নেবে। একটা

লোককে কী করে না মেরেও মেরে ফেলা যায় সেটা শ্রীধর পাত্রা ভালো করেই জানে। সুতরাং, কেয়ারফুল...।'

অফিসারের সঙ্গে কথা শেষ করে পান্ডা আর মূর্তি জিশানকে নিয়ে সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল।

চকচকে বাদামি গ্রানাইট পাথর বসানো মেঝেতে আয়নার মতো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। জিশানের দুপাশে পান্ডা আর মূর্তি। প্যারেডের মতো সমান তালে পা মিলিয়ে ব্যস্তভাবে হেঁটে চলেছে। দেখে মনে হবে, ওরা কোনও মিশনে চলেছে। কন্ট্রোল রুমের অফিসার পান্ডা আর মূর্তিকে ঠিক এইভাবে হেঁটে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। জিশানের নিরাপত্তার জন্য এটা ওদের একরকম ছদ্মবেশ।

করিডরের দৈর্ঘ্য শেষ হতেই কয়েকধাপ সিঁড়ি। তারপর স্মার্ট ডোর। নির্দিষ্ট স্লটে নিজের স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করল মূর্তি। দরজা খুলে গেল। সামনেই খোলা চত্বর। চত্বরের বাইরে একফালি মিহি ঘাসজমির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কিউ-মোবাইল। তার গায়ে সিন্ডিকেটের লোগো আঁকা।

জিশান চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

জায়গাটা একদম ফাঁকা এবং অন্ধকার। পান্ডা চাপা গলায় বলল যে, এটা গেস্টহাউসের পিছনদিক। এদিকটায় শুধু গার্ডরাই চলাফেরা করে। ওদের ব্যবহারের জন্য যেসব কিউ-মোবাইল গেস্টহাউসে আসা-যাওয়া করে সেগুলো এখানেই পার্ক করা হয়। এখানে এসে গাড়িগুলো থামে, গার্ডরা ওঠা-নামা করে।

জিশানদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিউ-মোবাইলটার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে আরও ছ'টা কিউ-মোবাইল পার্ক করা রয়েছে। পার্কিং জোনে লাল আলো জ্বলছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা 'রেড অ্যালার্ট' জোন।

দূরে চারজন গার্ডকে দেখতে পেল জিশান। ওদের দিকে ইশারা করে পান্ডা হাত নাড়ল। ওরাও হাত নেড়ে জবাব দিল।

গাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে পান্ডা পকেট থেকে একটা রিমোট বের করে বোতাম টিপল।

কিউ-মোবাইলের চারটে দরজা ডানার মতো খুলে গেল। জিশান দেখল, গাড়িতে কেউ নেই। তা হলে গাড়িটা চালাবে কে?

চোখে এই প্রশ্ন নিয়ে পান্ডার দিকে তাকাল জিশান।

পান্ডা হাসল। বলল, 'আমি চালাব। কোনও ভয় নেই। আমার এই গাড়ি ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স আছে। অনেক গার্ডকেই কিউ-মোবাইল ড্রাইভিং-এর ট্রেনিং দেওয়া হয়। কেউ সে-ট্রেনিং নেয়, কেউ নেয় না।'

পান্ডা পাইলটের সিটে বসে পড়ল। ওর বাঁ-পাশে জিশান। আর তার পর মূর্তি। শকারগুলো খুলে ওরা গাড়ির পিছনের সিটে রেখে দিল।

রিমোট টিপতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পান্ডা গাড়ি স্টার্ট দিল। সঙ্গে-সঙ্গে অটোমেটিক এসি চালু হয়ে গেল।

দক্ষ হাতে গাড়িটাকে চওড়া রাস্তায় নিয়ে এল পান্ডা। তারপর মসৃণ পথ ধরে নি:শব্দে গাড়ি ছোটাল।

একটু পরে পান্ডা আপনমনে বলতে লাগল, 'জানো ভাই, জিশান, ছোটবেলা থেকেই আমার গাড়ি চালানোর খুব শখ। আমার বাপের গাড়ি রং করার দোকান ছিল। তো ওইসব পুডিং ঘষা রং চটা গাড়ি—লুকিয়ে ওগুলোর চাবি নিয়ে চালাতাম। টের পেলেই বাপ খ্যাঁচখ্যাঁচ করত। বলত, খদ্দেরদের গাড়ি। আমি পাত্তা দিতাম না। গাড়ি আমাকে টানত।'

মূর্তি বলল, 'শুরুর দিকে ও সিন্ডিকেটের গাড়ি চালাত। একটা অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে সিকিওরিটি গার্ড হয়েছে।'

'যাকগে, ওসব বাদ দাও—' জিশানকে কনুইয়ের খোঁচা দিল পান্ডা : 'নিউ সিটির কী-কী দেখবে বলো...।'

জিশান পান্ডার দিকে তাকাল। অন্ধকারে আবছা পান্ডার মুখ। তার ওপরে রাস্তার মেটাল ল্যাম্প থেকে ছিটকে আসা আলোর হাইলাইট।

কী বলবে জিশান? বাড়ির ঠিকানা, আর বাবার চোখের জল—নিউ সিটির এটুকুই তো মনে আছে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'এন—টুয়েলভ কমা থার্টি সিক্স। এই ঠিকানায় আমি থাকতাম। আজ থেকে প্রায় দেড়যুগ আগে।'

'তাই?' অবাক চোখে জিশানের দিকে তাকাল মূর্তি। পান্ডাও।

নিউ সিটিকে অনেকগুলো ছোট-ছোট জোনে ভাগ করা আছে। জোনগুলোর নাম এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। এইরকম প্রতিটি জোনের এক-একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক বা কো-অর্ডিনেট আছে। সেই সংখ্যা দিয়েই কোনও জোনের একটি বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। জিশানের শুধু এটুকুই মনে আছে : এন—টুয়েলভ কমা থার্টি সিক্স।

জিশান সংক্ষেপে ওর ছোটবেলার কথা বলতে লাগল।

গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাস পেরিয়ে কিউ-মোবাইল অনেকক্ষণ আগেই বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাস্তার দু-ধারের আলোয় ছবির মতো পথটা দেখতে পাচ্ছিল জিশান। কালচে রুপোলি রং। ধাতুর পাতের মতো চকচকে। তারই ওপরে ছোট-ছোট বুটি। ঠিক যেন ব্যাঙের চামড়া। গাড়ির চাকা এই রাস্তায় সহজে পিছলে যাবে না। বাড়তি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক সেই নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে।

রাস্তায় বড়-বড় ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড চোখে পড়ছিল। সেগুলোর বেশিরভাগই প্রসাধন আর নেশার হরেকরকম উপকরণের বিজ্ঞাপন। জিশান অবাক হয়ে দেখছিল, বিজ্ঞাপনের চলমান ছবিগুলো ঠিক যেন আসলের মতো—ত্রিমাত্রিক।

মূর্তিকে সে-কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'এখানে নিয়মিত ফরেন টেকনোলজি কেনা হয়। কথায়-কথায় সবাই জাপান আর আমেরিকা দেখায়। ওই বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো সব হলোগ্রাম ইমেজ...তাই ওরকম আসলের মতো দেখাচ্ছে।'

একটু পরেই রঙিন হলোগ্রাম ইমেজ দেখে-দেখে জিশানের চোখ সয়ে গেল।

কিন্তু শুধু বিলবোর্ড নয়, নানান অফিস বিল্ডিং-এর চেহারা আর আলোকসজ্জা দেখেও তাক লেগে যায়। মনে হয় যেন শহরটা সৌন্দর্যে স্বর্গের খুব কাছাকাছি। যদিও স্বর্গের সৌন্দর্য কেমন জিশান জানে না।

ওল্ড সিটির কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। কষ্ট হল। মনে হল, একটা লেসার বিলবোর্ডের খরচ দিয়ে ওর শহরের দশটা গরিব পরিবারের একমাস খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরকম একটা সুন্দর বিল্ডিং-এর বদলে ওল্ড সিটিতে অনায়াসে গড়ে তোলা যায় দুটো ভদ্রস্থ হাসপাতাল, কিংবা হাফডজন স্কুল।

কিউ-মোবাইল ছুটছিল। আর জিশান মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এতটাই আকর্ষণীয় হতে পারে! আধুনিক এই প্রযুক্তির পাশাপাশি কী সাংঘাতিক ওইসব আদিম হিংস্র খেলা! বাইরের এই রঙিন সুন্দরের আড়ালে কী অদ্ভুতভাবেই না ঘাপটি মেরে বসে আছে ভয়ংকর কুৎসিত!

জিশানের বমি পেয়ে গেল। আচমকা 'ওয়াক' তুলল দুবার।

মূর্তি জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

জিশান মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশল, বলল, 'কিছু না।'

পান্ডা ওর দিকে একবার তাকাল শুধু—কিছু বলল না।

দশ কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পান্ডা গাড়িটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এল যাকে স্বপ্নের জগৎ ছাড়া আর কিছু বলে ভাবা যায় না। একটা বিশাল এলাকা জুড়ে নানান উচ্চতার বিমূর্ত ছাঁদের বাড়ি। তার সর্বত্র উৎসবের আলোকমালা। হাজার রঙের লেসার-ছবি বাড়িগুলোর গায়ে অদ্ভুত ছন্দে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

পান্ডা পার্কিংজোনে গাড়িটা পার্ক করতে-করতে বলল, 'এই কমপ্লেক্সটার নাম ''ই-ল্যান্ড''— এনটারটেইনমেন্ট ল্যান্ড। ফূর্তি-জোনও বলতে পারো। চার কিলোমিটার বাই চার কিলোমিটার এলাকা। টুয়েন্টি ফোর সেভেন খোলা...।'

রিমোট দিয়ে গাড়ির দরজা খুলল পান্ডা। নামতে-নামতে মূর্তিকে বলল, 'এই, শকারগুলো নিয়ে নে। কোমরে ঝোলাতে হবে।'

জিশান আর মূর্তি অন্য দরজা দিয়ে নামল। পিছনের সিট থেকে শকারগুলো তুলে নিল মূর্তি। জিশানকে একটা দিল, আর বাকি দুটো হাতে করে পান্ডার কাছে গেল।

পান্ডা কিউ-মোবাইলের দরজা বন্ধ করল। তারপর রিমোটের অন্য একটা বোতাম টিপে গাড়িটা 'ফার্মলক' করে দিল।

জিশান অবাক হয়ে সুবিশাল ইলেকট্রনিক হাঙ্গামার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই এনটারটেইনমেন্ট। নন-স্টপ বিনোদন।

চঞ্চল আলোর রঙিন আভা জিশান, পান্ডা আর মূর্তির মুখে খেলা করছিল।

ওরা তিনজনে এগোল 'ই-ল্যান্ড'-এর দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল, পিস ফোর্সের তিনজন গার্ড ব্যস্তভাবে ডিউটিতে চলেছে।

স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়ল জিশান। ওর মনে হল, ও অলৌকিক কোনও শহরে এসে পড়েছে। যেখানে অটোমেশান, ইলেকট্রনিক্স আর অপটিকস তাদের 'ছলাকলা'র মরণপণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

পান্ডা আর মূর্তির সঙ্গে হাঁটছিল জিশান। সব জায়গায় স্মার্ট কার্ড সোয়াইপ করার ব্যাপারটা ওরা দুজন সামলাচ্ছিল। আর জিশান ওপরদিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আশ্চর্য জগতের অভিঘাতটা শুষে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

পান্ডা ওকে বলছিল, '...এখানে দোকানপাট আছে, ব্যাঙ্ক আছে, ক্লাব আছে, গেমস পারলার আছে, নকল সমুদ্র আছে, সি-বিচ আছে...কী নেই!'

কথা বলতে-বলতে একটা মল-বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢুকে পড়ল ওরা।

চারিদিকে শুধু কাচ আর কাচ, আলো আর আলো। আলো যেমন নানান রঙের, কাচের দেওয়ালগুলোও তাই। এ ছাড়া রয়েছে স্বচ্ছ ফাইবারের সিঁড়ি আর মেঝে। সিঁড়ি চলছে, কোথাও-কোথাও মেঝেও।

তাজ্জব জিশানকে নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল পান্ডা আর মূর্তি। তারপর একটা গেমস পারলারের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। পারলারের কাচের দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে মূর্তি বলল 'ওই দ্যাখো—।'

জিশান তাকাল। এবং নিজেকে দেখতে পেল।

কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পারলারের ভেতরে জায়ান্ট টিভি চলছে এবং সেখানে জিশানকে দেখা যাচ্ছে।

পান্ডা জিশানের হাত ধরে টানল। ওরা তিনজন পারলারে ঢুকে পড়ল।

জিশান অবাক হয়ে দেখল, টিভিতে কিলগেমের প্রোমো চলছে। তাতে জিশানের নানারকম ক্লিপিংস দেখানো হচ্ছে। জিশান ঘরে পায়চারি করছে, খেলার মাঠে বল খেলছে, অ্যানালগ জিমে ব্যায়াম করছে, কানে হেডফোন লাগিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করছে, কমব্যাট পার্কে কোমোডো ড্রাগনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, টিভি ক্যামেরাম্যানকে দু-হাতে মাথার ওপরে তুলে নিয়েছে, স্নেক লেকে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, জাব্বার সঙ্গে মরিয়া লড়াই চালাচ্ছে...।

এবং তারপর কিল গেমের বিজ্ঞাপন। খুব শিগগিরই কিল গেমের দিনক্ষণ জানানো হবে। সেই খেলার সিধা প্রসারণের সময় যাঁরা বিজ্ঞাপন দিতে চান তাঁরা অন-লাইনে বুকিং করুন। তারপরই পরদায় ফুটে উঠছে কয়েকটি ওয়েবসাইট আর সাইবার লিংকের অ্যাড্রেস।

পারলারে ভিড় ছিল। নানান বিচিত্র গেম খেলায় ব্যস্ত নানাবয়েসি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আরও অনেকে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। জিশান লক্ষ করল, ওকে নিয়ে কিল গেমের প্রোমো চলছে দেখে টিভির সামনে ভিড় বাড়ছিল। এবং টিভিতে ওর মুখ দেখানোমাত্রই হইচইয়ের জোয়ার উঠছিল।

আশপাশের মানুষজনের কথা শুনতে পাচ্ছিল জিশান।

কেউ ওর বডির প্রশংসা করছিল। কেউ বলছিল, 'লোকটাকে কী হ্যান্ডসাম দেখতে!' কেউ বলছিল, জাব্বার মতো একজোড়া পালোয়ানের সঙ্গে ও অনায়াসে মহড়া নিতে পারে। আবার আর-একজনের মন্তব্য : 'আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা কিল গেমে জিতে যাবে...।'

পান্ডা জিশানকে খোঁচা দিল। জিশান ওর দিকে ফিরে তাকাতেই পান্ডা চোখ ঠারল। যার অর্থ হল : 'দেখছ, সবাই তোমার কথা বলছে!'

যতক্ষণ কিল গেমের প্রোমো চলল ততক্ষণ টিভির সামনে ভিড় লেগে রইল। দর্শকদের উচ্ছ্বাস জিশানকে অবাক করে দিল। গার্ডরা ওকে যে পছন্দ করে তার পিছনে হয়তো শ্রীধর পাট্টাকে অপছন্দের কারণ রয়েছে। কিন্তু পারলারে বিনোদনের সন্ধানে আসা জনগণ? ওরা কি চাইছে জিশানের ভালো হোক, জিশান জিতুক? নাকি আসলে চাইছে কিল গেম জমে উঠুক?

পান্ডা আর মূর্তির হাত ধরে টান মারল জিশান। তারপর ওরা তিনজনে গেমস পারলার থেকে বেরিয়ে এল।

মূর্তি বলল, 'জিশান, তোমাকে নিয়ে লোক কিন্তু হেভি এক্সাইটেড। তোমার বিজ্ঞাপনগুলোও পাবলিককে হেভি টানছে...।'

'বিজ্ঞাপন? তার মানে?' জিশান অবাক হয়ে মূর্তিকে দেখল।

তখন পান্ডা বলল, 'প্রায় একমাস ধরে সিন্ডিকেট এই কাজটা শুরু করেছে। তোমার ডিফারেন্ট টাইপের ক্লিপিংস দেখিয়ে তার ফাঁকে-ফাঁকে নানান প্রোডাক্টের অ্যাড চলছে। এরপর...কিল গেমের আগে...তোমাকে নিয়ে ক'দিন শুটিং চলবে। নতুন-নতুন জিনিসের বিজ্ঞাপন। গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া থেকে শুরু করে প্রোটিন ফুড আর ক্রাঞ্চি মিল পর্যন্ত...।'

জিশান চুপ করে রইল। একটা ক্লাবের পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তার কাচের দেওয়ালে রঙিন এল. সি. ডি. ডিসপ্লে-তে ইংরেজিতে লেখা 'ফানডম'। তার নীচে লেখা : 'ডু নট এন্টার ইফ য়ু আর অ্যাবাভ সিক্সটিন।'

জিশান সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে পান্ডা হেসে বলল, ' ''ই-ল্যান্ড''-এ যে ক'টা ক্লাব আছে তার একটার নামও নাইট ক্লাব নয়। কেন জানো?'

জিশান পান্ডার দিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। জানে না।

পান্ডা আর মূর্তি এ-ওর গায়ে চাপড় মারল, হাসাহাসি করল। তারপর মূর্তি বলল, 'ক্লাবগুলো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে বলে এগুলোর নাম নাইট ক্লাব নয়।'

'তা ছাড়া নানান ক্লাবের নানারকম বয়েসের লিমিট আছে।' পান্ডা বলল। আঙুল তুলে 'ফানডম'-এর নীচের লেখাটা দেখাল: 'ওই যে...ওইরকম।'

এরপর ''ই-ল্যান্ড''-এর আরও অনেকগুলো বিল্ডিং ঘুরে দেখল ওরা। ট্রান্সপারেন্ট ফাইবারের এসক্যালেটরে চড়ে বহুবার ওপর-নীচ করল। হরেকরকম বিনোদনের পসরা দেখে জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটা দোকানে জায়ান্ট স্ক্রিন টিভিতে নিজেকে দেখতে পেল জিশান। ওকে নিয়ে তৈরি দু-তিনটে বিজ্ঞাপনও দেখল।

আশ্চর্য! এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা ও কিছুই জানে না!

পান্ডা আপনমনে বলল, 'তোমাকে সিন্ডিকেট প্রাইজ মানি দিচ্ছে ঠিকই—কিন্তু সেই টাকা কড়ায়-গন্ডায় উশুল করে নিচ্ছে। তোমাকে নিয়ে ওরা মিডিয়া হাইপ তৈরি করছে। কিল গেমের ব্যাপক পাবলিসিটি করছে

—যাতে প্রচুর অ্যাড পাওয়া যায়।'

জিশান চুপ করে রইল। সিন্ডিকেটের অঙ্কটা মনে-মনে বোঝার চেষ্টা করল। বিজ্ঞাপনের শুটিং করতে হবে ওকে! ওকে পাবলিসিটি দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলে তারপর ফায়দা তোলার পালা। আর সবশেষে রয়েছে পাঁঠাবলির লাইভ টেলিকাস্ট।

'ই-ল্যান্ড' থেকে বেরিয়ে ওরা কিউ-মোবাইলে উঠে আবার রওনা দিল। নানান রাস্তা ঘুরে জিশানের ছোটবেলার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

জায়গাটা দেখে জিশানের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। পুরোনো কিছুই আর নেই। নতুন-নতুন সব বাড়ি-ঘর তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

'এইখানে একটা দোতলা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে আমি থাকতাম।' পান্ডার দিকে তাকিয়ে বলল জিশান। মনে-মনে ও ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছিল। ওদের বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় ছিল সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছিল।

রোজ ঘুম থেকে উঠে যে-বারান্দাটায় গিয়ে ও দাঁড়াত সেটা কোনদিকে ছিল যেন? সূর্যটা কোনদিক থেকে ওঠে? কোনটা পুবদিক?

আকাশের দিকে তাকাল জিশান। একটুকরো চাঁদ, তারা, আর অন্ধকার। পুবদিক কোনদিকটা হতে পারে সেটা আন্দাজ করে 'বারান্দা'টা আবার খুঁজল। পেল না।

সবকিছু কেমন গুলিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিশান। শুধু বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল, 'এইখানে আমাদের বাড়ি ছিল। এইখানে...আমাদের... বাড়ি...ছিল...।'

বাবার ডাক শুনতে পেল জিশান। বাবা ওকে ডাকছে : 'জিশু! জিশু— !'

জিশান চোখ মুছল। চোয়াল শক্ত করল। পুরোনো মুছে গিয়ে ভালোই হয়েছে। মনে-মনে ভাবল জিশান। পুরোনো সবকিছু থাকলে স্মৃতি ওর চোখের জলে আরও ঢেউ তুলত। 'পুরোনো'কে ঝাপসা করে দেওয়ার জন্য 'নতুন'কে ধন্যবাদ জানাল। মনটা আরও শক্ত করতে চাইল।

শহরের আরও অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখানোর পর কিউ-মোবাইল জিপিসি-র পথ ধরল। এই কয়েকঘণ্টার শহর ভ্রমণে জিশান নিজের অনেক ছবি দেখেছে। বেশ কয়েকটা বিলবোর্ডেও জিশান পালচৌধুরী হাজির। চারিদিকে ওর এত ছবি!

'ছবি' হয়ে যাওয়ার আগে এখানে বোধহয় এরকমটাই হয়।

•

গেস্টহাউসে নিজের রুমে ফিরে আসার পর জিশানের খুব ক্লান্ত লাগছিল—তবে চোখে ঘুম আসছিল না। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল। চোখের নজর ঘরের সিলিং-এর দিকে। সেদিকে তাকিয়ে এক অন্ধকার সিনেমার পরদায় ও যেন নিজের জীবনের ছায়াছবি দেখছিল।

গত কয়েকটা মাসে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে ওর জীবনে! ওর ওল্ড সিটির বস্তিবাড়িতে শ্রীধর পাট্টা হাজির হওয়ার পর থেকেই শান্ত সুন্দর জীবনটা কেমন বদলে গেল। ওর ওল্ড সিটির হতমান অবস্থার মধ্যে কোনও সৌন্দর্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু ওর জীবনের ভেতরে সৌন্দর্য ছিল।

আর এখানে! নিউ সিটির অঙ্গসজ্জায় সৌন্দর্যই প্রথম এবং শেষ কথা। কিন্তু তার গভীরতা শরীরের ত্বক পর্যন্তই। তারপর...ত্বকের গভীরতার পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে কুৎসিতের জয়জয়কার। তাই কিল গেমে 'মৃত্যুপথযাত্রী' জিশানকে নিয়েও ওরা নির্লজ্জ ব্যাবসা শুরু করে দিয়েছে।

কেন জানি না, জিশান মনে-মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছিল। আর কতদিন...আর কতদিন ও কুৎসিতের সঙ্গে এরকম মরিয়া লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে?

কিল গেম পর্যন্ত সুপারগেমস কর্পোরেশন জিশানকে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যাবসা করবে। তারপর...কিল গেম শেষ হলে...অথবা, জিশান শেষ হলে...ওরা নতুন আর-একজন 'সুপারহিরো'র সন্ধানে নেমে পড়বে।

কিন্তু ওই তিনটে খুনির সঙ্গে 'ক্যাট অ্যান্ড মাউস' গেমে জিশান যদি জিতে যায়!

তা হলে জিশান হয়ে যাবে 'মেগা সুপারহিরো'। ওকে নিয়ে সিন্ডিকেট আরও কিছুদিন রমরমা ব্যাবসা চালাবে। প্রাইজমানি ছাড়াও ওকে নিউ সিটির একটা ফ্ল্যাট গিফট করবে। আরও সব নানান কোম্পানি ওকে হরেকরকম উপঢৌকন দেবে। তার মধ্যে গাড়ি তো আছেই! তা ছাড়াও থাকবে আধুনিক জীবনযাত্রার নানান সরঞ্জাম।

তখন মিনি আর শানুকে নিয়ে জিশান ওল্ড সিটি ছেড়ে চলে আসতে পারবে। চিরকালের জন্য। দু:খের জগৎ থেকে ওরা তিনজন চলে আসবে সুখের জগতে।

কিন্তু ওল্ড সিটির বাকি মানুষজন? ওরা কি ছন্নছাড়া জীবন আর অভাবের জাঁতাকলে পিষে মরবে?

যতই চিন্তা করছিল ততই জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল। ও বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ও বিছানায় উঠে বসল। বল রিমোটের বোতাম টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। তারপর দেওয়ালের প্লেট টিভিটার দিকে তাকাল।

জিপিসি-র এই গেস্টহাউসে আসার পর জিশান প্রথম দু-এক সপ্তাহ নানান চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখেছিল। তারপর থেকে ও গেমস-এর চ্যানেল আর চালায় না। ওইসব চ্যানেল দেখলে ওর মনের ওপর চাপ পড়ে। তাই ও নিয়ম করে দু-চারটে নিউজ চ্যানেল ছাড়া অন্য কোনও চ্যানেল আর দ্যাখে না। আর বেশিরভাগ সময় টিভিটাকে অন-লাইন ইনটারঅ্যাকটিভ মোডে রাখে, যাতে সিন্ডিকেট বা সুপারগেমস কর্পোরেশনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকে। এ ছাড়া টিভিটাতে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে—সিন্ডিকেট যখন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তখন যদি টিভিটা অফ থাকে তা হলে সেটা নিজে থেকেই অন হয়ে যায় এবং ইনটারঅ্যাকটিভ চ্যানেল চালু হয়ে যায়।

আর টিভি যদি চালু থাকে এবং তাতে অন্য চ্যানেল চলতে থাকে, তা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যানেল সোয়াপ হয়ে গিয়ে ইনটারঅ্যাকটিভ চ্যানেল পরদায় চলে আসে।

টিভির দিকে তাকিয়ে জিশান ওর আজকের নাইট সাফারির কথা ভাবছিল। ভাবছিল, ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের মাতামাতির কথা।

রিমোটের বোতাম টিপে টিভি অন করে দিল জিশান। চ্যানেল সার্ফ করে একটা গেমের চ্যানেলে গিয়ে থামল। লাইভ টেলিকাস্ট নয়—সেখানে তখন একটা 'হাংরি ডলফিন' গেমের ভিডিয়ো রেকর্ডিং দেখাচ্ছে। সমুদ্রের জলে ডলফিনের সঙ্গে মিশে আছে ডলফিনের 'ছদ্মবেশ' নেওয়া হিংস্র হাঙর। তাদের মধ্যে সাঁতারে বেড়াচ্ছে প্রতিযোগী।

হঠাৎই শুরু হল কর্মাশিয়াল ব্রেক। আর সেই ব্রেকের সময়ে টিভির পরদায় দেখা দিল জিশান। ওকে নিয়ে বিজ্ঞাপন শুরু হল।

অ্যানালগ জিমে জিশান ব্যায়াম করছে। বাটারফ্লাই ক্রাঞ্চ! রুমে এসি থাকা সত্ত্বেও ওর ত্বকের ওপরে ঘামের চকচকে স্তর। হঠাৎ সেই ছবি সরে গিয়ে একটা ভাইটালাইজিং পাউডারের কনটেইনারের ছবি। পাশে একজন স্লিম সুন্দরী তরুণী। মিষ্টি গলায় পাউডারের নানান গুণপনার কথা বলছে। পাউডারের কৌটোটাকে উষ্ণ আদরের ভঙ্গিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আদুরে ঢঙে হাস্কি ভয়েসে বলছে, 'তুমি আমার। আমার তুমি।' তারপরই জিশানের হাসিমুখ। আবার জিশানের ব্যায়াম। আবার পাউডারের কৌটো।

বিজ্ঞাপনটা শেষ হওয়ার পর জিশান ভাবতে বসল। টিভিতে তখন অন্য বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেলেও সেদিকে ওর মন ছিল না।

এই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা জিশান জানতেও পারেনি। জিশানকে জানানোর দরকারও মনে করেনি কেউ। ওর ব্যায়ামের ছবির ক্লিপিং-এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে ওই ভাইটালাইজিং পাউডারের ছবি, মেয়েটির ছবি।

তারপর এডিটিং-এর কারসাজিতে ছবিগুলো বিনুনির মতো জুড়িয়ে দিয়েছে। তারই মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে জিশানের হাসিমুখ। কোনওসময় ও হয়তো মনোহর বা খোকনের সঙ্গে হাসি-মশকরা করছিল, তখন লুকোনো টেলিক্যামেরায় তুলে নিয়েছে ওর হাসিমুখের ছবি।

জিশানের খুব রাগ হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও বুঝল, এ রাগের কোনও মানে নেই। ওর ফোঁসফোঁসানিই সার—ওর কামড়ে কোনও বিষ নেই।

হতাশা আর ক্ষোভে ওর চোখ জ্বালা করতে লাগল।

বিছানার মাথার দিকে তাকাল জিশান। বালিশের পাশেই পড়ে আছে এম. ভি. পি.—মাইক্রোভিডিয়োফোন।

মিনিকে ভীষণ ফোন করতে ইচ্ছে করল।

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দেড়টা।

মিনি নিশ্চয়ই এখন ঘুমিয়ে আছে। আর মা-কে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শানু। তা ছাড়া এই মাঝরাতে মিনির এম. ভি. পি. নিশ্চয়ই সুইচ অফ করা আছে।

এতসব ভাবনার পরেও জিশান শরীরটা ঝুঁকিয়ে হাত বাড়িয়ে এম. ভি. পি.-টা মুঠো করে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর মনে হল, মিনি এসে গেছে হাতের মুঠোয়।

সোজা হয়ে বসল। এম. ভি. পি.-টা মুখের সামনে তুলে ধরল। তারপর বোতাম টিপল।

আজকের রাতটার মধ্যে বোধহয় ম্যাজিক আছে। কারণ, ফোনের বাজনা তৃতীয়বার শেষ হওয়ার আগেই মিনি ফোন ধরল।

ছোট্ট এল.সি.ডি. পরদায় ওকে দেখতে পেল জিশান।

ঘরের অন্ধকারে ভাসছে মিনির সদ্য-ঘুম-ভাঙা মুখ। ফোনের আলোর আভায় ওর মুখটা অলৌকিক দেখাচ্ছে।

'মিনি—।'

'জিশান! কী হয়েছে? এত রাতে!' ঘুম জড়ানো গলায় মিনি বলল। ওর কথায় আশঙ্কা উঁকি মারছে।

'না, কিছু হয়নি।'

'না—বলো। তুমি লুকোচ্ছ। প্লিজ বলো—!'

'না, মিনি—কিচ্ছু না। বিশ্বাস করো।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আসলে তোমাকে ভীষণ ফোন করতে ইচ্ছে করল। দেখতে ইচ্ছে করল। আমি...শুধু-শুধু তোমার ঘুম ভাঙালাম...।'

'তাতে কী আছে! তোমার ফোন আসতে পারে ভেবে আমি রোজ ফোনটা অন করে বালিশের পাশে রেখে শুই।'

'আমার এখানে আর ভাল্লাগছে না।' বাচ্চা ছেলের বায়নার ঢঙে বলল,'আমার কিছু ভাল্লাগছে না।'

'ভালো লাগবে কেমন করে! নিউ সিটি মোটেই ভালো লাগার জায়গা নয়...সবাই জানে...।'

জিশান আর মিনি কথা বলতে লাগল। ওদের কথা আর ফুরোতে চায় না। কিন্তু বরাদ্দ দশমিনিট ধীরে-ধীরে ফুরিয়ে আসছিল।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, ওরা দুজনেই কিল গেমের কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। যেন ব্যাপারটাকে অস্বীকার করলেই ওটা উধাও হয়ে যাবে।

সময় ফুরিয়ে আসছিল বলে জিশান মিনিকে ওর নাইট সাফারির কথা বলল। বলল পান্ডা আর মূর্তির সাহায্যের কথা। আনমোলের কথা। সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমের অফিসারের কথা।

পান্ডা আর মূর্তির কথা মিনি জিশানের কাছে আগেই শুনেছিল। এখন জানতে পারল, আরও অনেক সিকিওরিটি গার্ড জিশানের ভালো চাইছে। চাইছে জিশান জিতুক।

জিশান এবার বিজ্ঞাপনের কথা বলল। বলল, কীভাবে সিন্ডিকেট ওকে বিপণনের কাজে লাগাচ্ছে।

'...আমার হাত-পা বাঁধা। কিছু করতে পারছি না। মিনি, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে...।' জিশান কেঁদে ফেলল।

'হ্যাঁ—জানি, তোমার ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় কী! তোমাকে সহ্য করতেই হবে। প্লিজ, কেঁদো না...।'

জিশান চোখের জল মুছে বলল, 'এরপর হয়তো ওরা ক্লিপিংস ইউজ না করে আমাকে দিয়ে অ্যাডের শুটিং করাবে। একটা বলির পাঁঠাকে নিয়ে আর কত হেনস্থা করবে ওরা! ওই শয়তানটা...ওই হারামজাদা শ্রীধর পাট্টা...ওকে খতম করতে পারলে...।'

'শোনো, জিশান!' ওকে বাধা দিয়ে বলল মিনি, 'এইসব হেনস্থার জবাব তোমাকে দিতে হবে কিল গেমে।'

'কিল গেমে!' হঠাৎ করে কিল গেমের প্রসঙ্গ সরাসরি উঠে আসায় জিশান অবাক হল। মিনির ছবির দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। কিল গেমের দিন ঠিক হলে ওই গেম সিটিতেই তোমাকে জবাব দিতে হবে। ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—।'

চোয়াল শক্ত করল জিশান : 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।' মাথা নাড়ল : 'ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জবাব দিতে হবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টা নয়—তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটের মধ্যে—।'

'হ্যাঁ। তুমি...।'

দশ মিনিট ফুরিয়ে গেল। এম.ভি.পি.-র পরদায় মিনির ছবি দপ করে নিভে গেল।

জিশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও যেন এতক্ষণ স্বর্গে ছিল—এই মুহূর্তে নরকের অন্ধকূপে খসে পড়ল।

এম.ভি.পি.-টা সুইচ অফ করে বালিশের কাছে ছুড়ে দিল। বল রিমোটের বোতাম টিপে প্লেট টিভি অফ করল। তারপর ঘরের আলোটাও নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর।

জীবন্ত প্রেতের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল জিশান। হতাশার স্রোত ওকে আলোয়ানের মতো জড়িয়ে নিচ্ছিল। এবং অন্ধকারে চুপচাপ বসে ও প্রাণপণে তার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! হঠাৎই টিভির ইনটারঅ্যাকটিভ চ্যানেল দপ করে চালু হয়ে গেল।

আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠল জিশান। তাকাল টিভির দিকে।

একজন সুন্দরী মিষ্টি গলায় ওর নাম ধরে ডাকল : 'জিশান! জিশান!'

মেয়েটি বোধহয় ভেবেছে জিশান ঘুমিয়ে আছে।

আরও দু-একবার ডাকার পর জিশান বিছানা ছেড়ে উঠল। টিভির কাছে গিয়ে বলল, 'বলো। জেগে আছি।'

হাসল মেয়ে : 'সরি, জিশান। ডিসটার্ব করছি। তোমাকে আমাদের পিস ফোর্সের মাননীয় মার্শাল ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি রেডি হয়ে নাও। পিস ফোর্সের গার্ডরা ঠিক সাত মিনিট পর তোমাকে নিতে আসবে। থ্যাংক য়ু।'

ইনটারঅ্যাকটিভ চ্যানেল অফ হয়ে গেল। মেয়ে মিলিয়ে গেল।

রিমোটের বোতাম টিপে আলো জ্বালল জিশান। ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে পাল্লা খুলল। একটা ছাই রঙা কর্ডের প্যান্ট আর নীল রঙের পোলো নেক টি-শার্ট পরে নিল।

শ্রীধর পাট্টা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

কিন্তু কেন?

সাত মিনিট শেষ হতে না হতেই দরজায় কলিংবেল। গার্ডরা এসে গেছে।

দরজা খুলল জিশান। পিস ফোর্সের তিনজন গার্ড। অভিব্যক্তিহীন মুখ। কোমরে শকার—সুইচ অন করা।

না, গার্ডদের একটা মুখও ওর চেনা নয়।

'চলো—মাননীয় মার্শাল...।' ওদের একজন বলতে শুরু করেছিল।

'জানি।' লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে জিশান বলল। এবং ওদের সঙ্গে রওনা হল।

করিডর ধরে যেতে-যেতে জিশান ওদের কাছে বারবার জানতে চাইল, শ্রীধর পাট্টা ওকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওরা কোনও জবাব দিল না।

আরও অনেকবার জিশান একই কথা জিগ্যেস করল। কিন্তু তা সত্বেও কোনও জবাব নেই।

এলিভেটরে করে নামার সময় জিশান ওদের অনুনয় করে বলল, 'প্লিজ, ভাই! যদি জানা থাকে আমাকে বলো। প্লিজ!'

গার্ডরা নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বরফ গলল। ওদের একজন জিগ্যেস করল, 'তুমি আজ রাতে গেস্টহাউস ছেড়ে বেরিয়েছিলে?'

জিশান কোনও উত্তর দিতে পারল না। হতবাক হয়ে গার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর-একজন গার্ড বলল, 'তুমি জিপিসি-র ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়েছিলে। মনে হয়, শ্রীধর পাট্টা সেটা জানতে পেরেছেন...।'

জিশানের বুকের ভেতর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামতে শুরু করল। আবার তা হলে 'রোলারবল'?

কিন্তু শ্রীধর জানতে পারলেন কেমন করে!



জিপিসির গেস্টহাউস থেকে নীচে নেমে এল জিশান। তিনজন গার্ডের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেল একটা কিউ-মোবাইলের দিকে।

গাড়িতে একজন পাইলট স্টিয়ারিং-এর সামনে বসেছিল। তার পাশে জিশানকে বসিয়ে একজন গার্ড জিশানের বাঁ-পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর বাকি দুজন পিছনে। ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ির চারটে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

জিপিসি-র ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে কিউ-মোবাইল ছুটে চলল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ইলেকট্রনিক প্যানেলের দিকে তাকাল জিশান। ডিজিটাল ঘড়িতে দুটো দশ। তার পাশেই বসানো ছোট টিভির পরদায় রক ব্যান্ডের লাইভ শো দেখানো হচ্ছে।

গন্তব্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ার পর জিশান বিল্ডিংটাকে চিনতে পারল : সিন্ডিকেট হেডকোয়ার্টার। এত রাতেও বহুতল বিল্ডিংটার নানান ফ্লোরে আলো জ্বলছে। আগেই জিশান শুনেছিল, এখানে প্রায় সব অফিসেই নাইট শিফটে কাজ হয়।

গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে এগোল ওরা।

রাতের বাতাস কেটে শিসের শব্দ শুনতে পেল জিশান। মাথা তুলে ওপরে তাকাল।

দুটো শুটার বাঁক নিয়ে ছুটে গেল আকাশে। বোধহয় রাতে ওরা নিউ সিটির আকাশে টহল দেয়। নজরদারির কাজ করে। হয়তো ওই শুটার থেকেই কোনও টহলদার গার্ড জিশানের নাইট সাফারির কথা জানতে পেরেছে—তারপর শ্রীধর পাট্টাকে খবর দিয়েছে।

বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়তেই শীতাতপ পরিবেশে উষ্ণতা বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল। অথচ গ্রানাইট, কাচ, প্লাস্টিক আর স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি আধুনিকতম সব ঘর আর বারান্দার নকশা। অথচ চারপাশে তাকালে কেমন যেন নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ভাব।

জিশান লক্ষ করল, করিডরে লোক চলাচল দিনের তুলনায় বেশ কম। তবে যে-ক'জন গার্ডকে নজরে পড়ল তারা সকলেই একইরকম স্মার্ট এবং ওদের কোমরে ঝোলানো শকার একইরকম সক্রিয়।

প্রথমে ভার্টিকাল এলিভেটর। তারপর হরাইজন্টাল এলিভেটর। তাতে ওঠার পর একজন গার্ড ডিজিটাল প্যানেলে কো-অর্ডিনেট পাঞ্চ করল। এক্স-ওয়াই স্থানাঙ্ক পাওয়ামাত্রই মসৃণ এলিভেটর নি:শব্দে গন্তব্যে ছুটে চলল।

জিশান কোনও কথা বলছিল না। গার্ড তিনজনও চুপচাপ। ঠিক যেন কারও মৃত্যুশোকে নীরবতা পালন চলছে। বোধহয় শোকের ঘটনার আগেই স্মরণসভা শুরু হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত জিশানকে যেখানে নিয়ে আসা হল বেশ বড় মাপের একটা দরজার সামনে। গার্ড তিনজন দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ইশারায় জিশানকে ভেতরে ঢুকতে বলল।

কপালে-যা-থাকে-থাক ভেবে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল জিশান।

একটা বিশাল হলঘর। ঘরের একপ্রান্তে অদ্ভুত জ্যামিতিক চেহারার একটা কনফারেন্স টেবিল। তাকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার।

একটা চেয়ারে বসে আছেন অবশ্যই শ্রীধর পাট্টা। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। সোনালি বোতাম। বুকপকেটের ওপরে জ্বলজ্বলে নীল হলোগ্রাম।

এই রাত আড়াইটের সময়েও মানুষটার শরীর চাবুকের মতো টান-টান, গিরগিটির মতো সজাগ।

জিশানকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ওয়েলকাম, জিশান—ওয়েলকাম...।'

জিশান মানুষটার দিকে একবার তাকাল শুধু—কোনও কথা বলল না। লোকটার ফরসা মসৃণ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই করা এক কুৎসিত ভাস্কর্য।

শ্রীধরের দুপাশের দুটো চেয়ারে বসেছিল দুজন পুরুষ। ডানদিকে যে বসেছিল তার বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ গোছের হবে। তামাটে রং, মাথায় টাক, চোখে চশমা, ভাঙা চোয়াল, থুতনিতে সামান্য দাড়ি।

আর শ্রীধর পাট্টার বাঁ-দিকের লোকটির বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। মাঝারি রং, অসম্ভব রোগা, মাথার সাদা চুলগুলো এলোমেলো—দেখে মনে হয় চিরুনির সঙ্গে ওদের বহুকাল দেখা নেই। লম্বা খাড়া নাক, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, নাকের নীচে পাতলা সাদা গোঁফ।

দুজন মানুষকে দুরকম দেখতে হলেও ওদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেল জিশান : দুজনের চোখেই ঘুম-ঘুম ভাব।

হঠাৎই হাততালি দিলেন শ্রীধর—পরপর দুবার। হাসলেন। ছড়া কেটে বললেন, 'এসো, জিশান—গুড বয়/করো এদের সঙ্গে পরিচয়।'

হাততালির শব্দেই শ্রীধরের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল জিশান। শ্রীধর টাকমাথা লোকটির দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, 'গণপত আচারিয়া। আমাদের সিন্ডিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট। গ্রেট ইনভেন্টর। তবে...' এবার বাঁ-দিকের মানুষটার দিকে ইশারা করে : 'ইনি হলেন আমাদের এক নম্বর সায়েন্টিস্ট। মনসুখ চক্রপাণি। গ্রেট, গ্রেটার, গ্রেটেস্ট ইনভেন্টর। নিউ সিটির বিজ্ঞানদেবতা।

'এই দুজনের কাছে, জিশান, সবরকম কোশ্চেনের আনসার রয়েছে। তাই ডক্টর আচারিয়াকে আমি ''কোশ্চেন'' বলে ডাকি, আর প্রফেসর চক্রপাণির আমি নাম দিয়েছি ''আনসার''। ওঁরা দুজন যদি একজোট হন তা হলে সব কোশ্চেনেরই আনসার পাওয়া যায়। তাই সংক্ষেপে ওঁদের আমি ''কিউ'' আর ''এ'' বলে ডাকি...।'



কয়েক সেকেন্ড থামলেন শ্রীধর। তারপর একটা লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'যে-ফেনোমেনাল ফাইটারের কথা আপনাদের বলছিলাম ডক্টরস—এই সেই জিশান পালচৌধুরী...।'

চশমার কাচের পিছন থেকে দু-জোড়া চোখ জিশানকে দেখতে লাগল। সে-চোখে খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা বিস্ময়।

কিউ উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, বললেন, 'হাই, জিশান।'

জিশান ডানহাতটা খানিকটা তুলল শুধু—কোনও কথা বলল না।

এ একবার হাই তুললেন। তারপর বসে-বসেই বললেন, 'নাইস টু মিট যু—।'

জিশান আবার হাত তুলল, হাসল। বলল, 'থ্যাংকস। হাউ ডু যু ডু?'

পকেট থেকে একটা ফোন বের করলেন শ্রীধর। চেহারা দেখে জিশানের মনে হল বস্তুটা স্যাটেলাইট ভিডিয়োফোন। সেটা অন করে শ্রীধর চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অপেক্ষার একমিনিটও বোধহয় পুরোপুরি কাটেনি, হলঘরের অন্যপ্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল। কয়েকজন লোক ঘরে ঢুকল। সঙ্গে চারজন গার্ড। হাতে শকার—আত্মরক্ষা কিংবা আক্রমণের জন্য তৈরি।

যাদের জিশান 'লোক' বলে ভাবছিল তারা যে প্রায় সকলেই ওর চেনা সেটা ও বুঝতে পারল একটু দেরিতে। কারণ, তাদের চোখ-মুখ নানান জায়গায় ফুলে আছে, কোথাও-কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে আছে, কারও-বা ভুরুর কাছে কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

রক্তের দাগ-টাগ থাকা সত্বেও জিশান প্রথমে সেই অফিসারকে চিনতে পারল। কাল রাতে সিকিওরিটি কন্ট্রোল রুমে অল-গ্লাস কিউবিকলের ভেতরে আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে যে বসেছিল। মাথায় তার কাঁচাপাকা চুল। কাল রাতে যে-চেহারাটা জিশানের বেশ লম্বা-চওড়া বলে মনে হয়েছিল এখন আর ততটা

লম্বা-চওড়া বলে মনে হল না। শ্রীধর পাট্টার অত্যাচার মানুষটাকে একইসঙ্গে অনেক খাটো, অনেক ভঙ্গুর, আর অনেক নমনীয় করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়জন আনমোল। জিশানের কাল রাতের মেকাপম্যান। ওর ভুরুর কাছে অনেকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তাই জিশানের ওকে চিনতে একটু বেশি সময় লেগেছে।

আনমোলের চোখে শূন্য দৃষ্টি। স্থিরভাবে ঘরের একটা আলোর ফিক্সচারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তৃতীয়জনকে চিনতে পারার পরই একটা জোরাল ধাক্কা খেল। পান্ডা। ওর ঠোঁটের বাঁ-দিকটা ফুলে আছে। কালচে হয়ে রক্ত জমে আছে। ডানচোখটার অবস্থাও একইরকম। ফুলে উঠে চোখটা প্রায় বুজে গেছে। চোখের ওপরটা আর পাশটা নীল হয়ে আছে।

মুখে এতরকম 'কারুকাজ' থাকা সত্ত্বেও পান্ডাকে জিশানের চিনতে ততটা সময় লাগেনি। কারণ, মানুষটা চঞ্চলভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। জিশানকে লক্ষ করামাত্রই ও জিশানের দিকে অনেকক্ষণ স্থির নজরে তাকিয়ে থেকেছে। তারপর ঠোঁট জোর করে টেনে লম্বা করে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেছে।

আশ্চর্য মানুষ বটে! সামনে খোদ শ্রীধর পাট্টা হাজির—তবুও কোনও ভয়ডর নেই।

ওরা তিনজন ছাড়াও একজন আহত যুবক ওদের সঙ্গে ছিল। জিশান তাকে চিনতে পারল না।

হঠাৎই পান্ডা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন গার্ড ঝুঁকে পড়ে ওকে ঝটকা মেরে টেনে তুলল। আবার দাঁড় করিয়ে দিল।

পান্ডা দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু ওর দেহটা সামান্য নড়তে লাগল।

অন্য সময় হলে জিশান ভাবত পান্ডা নেশা করেছে। কিন্তু এখন ওর মনে হল, পিস ফোর্সের গার্ডরা পান্ডাকে অসম্ভব মারধোর করেছে। তাই ও ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না।

'জিশান—!' হঠাৎই চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন শ্রীধর পাট্টা।

ডাকটা শোনামাত্রই গার্ডরা কেমন যেন অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে চলে গেল। কিন্তু জিশান শুধু স্লো মোশানে চোখ ফেরাল টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মার্শালের দিকে।

'জিশান, কাল রাতে তুমি ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলে, তাই না?'

প্রশ্নটা শুনে জিশানের হঠাৎই মনে হল, শ্রীধর এখনও এই প্রশ্নটার সুনিশ্চিত উত্তর পাননি। এই চারজন মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে শ্রীধর যদি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন তা হলে জিশানকে আর এই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতেন না। সুতরাং জিশান বুঝতে পারল ওর উত্তর কী হওয়া উচিত।

একইসঙ্গে ও ভেবে দেখল, শ্রীধর কতটা খবর পেয়েছেন বা পাননি তার ওপরে ওর উত্তরটা নির্ভর করছে না। ও যদি বলে, হ্যাঁ, ও কাল রাতে জিপিসি ছেড়ে বেরিয়েছিল তা হলে আনমোল, পান্ডাদের ওপরে টরচার আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বরং উলটো উত্তরটাই সঠিক উত্তর: না, ও ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরোয়নি। শ্রীধরের নলেজ বেসের স্টেটাসের সঙ্গে এই উত্তরটার নড়চড় হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

জিশান জবাব দিল, 'না, আমি ক্যাম্পাস থেকে বেরোইনি।'

ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে মিহি গলায় হেসে উঠলেন শ্রীধর। তারপর মুখ নামিয়ে তাকালেন জিশানের দিকে। ভুরু উঁচিয়ে ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করলেন, 'তাই? বেরোওনি? লক্ষ্মীছেলে হয়ে ছিলে? ঘুমু-ঘুমু করছিলে?'

জিশান চুপ করে রইল। ভাবতে চেষ্টা করল, এরপর শ্রীধর কোন পদক্ষেপ নেবেন।

শ্রীধর পাট্টা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানের দিকে একবার দেখলেন, তারপর তাকালেন পান্ডাদের দিকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'এই চারটে লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ারও একই কথা বলছে। অথচ এদের একজনের ছবি ই-ল্যান্ডের ক্লোজড সার্কিট টিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে। তা ছাড়া কাল রাতে গেস্টহাউস বিল্ডিং-এর চারটে সারভেইল্যান্স জোন কী কারণে যেন সাডেনলি ডি-অ্যাক্টিভেটেড হয়ে

গিয়েছিল। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আপনারা কী বলেন, এ এবং কিউ?' মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে শেষ প্রশ্নটা করলেন শ্রীধর পাট্টা।

ওঁরা দুজনে একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'অফ কোর্স গোলমেলে—সাসপিশাস।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। পান্ডাদের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। জিশানের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। তারপর আবার এগোলেন। একেবারে পান্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই পান্ডার গালে সপাটে এক থাপ্পড় কষালেন।

বিকট শব্দ হল। পান্ডা ছিটকে পড়ে গেল মার্বেলের মেঝেতে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনও যন্ত্রণার শব্দ বেরোল না।

শ্রীধরের হাতে বোধহয় রক্ত-টক্ত লেগে গিয়েছিল। তাই সামনে দাঁড়ানো একজন গার্ডের য়ুনিফর্মে হাতটা ঘষে-ঘষে মুছলেন। বললেন, 'এক্ষুনি গিয়ে য়ুনিফর্মটা পালটে নাও—।'

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন করে গার্ড চলে গেল।

পান্ডা তখনও মেঝেতে পড়ে ছিল। গালে আলতো করে হাত বোলাচ্ছিল। আর ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল শ্রীধরের দিকে। শুধু শ্রীধরেরই দিকে।

শ্রীধর সেই ঠান্ডা দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। একটা নোংরা গালাগাল দিয়ে বুটের এক লাথি কষিয়ে দিলেন পান্ডার পাঁজরে।

সংঘর্ষের শব্দ হল। পান্ডার শরীরটা ভাঁজ খেয়ে গেল আঘাতে। কিন্তু না—এত সত্বেও ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটাকে খানিকটা সোজা করে ও আবার তাকিয়ে রইল শ্রীধরের দিকে।

সেই অভিব্যক্তিহীন ঠান্ডা দৃষ্টির সামনে পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। জিশান দেখল, শ্রীধর পাট্টা চোখ সরিয়ে নিলেন পান্ডার দিক থেকে।

এই ছোটখাটো দুর্বল মাতাল মানুষটার কী অবিচল নি:শব্দ প্রতিরোধ! ওর দৃষ্টিতে জিশান যেন একইসঙ্গে দেখতে পেল ঘৃণা আর প্রতিবাদ।

সত্যি, জিশানকে ওরা কীভাবে আগলে রেখেছে! দু-হাতের তালুর আড়ালে নিশ্চিন্তে স্থির হয়ে থাকা জ্বলন্ত প্রদীপের শিখার মতো। হাত দুটো আঘাতে-আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও তাদের আড়ালে প্রদীপের শিখা অবিচল, অমলিন।

মনে-মনে পান্ডাদের সেলাম জানাল জিশান। মানুষগুলো এত সয়েছে ওর জন্য! এত!

শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট শিশি বের করলেন। ওপরদিকে মুখ তুলে হাঁ করলেন। তারপর শিশি থেকে তিন ফোঁটা তরল মুখের ভেতর ঢেলে দিলেন।

জোরে-জোরে শ্বাস টানলেন শ্রীধর। জিভের ডগাটা দু-ঠোঁটের ফাঁকে চট করে এপাশ-ওপাশ নাড়লেন। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নতুন তেজে ফিরে এলেন জিশানের কাছে।

'জিশান, তুমি সত্যি কথা বলছ কি না সেটার জন্যে আমি একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করব। এই এক্সপেরিমেন্টটা কিউ অ্যান্ড এ-র ডিজাইন। মানে, ওই...' হাত তুলে দুই বিজ্ঞানীর দিকে দেখালেন শ্রীধর : '...আচারিয়া আর চক্রপাণির ইনভেনশান। এই এক্সপেরিমেন্টটার মজা হচ্ছে এতে তোমার কোনও ফিজিক্যাল পেইন হবে না। য়ু ওন্ট বি হার্ট। য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেলথ—অ্যান্ড ইন ওয়ান পিস। কিন্তু...না:, থাক—বলব না। সে তুমি দেখতেই পাবে। এই ''কিন্তু''টাই এক্সপেরিমেন্ট। নাউ গেট রেডি অ্যান্ড বি স্টেডি...।' মোলায়েম হেসে কথা শেষ করলেন শ্রীধর পাট্টা।

তারপরই চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তাকালেন পান্ডাদের দিকে। একজন গার্ডকে ইশারা করে বললেন, 'ওদের নিয়ে যাও—যার-যার ডিউটি করার জন্যে ছেড়ে দাও। আর ওদের ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার বসকে ক্লিয়ারেন্স কোড জানিয়ে দিচ্ছি...।'

পকেট থেকে আবার স্যাটেলাইট ভিডিয়োফোন বের করলেন। অন করে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর গার্ডদের দিকে ইশারা করে মাথা নাড়তেই ওরা পান্ডা, আনমোলদের রুক্ষভাবে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল।

জিশান লক্ষ করল, ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পান্ডা জিশানের চোখে তাকিয়ে রইল।

বিজ্ঞানী দুজন জিশানের কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীধর ফোনে আবার কথা বলছিলেন। সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ উচ্চারণে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। নির্দেশ দেওয়া শেষ হওয়ার মিনিট তিন-চারেকেরই মধ্যেই ঘরে ছ'জন গার্ড ব্যস্তভাবে ঢুকে পড়ল। তাদের পিছন-পিছন চারজন লোক—তারা একটা বড়সড় ভারী মেটাল টপ কাঠের টেবিলকে শূন্যে ভাসিয়ে বয়ে নিয়ে আসছে।

টেবিলটা ঘরের একপ্রান্তে মাঝামাঝি রাখা হল। টেবিল থেকে ঘরের তিনটে দেওয়ালেরই দূরত্ব অন্তত দশফুট।

চারজন টেবিল-বাহক ঘর ছেড়ে চলে গেল। ছ'জন গার্ড টেবিলটাকে অর্ধচন্দ্রের ঢঙে ঘিরে দাঁড়াল। কোমর থেকে শকার খুলে তরোয়ালের মতো উঁচিয়ে ধরল।

জিশানের মনে হচ্ছিল, কোনও একটা নাটকের শোয়ের জন্য স্টেজ তৈরি করা হচ্ছে, তার ওপরে প্রপস সাজানো হচ্ছে। শুধু কুশীলবদের স্টেজে ঢুকে পড়াটাই বাকি।

এ এবং কিউ তখন নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের জটিল কোনও বিষয় নিয়ে হাত-মুখ-চোখ নেড়ে গভীর আলোচনা করছেন। এবং মাঝে-মাঝেই হাই তুলছেন।

শ্রীধর পাট্টা ওঁর বাঁ-হাতের নখ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'জিশান, এবার তোমাকে টি-শার্টটা খুলে ফেলতে হবে।'

জিশান চমকে উঠে শ্রীধরের দিকে তাকাল। এ কী বলছেন শ্রীধর? গায়ের জামা খুলে ফেলতে হবে?

শ্রীধর হাসলেন, ছন্দবাণীতে বললেন, 'খোলো, খোলো। এবার তোমার শো হবে সোলো—।'

শ্রীধর যে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন সেটা বোঝা গেল ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে। কারণ জিশানকে লক্ষ্য করে শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় তিনি ডানহাতের দু-আঙুলে টুসকি দেওয়ার চটাচট শব্দ করলেন।

জিশান অবাক চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে পোলো নেক টি-শার্টটা খুলতে শুরু করল।

শ্রীধর এবার বিজ্ঞানী দুজনের দিকে তাকালেন। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা দুজন কি তৈরি?'

'ইয়েস, স্যার।' চটপট জবাব দিলেন চক্রপাণি। আচারিয়ার দিকে তাকালেন। এবং ঘুম তাড়াতে আঙুল দিয়ে দু-চোখ রগড়ে নিলেন।

আচারিয়া সাদা-কালো চেকশার্ট পরেছিলেন। সঙ্গে চকোলেট রঙের ঢোলা ট্রাউজার্স। তারই পকেটে ব্যস্তভাবে হাত ঢোকাতে-ঢোকাতে বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার, আমরা তৈরি—।'

জিশানের খারাপ লাগল। বাবার কথা মনে পড়ল। শ্রীধর পাট্টার মতে নিউ সিটির এক নম্বর এবং দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট যথাক্রমে একনম্বর এবং দু-নম্বর চাকরের মতো আচরণ করছে! শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান এঁদের মধ্যে মর্যাদাবোধ তৈরি করতে পারেনি।

গণপত আচারিয়া পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে নিলেন। তারপর সেটা উঁচিয়ে ধরে শ্রীধরকে দেখালেন। জিশানও সেটা দেখল।

দুই কি আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের কৌটো। উচ্চতায় ইঞ্চি চারেক হবে। কৌটোর ভেতরে চকচকে অথচ স্বচ্ছ একটা তরল। আলো পড়ে ধাতুর মতো ঝিকমিক করছে। অথচ পারদ নয়—তার তুলনায় ঘনত্ব অনেক কম। কোনও তরলের এরকম রং জিশান আগে কখনও দেখেনি।

ওর টি-শার্ট খোলা হয়ে গিয়েছিল। সেটা মেঝেতে ফেলে দিল। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে শীতাতপের প্রভাবে ওর শীত করতে লাগল।

জিশান অপেক্ষা করতে লাগল। শ্রীধরের এর পরের নির্দেশ কী হবে কে জানে! ওর কর্ডের প্যান্টটার ভাগ্যেও কি টি-শার্টের পরিণতি লেখা আছে?

•

সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জিশানের শরীর পরখ করছিলেন। ফরসা, সুঠাম দেহ। বুকের মাঝখানটা সামান্য লোমশ। কিন্তু তার জন্য উদ্ধত পেশিগুলো দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, এ-দেহ অনেক লড়াই দেবে।

শ্রীধরের মনে-মনে নেওয়া 'পরীক্ষা'য় জিশান বোধহয় পাশ করল। কারণ, শ্রীধর ছোট্ট করে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন এবং হাসলেন।

তারপরই বললেন, 'এবার কর্ডের প্যান্টের পালা। খোলো, জিশান!' বারদুয়েক শ্বাস নিয়ে বিপ্লবের জিগির দেওয়ার ঢঙে বললেন, 'কর্ডের প্যান্ট, দূর হঠো!'

জিশান মনে-মনে নিজেকে বলল, 'ধৈর্য হারালে চলবে না। শান্ত হও। শান্ত থাকো। এখনও ধৈর্য হারানোর সময় আসেনি। ধৈর্য তুমি তখনই হারাবে যখন প্রতিপক্ষকে অনেক-অনেক লড়াই দিতে পারবে...।'

জিশান মুখের ভাব সংযত রেখে প্যান্টের বোতামে হাত দিল। তখনই লক্ষ করল, চক্রপাণি পকেট থেকে একজোড়া হালকা নীল রঙের গ্লাভস বের করে নিলেন। স্বচ্ছ। রাবার লেটেক্স-এর তৈরি। জিশানের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে গ্লাভস পরে নিতে লাগলেন। দুবার হাই তুললেন।

জিশানের ভেতরে হেনস্থার ঘৃণা অসংখ্য বুদ্বুদ হয়ে উথলে উঠতে লাগল। কিন্তু ও চোয়াল শক্ত করে প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল।

শ্রীধর ডানহাত শূন্যে তুলে ম্যাজিশিয়ানদের মতো একটা ইশারা করলেন। বোঝা গেল ইশারাটা টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের জন্য। ওদের চারজন পলকে গতিশীল হল। এগিয়ে আসতে লাগল জিশানের দিকে।

বাকি দুজন গার্ড টেবিলের গায়ে লাগানো লুকোনো কোনও বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চারটে স্টেইনলেস স্টিলের ব্যান্ড টেবিলের মেটাল টপ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল। ব্যান্ডগুলো দেখতে ওলটানো 'ইউ' অক্ষরের মতো।

জিশান কর্ডের প্যান্টটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে দিল। খানিকটা অবাক চোখে টেবিলের চারটে স্টিল ব্যান্ডকে দেখতে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে এই বিশেষ টেবিলটার সম্পর্ক ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

জিশানের জাঙ্গিয়া পরা লম্বা দেহটার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর। দেখলেন এ এবং কিউ-র দিকে। এ তখন গ্লাভস পরে তৈরি। তৈরি জিশানকে ঘিরে থাকা চারজন গার্ডও।

শ্রীধর হাসলেন। চাপা গলায় বললেন, 'স্টার্ট অপারেশান—।'

সঙ্গে-সঙ্গে চারজন গার্ড একরকম ছিটকে চলে এল জিশানের কাছে। নিমেষের মধ্যে দুজন ওর হাত চেপে ধরল। আর বাকি দুজন মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ে ওর পা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

জিশান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গার্ডদের বাঁধন ছাড়ানোর এতটুকুও চেষ্টা করল না। প্রথমত, ও দেখতে চাইছিল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। দ্বিতীয়ত, ও গার্ডদের কোমরে ঝোলানো শকারগুলোর কথা ভোলেনি।

দু-হাতের কবজিতে এবং দু-পায়ের গোড়ালির গাঁটের ঠিক ওপরে জিশান গার্ডদের মুঠোর চাপ অনুভব করছিল। ও তাকিয়ে ছিল এ আর কিউ-র দিকে। দেখল, কিউ-র হাতের ঝিকিমিকি তরলের স্বচ্ছ কৌটোটা চালান হয়ে গেল এ-র গ্লাভস পরা হাতে। এ কৌটোটা শূন্যে উঁচিয়ে ধরে চোখ সরু করে কী যেন পরখ

করতে লাগলেন। কৌটোর তরলটা মাঝে-মাঝে নাড়ছিলেন, এবং আপনমনেই বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন।

শ্রীধর পাট্টা কোমরে দু-হাত রেখে ঠোঁটে সামান্য তেরছা হাসি ফুটিয়ে জিশানকে দেখছিলেন। এ-র দিকে নজর ফিরিয়ে মিহি অথচ রুক্ষ গলায় বললেন, 'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করুন—।'

এ চমকে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'করছি, স্যার, করছি—।'

এ কৌটোটা হাতে করে কিউ-কে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন জিশানের ঠিক পিছনে। জিশান ওঁদের আর দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টাও করল না।

কৌটোর ঢাকনা খুললেন এ। কৌটো কাত করে খানিকটা তরল গ্লাভস পরা হাতে ঢেলে নিলেন। কৌটো আর ঢাকনা কিউ-র হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর হাতের তরল তেল মাখানোর মতো করে জিশানের পিঠে মেখে দিতে লাগলেন।

জিশান অবাক হলেও চুপ করে রইল। পিঠে মাখিয়ে দেওয়া তেলটা যে বেশ ঠান্ডা সেটা অনুভবে টের পেল।

ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু জিশানের নগ্ন পিঠে দস্তানা পরা একটা হাতের তেল মাখানোর চাপড়ের শব্দ।

শ্রীধর পাট্টা পাথরের মূর্তির মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন আর কোনও কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

জিশানের ঘাড়, পিঠ, কোমরের পিছনে জাঙ্গিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত তেল মাখানো হয়ে গিয়েছিল। তাই এ থামলেন। তাকালেন পাশে দাঁড়ানো কিউ-র দিকে।

ওঁদের মধ্যে নীরবে কী কথা হল। কিউ তরলের কৌটো এবং ঢাকনা এ-র হাতে তুলে দিলেন। তারপর নিজের পকেট থেকে একজোড়া নীলচে গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিলেন। এ-র কাছ থেকে তরল ঢেলে নিলেন হাতে। এবং মেঝেতে উবু হয়ে বসে জিশানের পায়ের পিছনদিকটায় মাখাতে লাগলেন।

তেল মাখানোর সুবিধের জন্য জিশানের পা ধরে থাকা দুজন গার্ড তাদের হাতের বাঁধন সরিয়ে নিল।

জিশানের অস্বস্তি হচ্ছিল। একজন নামি বিজ্ঞানী, সিন্ডিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট, ওর পায়ে এভাবে 'তেল' মাখাচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল গণপত আচারিয়া দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট নয়, 'দু-নম্বরি' সায়েন্টিস্ট। সেইজন্যই শ্রীধর পাট্টার পায়ে উনি তেল মাখান—দিন-রাত। জিশানের পা শ্রীধরের চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়! সুতরাং জিশান কেন অস্বস্তি পাবে?

কিন্তু মনে-মনে যতই যুক্তি খাড়া করুক না কেন, জিশান কিছুতেই পুরোপুরি সহজ হতে পারছিল না।

তরল মাখানোর কাজ শেষ হলে কিউ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এ আর কিউ জিশানের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেলেন। তারপর ওঁরা তাকালেন শ্রীধর পাট্টার দিকে। যে-দৃষ্টির অর্থ, আমাদের কাজ শেষ।

'থ্যাংক যু—' বললেন শ্রীধর এবং আঙুলে তুড়ি মেরে গার্ডদের ইশারা করলেন।

চারজন গার্ডের একজন জিশানের খুব কাছে এসে ছোট্ট করে বলল, 'ওই টেবিলটায় গিয়ে শুয়ে পড়ো...' তারপরই ফিসফিস করে বলল, 'প্লিজ...।'

জিশান চমকে চোখ ফেরাল গার্ডের চোখে। ও কি ভুল শুনছে? লোকটা বলছে, 'প্লিজ...!'

গার্ডের চোখে একচিলতে 'বন্ধু'র ছোঁয়া। তার সঙ্গে সামান্য শ্রদ্ধাও কি টের পাওয়া যাচ্ছে না?

জিশান একইরকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর চটপট পা ফেলে বাধ্য ছেলের মতো বিশাল টেবিলটার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তখনই ও লক্ষ করল, এ এবং কিউ ঘন-ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

চারজন গার্ড টেবিলের চারদিক থেকে এগিয়ে এল। কী এক কায়দায় চারটে স্টিল ব্যান্ড জিশানের হাতে-পায়ে এঁটে দিল। জিশান লক্ষ করল, ওই চারজন গার্ডও কখন যেন এ এবং কিউ-র মতো হাতে লেটেক্স-এর দস্তানা পরে নিয়েছে।

জিশান বন্দি অবস্থায় ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো চিত হয়ে পড়ে রইল টেবিলে। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। সিলিং-এর ধপধপে সাদা কারুকাজ দেখতে লাগল। উজ্জ্বল আলোর আধুনিক জরিপ করতে লাগল।

এইসব শৌখিন ঘর আর তার আধুনিক সরঞ্জাম ওল্ড সিটির অভাবী মানুষগুলোর কল্পনার বাইরে। বস্তির ওই ঘরে মিনি ছোট্ট শানুকে নিয়ে কী কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! মিনিকে ও গত সপ্তাহেই ওর প্রাইজ মানি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। সিন্ডিকেট টাকা পাঠানোর সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু...

সঙ্গে-সঙ্গে মনোহর সিং-এর কথা মনে পড়ল। হাসিখুশি সরল লোকটা এই দুনিয়ায় একা ছিল। না কোই আগে, না কোই পিছে/উপর আসমা, ধরতী নীচে। এখানে এসে জিশান, খোকন ওদের সঙ্গে লোকটার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আর হয়ে গেল বলেই জিশানরা এখন মনে-মনে এত কষ্ট পাচ্ছে। ওই গর্তের ভেতরে শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় মনোহরেরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।

জিশান নানান চিন্তায় বিভোর ছিল। হঠাৎই খেয়াল করল, এ আর কিউ দস্তানা পরা হাতে ওর বুকে তেল মাখাচ্ছেন।

কিন্তু কেন?

এই তেলের কী এমন গুণ? এই তেল কী এমন শাস্তি দিতে পারে? শ্রীধর বলছেন, এই শাস্তিতে কোনও ব্যথা লাগবে না, জিশানের কেটে-ছড়ে যাবে না, 'য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেলথ—অ্যান্ড ইন ওয়ান পিস।' তা হলে শাস্তিটা হবে কেমন করে?

জিশান অবাক হয়ে এইসব ভাবছিল আর দুই বিজ্ঞানী জিশানের বুকে, হাতে, পায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন।

শ্রীধর কৌতুকের চোখে ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করছিলেন। দুটো হাত বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রেখে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিশানের অবাক ভাবটা বেশ আন্তরিকভাবে উপভোগ করছিলেন।

তেল মাখানো শেষ হয়ে গেল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। তেলের কৌটোটা দস্তানা পরা একজন গার্ডের হাতে ধরা ছিল। সেটা চেয়ে নিলেন আচারিয়া। তারপর তিনি আর চক্রপাণি জিশানের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। আচারিয়া শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের কাজ শেষ, স্যার...।'

'গুড। গুড—' বিজ্ঞানী দুজনের দিকে দু-পা এগিয়ে এলেন শ্রীধর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আচারিয়ার দিকে নজর ফেরালেন। চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'সিনেমা শুরু হতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

তেলের কৌটো পকেটে রেখে আচারিয়া টাকে আলতো করে হাত বোলালেন। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, 'বড়জোর দশ মিনিট...।'

'আর য়ু শিয়োর?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন।

'অফ কোর্স উই আর...।' উত্তরটা দিলেন মনসুখ চক্রপাণি।

শ্রীধর ছোট্ট করে 'হুঁ' শব্দ করলেন। তারপর এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন গভীর কোনও চিন্তায় ডুবে আছেন।

কিউ এবং এ ওঁদের চেয়ারের কাছে ফিরে গেলেন, বসে পড়লেন।

চক্রপাণি চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেললেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ ঘষে-ঘষে মুছতে লাগলেন। এবং পরপর তিনবার হাই তুললেন।

আচারিয়া চক্রপাণির হাই তোলা দেখছিলেন এবং নিজের হাই ওঠার ঝোঁকটা প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করছিলেন।

হাই তুলতে-তুলতে মিহি জড়ানো গলায় এ কিউ-কে বললেন, 'সাবজেক্টের রিঅ্যাকশানগুলো নোট করে নিন। সলিউশানটার ইমপ্রুভমেন্টে কাজে লাগবে।'

'য়ু আর রাইট।' বলে কিউ জামার বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর পেন বের করে তৈরি হয়ে বসলেন।

সময় খুব ধীরে-ধীরে কাটছিল। ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের ধকধক শব্দটা জিশানের কানে ঘড়ির কাঁটার শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। গণপত আচারিয়ার 'দশ মিনিট' কথাটা জিশান শুনতে পেয়েছিল। তাই ও ধৈর্য ধরে সময়ের এক-একটা স্তর ডিঙোতে লাগল।

সাড়ে ন' মিনিটের মতো সময় পেরোতেই শ্রীধর পাট্টা জিশানের টেবিলের কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন। চিত হয়ে থাকা অসহায় জিশানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হেসে বললেন, 'সিনেমাটা আমি ভালো করে পুরোটা দেখতে চাই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস ইভন আ সিঙ্গল মোমেন্ট অফ দ্য শো—।'

জিশান কোনও উত্তর দিল না। শুধু স্থির চোখে শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ জ্বালা করছিল। ক্লান্তিতে হাই উঠতে চাইছিল।

কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা হঠাৎ করেই শুরু হল।

জিশানের মনে হল, অণু-পরমাণু মাপের সূক্ষ্ম পিঁপড়ে—অসংখ্য পিঁপড়ে —ওকে সূক্ষ্ম কামড়ের হুল ফোটাতে শুরু করেছে। বলতে গেলে হালকা চুলকুনির মতো হয়ে ব্যাপারটা শুরু হল।

প্রথম-প্রথম জিশানের আরাম লাগছিল, কিন্তু দশ-পনেরো সেকেন্ড পার হতেই চিড়বিড়ে চুলকুনি জিশানকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু তা সত্বেও ও দাঁতে দাঁত চেপে ওই অদ্ভুত চুলকুনি সহ্য করতে লাগল।

ব্যাপারটা ক্রমেই তীব্রতায় বাড়তে লাগল। মিষ্টি এবং তীব্র চুলকুনি। তাতে কোনও জ্বালা নেই, কোনও যন্ত্রণা নেই। কিন্তু জায়গাটা চুলকোতে না পারার কষ্ট জিশানকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। ওর হাত-পা শক্ত বাঁধনে বাঁধা জেনেও ও হাত-পায়ের বাঁধন ছাড়াতে চাইল। তাতে যা হওয়ার তাই হল। স্টিল ব্যান্ডের সঙ্গে ঘষটানিতে ওর কবজি এবং গোড়ালির গাঁট ছড়ে যেতে লাগল।

শ্রীধর পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জিশানের দশাবিপর্যয় লক্ষ করছিলেন আর মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

জিশানের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে শূন্যে উঠছিল আর শব্দ করে মসৃণ টেবিলে আছড়ে পড়ছিল। একইসঙ্গে ও মাথা ঝাঁকাচ্ছিল এপাশ-ওপাশ। আর ওর হাতের আঙুলগুলো বারবার বাতাস আঁকড়ে ধরছিল। মনে হচ্ছিল, ও বাতাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আপ্রাণ বাঁচতে চেষ্টা করছে।

জিশান পাগলের মতো ছটফট করছিল বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আর্ত শব্দ করতে চাইছিল না। কারণ, শ্রীধর পাট্টার সামনে এই প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায় অসহায়ভাবে চিৎকার করাটা প্রায় প্রাণভিক্ষার কাতর অনুনয়ের মতো শোনাতে পারে। সেটা জিশান কিছুতেই করতে চায় না। তাই ও প্রাণপণে আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু তা সত্বেও চাপা গোঙানির মতো একটা শব্দ জিশানের গলার ভেতর থেকে উথলে উঠছিল।

বিছুটিপাতা গায়ে ঘষলে কীরকম চুলকোয় জিশান জানে না। কিন্তু ও নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, এই ঝিকিমিকি তরলের ক্ষমতা বিছুটিপাতার চেয়েও অনেক বেশি। কারণ জিশানের সর্ব অঙ্গে চুলকুনির এমনই ফুলঝুরি ছুটছিল যে, ওর মস্তিষ্ক ঠিক-ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না।

তবুও জিশান মিনি আর শানুর কথা ভাবতে লাগল।

শ্রীধর পাট্টা ওকে জিগ্যেস করলেন, 'বাবু জিশান, কাল রাতে তুমি জিপিসির বাইরে বেরিয়েছিলে?'

যে-চিৎকার জিশান এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেপে রেখেছিল সেটাই শ্রীধরের প্রশ্নের উত্তর হয়ে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল : 'না! না! না! না! না!'

শ্রীধর চওড়া হাসলেন : 'তুমি তা হলে কাল রাতে তোমার কোয়ার্টার ছেড়ে বেরোওনি?'

আবার ছিটকে বেরোল সেই লাভাস্রোত : 'না-না-না-না-না!'

জিশান পান্ডার কথা ভাবছিল। ওর সেই অভিব্যক্তিহীন ঠান্ডা দৃষ্টি। যে-দৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞা ঝিলিক মারছিল। অথচ ওর শরীর তখন অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত।

জিশান হিমশীতল চোখে শ্রীধরের দিকে তাকাল। মনে-মনে ভাবল, ও যেন বেরিয়ে এসেছে নিজের দেহের বাইরে। শূন্যে ভেসে বেড়াতে-বেড়াতে ও তাকিয়ে দেখছে নিজের ছটফটানো শরীরের দিকে। দেখছে শ্রীধরের অহঙ্কার। ওঁর ক্ষমতা আর প্রভুত্ব মেশানো বেপরোয়া অভিব্যক্তি।

নিজের অনুভূতির সুইচ অফ করে দিল জিশান। অন্তত অফ করে দিতে চেষ্টা করল। মনে-মনে ভাবল, আর কতক্ষণ এই অমানুষিক অবস্থা চলবে কে জানে!

দূরের টেবিলে বসে গণপত আচারিয়া জিশানের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন আর নোট নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে চক্রপাণির সঙ্গে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন।

চক্রপাণি হঠাৎই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অ্যামেজিং এনডিয়োর‍্যান্স! আর কেউ এতটা সহ্য করতে পারত না...।'

আচারিয়া বললেন, 'তা হলে কি আমাদের কেমিক্যালটা ততটা স্ট্রং হয়নি? কিন্তু আমরা নরম্যাল কোনও মানুষকে যে-অ্যামাউন্টের কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করে রেজাল্ট পাই জিশানকে তার অ্যাপ্রক্সিমেটলি থ্রি টাইমস অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তাতেও তো দেখছি...।'

'এখন এসব ডিসকাশন থাক—' আচারিয়াকে থামিয়ে দিলেন চক্রপাণি। চাপা গলায় বললেন, 'মার্শাল এসব কথা শুনলে প্রবলেম হতে পারে। বরং আমরা এই কনক্লুশানই জানাব যে, জিশান পালচৌধুরী নরম্যাল মানুষ নয়—ওর এনডিয়োর‍্যান্স ফ্যাক্টর অ্যাবনরম্যালি হাই। জিশান ইজ অ্যান একসেপশান...।'

চক্রপাণির কথায় সায় দিয়ে আচারিয়া চুপ করে গেলেন। তারপর কবজির ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছোট্ট করে বললেন, 'টাইম ইজ আপ—।'

এ-কথা বলার দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্যেই জিশানের চুলকুনি কমতে লাগল। ও চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল। ওর বুক ওঠা-নামা করতে লাগল। হাপরের শব্দ বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে।

শ্রীধর পাট্টার মুখের সূর্যোদয়ের মুচকি হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে সূর্যাস্ত নেমে আসছিল। হিমশীতল ইস্পাতের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ছিল মুখের ওপরে।

হারতে শ্রীধরের ভালো লাগে না। কিন্তু নিতান্তই যদি হারতে হয় তা হলে পরমুহূর্ত থেকেই পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতেও জানেন তিনি।

সুতরাং শ্রীধর চোয়াল শক্ত করলেন। দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের দিকে ইশারা করলেন। বললেন জিশানের বাঁধন খুলে দিতে। তারপর ধীরে-ধীরে পা ফেলে আচারিয়া আর চক্রপাণির টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন।

স্টিল ব্যান্ডের বাঁধন খুলে যেতেই জিশান টেবিলে উঠে বসল। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর শরীরে সামান্য জ্বালা-জ্বালা ভাব চিড়বিড় করছিল। ও কবজির ছড়ে যাওয়া জায়গার জ্বালা কমাতে কবজি দুটো কয়েকবার চেপে-চেপে ধরল, হাত বোলাল পায়ের গোড়ালির গাঁটের কাছটায়। হাত বুলিয়ে আর হাত চেপে শুশ্রূষা করতে চাইল। তারপর পাছায় ভর দিয়ে শরীরটাকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। লক্ষ করল, ওর ফরসা শরীর বেশ লালচে হয়ে গেছে।

জিশান শ্রীধরকে দেখছিল। লোকটা বোধহয় স্যাডিস্ট প্রকৃতির। কিন্তু আজ জিশান ওঁকে জেতার তৃপ্তি দেয়নি। লোকটার দিকে তাকিয়ে জিশানের ঘেন্নায় থুতু ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও তা করল না। বরং ঠোঁটের কোণে একচিলতে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে শ্রীধরকে দেখতে লাগল। যেন বলতে চাইল, 'তুমি কতদূর যেতে চাও? আমি তার চেয়েও বেশি দূর যাওয়ার ক্ষমতা রাখি।'

শ্রীধরের চোখে চোখ রেখে মেঝেতে পড়ে থাকা প্যান্ট আর টি-শার্টের কাছে গেল জিশান। শ্রীধরের দিকে তাকিয়েই ধীরে-ধীরে পোশাক পরে নিল। তারপর শ্রীধরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁটে সেই হাসির ছোঁয়া।

শ্রীধরের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো জিশানের হাসি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, জিশানকে চড়-থাপ্পড় মেরে হেনস্থা করে প্রতিশোধ নিত। কিন্তু শ্রীধর আশ্চর্য ধাতুতে গড়া।

জিশানের কাছে এগিয়ে এসে ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর নাইস কোঅপারেশান। য়ু মে লিভ নাউ—।'

জিশান ঠোঁটের হাসিটা আরও একটু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'য়ু আর ওয়েলকাম...।'

শ্রীধর দুজন গার্ডকে ইশারা করলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানের দুপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা জিশানকে এসকর্ট করে জিপিসি-র কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে।

এতক্ষণ পর ঘুমের টান আর ক্লান্তিতে জিশান একটা হাই তুলল।

•

সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলিং কাজটা বড় সহজ নয়। কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে ট্রাই-ডাইম হলোগ্রাম ইমেজগুলো দেখতে-দেখতে এই কথাটাই বারবার রঙ্গপ্রকাশের মনে হচ্ছিল।

নিউ সিটিতে জিশান পাল চৌধুরী আসার পর থেকে ওর যত ভিডিয়ো ফটো আর হলোগ্রাম ইমেজ তোলা হয়েছে তার সবটাই একটা ট্রাই-ডাইম মাইক্রোসিডি-তে রাইট করে সুপারগেমস কর্পোরেশন রঙ্গপ্রকাশকে দিয়েছে। রঙ্গপ্রকাশের কাজ হল সেই ভিডিয়ো খুঁটিয়ে দেখে জিশান পাল চৌধুরীর একটা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করা।

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস নিউ সিটির বিখ্যাত সাইকোঅ্যানালিস্ট। নিউ সিটির 'সাইকোঅ্যানালিসিস সেন্টার'-এর চিফ সাইকোলজিস্ট। নিউ সিটির সিস্টেমের বিরুদ্ধে যারা সরাসরি কিংবা আড়ালে আওয়াজ তোলে তাদের সাইকোপ্রোব করাটা রঙ্গপ্রকাশের প্রধান কাজের তালিকার মধ্যে পড়ে। সিন্ডিকেটের 'ক্রাইম কন্ট্রোল' ডিভিশন প্রায়ই রঙ্গপ্রকাশের সাহায্য চায়। এবং রঙ্গপ্রকাশ সাহায্য করেও থাকেন।

গত দু-সপ্তাহ ধরে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলিং-এর কাজে ব্যস্ত তিনি। কম্পিউটারের পরদায় ওর ছবি বারবার দেখছেন। দেখছেন টু-ডাইমেনশন্যাল এবং হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ। ভিডিয়ো ক্লিপগুলো কখনও 'নরম্যাল' স্পিডে দেখছেন, কখন আবার 'স্লো' কিংবা 'ভেরি স্লো' মোডে দেখছেন। ইচ্ছেমতো কোনও ফ্রেমকে 'ক্লোজ-আপ' মোডে দেখছেন কিংবা বেশ কয়েক গুণ ম্যাগনিফাই করে জিশানের চোখের কোণের ভাঁজ অথবা রোমকূপ পর্যন্ত পরখ করে নিচ্ছেন। আর সেই ভিডিয়োর মিছিল থেকে দরকার মতো ছবি ক্লিপ করে নতুন-নতুন ফাইলে স্টোর করে নিচ্ছেন।

তারপর সেই ফাইলের ছবি ও কথা আবার স্টাডি করছেন এবং কখনও-কখনও প্রিন্ট-আউট বের করছেন।

এইসব তথ্যের সঙ্গে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের রিপোর্ট তৈরি করছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। রিপোর্ট শেষ হলেই সেটা 'কনফিডেনশিয়াল' খামে ভরে তুলে দিতে হবে শ্রীধর পাট্টার হাতে। ওটা কিল গেমের প্রোমোশনাল ভিডিয়ো ট্রেলার-এ ব্যবহার করা হবে। কিংবা হয়তো আরও কোনও কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে—সেটা একমাত্র শ্রীধর পাট্টাই ভালো করে জানেন।

ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল রঙ্গপ্রকাশের। অথচ দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না। দুশ্চিন্তার পেন্ডুলামটা মাথার ভেতরে দুলছিল। আর শব্দ হচ্ছিল, 'ঢং-ঢং।' সেই শব্দ রঙ্গপ্রকাশ ছাড়া আর কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

দুশ্চিন্তার কারণটা এখনও স্ত্রীকে খুলে বলেননি। আর ছেলে সিমানকে বলার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না! যেহেতু আজ, এই মুহূর্তে, যে-সংকটের মুখোমুখি রঙ্গপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার উৎসে রয়েছে সিমান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। দু-চোখ বুজে মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিলেন। একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন : 'আ-আ-আ : !'

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস নিউ সিটির কদরদান বিজ্ঞানী। ডক্টর মনসুখ চক্রপাণি আর ডক্টর গণপত আচারিয়া তাঁদের আবিষ্কার এবং গবেষণার জন্য শ্রীধর পাট্টার খুব প্রিয় ঠিকই, কিন্তু ডক্টর বিশ্বাসও শ্রীধরের কাছে কম প্রয়োজনীয় নয়। তার কারণ, রঙ্গপ্রকাশের কাজের ধরনটা একটু অন্যরকম।

চক্রপাণি এবং আচারিয়া যেসব গবেষণা করেন বা আবিষ্কার করেন তার দরকার বাইরের পার্থিব জগতের জন্য। সেগুলো চোখে দেখা যায়। তার ফল পাওয়া যায় হাতেনাতে—অন্তত এখন না হলেও ভবিষ্যতে। তাই ব্যাপারটা প্রচারের আলোয় চলে আসে চটপট।

রঙ্গপ্রকাশের কাজ অন্ত:সলিলা। মানুষের মন নিয়ে ওঁর কাজ। বেশিরভাগ সময়েই ওঁকে কোনও মানুষের ফটোগ্রাফ দেখে কিংবা ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে তার মানসিক গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিতে হয়। সেইসব মতামত থেকে শ্রীধর পাট্টা, সিন্ডিকেট, কিংবা সুপারগেমস কর্পোরেশন অতীতে বহুবার লাভবান হয়েছে। কিন্তু তাতে বাইরে কোনও হইচই হয়নি। শুধু শ্রীধর পাট্টা বা সিন্ডিকেট রঙ্গপ্রকাশকে বাহবা দিয়েছে। তার সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও জুটে গেছে কপালে। কিন্তু প্রচারের আলোর বৃত্তে ঢুকতে পারেননি। কারণ, ওঁর কাজের ধরনটাই গোপন—একান্ত গোপন।

এসব ছাড়া রঙ্গপ্রকাশ নিয়মিতভাবে আরও একটা দায়িত্ব পালন করেন: তিনি শ্রীধর পাট্টার পার্সোনাল থেরাপিস্ট। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তিনি কোনও পেশেন্টের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করে সাইকিয়াট্রিস্টের প্রথাগত ভূমিকা নেন। এবং এই কাজটা করেন অত্যন্ত গোপনে। ডাক্তার এবং পেশেন্ট ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এই নিয়মিত থেরাপির কথা জানে না। আর-কেউ যে জানবে না, সেটাই শ্রীধরের নির্দেশ—সুতরাং সেটাই 'আলটিমেট কোড অফ কনডাক্ট'।

রঙ্গপ্রকাশের এই বিশেষ দায়িত্বটা বলতে গেলে একধরনের গোপন সম্মান। শ্রীধরের মনের অলিগলির খোঁজখবর শ্রীধরের চেয়ে অনেক বেশি জানেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধর পাট্টাকে তিনি ভেতর-বাইরে দেখতে পান। আর দেখতে পান বলেই ওঁকে ভয় পান। অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভয় পান।

কিন্তু এখন সিমানের তৈরি করা দুশ্চিন্তা ওঁকে শ্রীধরের ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বলতে গেলে সিমানই ঠিক করে দেবে ওঁদের আগামীদিনের জীবন কীরকম হবে।

অদ্ভুত এক বেদনায় রঙ্গপ্রকাশের চোখে জল এসে গেল। চোখ বুজে থাকা অবস্থাতেই কষ্টটা অনুভব করতে লাগলেন। মনের জোরে সেটাকে কমাতে চাইলেন। একটু পরে ভিজে চোখ খুলে সামনের খোলা জানলার দিকে তাকালেন।

জানলায় ফোটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। কিন্তু জানলার দিকে তাকিয়ে সেটার অস্তিত্ব বোঝার কোনও উপায় নেই। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই প্রকৃতিকে ছোঁয়া যাবে। অথচ বাইরের সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা জীবাণু জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না। অর্থাৎ, রঙ্গপ্রকাশ ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত।

কিন্তু সত্যিই কি সুরক্ষিত?

খোলা জানলায় অতিস্বচ্ছ ন্যানোপলিমার প্লেট অদৃশ্য মায়া তৈরি করেছে। সেই মায়ার ঘেরাটোপে বসে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবছেন রঙ্গপ্রকাশ।

বাড়িতে এখন কেউ নেই। স্ত্রী পর্ণমালা মিটিং-এ গেছে। নিউ সিটির ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ও সেক্রেটারি। আজ নতুন একটা ইমপোর্ট পলিসি নিয়ে সাংঘাতিক জরুরি একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ হতে সময় লাগবে।

ছেলে সিমানও বাড়িতে নেই এখন। রোজ বিকেলে যেমন বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেরোয় তেমনই বেরিয়েছে। রাত বারোটার আগে ও ফিরবে না। আঠেরো বছর বয়েসেই সিমান জীবনের 'আসল' মানে জেনে গেছে : জীবন মানে ফুর্তি আর বাজি। অর্থাৎ, ই-ল্যান্ডে গিয়ে ফুর্তি করো, আর বিভিন্ন গেমে বেপরোয়া বাজি ধরো।

ওরা কেউ বাড়িতে নেই। তাই রঙ্গপ্রকাশ প্রাণ খুলে কাঁদতে পারছিলেন।

নিউ সিটির বৈভবের জীবনটা ধীরে-ধীরে এরকম ফাঁপা হয়ে যাক তিনি কখনও চাননি। অথচ...।

রঙ্গপ্রকাশের কম্পিউটার-রুমটা মাপে বিশাল।

তিরিশ বাই কুড়ি মাপের ঘরটা আধুনিক পেশাদার অফিসের মতো করে সাজানো। ঘরে পাশাপাশি তিনটে টেবিলে তিনটে প্লাজমা কম্পিউটার। তিনটে মেশিনই রঙ্গপ্রকাশ একা ব্যবহার করেন। এ ছাড়া রয়েছে একটা বড় অফিস-টেবল। তাতে নানান কাগজপত্র, ট্রাই-ডাইম মাইক্রোসিডি, পেন, বই, মোবাইল ফোন এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এই ছন্নছাড়া টেবিলটা দেখে বোঝা যায় যে, রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস বিজ্ঞানী। যদিও পর্ণমালা এবং সিমানের ধারণা, সাইকিয়াট্রিস্টকে ঠিক বিজ্ঞানী বলা যায় না।

ওদের কথা শুনে রঙ্গপ্রকাশ মনে-মনে হাসেন। ওঁর মনে পড়ে যায় কয়েকশো বছর আগের একজন বিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা। যাঁর হাতে মনোবিজ্ঞান সঠিক চেহারা পেয়েছিল, একটা দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ফ্রয়েড বলেছিলেন, 'অনেকেরই ধারণা সাইকোলজি বিষয়টা তাঁরা বেশ ভালোই বোঝেন—কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই একটা করে মনের মালিক।'

রঙ্গপ্রকাশ জানেন, মনের ওপর মালিকানা থাকলেই তাকে বোঝা যায় এমনটা কখনওই নয়। তাই যদি হত তা হলে শ্রীধর পাট্টা মোটেই রঙ্গপ্রকাশের কাছে নিয়মিত 'সিটিং' দিতেন না।

চোখের জল মুছে রঙ্গপ্রকাশ ঘরটাকে জরিপ করতে শুরু করলেন। ভাবতে চাইলেন, তিনি যেন এক অচেনা আগন্তুক—হঠাৎ করে এই ঘরটায় এসে পড়েছেন এবং অপরিচিতের চোখে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

ঘরের সব ফার্নিচারই সেমি-ট্রান্সপারেন্ট—গ্লাস পার্টিকল ইমপ্রেগনেটেড পলিমারের তৈরি। ফলে বাইরে থেকে আসা বিকেলের আলো আর ঘরের সাদা আলো মিলেমিশে ঢুকে পড়ছে ফার্নিচারের অন্দরমহলের আনাচেকানাচে। ছোট-বড় নানান মাপের আলোর টুকরো দিয়ে এক রহস্যময় নকশা তৈরি করেছে।

ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করানো চারটে সুদৃশ্য বুককেস। তাতে সাইকোলজির প্রচুর বই আর মাইক্রোসিডির বাক্স ঠাসা। ডানদিকের দেওয়ালে ফোটো-অ্যাকটিভেটেড একটা জায়ান্ট সাইজের প্লেট টিভি। টিভির মুখোমুখি আর-এক দেওয়াল ঘেঁষে একটা সুন্দর ছাঁদের লম্বা সোফা। তার গদি-বালিশ সবই স্বচ্ছ পলিমারের আবরণে বন্দি রঙিন বাতাস দিয়ে তৈরি। ওই আবরণের ভেতরে বিভিন্ন রঙের স্রোত অত্যন্ত ধীরে খুশিমতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রঙ্গপ্রকাশ জানেন, ইমপোর্টেড এই জিনিসগুলোতে ডায়ানামিক ডেনসিটি গ্র্যাডিয়েন্ট আর স্ট্যাটিক চার্জ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘরের ভেতরে একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিজ্ঞানীর মুড ঠিক করার জন্য এই রুম ফ্রেশনারের ব্যবস্থা। এ ছাড়া খুব নীচু গ্রামে হালকা মিউজিক বাজছিল। ভালো করে খেয়াল করলে তবেই সেই মিউজিকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীর ক্রিয়েটিভিটিকে উসকে দেওয়ার এই ব্যবস্থা রঙ্গপ্রকাশের খুব পজিটিভ বলে মনে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে সবই কেমন নেগেটিভ লাগছিল।

জানলার বাইরে তাকিয়ে, রঙ্গপ্রকাশ দেখছিলেন লতানে গাছ। গাছে ছোট-ছোট বর্ণালি ফুল। দূরে, রাস্তার ওপারে, সুন্দর ছোট-বড় বাড়ি। সব বাড়িরই চেহারায় আকর্ষণীয় জ্যামিতি। শুধু চোখে দেখেই বোঝা যায়, নিউ সিটির আর্কিটেকচার কত আধুনিক।

আধুনিক এই শহর ছেড়ে যেতে চান না তিনি। কিন্তু হয়তো যেতে হবে। কারণ, আজ সকালেই ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভিতে সিন্ডিকেটের ওয়ার্নিং পেয়েছেন।

এই ওয়ার্নিং-এর পিছনে কে আছে তিনি জানেন—শ্রীধর পাট্টা। কিন্তু শ্রীধরকে ঠিক দায়ী করা যায় না। কারণ, নিউ সিটির বরাবরের নিয়ম এটাই। ই-আই—মানে, ইকনমিক ইনডেক্সই এখানে প্রথম—এবং শেষ কথা।

ওয়ার্নিং-টা যে আসতে চলেছে মাসখানেক আগে থেকেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এবং আজ সকালে সেটা এসে গেছে।

ওয়ার্নিং-টার কথা পর্ণমালাকে এখনও বলেননি। সিমানকেও নয়।

এই ওয়ার্নিং পাওয়ার পর সিন্ডিকেট মাত্র তিনমাস সময় দেয়। সেই তিনমাসে ই-আই-টাকে 'ক্রিটিক্যাল ভ্যালু'র ওপরে নিয়ে আসতে হয়। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তা হলে 'বাই-বাই নিউ সিটি'।

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এত বছর ধরে নিউ সিটির মনোরম বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে তারপর হঠাৎ করে এক্সপালশান! ত্যাজ্যপুত্রের মতো রঙ্গপ্রকাশরা হয়ে যাবেন 'ত্যাজ্য-নাগরিক'। ওঁদের গিয়ে থাকতে হবে ওই জঘন্য ক্লেদাক্ত হিংস্র ওল্ড সিটিতে!

টিভিতে ওল্ড সিটির চেহারা দেখে আর নানান খবর দেখে শিউরে ওঠেন রঙ্গপ্রকাশ। আইন-শৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই—

সর্বত্র 'ফ্রি ফর অল'। সেখানে রঙ্গপ্রকাশরা বাঁচবেন কেমন করে!

হিংস্রতা অবশ্য নিউ সিটিতেও আছে—'শৃঙ্খলাবদ্ধ' হিংস্রতা। অভিনব সব মরণখেলা। সেগুলোকে ব্যবহার করে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার ব্যাবসা। এইসব 'খেলা'-র লাইভ টেলিকাস্ট রাইট গোটা পৃথিবী জুড়ে বিক্রি করে সিন্ডিকেট। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেটিং আর বিজ্ঞাপনের রমরমা বাজার।

না, এই 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' হিংস্রতাও রঙ্গপ্রকাশ পছন্দ করেন না। একটুও না। শুধুমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার সবরকম আধুনিক সুযোগ এখানে আছে বলে তিনি এখনও নিউ সিটি ছেড়ে যাননি।

তা ছাড়া যাবেনই বা কোথায়? ওই ওল্ড সিটিতে? যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ আক্রান্ত?

'আর এখানে যে মনুষ্যত্ব আক্রান্ত!' রঙ্গপ্রকাশের বুকের নিউক্লিয়াস থেকে চিৎকার করে কে যেন বলে উঠল। বুকের ভেতরের ওই অজানা-অচেনা লোকটা প্রায়ই এরকম পাগলের মতো চিৎকার করে। সে-চিৎকার রঙ্গপ্রকাশ শুধু একা শুনতে পান। পর্ণমালা বা সিমান শুনতে পায় না।

কিন্তু এখন? এখন তো ওয়ার্নিং এসে গেছে। তিনটে মাস রঙ্গপ্রকাশকে প্রাণপণে লড়তে হবে। ই-আই-কে আপগ্রেড করতে হবে—'ক্রিটিক্যাল ভ্যালু'র ওপরে যেতে হবে।

না, এখন পর্ণমালাকে ব্যাপারটা জানাবেন না। জানালে হয়তো পর্ণমালা পাগল হয়ে যাবে। সিমানের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তার চেয়ে বরং আরও সাত-দশদিন যাক—তারপর...।

হঠাৎই মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কম্পিউটারের টাচ-স্ক্রিনে আঙুল ছুঁইয়ে মেশিন শাট-ডাউন করে দিলেন।

হালকা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়াচাড়া দিলেন রঙ্গপ্রকাশ। কপালে হাত বোলালেন কয়েকবার। আবার মাথা ঝাঁকালেন এপাশ-ওপাশ।

যন্ত্রণা। যন্ত্রণা। জ্বালা। জ্বালা।

ঘরের মধ্যে এলোমেলো হাঁটতে লাগলেন।

আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

হিরের মতো ঝকঝকে আয়নায় এ কাকে দেখছেন! ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস? নিউ সিটিতে যিনি অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির 'দেবতা'!

ছোট-ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল। ভাঙা গাল। কপালে বলিরেখা। চশমার পলিমার লেন্সের পিছনে নিষ্প্রভ দুটি চোখ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

সব মিলিয়ে হতাশায় উদভ্রান্ত একজন মানুষ।

অথচ গতকালই ওঁর গাল দুটো এতটা ভাঙা মনে হয়নি। কপালে বলিরেখার সংখ্যা আরও কম ছিল। চোখের মণি ছিল উজ্জ্বল। সেখান থেকে আত্মবিশ্বাসের জ্যোতি বেরোচ্ছিল।

কী করবেন এখন? কী করা উচিত?

প্রশ্ন দুটোর উত্তর ভেবে ওঠার আগেই টেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল বুকের ভেতরে।

শ্রীধর পাট্টা। একমাত্র শ্রীধর ফোন করলেই রঙ্গপ্রকাশের ফোন এই বিশেষ সুরে বেজে ওঠে। এই মিউজিকটা তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য প্রজাপতির ডানা নাড়ার শব্দ দিয়ে। শব্দগুলোকে একহাজার গুণ অ্যামপ্লিফাই করে একটার সঙ্গে আর-একটা মিশিয়ে ডিজিটাল প্রসেসিং করে ফিলটার করে তৈরি হয়েছে এই কপিরাইট রিং টোন। নিউ সিটির হাতে গোনা কয়েকজন শৌখিন মানুষ এই রিং টোন ব্যবহার করে। তার মধ্যে রঙ্গপ্রকাশ একজন।

অফিস-টেবলের কাছে এগিয়ে গেলেন। মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিলেন। বুকের ভেতরে একটা গুমগুম শব্দ শুরু হয়ে গেল।

'হ্যালো—।'

'মার্শাল স্পিকিং—।'

'ইয়েস, স্যার।' গলার স্বরটা যাতে কেঁপে না যায় তার জন্য বেশ সতর্ক হয়ে কথাগুলো বললেন।

'ডক্টর বিশ্বাস, আই নিড য়ু। ইমার্জেন্সি। আপনি একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন। আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমার সিকিওরিটি কোড হল ফোর ওয়ান জিরো জিরো টু এ-সি-এক্স। আজ সিটিং-এর পর জরুরি কথা আছে। জিশান পাল চৌধুরীর প্রোফাইল নিয়ে আর আপনার ই-আই নিয়ে।' একটু থামলেন শ্রীধর। তারপর : 'আপনাকে ক'টা নাগাদ আমি এক্সপেক্ট করব, ডক্টর?'

কানে ফোন ধরে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রঙ্গপ্রকাশ। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখান থেকে শ্রীধরের বাড়ি একঘণ্টার ড্রাইভ। আর সিকিওরিটির ঝামেলা পেরোতে আরও দশমিনিট। সুতরাং...।

'আমি পৌনে সাতটার মধ্যে রিচ করে যাব, স্যার।'

'ও.কে. দেন। সামনে এলে কথা হবে।'

ফোন কেটে গেল।

শ্রীধরের দেওয়া সিকিওরিটি কোডটা শোনামাত্রই মনে গেঁথে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এখন সেটা মোবাইলে স্টোর করে নিলেন।

শ্রীধরের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে ঢোকার জন্য আজ বিকেলে পাঁচ ঘণ্টার জন্য এই সিকিওরিটি কোডটা অ্যাকটিভেট করা আছে। শ্রীধর নিজের সুবিধেমতো এই কোডটা পালটে দেন। ওঁর বাড়ির কমপ্লেক্সের মেইন গেটে ভিজিটরের জন্য সিকিওরিটি কোড প্যানেল রয়েছে। ওই প্যানেলে সংখ্যা এবং ইংরেজি হরফের বোতাম রয়েছে। সিকিওরিটি কোড জানা থাকলে তবেই সঠিক বোতাম টিপে কমপ্লেক্সের মেইন গেট পেরোনো সম্ভব। তারপর রয়েছে সিকিওরিটি চেকের আরও দুটো স্তর। প্রথম স্তরে চারজন আর্মড গার্ড অতিথিকে সার্চ করে। সার্চ করে তারা সন্তুষ্ট হলে তবেই অতিথি যেতে পারবেন দ্বিতীয় স্তরে। সেখানে কোনও মানুষ নেই। একটা অদ্ভুত চেহারার গেটের মধ্যে দিয়ে অতিথিকে হেঁটে যেতে হয়। হেঁটে যাওয়ার সময় একটা সফট এক্স রে স্ক্যানার অ্যাকটিভেটেড হয়। স্ক্যানারের আউটপুট কম্পিউটারে প্রসেস করে ডিজিটাল উত্তর বেরোয় : 'হ্যাঁ', অথবা 'না'। তার ওপর নির্ভর করে অতিথির চোখের সামনে ডিজিটাল প্যানেলে সবুজ রঙে ফুটে ওঠে : 'প্লিজ এন্টার।' অথবা, উজ্জ্বল লাল আলোয় ফুটে ওঠে : 'ফর ইয়োর সেফটি, ডু নট এন্টার।'

এই নির্দেশ পালন না করলে অতিথির বিপদ। সিকিওরিটি ইউনিট রুমে অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর তার ঠিক এক মিনিট পর হাই এনার্জি পার্টিকল রেডিয়েশান অতিথিকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

অর্থাৎ শ্রীধর পাট্টা না চাইলে ওঁর সঙ্গে কারও দেখা করার উপায় নেই।

মোবাইল ফোন পকেটে রেখে দেওয়ার পরেও বেশ কয়েক মিনিট ধরে নিজের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু একটা ভাবতে চাইছিলেন কিন্তু কিছুতেই ভাবনার

পরম্পরা সঠিকভাবে সাজাতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিলেন। একটা লম্বা শ্বাস ফেলে কম্পিউটারের কাছে এগিয়ে গেলেন। টেবিল থেকে একটা গোলাপি প্লাস্টিক ফোল্ডার তুলে নিয়ে জিশানের কয়েকটা কালার প্রিন্ট-আউট তার মধ্যে ভরে নিলেন। প্রিন্টারের পাশে এলোমেলোভাবে খসড়া রিপোর্টের কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে ছিল। সেগুলোও ফোল্ডারে ঢুকিয়ে নিলেন। শ্রীধরের সঙ্গে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে আলোচনার সময় এই ফটো আর রিপোর্টের পাতাগুলো কাজে লাগতে পারে।

ফোল্ডারটা হাতে নিয়ে কম্পিউটার-রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর মিনি অটোমেটিক এলিভেটরে চড়ে নীচে নেমে এলেন। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজাটা সফটওয়্যার লক করে দিলেন। পর্ণমালা আর সিমান দুজনেই আনলক করার কোডটা জানে। তাই বাড়িতে খুশিমতো ঢুকতে ওদের কোনও অসুবিধে হবে না।

বাইরের লনের পাশে রঙ্গপ্রকাশের জি-মোবাইল দাঁড়িয়ে ছিল। নিউ সিটিতে সিভিলিয়ানরা বেশিরভাগই এই লাল রঙের জি-মোবাইল ব্যবহার করে। এই গাড়ির যারা মালিক তাদের সিটিজেন কোড নম্বরই হল গাড়ির নম্বর। তবে তার সঙ্গে একটা ইংরেজি 'সি' হরফ যোগ করা আছে।

পকেট থেকে সিটিজেন'স আই-ডি স্মার্ট কার্ড বের করলেন। গাড়ির কাছে গিয়ে দরজার স্লটে কার্ডটা ঢুকিয়ে সোয়াইপ করলেন।

গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ড্রাইভিং সিটে বসলেন রঙ্গপ্রকাশ। সুইচ অন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ড্যাশবোর্ডের ব্যাক-লাইটেড এল-সি-ডি প্যানেলে নিউ সিটির ম্যাপ ফুটে উঠল। অ্যাকটিভেটেড হয়ে গেল 'সারফেস নেভিগেটর' সফটওয়্যার।

ম্যাপে নিজের বাড়ির লোকেশানে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর শ্রীধর পাট্টার বাড়ির জায়গায় তর্জনি রাখলেন। মানচিত্রে দুটো নীল রঙের বিন্দু দপদপ করতে লাগল—সোর্স আর ডেস্টিনেশান। তখন মুখে বললেন, 'শর্টেস্ট রুট'। অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড সিস্টেম চোখের পলকে রঙিন মানচিত্রের ওপরে একটা লাল রঙের রেখা এঁকে দুটো নীল বিন্দুকে জুড়ে দিল।

গাড়ি স্টার্ট করতেই অটোমেটিক নেভিগেটর গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নিয়ে নিল। রঙ্গপ্রকাশ অলসভাবে বসে গাড়ির জানলা দিয়ে ওঁর পছন্দের শহরটাকে দেখতে লাগলেন।

ওঁর বুকের শব্দটা এখন আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

•

গাড়ি যে নিউ সিটির রাস্তা ধরে ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটছিল সেটা রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তিনি চোখ বুজেছিলেন।

গাড়ির স্বয়ংক্রিয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রঙ্গপ্রকাশের 'কমফোর্ট কোশেন্ট' অনুযায়ী নির্ভুলভাবে কাজ করছিল। রঙ্গপ্রকাশের শরীর প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে সেই শীতল আরামটুকু ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিচ্ছিল। পিছনদিকে ছুটে চলে যাওয়া রাজপথ, মেটাল ফ্লাইওভার, হাইরাইজ স্ট্রাকচার, আধুনিক বাড়ি-ঘর—কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। আর 'জিরো গ্র্যাডিয়েন্ট' রাস্তার মসৃণ গঠন ওঁকে কোনও সূক্ষ্ম ঝাঁকুনিও টের পেতে দিচ্ছিল না। অবশ্য এর পিছনে জি-মোবাইল-এর আধুনিক প্রযুক্তিরও অবদান ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ধীরে-ধীরে শান্ত হচ্ছিলেন। বুকের বাড়তি শব্দের ঢেউ এখন প্রায় মিলিয়ে গেছে। টেনশান কমাতে শরীর আর মনকে মনে-মনে শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। চোখ মেলে জি-মোবাইল-এর জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

একটু আগের বিকেলটা এখন হামাগুড়ি দিয়ে সন্ধের ঘেরাটোপে ঢুকে পড়ছে। পশ্চিমের আকাশে লাল-হলুদ আর কমলা রঙের খেলা। সূর্য চলে যাচ্ছে—কাল সকালে ফিরে আসার জন্য।

এই সূর্য দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটি থেকেও। ভাবলেন রঙ্গপ্রকাশ। এমনকী ওই যে সিলুয়েট পাখির মিছিল কমলা রঙের পটভূমিতে 'স্লো মোশান'-এ উড়ে যাচ্ছে, সেটাও হয়তো দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটি থেকে।

রাস্তার দুপাশে সুন্দর সারিতে লাগানো রয়েছে বিশাল উচ্চতার বিদেশি পাতাবাহার গাছ। তার বড়-বড় পাতায় যেন রামধনু-রঙের ছোপ। জি-মোবাইল-এর ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, সেই রঙিন পাতাগুলো বাতাসে উড়ছে।

তৃপ্তির দৃষ্টিতে এসব দেখতে-দেখতে কোথা থেকে যেন চোখে জল এসে গেল। যে সুন্দর সে স্বর্গেও সুন্দর, নরকেও সুন্দর। এই ডুবে যাওয়া সূর্যের আলো এই মুহূর্তে ওল্ড সিটিকেও ছুঁয়ে আছে। ওই পাখির দল অনায়াসে উড়ে চলে যেতে পারে নিউ সিটির সীমানা ছাড়িয়ে। পিস ফোর্সের সমস্ত প্রতিরোধ সেখানে অকেজো। ওই যে গাছের পাতা নিয়ে খেলা করছে যে-অস্থির বাতাস, তাকেও কেউ রুখতে পারবে না। শুধু মানুষেরই সীমানা ডিঙোনোর কোনও অধিকার নেই।

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলেন রঙ্গপ্রকাশ। বদ্ধ গাড়ির ভেতরে থেকেও তীব্র শিসের শব্দ শুনতে পেলেন। চোখ তুললেন আকাশের দিকে। চারটে ইস্পাতের পাখি উড়ে যাচ্ছে। চারটে শুটার। ওদের নজরদারির কাজে ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান সিস্টেমের অতি আধুনিক সফটওয়্যার এ-কাজে ওদের সাহায্য করছে।

সারফেস নেভিগেটরের পরদার দিকে তাকালেন। জি-মোবাইল গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছে।

আর সাত সেকেন্ডের মধ্যেই ওঁর পেশেন্টের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেলেন রঙ্গপ্রকাশ। টের পেলেন বুকের ভেতরের শব্দটা আবার শুরু হয়ে গেছে।

সন্ধে নেমেছে। কমপ্লেক্সের মেইন গেটের বাইরে অসংখ্য আলোর বন্যা। সেই আলো গায়ে মেখে দুজন সিকিওরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল। রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসকে চিনতে পারলেও তাদের ভাবলেশহীন মুখের চেহারা পালটাল না। রঙ্গপ্রকাশ আগে বহুবার এখানে 'অতিথি' হয়ে এসেছেন—তাই নিয়মকানুন সব জানেন। তা সত্বেও একজন গার্ড ইশারায় ওঁকে কার পার্কিং জোনটা দেখাল। ততক্ষণে রঙ্গপ্রকাশ পার্কিং জোন লক্ষ্য করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছেন।

পার্কিং জোনটা ইস্পাতের তৈরি। সেখানে গাড়ির মাপে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র পাশাপাশি আঁকা। দূরের এরকমই একটি আয়তাকার স্লটে হালকা মেরুন রঙের একটা কিউ-মোবাইল দাঁড়িয়ে আছে। রঙ্গপ্রকাশ ওঁর গাড়িটা একটা স্লটে দাঁড় করালেন। গাড়ি থেকে নেমে সরে আসার পরই দেখলেন গাড়িটা যেখানে পার্ক করেছেন সেই আয়তাকার অংশটা ধীরে-ধীরে নীচে নামতে শুরু করল। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রায় ফুটখানেক নীচে নামার পর অংশটা স্থির হল।

এই হাইড্রলিক সিকিওরিটি সিস্টেম রঙ্গপ্রকাশের খুব চেনা। এখন ওঁর গাড়িটা ফুটখানেক গভীর গর্তের মধ্যে বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করলেই রঙ্গপ্রকাশ খুশিমতো গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে পারবেন না। যখন এখানকার সিকিওরিটি সিস্টেম ওঁকে চলে যাওয়ার ছাড়পত্র দেবে তখনই ওঁর গাড়ির চাকা আবার ধীরে-ধীরে গ্রাউন্ড লেভেলে উঠে আসবে।

যে-মানুষ যত ভয় পায় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তত বেশি। শ্রীধর পাট্টা আসলে একজন ভিতু মানুষ। প্রাণভয়ে সবসময় কাঁটা হয়ে আছেন। আর ভয় পান বলেই, নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে, অন্যকে আক্রমণ করতে ভালোবাসেন।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ শ্রীধরের কমপ্লেক্সের মেইন গেটের কাছে পৌঁছে গেলেন। সিকিওরিটি কোড প্যানেলে আঙুল ছুঁইয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। মোবাইলের বোতাম

টিপে-টিপে ওপেন করলেন নির্দিষ্ট উইন্ডো। সেখানে স্টোর করা কারেন্ট সিকিওরিটি কোডটা দেখা গেল। সেটা সিকিউরিটি কোড প্যানেলে পাঞ্চ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেটাল প্লেট পাশে সরে গিয়ে গেট খুলে গেল। দু-ফুট চওড়া একটা পথ তৈরি হল—যার ভেতর দিয়ে মাত্র একজন মানুষ যেতে পারে।

প্রথম নিরাপত্তার স্তর পেরিয়ে রঙ্গপ্রকাশ ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি জানেন, এই পথের দুপাশের দেওয়ালে লাগানো রয়েছে অপটিক্যাল ডিভাইস। ক'জন মানুষ গেট পেরিয়ে ঢুকল এই যন্ত্র তার হিসেব রাখে। যেহেতু এখন একজন ঢোকার কথা তাই রঙ্গপ্রকাশ অপটিক্যাল সেন্সরের নজরদারি পেরোতেই মেইন গেটের মেটাল প্লেট 'ক্র্যাক' শব্দ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গামতো ফিরে গিয়ে এঁটে গেল।

এরপর নিয়মমাফিক নিরাপত্তার আরও দুটো স্তর পেরোলেন। শ্রীধর পাট্টার পার্সোনাল থেরাপিস্ট বলে আলাদা কোনও খ্যাতির নেই।

একসময় রঙ্গপ্রকাশ পৌঁছে গেলেন বাড়ির সদর দরজায়।

ভারী কাঠের দরজায় রঙিন কাচ আর কাঠখোদাইয়ের কারুকাজ।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে সাতটা বাজতে মোটামুটি দেড়মিনিট বাকি। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে শ্রীধরের নম্বর ডায়াল করলেন।

একবার রিং হওয়ার পরই দরজা খুলে গেল। চোখে পড়ল একটা হলঘর। একটা লুকোনো স্পিকারে শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত আবাহন শোনা গেল : 'ওয়েলকাম, ডক্টর।'

রঙ্গপ্রকাশের সামনে কেউ নেই। কেউ ওঁকে রিসিভ করতে আসেনি।

এতে রঙ্গপ্রকাশ মোটেই অবাক হলেন না। কারণ, এই অপরূপ সুন্দর, হাইলি অটোমেটেড এবং ল্যাভিশলি ফারনিশড তিনতলা বাড়িটায় শ্রীধর পাট্টা সম্পূর্ণ একা থাকেন। নিরাপত্তার কারণেই কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

খুবই স্বাভাবিক। কারণ, শ্রীধরের মধ্যে তিনি সোশিয়োপ্যাথিক ডিসঅর্ডার ছাড়াও প্যারানয়েড পারসোনালিটির হদিস পেয়েছেন। প্যারানয়েড পারসোনালিটির মানুষ হাইপারসেনসিটিভ আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়।

রঙ্গপ্রকাশ হলঘরে ঢুকতেই ওঁর পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার শব্দের ফাঁপা প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হলঘরের মাঝখান থেকে একটা স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি অদ্ভুত ছন্দে পাক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। তারপর পাকের ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে সেটা ঘরের দেওয়ালে সেঁটে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যালকনি তৈরি করে ফেলেছে। ঘরের উজ্জ্বল সাদা আলোয় সিঁড়ি আর ব্যালকনি ঝকঝক করছে।

সেই ব্যালকনির এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাট্টা। গায়ে ফুলহাতা কালো টি-শার্ট আর পায়ে কালো প্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে, টানটান ঋজু ভঙ্গিতে একটা কালো পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি জানেন, রঙ্গপ্রকাশকে কোনওরকম নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে হলঘরের কার্পেটের ওপরে পা ফেলে এগোলেন ডক্টর। কার্পেটের ডিজাইনটা নিউ সিটির রঙিন ম্যাপ। এই কার্পেট বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি। এবং এই কার্পেট মাত্র একপিসই তৈরি করা হয়েছে।

হলঘরের দেওয়ালে আট-দশটা হলোগ্রাম পেইন্টিং। গত পাঁচশো বছরের নামি শিল্পীদের বিখ্যাত সব পেইন্টিং-এর হলোগ্রাফিক রিপ্রোডাকশন। তার মধ্যে ভ্যান গঘ, সালভাদোর দালি, রবীন্দ্রনাথ, বিকাশ ভট্টাচার্য, মকবুল ফিদা হুসেনও রয়েছেন।

ছবি-টবি সব সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু শিল্পী এবং শিল্পের খোঁজ শ্রীধর কতটা রাখেন সন্দেহ আছে।

এ-কথা ভাবতে ভাবতে স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধর একইভাবে দাঁড়িয়ে ওঁকে লক্ষ করতে লাগলেন।

রঙ্গপ্রকাশ যখন শ্রীধরের খুব কাছাকাছি চলে এলেন তখন শ্রীধর কথা বললেন, 'চলুন—কনফারেন্স রুম ওয়ানে গিয়ে বসি।' এবং সেদিক লক্ষ্য করে হাঁটা দিলেন।

শ্রীধরের বাড়িতে তিনটে কনফারেন্স রুম আছে। তাদের নম্বর ওয়ান, টু এবং থ্রি। রুম নম্বর ওয়ানটা মাপে সবচেয়ে ছোট। বড়জোর পাঁচজন মানুষ সেখানে বসে আলোচনা করতে পারে। দু-নম্বর ঘরটা পনেরোজনের জন্য। আর শেষ কনফারেন্স রুমটায় তিরিশজন বসতে পারে।

শ্রীধরের বাড়ির সমস্ত দরজা এবং জানলার কাচগুলো আসলে মামুলি কাচ নয়—ফোটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট। ওগুলো স্বচ্ছ তো বটেই, তার ওপর শ্যাটারপ্রুফ এবং বুলেটপ্রুফ। যদি কোনও স্নাইপার বহুদূরের কোনও হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে হাই পাওয়ার টেলিস্কোপিক রাইফেল কিংবা অটো-কনভার্জিং রকেট লঞ্চার থেকে শ্রীধরের বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে ফায়ার করে তবে সে ভীষণ হতাশ হবে।

আক্রমণকারীদের হতাশ করাই শ্রীধর পাট্টার একমাত্র মিশন।

কনফারেন্স রুম ওয়ানের কাচের দরজা ঠেলে ওঁরা দুজনে ঢুকে পড়লেন।

ঘরটা ঠান্ডা। সেন্ট্রাল এসি সিস্টেম নি:শব্দে কাজ করে চলেছে।

ঘরের ডানদিকে কনফারেন্স টেবিল, আর পাঁচটা মোটর অপারেটেড আরামের গদি-আঁটা চেয়ার। চেয়ারগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। আর, ডানদিকের হাতলে ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। প্যানেলের বোতাম টিপে চেয়ারগুলোকে খুশিমতো চালানো যায়।

ঘরের বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বেঁটেখাটো চেহারার ডোমেস্টিক রোবট। তার মাথাটা বেঢপ, হাত-পাগুলো দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও বেশ মোটাসোটা, মজবুত। রোবটটার বুকের কাছটায় একটা চৌকো গর্ত—সেটা কালো কাচে ঢাকা। রঙ্গপ্রকাশ জানেন, ওটা রিমোট অ্যাক্টিভেশানের রিসেপটর। তার পাশেই দুটো সবুজ আলো—একটা স্থিরভাবে জ্বলছে, অন্যটা দপদপ করছে।

ডোমেস্টিক রোবটটার পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে তিনটে অল-গ্লাস ভেন্ডিং মেশিন। তাদের প্রথমটায় কফি, দ্বিতীয়টায় বিভারেজ আর তৃতীয়টায় স্ন্যাক্স সার্ভ করার ব্যবস্থা রয়েছে। দরকার পড়লে কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথিদের এই ডোমেস্টিক রোবটই কফি, বিভারেজ এবং স্ন্যাক্স সার্ভ করে।

ঘরের সবচেয়ে দূর-প্রান্তে গাঢ় বাদামি রঙের দুটো সোফা। তাদের গালফোলা গদির রকমসকম দেখেই বোঝা যায় ওগুলো বসার পক্ষে অতিরিক্ত আরামের। বাদামি সোফা দুটির মাঝখানে একটা কালচে বাদামি রঙের কফি টেবল। তার কাঠের পালিশ অক্ষত রাখার জন্য সিরামিক ল্যাকারের কোটিং দেওয়া রয়েছে।

টেবিলের ওপরে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার খোলা। তার পরদায় শ্রীধর পাট্টার মুখের ছবি। শ্রীধরের ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভার হিসেবে এর চেয়ে ভালো ছবি আর কী হতে পারে!

শ্রীধর ডক্টরকে ইশারা করলেন। তারপর দুটো সোফায় বসে পড়লেন দুজনে।

বড় করে একটা শ্বাস ছাড়লেন শ্রীধর। রঙ্গপ্রকাশকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

'কী নেবেন বলুন, ডক্টর? হট, না কোল্ড?'

রঙ্গপ্রকাশ ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শ্রীধরের মধ্যে যে সামান্য মেগালোম্যানিয়ার লক্ষণ তিনি টের পেয়েছেন, বোধহয় সেটার কথাই ভাবছিলেন।

শ্রীধরের প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'কুকিজ। আর সফট ড্রিংক।'

শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করলেন। পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ডোমেস্টিক রোবট সচল হল। ওটার পেটের কাছ থেকে একটা মেটাল ট্রে বেরিয়ে এল বাইরে। রোবটটা ভেন্ডিং মেশিনের কাছে গিয়ে বোতাম টিপল। মেশিন থেকে সফট ড্রিংক আর কুকিজ বেরিয়ে এল। রোবটটা সেগুলো ওর ট্রেতে সাজিয়ে নিল। তারপর কোমরের কাছে দুটো লুকোনো চেম্বারের দরজা খুলে দুটো ক্রিস্টালের গ্লাস বের করল। সফট ড্রিংকের বোতলের পাশে রাখল।

এবার রোবটটা ওর পায়ের চাকা গড়িয়ে কফি-টেবলের কাছে এল। নিখুঁত দক্ষতায় টেবিলে ওগুলো নামিয়ে সফট ড্রিংক অর কুকিজ সার্ভ করল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু দপদপ করা সবুজ আলোটা জানিয়ে দিতে লাগল যে, ও এখনও অ্যাকটিভ।

'শেভ করেননি কেন?'

শ্রীধরের আচমকা প্রশ্নে রঙ্গপ্রকাশ কেমন হকচকিয়ে গেলেন। নিজের অজান্তেই গালে হাত চলে গেল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আঙুল বোলালেন। বললেন, 'এমনি...।'

শ্রীধর কুকিজ তুলে মুখে দিলেন। সফট ড্রিংক সিপ করলেন। রঙ্গপ্রকাশকে স্থিরচোখে জরিপ করতে-করতে বললেন, 'ও. কে., ডক্টর। আপনার টেনশান নিয়ে পরে কথা বলব।' সোফায় হেলান দিয়ে শরীরটাকে ডুবিয়ে দিলেন : 'আগে আমার টেনশান নিয়ে কথা হোক...।'

রঙ্গপ্রকাশ নড়েচড়ে বসলেন। কুকিজ তুলে কামড় বসালেন। সফট ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিলেন। ঝাঁঝটা নাকে জ্বালা ধরাল। কিন্তু মিষ্টি তরলের ঠান্ডা ছোঁয়ায় কেমন যেন এক প্রশান্তি খুঁজে পেলেন। দু-হাতে মুখ মুছলেন। ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিউ সিটির একজন নাগরিককে পিছনে ঠেলে দিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গলায় পেশাদারি গাম্ভীর্য এনে প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন আছেন?'

'ভালো না।' ঠোঁট টিপে বললেন শ্রীধর। ফরসা মুখে অপ্রসন্ন ভাঁজ ফেললেন : 'কতকগুলো স্বপ্ন বড় ঝামেলা করছে।'

'স্বপ্ন?' অবাক হলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'হ্যাঁ, স্বপ্ন—' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখ বুজে ধীরে-ধীরে বললেন, 'এমনিতে স্বপ্নগুলো হয়তো তেমন খারাপ কিছু নয়...কিন্তু আমার কাছে ওগুলো সিম্পলি নাইটমেয়ার—দু:স্বপ্ন।'

'কেন? কী দেখেছেন স্বপ্নে?' ভুরুতে ভাঁজ ফেললেন ডক্টর।

'যেমন, একটা মরুভূমি। চারিদিকে শুধু হলদে বালি আর বালি। সেই বালি থেকে তাপ উঠছে। আমার পা পুড়ে যাচ্ছে...কিন্তু আমি হেঁটে চলেছি। ঢেউখেলানো বালির পাহাড় একের পর এক ডিঙিয়ে চলেছি—অথচ বালির শেষ নেই। বাতাসে বালির কণা উড়ছে—চোখে-মুখে এসে লাগছে। মনে হচ্ছে ওগুলো আগুনের কণা...।'

শ্রীধর চোখ বুজে কথা বলছিলেন। খুব ধীরে এক-একটা শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছিলেন।

রঙ্গপ্রকাশ বেশ বুঝতে পারছিলেন স্বপ্নের প্রতীক কী বলতে চাইছে, কীসের ইশারা করছে। দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু, জাতিদাঙ্গা, সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

সোফায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে বসে থাকা এই নিষ্ঠুর মানুষটা এতদিন ধরে শুধু ভয় আর ক্ষয় বিক্রি করে চলেছে। এবার কি ওর সেগুলো কেনার পালা? স্বপ্নটা কি সে-কথাই জানাতে চাইছে?

কিন্তু সেসব তো শ্রীধরকে বলা যাবে না। কারণ, সেই ভয় আর ক্ষয়।

তাই উত্তরটাকে মনে-মনে সাজিয়ে নিয়ে বারকয়েক রিহার্সাল দিয়ে তারপর ডক্টর বললেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, আপনি একা। একজন সেলফমেড ম্যান। আর...আপনার সামনে লড়াই—।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

শ্রীধর পাট্টা চোখ খুললেন। কুকিজ আর সফট ড্রিংক চলতে লাগল।

একসময় রঙ্গপ্রকাশ জিগ্যেস করলেন, 'আর কী স্বপ্ন দেখেন আপনি?'

চোখ বুজলেন শ্রীধর। আলতো করে বললেন, 'আয়নার স্বপ্ন দেখি। আয়নায় আমার...আমার মুখ দেখতে পাই...।'

•

'স্পষ্ট দেখতে পান?'

'হ্যাঁ...' সফট ড্রিংক সিপ করলেন শ্রীধর : 'প্রায় স্পষ্টই বলা যায়, আয়নার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুখে চাকা-চাকা দাগ। অনেকটা জলবসন্তের গুটির মতো। আর আয়নায় আমার মুখের পেছনটা গাঢ় অন্ধকার। আমি খুব চেষ্টা করেও অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অথচ...অথচ আমার মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে, অন্ধকারটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...।'

রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন। এই স্বপ্নের ব্যাপারটা যদি শ্রীধর ঠিকঠাক বলে থাকেন তা হলে এই স্বপ্নের অর্থ একটাই : শ্রীধর খুব শিগগিরই রূঢ় এবং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। শ্রীধরের দিক থেকে দেখলে সেই বাস্তব কুৎসিত—তাই ওঁর মুখে জলবসন্তের গুটির চাকা-চাকা দাগ। আর ওই যে অন্ধকার, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—সেটা হল অজানা আশঙ্কা, ভয়।

কিন্তু শ্রীধর পাট্টাকে এর কতটুকু বলা যায়?

কিংবা আদৌ কি বলা যায়?

এই লোকটা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কত মানুষের যে মৃত্যুর কারণ হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। অথচ লোকটার মধ্যে অপরাধবোধও নেই।

তার কারণ ওর অপরিণত বিবেক। সাইকোলজির ভাষায় যাকে বলে 'আন্ডারডেভেলাপড কনশানস'। সোজা কথায় শ্রীধর পাট্টা একজন 'মরাল মোরন'। এই ধরনের অ্যান্টিসোশাল পারসোনালিটির মানুষরা মুখে সবসময় মূল্যবোধের কথা বলে, কিন্তু বিবেক অপরিণত হওয়ায় মূল্যবোধের বোধটাই থাকে না। এদের বুদ্ধি ক্ষুরধার, কিন্তু বিবেক ভোঁতা।

এখন সেইরকম একটা মানুষের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ফরসা তেলতেলে মুখ। মুখে কেমন একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব।

অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছেন। এবার কিছু একটা বলা দরকার।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীধর বলে উঠলেন, 'ডক্টর, কিছু বুঝতে পারলেন?'

ঘোর থেকে জেগে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। টেবিল থেকে কুকিজ তুলে নিয়ে মুখে দিলেন, সফট ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে লম্বা শ্বাস টেনে বললেন, 'স্যার, আপনার...আপনার সামনে যে-লড়াই...সেই লড়াইটা খুব মসৃণ হবে না। তাই আপনার মুখের রিফ্লেকশানে ওইরকম...চাকা-চাকা দাগ।' মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। ঘাড়ে একবার হাত বোলালেন। তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে আলতো করে যোগ করলেন, 'আক্রমণ যেটা আসবে...মানে, শত্রুর দিক থেকে...সেটা হবে আনএক্সপেক্টেড। মানে, আপনি আগে থেকে গেস করতে পারবেন না। সেইজন্যেই ওরকম অন্ধকার দেখেছেন...নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...জীবন্ত অন্ধকার।'

কে হতে পারে সেই অপ্রত্যাশিত শত্রু? কে হতে পারে সেই জীবন্ত অন্ধকার?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজের অজান্তেই শ্রীধর পাট্টার কপালে ভাঁজ পড়েছিল। রঙ্গপ্রকাশ সেই দুশ্চিন্তাটাকেই যেন আরও তীব্র করতে প্রশ্ন করলেন, 'এমন কোনও শত্রুর কথা কি আপনি ভাবতে পারছেন, স্যার? যাকে এখনও শত্রু বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—অথচ যে আনএক্সপেক্টেড দিক থেকে সাডেনলি অ্যাটাক করতে পারে?'

সফট ড্রিংকে চুমুক দিয়ে মেঝের দিকে তাকালেন শ্রীধর। কয়েক সেকেন্ড মাথা ঝুঁকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।

'না, এরকম এনিমি হিসেবে কাউকে এখন আইডেনটিফাই করতে পারছি না...।'

সোফা এবং নিজের শরীরের মাঝে খাড়া করে দাঁড় করানো গোলাপি ফোল্ডারটার দিকে রঙ্গপ্রকাশের চোখ গেল। জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে শ্রীধরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে সেসব কথা শুরু করার আগে থেরাপির 'কিউ অ্যান্ড এ' সেশানটা সেরে নেওয়া যাক।

একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর। তারপর বললেন, 'যা-যা বললেন সে ছাড়া আর কোনও স্বপ্ন কি দেখেন আপনি?'

'না:, শুধু ওইগুলোই। ঘুরেফিরে ওই স্বপ্নগুলোই আসে—তবে তার ডিটেইলের একটু-আধটু রকমফের হয়।'

'তা হলে কোয়েশ্চেন-আনসার সেশান শুরু করি, স্যার?'

'হ্যাঁ—করুন।'

কথাটা বলেই সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন শ্রীধর। সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করে দেওয়ালের একটা কালো ফাইবার প্লেটের দিকে তাক করে বোতাম টিপলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াল মাউন্টেড একটা অডিয়ো সিস্টেম 'রেকর্ডিং অ্যাকটিভ' হয়ে গেল।

রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে প্রতিটি সাইকোথেরাপি সেশান রেকর্ড করে নেন শ্রীধর। সেই রেকর্ডিং-এ দিন এবং সময় বসিয়ে নেয় অডিয়ো সিস্টেম নিজেই। রেকর্ড করা সেশানের একটা কপি একটা মাইক্রোসিডিতে করে রঙ্গপ্রকাশকে দিয়ে দেন। ফলে ডক্টর এবং ক্লায়েন্ট দুজনেই থেরাপির প্রগ্রেস সম্পর্কে পুরোপুরি আপডেটেড থাকেন। প্রয়োজনে কখনও সেগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনাও করতে পারেন।

পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই আর পেন বের করে নিলেন ডক্টর। কারণ, সেশানের মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও পয়েন্ট নোট করে নেওয়ার দরকার হয়। এই নোটগুলো ওঁর নিজের। এগুলো শ্রীধর পাট্টার জন্য নয়।

ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। তারপর আচমকা শুরু করলেন।

'ছোটবেলাতে আপনি ফিরে যেতে চান?'

'না—না।'

শ্রীধর চোখ বুজে ফেলেছিলেন। বোধহয় তীক্ষ্ণ মন:সংযোগ তৈরি করতে চাইছিলেন। ওঁকে দেখে রঙ্গপ্রকাশের মনে এক বিচিত্র ভাব জেগে উঠল। তীব্র প্রতিশোধকামী যে-নিষ্ঠুর মানুষটাকে তিনি জেনে এসেছেন এখন তাকে দেখে অসহায় ঘুমন্ত শিশু বলে মনে হচ্ছে।

'ছোটবেলায় ফিরতে চান না কেন? অনেকেরই তো ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে...।'

'না, আমার ছোটবেলায় ফিরতে ইচ্ছে করে না।'

'ছোটবেলায় সবাই ফিরে যেতে চায় সিকিওরিটির জন্যে। কারণ, তখন চারপাশে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন—সব গুরুজনেরা থাকেন। তাঁরা ছোটবেলার নিরাপত্তার জোগান দেন। দে প্রোভাইড দ্য সেফটি ওয়ালস...।'

'না, আমি ফিরব না। আমার কোনও সেফটি ওয়াল ছিল না।'

'তা হলে কী ছিল?'

'কিছুই ছিল না। কেউ ছিল না। শুধু আমি ছিলাম। একা। একেবারে একা।'

'একা থাকতে আপনার ভয় করত না?'

'না। ফিয়ার ওয়জ মাই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।'

নোটবইতে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। অদ্ভুত মন্তব্য। 'ফিয়ার ওয়জ মাই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।' ভয় আমার একমাত্র আত্মীয়। একমাত্র বন্ধু...।

'ভয় কীভাবে আপনার আত্মীয় হল? বন্ধু হল?'

'আমার চারপাশে ভয় ছিল। ভয় আমাকে ঘিরে থাকত। মাঝে-মাঝে মনে হত, ইট ওয়জ মাই সেফটি ওয়াল।'

'আপনি কি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাইতেন? মনে হত, এই দুনিয়ার সঙ্গে ঠিকঠাক মোকাবিলা করার জন্যে আপনার তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠা দরকার?'

'হ্যাঁ—মনে হত। মাঝে-মাঝে মনে হত।'

'আপনার তো বন্ধু ছিল না বললেন—তাই তো?'

'হ্যাঁ—।'

'কোনও শত্রু ছিল?'

'প্রচুর। আমার মনে হত, আমার চারপাশে শত্রু। কিলবিল করছে। ওদের আমি ঘেন্না করি। আই ডেসপাইজ দেম।'

'কারা সেই শত্রু? দু-একজনের নাম বলতে পারেন?'

'নাম? নাম কী বলব! সবাই শত্রু। দ্য হোল সোসাইটি ওয়জ মাই এনিমি—।'

শ্রীধরের উত্তর শুনতে-শুনতে নোট নিলেন ডক্টর। সোসাইটির প্রতি অ্যাপ্যাথি। সমাজ নাপসন্দ। সেই থেকেই হয়তো সমাজকে দখল করে শাসন করার ইচ্ছেটা অবচেতনে দানা বেঁধেছে। এখন নিউ সিটিতে তিনি যেটা করছেন। শাসন। অতিশাসন। অপশাসন।

'সবাই কেন শত্রু হবে?' কোমল গলায় বললেন ডক্টর। তারপর কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ছোটবেলায় কে আপনাকে দেখাশোনা করত?'

শ্রীধরের যে বাবা-মা ছিল না সেটা আগের নানান থেরাপি সেশান থেকে রঙ্গপ্রকাশ জানেন। কিন্তু বাবা-মায়ের বদলে কারা ওঁকে ছোটবেলাটায় মানুষ করেছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। শ্রীধর সবসময় প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। আজ আবার কথায়-কথায় সেই একই প্রশ্ন এসে গেছে।

শ্রীধর চোখ বুজে ছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে অপ্রসন্নতার কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'দেখাশোনা কেউ করত না। জ্ঞান হয়ে থেকেই দেখেছি আমি সবার ফাইফরমাশ খাটছি। আমাকে যে-সে শাসন করছে—চড়-থাপ্পড় মারছে—গায়ে থুতু দিচ্ছে।'

'বাবা-মায়ের খোঁজ করেননি কখনও?'

'প্রথম-প্রথম একে-তাকে জিগ্যেস করতাম...পরে আর করিনি।'

'কেন, করেননি কেন?'

'যারা ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে তাদের কখনও খুঁজে পাওয়া যায়! আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মা-বাবা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে—লুকিয়ে পড়েছে—আর কখনও আমার সামনে আসবে না বলে...।'

'বাবা-মাকে কাছে পাওয়ার জন্যে মন টানত না? কষ্ট হত না...কান্না পেত না?'

'প্রথম-প্রথম মন টানত। আমার বয়েসি বাচ্চা-কাচ্চাগুলো রাস্তার ধারের নোংরা ঝুপড়িতে থাকত। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পেত না। খাবারের খোঁজে আবর্জনা ঘাঁটত। কিন্তু ওদের দেখতাম বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা করছে, হাসছে—কী আনন্দে আছে। তখন আমার কষ্ট হত, কান্না পেত। তারপর...তারপর...রাগ হত। অসহ্য রাগ। সবার বাবা-মায়ের জন্যে আমার ঘেন্না হত।'

নোট নিতে-নিতে মুখ তুললেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের দিকে তাকালেন। ওঁর মুখে একটা লালচে আভা। আর তার সঙ্গে ঘৃণা আর উত্তেজনার ছাপ।

'হ্যাঁ—বুঝতে পারছি। কিন্তু...একটা কথা বলুন তো। ছোটবেলায় যেখানে আপনি থাকতেন—মানে, ওল্ড সিটিতে—সেখানে আপনার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?'

'না, না, না-না-না!' শ্রীধরের ঠোঁট চিরে হিসহিস শব্দে 'না'-এর স্রোতটা বেরিয়ে এল। মুখের লালচে আভা আরও গাঢ় হল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন ডক্টর। শ্রীধরের উত্তেজনার পারদকে খানিকটা নেমে আসার সময় দিলেন। তারপর : 'ওল্ড সিটিকে আপনার ভালো লাগে না?'

'ভালো লাগবে?' অবাক সুরে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন : 'কেন, ভালো লাগবে কেন?'

'আপনার জন্মভূমি—তাই...।'

'জন্মভূমি মাই ফুট। আই হেট ওল্ড সিটি। ওল্ড সিটিকে আমি ঘেন্না করি। ওই নোংরা, অসুস্থ, ক্লেদাক্ত শহরটা আমাকে কী দিয়েছে? কিছুই না! কিচ্ছু না! ওই শহরটাকে আমি হাতের মুঠোয় পিষে গুঁড়ো করে ফেলতে চাই। আই ওয়ন্ট টু অ্যানিহিলেট দ্যাট রটন হেল অ্যালংউইথ অল দ্য স্কাম ইন ইট।'

শ্রীধর বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। ওঁর ঠোঁট নড়ছিল। নি:শব্দে কিছু একটা বিড়বিড় করছিলেন।

নোটবইয়ের পাতায় রঙ্গপ্রকাশের পেন ব্যস্তভাবে চলছিল। একইসঙ্গে ওঁর মনের ভেতরে শ্রীধর পাট্টার মনস্তাত্বিক মূল্যায়নও চলছিল। সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি হচ্ছিল।

ওল্ড সিটির প্রতি শ্রীধরের এই একরোখা ঘৃণার জন্যই কি সুপারগেমস কর্পোরেশনের নানান হাই রিসক গেমসের প্রতিযোগী জোগাড় করা হয় শুধুমাত্র ওল্ড সিটি থেকে? এই কারণেই কি বড়লোক বানানোর লোভ দেখিয়ে ওল্ড সিটির গরিব 'ছোটলোক'গুলোকে দোজখের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়?

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রীধরের পরিচয়হীনতার ক্ষোভ। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে সুস্থ সমাজের প্রতি ওঁর আক্রোশ।

শ্রীধর পাট্টার মনের গঠনের মানচিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত একজন অতিমাত্রায় সংবেদনশীল মানুষ। ওঁর মধ্যে রয়েছে গোঁয়ার্তুমি, হিংসা, অসার আত্মগর্ব। এ ধরনের মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই কোনও গুরুত্ব দেয় না, আর নিজের ভুল বা ব্যর্থতার জন্য সবসময় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অপরিণত বিবেক আর অপরিণত অপরাধবোধ।

সব মিলিয়ে একটা জটিল প্যারানয়েড পারসোনালিটি।

'ওল্ড সিটি আপনি ছেড়ে এলেন কেমন করে?' নোট নেওয়া শেষ করে প্রশ্নটা করলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা।' চোখ বুজেই ঠোঁটে হাসলেন শ্রীধর। তারপর এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন স্লো মোশানে একটা সিনেমা দেখছেন এবং অস্ফুট স্বরে ধীরে-ধীরে সেটার বর্ণনা করছেন।

'আমার দাদা বলধর পাট্টা আমাকে ওল্ড সিটিতে হঠাৎই খুঁজে পায়। আমার গলার একটা চেন দেখে চিনতে পারে। আমার খুব ছোটবেলায় এই নিউ সিটিতে পিস ফোর্সের একটা বিদ্রোহ হয়েছিল। শুনেছি তখন আমার বয়েস ছিল নাকি এক বছর দু-মাস। সেই বিদ্রোহের সময় পিস ফোর্সের ছ'জন বিদ্রোহী অফিসার আমাকে কিডন্যাপ করে শুটারে চেপে ওল্ড সিটিতে পালিয়ে যায়। ওরা দাদাকে থ্রেট করে—বলে যে, কাউকে এই কিডন্যাপিং-এর কথা জানালে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। পরে দাদা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে সবক'টা বিদ্রোহীকে খুঁজে বের করে গুনে-গুনে খতম করে। কিন্তু আমাকে আর খুঁজে পায়নি। পেয়েছে তার অনেক বছর পরে—প্রায় তেরো বছর পরে। তখন দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি—।'

এই গল্পটা শ্রীধর তৈরি করেননি—করেছিলেন বলধর পাট্টা। গল্পটা বানানো হলেও এর মধ্যে পিস ফোর্সের বিদ্রোহের অংশটা সত্যি। এই গল্পটা দীর্ঘদিন ধরে সবাইকে বলে-বলে ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, শ্রীধর নিজেও গল্পটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এবং সেই ফাঁকের দিকে তাক করেই পরের প্রশ্নটা করলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'বলধর পাট্টার তো বাবা-মায়ের পরিচয় ছিল। তা হলে আপনি নিজেকে পরিচয়হীন বলছেন কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর জবাব দিলেন, 'যখন একটা শিশুর বাবা-মা-কে ভীষণ প্রয়োজন তখন যদি তাদের না পায় তা হলে সে কোন বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠবে? আমার এক বছর দু-মাস বয়েস থেকে প্রায় চোদ্দো বছর বয়েস পর্যন্ত আমি আবর্জনার মতো বড় হয়ে উঠলাম। বাবা-মা-কে সচেতনভাবে কখনও

চোখেই দেখলাম না। তাঁরা শুধু হলোগ্রামের ছবি হয়ে আমার কাছে বেঁচে রইল। তা হলে আমার মনে হবে না কি যে, আমার মা-বাবা বলে কেউ ছিল না! আই অ্যাম আ ব্লাডি অরফ্যান!'

এই ব্যাখ্যাটা শ্রীধর পাট্টা বহুবছর আগেই তৈরি করেছেন। প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। যেমন এখন ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসের থেরাপির সময় ব্যবহার করছেন।

শ্রীধর ব্যাখ্যা দিলেও সাইকোঅ্যানালিস্ট রঙ্গপ্রকাশ তার মধ্যে একটু-আধটু ফাঁকফোকর দেখতে পাচ্ছিলেন। আসলে সাইকোথেরাপি সেশানের সময় ডক্টর এবং পেশেন্ট দুজনকেই কমিটেড হতে হয়। পেশেন্ট যখন নিজের সমস্যার কথা ডক্টরকে বলবে তখন তাকে সৎ হতে হবে—কোনও মিথ্যে কথা বললে চলবে না। আর থেরাপিস্টকেও হতে হবে অবজেকটিভ, প্রফেশনাল, সাপোর্টিভ—আর, সেশানের সব কথাই তাঁকে গোপন রাখতে হবে।

শ্রীধর পাট্টার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ করে রঙ্গপ্রকাশের মনে হচ্ছিল, শ্রীধর ওঁর সততার শর্ত পুরোপুরি পূরণ করতে পারছেন না।

ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। থেরাপি সেশান এখানেই শেষ করা যাক। তাই টেপ-রেকর্ডারকে শোনানোর জন্য বললেন, 'এন্ড অফ থেরাপি সেশান। থ্যাংক য়ু, স্যার।'

কথাগুলো শুনলেন শ্রীধরও। কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে বোঝা যাচ্ছিল না। একইরকমভাবে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে শুয়ে আছেন। শুধু বুকটা ওঠা-নামা করছে।

নোটবই আর পেন পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের উষ্ণতা বোধহয় অনেকটা কমে গিয়ে থাকবে। কারণ, এখন বেশ শীত-শীত করছিল।

হঠাৎই ডক্টরকে চমকে দিয়ে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ছিটকে সোজা হয়ে বসলেন শ্রীধর। চোখ খুললেন। ডক্টরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওয়েল, ডক্টর, হোয়াট ডু য়ু থিংক?'

গোলাপি প্লাস্টিকের ফোল্ডারটা কোলের ওপর তুলে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সেটা নাড়াচাড়া করছিলেন। শ্রীধরের প্রশ্নের উত্তরে আলতো করে বললেন, 'আই থিংক ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, স্যার। আরও কয়েকটা সেশানের পর আমি হয়তো আপনাকে কিছু মেডিসিন নেওয়ার কথা বলব। তার আগে আমাকে একজন সাইকোফার্মাকোলজিস্টের সঙ্গে ডিসকাস করতে হবে...।'

'যত খুশি ডিসকাস করুন—শুধু মনে রাখবেন, আমার নাম যেন কোনওভাবেই মেনশানড না হয়। যদি হয় তা হলে আই অ্যাম গোয়িং টু বি ইয়োর লাস্ট পেশেন্ট, ডক্টর...।'

শেষ কথাটায় রঙ্গপ্রকাশের গায়ে কাঁটা দিল। ফোল্ডারের ওপরে ওঁর হাতের আঙুল অকারণেই দ্রুত নড়াচড়া করতে লাগল। প্রাণপণে তিনি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

শ্রীধর দু-হাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত দুটো কয়েকবার পাশে ছড়ালেন, ওপর-নীচ করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ হাতের ফোল্ডারটা খুললেন। আলতো করে বললেন, 'স্যার, এবার জিশান পালচৌধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে একটু কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ—পারেন।' অনুমতি দিলেন শ্রীধর এবং রঙ্গপ্রকাশের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

হ্যাঁ, জিশান পালচৌধুরীর ভেতরটা তিনি এবার বুঝতে চান।

•

থেরাপি সেশান শেষ হওয়ার পর রঙ্গপ্রকাশের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হল, এতক্ষণ ধরে ওঁর যেন দম-বন্ধ-করা অবস্থা চলছিল—এবং এই প্রথম স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারছেন।

'স্যার, আগে এগুলো একবার দেখে নিন। এতে সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল সম্পর্কে বেশ কিছু ইমপরট্যান্ট নোটস আছে আর রেলিভ্যান্ট কয়েকটা ফোটোগ্রাফ আছে।' কথাগুলো বলে খোলা ফোল্ডরটা শ্রীধর পাট্টার দিকে এগিয়ে দিলেন।

শ্রীধর ফোল্ডারটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগলেন। ফোটোগ্রাফগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

রঙ্গপ্রকাশ দেখছিলেন শ্রীধরের কপালে ভাঁজ তৈরি হয়েছে। পাতলা ঠোঁট মাঝে-মাঝে নি:শব্দে নড়ছে। শ্রীধরের মনের মেশিনে জিশান পালচৌধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের মূল্যায়ন তৈরি হচ্ছে।

সৎ। স্পষ্ট। মানবিক মূল্যবোধের দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। বড় সহজে বন্ধুত্ব তৈরির চেষ্টা করে। শত্রুকেও বন্ধু বলে ভাবতে চায়।

জিশান সম্পর্কে এই কথাগুলোই শ্রীধর ভাবছিলেন।

কিন্তু ছেলেটার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে। আছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। জাব্বার সঙ্গে পিট ফাইটের সময় সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিকে শ্রীধর কাইনেটিক এনার্জিতে বদলে যেতে দেখেছেন। তা ছাড়া এই ধরনের মানুষ পেশাদার নয় বলেই মূল্যবোধের হাতিয়ার নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীধর ভাবছিলেন। শুধু ভাবছিলেন।

জিশানের কিল গেম-এর তারিখ এবার ঠিক করতে হবে। এবং জেলখানা থেকে তিনজন কিলার—না, না...সুপারকিলার—কিংবা সুপারি কিলারও বলা যেতে পরে—তিনজন মারাত্মক খুনিকে বেছে নিয়ে আসতে হবে—চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। তারপর গেম সিটিতে চব্বিশ ঘণ্টার কিল গেম। সেই খেলার লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে-দেখতে সবার বন্ধ হয়ে আসবে দম। এবং জিশান খতম।

আপনমনে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। সুপারহিরোকে শেষ করতে সুপারকিলারই দরকার। সুতরাং এই 'খুনি' বাছাইয়ের কাজে এবার শ্রীধর নিজেই যাবেন। জেলে যতজন মারাত্মক খুনি আছে তাদের সকলের 'কারিকিউলাম ভিটা' খুঁটিয়ে পরখ করে দেখবেন—বারবার। তারপর বেছে নেবেন তিনজনকে। যারা শয়তানিতে শয়তানকেও হারাতে পারে।

জিশানের একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্রীধর। মনে হচ্ছিল এই জোয়ান ছেলেটা এক-একটা খেলায় কোয়ালিফাই করে ধীরে-ধীরে যেন কিল গেম-এর দিকে নয়—শ্রীধরের দিকে এগোচ্ছে। শ্রীধর পাট্টাকে নি:শব্দে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

না:, জিশান কিছুতেই কিল গেম-এ জিততে পারে না। যদি জেতেও, তা সত্বেও ওকে হারতেই হবে। শ্রীধর সে-ব্যবস্থা অবশ্যই করে রাখবেন। কারণ, জিশানকে জিততে দেওয়া যাবে না। জিশান যদি জেতে তা হলে সেটা হবে নিউ সিটির স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

শ্রীধরের চোয়াল শক্ত হল। ঠোঁট টিপলেন। ছোট্ট করে মাথা দোলালেন। তারপর জিশানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন—যেন ওর সঙ্গে কথা বলছেন।

রঙ্গপ্রকাশ চুপ করে বসে নিজের পেশেন্টকে লক্ষ করছিলেন। ও জানে না ওর অপরাধবোধ অপরিণত, বিবেকেরও একই দশা। জানে না, ও একজন প্যারানয়েড পারসোনালিটির মানুষ, 'মরাল মোরন'। ও নিজে যে-পথে চলার কথা ভাবে সেটাই ওর কাছে একমাত্র সঠিক পথ।

শ্রীধরের পকেটের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল। শুটারের শিসের শব্দ, আর তার সঙ্গে মিশে আছে যুদ্ধ ঘোষণার ঝংকার তোলা ব্যান্ড। এই কপিরাইট রিং টোন শুধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার জন্য তৈরি।

হাতের ফোল্ডার শব্দ করে বন্ধ করলেন শ্রীধর। রঙ্গপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করুন। আমাকে এর একটা সফট কপি মাইক্রোসিডিতে করে দেবেন—আর তার সঙ্গে একটা হার্ড কপি। একটা কথা মনে রাখবেন : আপনার অ্যাসেসমেন্ট যেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়। ওতে যেন কোনওরকম ঝাপসা মন্তব্য না থাকে। মানে সায়েন্টিফিক জারগন দিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করবেন না...।'

ফোল্ডারটা ফেরত পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের ফোন তখনও বাজছিল।

উঠে দাঁড়ালেন। ফোন বের করে কানে দিলেন। বাঁ-গালে আঙুলের ডগা ঘষলেন কয়েকবার।

রঙ্গপ্রকাশও সঙ্গে-সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'হ্যালো—।' শ্রীধর ঠান্ডা গলায় বললেন।

'মার্শাল, স্যার—' ওপাশ থেকে সিকিওরিটি চিফের গলা ভেসে এল : 'আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্যে দু:খিত, কিন্তু এইমাত্র আমার দুই সাবর্ডিনেট স্টাফ ভীষণ ইমপরট্যান্ট খবর নিয়ে এসেছে...।'

'শুনছি...' নিরুত্তাপ গলায় বললেন শ্রীধর। কারণ, সহজে উত্তেজিত হওয়া শ্রীধরের স্বভাব নয়। তা ছাড়া ওঁর সিকিওরিটি স্টাফ প্রায়ই নানান গোপন খবর ওঁর কাছে পৌঁছে দেয়। যেহেতু কোনও সঠিক খবর পৌঁছে দিলে ভালোরকম ক্যাশ প্রাইজের ব্যবস্থা আছে, এবং খবরের গুরুত্ব বুঝে প্রোমোশনও দ্রুত হয়ে যেতে পারে, সেহেতু খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য সিকিওরিটি টিমের মধ্যে এক অদ্ভুত অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আছে। শ্রীধর সেটা ভালো করেই জানেন এবং এই প্রতিযোগিতার মনোভাবটা তিনি জিইয়ে রাখতে চান। কারণ, প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে। আর সেখান থেকেই আসে অবিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি।

এই অবিশ্বাসের সম্পর্কটা শ্রীধর জিইয়ে রাখতে চান। তাতে ওদের ওপরে শাসনের নিয়ন্ত্রণটা সহজে কায়েম করা যায়। আর ওদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ছিদ্র পথে শ্রীধর অনেক গোপন খবর পান—পরস্পরবিরোধী গোপন খবর। সেইসব খবরকণিকা থেকে তোলমোল করে শ্রীধর ছেঁকে বের করে নেন নির্যাসটুকু। তারপর নিজস্ব ঢঙে প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেন।

'স্যার, ওদের আপনার কাছে নিয়ে আসছি। ওদের কোড নম্বর হল...' সিকিওরিটি চিফ সেই দুজন সিকিওরিটি স্টাফের কোড নম্বর বললেন।

রঙ্গপ্রকাশ দেখলেন শ্রীধর কোড নম্বরগুলো শুধু শুনে নিলেন—কোথাও টুকে নিলেন না। না, ভুল হল। বরং বলা ভালো, শ্রীধর পাট্টা নম্বরগুলো ওঁর মাথায় টুকে নিলেন। সত্যি, অমানুষ এই মানুষটার আশ্চর্য মেমোরি! প্রাচীন যুগ হলে শ্রীধরকে অনায়াসে 'শ্রুতিধর' বলা যেত।

'ঠিক আছে, ওদের নিয়ে আসুন। আমি আপনার আর ওদের কোড নম্বর পাঞ্চ করে ইনটারনাল সিকিওরিটি ক্লিয়ারেন্স থ্রু করে রাখছি...।'

কথা বলা শেষ করে স্যাটেলাইট ফোনটা চোখের সামনে ধরলেন। সিকিওরিটি চিফ আর তার দুজন স্টাফের কোড নম্বর তিনটে দ্রুত পাঞ্চ করলেন। তারপর আরও কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন পরপর।

স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আড়চোখে রঙ্গপ্রকাশের দিকে তাকালেন : 'ডক্টর, প্লিজ একটু ওয়েট করুন। পাশের ঘরে গিয়ে আমি একটা ইমার্জেন্সি ব্যাপার চট করে সেরে আসছি। এসে আপনার ই. আই. নিয়ে কথা বলছি। এক্সকিউজ মি...।'

শ্রীধর চলে গেলেন। রঙ্গপ্রকাশ ওঁর চলে যাওয়া দেখলেন।

ওঁর পা ফেলার ঢং থেকে আত্মবিশ্বাসের বিকিরণ টের পেলেন ডক্টর। অবাক হয়ে ভাবলেন, মানুষটা কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে! ওল্ড সিটির আবর্জনায় তেরো বছর কাটিয়ে শ্রীধর হয়তো দাঁত-নখের লড়াইটা শিখেছেন, কিন্তু লেখাপড়া?

উত্তরটা শ্রীধরের নানান থেরাপি সেশান থেকেই পেয়েছেন রঙ্গপ্রকাশ। বলধর পাট্টা 'হারানো' ছোট ভাইকে খুঁজে পাওয়ার পর দশবছর ধরে তাকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন—নানান বিষয়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজি শেখা আর ম্যানার্স শেখা। এ দুটো শেখার জন্য শ্রীধরকে দু-বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় রেখেছিলেন বলধর। সেখানে ওঁর জন্য স্পেশাল প্রাইভেট কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল।

তারপর এল জাপানের পালা। কিক বক্সিং আর সামুরাই সোর্ড। এই দুটো বিষয়ে শ্রীধরের আগ্রহ আর দক্ষতা বলধর পাট্টাকে অবাক করেছিল। তিন বছর ট্রেনিং-এর পর শ্রীধর যেখানে পৌঁছেছিলেন একজন প্রতিভাবান শিক্ষার্থী সাধারণত দশ বছরে সেখানে পৌঁছোতে পারে।

জাপান থেকে ফেরার পর বাড়িতে থেকেই শ্রীধর লেখাপড়া শিখেছেন আর শরীরচর্চা করে গেছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন লড়াইয়ে শ্রীধর নাম দিয়েছেন। ওঁর সাকসেস রেট ছিল নাইনটি ওয়ান পারসেন্ট।

বলধর লক্ষ করেছিলেন, শ্রীধরের মধ্যে একটা সহজাত পশু-প্রবৃত্তি রয়েছে। সেটা হল, প্রতিপক্ষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, খতম করা। এই অ্যানিম্যাল ইনস্টিংকট-ই শ্রীধরের মেজর অ্যাসেট।

শ্রীধরের লেখাপড়ার প্রায় পুরোটাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে শেখা, অথবা বিদেশ থেকে আনা কাস্টম-বিলট মাইক্রোসিডি কমপিউটারে চালিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। সবকিছু শেখার ব্যাপারে ওঁর অসাধারণ মেমোরি ওঁকে দুর্দান্তভাবে সাহায্য করেছে। এবং সেই সময়ে শ্রীধর যতগুলো অন-লাইন টেস্ট দিয়েছেন তার সবগুলোতেই দারুণ রেজাল্ট করেছেন।

শ্রীধরকে নিয়ে বলধর পাত্রা খুব গর্ব অনুভব করতেন। একটা সময়ের পরে তিনি শ্রীধরকে সত্যি-সত্যি নিজের ভাই বলে ভাবতে শুরু করেন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওঁর এই ভাবনা অটুট ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ছোট-ছোট পা ফেলে পায়চারি করছিলেন। কী এক কৌতূহলে তিনি কনফারেন্স রুম ওয়ানের কাচের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্বচ্ছ দরজা ভেদ করে রঙ্গপ্রকাশের দৃষ্টি দূরে পৌঁছে গেল।

একটা কাচের ঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই ঘরের দরজায় হলোগ্রাম দিয়ে রঙিন ডিজাইন করে লেখা রয়েছে 'ভিজিটর'।

ঘরের ভেতরে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীধর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একটা চাপা অস্থিরতা ওঁর ভেতরে কাজ করছে। শরীরের ওজনটা বারবার এক পা থেকে আর-এক পায়ে নিচ্ছেন, থেকে-থেকেই তাকাচ্ছেন স্টেইনলেস স্টিলের প্যাঁচানো সিঁড়ির দিকে।

একটু পরেই কালো য়ুনিফর্ম পরা তিনজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। কাচের দেওয়ালে পেরিয়ে শ্রীধর পাত্রাকে দেখতে পেল। সুতরাং লক্ষ্য স্থির করে তিনজনে দম দেওয়া খেলনা পুতুলের মতো 'ভিজিটর' লেখা ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

শ্রীধরের কাছে পৌঁছে ওরা মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকল।

শ্রীধর একচিলতে হেসে ওদের অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন।

তিনজনের মধ্যে যার বয়েস একটু বেশি সে-ই বোধহয় সিকিওরিটি চিফ—কারণ, তার য়ুনিফর্মের বুকের কাছে লাল ও নীল রঙের দুটো কাপড়ের স্ট্রিপ, আর তার ওপরে চারটে করে মেটাল স্টার।

বছর চল্লিশের মানুষটার লম্বাটে মুখ যেন তামাটে পাথরে খোদাই করা। চোখ দুটো ছোট-ছোট। দু-গাল এমন বসে গেছে যে, হঠাৎ করে প্রেত বলে মনে হয়।

মাথার টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে চিফ বলল, 'স্যার, এই যে—এরা দুজন—কুশিয়া চতুর্বেদী আর নন্দরাম সরখেল। ওরা একটা টেররিস্ট গ্রুপের কিছু টপ সিক্রেট ইনফরমেশান লাকিলি জানতে পেরেছে।... সেই...সেই ইয়েগুলো আপনাকে জানাতে চায়। ফার্স্ট হ্যান্ড...।'

শ্রীধর কুশিয়া আর নন্দরামকে দেখলেন। শুধু দেখলেন না, ঠান্ডা দৃষ্টিতে মেপেও নিলেন। বয়েস খুব বেশি হলে চব্বিশ কি পঁচিশ। দুজনেরই মুখে একটা 'খোকা-খোকা' ভাব। নিষ্পাপ চোখ, তেলতেলে মুখ, চওড়া গোঁফ।

সব মিলিয়ে মুখ দুটোয় বেশ মিল আছে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড পর শ্রীধর চিফের দিকে তাকালেন। তারপর হাতের ইশারায় চিফকে ডিসমিস করে দিলেন, বললেন, 'আপনি এবার আসতে পারেন...।'

ঘরের এক কোণে একটা বড় সোফা রাখা ছিল। সেটার দিকে ইশারা করে কুশিয়া আর নন্দরামকে বসতে বললেন শ্রীধর। ওরা বাধ্য ছাত্রের মতো 'স্যার'-এর কথা শুনল। সোফার কাছে গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়ল দুজনে।

নিউ সিটির টেররিস্ট গ্রুপ সত্যিই বেশ চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীধরের খুব ছোটবেলায় পিস ফোর্সের যে-বিদ্রোহ হয়েছিল বলধর পাট্টা তার আগুন নেভাতে পেরেছিলেন। বলধর জানতেন, যদি একটা মানুষের জীবনযাপনের সব আরাম তাকে উপহার দেওয়া যায় তা হলে সে আর বিদ্রোহ করবে না। তাই নিউ সিটির মানুষের রোজকার জীবনের যা-যা বস্তুতান্ত্রিক চাহিদা, যদি নিখুঁতভাবে তার নিয়মিত জোগান দেওয়া যায়, তা হলে কারও আর কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকবে না।

সেই পথই ধরেছিলেন বলধর। পিস ফোর্সের গার্ডÇদের কোনও অভাব রাখেননি, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের ওপরে গোপন নজরদারির তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বলধর পাট্টা আগুন নেভালেও ছাই থেকে গিয়েছিল। আর সেই ছাইয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আগুনের কিছু কণা। সেই কণা থেকেই মাঝে-মাঝে জ্বলে উঠত নতুন আগুন। ছোটখাটো অসন্তোষ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ।

কেন এই অসন্তোষ, বিদ্রোহ, তা বলরাম বুঝতে পারতেন না। তার কারণ, বস্তুতান্ত্রিক চাহিদার বাইরেও যে মানুষের চাহিদা থাকে সেটা তিনি বোঝেননি। তাই শিকারির গুলিতে একটা পাখির মৃত্যু হলে অন্য একজন মানুষ কেন দু:খ পাবে সেটা বলধর বুঝতেন না। বুঝতে পারতেন না, কয়েকটা প্রজাপতি আগুনের আঁচে পুড়ে মরলে কেন মানুষ কষ্ট পাবে। সবসময় ভাবতেন, না, এর কোনও লজিক নেই। তেমনই ভাবতেন সুপারগেমস কর্পোরেশনের ডিজাইন করা মনোহারী সব খেলায় কোনও পার্টিসিপ্যান্ট আহত কিংবা নিহত হলে নিউ সিটির কেউ কেন দু:খ পাবে। অচেনা, অজানা, অনাত্মীয় কোনও মানুষ মারা গেলেও কারও দু:খ পাওয়া উচিত নয়। এইসব ইললজিক্যাল ব্যাপারের কোনও মানে হয় না।

বলধর পাট্টা নিজেকে যথেষ্ট লজিক্যাল মানুষ বলে মনে করতেন। তাই ওঁর যান্ত্রিক লজিকের কাঠামো দিয়ে এইসব 'আলতু-ফালতু' ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন—কিন্তু পারতেন না।

শ্রীধর পাট্টাকে বলধর নিজের জেরক্স কপি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেটা করতে গিয়ে দেখেছিলেন, শ্রীধর যেন আগে থেকেই বলরামের জুতোয় পা গলিয়ে বসে আছেন।

সুতরাং বলধরের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাতে তিনি বলতে গেলে দ্বিতীয় বলধর পাট্টা তৈরি করে গিয়েছিলেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, ভাবনা—সবই তিনি শ্রীধরের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

তবে শ্রীধর কিন্তু দ্বিতীয় বলধর হননি। বরং বলধরকে বেশ কয়েকগুণ ছাপিয়ে গিয়েছেন। বলধর পাট্টা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে এই 'বেশ কয়েক গুণ' বলধরকে দেখে খুশি হতেন। এবং, এটা মনে রাখতে হবে, বলধর পাট্টাকে খুশি করা বেশ শক্ত কাজ ছিল।

বলধর যেভাবে ছোটখাটো বিদ্রোহ বা বিক্ষোভগুলোর মোকাবিলা করতেন, শ্রীধরও একইভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তিনি নিউ সিটির বাসিন্দাদের এটা বোঝাতে চেয়েছেন এইসব বিদ্রোহীরা আসলে টেররিস্ট, সন্ত্রাসবাদী। এরা অকারণে নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে খুন করে। সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্রীধর পাট্টা বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষকে গোপনে কোতল করে তার দায় বিদ্রোহীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তা ছাড়া সারা শহর জুড়ে গোপন নজরদারির কাজ আরও ব্যাপক, আরও শক্তিশালী করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও...।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কুশিয়া আর নন্দরামকে লক্ষ করছিলেন। তারই মধ্যে কখন যেন স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে আবার হাতে তুলে নিয়েছেন।

একটু অপেক্ষা করার পর শ্রীধর বললেন, 'কী বলবে বলো...।'

কুশিয়া তখন বলতে শুরু করল, 'স্যার...মার্শাল, স্যার...কী হয়েছে বলছি।' কয়েকবার ঢোঁক গিলল কুশিয়া। তারপর : 'মার্শাল, স্যার, ডি, জি আর এম জোনে টেররিস্ট গ্রুপের বেশ কয়েকজন লোক আছে। ওদের কাছে আর্মসও আছে। আমি আর নন্দরাম...' নন্দরামের দিকে তাকাল কুশিয়া : 'গতকাল ওই তিনটে

জোনে সিক্রেট প্যাট্রলে ছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এম জোনের টুয়েলভ কমা সেভেন্টি এইট কো-অর্ডিনেটে যাই। সেখানে একটা শপিং মলে ঢুকি। আমরা...আমরা ফুড প্লাজায় একটা টেবিলে বসে...আমরা খাবারের অর্ডার দেব বলে ভাবছিলাম। তখন পাশের টেবিলে বসা দুজন লোকের কথা আমাদের কানে এল...।' নন্দরামের দিকে তাকিয়ে কুশিয়া বলল, 'এবার তুমি বলো...।'

নন্দরাম সোফায় বসার পর থেকেই উসখুস করছিল। এখন একটু নড়েচড়ে বসে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'স্যার, ওদের কথার পয়েন্টসগুলো আমি লিখে এনেছি। কয়েকটা ফোন নাম্বারও টুকেছি। ডি আর জি জোনে ওদের কনট্যাক্ট আছে। এই দেখুন...' বলে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল নন্দরাম।

তার পরের ঘটনাগুলো শ্রীধর যেন স্লো মোশানে দেখতে পেলেন।

নন্দরাম ওর পকেট থেকে পয়েন্টস লেখা কাগজ বের করার বদলে একটা ০.২২ ক্যালিবারের হ্যান্ডগান বের করে নিয়েছে, এবং লেসার পয়েন্টার লাগানো ছোট্ট পিস্তলটা ধীরে-ধীরে উঁচিয়ে ধরছে শ্রীধরের দিকে।

'ওয়ালথার টি-পি-এইচ স্টেইনলেস' ডাবল অ্যাকশন হ্যান্ডগান। ম্যাট ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। ওজন মাত্র ৩৯৫ গ্রাম। ছ'রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়। পিস্তলের হাতলটা কালো রঙের সিনথেটিক মেটিরিয়াল।

চেহারায় ছোটখাটো কিন্তু বেশ কাজের এই হ্যান্ডগান দিব্যি প্যান্টের পকেটে এঁটে যায়।

কুশিয়াও কিন্তু বসে ছিল না। নন্দরামকে অনুকরণ করে সে-ও একটা ওয়ালথার টি-পি-এইচ স্টেইনলেস পকেট থেকে বের করে নিয়েছে এবং সেটা তাক করছে শ্রীধরের দিকে।

'আমরাই সেই টেররিস্ট, মার্শাল, স্যার—।' কুশিয়া দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল।

•

এরকম সংকটের মুহূর্ত শ্রীধর পাট্টার জীবনে অনেক এসেছে। তিনি যখন চোদ্দো বছরের পিলটু তখন থেকেই। সুতরাং শ্রীধরকে কেউ চমকে দিতে পারে না, ওঁর কাছে 'অপ্রত্যাশিত' বলে কিছু নেই। আসলে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হওয়াটা যে কত বড় 'যোগ্যতা' শ্রীধর পাট্টা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

নন্দরাম এবং কুশিয়া যতই সিকিওরিটি ফোর্সের সদস্য হোক ওরা কখনওই শ্রীধর পাট্টার কাছে সন্দেহের ওপরে ছিল না—বরং বলা যায়, সন্দেহের অনেকটা নীচে। আসলে শ্রীধরের কাছে—একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া—আর কেউই সন্দেহের ওপরে নয়।

সুতরাং ভাবলেশহীন শ্রীধর নিজস্ব অভিনব পদ্ধতিতে এই 'গেরিলা' আক্রমণের জন্য তৈরি ছিলেন। আর সেইজন্যই স্যাটেলাইট ফোনটা তিনি হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নন্দরাম পকেট থেকে হ্যান্ডগান বের করে নেওয়ামাত্রই তিনি স্যাটেলাইট ফোনের একটি বিশেষ বোতাম টিপেছেন এবং তৎক্ষণাৎ একটা জোরালো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড স্বচ্ছ দেওয়ালের মতো নন্দরামদের কাছ থেকে শ্রীধর পাট্টাকে আলাদা করে দিয়েছে।

নন্দরাম ফায়ার করেছিল। তার কয়েক লহমা পরে কুশিয়াও। কিন্তু ফোর্স ফিল্ডের শিল্ড হাইস্পিড মেটাল বুলেটগুলোকে রুখে দিল। ওদের কাইনেটিক এনার্জি বদলে গেল থার্মাল এনার্জিতে। হাই টেম্পারেচারে ওগুলো প্লাজমা হয়ে গেল। সেই প্লাজমাকে ফোর্স ফিল্ড ট্র্যাপ করে নিল।

নন্দরাম আর কুশিয়া ফায়ার করেই যাচ্ছিল। ফোর্সÇ ফিল্ড যেহেতু চোখে দেখা যায় না তাই ব্যাপারটা যে ঠিক কী হচ্ছে সেটা ওরা ঠাহর করতে পারছিল না। শুধু দেখছিল, ভাবলেশহীন পাথরের মুখ নিয়ে শ্রীধর পাট্টা একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মরা মাছের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে 'বিপ্লব' অথবা 'বিদ্রোহ' শেষ হলে নন্দরাম আর কুশিয়া হকচকিয়ে গেল। শয়তানটা এখনও দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আঁচড়হীন।

এরপর উত্তেজনা এবং বিদ্রোহের জোশ বিদ্রোহীদের দিয়ে যা করিয়ে থাকে নন্দরাম আর কুশিয়াও তাই করল।

হ্যান্ডগান উদ্যত হাতুড়ির মতো বাগিয়ে ধরে ওরা ক্ষিপ্তের মতো ছুটে এল শ্রীধরের দিকে।

এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে শ্রীধর ভীষণ পরিচিত। তাই চমকানোর কোনও প্রশ্নই উঠল না। শুধু হাতের মুঠোয় ধরা স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডের ইনটেনসিটি কমিয়ে 'স্টানিং' লেভেলে নিয়ে এলেন। ফলে নন্দরাম-কুশিয়া ফিল্ডের দেওয়াল ছোঁওয়ামাত্রই শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

এবং তাই হল। দুটো জোয়ান শরীর লুটিয়ে পড়ল 'ভিজিটর' রুমের মার্বেল পাথরের মেঝেতে। ওরা এখন কমপক্ষে দু-ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকবে।

এবার শ্রীধর একচিলতে হাসলেন। ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডকে ডি-অ্যাকটিভেট করে দিলেন।

এই লোকদুটোকে জ্যান্ত রাখাটা খুব জরুরি। কারণ, ওদের কাছে থেকে সিক্রেট টেররিস্ট গ্রুপগুলো সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যাবে। ফল পিষে যেভাবে ফলের রস বের করা হয় ঠিক সেইভাবে খবরগুলো ওদের ব্রেন থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারপর ছিবড়ে ফেলে দেওয়া হবে নেক্রোসিটির কবরস্থানে।

এ ছাড়া আরও কিছু কাজ বাকি।

এই দুটো ছেলে—নন্দরাম আর কুশিয়া—গত সাতদিনে যেসব লোকের সঙ্গে সরাসরি কিংবা ফোনে যোগাযোগ করেছে তাদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। এবং টপ লেভেল সিকিওরিটি গ্রিলিং দিতে হবে। এই সন্দেহভাজনদের তালিকায় যদি কোনও সিকিওরিটি স্টাফ থাকে তা হলে তারও কোনও রেহাই নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রীধর। এই শৌখিন বাড়িটার একটা সিক্রেট বলধর পাত্রা জানতেন—আর ওঁর কাছ থেকে জেনেছেন শ্রীধর পাত্রা। এ ছাড়া আর কেউ সেই গোপন খবরটা জানে না। সেটা হল, এই বাড়ির আনাচেকানাচে সাড়ে সাতষট্টি রকম মডার্ন অটোমেটেড সিকিওরিটির ব্যবস্থা করা আছে। সেগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশদ আলোচনা করে একটা টেকনিক্যাল বই লিখলে 'মডার্ন সিকিওরিটি সিস্টেম'-এর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স প্রায় কাভার্ড হয়ে যাবে। সুতরাং নন্দরাম ও কুশিয়া জাতীয় এলিমেন্টরা যে নাস্তানাবুদ হবে এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তা ছাড়া 'ভিজিটর' রুমে গোপন সিকিওরিটির ব্যবস্থাটা একটু বেশি কড়া—লেভেল ফাইভ। এই লেভেল ফাইভ সিকিওরিটি আর আছে শ্রীধরের বেডরুমে।

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে সিকিওরিটি চিফের সঙ্গে কথা বললেন শ্রীধর।

'ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান। দুটো সেন্সলেস বডিকে ইন্টারোগেশান প্রসেস-এ পাঠাতে হবে। এ ছাড়া হ্যান্ড্রেড পারসেন্ট ফিজিক্যাল আর সাইকোলজিক্যাল স্ক্যানিং করতে হবে। ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধ্যে আমার ফুল অ্যান্ড ফাইনাল রিপোর্ট চাই। আন্ডারস্টুড?'

'পারফেক্টলি আন্ডারস্টুড, মার্শাল স্যার...।'

ফোন কেটে দিলেন শ্রীধর। কাচের দেওয়াল ভেদ করে কনফারেন্স রুম নাম্বার ওয়ানের দিকে নজর চলে গেল ওঁর। ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস এদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। বোধহয় এই ঘরে ঘটে যাওয়া রোমাঞ্চকর 'সিনেমা'টা পুরোটাই দমবন্ধ করে দেখেছেন। অবশ্য দেখেও সবকিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারেননি। যেহেতু ফোর্স ফিল্ড আর প্লাজমার ব্যাপারটা চোখে দেখা যায় না।

একমিনিটের মধ্যেই দুটো ম্যাগনেটিক মেটাল স্ট্রেচার নিয়ে চারজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড চলে এল। সঙ্গে সিকিওরিটি চিফ।

গার্ডদের হাতে গাঢ় সবুজ চাদরের মতো দুটো মোটা কাপড় ছিল। সেগুলো দিয়ে ওরা অজ্ঞান নন্দরাম আর কুশিয়াকে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে দিল। ওদের হাতজোড়া চাদরের মধ্যে বন্দি হয়ে গেল। চাদরে জ্যাকেটের মতো জিপ টানার ব্যবস্থা ছিল। গার্ডরা সেটা টেনে আটকে দিল। তারপর ওদের স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে স্ট্রেচারের লুকোনো ইলেকট্রোম্যাগনেট অ্যাক্টিভেট করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ চাদরের ভেতরে

লাগানো লোহার পাত চুম্বকের টানে স্ট্রেচারের সঙ্গে আটকে গেল। এখন কারও সাহায্য ছাড়া নন্দরাম আর কুশিয়া স্ট্রেচার ছেড়ে পালাতে পারবে না।

স্ট্রেচার দুটো নিয়ে ওরা পাঁচজন চলে যেতেই স্যাটেলাইট ফোন পকেটে ঢোকালেন শ্রীধর। তারপর হাততালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন। বেরিয়ে এলেন 'ভিজিটর' রুম ছেড়ে।

এবার রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে ওঁর ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে কথা বলতে হবে।

কনফারেন্স রুম নাম্বার ওয়ানে শ্রীধর পাট্টা যখন এসে ঢুকলেন, তখন ওঁকে দেখে রঙ্গপ্রকাশের মনে হল এতক্ষণ 'ভিজিটর' রুমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শ্রীধরের জীবনে যেন ঘটেনি—তিনি এতটাই স্বাভাবিক।

শ্রীধরও রঙ্গপ্রকাশকে দেখছিলেন। দেখে বুঝতে চাইছিলেন, শ্রীধরের শত্রু প্রতিরোধের অদ্ভুত পদ্ধতির লাইভ ডেমনস্ট্রেশান রঙ্গপ্রকাশ ঠিকঠাক দেখেছেন কি না।

রঙ্গপ্রকাশ যে সেটা দেখেছেন সেটা ওঁর মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন শ্রীধর। কিন্তু সামান্য হেসে অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'আসুন, ডক্টর—বসুন। আমাদের বাকি আলোচনাটুকু সেরে নিই। ওই যে, ইকনমিক ইনডেক্স...।'

আবার মুখোমুখি বসলেন দুজনে।

'ইকনমিক ইনডেক্সটাকে আপগ্রেড করার ব্যাপারে আপনি কিছু ভাবছেন?' গায়ের কালো টি-শার্ট থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে শ্রীধর পাট্টা জিগ্যেস করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করলেন। বোধহয় সঠিক উত্তর খুঁজতে চাইছিলেন। তারপর বললেন, 'ভেবেছি...তবে ডেফিনিট পথ কিছু খুঁজে পাইনি। ভাবছি...ভাবছি কারও কাছে লোন নেব...।'

'যদি তাই মনে হয় তা হলে নিন।' ভুরু উঁচিয়ে বললেন শ্রীধর, 'কিন্তু দেখবেন, আপনাকে লোন দিতে গিয়ে তার ই-আই-টা যেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে না চলে যায়।'

ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। কী সুন্দর কথা! সব জিনিসেরই বোধহয় একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থাকে। জীবনেরও। ভাবলেন ডক্টর।

যেমন শ্রীধরের মতে জিশানের দাম ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। না, ভুল ভেবেছেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের কাছে বোধহয় সবার জীবনের দামই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। শুধু নিজের জীবনটা ছাড়া।

'না, স্যার।' শ্রীধরের মন্তব্যের জবাব দিলেন, 'সেটা আমি খেয়াল রাখব...।'

খেয়াল রাখবেন বটে, কিন্তু রঙ্গপ্রকাশ টাকা ধার নেবেন কার কাছে? মনে-মনে বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের তালিকার ওপরে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন।

না:, সেরকম কেউ নেই। এমনকী শ্বশুরবাড়ির কথাও ভাবলেন। সেখানেও সমাধান অমিল। কারণ, পর্ণমালাদের বাড়ির অবস্থা এমন যে, রঙ্গপ্রকাশকে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর ওপরে তুলতে গেলে ওদের ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে যাবে।

এ ছাড়া, কারও কাছ থেকে লোন পেলেও রঙ্গপ্রকাশের আরও একটা সমস্যা রয়েছে। সিমানের যা লাইফস্টাইল তাতে লোন নেওয়া টাকা উড়িয়ে দিতে ও খুব বেশি সময় নেবে না। ই-ল্যান্ড আর কমপিটিশানের গেমগুলোই ওর দফারফা করে দেবে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আর মাত্র তিন মাস সময়। মানে নব্বই দিন। তার মধ্যে আজ একটা দিন পার হয়ে গেল। বাকি থাকবে উননব্বই দিন। তার মধ্যে যা হোক কিছু একটা করতে হবে।

শ্রীধর যেন ডক্টরের হিসেবটা মনে-মনে পড়ে ফেললেন। বললেন, 'আজকের দিনটা বাদ দিলে আর মাত্র উননব্বই দিন...। কাউন্ট ডাউনটা খেয়াল রাখবেন, ডক্টর...।'

আচ্ছা, শ্রীধরকে কি সিমানের কথা বলা যায়? বলা যায় উড়নচণ্ডী নেশাতুর ছেলের কথা? ওঁর কথা শুনে শ্রীধর হাসবেন না তো?

'একটা কথা বলব, স্যার?'

'কী কথা?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন শ্রীধর : 'বলুন...।'

শ্রীধর জানেন, রঙ্গপ্রকাশ কখনওই নিজের জন্য কোনও সুবিধে চান না। শ্রীধরের পার্সোনাল থেরাপিস্ট হওয়ার সুবাদে তিনি শ্রীধরের অনেক কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে অনেক সুযোগ চাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন—কিন্তু চাননি।

মানুষটার জন্যে শ্রীধরের করুণা হল। আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বড় জ্বালা!সবসময় অন্তরে-অন্তরে জ্বালিয়ে মারে। দেখি মানুষটা কী বলতে চায়। ভাবলেন শ্রীধর। যদি কোনও সুযোগ চায় বা টাকা ধার চায় তা হলে শ্রীধর এককথায় দিয়ে দেবেন। আজ কেন যেন ডক্টর বিশ্বাসের প্রতি শ্রীধরের দক্ষিণ্যের একটা ঝোঁক চেপেছে।

'আমার ছেলেকে ফেরানো যায় না?' রঙ্গপ্রকাশের গলাটা সর্বহারার মতো শোনাল।

শ্রীধর পাট্টা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। প্রশ্নটার অর্থ ওঁকে পাশ কাটিয়ে গেল।

'ফেরানো মানে?'

'ফেরানো মানে...' রঙ্গপ্রকাশ মরিয়া হয়ে বলতে শুরু করলেন। কার সামনে তিনি কী বলছেন সেটা ভুলে গেলেন : 'সিমান...মানে, আমার ছেলে...ও...ও খুব বাজে রাস্তায় চলে গেছে। ও নেশা করে। সুপারগেমস কর্পোরেশনের কমপিটিটিভ গেমসগুলোয় পাগলের মতো বাজি ধরে। ওকে...ওকে দেখে মনে হয়...মনে হয়...ওটাই জীবন। এসব ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই। ওর...ওর নেশার খিদে মেটাতে গিয়ে আমার সমস্ত সেভিংস তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমার ই. আই. ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে গেছে।' দু-হাতে মাথা আঁকড়ে ধরলেন রঙ্গপ্রকাশ। কান্নার দমক ছিটকে বেরোতে চাইল গলা দিয়ে। ওঁর চোয়াল দুটো ব্যথা করছিল, চোখ জ্বালা করছিল। কান্না চেপে কোনওরকমে বললেন, 'স্যার, বিশ্বাস করুন...আমাদের তিনজনের জীবনটাই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে গেছে। সিমানকে যদি ফেরাতে পারি তবেই আমি আর পর্ণমালা সবচেয়ে বেশি খুশি হব। বুঝব, আমাদের তিনজনের লাইফ ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর ওপরে উঠেছে। সেই জীবনগুলোকে নিয়ে বাঁচা যায়।' মাথা থেকে হাত সরালেন রঙ্গপ্রকাশ। সজল চোখে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আচমকা আবেগে শ্রীধরের হাত দুটো চেপে ধরলেন : 'স্যার, প্লিজ হেল্প করুন। আমার...আমার ছেলেটাকে ফেরানোর পথ বলুন। ওকে বাঁচান। প্লিজ, স্যার...।'

রঙ্গপ্রকাশ কান্নাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। ভেঙেচুরে গেলেন।

শ্রীধর পাট্টা দু:খী মানুষটার হাত থেকে নিজের হাত দুটো আলতো করে ছাড়িয়ে নিলেন। খানিকটা অবাক চোখে নিউ সিটির সাইকো অ্যানালিসিস সেন্টারের চিফ সাইকোলজিস্টকে দেখতে লাগলেন। সন্তানের ভালোর জন্য পিতার আকুলিবিকুলির মূল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চাইছিলেন। কিন্তু ঠিকঠাক পারছিলেন না। কারণ, শ্রীধর পাট্টা সংসারে একাকী। 'বাবা' ডাকের মর্মস্পর্শিতা কিংবা অন্তর্ভেদী শক্তি—দুটোর কোনওটাই শ্রীধরের জানা নেই। তাই নিথর নয়নে অসহায় মানুষটার দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের রেখার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর বললেন, 'ডক্টর, আই ফিল ফর য়ু। কিন্তু আপনি তো জানেন গেম শো হচ্ছে নিউ সিটির এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড। বিনোদনকে আমরা যে-লেভেলে নিয়ে গেছি সেটা আর কোনও সিটি পারেনি। আমাদের শহরের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ডিরেক্টলি কিংবা ইনডিরেক্টলি এইসব মাইন্ডব্লোয়িং গেমসের সঙ্গে জড়িত। আমাদের শহরের স্ট্রং ইকনমি এইসব গেমসের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি জানেন, পৃথিবীর কত শহর এই একটা কারণে আমাদের কীরকম ঈর্ষা করে! আমরাই দুনিয়ার এক নম্বর, ডক্টর বিশ্বাস, এক নম্বর! আর সেই একনম্বর শহরের নাগরিক আপনি—অন্তত এখনও। য়ু শুড ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট...।'

শ্রীধর থামলেন। ওঁর মুখ-চোখে লালচে আভা। আর তার সঙ্গে গর্বের ছটা।

'কিন্তু আমার...আমার ছেলেটা?'

পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করলেন শ্রীধর। শূন্যে মুখ উঁচিয়ে শিশি থেকে দু-ফোঁটা তরল জিভে ঢাললেন। টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চটাস-চটাস শব্দ করলেন দুবার। মাথাটা দুপাশে ঝাঁকালেন। ঘন-ঘন শ্বাস ফেললেন কয়েকবার। তারপর হাঁটুতে ছোট্ট চাপড় মেরে বললেন, 'কন্ট্রোল। কন্ট্রোলই হচ্ছে আসল। ভালো থাকার পাসওয়ার্ড। যে-কোনও ধরনের এক্সাইটমেন্টই একটা নেশার মতো। সেটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে সেটাকে স্ট্রং রেসিস্ট্যান্স দিয়ে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হয়...।'

শ্রীধর আরও অনেক কথা বলছিলেন, কিন্তু তার একটি বর্ণও রঙ্গপ্রকাশের কানে ঢুকছিল না। মনে হচ্ছিল, শ্রীধর কোনও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বই পড়ে শোনাচ্ছেন।

রঙ্গপ্রকাশের অন্তরে একটা হাহাকার ঢেউ তুলল। শ্রীধর কেতাবি জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন আর ওঁর প্রাণের ছেলেটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। মাপে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

এরপর যদি সিমানকে আর দেখতে না পাওয়া যায়!

এ-কথা ভাবামাত্রই রঙ্গপ্রকাশের শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি খেলে গেল। গায়ে কাঁটা দিল।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝলেন, শ্রীধর পাট্টার কাছে বিনোদন এবং বৈভব হল দুই 'শ্রদ্ধেয়' দেবতা। আর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতা তাঁদের বাহন।

একজন অসহায় আশঙ্কিত চুরমার পিতা বসে-বসে ভাবতে লাগলেন, কী করে তাঁর একমাত্র ছেলেকে সঠিক পথে ফেরানো যায়।

•

ঘরের বাইরে গ্লো-সাইন দিয়ে লেখা 'জয় রুম'। শুধু আনন্দের জন্য তৈরি ঘর।

ঘরের দেওয়ালগুলো সব কাচের তৈরি। কিন্তু সাধারণ কাচের নয়—আয়না-কাচ। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু আবছাভাবে দেখা গেলেও বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না—মনে হয় যেন আয়না।

বিশাল ঘরটার ভেতরে নানান রঙের ধোঁয়া উড়ে বেড়াচ্ছিল। সুতোর তৈরি সাপের মতো সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখাগুলো দেখে মনে হয় যেন কেউ শূন্যে স্বপ্নের জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

ঠিক স্বপ্ন না হলেও এই ধোঁয়া স্বপ্ন তৈরি করে। কারণ, নানান ধরনের ড্রাগ থেকে তৈরি এই নেশার ধোঁয়ায় ঘণ্টাখানেক কাটালে মাথা ঝিমঝিম করে, শরীরটা পাখির মতো হালকা মনে হয়। সচেতন মন আড়ালে চলে গিয়ে অবচেতন মন তখন রাজত্ব শুরু করে। সে তখন দু-কাঁধে দুটো সুন্দর ডানা লাগিয়ে দেয়। তারপর আচমকা এক উড়ান দিয়ে আশ্চর্য সব স্বপ্নের জগতে বেড়াতে নিয়ে যায়। ভাসতে থাকা শরীর আর ভাসতে থাকা মন তখন অপরূপ আনন্দের স্বাদ নিয়ে বেড়ায়।

সিমান সেই আনন্দের জগতেই ভেসে বেড়াচ্ছিল।

'জয় রুম'-এ হালকা মিউজিক বাজছিল। আর সেই তালে-তালে ঘরের চার দেওয়ালে আলোয় আঁকা চঞ্চল ঝরনার ছবি রং পালটাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমার রাতে অপরূপ এক জঙ্গলের মাঝে ঝরনা ঘেরা কোনও প্রাকৃতিক উদ্যানে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তিমিত মিউজিকের ফাঁকে-ফাঁকে ঝরনার কল্লোল শোনা যাচ্ছিল। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এলোমেলো ছন্দে শরীরে ঝাঁকুনি তুলছিল।

ওদের বয়েস সতেরো কি আঠেরো থেকে উনিশ-কুড়ির মধ্যে। পরনে আধুনিক রঙিন পোশাক। জিনস, স্লিভলেস, ক্যাপরি, কার্গো, হলটার, ভেস্ট, আরও কতরকম। হাতে-পায়ে, পিঠে কিংবা গলায়-গালে অনেকেরই ফ্লুওরেসেন্ট ট্যাটু আঁকা। কারও-কারও ট্যাটু লেসার হলোগ্রাম দিয়ে তৈরি। প্রযুক্তির কী এক কৌশলে সেগুলো শরীরের চামড়ায় একেবারে জড়িয়ে গেছে।

'জয় রুম'-টা মাপে বিশাল। কমপক্ষে তিরিশ ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট। তারই ঠিক মাঝখানটায় মিউজিক, আলো আর নাচের ব্যাপারটা চলছিল। সেখানে রঙিন ছায়া মাখা শরীর নিয়ে সিমান নাচছিল, আর ওপরদিকে নাক উঁচিয়ে ধরে বড়-বড় শ্বাস টানছিল। তাতে ওর নেশাটা আরও গাঢ় হচ্ছিল।

'জয় রুম'-এর মেঝেতে কৃত্রিম ঘাসের গালিচা পাতা। তার রং আর ধরন এমন যে, আসল ঘাসও হার মানবে। নাচতে-নাচতে তরুণ-তরুণীদের কেউ-কেউ—অথবা, কিশোর-কিশোরীদের কেউ কেউ—সেই ঘাসের মেঝেতে শুয়ে পড়ছিল। আবার একটু পরেই শরীর ভাঁজ করে ঝটকা মেরে উঠে পড়ছিল। তারপর নাচছিল।

হঠাৎই মিউজিক স্তিমিত হল। লুকোনো কোনও স্পিকার থেকে একটি মেয়ের মিষ্টি গলা শোনা গেল। গলাটা একইসঙ্গে মিষ্টি এবং নেশাতুর।

'ফোকস, নাউ উই স্টপ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক। নাচ আর বাজনা এবার শেষ। শুরু হবে হলোগ্রাম ফাইট গেম। তোমাদের হট ফেবারিট শো...।'

ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে খুশির হল্লা শোনা গেল। ছায়া-ছায়া মানুষগুলো 'জয় রুম'-এর মাঝখান থেকে সরে গেল দেওয়ালের দিকে। ফলে মাঝখানটায় বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গেল।

তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। রঙিন ধোঁয়ার সুতোগুলোর বেশিরভাগটাই কোনও লুকোনো সাকশান ফ্যান যেন মুহূর্তে গিলে নিল। এবং সেগুলো মিলিয়ে যেতেই ঘরের মেঝেতে দুটো আলোকিত শরীর জন্ম নিল।

লেসার দিয়ে তৈরি দুটো হলোগ্রাম শরীর। একটা লাল, অন্যটা নীল। দুটো শরীরই চাপ-চাপ পেশি দিয়ে তৈরি। ওদের পরনে শুধু ধপধপে সাদা দুটো জাঙ্গিয়া।

শরীর দুটোর মাঝে চার-পাঁচ হাতের দূরত্ব। ওরা লড়াইয়ের ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

স্কিন টাইট কালো পোশাক পরা আট-দশজন লোক 'জয় রুম'-এ ঢুকে পড়ল। ওদের বুকে 'জয় রুম'-এর ফ্লুওরেসেন্ট লোগো জ্বলজ্বল করছে। ওরা ইলেকট্রনিক প্যানেল বসানো চারটে কাউন্টার মূর্তি দুটোকে ঘিরে বসিয়ে দিল। ফলে লড়াকু দুজন যোদ্ধার জন্য একটি চৌকোনা এরিনা তৈরি হয়ে গেল। ঘরের হুল্লোড় করা ছেলেমেয়েগুলো ইলেকট্রনিক প্যানেলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

এখুনি হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হবে। শুরু হবে লাল আর নীলের লড়াই। র‍্যান্ডমাইজ করা সফটওয়্যার যোদ্ধা দুজনকে পরিচালনা করবে। দাবার চালের মতো লড়াইয়ের ছোট-ছোট চাল অ্যাক্টিভেট করবে। তবে কখন কোন চাল অ্যাক্টিভেটেড হবে কেউ বলতে পারবে না। তার কারণ র‍্যান্ডমাইজেশান।

কিন্তু এর পরেও একটা মজা আছে।

লড়াই দেখতে-দেখতে যে-কোনও দর্শক কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে লড়াইয়ের কোনও একটা মুভ অ্যাক্টিভেট করতে পারে। এর ফলে সফটওয়্যার জেনারেটেড র‍্যান্ডম সিকোয়েন্সের ধরন বদলে যেতে পারে। এবং তখন লড়াইটা হয়ে উঠবে আরও আনপ্রেডিক্টেবল।

স্বাভাবিকভাবেই এই হলোগ্রাম যোদ্ধা দুজন কখনও ক্লান্ত হয় না। তবে ওরা হাঁপায়, ওদের শরীরে ঘাম দেখা দেয়। স্পেশাল টেকনিক দিয়ে এগুলো ডিজাইন করা হয়েছে ফাইট গেমটাকে রিয়েলিস্টিক করার জন্য।

এই লড়াই চলবে ঠিক এক ঘণ্টা। তাতে যে-হলোগ্রাম ফাইটার পয়েন্টে জিতবে তার শরীরটা এরিনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যজন শুয়ে পড়বে মেঝেতে। উইনারের হয়ে যারা ইলেকট্রনিক প্যানেলে বোতাম টিপে লড়াইয়ের মুভ অ্যাক্টিভেট করেছে তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে। তাদের চিনে নেওয়া হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অটো-ম্যাচ টেকনিকের মাধ্যমে।

এ ছাড়া এই দুজন ফাইটারকে নিয়ে বাজি ধরায় কোনও বাধা নেই।

হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হল। তার সঙ্গে মানানসই সাউন্ড এফেক্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে নেশাতুর মানুষগুলো হাত-পা ছুড়ে চিৎকার শুরু করল।

'রেড! রেড!'

'ব্লু! ব্লু!'

একইসঙ্গে দর্শকদের অনেকেই কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে 'রেড' আর 'ব্লু'-র জন্য লড়াইয়ের নানানরকম মুভ অ্যাক্টিভেট করছিল। আর কালো পোশাক পরা লোকগুলোর কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে বাজি ধরছিল।

সিমানও চুপ করে ছিল না। উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে যুযুধান ফাইটার দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর থেকে থেকেই উল্লাসের চিৎকার করে কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপছিল। ওর চোখে হলোগ্রাম ফাইটারদের লাল-নীল ছায়া চঞ্চলভাবে নড়ছিল।

সিমানকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই লড়াইটাই ওর একমাত্র পৃথিবী। একটু আগেই ও 'রেড' ফাইটার জিতবে বলে আট হাজার টাকা বাজি ধরেছে। যদি ও জেতে তা হলে হাতে-হাতে পাবে ষোলো হাজার টাকা। তাতে আরও কিছুদিন আনন্দ আর ফুর্তি করা যাবে। বাবার কাছ থেকে ইদানীং হাতখরচের টাকা পেতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।

এ-কথাটা মনে হতেই সিমানের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব উথলে উঠল।

লড়াই ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। যোদ্ধা দুজন হলোগ্রাম ইমেজ হলে হবে কী, ওদের শরীর রক্ত-মাংসের শরীরের মতোই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। হাতে-কপালে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। মুখ দিয়ে যন্ত্রণার 'উ:! আ:!' শব্দও বেরোচ্ছিল।

ঘরের প্রায় সিলিং-এর কাছাকাছি শূন্যে ভেসে আছে একটা হলোগ্রাম স্কোরবোর্ড। তাতে ডিজিটাল হরফে নীল এবং লাল রঙে যথাক্রমে ব্লু এবং রেড-এর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে। লড়াইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পয়েন্ট বাড়ছে—কখনও লালের, কখনও নীলের।

সবকিছু মানুষের মতো হলেও হলোগ্রাম ফাইটাররা লড়াই করছিল অতিমানবের মতো। এমন সব মার কিংবা মারপ্যাঁচ ব্যবহার করছিল যা একমাত্র সিনেমার স্পেশাল এফেক্টের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব। ওদের লড়াইয়ের অভিনব মুভগুলো দেখতে-দেখতে দর্শকের দল উত্তেজনায় চিৎকার করছিল।

এসবের মধ্যে হঠাৎ করেই একটা গন্ডগোল শুরু হল।

কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টেপার দখল নিয়ে সিমানের সঙ্গে একটা মেয়ের ঝামেলা লাগল।



মেয়েটার চুলগুলো ছোট, খাড়া-খাড়া। চোখে সবুজ রঙের ফ্লুওরেসেন্ট কাজল। নাকে আর গলায় দুটো সোনার রিং। কপালে চকচকে কী একটা গুঁড়ো মাখা। তার কণাগুলো জোনাকির মতো ঝিকমিক করছে।

মেয়েটার গায়ে স্লিভলেস শর্ট জ্যাকেট। পায়ে লেদার স্ল্যাক্স, তার ওপরে মেটাল বাটন। ডানহাতে একটা ফানি চকোলেট স্টিক। সেটা মাঝে-মাঝে চুষছে।

ফানি চকোলেট স্টিকটা ঠিক নেশার জিনিস নয়। তবে এটার একটা বিশেষ গুণ আছে। অন্য কোনও কিছু থেকে একবার নেশা হলে ফানি চকোলেট স্টিক সেই নেশার ঝোঁককে বহুক্ষণ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

মেয়েটা সিমানকে একটা ধাক্কা মেরে জড়ানো গলায় বলল, 'য়ু স্কাম! ওই কন্ট্রোল প্যানেলের বাটনগুলো তোমার পার্সোনাল প্রপার্টি নয়। লেট মি প্রেস সাম...।'

সিমান রুখে দাঁড়াল কিন্তু মেয়েটার গায়ে হাত তুলল না। নেশা জড়ানো গলায় বলল, 'বোতাম টেপাটাও একটা কম্পিটিশান, সিসি। লড়াই করে জায়গা করে নিয়ে তোমাকে বোতাম টিপতে হবে...।'

'থ্যাংকস ফর দ্য অ্যাডভাইস। আমি ব্লু-র ওপরে এক লক্ষ টাকা বেট করেছি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ব্লু টু উইন। সো আই ওয়ান্ট দ্য উইনিং মুভস, ও.কে.? উড য়ু প্লিজ গেট লস্ট, ডিউড?'

'হু দ্য হেল আর য়ু?' মেয়েটার মুখের কাছে হিংস্র মুখ নিয়ে এল সিমান। ওর থুতনিতে একচিলতে দাড়ি। গালে একটা ছোট্ট লাল ফুল—লেসার ট্যাটু।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিমান : 'এখানে তোমাকে নতুন মনে হচ্ছে। য়ু ডোন্ট নো দ্য রুলস। কাম ব্যাক হোয়েন য়ু গ্রো আপ, বিচ!'

সিমান কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটা নোংরা গালিগালাজ করে উঠল এবং সিমানের গালে সপাটে এক চড় কষাল।

সিমান প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই একটা পালটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল মেয়েটার গালে। মেয়েটার হাত থেকে ফানি চকোলেট স্টিকটা পড়ে গেল।

তারপর যেটা শুরু হল সেটা কিল-চড়-লাথি-ঘুসির বিচিত্র লড়াই। কোনও পুরুষ এবং মহিলার এরকম অসভ্য লড়াই কল্পনা করাও কঠিন।

হলোগ্রাম ফাইটারদের অক্লান্ত লড়াই চলছিল। তাদের ঘিরে দর্শকদের হইহুল্লোড়ও চলছিল। কিন্তু তারই মধ্যে দশ-বারোজন সিমান এবং মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং বিনাপয়সার মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎই ওদের কেউ বাজি ধরার ব্যাপারটা শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতে লাগল। কেউ সিমানকে জেতার জন্য চিয়ার আপ করতে লাগল। আর কেউ মেয়েটাকে।

কিন্তু কেউই ওদের লড়াইটা থামাতে এগিয়ে এল না। বিশৃংখল উল্লাসে 'জয় রুম' তখন কাঁপছে।

সিমান আর মেয়েটির শরীর অক্ষত ছিল না। আঁচড়-কামড়ের চিহ্ন থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে ওদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা তুচ্ছ কারণে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লড়াই করছিল।

হঠাৎই একটি ছেলে 'স্টপ দ্য ফাইট! স্টপ ইট!' বলে চিৎকার করে উঠল। আরও একটি মেয়ে ছেলেটির সঙ্গে গলা মেলাল। ওরা দুজনে ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল, আর একইসঙ্গে 'ওদের থামাও! ওদের থামাও!' বলে চিৎকার করে চলল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন ছেলেটাকে লক্ষ্য করে গালাগাল ছুড়ে দিল। এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঘুসি।

ছেলেটা ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা অভদ্র ধাক্কা ওর পড়ে যাওয়াটা রুখে দিল। আর তারপরই অন্য এক অ্যাঙ্গেল থেকে কেউ ওকে লক্ষ্য করে আর-একটা ঘুসি চালাল।

তারপর ব্যাপারটা চলতেই থাকল। এবং শেষ পর্যন্ত ছেলেটা পড়ে গেল।

ছেলেটির প্রতিবাদী সঙ্গী মেয়েটিও রেহাই পায়নি। ওর কপালেও একইসঙ্গে কিছু খুচরো চড়-থাপ্পড় জুটেছে। ওর একটা চোখ ফুলে গেছে. নাকের পাশে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। ও কোনওরকমে ভিড়ের বৃত্তের বাইরে পালিয়ে আরও হেনস্থা থেকে বেঁচেছে।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে, সিমান আর ওই মেয়েটির মারপিট যেন একটা মজাদার সাসপেন্স সিনেমা। দু-একজন 'পাগল' ছাড়া কেউই চায় না সিনেমাটা মাঝপথে বন্ধ হোক।

কিন্তু সিনেমাটা একটু পরেই শেষ হল। শেষ করল মেয়েটাই। ও কখন যেন একটা মেটাল কি-রিং বের করে সিমানের গালে বসিয়ে টেনে দিয়েছে।

সিমানের গাল ফাঁক না হয়ে গেলেও ক্ষতটা যে মোটামুটি গভীর সেটা রক্তের ধারা এবং সিমানের যন্ত্রণার চিৎকার শুনে বোঝা গেল।

সিমান ভয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেল। একটা হাত আহত গালে চেপে ধরল। চোখে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা অপমান। আর তার সঙ্গে যন্ত্রণার অশ্রুজল।

সিমানের মুখটা দেখে মায়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু জনতার আচরণ দেখে মায়া ব্যাপারটা ওদের মধ্যে আদৌ আছে বলে মনে হল না।

হলোগ্রাম ফাইটার ব্লু এবং রেড তখনও লড়ছিল। হলোগ্রাম স্কোরবোর্ডের হিসেবে ব্লু তখন অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু স্কোর ওলটপালট হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

সিমানকে স্রেফ ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ের দল আবার হলোগ্রাম ফাইটের উত্তেজনায় ডুবে গেল।

সিমানের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে যাওয়া মেয়েটা অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে হাসাহাসি করছিল। আর পকেট থেকে একটা হিলিং স্প্রে বের করে নিজের শরীরের ক্ষতের ওপরে স্প্রে করছিল। তখন একটা ছেলে একটা সবুজ রঙের ফানি চকোলেট স্টিক মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা ওকে হেসে 'থ্যাংকস' জানাল, চকোলেট স্টিকটা চুষতে লাগল।

হলোগ্রাম ফাইট যতই শেষের দিকে এগোতে লাগল চিৎকার আর উত্তেজনার মিটার ততই চড়তে লাগল। সিমান ভিড়ের চক্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আহত নজরে লড়াই দেখছিল আর শরীরের কেটে-ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো মেরামত করার চেষ্টা করছিল। ওর বুকের ভেতরে টিপটিপ করে শব্দ হচ্ছিল। কে জিতবে? রেড, না ব্লু? ওর বাজি ধরা আট হাজার টাকা শেষ পর্যন্ত...।

হলোগ্রাম ফাইট শেষ হতেই চিৎকারের ফোয়ারা ছুটল। তার সঙ্গে তীব্র শিসের আওয়াজ, পশু-পাখির নকল ডাক।

যারা বাজিতে জিতেছে তারা পাগলের মতো হাত তুলে লাফাতে লাগল। আর যারা হেরেছে তাদের চিৎকার, লম্ভঝম্প সব স্তিমিত হয়ে গেল।

রেড ফাইটার শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ব্লু ফাইটার বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাত তুলে নাড়ছে, এরিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়েই সিমান ভেঙে পড়ল। কাঁদতে শুরু করল। তারপর ওই অবস্থাতেই বসে পড়ল নকল ঘাসের মেঝেতে।

আট হাজার টাকা গেল! এখন তো সম্বল বলতে কিছুই প্রায় নেই! কাল যখন নেশার টানে মনটা আকুলিবিকুলি করবে তখন কী করবে ও? 'জয় রুম'-এর এন্ট্রি ফি কোথা থেকে পাবে? টাকা চেয়ে বাবার কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আর মা? মা তো ওর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনও কথাই বলে না!

তা হলে?

আগামীকালের নেশার তেষ্টার কষ্টটা সিমান যেন এখন থেকেই টের পেতে শুরু করল। ওর গলা শুকিয়ে এল। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ তৈরি হল। আর একইসঙ্গে দু-চোখে জলের ধারা বইতে লাগল।

কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর সিমান চোখ মুছল। নাক টানল কয়েকবার। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

না, হাল ছাড়লে চলবে না। ওর কাছে সামান্য যা কিছু টাকা আছে সেটাকেই পুঁজি করে আগামীকালের সন্ধেটা শুরু করতে হবে। যদি ও কয়েকটা ছোট-ছোট বাজি জিততে পারে তা হলেই আর চিন্তা নেই।

কিন্তু ভাগ্য ওকে সাহায্য করবে তো? ও পারবে তো জিততে?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে ভাঙাচোরা সিমান 'জয় রুম' থেকে বেরিয়ে এল।

•

গেম পার্টিসিপ্যান্টস ক্যাম্পাসের জীবন জিশানের অসহ্যরকম একঘেয়ে লাগছিল। সারাটা দিন ধরে শুধু অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিমের ট্রেনিং, নানান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, অ্যাথলেটিক অপারেশানস, কিল গেম সিমুলেটর-এ ট্রেনিং আর সাইকোলজিক্যাল সেশান। এরই ফাঁকে বিকেলে দেড় ঘণ্টার ব্রেক। তখন জিশান আর অন্য পার্টিসিপ্যান্টসরা নানান খেলাধুলো আর আড্ডা-গল্পে মেতে ওঠে।

আড্ডা মারার সময় বা গল্প করার সময় জিশান অবাক হয়ে খেয়াল করে ও হাসছে, আর অন্যান্য প্রতিযোগীও তার ব্যতিক্রম নয়। ওদের কেউ-কেউ বেশ জোরে-জোরে হেসে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাচ্ছে, কোন পরিস্থিতির মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের মাথার ওপরে ঠিক কী ধরনের এবং কতটা ধারালো খাঁড়া ঝুলছে।

পিট ফাইটের পর একমাস সাতদিন পার হয়ে গেছে। জিশান আরও একমাস সাতদিন এগিয়ে গেছে কিল গেমের দিকে। ওর এটা ভালো লাগছিল। কারণ, মিনি আর শানুর সঙ্গে ওর দেখা হবে কি হবে না তার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে চলেছে। এবং তার পরই ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে শান্তিপূর্ণ জীবন। মিনি-শানুর কাছে ফিরে যেতে পারলে যেমন ওর শান্তি, তেমনই ফিরে যেতে না পারলেও যেখানে ও যাবে সেখানে চিরপ্রশান্তি।

ঘুমের ঘোরে এসব কথা ভাবছিল জিশান। তখনই অটোমেটিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি মেয়েটার মিষ্টি গলা শুনতে পেল ও।

'জিশান! জিশান—ওঠো। ভোর হয়েছে...।'

জিশান চোখ খুলল। একটা হাই তুলে উঠে বসল বিছানায়।

প্লেট টিভি 'অন' হয়ে গেছে। তার রঙিন 'পরদানশিন' মেয়েটি মুখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে জিশানকে ডাকছে।

আশ্চর্য! জিশানের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়ে বলল, 'গুড মর্নিং। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও। মার্শাল স্যার ঠিক সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ওই ইমার্জেন্সি স্পেশাল মিটিং-এর পর তোমার অ্যানালগ জিমের শিডিউল শুরু হবে...।'

জিশান বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট।

মেয়েটা মনে হল সরাসরি জিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জিশানের ভিডিয়ো ইমেজ ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

অসম্ভব কিছু নয়। লুকোনো ক্যামেরা আর আধুনিক প্রযুক্তি যদি হাতে হাত মেলায় তা হলে ব্যাপারটা জলের মতো সহজ।

জিশান মেয়েটির চোখে চোখ রেখে সামান্য জড়ানো গলায় বলল, 'ও.কে.—থ্যাংক য়ু। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি...।'

টিভির পরদার আলো দপ করে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্লেট টিভি অফ হয়ে গেছে।

জিশান তৈরি হতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে ভাবতে লাগল, শ্রীধর পাট্টা আবার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন।

জিপিসির বাইরে বেরোনোর জন্য ওকে শাস্তি দিতে ডেকেছিলেন শ্রীধর। চুলকুনি অস্ত্র দিয়ে অভিনব শাস্তি। কিন্তু তারপর তো চার দিন পার হয়ে গেছে! এর মধ্যে তো জিশান কোনওরকম গোলমাল করেনি! বরং ভালো ছেলের মতো নিয়ম করে রোজকার রুটিন মেনে চলেছে।

তা হলে?

প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল শ্রীধর পাট্টার অফিসে গিয়ে।

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর একুশতলায় শ্রীধরের অফিস। এই ভোর সাতটাতেও অফিসটার চরিত্র সকাল এগারোটার মতন।

অফিসঘরে জিশানকে ঢুকিয়ে দিয়ে পিস ফোর্সের 'বোবা' গার্ডরা চলে গেল। আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে পা দিয়েই জিশান বিমূর্ত সৌন্দর্যের ধাক্কা খেল।

এত সুন্দর করেও একটা অফিসঘর সাজানো যেতে পারে!

ও হতবাক হয়ে ঐশ্বর্যময় অফিসঘরটাকে দেখছিল। ঘরের ডানপাশে একটা ফুলের বাগান। ফুটপাঁচেক চওড়া—গোল রিং-এর মতো। একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের স্তম্ভকে ঘিরে খুব ধীরে ধীরে চক্রের মতো ঘুরছে।

বাগানে ছোট-ছোট ফুলের গাছ—তাতে রঙিন ফুল। এরকম সুন্দর প্রজাপতির মতো ফুল জিশান জীবনে দেখেনি।

বাগানের ঠিক ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ফ্যান টেইলড লাভ-বার্ড। অন্তত জিশানের দেখে তাই মনে হল।

পাখিগুলো কিচকিচ করে ডাকাডাকি করছে, বাগানের ওপরে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে উড়ছে—এখানে-ওখানে বসছে, কিন্তু কোনও অদৃশ্য মন্ত্রবলে যেদিকে-সেদিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না।

এমনটা ভাবার কারণ, কোনও জাল কিংবা খাঁচাজাতীয় বস্তু জিশানের চোখে পড়ছে না।

বাগানের উলটোদিকের দেওয়ালে ঝরনার জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। আলো পড়ে চিকচিক করছে। তার সঙ্গে জলের মৃদু কলকল শব্দ। এই ঝরনাকে পটভূমিতে রেখে অদ্ভুত স্টাইলে সাজানো রয়েছে আটটা বড় মাপের টিভির পরদা। তাতে নিউ সিটির কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দেখা যাচ্ছে।

ঘরের সিলিংটা অনেকটা ওলটানো কড়াইয়ের মতো। তাতে নীল আর সাদা ধোঁয়ার ছায়া আকাশের আভাস তৈরি করেছে। তার মধ্যে ছোট-ছোট হলদে আলোর ফুটকি জ্বলজ্বল করছে। যেন অসংখ্য তারা ঘরের আলোর জোগান দিচ্ছে।

ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র স্বচ্ছ পলিমারের তৈরি। তার মধ্যে হালকা নীলরঙের আভা জ্যান্ত সাপের মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটা বিশাল টেবিলের ওপারে পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছেন শ্রীধর পাত্রা। ওঁর উলটোদিকে ছ'টা চেয়ার। তার মধ্যে চারটে চেয়ার খালি—ডান-দিকের শেষ দুটো চেয়ারে বসে রয়েছেন দুজন হোমরাচোমরা বয়স্ক মানুষ। ওঁদের ফিটফাট পোশাক আর বয়স্ক চেহারা দেখেই জিশান ওদের হোমরাচোমরা বলে আন্দাজ করেছে।



দুজনেরই মাথায় টাক। চোখে চশমা। চর্বি ঠাসা গাল ঝুলে পড়েছে। মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ।

শ্রীধরের টেবিলের সব জিনিস বেশ সুন্দর করে সাজানো। পেন, স্যাটেলাইট ফোন, রাইটিং প্যাড, মিনারেল ওয়াটারের সিপার ইত্যাদি এমনভাব সাজানো যেন কেউ ওগুলো বিক্রির জন্য দোকান সাজিয়ে বসেছে।

টেবিলের ডানদিকে একটা আর্ক কম্পিউটার মনিটর। তার কিবোর্ডের ওপরে শ্রীধরের ডানহাতের আঙুল নড়ছিল। জিশানকে দেখে আঙুল থামল। শ্বেতপাথরের মুখে সামান্য হাসি ফুটল।

'এসো, জিশান—এসো। বোসো—।' শ্রীধর উষ্ণ আহ্বান জানালেন।

জিশান টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। বসে থাকা দুই প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটা চেয়ারের তফাত রেখে বসে পড়ল।

বসে পড়ার পরেও জিশান লাভ-বার্ডগুলোর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। ওদের ওড়াউড়ি দেখছিল। আর অদৃশ্য খাঁচাটার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

সেটা লক্ষ করে শ্রীধর বললেন, 'ওগুলো ফ্যান টেইলড লাভ-বার্ড। জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। ওদের জোড়ের একটা মারা গেলে অন্যটাও দু-চারদিনের মধ্যে দু:খে মারা যায়।'

জিশান একটু হাসল, মাথা নাড়ল : 'জানি। আমি ওদের খাঁচাটা দেখার চেষ্টা করছি।'

শ্রীধর শব্দ করে হাসলেন। জিশানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'দেখতে পাবে না। কারণ, খাঁচাটা ইনভিজিবল। ওটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে তৈরি। পাখিগুলো একটা স্ফিরিক্যাল ফোর্স ফিল্ডের ক্যাভিটির মধ্যে আছে। এলাকার বাইরে গেলেই ওরা স্ট্রং ফিল্ডটা সেন্স করতে পারে। তখনই চট করে কমফোর্টেবল জোনে ফিরে আসে।' স্বচ্ছ টেবিলে আঙুলের ডগা ঠুকলেন শ্রীধর : 'এই অদৃশ্য খাঁচা আমাদের সায়েন্টিস্টদের আবিষ্কার। দারুণ, না?'

'হুঁ, দারুণ—।' জিশান বলল।

কিন্তু জিশানের কথা ছাপিয়ে দুই প্রৌঢ়ের সম্মিলিত গলা শোনা গেল, 'একসিলেন্ট, স্যার, একসিলেন্ট। আপনার ইনভেন্টিভ পাওয়ার রিয়েলি একস্ট্রর্ডিনারি—।'

জিশান চাটুকার দুজনের দিকে একবার তাকাল।

জিশান না হয় এই অদ্ভুত খাঁচা প্রথম দেখছে, কিন্তু এঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা নতুন দেখছেন না! তা হলে এই চাটূক্তির মানে কী? 'চাটুকার' শব্দটা কী 'চাটা' থেকে তৈরি হয়েছে?

মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। নিউ সিটির একনম্বর এবং দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট। শ্রীধর পাট্টার পা চাটার ব্যাপারেও ওঁরা একনম্বর এবং দু-নম্বর।

এই প্রৌঢ় দুজন কি তা হলে তিননম্বর এবং চারনম্বর?

বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল জিশানের।

'বিজ্ঞানীদের কেউ-কেউ শাসকদের পা চাটতে পারে—কিন্তু জেনে রাখিস জিশু, বিজ্ঞান কখনও কারও পা চাটে না—।'

জিশান পাশে বসে থাকা লোকদুটোর দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল। তারপর শ্রীধর পাট্টার চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, 'বলুন, আমাকে কেন ডেকেছেন?'

'শরীর কেমন আছে?' মোলায়েম গলায় পালটা প্রশ্ন করলেন শ্রীধর।

জিশান ভীষণ অবাক হল। ওর শরীরের খবর নিচ্ছেন শ্রীধর। ঠিকাদার যেমন মাটি-কাটা শ্রমিকের শরীরের খবর জানতে চায়, সেরকম? নতুন কী 'মাটি-কাটা'র কাজ রয়েছে জিশানের জন্য?

'ভালো।' ছোট্ট উত্তর দিল জিশান।

'গুড। একটু কফি খাও—।' বলে স্যাটেলাইট ফোন তুলে নিয়ে কাকে যেন ফোন করলেন। চারজনের জন্য কফি আর কুকিজ চেয়ে পাঠালেন।

তারপর : 'জিশান, এবারে কাজের কথায় আসি। আমাদের কোর কমিটির মিটিং-এ কিল গেমের তারিখ মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, রবিবার।'

জিশানের শরীরের ভেতরে বরফ-জলের স্রোত বয়ে গেল। অথচ এই স্রোতটা বয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু গত তিনমাস ধরে সবই ওর জানা।

জিশান অবাক হল। 'ফাঁসি' হবে এটা নিশ্চিতভাবে জানা থাকা সত্বেও 'ফাঁসি'র তারিখটা শুনলে এরকম হয়? ড্যাশ, কমা, কোলন, সেমিকোলন যতই থাক না কেন ফুল স্টপের ওজনই আলাদা। কিল গেমের এই তারিখটা যেন সেই ফুল স্টপ।

জিশানের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখের সামনে শ্রীধর পাট্টার ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেল। বরফ-জলের হিমশীতল স্রোতটা এখন শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে।

সেকেন্ড সেপ্টেম্বর। ফুল স্টপ।

'...দিনটা মোটামুটিভাবে ঠিক হয়েছে। এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাইনাল হয়নি।' শ্রীধর তখনও কথা বলছিলেন।

জিশান বুঝতে পারছিল, শ্রীধরের কিছু কথা ও মিস করেছে—যেহেতু ওর মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না।

'...তবে দু-তারিখটায় যদি কোনও প্রবলেম হয় তা হলে আমরা নাইনথ সেপ্টেম্বরে শিফট করব। কারণ, দিনটা রোববার হওয়াটা খুব জরুরি। বুঝতেই পারছ—আমাদের অসংখ্য ভিউয়ার্স দরকার। তা ছাড়া স্পনসরদের কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার। আর তুমি যদি জিতে যাও—' হাসলেন শ্রীধর : 'তা হলে একশো কোটি টাকার প্রাইজ মানি তো আছেই!'

জিশান সম্মোহিতের মতো চুপচাপ বসে ছিল। শ্রীধরের কথা শুনছিল। কিন্তু ও এখনও বুঝে উঠতে পারছিল না শ্রীধর পাট্টা কেন ওকে সাতসকালে ওঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই ও অপেক্ষা করছিল।

'জিশান—' চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন শ্রীধর : 'আমরা এবার কিল গেমের প্রোমোশনাল পাবলিসিটি শুরু করতে চাই। তুমি হয়তো টিভিতে দেখেছ তোমার কিছু-কিছু ভিডিয়ো ক্লিপিংস আমরা নানারকম প্রোডাক্টের অ্যাডে ব্যবহার করছি। কিন্তু এবার আমরা ফুল সুইং-এ ক্যাম্পেন শুরু করতে চাইছি। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে তোমাকে আমরা ব্যবহার করব—অবশ্য তার জন্যে তুমি পয়সা পাবে। এ ছাড়া কিল গেমের পাবলিসিটিতেও তোমাকে ভাগ নিতে হবে।

'তুমি হয়তো জানো না, আমাদের কিল গেমের যে-লাইভ টেলিকাস্ট আমরা করি তার ভিউয়ার্সের সংখ্যা বিলিয়নস-এ হিসেব করতে হয়। টিভি আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই এক্সাইটিং গেম একেবারে জ্যান্ত হয়ে ঢুকে পড়ে সবার ঘরে। সুতরাং, তুমি রাতারাতি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবে। একবার ভাবো তো! কোথায় তুমি ওল্ড সিটিতে একটা কেন্নোর মতো ধুঁকে মরছিলে...সেখান থেকে একেবারে ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি! তুমি ভাবতেই পারছ না..।'

শ্রীধরের কথা শেষ হওয়ার আগেই জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : 'যদি আপনার আর কোনও কাজের কথা না থাকে তা হলে আমি এবার যাব—।'

শ্রীধর পাট্টা ভুরু উঁচিয়ে সামান্য কৌতুকের চোখে জিশানের দিকে তাকালেন। তারিফের গলায় বললেন, 'দিস ইজ হোয়াট আই লাইক অ্যাবাউট য়ু। জোশ। তেজ। অথচ কুল ব্রেইন। এই ফ্যাকালটিগুলো তোমাকে নানান গেমে জিততে হেলপ করেছে—' চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীরটাকে দোলাতে লাগলেন : 'বোসো, বাবু জিশান। শোনো আমার প্ল্যান...।' এবার হাত দিয়ে জিশানকে বসতে ইশারা করলেন : 'বোসো, বোসো...।'

জিশান বসে পড়ল আবার। তবে ওর মুখের বিরক্ত ভাবটা গোপন রইল না।

'কেন তোমাকে এত কথা বলছি শোনো—' ছোট বাচ্চাকে বোঝানোর মতো করে বলতে শুরু করলেন শ্রীধর, 'কিল গেমের মোটামুটিভাবে একমাস আটদিন বাকি। এই সময়টা আমরা ইনটেনসিভ প্রোমোশনাল ক্যাম্পেন করতে চাই। আমরা ফুল সুইং-এ যে-ক্যাম্পেন শুরু করতে চলেছি তাতে সবসময় তোমাকে দরকার হবে। ফলে তোমাকে নিউ সিটির হরেক জায়গায় নানান প্রোগ্রামে যেতে হবে। তোমার ওপরে নজরদারির জন্য সর্বক্ষণ দু-চারজন গার্ডকে মোতায়েন রাখাটা আনইকনমিক এবং ইরিটেটিং। তা ছাড়া ব্যাপারটা নিউ সিটির সিটিজেনদের চোখে ভালোও ঠেকবে না। বরং তুমি যদি স্বাধীনভাবে সব জায়গায় যেতে পারো, সব প্রোগ্রাম, অ্যাড ক্যাম্পেন অ্যাটেন্ড করতে পারো সেটা অনেক বেটার। মানুষ দেখবে স্বাধীন জিশান পালচৌধুরী নিউ সিটির যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্যাট উইল বি গ্রেট, তাই না?'

জিশানের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর পাট্টা।

য়ুনিফর্ম পরা একজন লোক ট্রলি নিয়ে ঢুকল ঘরে। স্বচ্ছ কাপ-প্লেটে রাখা কফি আর কুকিজ সাজিয়ে দিল চারজনের সামনে। শ্রীধর ইশারায় সবাইকে কফি নিতে অনুরোধ করলেন। ওরা কাপে চুমুক দিতে শুরু করল।

কফির স্বাদটা তেতো লাগল জিশানের। ও একটা কুকিজ তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

স্বাধীনতা? এই নামের কোনও বস্তু হয় নাকি শ্রীধর পাট্টার রাজত্বে?

জিশান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও দেখল, ওর পাশে বসা প্রৌঢ় দুজন অল্প-অল্প হাসছেন, শ্রীধরের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ছেন।

'হ্যাঁ, জিশান, তোমাকে আমি ফ্রিডম দেব...' আবার কথা বলতে শুরু করলেন শ্রীধর, 'তবে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম নয়—কন্ট্রোলড ফ্রিডম। মানে, তুমি স্বাধীনভাবে যতই ঘোরাফেরা করো না কেন একটা প্রিঅ্যাসাইনড টাইমে তোমাকে জিপিসির গেস্টহাউসে ফিরে আসতেই হবে। রোজ। আর তুমি ফিরে আসবে নিজে-নিজে—কাউকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে হবে না। যেভাবে শুয়োর নিজে থেকে খোঁয়াড়ে ফিরে আসে। কী, তাই তো?' শেষের প্রশ্নটা করলেন প্রৌঢ় দুজনের দিকে তাকিয়ে।

প্রৌঢ় দুজন হেসে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।

জিশান একটু ধন্দে পড়ে গেল। কন্ট্রোলড ফ্রিডম জিনিসটা আবার কী?

শ্রীধর প্রৌঢ় দুজনের দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, 'এরা হলেন আমাদের টেকনিক্যাল কমিটির চিফ আর আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড। কন্ট্রোলড ফ্রিডমের বুদ্ধিটা ওঁরাই বের করেছেন। দারুণ বুদ্ধি, তাই না, জিশান? সারাটা দিন তুমি স্বাধীনভাবে খুশি মতো ঘুরে বেড়াবে, আর সময় হলেই নিজে-নিজে ফিরে আসবে, গুটিগুটি ঢুকে পড়বে খাঁচায়...।'

কথা শেষ করে হেসে উঠলেন শ্রীধর।

কীভাবে এটা সম্ভব? জিশান চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগল।

ঠিক তখনই ফ্যান টেইলড লাভ-বার্ডগুলো জোরে-জোরে ডেকে উঠল।

জিশান ভাবল, ওর জন্য হয়তো নতুন ধরনের কোনও ফোর্স ফিল্ডের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীধর। ওই পাখিগুলোর মতো।

কিন্তু সেটা কী?

•

জিশান মনে-মনে কন্ট্রোলড ফ্রিডমের গূঢ় অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু রহস্যটা ভেদ করতে না পেরে তিনজন মানুষের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। ওঁদের হাবভাব আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে রহস্যের সমাধানটা আঁচ করার নি:শব্দ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জিশানের মুখে একটা অসহায় বোকা-বোকা ভাব ফুটে উঠেছিল। শ্রীধর পাট্টার দিকে তাকিয়ে ও বুঝল শ্রীধর সেটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন।

জিশান আর ভাবতে পারছিল না। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করল। অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই শ্রীধরের কথা শুনতে পেল ও।

'আমিই জিশানকে ব্যাপারটা খুলে বলছি। যদি টেকনিক্যাল কোনও পয়েন্ট আমি মিস করি তা হলে সেটা আপনারা—প্লিজ—জুড়ে দেবেন...।'

জিশান মুখ তুলল।

শ্রীধর সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। ঠোঁটে একচিলতে হাসির ছোঁয়া। ওঁর ঠিক পিছনেই বিশাল জানলা। ফটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। এই প্লেটের প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের প্রতিসরাঙ্কের ভীষণ কাছাকাছি। ফলে প্লেটটা লাগানো আছে কি নেই সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ভোরের নীল আকাশ। তার সঙ্গে হাইরাইজ কয়েকটা বাড়ির জ্যামিতি।

আকাশে খেয়ালি মুডে ভেসে বেড়ানো বাচ্চা-বাচ্চা মেঘ। আর কখনও-কখনও তাদের চিরে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্যস্ত শুটার।

ঝরনার জলের কলকল শব্দ কানে আসছিল, আর লাভ-বার্ডগুলোর কিচকিচ। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শ্রীধর মুখ খুললেন।

'জিশান, আজ রাতে তোমাকে আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের ''রিমোট অপারেশানস'' ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার ওপরে প্রথমে ''গ্রিন টেস্ট'' করা হবে। যার পারপাস হল, তোমার শরীরের সুটেবিলিটি পরীক্ষা করা যে, তুমি কন্ট্রোলড ফ্রিডম প্রোগ্রামটা নিতে পারবে কি না।'

' ''গ্রিন টেস্ট''-এ কোয়ালিফাই করে গেলে তারপর আসল অপারেশান। একটা পলিমার কোটেড সিলভার ক্যাপসুল...।'

শ্রীধর হঠাৎই থমকে গেলেন। চওড়া করে হেসে বললেন, 'না:, থাক—আর কিছু বলব না। য়ু ফাইন্ড আউট ইয়োরসেলফ।' সামনে ঝুঁকে এলেন : 'তুমি জানো, জিশান, লাইফ কেন এত ইন্টারেস্টিং?'

জিশান চুপ করে রইল। পাশের প্রৌঢ় দুজনও চুপচাপ। তবে একজনের চোয়াল নড়ছে। তিনি কিছু একটা চিবোচ্ছেন।

শ্রীধর টেবিলে আঙুলের টোকা মারলেন। ভুরু উঁচিয়ে জিশানের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'জিশান, লাইফ ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ...বিকজ ইট ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেস। আমাদের জীবনে অনেক লুকোনো চমক থাকে যেগুলো আমাদের বাঁচার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তুমি আমাদের চেয়ে অনেক লাকি, কারণ, তোমার লাইফে চমকের সংখ্যা অনেক বেশি—অন্তত তুমি নিউ সিটিতে আমাদের হাতে এসে পড়ার পর। আমি এই একটা চমক তোমার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম। আজ রাতে...দশটার সময়...তুমি যখন ''রিমোট অপারেশানস'' ল্যাবে যাবে তখনই জানতে পারবে, ''কন্ট্রোলড ফ্রিডম''-এর রহস্য। সো, য়ু মে লিভ নাউ। তোমার এখন ছুটি...।'

শ্রীধর আচমকা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মিটিং শেষের ইঙ্গিত।

জিশানও উঠে দাঁড়াল। একইসঙ্গে প্রৌঢ় দুজনও।

শ্রীধর জিশানের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রৌঢ় দুজনকে বললেন, 'তা হলে রাত দশটায় জিশান আপনাদের চার্জে যাচ্ছে...।'

দুজনের মধ্যে একজন প্রৌঢ় বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না, স্যার—আমরা তৈরি আছি।'

শ্রীধর ছোট্ট করে হাসলেন। এই নিউ সিটিতে সবসময় তৈরি থাকাটাই দস্তুর।

•

চারজন সিকিওরিটি গার্ড জিশানকে 'রিমোট অপারেশানস' ল্যাবে পৌঁছে দিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল জিশান। কাঁটায়-কাঁটায় সওয়া দশটা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই গোটা ল্যাবটা প্রায় দেখা যাচ্ছিল। তার কারণ, চারদিকে শুধু কাচ আর কাচ। দরজা থেকে শুরু করে ল্যাবের সব দেওয়ালই কাচের। তার কোথাও-কোথাও স্টেইনলেস স্টিলের ফিটিংস আর কোথাও বা রঙিন পলিমার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড জিশানের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকটিভ টারমিনালে কথা বলেছেন। 'রিমোট অপারেশানস' ল্যাবের নানান টেস্ট আর ল্যাবের কাজকর্ম নিয়ে জিশানকে একটা ওপর-ওপর ব্রিফিং দিয়েছেন।

ওঁর কাছ থেকেই জিশান জেনেছে, এই ল্যাবের বিভিন্ন সাব-ল্যাবের চার্জে যাঁরা-যাঁরা আছেন তাঁরা ইচ্ছেমতো নিজের-নিজের অংশের কাচের দেওয়ালগুলোকে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ করতে পারেন। অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ কাচকে অস্বচ্ছ করতে চাইলে ন্যানোঅপটিকস প্রযুক্তির জোরে চোখের পলকে সেই কাচটাকে সুপার-পোলারাইজড করে দেওয়া হয়। ব্যস, কাজ শেষ।

প্রযুক্তির এই অভিনব 'ম্যাজিক'গুলো শেষ পর্যন্ত মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার করা হলে কত ভালো হত!

জিশানের বুকে ছোট্ট অথচ তীব্র একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল।

ঢোকামাত্রই জিশানকে ল্যাবের টিম টেকওভার করল।

ওকে প্রথমে পাঠানো হল স্টেরিলাইজিং স্ক্যানারের মধ্যে দিয়ে। তারপর কাচের গোলকধাঁধার ভেতরে এ-পথ সে-পথ দিয়ে হেঁটে অনেক ঘোরপ্যাঁচের পর ওকে তারা নিয়ে গেল একটা ল্যাবে।

ল্যাবের দরজায় লাগানো এল. সি. ডি. প্যানেলে লেখা 'ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব'।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বিশাল বড় মাপের একটা কাচের ঘর। ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা সুন্দর মসৃণ কন্ট্রোল প্যানেল। তার ওপরে বেশ কয়েকটা সি. আর. টি. স্ক্রিন আর ডিজিটাল মিটার লাগানো। তাতে নানান গ্রাফ আর সংখ্যা নাচানাচি করছে।

প্যানেল থেকে হাত তিনেক দূরে একটা লম্বা টেবিলে তিনটে লার্জ স্ক্রিন আর্ক কম্পিউটার। সেগুলোর সামনে বসে দুজন অপারেটর।

বাঁ-দিকে একটা ছোট কন্ট্রোল প্যানেল আর তার সামনে একটা বড় মাপের অদ্ভুত চেয়ার।

অদ্ভুত এই কারণে যে, চেয়ারটা দেখতে অনেকটা ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো হলেও আসলে তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। চেয়ারটার হাতলের কাছে বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি। পায়ের কাছেও কতরকম কনট্র্যাপশন আর অ্যাটাচমেন্ট।

সব দেখেশুনে জিশানের মনে হল, চেয়ারটা যেন কোনও ধর্মীয় পবিত্র বস্তু, কোনও 'জাগ্রত' দেবতার সিংহাসন—আর নানান মানুষ তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় ঢিলের বদলে নানান যন্ত্রপাতির টুকরো চেয়ারটার গায়ে বেঁধে দিয়ে গেছে।

চেয়ারের ঠিক পাশটিতে কাঠ-কাঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ভীষণ রোগা তরুণী। পরনে হলুদ চুড়িদার, তার ওপরে বাদামি রঙের লেস দিয়ে বোনা একঝাঁক গোলাপ। গলায় একটা হলুদ ওড়না সাপের মতো প্যাঁচানো।

জিশান মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বয়েস কত হবে? খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। ওর রিমিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়েটির রং কেমন যেন ফ্যাকাসে ধরনের ফরসা। বেশ রোগা হলেও লম্বা। ছোট্ট মুখ—অনেকটা পুতুলের মতো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। প্রজাপতির কোমল ডানার মতো নাকের দুপাশে মেলে আছে।

রিমিয়া খুব স্বপ্ন দেখত। আর এই মেয়ের চোখ দুটো স্বপ্নের মতো—এবং স্বপ্ন দেখানোর মতো।

ওর গলায় বাদামি ক্রিস্টালের একটা মালা। চোখের জলের মতো চিকচিক করছে। আর বাঁ-হাতের অনামিকায় একটা চিকন আংটি।

মেয়েটি এত চুপচাপ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে যে, জিশান ওকে প্রায় পুতুল বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। ঠিক তখনই মেয়েটি জিগ্যেস করল, 'তুমি জিশান তো?'

প্রশ্নের সপ্রতিভ ঢঙে জিশান অবাক হয়ে গেল। বহুদিনের চেনা মানুষ এইভাবে প্রশ্ন করে। ওর একটু অস্বস্তি হল, কারণ, ল্যাব টিমের তিনজন মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে জিশানের পিছনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। আর কম্পিউটারের সামনে দুজন।

জিশান সহজভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ, আমি জিশান—।'

'আমি ডক্টর সুধাসুন্দরী...না, না, হেসো না—' হাত তুলে ইশারা করল মেয়েটি : 'আমি জানি আমি সুন্দরী নই, কিন্তু কী করব, এটা আমার সত্যিকারের নাম...বাবা-মা দিয়েছিল।'

জিশান বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটি যে সুন্দরী নয় সেটা ওকে কে বলল? জিশানের তো পুতুলটিকে যথেষ্ট সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল।

একে তো নামটা বেশ অদ্ভুত, পুরোনো-পুরোনো। তার ওপর অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে কী আজব আন্তরিক কথাবার্তার ঢং! নিউ সিটিতে এটা নতুন।

'শোনো, জিশান—এখন যে-কাজটা আমি করব সেটা আমার খুব অপছন্দের। কিন্তু করতে হবে—' ঠোঁট ওলটাল : 'কাজ তো কাজ!'

জিশান ওর পিছনে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দিকে একবার তাকাল। 'রিমোট অপারেশানস' ল্যাবে ঢোকা ইস্তক এই তিনজন ওর সঙ্গে ছায়ার মতো জুড়ে গেছে।

দু-এক সেকেন্ডের দ্বিধা কাটিয়ে জিশান জিগ্যেস করে ফেলল, 'কী কাজ?'

হাসল সুধাসুন্দরী : 'তোমাকে ম্যাজিক শট দেওয়ার কাজ।'

'ম্যাজিক শট?' কপালে উঠল জিশানের ভুরু।

'হ্যাঁ—স্পেশাল ইনজেকশান।'

কথা বলতে-বলতে সুধা ডানদিকের কন্ট্রোল প্যানেলটার কাছে চলে গিয়েছিল। ব্যস্তভাবে কয়েকটা বোতাম টিপল। দুটো মিটারের রিডিং খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জিশানের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাতে হাত ঘষল।

'ও.কে., জিশান, আই অ্যাম রেডি। আই হোপ য়ু আর—।'

জিশান লক্ষ করল ওর ইংরেজি কথা বলার ঢং অনেকটা যেন সাহেবি ধাঁচের। ছোট্ট করে বলল, 'আপনি রেডি হলেই আমি রেডি।'

'চমৎকার। তা হলে ওই চেয়ারটায় শুয়ে পড়ো—।'

জিশান ল্যাবের চারপাশে তাকাল। তাকিয়েই অবাক হল। কখন যেন চারটে দেওয়ালের কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের যে-উজ্জ্বল আলোগুলো এতক্ষণ তীব্র কর্কশ মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বিশাল চেয়ারটার কাছে চলে গেল জিশান। ওটাতে বসে পড়ল, নাকি শুয়ে পড়ল? উঁহু, ব্যাপারটা বসা এবং শোয়ার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়াল।

'গুড বয়।' সুধাসুন্দরী ওর কাছে এগিয়ে এল : 'অ্যান্ড স্টে কুল লাইক আ গুড বয়।'

জিশান চেয়ারে শুয়ে সুধাকে দেখছিল।

ওই রোগা ফরসা পুতুল-পুতুল মেয়েটার 'পুতুল-পুতুল' ব্যাপারটা স্রেফ ওপরের চেহারাতেই শেষ। ওর ভেতরে রয়েছে দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসে ঠাসা একজন ডক্টর।

জিশান অবাক হচ্ছিল। এই মেয়েটা শ্রীধরের রাজত্বে এসে পড়ল কেমন করে?

জিশানের তিনজন সঙ্গী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বোকা-বোকা নজরে এদিক-ওদিক দেখছিল। ওদের কাজটাই বোধহয় জিশানের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকা।

আচমকা ওদের দিকে ডানহাত উঁচিয়ে কয়েকটা চুটকি দিল সুধা। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনাদের এখন ল্যাবের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করার সময় এসে গেছে। দিস ইজ দ্য রুল অফ মাই ল্যাব।'

তিনজনের মধ্যে দুজন তক্ষুনি ল্যাবের দরজার দিকে রওনা হওয়ার ঝোঁক নিল, কিন্তু একজন একটু ইতস্তত করতে লাগল।

সেই লোকটা আমতা-আমতা করে বলল, 'আমাদের বস বলেছেন জিশান পাল চৌধুরীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে। ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে না যেতে...।'

সুধাসুন্দরী ঠান্ডা গলায় বলল, 'কে তোমার বস জানি না, তবে হি ইজ ইয়োর বস আউটসাইড মাই ল্যাব। অ্যান্ড সো অল হিজ অর্ডারস সিম্পলি স্টপ আউটসাইড মাই ড্যাম ল্যাব ডোর। নিউ সিটির সবার সব অর্ডার আমার ল্যাবের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে যায়—ভেতরে ঢুকতে পারে না...।'

কথা বলতে-বলতে সুধা কম্পিউটার-টেবিলের ওপর থেকে একটা সেল ফোন তুলে নিল। তাতে অটো ডায়াল করে ও-প্রান্তের কথা শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল সুধার কপালে ভাঁজ, আয়ত চোখে বিরক্তি।

প্রতিবাদী লোকটা তখনও বলছিল, 'ডক্টর, প্লিজ, ভুল বুঝবেন না। আমাদের জিশানের সঙ্গে-সঙ্গে থাকার জন্যে স্ট্রং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। আমরা...।'

'মার্শাল স্যার, সুধাসুন্দরী বলছি। ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব থেকে—।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। সুধা সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে! ওর হাত এত লম্বা যে, শ্রীধরকে এককথায় ফোন করতে পারে?

শ্রীধরের গলা শোনা গেল, 'ইয়েস, সুধা। বলো তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

শ্রীধরের কথা শুনতে পাওয়ামাত্রই জিশান বুঝল ঘরের সবাইকে ও-প্রান্তের কথা শোনানোর জন্য সুধা ওর মোবাইল ফোনের স্পিকার অন করে দিয়েছে।

'আমি এখন জিশান পাল চৌধুরীর ওপরে ''গ্রিন টেস্ট'' শুরু করতে চলেছি। এসব টেস্ট কিংবা অপারেশানের সময়—আপনি তো জানেন—আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন ছাড়া আর কোনও লোকের প্রেজেন্স পছন্দ করি না। কিন্তু এখানে একজন রয়েছে—জিশানের এসকর্ট—সে বলছে কোনও অবস্থাতেই জিশানকে ছেড়ে যাবে না। ওর ওপরে নাকি অর্ডার আছে—' সুধা ফোনে কথা বলছিল আর এসকর্ট তিনজনের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে জিশানের দিকেও। ওদের একজন জিশানের চেয়ারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আর বাকি দুজন ল্যাবের দরজার কাছে—অনেকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে সুধাসুন্দরী বলল, 'আপনি আমাকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে ডিসিশান দেবেন, স্যার। না হলে আমি ইলেভেনথ সেকেন্ডে আমার রেজিগনেশান আপনাকে ই-মেলে সাবমিট করে দেব। বিকজ আমার ল্যাবে সায়েন্স ছাড়া আর কারও হুকুমে আমি চলি না।'

জিশান শুধু অবাক নয়, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে এইভাবে কথা বলা যায়।

ও একদৃষ্টে বিজ্ঞানী মেয়েটাকে দেখছিল।

শ্রীধর পাট্টার শান্ত গলা শোনা গেল : 'সুধা, তুমি ফোনটা প্লিজ ওই এসকর্টকে দাও—।'

সুধা জিশানের চেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। প্রতিবাদী কর্মনিষ্ঠ এসকর্টটির হাতে নিজের ফোনটা তুলে দিল—কিন্তু একটাও কথা বলল না।

লোকটা ফোনটা কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে শ্রীধরের শান্ত গলা শোনা গেল : 'তোমার নামটা কি জানতে পারি?'

লোকটার মুখ অনেকক্ষণ আগেই ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছিল, এখন সেটা প্রায় ব্লটিং পেপারের কাছাকাছি। আর ওর শুকনো মুখে ভয়ের সিলমোহর।

কাঁপা গলায় ও বলল, 'আ-আমার নাম বি-বিকাশ সাহা, স্যার।'

'চমৎকার।' বললেন শ্রীধর, 'বিকাশ সাহা, তুমি এই মুহূর্তে ডক্টরের হাতে সেল ফোনটা ফেরত দিয়ে ল্যাব থেকে তোমার সাঙ্গপাঙ্গ কাচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও—।'

'ও.কে., স্যার। ইয়েস, স্যার।' বিকাশের গলা এবং শরীর কাঁপছে।

'যদি ঘর থেকে বেরোতে তোমার পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে তা হলে আমি তোমার সুইচ পার্মানেন্টলি অফ করে দেব।'

'খট' করে লাইন কেটে দেওয়ার শব্দ হল। বিকাশ কাঁপা হাতে ফোনটা সুধাকে ফেরত দিল। এবং প্রায় আলোর গতিতে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল।

ওর দুজন সাথী ওর আগেই ল্যাবের বাইরে চলে গেছে।

সুধাসুন্দরী ওর মোবাইল ফোনটা অফ করে কম্পিউটার-টেবিলে রেখে দিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখের ভাব করে জিশানের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'জিশান, প্রথমে তোমার ''গ্রিন টেস্ট'' হবে। সেই টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ হলে তবেই ম্যাজিক শট—মানে, ম্যাজিক ইনজেকশান...।'

জিশান একটা হাত তুলে বলল, 'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান—আগে আপনাকে কনগ্র্যাটস জানাই—তারপর ওসব টেস্ট-ফেস্ট হবে।'

'কেন?' সুধার ফরসা কপালে ভাঁজ পড়ল।

'যেভাবে আপনি মার্শালের সঙ্গে কথা বললেন...ওই ফোর্স, ওই কনফিডেন্স...ভাবা যায় না। না:, ডক্টর, আপনাকে সেলাম জানাই।'

জিশানের ভেতরে-ভেতরে একটা সত্যিকারের ঢেউ উথালপাথাল করছিল। আনন্দের ঢেউ। নিউ সিটিতে এরকম দৃপ্ত সাহসী মানুষ আর ক'জন আছে কে জানে!

সুধা জিশানের চোখে চোখ রেখে তাকাল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'জিশান, দুটো কথা। এক, তুমি আমার সঙ্গে ''আপনি-আপনি'' করে কথা বলবে না। ''তুমি''-টা ''আপনি''-র চেয়ে অনেক বেটার, অনেক সুন্দর।' সুধা এবার আঙুল তুলে ইশারায় দুই দেখাল : 'আর দু-নম্বর কথা হল, ওই ফোর্স, কনফিডেন্স এটসেটেরা...। আমি এখানে চাকরি করি, জিশান—কিন্তু তাই বলে এঁদের চাকর নই। আমি শুধু বিজ্ঞানের চাকর—আর কারও নয়।'

সুধাসুন্দরীর মুখে অদ্ভুত এক আলো দেখতে পেল জিশান।

•

সুধাসুন্দরী কথা বলছিল, আর একইসঙ্গে ব্যস্ত হাতে কাজ করছিল। কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে কতকগুলো মিটার রিডিং দেখল, একটা ছোট মাপের পুশবাটন প্যানেলে আঙুলের ডগা দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে একটা 'ক্লিক' শব্দ শোনা গেল আর দরজার কাচটা অস্বচ্ছ হয়ে গেল।

জিশানের কাছে এল সুধাসুন্দরী : 'দরজাটা লক করে দিলাম। এবার তোমার ডানহাতটা চেয়ারের হাতলের ওপরে রাখো। হাতের চেটো ওপর দিকে—।'

জিশান কথা শুনল।

'স্যামি! চিকি!' আর্ক কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজনের দিকে ইশারা করে বলল সুধা, 'পেশেন্টকে গ্রিন টেস্টের জন্যে রেডি করো—।'

পেশেন্ট! জিশান এখন তা হলে পেশেন্ট? অন্তত সুধার চোখে।

জিশান অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল সুধাও।

চিকি আর স্যামি কম্পিউটার ছেড়ে উঠে এল। ছিপছিপে চেহারার দুজন স্মার্ট যুবক। একজনের চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল মাখানো, আর-একজনের চোখ একেবারে নির্লিপ্ত, ঠান্ডা।

ঠান্ডা চোখের যুবকটি চটপট জিশানের কাছে এল। জিশানের দুটো হাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ফাইবারের স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর সে উবু হয়ে বসে পড়ল জিশানের পায়ের কাছে। গোড়ালির

গাঁটের ঠিক ওপরটায় শক্ত করে স্ট্র্যাপ বেঁধে দিল।

জিশান অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল।

হাসল সুধা। বলল, 'সেফটি, জিশান। কারণ এখন যে-টেস্টটা করব তাতে তোমাকে একটা স্পেশাল মেডিসিন ইনজেক্ট করতে হবে। যদি তাতে তোমার কোনও রিয়্যাকশন না হয় তা হলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু...' জিশানের কাছে এগিয়ে এল সুধাসুন্দরী : 'কিন্তু যদি রিয়্যাকশন হয় তা হলে...তা হলে তোমার ঝামেলা হবে। ঠিক দশ সেকেন্ড তোমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হবে। তখন তুমি পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তেও পারো। তাই এই স্ট্র্যাপ। সেফটি।' আবার হাসল ও।

'আর যদি কোনও রিয়্যাকশন না হয়, তা হলে?'

'তা হলে তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ। দশ মিনিট পরেই তোমাকে ম্যাজিক শট দেওয়া যাবে।'

দ্বিতীয় লোকটি একটা অদ্ভুত ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়াল সুধাসুন্দরীর সামনে। ট্রে-তে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়কে একটা খুব সরু ইনজেকশন সিরিঞ্জ। একজোড়া হালকা নীল রঙের রাবার লেটেক্স-এর গ্লাভস। একটা ছোট্ট ওষুধের শিশি। শিশিতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা তরল। আর তার পাশে ছোট্ট গোলাপি সাবানের মতো দেখতে একটা কী যেন।

এতক্ষণে 'গ্রিন টেস্ট' নামের মানে বুঝতে পারল জিশান।

সুধাসুন্দরী কাজ শুরু করল রোবটের মতো যান্ত্রিক দক্ষতায়। লেটেক্স গ্লাভস পরে নিয়ে ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা বের করে নিল। ভায়ালে ছুঁচ ফুটিয়ে সবুজ তরলের প্রায় সবটাই টেনে নিল সিরিঞ্জে। ট্রে থেকে গোলাপি টুকরোটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিশানের ওপরে।

টুকরোটা জিশানের 'চিত' করা ডানহাতের শিরার ওপরে ঘষতে-ঘষতে সুধাসুন্দরী বলল, 'এটা সলিড স্টেরিলাইজার। আর সিরিঞ্জটার স্পেশালিটি হল, এটার ছুঁচটা ভীষণ শক্ত অথচ সরু—এত সরু যে, তুমি টেরই পাবে না এটা তোমার শিরায় ঢুকছে।'

'আর এই সবুজ লিকুইডটা?' জিশান জিগ্যেস করল।

'ওটা একটা স্ট্রেঞ্জ কম্পাউন্ড...' হাসল সুধা : 'আমার আবিষ্কার...।'

'আপনার...মানে, তোমার আবিষ্কার? সত্যি?'

'হ্যাঁ—এতে অবাক হওয়ার কী আছে? জানো, বায়োকেমিস্ট্রির ফিল্ডে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্ট আছে!'

'পেটেন্ট?' অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল জিশান : 'সেটা আবার কী?'

'সোজা কথায় বোঝাতে গেলে, আমার তেতাল্লিশটা আবিষ্কার আছে। সেই আবিষ্কারগুলোর মালিকানা রেজিস্ট্রি করার নামই হল পেটেন্ট...।' সিরিঞ্জের তীক্ষ্ণ ডগাটা জিশানের হাতের শিরায় ছুঁইয়ে সুধাসুন্দরী বলল, 'রেডি, স্টেডি, গো—!'

এবং সবুজ তরলটা জিশানের শিরায় ঢুকিয়ে দিয়ে তৎপরভাবে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। জিশানের চোখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় মনে-মনে এক-দুই গুনে দশ সেকেন্ড পার করছিল। আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন কন্ট্রোল প্যানেলের ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল।

জিশান কোনও যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল না। ও স্বাভাবিক গলায় সুধাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি তা হলে খুব নামকরা সায়েন্টিস্ট?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল : 'লোকে তো বলে।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন সুধাকে লক্ষ করে হাতের ইশারা করল। যার অর্থ হল, দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে।

'তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ করে গেছ, জিশান। যু আর নাউ এলিজিবল ফর গেটিং দ্য ম্যাজিক শট।' হঠাৎই জিশানের মাথায় হাত দিয়ে ওর চুল ঘেঁটে দিল সুধাসুন্দরী। যেমন করে গুরুজনরা বাচ্চাদের আদর করে, অনেকটা সেইরকম।

'আমার হাত-পা কি এখনও বাঁধা থাকবে?' চোখের ইশারায় হাত-পায়ের স্ট্র্যাপগুলো দেখাল জিশান।

'না, না, এক্ষুনি ওগুলো খুলে দিচ্ছি। চিকি—।'

চিকি যন্ত্রের মতো কাজ করতে শুরু করল।

'এই দশটা মিনিট আমরা কীভাবে কাটাব?' প্রশ্নটা করে জিশান সুধাসুন্দরীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

সুধাসুন্দরী ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা স্যামির ট্রে-তে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যাজিক শট প্রিপেয়ার করো—।' তারপর জিশানের দিকে তাকাল : 'এখন আর ন'মিনিট বাকি আছে। এই সময়টা তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি—ম্যাজিক শট নিয়ে।'

'তাই? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে—কী এই ম্যাজিক শট। এই ইনজেকশন নিলে কীভাবে কন্ট্রোলড ফ্রিডম পাওয়া যায়...।'

'বলছি—' বলে সুধাসুন্দরী স্যামির দিকে তাকিয়ে কয়েকটা টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাকশন দিল। তারপর তাকাল জিশানের দিকে : 'ছোট্ট একটা পলিমার কোটেড সিলভার ক্যাপসুল তোমার কানের নীচে আমি ইনজেক্ট করে দেব। সেই মোমেন্টটাই হল টাইম জিরো। তারপর থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর তোমার ভীষণ জল তেষ্টা পাবে। ভয়ঙ্কর জল তেষ্টা। ডিমনিক থার্স্ট। তুমি কল্পনা করতে পারবে না এমন তেষ্টা।'

'তেষ্টা পেলে জল খাব—সিম্পল।' জিশান হালকাভাবে বলল।

'উঁহু, ওটাই তো মজা! যত খুশি জল তুমি খাও না কেন, ওই তেষ্টা কিছুতেই কমবে না। কিছুতেই না।'

'তা হলে?'

হাসল সুধা। বলল, 'চব্বিশ-ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে আমার কাছে—এই ল্যাবে। আমি রিমোট অপারেশানে সিলভার ক্যাপসুলটাকে নেক্সট টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স-এর জন্যে রিচার্জ করে দেব। তখন তুমি আবার স্বাধীন—ইচ্ছেমতো নিউ সিটির যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারো—চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।' একটু থামল সুধা। স্যামির দিকে একপলক তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল জিশানের দিকে : 'আই হোপ নাউ য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কন্ট্রোলড ফ্রিডম—।'

'জিশান মাথা নাড়ল ওপর-নীচে। হ্যাঁ, এবার ও ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

স্যামি একটা অদ্ভুত ধরনের পিস্তল আর একটুকরো সলিড স্টেরিলাইজার ট্রে-তে সাজিয়ে সুধাসুন্দরীর কাছে নিয়ে এল।

জিশানের ডানদিকের কানের নীচে স্টেরিলাইজার ঘষল সুধা। তারপর ট্রে থেকে অদ্ভুত ধরনের পিস্তলটা তুলে নিল।

জিশান লক্ষ করল, পিস্তলের নলটা অস্বাভাবিক মোটা, কালো রঙের। গুলির চেম্বারের গায়ে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে উইন্ডো। সেখানে কতকগুলো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে।

সুধাসুন্দরী পিস্তলের নলটা জিশানের ডান কানের নীচে চেপে ধরল।

'সরি, জিশান। এটা না করে আমার উপায় নেই।'

জিশানের ভেতরে কোনও প্রতিরোধ তৈরি হল না। ওর একটা মাংসপেশিও প্রতিরোধের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় শক্ত হল না। বরং মনে হল, আপাতভাবে 'স্বাধীন' হয়ে নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানো যাবে, এটাই বা কম কী!

'রেডি, স্টেডি, গো—।' বলে পিস্তলের ট্রিগার টিপল সুধা।

ছোট্ট চাপা শব্দ হল। এবং জিশানের মনে হল একটা অন্ধকার কুয়োর ভেতরে ও পড়ে যাচ্ছে। পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রি ফল'।

ও পড়ছে তো পড়ছেই। পেটের ভেতরটা কেমন অদ্ভুতরকম খালি লাগছে।

কিন্তু একফোঁটাও যন্ত্রণা নেই।

বহুদূর থেকে একটা ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়ে সুধাসুন্দরীর প্রতিধ্বনিময় গলা ভেসে এল, 'স্টেডি, জিশান, স্টেডি—।'

হঠাৎই চোখের সামনে আলো ফুটে উঠল। চারপাশটা আবার স্বাভাবিক। 'ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব'-কে আবার আগের চেহারায় দেখতে পেল জিশান। ওই তো সুধাসুন্দরী! ওই তো স্যামি আর চিকি!

সুধা হাসছিল : 'উঠে দাঁড়াও, জিশান। এখন নিউ সিটির কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। এনজয় ইয়োর ফ্রিডম...।'

'থ্যাংকস—' বলে জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ডান কানের নীচে গলার পাশটায় হাত দিল। একটা মসৃণ চাকতি হাতে ঠেকল ওর। কেউ যেন একটা টিপ কপালের বদলে ওই জায়গাটায় শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে একটু ব্যথা টের পেল ও।

'ওটা পোস্ট অপস পলিমার সিল। ক্যাপসুলটা শরীরে ঢোকার জন্যে সামান্য যেটুকু ড্যামেজ হয়েছে সেটা আমি সিলিং গান দিয়ে সিল করে দিয়েছি। তখন তুমি ব্ল্যাক আউট স্টেটে ছিলে। তিন ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

জিশান ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা পায়চারি করল। না, শরীর কোনও অসুবিধের কথা জানান দিচ্ছে না। সমস্ত পেশি জিশানের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

'আমি কি তা হলে এখন যেতে পারি?' জানতে চাইল জিশান।

'হ্যাঁ—পারো।' সুধাসুন্দরী বলল, 'কিন্তু কাল তোমাকে রাত ন'টার সময় আমার এই ল্যাবে ফিরে আসতে হবে। যদিও এখন সময়...' কন্ট্রোল প্যানেলের ঘড়ির দিকে তাকাল : '...রাত প্রায় এগারোটা, আমি সেফসাইডে থাকার জন্যে তোমাকে দু-ঘণ্টা আগে আসতে বলছি এবং সেই সময়টাই ফিক্স করেছি। তখন আমি তোমার কন্ট্রোলড ফ্রিডম আবার পরদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত রিচার্জ করে দেব। ইনিশিয়াল শটের সময় ওই ক্যাপসুলটা যে-রেফারেন্স টাইম ওর মেমোরিতে স্টোর করে সেই টাইমটার আর নড়চড় হয় না। সো—' হাতে হাত ঘষল সুধা। ভোরবেলা ফোটা ফুলের মতো প্রশান্ত আয়ত চোখ মেলে জিশানকে দেখল : 'টুমরো ইভনিং, নাইন ও' ক্লক। তোমার সঙ্গে রোজ এই ল্যাবে আমার দেখা হবে—।'

'হ্যাঁ—কিল গেমের আগের রাত পর্যন্ত।'

এ-কথায় সুধা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'স্যামি তোমাকে সঙ্গে করে এখন নিয়ে যাবে। যা-যা ফরম্যালিটি আছে সেগুলো সেরে নেবে—।'

'ফরম্যালিটি?' জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ—ফরম্যালিটি।' মাথা নেড়ে বলল সুধাসুন্দরী, 'রিমোট অপারেশানস ল্যাবে যাওয়া-আসার জন্যে তোমাকে একটা স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। প্রতিদিন রাত পৌনে ন'টা থেকে সওয়া ন'টার মধ্যে তুমি ওই কার্ড সোয়াইপ করে আমার এই ল্যাবে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'তা ছাড়া তোমাকে একটা সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। মানে, ''কন্ট্রোলড ফ্রিডম সিটিজেন'' কার্ড। নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় নানা জায়গায় এই স্মার্ট কার্ডটা তোমার কাজে লাগবে। আর তোমাকে একটা পার্সোনাল গাড়িও দেওয়া হবে। তবে ওটা মার্শালের ব্যাপার। উনি ঠিক সময়ে ওটার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

হঠাৎই জিশানের দিকে এগিয়ে এল সুধা। হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, 'তোমার হিরোইকস আমি টিভিতে দেখেছি। য়ু আর অ'সাম। লাস্ট পাঁচ বছরে তোমার মতো কেউ আসেনি। মনে হচ্ছে, তুমি মার্শালের হিসেব ওলটাতে পারবে। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট ইন কিল গেম—।'

'থ্যাংকস—' বলে সুধার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা মুঠোয় নিল জিশান। হ্যান্ডশেক করল।

স্যামি জিশানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিশান কী ভেবে ওকে বলল, 'আপনি একটু ল্যাবের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান—আমি আসছি।'

চিকি তখন ওর কাজের টেবিলে চলে গেছে। ওর আর্ক কম্পিউটারের সামনে বসে পড়েছে।

জিশান চিকির দিকে একবার তাকাল। আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, ও সুধাকে নীচু গলায় কোনও কথা বললে সেটা চিকি শুনতে পাবে কি না।

জিশান সুধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'কী কথা?'

প্রায় ফিসফিস করে জিশান বলল, 'একটা ব্যাপার ভীষণ তাজ্জব লাগছে। তোমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট শ্রীধর পাট্টার তৈরি নরকে বসে কী করছে—।'

সুধাসুন্দরীর মুখের উজ্জ্বল ভাবটা মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ও। বোধহয় ভাবতে লাগল।

একটু পরে ও বলল, 'কাল তো তুমি আসছ। কাল বলব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'সত্যিই তো! এই নরকে আমার থাকার কথা নয়...।'

•

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পর গেস্টহাউসের ঘর ছেড়ে বাইরে এল জিশান। আজ ওর স্বাধীনতার প্রথম দিন।

সকাল সাতটার সময় অটোমেটিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি গলার মেয়েটি জিশানের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারপর ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে।

'গুড মর্নিং, জিশান।'

'গুড মর্নিং—' জিশানও পালটা বলল। ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভিতে সে-কথা শুনতে পেল মেয়েটি।

দু-আঙুল তুলে জয়ের 'ভি' সংকেত দেখাল মেয়েটি : 'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!' তারপর হাসল।

'থ্যাংকস।'

'এখন কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিলে তোমার আপত্তি আছে?'

'না, বলো—।'

'আমাদের মার্শাল তোমার জন্যে একটা অটোমোবিল অ্যালট করেছেন। সেই গাড়িটা নীচের পার্কিং লটে এখন দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমাদের এই হাই-টেক গাড়ি প্রথম-প্রথম চালাতে পারবে না। তাই গাড়িতে একজন ড্রাইভার রয়েছে। এ ছাড়া তুমি গাড়িতে একটা প্যাকেট পাবে। তাতে জেনারেল প্যাকেট রেডিয়ো সারভিস আর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করা একটা স্যাটেলাইট ফোন রয়েছে—নিউ সিটিতে তুমি যতদিন আছ ফোনটা ততদিন তুমি ইউজ করবে। এ ছাড়া নিউ সিটি সম্পর্কে নানান তথ্য জানার জন্যে রয়েছে কয়েকটা ডিভিডি। গাড়ির ডিভিডি প্লেয়ারে তুমি ইচ্ছেমতো ওগুলো চালিয়ে দেখতে পারো—।'

'নিউ সিটির কোথায় আমি যেতে পারব, আর কোথায় পারব না, তার কোনও ইনস্ট্রাকশন রয়েছে?' জিশান জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, ওই প্যাকেটে রয়েছে তোমার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড। সিটির যে-যে জায়গায় তুমি বন্ধ দরজা পাবে সেখানে ঢোকার জন্যে তোমাকে এই সি. এফ. সি. কার্ডটা সোয়াইপ করতে হবে। তাতে দরজা যদি খুলে যায় তা হলে তুমি অ্যালাউড—আর না খুললে, নয়।

'শোনো। ড্রাইভার ছেলেটির নাম গুনাজি। ভীষণ ব্রাইট বয়। ও তোমাকে সবরকমভাবে গাইড করবে, আর সব ব্যাপারে হেলপ করবে। বলতে গেলে ও তোমার লিভিং স্মার্ট কার্ড। ও.কে.?'

জিশান বলল, 'ও.কে.।'

'এনি ফারদার কোশ্চেন?'

জিশান ভেবে দেখল, ওর মনে এই মুহূর্তে আর কোনও প্রশ্ন নেই। তাই ও বলল, 'থ্যাংক য়ু। নো কোশ্চেন।'

হাসল মেয়েটি : 'গুড। তা হলে শেষ জরুরি কথাটা এবার বলি। টাকা। রাস্তায় বেরোলে তোমার কিছু খরচ হতে পারে। অনেকগুলো কমপিটিশানে জিতে তোমার এখন অনেক টাকা। সেই টাকা থেকে তুমি অনায়াসে খরচ করতে পারো। ওই সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডই তোমার এটিএম কার্ড। তুমি নিউ সিটির যে-কোনও এটিএম কিয়োস্কে ওই কার্ড সোয়াইপ করে টাকা তুলতে পারো। তোমার এটিএম পিন গুনাজি তোমাকে বলে দেবে। হি ইজ আ ভেরি স্মার্ট বয়।' হাত নাড়ল মেয়েটি, বলল, 'বাই, জিশান—।'

'বাই—।'

ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভি অফ হয়ে গেল।

এখন, ব্রেকফাস্টের পর, জিশান ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। পরনে ব্লু জিনস, কালো রঙের টি-শার্ট, কোমরে সরু কালো বেল্ট। বেল্টের সঙ্গে আটকানো একটা পাউচে মাইক্রোভিডিয়োফোনটা ঢুকিয়ে নিয়েছে। নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় মিনির সঙ্গে কথা বলতে চায় ও। শহরটা দেখতে কেমন তার একটা ধারাবিবরণী দিতে চায়।

গেস্টহাউস ছেড়ে নীচে নেমে পায়ে-পায়ে ফোয়ারার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জিশান। ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে ওর ফকিরচাঁদের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ওর হতভাগ্য ভাইয়ের কথা। নেকরোসিটির কথা।

এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল জিশান। এখন কী করে ও গুনাজিকে খুঁজে পাবে? ওর গাড়িটাই বা কোথায়?

হঠাৎই দেখল, মেন গেটের দিক থেকে অত্যন্ত রোগা লম্বা একটা ছেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ফরসা, খোকা-খোকা চেহারা। গোঁফের রেখা সদ্য গজিয়েছে। মাথার চুল সোনালি রঙে রাঙানো এবং হেয়ার জেলের দৌলতে বেশ খাড়া-খাড়া হয়ে আছে।

জিশানের কাছে এসে একগাল হাসল ছেলেটা। বিচিত্র ঢঙে সেলাম ঠুকে বলল, 'স্যার, আমার নাম গুনাজি। ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে একটা গাড়ি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে সবসময় থাকব আমি। প্রচুর সার্ভিস দেব—।'

জিশান অবাক হয়ে ছেলেটাকে দেখতে লাগল।

গুনাজির বয়েস বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। টগবগে। চাবুকের মতো। মুখ থেকে কম বয়েসের ছটা বেরোচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটা জিশানকে হঠাৎ সেলাম ঠুকল কেন? আর 'স্যার'ই বা বলছে কেন?

এই ব্যাপারগুলো জিশান মোটেই পছন্দ করে না। তাই গুনাজিকে বলল 'গুনাজি, তুমি আমার ড্রাইভার নয়—আমার মাস্টারমশাই। আমাকে তুমি গাড়ি চালানো শেখাবে। আর একইসঙ্গে তুমি আমার গাইড, আমার বন্ধু। তুমি আমাকে ''স্যার'' বলবে না, আর ওইরকম বোকা-বোকা সেলামও ঠুকবে না—।'

জিশানের কথায় ছেলেটা একটু দমে গেল যেন। তারপর বলল, 'আপনার মতো করে কেউ কখনও বলেনি—সেই ষোলো বছর বয়েস থেকে গাড়ি চালাচ্ছি—।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'তবে আপনাকে সেলাম ঠুকেছি অন্য কারণে।'

'কী?'

'আপনার সমস্ত গেম আমি টিভিতে দেখেছি। আপনি এককথায় সুপার। আপনার মতন কাউকে দেখিনি। তা ছাড়া পিট ফাইটের সময় আপনি লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন। পাবলিক হাজারটা ওসকানি দেওয়া সত্বেও আপনি জাব্বাকে মেরে ফেলেননি—ছেড়ে দিয়েছেন। সেলামটা সেইজন্যে—।'

জিশান ছেলেটাকে দেখতে লাগল। ও তখনও কথা বলছিল।

'আসলে আমাদের এই শহরটা থেকে দয়া, মায়া, ক্ষমা—এসব উঠে গেছে। তাই টিভিতে অনেকদিন পর সেটা দেখে খুব ভালো লেগেছিল। আমার কখনও যদি আপনাকে সেলাম করার ইচ্ছে হয় সেটা কিন্তু স্যার

বারণ করবেন না।'

'আবার স্যার?'

'সরি।' লাজুক হাসল গুনাজি। আঙুল তুলে বাইরের দিকে দেখাল : 'চলুন, গাড়িটা ওইদিকে ডান সাইডে পার্ক করা আছে—।'

ওর সঙ্গে হাঁটা দিল জিশান। গুনাজির পাশাপাশি হাঁটতে ওর কেন জানি না ভালো লাগছিল।

ফোয়ারার জলে সকালের রোদ চিকচিক করছিল। অসংখ্য সোনার কুচি। জিশানের চোখ পলকের জন্য আটকে গেল।

তারপর আকাশের দিকে তাকাল। আজ অনেক বেশি নীল লাগছে। সেখানে বেশ কয়েকটা পাখি চোখে পড়ল। ডানা খেলিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

জিশানের পাখি হতে ইচ্ছে করল। কন্ট্রোলড ফ্রিডম নয়—ওর টোটাল ফ্রিডম চাই। ওর একার জন্য নয়—সকলের জন্য।

জিশান একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

ঠিক তখনই গুনাজি ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনার গায়ে খুব জোর, তাই না?'

জিশান ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'শুধু গায়ে নয়, গুনাজি—মনেও জোর চাই...।'

•

বাতাসে পাখির পালক যখন ভেসে যায় তখন যে-কোমলতার স্পর্শ অনুভব করা যায় জিশানের ঠিক তেমনটাই লাগছিল। গুনাজি যেন গাড়ি চালাচ্ছিল না, একটা তুলতুলে পালক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল নিউ সিটির নিখুঁত পরিপাটি রাস্তায়।

চারপাশে তাকালেই ছবির মতো সব বাড়ি, ছবির মতো মসৃণ রাস্তাঘাট, পার্ক, গাছপালা, বাগান, লেক। ছবিটা সবমিলিয়ে খুবই সুন্দর, তবে এটা যে 'বাইরের' ছবি সেটা জিশানের মনে পড়ল। 'ভেতরের' ছবিটা দেখার জন্য জিশান চোখ বুজল—কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে রইল।

গুনাজি গাড়ি চালাচ্ছিল আর টগবগ করে কথা বলছিল। জিশানকে ওর স্যাটেলাইট ফোনটা দিয়ে তার নানান বোতামের ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কী করে ফোন করতে হয়, কী করে ফোন ধরতে হয়, কী করে জি. পি. আর. এস. আর. জি. পি. এস ব্যবহার করতে হয়—এইসব।

'তুমি এত কিছু শিখলে কী করে?' জিশান ওকে জিগ্যেস করল।

গাড়ির সামনের কাচে চোখ রেখে হাসল গুনাজি : 'স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার স্বভাব। তা ছাড়া আমাদের নিউ সিটির ''ডেটা কমিউনিকেশান সেন্টার''-এ আমি ছ'মাস ট্রেনিং নিয়েছি। আমি লাস্ট দেড় বছর ধরে সবাইকে স্যাটেলাইট ফোন অপারেট করা শেখাই আর সি থ্রু অটোমোবিল চালানো শেখাই। এই কাজটা আমার খুব ভালো লাগে...।'

যে-গাড়িটা গুনাজি জিশানের জন্য নিয়ে এসেছে সেটা ব্যাটারিতে চলে এবং সেটা সি থ্রু। অর্থাৎ, গোটা গাড়িটা স্বচ্ছ ফাইবারের তৈরি। তার ভেতরের বিভিন্ন পার্টস, মোটর, ক্লাচ, গিয়ার বক্স, ডিফারেনশিয়াল গিয়ার—সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ির ডিজাইন এরোডায়ানামিক এবং একইসঙ্গে আরগোনোমিক। ছুটে যাওয়া গাড়িটাকে যাতে দেখতে কারও অসুবিধে না হয় তার জন্য গাড়িকে ঘিরে ফাইবারের বডির ওপরে ছ'ইঞ্চি চওড়া ফ্লুওরেসেন্ট ব্লু রঙের উজ্জ্বল পটি আঁকা আছে। এই নীল রং দিনে কিংবা রাতে নীল আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে।

গাড়িটাকে দেখেই জিশানের তাক লেগে গিয়েছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলল, 'এ-গাড়িটা ইমপোর্ট করা, স্যার...।'

'আবার ''স্যার''?' জিশান বকুনির ঢঙে বলল।

'না, স্যার—মানে, দাদা। এটা ইমপোর্টেড গাড়ি। তবে কিউ মোবাইলের চেয়ে দামে সস্তা। এ-গাড়ি নিউ সিটিতে অনেক আছে।'

জিশান গাড়ির ভেতরটা অবাক হয়ে দেখছিল। অটো এয়ারকন্ডিশানিং সিস্টেম। অটো নেভিগেশান স্ক্রিন। স্মার্ট গিয়ার। ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল। আরও কত কী!

গুনাজি জীবন্ত 'ম্যানুয়াল' হয়ে জিশানকে সি থ্রু অটোমোবিল নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল। ওর কথায় বোঝা যাচ্ছিল, এই গাড়ির কারিগরি নিয়ে ও অনেক সময় খরচ করেছে।

জিপিসি-র গেস্টহাউস থেকে গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই জিশান গুনাজিকে বলেছে, 'গুনাজি, আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালানো শিখব না। আজ তুমি নানান জায়গায় ঘুরে আমাকে শহরটা চেনাবে, কেমন?'

'যা বলবেন...।'

সেই কথামতো জিশানের গাড়ি শহরের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও শহরের পার্ক, কখনও লেক, কখনও অফিসপাড়া, কখনও বা সুপারগেমস কর্পোরেশানের বিল্ডিং কিংবা সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টার।

শহরটা দেখতে-দেখতে জিশানের মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, ওর ওল্ড সিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওর শহরটা একমনে গড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষয়ের দিকে।

গাড়ির কন্ট্রোলের দিকে নজর রেখেছিল গুনাজি। আর একইসঙ্গে জিশানের গাইডের কাজ করছিল। শহরের নানান জায়গা সম্পর্কে ও যতটুকু জানে সেটাই অন্তরঙ্গভাবে জিশানকে বলার চেষ্টা করছিল।

শহরের রাস্তাঘাটে পথচারী মানুষজন প্রায় চোখেই পড়ে না। শুধু গাড়ি আর গাড়ি। নানান মাপের, নানান রঙের, নানান ঢঙের। শহরটা যেন শুধু যন্ত্র দিয়ে ঠাসা—ভাবল জিশান। কিন্তু গাড়িগুলো সব ব্যাটারি ড্রিভেন হওয়ায় আকাশ-বাতাস পরিষ্কার—দূষণের ছোঁয়া টের পাওয়া যায় না।

একটা ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে জিশানের গাড়ি ছুটছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে জিশান হঠাৎই দেখতে পেল একটা সবুজ জঙ্গল। আকারে চৌকো। তার এক-একদিকের বাহুর মাপ চারশো কি পাঁচশো মিটার হবে।

'নীচে ওটা কি, গুনাজি?'

'ওটা পাখির বাসা।'

'পাখির বাসা মানে?' অবাক হয়ে গুনাজির দিকে তাকাল জিশান।

জিশানের দিকে চোখ ফেরাল গুনাজি। হাসল : 'বার্ড স্যাংচুয়ারি, দাদা। আমি শর্টে বলি পাখির বাসা—।'

জিশান হেসে ফেলল।

গুনাজি বলল, 'এ শহরে এরকম মোট দশটা স্যাংচুয়ারি আছে—শুধু পাখির জন্যে। ওই মিনি জঙ্গলগুলোয় পাখি ছাড়া আর কিছু নেই। যে-কেউ ইচ্ছে করলে টিকিট কেটে ওই জঙ্গলে ঢুকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে তার গায়ে মাইক্রো-ক্যামেরা ফিট করে দেওয়া হয়—যাতে পাখিদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। পাখি ধরতে বা মারতে চেষ্টা করলে জঙ্গলের সিকিওরিটি গার্ডরা তাদের মনিটরে সেটা দেখতে পাবে। আর তখনই শাস্তি—।'

'কী টাইপের শাস্তি?' জিশান জানতে চাইল।

'এসব কেসে শাস্তি হচ্ছে ফাইন—মানে, টাকা। আর টাকার ফিগারটা এমন যে, তার ইকনমিক ইনডেক্স পড়ে যেতে পারে। মানে, বাই-বাই নিউ সিটি হয়ে যেতে পারে—।'

জানলা দিয়ে নীচে তাকাল জিশান। আরও একটা পাখির বাসা ওর চোখে পড়ল। শহরের মধ্যে দশ-দশটা পাখির অভয়ারণ্যের ব্যাপারটা ওর ভালো লাগল।

'গুনাজি, শহরের মধ্যে পাখি ছাড়া আর কিছুর স্যাংচুয়ারি নেই?'

'না, আর যা আছে সব শহরের বাইরে। নিউ সিটির মধ্যে শুধু পাখি। কারণ, আমাদের মার্শাল পাখি ভালোবাসেন...।'

জিশানের মনে পড়ে গেল শ্রীধরের অফিসের ফ্যানটেইলড লাভবার্ডস- গুলোর কথা। আর একইসঙ্গে মনে পড়ল পাখিগুলোর 'কন্ট্রোলড ফ্রিডম'-এর কথা।

কিন্তু এই অভয়ারণ্যের পাখিগুলোর স্বাধীনতায় শ্রীধর পাট্টা কোনওরকম খবরদারি করেননি।

শহরের নানান জায়গায় জিশান অনেক ফ্লাইওভার দেখতে পাচ্ছিল। বিশাল-বিশাল, রামধনুর মতো তাদের চেহারা। আর তাদের প্রত্যেকের গায়ে লাল, নীল, হলদের মতো উজ্জ্বল রং। আর সবক'টাই এক অলৌকিক উপায়ে কোনওরকম পিলার ছাড়াই শূন্যে ভেসে আছে।

এখন যদি একটা সত্যিকারের রামধনু ওঠে তা হলে দারুণ হয়। ভাবল জিশান।

শহরে ঘোরাঘুরির পথে গুনাজির গাড়ি এক ফ্লাইওভার ছেড়ে আর-এক ফ্লাইওভারে উঠছিল। জিশানের মনে হচ্ছিল, ও নানান পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। আর সেই 'পাহাড়' থেকে দেখতে পাচ্ছে গাছপালা, হাই-রাইজ, উড়ে যাওয়া পাখি আর শিস দিয়ে ছুটে যাওয়া শুটার।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়ার জন্য একটা ফুড মলের কাছে গাড়ি পার্ক করল গুনাজি।

প্রায় দশতলা উঁচু মল-বিল্ডিং। বাইরের চেহারা সুষম বহুভুজের মতো। পুরোটাই কাচে ঢাকা। আর বিল্ডিংটা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে খুব ধীরে-ধীরে ঘুরছে। বিল্ডিং-এর নানান তলায় বসে থাকা লোকজনকে আকাশের ছায়া-মাখা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

শহরের বৈভব আর কারিগরি দক্ষতা জিশানকে যেন আবার নতুন করে ধাক্কা দিল।

গাড়ি থেকে নামার আগে গুনাজি বলল, 'দাদা, সানগ্লাসটা চোখে দিয়ে নিন। আর এই ব্লু ক্যাপটা মাথায় পরে নিন—' গাড়ির পিছনের সিট থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে তার ভেতরে হাত ঢোকাল গুনাজি। একটা সানগ্লাস আর একটা নীল টুপি জিশানের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার ওপরে এরকমই ইনস্ট্রাকশন আছে। এই সানগ্লাস আর টুপি না পরলে পাবলিক চট করে আপনাকে চিনে ফেলতে পারে। তখন ভিড়-টিড় জমে গিয়ে ঝামেলা হবে...।'

জিশান গুনাজির দেওয়া জিনিস দুটো চোখে আর মাথায় পরে নিল। তারপর গাড়ি থেকে নামল।

খাওয়াদাওয়া আর আরামে ঘণ্টাদেড়েক কেটে গেল। মাইক্রোভিডিয়োফোনে মিনির সঙ্গে কথা বলল জিশান। প্রতিদিনের বরাদ্দ দশমিনিট থেকে কিছু-কিছু করে সময় জমিয়ে জিশানের টকটাইম ব্যালান্স এখন এক ঘণ্টারও বেশি। ওর মনে হয়েছে, কিল গেমে যাওয়ার আগের কয়েকটা দিন মিনির সঙ্গে ওর অনেক বেশি সময় ধরে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। তাই ও গত একমাস ধরেই এমভিপি-র সময় জমাচ্ছে।

গুনাজি আবার যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল তখন জিশান 'ছদ্মবেশ' খুলে রেখে মিনি আর শানুর ভাবনায় ডুবে আছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, 'দাদা, আমরা এবার সেন্ট্রাল লেকের দিকে যাচ্ছি। এটা শহরের খুব সুন্দর জায়গা। লেকটা মাপে এত বড় যে, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। আর সাহেবদের চোখের মতো নীল জল...।'

ওর তুলনার ঢঙে জিশান হেসে ফেলল। একইসঙ্গে ওল্ড সিটির মা আর ছেলের চিন্তার জাল ছিঁড়ে পলকে চলে এল সি থ্রু অটোমোবিলে। ও গুনাজির দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফেরাল সামনের দিকে। গাড়ির স্ক্র্যাচপ্রুফ স্বচ্ছ পলিমার উইন্ডশিল্ডটা এমন যে, আছে বলে চট করে বোঝা যায় না।

গাড়ি ছুটে চলল আরও চারমিনিট কি পাঁচমিনিট—তারপরই চোখ-জুড়োনো একটা জায়গায় জিশানরা পৌঁছে গেল।

সীমাহীন একটা হ্রদ। তার জল সত্যিই সাহেবদের চোখের মতো নীল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু নীল আর নীল। সেই নীলের বুক চিরে চওড়া কালো ফিতের মতো রাস্তা। রাস্তার দুপাশে হলদে রঙের পাম

গাছের ঘন সারি, আর সেগুলোর কোল ঘেঁষে ধবধবে সাদা ছোট-ছোট কটেজ।

রাস্তা থেকে নেমে ঘাসে ছাওয়া জমির ওপরে গাড়ি থামাল গুনাজি। জিশান আবার রোদচশমা আর টুপি পরে নিল। তারপর ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে লেকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

লেকের অন্তত একশো মিটার ওপর দিয়ে পাঁচটা রঙিন ফ্লাইওভার চলে গেছে। ওগুলো কী করে শূন্যে ঝুলে আছে জিশান ভেবে পেল না। নিউ সিটির প্রযুক্তিকে মনে-মনে সেলাম দিল জিশান।

সামনে তাকালে দেখা যায়, দূরে—বহুদূরে লেকের নীল জল ঝাপসা সবুজ এক পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে।

আর পিছনে, প্রায় সমান দূরে, চোখে পড়ছে হাই-রাইজের সারি।

'এই হল আমাদের সেন্ট্রাল লেক।' গুনাজি বলল, 'নিউ সিটির সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ টুরিস্ট স্পট। ওই যে কটেজগুলো দেখছেন—' আঙুল তুলে কটেজগুলো দেখাল : 'ওগুলোর চার্জ এত ভয়ংকর যে, শুধুমাত্র নিউ সিটির ব্যাপক বড়লোকরাই ওখানে থাকতে পারে। আর এখানকার হিসেবে যারা গরিব, তারা এখানে গাড়ি নিয়ে আসে, একটু ঘোরে-ফেরে, নৌকো চড়ে লেকে রাইড নেয়—তারপর সন্ধে হলে চলে যায়...।'

চারপাশে তাকিয়ে অনেক মানুষজন দেখতে পেল জিশান। লেকের কিনারায় অলস পায়ে বেড়াচ্ছে। বড়দের পাশাপাশি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।

এ ছাড়া লেকের নীল জলে সুন্দর ছাঁদের রঙিন নৌকো ভেসে রয়েছে। বেড়াতে আসা মানুষরা তাতে বসে আনন্দে হইচই করছে।

প্রাণ ভরে দৃশ্যগুলো দেখতে লাগল জিশান। সত্যি, পৃথিবীটা কী সুন্দর! কিল গেমে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ও রোজ একবার করে এখানে আসবে। নিজেকে বারবার করে বিশ্বাস করাবে, পৃথিবী অপরূপ, অলৌকিক। নিউ সিটির যে-ভয়ংকর রূপ সেটা সাময়িক এবং লৌকিক।

সূর্যের দিকে তাকাল জিশান। বেলা সাড়ে তিনটের সূর্য খানিকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নীল লেকের জলে তার উজ্জ্বল ছায়া।

আরামের বাতাস বইছিল। হ্রদের জলে কাঁপন ধরিয়ে শিরা উঠছিল। জিশান চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বাতাসটা শরীর শুষে নিতে চাইছিল। তখনই কয়েকটা পাখির শিস ওর কানে এল।

চোখ বুজে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যকে অনুভব করতে লাগল জিশান।

একটু পরে চোখ খুলে ও তাকাল গুনাজির দিকে : 'গুনাজি, আমরা কি একটা বোট নিয়ে লেকে বেড়াতে পারি?'

'হ্যাঁ, দাদা—পারি।' হাসল ছেলেটা : 'আপনার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডটা দিন—আমি সোয়াইপ করে আনছি...।'

কার্ডটা নিয়ে লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর দিকে চলে গেল গুনাজি। এবং ফিরে এল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। তারপর নীল রঙের একটা হাইটেক স্মার্ট বোট নিয়ে ওরা লেকের জলে ভেসে পড়ল।

বোটগুলোয় কোনও চালক নেই। সবটাই প্রি-প্রোগ্রামড। ফলে চালানোর কোনও ব্যাপার নেই, স্টিয়ারিং ঘোরানোর কোনও ব্যাপার নেই। শুধু আরাম করে বসে থাকলেই হল। নৌকো নিজের মনে চলবে। তার অটোনেভিগেশান এমনই যে, কোনও একটা নৌকোর সঙ্গে আর-একটা নৌকোর কখনওই ধাক্কা লাগবে না। আর নির্দিষ্ট সময় পার হলেই নৌকো পাড়ের কাছে স্টার্টিং পয়েন্টে আবার ফিরে আসবে।

নীল জলের ওপরে জিশানদের নীল রঙের বোট ভেসে বেড়াচ্ছিল। জলের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে জল আর আকাশ মাখামাখি। তারই মাঝে ফ্লাইওভারগুলো কালো ছায়ার দাগ টেনে হ্রদের জলকে চিরে দিয়েছে।

হঠাৎই একটা সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।

আওয়াজটা এসেছে ওপরদিক থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে জিশান আর গুনাজি মাথা তুলে তাকাল আকাশের দিকে। দেখল, ফ্লাইওভারের রেলিং ভেঙে একটা সি থ্রু অটোমোবিল ছিটকে গেছে শূন্যে। নীল আকাশের বুকে গাড়ির স্বচ্ছ ফাইবারের বডি সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। গাড়িটা শূন্যে লাট খেতে-খেতে নেমে আসছে নীচে।

লেকে ভেসে বেড়ানো বোটের যাত্রীরা চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে আতঙ্ক ছিল, কারণ প্রতিটি বোটই অটোনোভিগেশানে চলছে। শূন্যে বাতাস কেটে গাড়িটা যেভাবে নেমে আসছে তাতে ওটা যে-কোনও বোটের ওপরে এসে পড়তে পারে।

লেক কন্ট্রোল রুম থেকে বোধহয় কিছু একটা করল, কারণ, হঠাৎই সবক'টা নৌকো ছুটতে শুরু করল পাড়ের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে।

আর তখনই গাড়িটা উল্কার মতো ধেয়ে এসে লেকের নীল জলে 'ঝপাস' শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল। পড়েই বেশ কয়েক হাত লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার আছড়ে পড়ল।

লোকের জল বিস্ফোরণের স্প্লিন্টারের মতো চারিদিকে ছিটকে গেল। সেই জলে নৌকোয় বসা অনেক লোকের জামাকাপড় ভিজে গেল। যাত্রীদের হইচই চিৎকার কিছুতেই থামছিল না। গাড়িটা যে কোনও নৌকার ওপরে আছড়ে পড়েনি তার জন্য লোকজনের সেই চিৎকারে আতঙ্কের চেয়ে এখন আনন্দের ছাপ ছিল অনেক বেশি।

গাড়ির মধ্যে একটা ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। পাগলের মতো বেরোনোর চেষ্টা করছে গাড়ি থেকে, কিন্তু গাড়ির দরজা কিছুতেই খুলছে না। বরং গাড়িটা ধীরে-ধীরে লেকের জলে ডুবে যাচ্ছে।

অতটা উঁচু থেকে গাড়িটা পড়ার পরেও ছেলেটা যে বেঁচে আছে সেটা জিশানকে অবাক করেছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলল, 'এখানকার সব গাড়িতেই অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগ থাকে। হঠাৎ করে ছুটন্ত গাড়ি থেমে গেলে—মানে, কোনও কিছুতে ধাক্কা খেয়ে আচমকা গাড়ির স্পিড কমে গেল—ওই এয়ারব্যাগ 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে ফুলে ওঠে আর ড্রাইভারের মাথাটা ঘিরে বসে যায়। ফলে ড্রাইভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেঁচে যায়। আর ড্রাইভারের পাশে যে বসে সে-ও একইভাবে সেভ হয়ে যায়...।'

গাড়িটা তখনও ডোবেনি, আর ছেলেটাও গাড়ির ভেতরের দেওয়ালে কিল-ঘুসি মারছিল। বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে ওর চাপা চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল।

জিশান বুঝতে পারছিল, এইভাবে ছেলেটা আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে না। তখন অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগের ব্যাপারটাই মাঠে মারা যাবে। ব্যাগটা ওকে ইমপ্যাক্ট ইনজুরি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু লেকের জল তো ওকে রেহাই দেবে না!

চারপাশে খুব দ্রুত নজর চালিয়ে নিল জিশান।

অন্যান্য বোটের লোকজন এবার মজা দেখছে। বিনাপয়সার রোমাঞ্চকর শো। ওরা গাড়িটার খাবি খাওয়া দেখছে, ছেলেটার মরিয়া হাত-পা ছোড়াছুড়ি দেখছে আর নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে।

রাস্তায় পামগাছের সারির কাছে দাঁড়ানো লোকজনের অবস্থাও তাই।

জিশান আর দেরি করল না। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ছুড়ে দিল বোটের মেঝেতে। তারপর টুপিটাও। এবং ঝাঁপ দিল লেকের জলে।

আগের মজার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হওয়ায় দর্শকরা আবার উঁচু পরদায় হইহই করে উঠল।

জামা-প্যান্ট পরা অবস্থাতেই জিশান গাড়ি লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে লাগল। লম্বা-লম্বা হাত টেনে আধমিনিটের মধ্যেই ও গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেল। ডুবন্ত গাড়ির বনেটের ওপরে উঠে ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। কারণ, ইঞ্জিনের ভারে গাড়ির সামনের দিকটা ডুবে গিয়ে বনেটটা ঢালু হয়ে গিয়েছিল।

টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেও জিশান ডানপায়ের এক প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপরে। একটু পরেই আর-একবার।

গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।

জিশান নীচু হয়ে ঝুঁকে হাত বাড়াল গাড়ির ভেতরে। পলকে আঁকড়ে ধরল ছেলেটার জামা। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে টেনে নিল বাইরে।

ছেলেটা আতঙ্কে চোখ বুজে গোঙাচ্ছিল। জিশান ওকে টেনে নিয়ে ভেসে পড়ল জলে। তাড়াতাড়ি ডুবন্ত গাড়িটার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। কারণ, ডুবে যাওয়া গাড়ির জন্য জলে যে-ঘূর্ণি তৈরি হবে তাতে ও তলিয়ে যেতে চায় না।

ছেলেটা হাঁকপাঁক করছিল। ওর কপালের একপাশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। জিশান ওর চুলের মুঠি ধরে সাঁতরে চলল পামগাছের সারির দিকে।

ততক্ষণে লোকজন ওকে চিনতে পেরে গেছে। ওদের শহরের রিয়েলিটি শো-র হিরো জিশান। তাই ওরা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সব বোট তখন স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে গুনাজি 'দাদা! দাদা! চলে আসুন! আর-একটু! আর-একটু!' বলে চেঁচাচ্ছে। ওর আশপাশে আরও অনেক লোক হাত নাড়ছে।

জিশানের মনে হল, ও যেন একটা কমপিটিশানে নাম দিয়েছে। সেখানে ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ফিনিশ লাইন বা ওইরকম কোনও কিছুর দিকে এগোচ্ছে।

হঠাৎই লেক কন্ট্রোল রুম থেকে ছ'জন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের গায়ে কালো সিল্কের জ্যাকেট। তার বুকে-পিঠে রুপোলি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা : 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট।' ওরা দুটো বোট নিয়ে চট করে পৌঁছে গেল জিশানের দুপাশে। অভ্যস্ত কৌশলে ওদের দুজনকে একটা বোটে তুলে নিল। তারপর বোট দুটো ছুটে চলল পাড়ের দিকে।

জিশানের ভেজা জামা-প্যান্ট থেকে জল ঝরে পড়ছিল। ও ছেলেটাকে দেখছিল। একটু আগে ছটফট করছিল, কিন্তু এখন নিস্তেজ হয়ে চুপচাপ মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

ছেলেটার বয়েস সতেরো কি আঠেরো। ওর থুতনিতে এক চিলতে দাড়ি। আর বাঁ-গালে একটা ছোট্ট লাল ফুল—লেসার ট্যাটু।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ছেলেটার কাছে। ওর কপাল থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার।

ও ছেলেটার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। গালে আলতো করে দুটো চাপড় মারল : 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই যে, শুনতে পাচ্ছ?'

ছেলেটার চোখ এবার জিশানকে দেখতে পেল যেন। কেমন একটা যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

জিশান আবার আলতো চড় মারল গালে। জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কোনও কথা বেরোল না। ওর মুখ থেকে ঝিম ধরানো পেপারমিন্টের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধহয় নেশা-টেশা করেছে।

জিশান ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটা জড়ানো গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'সিমান—।'

•

গুনাজির আঙুল সি থ্রু অটোমোবিলের কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে নড়াচড়া করছিল। জিশান পাশের সিটে বসে আড়চোখে ওর দক্ষতা লক্ষ করছিল। আর মনে-মনে ওর তারিফ করছিল। তুলতুলে পালকটাকে আবার

ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে গুনাজি।

একটু দুশ্চিন্তাও ভেসে বেড়াচ্ছিল জিশানের মনে। মাথা ঘুরিয়ে পিছনের সিটের দিকে একপলক তাকাল ও। নেশায় অচেতন সিমান শুয়ে আছে।

ওকে পাড়ে নিয়ে আসার পর 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' গ্রুপের লোকেরা ওর তদারকি করেছে। ওর ভেজা জামাকাপড় পালটে দেওয়া হয়েছে। ইমার্জেন্সি কেয়ার ইউনিট থেকে চিফ মেডিক এসেছেন, সিমানের ট্রিটমেন্ট করেছেন, ওকে একটা ইনজেকশানও দিয়েছেন—কিন্তু সিমানকে জাগানো যায়নি। অবশ্য ইনজেকশানটা ঘুমপাড়ানোর না নেশা থেকে জাগানোর সেটা জিশান জানে না।

'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর কর্মীরা ব্যাপারটা পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে জানিয়েছে। তারপর যখন ওরা বলল যে, ছেলেটির আইডেনটিটি পাওয়া না গেলে ওকে কয়েকদিন পিস ফোর্সের হেফাজতে থাকতে হতে পারে, তখন জিশান আপত্তি করেছে। এবং ছেলেটির পরিচয় খোঁজার জন্য ওর ভেজা জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখার অনুমতি চেয়েছে।

জিশান এখন সকলের কাছে সুপারহিরো। তাই ওর কথায় 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এর অফিসাররা রাজি হয়ে গেল। জিশান ঝুঁকে পড়ে সিমানের ভেজা জামাকাপড়ের নানান পকেটে তল্লাশি শুরু করল।

একটু পরেই একটা ম্যাগনেটিক কার্ড পাওয়া গেল ওর পকেট থেকে। তাতে লেখা : 'সিমান বিশ্বাস। বাবা রঙ্গপ্রকাশ। মা পর্ণমালা। বাড়ির স্থ্যনাঙ্ক : জে— সেভেনটিন কমা ফরটি সিক্স।' এ ছাড়া রয়েছে ইমার্জেন্সি কনট্যাক্ট কোড।

অফিসারদের অনুমতি নিয়ে নেশায় অচল সিমানকে সি থ্রু অটোমোবিলের পিছনের সিটে তুলে নিয়েছে জিশান। তারপর ও আর গুনাজি সামনের সিটে বসেছে। এবং গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে।

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন থেকে গুনাজি সিমানের ইমার্জেন্সি কনট্যাক্ট কোডে ডায়াল করেছে।

ওপাশে কেউ কথা বলতেই জিশানের হাতে ফোন তুলে দিয়েছে গুনাজি। বলেছে, 'দাদা, আপনি কথা বলুন—।'

'হ্যালো, জিশান বলছি—জিশান পালচৌধুরী...।'

'আমি ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস বলছি...।' কণ্ঠস্বর মসৃণ এবং স্থির রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা পুরোপুরি হল না। শব্দগুলোর উচ্চারণে আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলে গেল।

এই সেই জিশান! যার সাইকোজিক্যাল প্রোফাইলিং নিয়ে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সময় কাটিয়েছেন রঙ্গপ্রকাশ!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই জিশান! কারণ, নিউ সিটিতে জিশান পালচৌধুরী একজনই।

জিশান এবার ধীরে ধীরে সিমানের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা খুলে বলল। বলল যে, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। 'লেক কন্ট্রোল রুম'-এ সিমানের যথাসাধ্য ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। এখন ও জিশানের সি থ্রু অটোমোবিলে শুয়ে রয়েছে—বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিশান ওকে নিয়ে রঙ্গপ্রকাশের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

রঙ্গপ্রকাশের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি কাজ করতে লাগল। মনে হল, হঠাৎই একজন সেলিব্রিটি টিভির পরদা থেকে বেরিয়ে সরাসরি পা রেখেছে রঙ্গপ্রকাশের ঘরে।

রঙ্গপ্রকাশ কেমন একটা অলীক ঘোরের মধ্যে জিশানকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন, 'আপনি আসুন। আমরা আপনার আসার জন্যে ওয়েট করছি—।'

একজিট বোতাম টিপে ফোন রিসেট করল জিশান। ফোনটা গাড়ির সিটে রেখে দিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর সিমানের দিকে একবার দেখল। ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, 'দাদা, আপনাকে এ-শহরের বহু লোক চেনে। ভালোও বাসে।'

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জিশান আনমনাভাবে বলল, 'হুঁ—।'

গাড়ির ড্যাশবোর্ডের প্যানেলে রঙিন নেভিগেশান ম্যাপ। সেখানে উজ্জ্বল লাল রেখায় সিমানের বাড়ির স্থানাঙ্কে পৌঁছোনোর পথ আঁকা রয়েছে। গুনাজি জানাল, সেখানে পৌঁছতে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক লাগবে।

এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। সূর্য হেলে পড়েছে। জিশানের মনে হল, ঠিক এই সূর্যটাই একইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটিতেও।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জিশানের বুক থেকে।

একটু আগে অল্প খিদে পাচ্ছিল। এখন সেই খিদের বোধটা বড্ড জোরালো হয়ে উঠেছে। গুনাজিকে সে-কথাই বলল জিশান। তখন গুনাজি বলল, 'দাদা, আমারও একই অবস্থা। আমাকে পাঁচটা মিনিট টাইম দিন, একটা ফুড মলে গাড়ি লাগাচ্ছি—।'

পাঁচ মিনিট নয়—তার কম সময়েই একটা অদ্ভুত চেহারার ফুড মলের পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল গুনাজি।

ফুড মলটা একটা গাছের মতো শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেইনলেস স্টিল আর কাচ দিয়ে তৈরি। তার ওপর রঙিন আলোর আভা এক অলৌকিক মায়া তৈরি করেছে। ছাই রঙের আকাশের পটভূমিতে এক বিমূর্ত চেহারার আলোকবৃক্ষ।

সিমানকে গাড়িতে রেখে ওরা দুজন নেমে দাঁড়াল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। তাই সানগ্লাসটা আর চোখে দিল না জিশান। শুধু নীল টুপিটা মাথায় দিয়ে নিল।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে সিমানের ওপরে ঝুঁকে পড়ল জিশান। ওর কপালে হাত বুলিয়ে তাপ নিল। না:, জ্বর-টর কিছু নেই।

গুনাজির দিকে তাকাল জিশান : 'আমাদের বেশি দেরি করলে চলবে না। সিমানকে জলদি বাড়িতে পৌঁছতে হবে—।'

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল গুনাজি।

'ওর জন্যে একটা হেলথ ড্রিংক বা ওই টাইপের কিছু নিয়ে নিয়ো। যদি ঘুম থেকে উঠে কিছু খেতে টেতে চায়...।'

'এক লিটারের একটা সফট এনার্জি প্যাক নিয়ে নেব, দাদা।'

ফুড মলের যে-রেস্তরাঁটায় গিয়ে ওরা ঢুকল সেটার নাম 'হেভেনস কিচেন।' রেস্তরাঁর বিশাল বড় প্লেট টিভিতে তখন জিশানের পিট ফাইট দেখানো হচ্ছে। ঘাম-চকচকে শরীর নিয়ে জিশান জাব্বার সঙ্গে লড়ছে।

জিশান একটু অস্বস্তি পেল। মাথার টুপিটাকে টেনে কপালের ওপরে আরও খানিকটা নামিয়ে দিল।

গুনাজি চাপা গলায় বলল, 'দাদা, আপনার ফাইট দেখাচ্ছে।'

'হুঁ—।' বলে একটা খালি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল জিশান। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। গুনাজিও বসে পড়ল ওর পাশে।

স্বচ্ছ টেবিলে ফুটে ওঠা রঙিন ব্যকলাইটেড টাচস্ক্রিন মেনুর দিকে তাকাল গুনাজি। সেখানে হালকা স্ন্যাক্স আইটেমের ওপরে আঙুল ছুঁইয়ে অর্ডার দিল।

রেস্তরাঁটায় বেশ ভিড়। দু-তিনটে টেবিল ছাড়া সব টেবিলেই লোকজন রয়েছে। বেশিরভাগ খদ্দেরই পুরুষ, তবে কয়েকটা টেবিলে ফ্যামিলি চোখে পড়ছে।

প্রায় সকলেরই চোখ টিভির পরদার দিকে। লড়াই দেখতে-দেখতে অনেকে অনেকরকম মন্তব্য করছে। কেউ উত্তেজিতভাবে জিশানকে সাপোর্ট করছে, আর কেউ-বা জাব্বাকে। সব মিলিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন আর হইচই।

জিশানের ভালো লাগছিল না। বারবার গাড়িতে রেখে আসা সিমানের কথা মনে পড়ছিল। কতক্ষণে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সে-কথাই ভাবছিল।

আশপাশের টেবিল থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা ছিটকে এসে ওর কানে ঢুকে পড়ছিল। হঠাৎই ও শুনতে পেল পাশের টেবিলে একজন বলছে, 'এই নিয়মটা বড্ড ফালতু যে, নিউ সিটির কোনও সিটিজেন এইসব কম্পিটিশানে নাম দিতে পারবে না—।'

জিশান তাকাল পাশের টেবিলটার দিকে।

তিনটে ছেলে বসে আছে সেখানে। হ্যামবার্গারে কামড় দিচ্ছে, চোখ প্লেট টিভির দিকে। ওদের সামনে তিনটে প্লেট আর তিনটে গ্লাস। গ্লাসে রঙিন তরল—সফট এনার্জি ড্রিংক কিংবা হার্ড এনার্জি ড্রিংক হতে পারে।

তিনজনের চেহারা তিনরকম, কিন্তু বয়েস আর পোশাক অনেকটা একই রকমের।

একজনের মাথায় কদমছাঁট চুল। গোঁফ কামানো। থুতনিতে একটু দাড়ি—সিমানের মতন। আর কানে চকচকে কোনও ধাতুর মাকড়ি। ছেলেটা বসে থাকলেও লম্বা যে, সেটা বোঝা যায়।

দ্বিতীয়জনের মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোয়ালের দুপাশের হাড় উঁচু। নাকটা থ্যাবড়ানো। নাকের নীচে সরু গোঁফ।

তৃতীয়জনের চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। কপালের ঠিক মাঝখান বরাবর চুলের এলাকা চোখা হয়ে নেমে এসেছে—ইংরেজিতে যাকে 'উইডোজ পিক' বলে। গাল ভাঙা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ডানচোখের ভুরুর ওপরে একটা মাকড়ি ঝকঝক করছে।

ওদের দিক থেকে ভেসে আসা প্রথম কথার টুকরোটা জিশানের কৌতূহল উসকে দিয়েছিল। কারণ, ওর ধারণা ছিল নিউ সিটির কোনও মানুষ সুপারগেমস কর্পোরেশনের কোনও খেলায় নাম দিতে চায় না।

কোঁকড়া চুল তখন বলছে, 'ফালতু মানে? একেবারে ন্যাকাচৈতন নিয়ম। এটা সিন্ডিকেট বোঝে না যে, প্রাইজ মানির কড়কড়ে রোকড়া সব ওল্ড সিটিতে টপকে যাচ্ছে!'

কদমছাঁট চুল তখন বলল, 'ওই যে জিশান নামের ছেলেটা যে লড়ছে, ওকে পালিশ দেওয়া কি খুব একটা টাফ ব্যাপার? শালা ফালতু কিছু নোট এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আর মাঝখান থেকে জিশান বড়লোক হয়ে গেল—।'

কথাগুলো গুনাজির কানেও যাচ্ছিল। ও জিশানের দিকে তাকাল। জিশান ইশারায় ওকে চুপচাপ থাকতে বলল। টুপিটা টেনে আরও খানিকটা সামনের দিকে নামাতে চাইল।

ওদের খাবার টেবিলে এসে গিয়েছিল। ও আর গুনজি মাথা নীচু করে খাওয়া শুরু করল।

চুল ব্যাকব্রাশ করা ছেলেটা বলল, 'দাঁড়া, কালই সিন্ডিকেটে একটা রিটন অ্যাপিল করছি। তাতে রিকোয়েস্ট করব, নিউ সিটির লোকজনও যেন সুপারগেমস কর্পোরেশনের এই থ্রিলিং কমপিটিশানে নাম দিতে পারে—।'

'সিন্ডিকেট?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্নটা করে কদমছাঁট ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল : 'সিন্ডিকেট মানে তো একপাল ইনটেলিজেন্ট বুরবাক—শুধু এই মার্শাল শ্রীধর পাট্টা ছাড়া। যাকগে, সে তুই চিঠি যা লেখার লেখ, কিন্তু বাইরের লোকজন এসে সব মালকড়ি নিয়ে কেটে পড়ছে এ-ব্যাপারটা আমার হেভি গায়ে লাগছে।'

কোঁকড়ানো চুল বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। ওর নজর লক্ষ্য করে সেদিকে তাকাল জিশান।

কয়েকটা টেবিল পরেই একটি ফ্যামিলির চারজন একটা টেবিলে খেতে বসেছে। তার মধ্যে একটি অল্পবয়েসি মেয়েও রয়েছে। বয়েস খুব বেশি হলে কুড়ি-একুশ। পরনে উজ্জ্বল হলদে স্লিভলেস টপ। আর কালো রঙের স্কিনটাইট বারমুডা স্ল্যাক্স। মাথার চুল বিচিত্র ভঙ্গিতে উঁচু করে বাঁধা। টানা-টানা রূপসী চোখ। কপালে লেসার হলোগ্রামের টিপ। গলায় গোলাপি পাথরের একটা মালা।

মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে সম্ভবত ওরা মা-বাবা আর ভাই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল।

কদমছাঁট চুল বাঁকা হাসি হেসে কোঁকড়া চুলের পিঠে একটা থাপ্পড় কষাল।

ব্যাকব্রাশ চুল মজা করে বলল, 'কী সার্ভে করছেন, স্যার?'

কোঁকড়ানো চুল ছেলেটা বন্ধুদের দিকে ফিরে চোখ টিপল : 'গ্রেট স্টাফ। এখন ওর জিয়োগ্রাফি সার্ভে করছি। হিস্ট্রি পরে জানার চেষ্টা করব। আর, বস, হিস্ট্রির পর আসবে আর্কিওলজি—।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই তিনজনে এমন নোংরা ভঙ্গিতে হাসল যে, কথার নোংরা ইঙ্গিতগুলো জিশানের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। ওর গা ঘিনঘিন করে উঠল। সেইসঙ্গে রাগও হল।

গুনাজি জিশানকে লক্ষ করছিল। জিশানের মনের অবস্থাটা বুঝতেও পারছিল। তাই ও টেবিলের ওপরে হাত বাড়িয়ে জিশানের বাঁ-হাতের পাতার ওপরে রাখল, চাপ দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'দাদা, প্লিজ —। এখানকার বেশিরভাগ ছেলেছোকরাই এই টাইপের...।'

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

পাশের টেবিলের তিনটে ছেলেই নিজেদের চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে সরাসরি মেয়েটার দিকে মুখ করে বসল এবং একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে লোভী কুকুরের মতো চেয়ে রইল। শুধু ওদের জিভগুলোই যা বাইরে বেরিয়ে লকলক করছিল না।

গুনাজি বলল, 'দাদা, চলুন, তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা চটপট বেরিয়ে যাই—।'

জিশান 'হুঁ' শব্দ করে খাওয়ায় মন দিল। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওর নজর ছেলে তিনটের অসভ্যতার দিকে চলে যাচ্ছিল।

টিভিতে জিশানের নানান গেম দেখানো হচ্ছিল কিন্তু সেদিকে ওই তিনজনের আর মন ছিল না।

মেয়েটিকেও লক্ষ করছিল জিশান। ও টিভির পরদার দিকে তাকাচ্ছিল, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, আর কখনও-কখনও অসভ্য ছেলে তিনটের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিল, অস্বস্তি পাচ্ছিল।

রেস্তরাঁর অন্যান্য খদ্দের ছেলে তিনটের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু শুধু দেখছিলই—কিছু করছিল না।

মেয়েটি ওর মা-বাবাকে বোধহয় কিছু বলল। ওঁরা ছেলে তিনটের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন আচমকাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

টেবিলে ওঁদের আধখাওয়া প্লেট পড়ে রইল। ওঁরা ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে তিনটেও উঠে দাঁড়াল।

এখন বোঝা গেল, কদমছাঁট চুল ছেলেটা শুধু যে মাথায় লম্বা তা নয়, চওড়াতেও বেশ মানানসই। ওর চোখ দুটো যেন কোটরে বসানো চকচকে মার্বেল—সবসময় এদিক-ওদিক নড়ছে।

ছেলেটার পরনে মেটালিক জিনস। গায়ে একটা প্রিন্টেড পোলো নেক টি-শার্ট।

ওর দু-বন্ধুর টি-শার্টও একই ডিজাইনের—শুধু রং-টা আলাদা।

ছেলে তিনটে নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে মেয়েটার দিকে বাজে ইশারা করছিল। আর বেশ তাড়াহুড়ো করে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোচ্ছিল।



জিশান খাওয়া থামিয়ে দিল। ছেলে তিনটের অভিসন্ধি বুঝতে চাইল।

কিন্তু তার জন্য জিশানকে বেশি মাথা ঘামাতে হল না, কারণ, তার আগেই দক্ষ নাচিয়ের তৎপরতায় কদমছাঁট চুল রেস্তরাঁর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে এবং মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

আর ওর বাকি দুই সঙ্গী তখন মেয়েটির বাবা-মা-ভাইয়ের ঠিক পিছনে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিশান টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু গুনাজি ওর হাত চেপে ধরল। বলল, 'দাদা, আপনি ঝামেলায় জড়াবেন না। তা হলে মার্শাল খেপে যাবেন। এখানকার এটাই দস্তুর। সবাই চুপচাপ দেখে যায়, এড়িয়ে যায়। যা করার পিস ফোর্সের গার্ডরা করে। মেয়েটির সঙ্গে যারা আছে—মানে, ওর বাবা-মা—ওরা পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে ফোন করে দিলেই গার্ডরা চলে আসবে...।'

জিশান গুনাজির দিকে অবাক চোখে তাকাল। জিগ্যেস করল, 'ততক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে এই মেয়েটির হেনস্থা দেখবে?'

'হ্যাঁ।' গুনাজি অনুনয় করে বলল, 'প্লিজ, দাদা, আমার কথাটা শুনুন। চলুন, আমরা বরং চলে যাই—।'

এ-কথায় জিশান কী ভাবল কে জানে! ও উঠে দাঁড়াল।

টেবিলের একপাশে কার্ড সোয়াইপ করার স্লট ছিল। সেই স্লটে জিশানের স্মার্ট কার্ডটা সোয়াইপ করে খাওয়ার বিল মেটাল গুনাজি। তারপর সিমানের জন্য নেওয়া সফট এনার্জি প্যাকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি রেস্তরাঁর দরজার দিকে পা বাড়াল।

কদমছাঁট চুল তখন মেয়েটিকে বলছে, 'তুমি খুব সুন্দর। আর আমি সুন্দর জিনিস পছন্দ করি—।'

মেয়েটি লোফার ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরোতে গেল, কিন্তু ছেলেটা দ্রুত পাশে সরে গিয়ে ওর পথ আগলে দিল।

রেস্তরাঁর অনেকেই এখন টিভির পরদা থেকে চোখ সরিয়ে জ্যান্ত 'নাটক' দেখছে।

জিশান লক্ষ করল, মেয়েটির বাবা কিংবা মা সাহায্য চেয়ে চারপাশের লোকজনের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। হয়তো ওঁরা জানেন, এইভাবে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ নেই।

মেয়েটি এবার বলল, 'সরুন। আমাকে যেতে দিন—।'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে...।'

'আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'তাই?' বলে জোরে হেসে উঠল অসভ্য কদমছাঁট।

জিশান আর গুনাজি ততক্ষণে রেস্তরাঁর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। গুনাজি কী এক অদ্ভুত কারণে জিশানের কবজি মুঠো করে ধরে রেখেছিল—যেমন করে ছোট বাচ্চা বাবার হাত ধরে রাখে। ওর ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি জিশান গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে।

জিশান কদমছাঁটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ, একটু সরুন—আমরা বাইরে বেরোব।'

গুনাজির বুকের ভেতরে তখন অকারণেই ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছিল।

কদমছাঁট ছেলেটা তখনও মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জিশানের কথায় ওর দিকে না তাকিয়েই ছেলেটা সামান্য সরে দাঁড়াল। জিশান আর গুনাজিকে পথ করে দিল। গুনাজি আগে, পিছনে জিশান। গুনাজির হাতে জিশানের হাত।

জিশান হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন—আপনারাও আসুন...।'

এ-কথায় মেয়েটি এক-পা এগোনোমাত্রই হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল কদমছাঁট। ওর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ঠান্ডা গলায় বলল, 'ও এখন যাবে না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি—।'

'কিন্তু ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।'

জিশান এ-কথা বলামাত্রই গুনাজি ওর কবজিতে টান মারল। উত্তরে জিশান একটা ছোট মোচড়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে গুনাজির বুকের ভেতরে বিপদের পাগলাঘণ্টি বাজতে শুরু করল।

কদমছাঁটের দুজন সঙ্গী এখন জিশানের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

জিশান ওদের দিকে একপলক দেখল। ওদের মুখে নেশাগ্রস্ত জঙ্গীভাব ফুটে উঠেছে।

এতক্ষণ পর কদমছাঁট চুলের মালিক জিশানের দিকে ভালো করে তাকাল। ঘেন্নায় নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও। নইলে প্রবলেম আছে।'

'কীসের প্রবলেম?'

এ-কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটা দরজার পাশের ধাতব দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

দেওয়ালের পাত তুবড়ে গেল। দেওয়ালের সঙ্গে ঘুষির সংঘর্ষের শক্তি দরজার ফ্রেমের দিকে প্রবাহিত হয়ে দরজার কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল।

টিভির পরদার দিকে যারা তাকিয়েছিল তাদের নজর ঘুরে গেল দরজার দিকে। চাপা গুঞ্জন শুরু হল। একজন মহিলার ভয়ের চিৎকার শোনা গেল।

জিশান দেখল, ওর সামনে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটির মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কিন্তু ওর মা-বাবা আর ভাইয়ের চোখে আশঙ্কা ছায়া ফেলেছে।

জিশান কদমছাঁটের চোখের দিকে তাকাল। ধীরে-ধীরে বলল, 'দেওয়ালরা খুব ভালো। কখনও পালটা ঘুসি মারে না...।'

কথাটা বলেই জিশান মাথা থেকে নীল টুপিটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল।

•

কদমছাঁট চুল অসভ্য ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানকে চিনতে পারল। ওর চকচকে মার্বেল-চোখ ছিটকে গেল টিভির পরদার দিকে। তারপর জিশানের দিকে। হ্যাঁ, টিভির সুপারহিরোটাই ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছেলেটার মনোযোগ এবার মেয়েটির দিক থেকে সরে গেল—পুরোপুরি চলে এল জিশানের দিকে। এ কী অপূর্ব সুযোগ ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! বরাবর যা নিয়ে ওর সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার সরাসরি সমাধান এই মুহূর্তে এসে গেছে হাতের মুঠোয়! একেই বলে কপাল!

কদমছাঁট চুল হেসে ফেলল। প্রথমে দাঁত-দেখানো নি:শব্দ হাসি—তারপর শব্দ করে তাচ্ছিল্যের হাসি।

জিশান ছেলেটার হাসির অর্থ একটু-একটু বুঝতে পারছিল। ও মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকাল। রেস্তরাঁর ভেতরে যদি হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় তা হলে বাড়াবাড়িরকমের ভাঙচুর হতে পারে। তার চেয়ে রেস্তরাঁর দরজার বাইরে চলে যাওয়া ভালো।

সুন্দরী মেয়েটি জিশানের হাতের নাগালের মধ্যে ছিল। জিশান আচমকা ছোঁ মেরে ওর হাত খামচে ধরল। তারপর এক ঝটকায় ওকে টেনে নিল দরজার বাইরে। একইসঙ্গে চাপা গলায় বলল, 'শিগগিরই এখান থেকে চলে যাও—।'

মেয়েটির মুখে তখন বিহ্বল ভাব। সেটা চট করে কাটিয়ে উঠে ও ইশারায় মা-বাবাকে বাইরে আসতে বলল।

প্রতিক্রিয়া দেখাতে কদমছাঁট চুল কয়েক পলক সময় নিল। তারপর জিশান যা ভেবেছিল ও ঠিক তাই করল। সরাসরি তেড়ে এল জিশানের দিকে। পিছনে ওর দুই শাগরেদ।

রেস্তরাঁর বাইরে একটা বড়সড় লাউঞ্জ। লাউঞ্জে ব্যাক লাইটেড গ্রাফিক গ্লাসের সিলিং আর চারপাশে অনেক বড়-বড় চৌকো ক্রিস্টালের পিলার। পিলারের গায়ে ফুটে উঠছে চলমান রঙিন ছবি—নানান জিনিসের রঙিন অডিয়োভিশুয়াল বিজ্ঞাপন। সেই রঙিন আলো জিশানের গায়ে পড়ছে। ওর মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, জিশান নিজেও একটা রঙিন বিজ্ঞাপন।

লাউঞ্জে যারা চলাফেরা করছিল তাদের দু-চারজন জিশানকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই ছেলেটা সত্যিই কিল গেমে কোয়ালিফাই করা, টিভিতে দেখা, জিশান পাল চৌধুরী কি না তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল।

গুনাজি কখন যেন আবার জিশানের হাত ধরে ফেলেছিল, আলতো করে টান মারছিল। আসন্ন মারপিটের ব্যাপারটাকে ও এড়াতে চাইছিল। কিন্তু এড়ানো যে যাবে না মনে-মনে সেটাও বুঝতে পারছিল।

জিশানের তিন-চার হাতের মধ্যে এসে কদমছাঁট থামল। জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'কী সুপারহিরো, লাইভ টেলিকাস্ট ছাড়া রিয়েলিটি শো হবে নাকি?'

ওর শাগরেদ দুজন একে অপরের দিকে চোখ ঠারল। তারপর হেসে চেঁচিয়ে বলল, 'জিশান, তুমি জিতলে আমরা চাঁদা তুলে তোমাকে প্রাইজমানি দেব। মাইরি—কসম খেয়ে বলছি...।' নিজের টুটিতে আঙুল ছোঁয়াল একজন।

'জিশান' নামটা শোনামাত্রই গুঞ্জন উঠল লাউঞ্জে। জিশানদের ঘিরে ভিড়টা আরও গাঢ় হল। ভিড়ের বৃত্তের দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্তরে মেয়েটি সপরিবারে দাঁড়িয়েছিল। চিবুক উঁচু করে জিশানকে স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করছিল। ওর মুখে উদ্বেগের ছোঁয়া।

কদমছাঁট ছেলেটা হাতের চার আঙুল নেড়ে জিশানকে কাছে আসার জন্য ওসকাচ্ছিল আর বলছিল, 'এসো, সুপারহিরো—দাদাগিরির প্রাইজমানি নেবে এসো। ও:, কাম অন—।'

ওর শাগরেদ দুজনের একজন—বোধহয় কোঁকড়া চুল—হিংস্র গলায় কদমছাঁটকে লক্ষ করে বলল, 'চামোন, মালটাকে গিলে খেয়ে নে!'

জিশান বুঝতে পারছিল, মেয়েটির ব্যাপারে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়াটা ওর ঠিক হয়নি। কদমছাঁট চুল ছেলেটিকে ওর ঠান্ডা মাথায় বোঝানো উচিত ছিল। কারণ, অসভ্যতাকে অ-সভ্যতা দিয়ে রুখলে ব্যাপারটা শেষ হতে চায় না। নিউক্লিয়ার চেইন রিয়্যাকশনের মতো তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চলতেই থাকে। যেমন এখন চলছে।

তাই জিশান আচমকা গুনাজির মুঠো থেকে নিজের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে ফেলল। চামোনকে অনুরোধের গলায় বলল, 'ভাই, কিছু মনে করবেন না। আমাদের কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে—।'

'তাই?' চামোন ন্যাকা গলায় জিগ্যেস করল। তারপর ওরা তিনজনেই বস্তির নোংরা ভাষায় গালাগাল ছুড়ে দিল।

জিশান তাও হাল ছাড়ল না। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে ওদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

উত্তরে সমবেত জনতাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে চামোন জিশানের রগে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল।

পটকা ফাটার শব্দ হল। জিশানের বাঁ-কানে তালা লেগে গেল পলকে। একইসঙ্গে ও কাচ-চকচকে মার্বেলের মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

ও যাতে গায়ের ওপরে এসে না পড়ে সেজন্য ভিড়ের বৃত্ত চট করে সরে গেল পিছনে। চিৎকারের একটা ঢেউ উঠল লাউঞ্জে।

গুনাজি আর দেরি করল না। পকেট থেকে একটা স্যাটেলাইট ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল। পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

জিশান ঘুসির আঘাতটা সামলে নিতে পারল। মাসের পর মাস ধরে নিউ সিটিতে ট্রেনিং নিয়ে ও লড়াই করতে যেমন শিখেছে, সহ্য করতেও তেমন শিখেছে। ওর রোজকার ওয়ার্কআউট রুটিনে এক কণাও ছন্দপতন হয়নি। তাই মেঝেতে দুবার পাক খেয়েই ওর শরীরটা আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছে।

চামোন তখন পরের আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ওদের ঘিরে মানুষের ভিড় আরও বেড়েছে। জিশানকে চিনতে পেরে অনেকেই অবাক হয়ে গুনগুন করে ওর নাম বলছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

জিশান শান্ত গলায় চামোনকে বলল, 'ভাই, আমি মারপিট করতে চাই না। মারপিট আমার ভালো লাগে না। প্লিজ, কুল ডাউন। আমি...।'

উত্তরে চামোন ওর শরীরটা একপাশে হেলিয়ে জিশানকে লক্ষ করে জোরালো লাথি চালাল। জিশান কথা বলতে-বলতেই দু-হাত একজোট করে অনায়াসে লাথিটা রুখে দিল।

'প্লিজ, আমার কথা শুনুন...' জিশান বলতে লাগল, 'মাথা ঠান্ডা করুন। আপনারা রেস্তরাঁয় ফিরে যান। হাতজোড় করে বলছি, মারপিট আমি ভালোবাসি না। শুধু ওই মেয়েটিকে আপনারা ডিসটার্ব করছিলেন বলে...।'

জিশানের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা লাথি এসে পড়ল ওর শরীরে। যেহেতু লাথিটা এসেছে ওর পিছন থেকে তাই জিশান এটা রুখতে পারল না। আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

লাথিটা মেরেছিল চামোনের ব্যাকব্রাশ চুল বন্ধু। সে কখন যেন জিশানের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুকে শাসিয়ে উঠেছে চামোন : 'অ্যাই, কিছু করবি না। আমি একা। আমি একা—।'

এ-কথায় ব্যাকব্রাশ চুল দমে গেল। ওর মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

কথা বলতে-বলতে জিশানের হাত ধরল চামোন। ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। ওর দিকে তাকিয়ে ন্যাকাবোকা ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'আমি একা। তোমাকে আমি একা খতম করব, সুপারহিরো।'

গুনাজির খুব খারাপ লাগছিল। প্রথমটায় ওর মনে হয়েছিল জিশান বুঝি নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা মোকাবিলায় নেমে পড়তে চাইছে। কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো দেখে ওর উলটোটাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, না, জিশান মারপিট ভালোবাসে না।

জিশান খুব সময়মতো নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এটা ঠিকই যে, চামোনের অসভ্য আচরণ ওর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল। ও ভেবেছিল, চামোনদের উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে হয়েছে, সেটা ঠিক হবে না। হিংসা আর প্রতিহিংসা মানুষকে কখনও এগিয়ে দেয় না। তা ছাড়া ওর কন্ট্রোলড ফ্রিডমের কথা মনে পড়েছিল। হয়তো এখানে গন্ডগোল করলে কাল থেকে ওর গুনাজির সঙ্গে বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে। জিপিসি-র গেস্টহাউসেই দমবন্ধ করে মুখ গুঁজে থাকতে হবে। তারপর দেখতে-দেখতে এসে

যাবে ২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। জিশানের বাঁচা-মরার দিন। কিল গেম। হয়তো তিন তারিখ থেকে জিশান আর কিছুই দেখতে পাবে না। মিনিকে না, অর্কনিশানকেও না।

জিশান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অল্প-অল্প টলছিল, আর এসব কথা ভাবছিল।

চামোন জিশানের গালে অসম্ভব জোরালো একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল। জিশানের মুন্ডুটা এক ঝটকায় ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

জিশান যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু সেটা একটা ছোট্ট টুকরো মাত্র। চিৎকারের বাকিটা ও দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় আক্ষেপের শব্দ বেরিয়ে এল জিশানদের ঘিরে থাকা দর্শকদের ঠোঁট চিরে।

জিশান চোখে ঝাপসা দেখছিল। চারপাশের বিজ্ঞাপনের মিউজিক আর দর্শকদের গুঞ্জন কেমন জড়িয়ে জট পাকিয়ে হিজিবিজি শোনাচ্ছিল। ও কেমন করে চামোনদের বোঝাবে, নিউ সিটির লড়াইয়ে ও সাধ করে আসেনি! ওকে ফাঁদে ফেলে এখানে আনা হয়েছে।

জিশানের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পিস ফোর্সের মার্শাল শ্রীধর পাট্টার ওপরে। চামোনদের এইরকম বখে যাওয়া আচরণের জন্য ওই শয়তান লোকটাই দায়ী। ওই লোকটাই নিউ সিটির মানুষের কাছে ভ্যালু আর প্রাইস—এই দুটো শব্দের মানে একাকার করে দিয়েছে।

জিশানের রাগটা আবার উথলে উঠছিল। ও গুনাজির দিকে একবার তাকাল। তাকানোর ভঙ্গিতে বোধহয় অনুমতি চাওয়ার একটা নীরব আরজি ছিল। সেই করুণ রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে গুনাজির চোখে জল এসে গেল। ও কান্না চেপে ভাঙা গলায় বলল, 'দাদা, আর মার খেয়ো না। আমি পিস ফোর্সে খবর দিয়েছি। কিন্তু ওরা আসতে-আসতে তুমি...তুমি...শেষ হয়ে যাবে...।' কথা শেষ করতে-করতে কেঁদে ফেলল গুনাজি। আর ঠিক তখনই চামোনের পা গুনাজির পেট লক্ষ করে ধেয়ে এল।

সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হল। একইসঙ্গে গুনাজির মুখ দিয়ে একটা বীভৎস 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল। গুনাজির হাত থেকে সিমানের জন্য কেনা এনার্জি ড্রিংকের প্যাকটা ছিটকে পড়ল। ওর রোগা লম্বা শরীরটা ভাঁজ হয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল দর্শকদের ঘাড়ে। একটা মেয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

জিশান যেন একটা শক খেল। ঝাপসা নজর স্পষ্ট হয়ে গেল পলকে। চটপট হাত-পা নেড়ে ও শরীরের ভেতরের একটা অদৃশ্য সুইচ অন করে দিল। শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের সুইচ।

জিশান সবে চামোনের দিকে এক পা এগিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। ফুড মলের দুজন সিকিওরিটি গার্ড গোলমালের খবর পেয়ে অকুস্থলে এসে হাজির হয়েছে। ওদের পরনে খাকি আর কালো রঙের নকশাদার ইউনিফর্ম। মাথায় কাপড়ের টুপি। হাতে লম্বাটে ওয়াকিটকি।

গার্ড দুজন চিৎকার করতে-করতে আসছিল আর মাঝে মাঝে ওয়াকিটকিতে কথা বলছিল।

ওরা ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে-ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। চামোন আর জিশানকে লক্ষ করে একজন বলল, 'অ্যাই এক্ষুনি হুজ্জুতি বন্ধ করো। যাও, বাইরে যাও!'

দ্বিতীয় গার্ড বলল, 'এখানে এসব লাফড়া চলবে না। এক্ষুনি পিস ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব...।'

এরপর যা হল সেটা জিশান কল্পনাও করেনি।

চামোন গার্ড দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নি:শব্দে হাসছিল। কিন্তু ওর দুজন দোস্ত সবাইকে চমকে দিয়ে গার্ড দুজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কোঁকড়ানো লম্বা চুল ছেলেটা সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় একজন গার্ডের ওয়াকিটকি কেড়ে নিয়ে সেটা প্রবল শক্তিতে সেই গার্ডের ব্রহ্মতালুতে বসিয়ে দিল। গার্ডটা একটা 'আঁক' শব্দ করে স্রেফ খসে পড়ল মেঝেতে।

ভুরুতে মাকড়িওয়ালা ব্যাকব্রাশ চুল সরাসরি দ্বিতীয় গার্ডটার গলা টিপে ধরল দু-হাতে। এবং নিজের মাথা দিয়ে সাংঘাতিক এক ঢুঁ মারল।

গার্ডটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে। তখন ব্যাকব্রাশ চুল ওকে এমন হেলাফেলা করে ছুড়ে দিল যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল—তাও আবার জলে ভেজা।

গার্ড দুজনকে ডিঅ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে, জমায়েত পাবলিক হইচই চিৎকার করারও সুযোগ পেল না। মুহূর্তের জন্য সবাই কেমন থম মেরে গেল।

কদমছাঁট চুল হঠাৎই শব্দ করে হাততালি দিয়ে উঠল। আর একইসঙ্গে একজোড়া বন্ধুকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'শাবাশ! জিয়ো:!'

উত্তরে ব্যাকব্রাশ চুল মাথা নেড়ে সিটি বাজাল তিনবার। তারপর গার্ড দুজনের নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় নোংরা খিস্তি করে উঠল।

চামোন বক্সারদের মতো লাফাতে-লাফাতে জিশানের কাছে এগিয়ে এল। তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারার জন্য ডানহাতটা মুঠো করে পিছিয়ে নিয়ে এল।

গুনাজি আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'দাদা, এবার মারো! পালটা মারো!'

জিশান যেন হঠাৎই ঘুম থেকে জেগে উঠল। হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারল ওর গাঁধিগিরি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ গাঁধিগিরি প্রয়োগ করা যায় মানুষের ওপরে—অমানুষের ওপরে নয়। তা ছাড়া যে-গুনাজি একটু আগে ওকে 'ঝামেলায়' জড়াতে বারণ করছিল সে-ই গুনাজিই এখন বলছে, 'দাদা, এবার মারো! পালটা মারো!'

জিশানের তাজ্জব লাগল। দুনিয়া কী দ্রুতই না রং পালটায়।

সুতরাং জিশান ডানহাঁটু ভাঁজ করে শূন্যে লাফ দিল বাজপাখির মতো। সামনে হাত বাড়িয়ে দু-হাতের তালুতে বন্দি করল কদমছাঁটের মাথা। এবং হাঁটুর গাঁট দিয়ে ওর চিবুকের নীচে এক মরণ-আঘাত করল।

ব্যাপারটা সেখানেই থামল না। ওর মুন্ডু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মেঝেতে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল জিশান। সেই প্রবল টানে মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি হল। শব্দ শুনে মনে হল এই বুঝি কারও খুলিতে ফাটল ধরল।

জিশানের মুখে তখন ছুঁয়ে রয়েছে কদমছাঁটের মুখ। নাকে আসছে উৎকট ঘামের গন্ধ। জিশান যেন চিড়িয়াখানায় কোনও জন্তুর খাঁচায় ঢুকে পড়েছে হঠাৎ।

নিউ সিটি জিশানকে লড়াইয়ের এইসব কলাকৌশল শিখিয়েছে। শিখিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাই নিউ সিটির এই অসভ্য জানোয়ারটাকে নিউ সিটির শিক্ষা ফেরত দিচ্ছিল ও। এবং তারই শেষ দফা হিসেবে ও কদমছাঁটের গালে ভয়ংকর এক কামড় বসাল। ব্যাকরণের বাইরে লড়াই।

এর ফলে যে-চিৎকারটা তৈরি হল তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কসাইখানায় ছুরি যখন আগু-পিছু করে কোনও শুয়োরের গলা কাটে তখন সে বোধহয় এরকম আর্তনাদই করে থাকে।

জিশান শরীরটাকে কয়েক পাক গড়িয়ে ছিটকে সরে এল চামোনের কাছ থেকে। ও তখন গালে হাত চেপে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে আর একইসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে-চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

পাবলিক এবার চিৎকারের ঢেউ তুলল। তাতে উত্তেজনার সঙ্গে মিশে আছে ভয়ের ছোঁয়া। কেউ-কেউ ভয়ে সরে গেল অন্য কোথাও। কারা যেন কাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। কেউ বা ব্যস্তভাবে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপছে।

জিশান উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ, মুখ, চোয়ালের রেখা এখন অন্যরকম লাগছে। জিভে নোনা স্বাদ। সত্যিই ও এখন কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

চামোনের দু-বন্ধু জিশানের প্রতিরোধের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জিশানের ক্ষমতা আর শক্তি ওরা এতক্ষণ আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু এখন আঁচ করতে পারা সত্ত্বেও বন্ধুর হেরে যাওয়ার অপমানের বদলা নিতে ওরা তিরবেগে ঝাঁপিয়ে এল জিশানের দিকে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ওরা বুলেটের মতো জিশানের দিকে আসছিল, কিন্তু ওদের রুখে দিল পাবলিক।

কোঁকড়াচুল আর ব্যাকব্রাশ এটা কল্পনাও করেনি। ওদের সঙ্গে পাবলিকের হুড়োহুড়ি আর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। রেস্তরাঁর সামনের লাউঞ্জটা মুহূর্তে কুরুক্ষেত্রের চেহারা নিল।

জিশানের চোখ এবার গুনাজিকে খুঁজতে লাগল।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। বরং গুনাজিই ওকে খুঁজে নিল। জটলার ফাঁক দিয়ে আচমকা হাজির হল। তারপর জিশানের হাত ধরে টান মারল : 'দাদা, শিগগির চলে এসো—।'

ওরা দুজনে প্রায় দৌড়তে শুরু করল।

অটো-এলিভেটরে করে নামার সময় জিশান বলল, 'সিমানের এনার্জি প্যাক তো আর নেওয়া হল না...।'

গুনাজি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'পথে কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিয়ে নেব।'

জিশানের ভালো লাগছিল না। ওর গাল জ্বালা করছিল। ও মারপিট করতে চায়নি। হুলস্থূল বাধাতেও চায়নি। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল!

পার্কিং লটে এসে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। জিশান তাকাল সিমানের দিকে। এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

গুনাজি গাড়িতে স্টার্ট দিতেই জিশান বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'চিন্তা কোরো না, দাদা—এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

বাইরে সন্ধে নেমে গেছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে গেছে। কখনও-কখনও চোখে পড়ছে বিজ্ঞাপনের রঙিন নকশা। এই রাতটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই নিউ সিটি হিংসা আর প্রতিহিংসার ব্যাবসা করে।

জিশানের নিজের ওপরে ঘেন্না হল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ও অনেকটা যেন আপনমনেই বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি মারপিট করতে চাইনি...।' নাকি কথাটা ও বলল মিনিকে?

সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখে গুনাজি বলল, 'জানি, দাদা। আমি মার্শালের অফিসে খবর পৌঁছে দিয়েছি। বলেছি, তোমাকে ওই গুন্ডাগুলো টরচার করতে-করতে মেরেই ফেলত। বলেছি, তোমার কোনও দোষ নেই। দেখো, মার্শাল তোমাকে কিছুই বলবে না—গ্যারান্টি।'

শেষ শব্দটা শুনে জিশানের হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসতে গিয়েই গালে টান পড়ল। গালের জ্বালাটা বেড়ে গেল।

রঙ্গপ্রকাশের বাড়ি আর কতদূর? মনে-মনে ভাবল জিশান।

•

একটা আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে ছিলেন শ্রীধর পাট্টা। ধনুকের মতো বাঁকানো এল. সি.ডি. পরদায় একটা লোকের নিরীহ মুখ। ফরসা। বেশ গোলগাল দেখতে। চোখগুলো ছোট-ছোট। গালে থুতনিতে খাপছাড়াভাবে হালকা দাড়ি।

মুখটা খুঁটিয়ে দেখে শ্রীধরের পছন্দ হল। দারুণ কনট্রাডিকশান। দেখে যা মনে হয় না লোকটা ঠিক তাই। লোকটার মুখে কেমন একটা নিষ্পাপ বাচ্চা-বাচ্চা ভাব। অথচ লোকটা প্রথম সারির একজন হার্ডকোর ক্রিমিনাল। অপাশি কানোরিয়া। বয়েস পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ।

ওর যা বয়েস ওর খুনের সংখ্যাও প্রায় তাই। এ পর্যন্ত বত্রিশটা খুন করেছে অপাশি। তার মধ্যে তিনটে ফ্যামিলি আছে যাদের ও এক-এক খেপে খুন করে রক্তের হোলি খেলেছে। পরিভাষায় যাকে বলে ম্যাসাকার।

প্রথম ফ্যামিলিতে চারজন ছিল। মাঝবয়েসি বাবা-মা। আর তাদের সদ্য তরুণ ছেলে আর মেয়ে। চপার হাতে আধঘণ্টার মধ্যে সেই চারজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় খতম করেছিল অপাশি। ওদের ফ্ল্যাট রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ফ্যামিলিতে ছিল পাঁচজন। অল্পবয়েসি বাবা-মা, আর তাদের ছোট-ছোট তিন সন্তান। দু-ছেলে, এক মেয়ে।

এই হত্যালীলায় অপাশি কানোরিয়ার অস্ত্র ছিল চপার আর শাবল। শাবলটা ও ওদের বাড়ির বাগানে খুঁজে পেয়েছিল।

তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে, বয়েসে সবচেয়ে ছোট আট বছরের মেয়েটাকে অপাশি সবার শেষে খুন করেছিল। ওকে তাড়া করে অপাশি ধরে ফেলে বাড়ির বাগানে। তারপর ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে জঘন্য হেনস্থা করে শাবল দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল।

তৃতীয় ফ্যামিলিতে সদস্যের সংখ্যা ছিল তিন। বাবা-মা আর ষোলো বছরের একটি মেয়ে।

মাথায় থান ইটের বাড়ি মেরে অপাশি প্রথমে ওদের তিনজনকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তারপর ইলেকট্রিকের তার দিয়ে কষে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। সবশেষে ওদের গায়ে পেট্রল ঢেলে ওদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

এ ছাড়া নানান কারণে অপাশি প্রচুর খুচরো খুন করেছে। ক্রিকেট খেলায় বাউন্ডারি না মেরে খুচরো এক রান কি দু-রান নেওয়ার মতো। ওর খুন-খুন খেলায় বাউন্ডারি বলতে ওই তিনটে : চার, পাঁচ, আর তিন।

আর্ক কম্পিউটারের পরদায় অপাশি কানোরিয়ার হুলিয়া দেখছিলেন শ্রীধর। আর ওর অত্যন্ত পোটেনশিয়াল সি-ভি খুটিয়ে পড়ছিলেন। কিল গেমের পক্ষে অপাশির সি-ভি সত্যিই এক্সপ্লোসিভ মেটিরিয়াল।

অপাশি কানোরিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার সবই রয়েছে এই সফট ফাইলে। আর সমস্ত বিবরণের পর রয়েছে ফোটো-ফাইল। সেখানে অপাশির নানান ঢঙে তোলা অসংখ্য রঙিন ছবি রয়েছে। আর তার পরে, ওর জীবনীর শেষ অধ্যায় হিসেবে, রয়েছে ওর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল।

পরদার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শ্রীধর পাট্টা লেখাগুলো এক মনে পড়ছিলেন আর ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন। একইসঙ্গে মনের মধ্যে খুশি ছটফটিয়ে উঠছিল। কিল গেমে জিশানের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অপাশি কানোরিয়া ক্যান্ডিডেট হিসেবে একেবারে 'খাপে খাপ, আবদুল্লার বাপ!'

ঠোঁটের কোণে হাসলেন শ্রীধর। কনট্রাডিকশান। সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল যা বলছে, খুনি হিসেবে কানোরিয়ার দক্ষতা, হিংস্রতা আর অভিজ্ঞতা যা বলছে, ওর ফোটোগ্রাফগুলো ঠিক তার বিপরীত। যেন হাসি-খুশি এক নিষ্পাপ গোলগাল শিশু—যে একটা মশাও মারতে পারে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। কিল গেমে জিশান পালচৌধুরীর সঙ্গে খেলার জন্য প্রথম প্লেয়ার বাছা হয়ে গেছে।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলেন। হাঁ করে মুখ তুললেন ওপরদিকে। শিশির ছিপি খুলে কয়েক ফোঁটা এনার্জি সল জিভে ঢাললেন। তারপর আওয়াজ করে স্বাদ নেওয়ার ঢঙে জিভ দিয়ে টাকরায় টকাস-টকাস শব্দ করলেন। শরীরে শক্তির আগুন ঝাঁজিয়ে উঠল।

কিল গেমের তারিখ ক্রমশ এগিয়ে আসছে—দরজায় কড়া নাড়ছে।

শ্রীধর পাট্টার পাশে তিনজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের গায়ে ব্ল্যাক ইউনিফর্ম। নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলের সব অফিসারের পোশাকই এইরকম। শুধু চিফ জেলারের বুকে দশটা সিলভার স্টার বসানো।

চিফ জেলার হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীধরের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেহারায় ছোটখাটো কিন্তু স্মার্ট। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা।

হরিমোহন জানেন যে, জানেন যে, কিল গেমের আগে মার্শাল নিজে সেন্ট্রাল জেলে আসেন। কিল গেমের তিনজন প্লেয়ারকে চুলচেরা বিচারের পর সিলেক্ট করেন। সেই সিলেকশানের সময় মার্শালের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ডেথ সেন্টেন্স পাওয়া অপরাধীদের সম্পর্কে নানারকম তথ্যের জোগান দিতে হয়। সেজন্যই হরিমোহন সঙ্গে দুজন জুনিয়ার অফিসারকে ডেকে নিয়েছেন।

ওঁরা চারজন এখন যে-ঘরটায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা সেন্ট্রাল জেলের কন্ট্রোল রুম।

নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির সীমানার গা ঘেঁষে সেন্ট্রাল জেলের চার কিলোমিটার বাই দু-কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা। শুটারে চড়ে উড়ে আসার সময় ওপর থেকে নীচে তাকালে সেন্ট্রাল জেলের মানচিত্রটা ছবির মতো ধরা পড়ে।

জেল এলাকার একটা দিক পরিখা বরাবর টানা দু-কিলোমিটার। সেদিক দিয়ে কোনও অপরাধীর জেল ভেঙে পালানোর কোনও উপায় নেই। কারণ, পরিখার খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল। সেই দেওয়াল বরাবর পঁচিশ ফুট গভীরতায় গেলে তবেই জলের শুরু। আর সেই গভীর খালের মধ্যে কিলবিল করছে বিষধর সাপ আর পিরানহা মাছ। ওরা যাতে আরামে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য জলের উষ্ণতা, নোনতা ভাব—সবকিছুই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পরিখার দিকটা জেল বিল্ডিং-এর পিছনদিক। বিল্ডিংটা লম্বায় পাঁচশো মিটার। একতলা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। বিল্ডিং-এর সব গেটেই বুলেটপ্রুফ পলিমারের অটোমেটিক শাটার। সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম দিয়ে লক করা।

জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ডানদিকে আর বাঁ-দিকে সাড়ে সাতশো মিটার করে ধু-ধু মাঠ। আর সামনে চার কিলোমিটার ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেড়-দু-ইঞ্চি লম্বা মিহি ঘাসের শিষ ছাড়া আর কিছু নেই। তাও ঘাস রয়েছে কোথাও-কোথাও—বেশিরভাগ জায়গাটাই ধুলো মাখা ধূসর মাঠ।

জেল বিল্ডিং ছাড়া বাকি জায়গাটা হাতের তালুর মতো ফাঁকা। পোকামাকড় ছাড়া আর কোনও প্রাণীর পক্ষে সেই খোলা জায়গায় লুকোনো সম্ভব নয়। যদি কোনও ক্রিমিনাল জেল ভেঙে পালাতে পারে তা হলে জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাকে ধু-ধু মাঠের ওপর দিয়ে অন্তত সাড়ে সাতশো মিটার পেরোতে হবে।

সেই সময় তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসবে রক্ষীদের মিসাইল পিস্তলের গুলি। এই আলট্রামডার্ন পিস্তলের গুলি ইনফ্রারেড সোর্স লক্ষ্য করে ছুটে যায়। মানুষের শরীর থেকে যে-ইনফ্রারেড তাপ-তরঙ্গ বেরোয় সেটাই গুলিটাকে জানিয়ে দেয় কোথায় গিয়ে তাকে আঘাত করতে হবে। মানুষটা যেভাবেই এঁকেবেঁকে দৌড়োক না কেন গুলিও 'বুদ্ধিমান' ছুঁচোবাজির মতো তার পিছন-পিছন এঁকেবেঁকে ছুটবে। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ছুটন্ত মানুষটাকে গতিতে হারিয়ে দেবে। এবং খেল খতম।

ধরে নেওয়া যাক, কোনও অপরাধী মিসাইল পিস্তলের গুলিকে ফাঁকি দিয়ে জেল এলাকার সীমানায় পৌঁছতে পারল।

সেখানে তার মুখোমুখি হবে কুড়ি ফুট উঁচু বুলেটপ্রুফ পলিমারের মসৃণ স্বচ্ছ পাঁচিল। সেই পাঁচিল পেরোলেই মুক্তি।

কিন্তু সেই পাঁচিলের মাথার দিকে প্রায় এক ফুট-জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো সমান্তরাল তামার তার। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। পলিমার অন্তরক পদার্থ হওয়ায় তামার তারগুলো পলিমারের মধ্যে অর্ধেকটা করে গেঁথে বসানো—পরিভাষায় যাকে বলে এমবেড করা। সেই তারে রয়েছে 6.6 কিলোভোল্ট এসি সাপ্লাই।

স্বচ্ছ পাঁচিলের মাথায় যদি কেউ উঠতে চায় তা হলে তাকে ভয়ংকর শক খেয়ে মরতে হবে।

জেল এলাকার ধু-ধু মাঠের নানান জায়গায় রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার।

ওয়াচ টাওয়ারগুলো একটু অদ্ভুত চেহারার।

স্বচ্ছ ফাইবারের একটা লম্বা খুঁটি খাড়া উঠে গেছে ওপরদিকে। সেই খুঁটির মাথায়—প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে—রয়েছে একটা ট্রান্সপারেন্ট কিউবিকল। সেখানে একজন সান্ত্রী মিসাইল পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ওয়াচ টাওয়ারে যেহেতু ওঠা-নামার কোনও সিঁড়ি নেই তাই সান্ত্রী বদলের কাজটা করা হয় শুটার দিয়ে। সেন্ট্রাল জেলের আন্ডারে মোট দশটা শুটার রয়েছে।

ওয়াচ টাওয়ারের মাথা থেকে ছাতার ফ্রেমের মতো ন'টা মেটালিক আর্ম বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় দশমিটার লম্বা এই বাহুগুলোর প্রান্তে লাগানো রয়েছে অতি শক্তিশালী মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প। রাতে এই বাতিগুলো জেল এলাকাকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। সেই আলোয় একটা নেংটি ইঁদুরও ছায়ার আড়াল খুঁজে পায় না।

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেল নিউ সিটির গর্ব। দেশবিদেশ থেকে বহু হোমরাচোমরা মানুষ এই হাই-টেক আলট্রামডার্ন জেল দেখতে আসেন। এটা শ্রীধর পাট্টার খুব ভালো লাগে। গর্বে বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলেও ওঠে হয়তো। কারণ, এই সেন্ট্রাল জেলের চিফ ডিজাইনার শ্রীধর নিজে।

শ্রীধর পাট্টা চেয়ারে বসে পড়লেন আবার। হরিমোহনকে ইশারায় বসতে বললেন। হরিমোহন ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে বোধহয় একটা বেয়াদব ব্যথাকে শায়েস্তা করলেন। তারপর একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে শ্রীধরের একরকম মুখোমুখি বসে পড়লেন। ওঁদের দুজনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আর্ক কম্পিউটারের মনিটর চোখে পড়ছিল। সেখানে অপাশি কানোরিয়ার বেশ কয়েকটা রঙিন ফোটোগ্রাফ।

বাঁ-হাতের পিঠের ওপরে ডানহাতের আঙুল দিয়ে কয়েকবার তাল ঠুকলেন শ্রীধর। ছোট করে ওপর-নীচে থুতনি নাড়লেন কয়েকবার। তারপর খুব আলতো গলায় বললেন, 'এই ক্রিমিনালটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। জিশান পালচৌধুরীর মোকাবিলা করতে হলে এরকম হার্ডকোর ক্রিমিনালই দরকার। ওর সি-ভি আমার দারুণ লেগেছে।' অল্প হাসলেন শ্রীধর : 'ওকে কোথায় পেলেন? লাস্ট কিল গেমের সময় যখন আমি সিলেকশানে এসেছিলাম তখন ওর সি-ভি তো স্টোরেজ ফাইলে ছিল না!'

ছোট্ট করে দুবার কাশলেন হরিমোহন। মার্শালের স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে উপায় নেই!

তারপর ওপরের ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন, স্যার। অপাশি কানোরিয়া আমার জেলে এসেছে আড়াই মাস। ওর ডোসিয়ারের ফার্স্ট পেজে ওর এন্ট্রির তারিখটা লেখা আছে। ওল্ড সিটির নর্দার্ন বেল্টের পাহাড়ি এলাকা থেকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম।'

'আমি ওর ফাইলটা ওপর-ওপর স্ক্যান করেছি। ভয়ংকর মানুষ হিসেবে খুবই অ্যাট্রাকটিভ সি-ভি। ওর টোটাল ফাইলটার একটা সফট কপি আর একটা হার্ড কপি কাল বিকেলের মধ্যে আমার কিল গেমের ইন-বক্সে পাঠিয়ে দেবেন। এখন ওর ব্যাপারে ইন আ নাটশেল কিছু আমাকে বলবেন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন হরিমোহন। বিনা প্রয়োজনে হাত কচলানোর ঢঙে হাতে হাত ঘষলেন। তারপর : 'আপনি এগজ্যাক্টলি কী জানতে চাইছেন জানি না, স্যার... তবে...অপাশির ফেরোসিটি কোশেন্ট হল 9.4—অর্থাৎ, আলট্রা-হাই রেঞ্জে...।'

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলে ভয়ংকর ক্রিমিনালদের রেটিং ঠিক করা হয় ফেরোসিটি স্কেল দিয়ে—অনেকটা ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলের মতো। একজন অ্যাভারেজ ক্রিমিনালের ফেরোসিটি কোশেন্ট হল 4.5□ আর, একজন সিরিয়াল কিলারের ফেরোসিটি কোশেন্ট 8.0□

শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ডক্টর মনসুখ চক্রপাণি আর ডক্টর গণপত আচারিয়া—যাঁদের শ্রীধর যথাক্রমে 'এ' এবং 'কিউ' বলে ডাকেন—এই ফেরোসিটি স্কেলের কনসেপ্ট আর তার ভ্যালু কমপিউট করার ইমপিরিক্যাল ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন। সেন্ট্রাল জেলে সব অপরাধীরই ফেরোসিটি স্কেল হিসেব করা আছে।

'চমৎকার! চমৎকার!' হাঁটুতে ছোট-ছোট তিনটে চাপড় মারলেন শ্রীধর। ফেরোসিটি স্কেল যার ৯.৪ তার কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করা যেতে পারে।

দুবার জোরে-জোরে নাক টানলেন। তারপর ভুরু উঁচিয়ে হরিমোহনকে জিগ্যেস করলেন, 'আর ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ? সেটা কীরকম?'

হরিমোহন চটপট জবাব দিলেন, 'সেটাও খারাপ নয়। তবে ওর হাত আর কাঁধে জোর সবচেয়ে বেশি। স্রেফ চপার চালিয়ে অপাশি একটা ছোটখাটো গাছের গুঁড়ি এককোপে কেটে ফেলতে পারে—।'

'আর কোনও ইমপরট্যান্ট ইনফরমেশান?'

একটু ইতস্তত করলেন। তারপর : 'এটা আদৌ কোনও ইনফরমেশান কি না জানি না—তবে অপাশি একটু একাচোরা টাইপের...।'

'মানে?'

'মানে...মানে...সবসময় একা-একা থাকতে ভালোবাসে। বিকেলের রিল্যাক্স আওয়ারে ও কারও সঙ্গে মেশে না। উঁহু, ''মেশে না'' কী বলব, কথাই বলে না...।'

থুতনিতে আঙুল বোলালেন শ্রীধর। বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর সি-ভি-তে ক্রাইম রেকর্ডও একই কথা বলছে। সবক'টা খুন ও একা করেছে—সঙ্গে কোনও অ্যাকমপ্লিস নেয়নি। হি ইজ আ লোন অপারেটার।'

চিফ জেলারের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর শ্রীধর বললেন, 'এবার আমি অপাশি কানোরিয়াকে দেখব। ওর সঙ্গে কথা বলব—।'

'অফ কোর্স, স্যার।' হরিমোহন চোখের পলকে 'হুজুরে হাজির' হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন অফিসার তাঁদের শরীরের ঢিলেঢালা ভাবটাকে পলকে ঝেড়ে ফেলে টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন।

'অপাশি কানোরিয়া—' হরিমোহন বললেন : 'কোড নম্বর A-1207। মার্শাল স্যার ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন—কথা বলবেন। যান, গিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন, আমি মার্শাল স্যারকে নিয়ে আসছি...।'

অফিসার দুজন জুতোর গটগট শব্দ করে চলে গেলেন।

ওদের মিনিট দশেক সময় দিলেন হরিমোহন। শ্রীধরের সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের নানান সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। তারপর একসময় বিনীত গলায় মার্শালকে বললেন, 'চলুন, স্যার। অপাশি কানোরিয়া—।'

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় পথ দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। শ্রীধর চুপচাপ ওঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

করিডর আর তার দুপাশের ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি, আলোর ব্যবস্থা, এমনকী সিলিংও যথেষ্ট আধুনিক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে জেলের বদলে একটা থ্রি স্টার হোটেলের কথা আগে মনে পড়ে। জেলের এই স্তরের যত্ন নেওয়ার খরচ জোগায় সিন্ডিকেট—অথবা, আরও সরাসরি বলা ভালো—শ্রীধর পাট্টা। কারণ, এই জেলের হার্ডকোর ক্রিমিনালদের ওপরে নির্ভর করছে কিল গেমের জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য, বিজ্ঞাপনের রেভিনিউ, নিউ সিটির ইকনমি।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ওঁরা একটা লেসার ডিসপ্লে দেখতে পেলেন। তাতে লাল আলোর হরফে ইংরেজিতে লেখা 'রেস্ট্রিকটেড এরিয়া'। তারপরই বিভাজনের স্বচ্ছ দেওয়াল।

হরিমোহন মার্শালের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'স্যার, আপনি এক বছর আগে সেন্ট্রাল জেল মডার্নাইজেশানের জন্যে যে-তিরিশ কোটি টাকা গ্রান্ট দিয়েছিলেন সেটা ইউটিলাইজ করেই এসব হাই-টেক ব্যাপার করেছি। এই দেওয়াল পেরোলেই হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকা। তাই দেওয়ালটা আক্ষরিক অর্থেই একদম ''হার্ডকোর''—মানে, ট্রান্সপারেন্ট, রেসিলিয়েন্ট আর বুলেটপ্রুফ।'

কথা থামিয়ে পরিতৃপ্তির চোখে মার্শালের দিকে তাকালেন হরিমোহন।

প্রভুভক্ত অ্যালসেশিয়ানের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ঢঙে চিফ জেলারের পিঠ চাপড়ে দিলেন শ্রীধর : 'আপনার এফিশিয়েন্সি আমি ভালো করেই জানি। সেইজন্যেই তো আপনার ওপরে এতটা ডিপেন্ড করি...।'

হরিমোহন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। ওঁর লেজ থাকলে সেটা নিশ্চয়ই এখন এদিক-ওদিক দুলত।

স্বচ্ছ দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে চারজন সিকিওরিটি গার্ড। তাদের কোমরে শকার এবং হাতে মিসাইল পিস্তল। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষ নয়—পাথরের মূর্তি। হরিমোহন আর শ্রীধরকে দেখে ওরা যান্ত্রিকভাবে বাও করল।

দেওয়ালের গায়ে কোনও দরজা চোখে পড়ছিল না শ্রীধরের। ঠিক যেন একটা সিমলেস বিভাজন পাত।

তিনি সামান্য ভুরু কুঁচকে হরিমোহনের দিকে তাকাতেই হরিমোহন পকেট থেকে একটা ছোট রিমোট ইউনিট বের করে সেটা দেওয়ালের দিকে তাক করে একটা দশ ডিজিটের কোড ইনপুট করলেন।

স্বচ্ছ দেওয়ালের একটা স্বচ্ছতর অংশ নি:শব্দে একপাশে সরে গেল। হরিমোহন শ্রীধরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকায় আলোর কোনও ঘাটতি নেই। এ ছাড়া তার নানা জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া।

হরিমোহন অলিপথ ধরে হাঁটছিলেন আর রিমোটের কীসব বোতাম টিপছিলেন। পাথরের মেঝেতে ওঁদের জুতোর শব্দ ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

একটু পরেই একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

স্বচ্ছ ফাইবারে তৈরি একটা ওয়ান রুম স্টুডিয়ো ফ্ল্যাট। ভেতরে উজ্জ্বল আলো। একজন মোটাসোটা লোক টেবিলের কাছে বসে কী যেন লেখালিখি করছে।

হরিমোহন চাপা গলায় বললেন, 'অপাশি কানোরিয়া, মার্শাল স্যার—।'

শ্রীধর দেখলেন, ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো। এমনকী ঘরে রঙিন টিভি পর্যন্ত রয়েছে।

না:, এদের যত্নআত্তির ব্যাপারে কোনও খামতি নেই। হরিমোহন জানেন, এরা নিউ সিটির বলতে গেলে অ্যাসেট।

শ্রীধরদের দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাল না অপাশি। নিজের মনে লিখতে লাগল। তারপর হঠাৎই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। শ্রীধরদের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

অপাশি সরাসরি শ্রীধরদের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখে শূন্য দৃষ্টি।

শ্রীধর পাক্কা অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। ইতস্তত করে অবাক চোখে চিফ জেলারের দিকে তাকালেন।

হরিমোহন হেসে বললেন, 'আপনাকে চমকে দেব বলে আগে থেকে বলিনি, স্যার। আমি রিমোটের বোতাম টিপে একটা স্পেশাল কোড ইনপুট দিলেই এই সেলের ফাইবারের ওয়ালগুলো সব ওয়ান ওয়ে মিরার হয়ে যায়। তাই অপাশি ওর ঘরের দেওয়ালগুলোকে এখন আয়না হিসেবে দেখছে—আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।'

শ্রীধর অপাশিকে দেখতে লাগলেন।

একটু আগে কম্পিউটারে যা দেখেছিলেন, কনট্রাডিকশান যেন তার চেয়েও অনেক বেশি। যেমন নিষ্পাপ চেহারা ঠিক তেমনই নিষ্পাপ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর অভিব্যক্তি। তবে ছোট-ছোট সরু চোখের কোথায় যেন মিশে আছে এক ফোঁটা সতর্কতা।

শ্রীধরের কেন জানি না মনে হচ্ছিল, এই ওয়ান ওয়ে মিরারের গল্পটা অপাশির অজানা নয়।

বেশ কয়েক মিনিট অপাশিকে লক্ষ করলেন ওঁরা দুজনে। তারপর শ্রীধরের ইশারায় রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপে সেলের ফাইবার ওয়ালের ক্যারেকটার পালটে দিলেন হরিমোহন। ওটা এখন টু ওয়ে সি থ্রু ফাইবার শিট হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অপাশি ওঁদের দুজনকে দেখতে পেল। সরলভাবে একগাল হেসে দিল ও।

সেই মুহূর্তে কনট্রাডিকশানের মাত্রাটা এক ঝটকায় এমন বেড়ে গেল যে, শ্রীধর পাট্টার মতন মানুষও চমকে উঠলেন।

হরিমোহন আবার রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপলেন।

ওঁদের সামনের দেওয়ালে আটটা ছোট-ছোট জানলা তৈরি হয়ে গেল। দুটো সারিতে চারটে করে খুদে জানলা—প্রত্যেকটা মাপে এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি।

হরিমোহন গর্বের হাসি নিয়ে ঘুরে তাকালেন মার্শালের দিকে। বললেন, 'সেলের কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এই ব্যবস্থা, স্যার...।'

শ্রীধর ওঁর দিকে চেয়ে একচিলতে হাসলেন শুধু।

এবার হরিমোহন অপাশির দিকে ইশারা করে ওকে ডাকলেন : 'মিস্টার কানোরিয়া, প্লিজ, আমাদের কাছে আসুন—।'

শ্রীধর অবাক হয়ে চিফ জেলারের দিকে তাকালেন।

চিফ জেলার বললেন, 'ও ''আপনি-আজ্ঞে'' ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে। তাতে বেশ হাসি-খুশি আর শান্ত থাকে।'

অপাশি কানোরিয়া শ্রীধরদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি, চোখে সামান্য কৌতূহল।

চিফ জেলার শ্রীধরের সঙ্গে অপাশির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'মিস্টার কানোরিয়া, ইনি হলেন নিউ সিটির পিস ফোর্সের মার্শাল মিস্টার শ্রীধর পাট্টা। ঠিকভাবে বলতে গেলে, ইনিই নিউ সিটির শেষ কথা...।'

হাসল কানোরিয়া। বলল, 'যেমন এই জেলে আপনিই শেষ কথা।' তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে : 'হাউ আর য়ু, মার্শাল,? নাইস টু মিট য়ু...।'

শ্রীধর কানোরিয়ার শেষের দিকের কথাগুলো ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিলেন না। কারণ, ওঁর মাথায় ঘুরছিল কনট্রাডিকশান।

কানোরিয়ার মধ্যে কনট্রাডিকশানের চূড়ান্ত দেখে শ্রীধর ভেতরে-ভেতরে টগবগ করছিলেন।

কী আশ্চর্য মিহি অপাশি কানোরিয়ার গলার স্বর! এ যেন কোনও মেয়ের গলাকেও হার মানায়!

অথচ এই লোকটাই গুনে-গুনে বত্রিশটা মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে! বত্রিশ রান!

কিল গেমের দিন ও নিশ্চয়ই অনায়াসে আরও একটা রান স্কোর করতে পারবে!

•

সিমানকে অনেকক্ষণ ধরে ফোন করে পাচ্ছিলেন না রঙ্গপ্রকাশ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। একইসঙ্গে ব্যথার জগতে হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রায়ই এরকম হয়। ছেলেটা বলতে গেলে সবসময়েই রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালাকে দুশ্চিন্তায় রাখে। কে জানে কোনও বিপদে পড়ল কি না!

সিমানের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ইকনমিক ইনডেক্স-এর কথাও ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর কথা।

মাথার দুপাশ দপদপ করছিল। কেউ যেন প্যাঁচ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ইস্পাতের তুরপুন চালিয়ে দিচ্ছে মাথার ভেতরে।

পর্ণমালা পাশের ঘরে। বোধহয় পামটপ নিয়ে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে। হয়তো ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও করছে, কিন্তু পর্ণমালাকে বাইরে থেকে

দেখে ওর ভেতরের ঝড় খুব একটা আঁচ করা যায় না। কিন্তু রঙ্গপ্রকাশের সে-দক্ষতা নেই। তাই ওঁর কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

গলা তুলে পর্ণমালাকে এক কাপ কফি দেওয়ার জন্য বললেন। দেখা যাক, এক কাপ কফি তুরপুনের তেজ কমাতে পারে কি না।

প্লাজমা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকালেন। সেখানে জিশানের ভিডিয়ো ছবি চলছে—তবে সাউন্ড 'মিউট' করে দেওয়া। শব্দহীন চলচ্চিত্র দেখছেন ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস। কারণ, ওঁর প্রিয় এলাকা হল 'কাইনেসিকস'। অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গি আর শরীরের ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশচর্চার বিজ্ঞান। না বলা মনের ভাব, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া।

এখন জিশানের নি:শব্দ ছবি দেখে ওর মনের ভেতরের রহস্য আরও গভীরভাবে বুঝতে চাইছেন। যা-যা বুঝতে পারবেন সেসব চলে যাবে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের ফাইলে।

ঠিক এমন একটা সময়ে, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে, অচেনা একটা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল।

তিনি 'হ্যালো' বলামাত্রই ও-প্রান্ত থেকে জিশান পালচৌধুরীর গলা শোনা গিয়েছিল। হ্যাঁ, জিশান—জিশান পালচৌধুরী!

টেলিফোনে জিশানের বলা কথাগুলো রঙ্গপ্রকাশের মনের ভেতরে হঠাৎই বেজে উঠল আবার।

'হ্যালো, জিশান বলছি—জিশান পালচৌধুরী...।'

উত্তর দেওয়ার সময় রঙ্গপ্রকাশের গলা কেঁপে গিয়েছিল। তারপর...।

তারপর, সিমানের কথা শোনার পর, মন এবং গলা সংযত করে জিশানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ফোনে কথা বলা শেষ করার পর নিজেকে আর সুস্থির রাখতে পারেননি। তাসের ঘরের মতো ছত্রখান হয়ে গিয়েছেন।

মরণাপন্ন জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ডুকরে উঠেছেন। পাঁজরার পলকা হাড়গুলো যেন পটপট করে মটকে যাচ্ছিল।

অদ্ভুত যন্ত্রণার শব্দে পর্ণমালা ছুটে এসেছেন কম্পিউটার রুমে। বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে দেখেছেন বিজ্ঞানী স্বামী টেবিলের ওপরে মাথা রেখে সব-হারানো বাচ্চার মতো কষ্টে জর্জরিত হয়ে ছটফট করছেন।

পর্ণমালার হাত থেকে গরম কফির কাপ খসে পড়েছে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফ্লোরে। কাপটা পাঁচ টুকরো হয়ে গেছে। আর কফিও ছড়িয়ে গেছে যেখানে-সেখানে।

ওঁর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো 'সিমান! সিমান!' শব্দটা বেরিয়ে আসছিল বারবার। ওঁকে দেখে পায়ে কুচলে দেওয়া কেন্নোর মতো লাগছিল।

ছেলেকে যে তিনি কতটা ভালোবাসেন সেটা যেন আবার নতুন করে বুঝতে পারছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ভয় হচ্ছিল, তিনি বোধহয় শত-সহস্র টুকরোয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ধুলো হয়ে যাবেন।

কিন্তু সেটা হল না পর্ণমালার জন্য।

ছুটে এসে স্বামীকে জাপটে ধরে সামাল দিতে লাগলেন। সান্ত্বনা দিতে, সাহস জোগাতে কত না এলোমেলো কথা বললেন। তারই মধ্যে উতলা গলায় জিগ্যেস করছিলেন, 'কী হয়েছে? সিমানের কী হয়েছে?'

ওঁদের আপাত সুন্দর সুখী বাড়িটার ভেতরে দুশ্চিন্তা আর শোকের ঢেউ উথলে উঠছিল বারবার। কিন্তু বাইরের রাস্তা থেকে সেসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ওঁরা সামলে উঠলেন। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে থমথমে মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সিমান কখন আসবে কে জানে!

স্বামীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পর্ণমালা আরও তিনবার কফি তৈরি করে নিয়ে এলেন। রঙ্গপ্রকাশকে দিলেন, নিজেও নিলেন। তারপর পরিস্থিতির চাপ হালকা করার জন্য প্লাজমা কম্পিউটারে জিশানের

হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ দেখতে শুরু করলেন।

রঙ্গপ্রকাশের চোখের কোল ফোলা। বারবার নাক টানছেন। কিন্তু একইসঙ্গে ওঁর চোখ আটকে রয়েছে কম্পিউটারের পরদায়। কীভাবে যেন ওঁর বিজ্ঞানী সত্তার একটা ছোট্ট অংশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। 'কাইনেসিকস' রঙ্গপ্রকাশকে উসকে দিচ্ছে।

এভাবে কতক্ষণ যে কেটেছে ডক্টরের খেয়াল নেই। হঠাৎই ওঁর কম্পিউটার রুমের দরজায় হাজির হয়ে গেল দুজন মানুষ।

জিশান আর সিমান।

রঙ্গপ্রকাশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারলেন না। নিষ্পলক চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই টগবগে তরুণ কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় প্লাজমা কম্পিউটারের মনিটর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে ওঁর ঘরের দরজায়।

অনেক পরে মনোযোগ গেল ছেলের দিকে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। কপালে ব্যান্ডেজ। গায়ে হসপিটালের রুগিদের মতো ঢোলা পোশাক। জিশানের গায়ে হেলান দিয়ে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কফির কাপ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পর্ণমালা। চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আপাত সংযমের বর্মের নানান স্তর মোচার খোলার মতো খসে পড়ল একে-একে। দৃষ্টিহীন মানুষের মতো এলোমেলো পা ফেলে ছেলের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর আচমকা ওকে বুকে জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

'সিমান! সিমান! এ কী দশা হয়েছে তোর! কোথায় ছিলি তুই? কোথায় ছিলি, বাবা?'

জিশান আর রঙ্গপ্রকাশ মা আর ছেলেকে দেখতে লাগলেন। জিশানের মনে পড়ল অর্কনিশানের কথা! ও:! কতদিন ওর সোনামণি শিশুটাকে ও বুকে জড়িয়ে ধরেনি!

স্ত্রীকে দেখে খানিকটা যেন অবাক হচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সিমানের জন্য পর্ণমালার এতটা টান তিনি আগে কখনও বুঝতে পারেননি। মাতৃস্নেহ তা হলে সহজে মরে না!

জিশানের হাতে একটা বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেট ছিল। তার মধ্যে সিমানের ভিজে জামাকাপড় রয়েছে।

ও দু-পা সামনে এগিয়ে প্যাকেটটা কফি টেবলের ওপরে রাখল। বলল, 'এর মধ্যে সিমানের ভেজা জামা-প্যান্ট রয়েছে...।'

জিশানকে সামনাসামনি দেখা আর সিমানকে ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরে পাওয়ার শক ধীরে-ধীরে কাটিয়ে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর এক পা সামনে এগিয়ে জিশানের দিকে হাত-বাড়িয়ে দিলেন।

'থ্যাংকস। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ...।' রঙ্গপ্রকাশের চোখে জল এসে গেল। ভাঙা গলায় নিজের আর পর্ণমালার পরিচয় দিলেন।

জিশান হাত মেলাল। সামান্য হাসল : 'ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ডক্টর বিশ্বাস। একজন সাধারণ মানুষ যা করত আমি তা-ই করেছি—তার বেশি কিছু করিনি—।'

এইজন্যই বোধহয় জিশান অসাধারণ। ভাবলেন রঙ্গপ্রকাশ।

'আপনি প্লিজ বসুন...।'

একটা সিঙ্গল সোফার দিকে ইশারা করলেন ডক্টর। চোখ মুছে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন।

জিশান বসল—রঙ্গপ্রকাশের মুখোমুখি। সিমান আর পর্ণমালাকে একপলক দেখল। তারপর অ্যাক্সিডেন্টের শুরু থেকে সব বলতে শুরু করল।

গাড়িতেই সিমানের নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল। তখন গাড়ি থামিয়েছে গুনাজি। জিশান গাড়ি থেকে নেমে সিমানের পাশে গিয়ে বসেছে। ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সফট এনার্জি প্যাক থেকে অল্প-অল্প করে

এনার্জি ড্রিংক ওকে খাইয়েছে। তারপর ওর শরীরটাকে যত্ন করে আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছে।

গুনাজির স্টিয়ারিং তখন রঙ্গপ্রকাশের বাড়ির সঙ্গে ওঁর সি থ্রু অটোমোবিলের দূরত্ব দ্রুতগতিতে কমাচ্ছে।

'সিমানের সবরকম মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা হয়ে গেছে—' জিশান রঙ্গপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বলল, 'এখন ওর শুধু রেস্ট দরকার।'

জিশানের কাছে সব ঘটনা শুনতে-শুনতে রঙ্গপ্রকাশের চোখ আবার ভিজে উঠেছে। তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। সিমান আর পর্ণমালার কাছে গেলেন। ছেলের মাথায় স্নেহমাখা হাত বোলালেন কয়েকবার। বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখের জল মুছলেন। ভারী গলায় পর্ণমালাকে বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। বিছানায় শুইয়ে দাও। রেস্ট—অ্যাবসোলিউট রেস্ট। ওকে এত ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে...।'

পর্ণমালা ছেলেকে নিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলেন ভেতরের ঘরের দিকে।

রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন, সামনের কম্পিউটারের পরদায় জিশান চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে—কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

কম্পিউটারের মনিটর থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নজর ঘোরালেই আসল জিশান।

রঙ্গপ্রকাশের বিজ্ঞানী সত্তা বলে উঠল, 'আচ্ছা, ছবির জিশান, আর সামনে বসে থাকা জলজ্যান্ত জিশান—কাইনেসিকস কি এই দুজনের শরীরের ভাষার তুলনামূলক বিচার করে নতুন কোনও উত্তর বের করতে পারে?'

সামনে বসা জিশানকে দেখছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, জিশান যতই বিনয় করে বলুক না কেন, ও আসলে সাধারণ নয়। ও যে অন্যরকম, তার একটা অদৃশ্য বিকিরণের তেজ রঙ্গপ্রকাশ অনুভব করতে পারছিলেন। সেইসঙ্গে সিমানকে নিরাপদে ফিরে পাওয়ার স্বস্তি এবং আনন্দ মনের ভেতরে বুদ্বুদের ফোয়ারা তৈরি করছিল। আর সামনে বসা তরুণটির প্রতি কৃতজ্ঞতার ঢেউ বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ছিল বারবার।

জিশান ঘরটা অবাক চোখে দেখছিল। দেখছিল সেমি-ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস পার্টিকল ইমপ্রেগনেটেড পলিমারের ফার্নিচার। আর দেওয়ালের জায়ান্ট প্লেট টিভি এবং প্লাজমা কম্পিউটারের মনিটর।

রঙ্গপ্রকাশ ওকে লক্ষ করছিলেন।

জিশানের কপালে একটু ভাঁজ পড়েছে। একটা ভুরু সামান্য উঁচিয়ে রয়েছে। হাত, হাতের আঙুল উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্তত নড়াচাড়া করছে।

সব মিলিয়ে বিস্ময়, কৌতূহল, অস্বস্তি।

সত্যি, 'কাইনেসিকস' বড় বিচিত্র বিষয়। প্রায় চারশো বছর আগে নৃবিজ্ঞানী রে বার্ডহুইস্টেল প্রথম এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি গবেষণা করে বুঝতে চেয়েছিলেন, মুখের ভাবভঙ্গি, হাতের ইশারা, পায়ের নড়াচড়া, দাঁড়ানোর ঢং এসবের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে ভাবের আদানপ্রদান করে। এই নন-ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মের ব্যাকরণও তৈরি করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমরা যে সামাজিক জীবনে নিয়মিত ভাব বিনিময় করি তার মাত্র তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ শতাংশ করি ভাষার মাধ্যমে—আর বাকিটা অভিব্যক্তি আর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে।

সেসব কথা খুব মনে পড়ছিল এখন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিশান বলল, 'গাড়িতে আসার সময় আমি সিমানের সঙ্গে...কথা বলছিলাম। তাতে যা...জেনেছি...সেগুলো আপনাকে...জানানো দরকার। সিমানের ভালোর জন্যে...।'

রঙ্গপ্রকাশ ছোট একটা ধাক্কা খেলেন। 'সিমানের ভালোর জন্যে....।' তার মানে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একসময় অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'বলুন—কী বলবেন...।'

টেবিলের দিকে চোখ নামাল জিশান। নীচু গলায় বলল, 'আপনার ছেলে সিমান...সুইসাইড করতে চেয়েছিল...।'

এবার বড় একটা ধাক্কা খেলেন। সুইসাইড করতে চেয়েছিল সিমান?

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না রঙ্গপ্রকাশ। ওঁর ঠোঁট সামান্য কাঁপতে লাগল। কিন্তু ওঁর বিজ্ঞানী সত্তা তখনও জিশানের অভিব্যক্তি আর নড়াচড়া লক্ষ করছিল।

না, জিশান যে মিথ্যে বলছে সেরকম কোনও লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

রঙ্গপ্রকাশের বুকের ভেতরে কয়েকটা বিশাল লোহার বল গড়াতে লাগল। দম আটকে আসতে চাইল। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এখন কথা বলার চেষ্টা করলে শুধুই কান্না বেরিয়ে আসবে।

যে-ছেলেটার জন্য তিনি সবসময় মানসিক চাপ আর যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যার জন্য নিউ সিটি ছেড়ে চলে যাওয়ার আতঙ্ক মনের আকাশে কালো মেঘের মতো ছেয়ে রয়েছে, সে রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার জীবন থেকে চিরকালের জন্য চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

রঙ্গপ্রকাশ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পর্ণমালাকে এ-ঘরে একবার ডাকা দরকার। কারণ, জিশান এবার যে-কথাগুলো বলবে সেগুলো একা-একা শোনার মতো সাহস তিনি তৈরি করতে পারছেন না। নিউ সিটির 'সাইকোঅ্যানালিসিস সেন্টার'-এর চিফ সাইকোলজিস্ট এখন নিজের মনের শক্তি এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিভ্রান্ত।

জিশানকে বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার ওয়াইফকে একটু ডেকে নিয়ে আসি—।'

ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। টের পাচ্ছিলেন পা দুটো ঠিকঠাক জায়গামতো পড়ছে না। ভয় পাচ্ছিলেন, এই বুঝি টলে পড়ে যাবেন।

ভাগ্য নেহাত ভালো বলতে হবে যে, চারটে কি পাঁচটা পা ফেলার পরই পর্ণমালাকে দেখতে পেলেন। একটা শৌখিন ট্রে হাতে এগিয়ে আসছেন ওঁদের দিকে। ট্রে-তে স্ন্যাক্স আর কফি—জিশানের জন্য।

তাড়াতাড়ি সোফার কাছে ফিরে এলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফায় বসার আগে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'সিমান?'

কফির টেবিলে হাতের ট্রে-টা নামিয়ে রেখে শান্ত গলায় জবাব দিলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা নার্ভ সুদার দিয়েছি...।'

'পর্ণ, তুমি একটু এখানে বোসো। মিস্টার পালচৌধুরী কী বলছেন শোনো—।'

স্বামীর কাছে বসলেন পর্ণমালা। জিশানের দিকে তাকালেন।

জিশান খেয়াল করল, সিমানের জন্য কান্নাকাটি করে পর্ণমালা ওর মেকাপের ধার যেটুকু নষ্ট করেছিলেন সেটা এটুকু সময়ের মধ্যেই সাধ্যমতো মেরামত করে এসেছেন।

জিশান কফির কাপে চুমুক দিল।

রঙ্গপ্রকাশ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'জিশান, বলুন, সিমানের কথা কী বলছিলেন—।'

'হ্যাঁ-বলছি।' পর্ণমালার দিকে তাকাল জিশান : 'ম্যাডাম, আপনাদের ছেলে সিমান গাড়ি চালিয়ে স্কাই-হাই ফ্লাইওভার থেকে সেন্ট্রাল লেকে ঝাঁপ দিয়েছে। ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল। তারপর...তারপর কীভাবে ওকে রেসকিউ করা হয়, মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, সেসব তো আগেই ডক্টর বিশ্বাসকে আমি ফোনে জানিয়েছি...।'

রঙ্গপ্রকাশ পাশে হাত বাড়ালেন। পর্ণমালার হাতটা খুঁজলেন। একসময় সেটা পেয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

'ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল কী করে বুঝলেন?' পর্ণমালার ভুরুতে ভাঁজ। কণ্ঠস্বরে হালকা বিদ্রোহ।

জিশান হাতে হাত ঘষল। এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন তাকাল। তাকাল, কিন্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পেল না।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝলেন, ও দোটানায় পড়েছে। স্পষ্ট কথা বলবে, নাকি মানবিক সৌজন্য বজায় রাখবে? একজন বাবা-মা-কে আঘাত দেবে, নাকি দেবে না?

শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হল।

জিশান রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার দিকে একপলক করে তাকিয়ে মাথা নীচু করল। বলল, 'সিমান নিজে আমাকে বলেছে...।'

খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখালেন পর্ণমালা। পালটা জিগ্যেস করলেন, 'কেন, সুইসাইড করতে চেয়েছে কেন? ওর কীসের কষ্ট? কীসের অভাব? আমাদের কোনও ব্যবহারে কি ও ব্যথা পেয়েছে?'

জিশান ইতস্তত করে বলল, 'না, না, ঠিক সেরকম নয়। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সিমান ওর খুব পারসোনাল কথা...গাড়িতে আসার সময় আমাকে বলেছে...।'

'খুব পারসোনাল কথা। অথচ আমাদের না বলে আপনাকে বলেছে!' পর্ণমালার ভুরু এখনও কুঁচকে রয়েছে। চোখের তারায় আলতো বিস্ময়।

জিশান একটু নড়েচড়ে বসল। সোফায় শরীরটাকে খানিকটা এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে গিয়ে কফির কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। স্ন্যাক্সে কামড় দিল। তারপর বলল, 'আশা করি আপনারা এগুলো সিমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন না।' ঠোঁটের ওপরে একবার আঙুল বুলিয়ে নিল জিশান। এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর : 'আলোচনা যদিও বা করেন, প্লিজ, বলবেন না যে, এসব আপনারা আমার কাছ থেকে শুনেছেন। তা হলে...তা হলে আমার প্রতি ওর যে আস্থা আর বিশ্বাস—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা...সেটা আমার ভালো লাগবে না...।'

'আপনাকে এসব পারসোনাল কথা ও বলতে গেল কেন?' পর্ণমালা এখনও সেই একই প্রশ্নে আটকে আছেন। কারণ, জিশানকে সিমানের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার ব্যাপারটা পর্ণমালা আর রঙ্গপ্রকাশের সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের দূরত্বটাকে বড্ড কুৎসিতভাবে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

'একটা কথা বলি, ম্যাডাম—' পর্ণমালার দিকে সরাসরি তাকাল জিশান : 'আমাকে নিশ্চয়ই আপনাদের খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কারণ, গত তিনমাস ধরে টিভিতে, রাস্তাঘাটের বিলবোর্ডে, নানান জায়গায় আমাকে—আমার ছবিকে—বেপরোয়াভাবে প্রচার করা হয়েছে। আপনাদের মিডিয়া আমাকে আপনাদের ঘরের লোক করে তুলেছে। এই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি দেখেছি, কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট জিশান পালচৌধুরীকে নিয়ে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা, কী হুল্লোড় মাতামাতি আর হইচই। ওদের কাছে আমি সুপারহিরো হয়ে গেছি—।'

রঙ্গপ্রকাশ বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাদের কাছেও।'

পর্ণমালা স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর জিশানের দিকে আবার মনোযোগ দিলেন।

'সেইজন্যেই বোধহয় সিমান ওর মনের কথা আমার কাছে বলেছে।... বলেছে, ও ইচ্ছে করে ফ্লাইওভার থেকে সেন্ট্রাল লেকের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। ওর আর বাঁচতে ইচ্ছে করছিল না...।'

•

আপনি ওর লাইফ সেভ করেছেন।' রঙ্গপ্রকাশ বললেন, 'উই আর গ্রেটফুল টু য়ু...।'

'প্লিজ—' অনুনয় করে বলল জিশান, 'একটা মামুলি কর্তব্যকে শুধু-শুধু বড় করে দেখাবেন না। যাই হোক, ডক্টর বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস...আপনাদের ছেলে প্রায় একবছর ধরে ড্রাগ, বেটিং আর গ্যাম্বলিং-এ মেতে আছে। আপনাদের এই নিউ সিটির সুপারফাস্ট লাইফস্টাইলে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অথচ এই লাইফস্টাইলের ভেতরটা যে ফোঁপরা সেটা আপনারা দুজন নিশ্চয়ই বোঝেন।

'ডক্টর, টাকা খরচ করতে পারার ক্ষমতাটাই একমাত্র ক্ষমতা নয়, গায়ের জোরে কাউকে হারাতে পারার ক্ষমতাটাই একমাত্র ক্ষমতা নয়। যারা এসব সত্যি বলে ভাবে তারা ভালোবাসার ক্ষমতার কথা জানে না...।' কফিতে আবার চুমুক দিল জিশান : 'আসলে কী জানেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যে-টান—সেই টানটাই সবচেয়ে পাওয়ারফুল। আপনাদের সঙ্গে সিমানের রিলেশানের টান কতটা ডেভেলাপ করেছিল সেটা আপনারাই ভালো জানেন। তবে...তবে...' একটু ইতস্তত করল জিশান। তারপর নীচু গলায় বলল, 'সিমান বলছিল, সেই টানটা ও কখনও সেভাবে টের পায়নি। ওর সবসময় মনে হয়, ওর কোনও পিছুটান নেই—।'

রঙ্গপ্রকাশ অবাক হয়ে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এসব কী শোনাচ্ছে জিশান। রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের গোপন কথা?

কে সাইকোলজিস্ট? রঙ্গপ্রকাশ, না জিশান?

রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। 'কাইনেসিকস' বলবে, তিনি আসলে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

আড়চোখে পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ওঁর অবস্থাও একইরকম। ঘরের ফার্নিচার খুঁটিয়ে দেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন।

জিশান তখন বলছিল, 'আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলছি বলে, প্লিজ, ক্ষমা করবেন। কিন্তু সিমানের কথাগুলো শুনে আমার মনে হল সেগুলো আপনাদের দুজনের কাছে পৌঁছোনো দরকার। তা হলে হয়তো সিমানের সঙ্গে আপনাদের কমিউনিকেশানের গ্যাপটা কমবে। যেমন ধরুন...।' সামান্য মাথা ঝাঁকাল জিশান। রঙ্গপ্রকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকাল।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন, যে-কথাটা জিশান এখন বলতে চায় সেটা বলতে ও ইতস্তত করছে, সময় নিচ্ছে। বোধহয় কথাটা বেশ স্পর্শকাতর।

'যেমন ধরুন, আপনি—ডক্টর বিশ্বাস—আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন...।'

রঙ্গপ্রকাশ চমকে গেলেন। জিশান এ-কথা জানল কেমন করে? ওর তো এসব জানার কথা নয়!

পর্ণামালাও অবাক হয়েছিলেন। ফার্নিচারের দিক থেকে চকিতে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন জিশানের দিকে।

জিশান বলল, 'না, না, ডক্টর—এতে আপনার অস্বস্তি পাওয়ার কিছু নেই। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখে আমাকে কিল গেমে নামতে হচ্ছে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সত্যি—এর মধ্যে কোনও 'ইফস অ্যান্ড বাটস' নেই। এবং আপনাকে বলে রাখছি, আমি সেদিন প্রাণপণ লড়ব। জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করব। কেন জানেন, ডক্টর?'

হঠাৎই উঠে দাঁড়াল জিশান। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর মাইক্রোভিডিয়োফোন ইউনিটটা বের করল।

এই মুহূর্তে ওর মিনির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে। শানুকেও দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেটটা অন করে একটু টিউন করতেই জিশানের আপনজনেরা চলে এল ওর চোখের সামনে।

মিনি। সুন্দর মুখে ঘাম এবং হাসি। জিশানের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো আরও জীবন্ত হয়ে উঠল। আস্তে করে জিগ্যেস করল, 'কেমন আছ?'

জিশান হাসল : 'ভালো—।'

'দু-তারিখ তো দেখতে-দেখতে এসে যাবে...।' সামান্য চোখ নামাল মিনি।

'হ্যাঁ, এসে যাবে। তারপর পেরিয়েও যাবে। তখন তোমাদের কাছে ফিরে যাব। আমার দেরি সইছে না।'

'তখন...তখন...' মিনির কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল : 'তখন যদি ওই শ্রীধর পাট্টা তোমাকে ফিরতে না দেয়?'

'না দিলে ওকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলব। তারপর তোমাদের কাছে ফিরে যাব।'

কথাটা বলার সময় জিশানের চোয়ালের রেখা যে শক্ত হল সেটা রঙ্গপ্রকাশের চোখ এড়াল না।

'শানু কোথায়?' জিশান ছেলেকে দেখতে চাইল।

মিনি ওর এমভিপি সেটটা নিয়ে গেল ছোট্ট ছেলেটার কাছে। বলল, 'এই দ্যাখো, মেঝেতে খেলনা ছড়িয়ে কী কাণ্ড করছে!'

ছেলেকে দেখতে পেল জিশান। এই চার মাসে কত বড় হয়ে গেছে!

কয়েকটা ভাঙা গাড়ি আর রঙিন পুতুল চারপাশে ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে।

এমভিপির পরদায় শানুর ফুটফুটে মুখ দেখা গেল। জিশান ওর এমভিপি সেটটা নিয়ে চলে এল রঙ্গপ্রকাশের পাশে। পরদার ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'আমার ছেলে, ডক্টর। ওর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাকে কিল গেমে জিততে হবে। ওর মায়ের কাছে ফেরার জন্যেও। ওরাই আমার সবচেয়ে জোরালো টান, সবচেয়ে বড় শক্তি—।'

পর্ণমালাও ঝুঁকে পড়ে শানুকে দেখছিলেন। ওঁদের সিমানও একদিন এইরকম ফুটফুটে ছিল।

জিশান সরে এল নিজের সোফার কাছে। বসে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট মিনি আর শানুর সঙ্গে কথা বলে কাটাল। তারপর সেটটা অফ করে দিল।

রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালা দুজনেই তাকিয়ে ছিলেন জিশানের মুখের দিকে। সেখানে এক অদ্ভুত দ্যুতি ওঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন : প্রিয়জনের ভালোবাসার দ্যুতি। সেই দ্যুতির সঙ্গে প্রাণশক্তির উজ্জ্বলতাও মিশে ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন সেই দীর্ঘশ্বাসের কোমল শব্দ পর্ণমালা শুনতে পেয়েছেন।

জিশান বলল, 'ডক্টর বিশ্বাস, আপনি আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন। নিশ্চয়ই শ্রীধর পাট্টার জন্যে। কিল গেমের জন্যে। যাই হোক, আপনার কাজ আপনি করবেন। আমারটা আমি। তবে একটা কথা আপনাকে বলি। কিল গেমের ফরম্যাট অনুযায়ী দু-তারিখে তিনজন মার্ডারার—লাইফার—আমাকে খুন করতে নামবে। আমি ওদের ফাঁকি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। যেটুকু জেনেছি তাতে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী যাবজ্জীবনের সাজা পাওয়া আসামিকে সত্যি-সত্যি সারাটা জীবন জেলে কাটাতে হয়। তাই ওই তিনজনের সামনে কোনও নতুন ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানটাই ওদের ভবিষ্যৎ...' একটু থামল জিশান। অপলক চোখে তাকাল রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসের দিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কিন্তু আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এক নয়, ডক্টর। আমি মিনি আর শানুর কাছে ফিরে যাব। ফিরে যাওয়ার এই টানটা আমার বর্তমান, আর ফিরে যাওয়াটা আমার ভবিষ্যৎ।

'আপনার তৈরি করা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলে এই ফিলিংটা নিশ্চয়ই নেই। আপনি কাইন্ডলি এটা ইনক্লুড করে নেবেন। আমি চাই নিউ সিটির সবাই জানুক আমি একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান—।'

জিশানের ফরসা মুখে লালচে আভা দেখতে পাচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ।

জিশান ওঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, এত কথা বলছে—সেটা রঙ্গপ্রকাশের সাইকোলজিস্ট ব্যক্তিত্বের ভালো লাগছিল। কারণ, খুব দ্রুত প্রচুর তথ্য পাচ্ছিলেন। তিনি জিশানের প্রোফাইল এ পর্যন্ত যা তৈরি করেছেন এখন পাওয়া তথ্যকণাসাগর তার সঙ্গে জুড়ে নিলে প্রোফাইলটা অনেক গুণ সমৃদ্ধ হবে।

আর সরাসরি যেটা বুঝতে পারছিলেন, কিল গেমে জিশান সহজে হারবে না, সহজে মরবে না। ও সত্যিই একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। ও হারার আগে মারবে, মরার আগেও মারবে। ফ্যামিলির জন্য টান ওর সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র।

কিন্তু যে-প্রশ্নটা রঙ্গপ্রকাশকে খোঁচাচ্ছিল সেই প্রশ্নটাই এবার করলেন, 'আমি যে আপনার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছি সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'সিমান।' বলে হাসল জিশান। মাথা দোলাল কয়েকবার। তারপর : 'সিমান আরও অনেক কিছু জানে। ও জানে যে, আপনার ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে গেছে। সেটা ইমপ্রুভ করার জন্যে আপনার হাতে সময় রয়েছে নব্বই দিনেরও কম...।'

রঙ্গপ্রকাশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভয় পাওয়া বিমূঢ় মুখে তাকিয়ে রইলেন জিশানের দিকে।

পর্ণমালা এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন স্বামীর দিকে। এ কী কথা শুনছেন তিনি! ই. আই. নেমে গেছে!

রঙ্গপ্রকাশ কাঁপতে লাগলেন। বিস্ময় আর নপুংসক রাগ ওঁর ভেতরে উত্তাল ঢেউ তুলল।

সিমান এ-কথা জানল কেমন করে! যে-কথা রঙ্গপ্রকাশ ভীষণ যত্নে গোপন রাখতে চেয়েছেন সেটা এখন যেন হুড়মুড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবার সামনে কফি টেবলের ওপরে।

পর্ণমালা যে এ-ঘটনায় বেশ ধাক্কা খেয়েছেন সেটা ওঁর বিহ্বল চোখ-মুখে স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশের মুখে যে-নীরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল সেটা জিশান পড়ে নিতে পেরেছিল। তাই ও আলতো গলায় থেমে-থেমে বলল, 'সিমান...আপনার... আপনার ই-মেল অ্যাকাউন্ট...হ্যাক করেছে। হ্যাক করে সব জেনেছে। ই. আই. ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়ার কথাও...।'

পর্ণমালা স্বামীর পাশে চলে এলেন। অসহায় মুখে ওঁর দিকে তাকিয়ে ওঁর জামা খামচে ধরলেন : 'এসব...এসব সত্যি? আমাদের ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে গেছে! সিমান...সিমান তোমার মেল হ্যাক করেছে!'

রঙ্গপ্রকাশ মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। সামান্য মাথা নাড়লেন ওপর-নীচে। ভাঙা গলায় বললেন, 'সত্যি—সব সত্যি...।'

জিশান ভেঙে পড়া বাবা-মা-কে দেখছিল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের ব্যাপারটা সিমানই ওকে বলেছে। জিশানের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার কথা। যে-বাবা সবসময় মাথা তুলে বাঁচার কথা বলতেন।

ইকনমিক ইনডেক্স! মুখের ভেতরটা তেতো লাগল জিশানের। এই অমানবিক নিয়ম একমাত্র নিউ সিটিকেই মানায়।

এখন কী করবেন রঙ্গপ্রকাশ? কোথায় মুখ লুকোবেন? সিমান ওঁর মেল হ্যাক করে সবকিছু জেনেছে বলেই কি সুইসাইড করতে গিয়েছিল?

সম্পর্কের টানের অভাব বহুদিন ধরে টের পেয়েছে সিমান। আর একইসঙ্গে জানতে পেরেছে ই. আই.-এর নড়বড়ে অবস্থা। তাই হয়তো ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল এবং জিশান দেবদূত হয়ে ওকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখন কী হবে?

সিমানকে ফিরে পেয়ে রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু এখন যদি সিমান জানতে পারে যে, ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়া এই ই. আই.-কে মেরামত করার কোনও ক্ষমতা ওঁদের নেই! তা হলে কী হবে? সিমান কি সেরে উঠে আরও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠবে, নাকি আবার সুইসাইড করায় চেষ্টা করবে?

তখন?

রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ভেতরে-ভেতরে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জিশানকে কি খুলে বলবেন নতুন সমস্যার কথা? যদি এক্ষুনি জিশানকে কিছু না জানান তা হলে পরে আর জানানোর সুযোগ পাওয়া যাবে না। জিশান হয়তো আর পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেই চলে যাবে। তারপর হয়তো ওর সঙ্গে আর কোনওদিনও দেখা হবে না।

রঙ্গপ্রকাশের বারবার মনে হচ্ছিল, জিশান এমনই একজন মানুষ যে সব পারে। সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে নিমেষে। ওর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল থেকেও ওর 'প্রবলেম সলভিং স্কিল'-এর ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল। তা হলে একবার বলেই দেখা যাক না!

রঙ্গপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে এলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো, পর্ণ। আমি তোমাকে ই. আই.-এর ব্যাপারটা সাহস করে বলে উঠতে পারিনি। আমি পাগলের মতো একটা সলিউশান খুঁজে

বেড়াচ্ছিলাম—কিন্তু কোনও পথ পাইনি।'

প্রায় ফিসফিস করে পর্ণমালা বললেন, 'আমরা...আমরা এখন কী করব? আমাদের তা হলে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

'জানি না।' মাথা নাড়লেন রঙ্গপ্রকাশ : 'হাতে এখনও মাস তিনেক সময় আছে। কিন্তু তাতে কী লাভ! যখন সামনে কোনও ওয়ে আউট দেখতে পাচ্ছি না...।'

'ওল্ড সিটিতে গিয়ে থাকতে হলে আমি...আমি সিম্পলি মরে যাব। আর...আর সিমানও কতটুকু বাঁচবে জানি না...।' পর্ণমালার চোখে জল এসে গেল। হাত দিয়ে চোখ মুছলেন।

জিশান খুব অস্বস্তি পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিল, একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত আলোচনার আবহাওয়ায় ও ঢুকে পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে তাকালেন। একটু আগেই জিশান বলছিল, ও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। কিন্তু রঙ্গপ্রকাশের এখন মনে হল, জিশান একা নয়—তিনি নিজেও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান।

রঙ্গপ্রকাশ দুবার ঢোঁক গিললেন। চোয়াল শক্ত করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর জিশানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জিশান, আপনি আমার ছেলেকে আজ বাঁচিয়েছেন বটে কিন্তু আসলে পুরোপুরি বাঁচাতে পারলেন না। কারণ, আমরা তিনজনেই শেষ হয়ে গেছি। আমাদের হাতে আর মাত্র তিন মাস সময়—তারপরই আমরা শেষ।'

জিশান বলল, 'জানি—ভালো করেই জানি। আমি একসময় এই নিউ সিটিতে ছিলাম। আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন এই ই. আই.-এর প্রবলেমের জন্যে আমাকে আর আমার বাবাকে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাবার চোখের জলের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। তখন আমার নাম ছিল নিশান। ওল্ড সিটিতে গিয়ে বাবা আমার নতুন নাম রাখেন জিশান। আমি সেই দিনটার কথা ভুলতে পারি না, ডক্টর। আমার বাবা বাকি জীবনটা কী কষ্ট পেয়েছিলেন তা আমি ভালো করে জানি।'

রঙ্গপ্রকাশ মুখ নামালেন। জিশানের ব্যথাটা অনুভব করতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জিশান। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'ডক্টর, আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোড নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন?'

'কেন?' চমকে উঠে মুখ তুললেন রঙ্গপ্রকাশ।

জিশান বলল, 'দিন না—একটু দরকার আছে—।'

রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকালেন। দেখলেন, ওঁর মুখেও বিস্ময়।

জিশানের কথা আর ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যে, রঙ্গপ্রকাশ আর আপত্তি করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা ম্যাগনেটিক কার্ড বের করলেন। জিশানও ওর পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে নিল।

রঙ্গপ্রকাশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অ্যাকাউন্ট কোড কেন চাইছে জিশান? ও কি রঙ্গপ্রকাশের ই. আই.-এর ব্যাপারটা হাতে-কলমে যাচাই করে নিতে চাইছে?

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোড নম্বরটা ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলেন। আর জিশানও টাচ স্ক্রিন কি-প্যাডে আঙুল ছুঁইয়ে সংখ্যাগুলো ওর ফোনে ইনপুট করতে লাগল।

নম্বর বলা শেষ হলে রঙ্গপ্রকাশ কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'এই কোড নাম্বার দিয়ে আপনি কী করবেন?'

'এই কোড নম্বর দিয়ে আমি সিমানকে বাঁচাব। এবার বোধহয় ওকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারব।'

'তার মানে?' পর্ণমালা। ওঁর চোখের পাতা সামান্য কাঁপছে।

হাসল জিশান : 'ম্যাডাম, এই নিউ সিটিতে এসে আমি বহু টাকার প্রাইজ জিতেছি। আমার এক বন্ধু মনোহর সিং-ও ওর প্রাইজ মানি আমার ছেলেকে গিফট করে গেছে। আমার এখন অনেক টাকা। এই টাকাটা আমি কাজে লাগাতে চাই...।' কথা বলতে-বলতে স্যাটেলাইট ফোনের কি-প্যাডে আঙুল ছোঁয়াচ্ছিল জিশান। কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুলে রঙ্গপ্রকাশের দিকে তাকাল, হাসল : 'আপনার অ্যাকাউন্টে আমি আট লাখ টাকা ট্রান্সফার করলাম, ডক্টর...। আপনাদের জন্যে না—সিমানের জন্যে। আর একটা কথা...প্লিজ, আমাকে কোনও ধন্যবাদ জানাবেন না...।'

রঙ্গপ্রকাশ হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। পর্ণমালা স্বামীর গায়ে হেলে পড়লেন, ওঁর বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

পর্ণমালার চোখ বোজা। ঠোঁট কাঁপছে।

রঙ্গপ্রকাশ কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু ওঁর কথা জড়িয়ে গেল।

জিশান ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'ডক্টর, কিল গেমে জিতে আমি যে-একশো কোটি টাকা পাব তা দিয়ে ওল্ড সিটির প্রচুর মানুষকে আমি নিউ সিটির সিটিজেন করে দিতে পারব। আমি ওদের এখানে নিয়ে আসতে চাই কেন জানেন?' ঠোঁটের কোণে হাসল জিশান। বলল, 'আপনাদের এখানে মনুষ্যত্বের বড় অভাব। ওরা এখানে এলে সেই অভাব অনেকটা ঘুচবে...।'

এক লহমা চুপ করে থেকে জিশান বলল, 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি সেপ্টেম্বরের দু-তারিখের পর আমাদের আবার দেখা হবে।'

ওঁরা দুজনেই রুদ্ধ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দেখা হবে। তখন আমরা অনেক গল্প করব। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট, জিশান—।'

স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জিশান। খুব টায়ার্ড লাগছে। গালটাও সামান্য জ্বালা করছে। তবে মনটা ভালো লাগছিল।

জিশান ঘড়ি দেখল। না, আর দেরি করলে চলবে না। সুধাসুন্দরীর কাছে সময়ের মধ্যে ফিরতে হবে। কন্ট্রোলড ফ্রিডম।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ও একটা হাই তুলল।

•

সুখারাম নস্কর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

কী সাংঘাতিক নীল! দেখলে লোভ হয়। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, 'চলে আয়!'

আর সেই নীলের চাদরে গাঁথা রয়েছে একটা ঝলমলে সোনালি বল। জ্বলছে। তবে এখন বিকেল বলে তেজ কম।

এই দুটো জিনিসের দিকে তাকালেই সুখারামের স্বাধীন হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে। আর তখনই ওর মন-কেমন-করা শুরু হয়।

সেন্ট্রাল জেলের প্রকাণ্ড মাঠে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েদিরা। কেউ-কেউ বারবেল বা ডাম্বেল নিয়ে শরীরচর্চা করছে। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে টিম তৈরি করে খেলাধুলো করছে। পাঁচটা ফুটবল মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তার পিছনে খেলোয়াড়রা। আবার কোথাও বা ক্রিকেট বল আর ব্যাট নিয়ে হইহই চলছে।

সব কয়েদির পরনে একইরকম পোশাক। ছাই রঙের টাইট স্লিভলেস ভেস্ট আর কালো রঙের টাইট প্যান্ট। প্রত্যেকের ভেস্টের ওপরে সামনে এবং পিছনে বারকোড প্রিন্ট করা। এই বারকোড লেজার স্ক্যানার

দিয়ে স্ক্যান করলেই সেই কয়েদির সমস্ত খুঁটিনাটি স্ক্যানারের ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে চলে যাবে কম্পিউটারের মেমোরিতে। এবং কম্পিউটারের মনিটরে ফুটে উঠবে।

শুধুমাত্র বিকেলের এই ড্রিলের সময় কয়েদিদের সেল থেকে বেরোতে দেওয়া হয়। চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এই 'স্বাধীনতা'-র সময়টাকে ওরা ঠাট্টা করে বলে 'ফান আওয়ার'। এই সময়টা জেলের খোলা মাঠে ওরা খেলাধুলো কি গল্পগুজব করে নিজেদের খুশিমতো সময় কাটায়।

জেল বিল্ডিং-এর এক কোণে রয়েছে 'ড্রিল কাউন্টার'। সেই কাউন্টার থেকে কয়েদিরা নিজেদের পছন্দমতো 'ড্রিল আইটেম' পেতে পারে। 'আইটেম' বলতে ফুটবল, ব্যায়ামের যন্ত্র, ক্রিকেট খেলার ব্যাট-বল—এইসব। তারপর সাড়ে পাঁচটা বাজলেই সমস্ত আইটেম কাউন্টারে আবার ফেরত দিয়ে জেল বিল্ডিং-এ ঢুকতে হয়। কেউ যদি কোনও আইটেম কাউন্টারে জমা না দিয়ে জেল বিল্ডিং-এ ঢোকে তা হলে স্পেশাল লেজার স্ক্যানার লাগানো দরজা দিয়ে পার হওয়ার সময় বিশেষ ধরনের বিপিং সাউন্ড শোনা যাবে। তখন শাস্তি হিসেবে সেই 'অপরাধী'-কে একটানা তিনদিন স্রেফ জল খেয়ে কাটাতে হবে।

সুখারাম মাঠের একটা জায়গায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে ছিল। চারপাশের চেনা দৃশ্যটা একজন নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে দেখছিল। আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

ড্রিলের এই সময়টা মাঠে বসে বা শুয়ে আকাশের দিকে তাকালেই ওর এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে ইচ্ছে করে। যদিও ও জানে সেটা অসম্ভব।

হঠাৎই সুখারামের নজরে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে দুজন কয়েদির মধ্যে হাতাহাতি লেগেছে।

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের লং ডিসট্যান্স লেজার স্ক্যানার কাজ শুরু করে দিল। বেশ কয়েকটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে সিকিওরিটি গার্ডদের লেজার স্ক্যানিং গান পলকে অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। সেই লেজারের আলো গিয়ে পড়ল যুযুধান দুই কয়েদির ওপরে। ওদের বারকোড স্ক্যান হয়ে সমস্ত তথ্য ঢুকে পড়ল জেলের কম্পিউটারে।

এরপর কী হবে সুখারাম জানে।

ওই কয়েদি দুজনকে নিয়মমাফিক কম-বেশি শাস্তি পেতে হবে।

সত্যি, এই সেন্ট্রাল জেলের নজরদারির প্রযুক্তির তুলনা নেই!

সুখারাম নস্করের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ও অলসভাবে চেয়ে রইল লড়াইখ্যাপা দুই কয়েদির দিকে।

কয়েদি দুজনের লড়াই একটু পরেই থেমে গেল।

এরকমটা প্রায়ই হয় : এই লড়াই, তো এই ভাব।

এই জেলে সুখারাম আছে তিন বছর, কিন্তু তিন বছরে মাত্র চারবার ওর সঙ্গে অন্য কয়েদির হাতাহাতি হয়েছে। আর প্রত্যেকবারই সুখারাম ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছে। তারপর হেসে হ্যান্ডশেক করেছে শত্রুর সঙ্গে।

কোনও-কোনও কয়েদি সুখারামকে দুর্বল ভাবলেও বেশিরভাগ কয়েদি তা ভাবেনি। বরং তাদের মনে হয়েছে, যে-ছেলেটা ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, যার হাত আর পায়ের মাসল নমনীয় অথচ মজবুত, যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে, শূন্যে ছ'ফুট লাফাতে পারে, সে আর যা-ই হোক দুর্বল হতে পারে না।

সুখারাম নস্কর নিজেও সেটা জানে। তবে যেটা অনেকেই জানে না সেটা হল, ঝগড়া কিংবা মারপিট করতে ওর ভালো লাগে না। ওর ভালো লাগে খোলা আকাশের নীচে দৌড়তে। দৌড়, দৌড়, দৌড়।

ও স্বপ্ন দ্যাখে, ও দৌড়চ্ছে—না, দৌড়চ্ছে না, উড়ে যাচ্ছে বাতাসের বেগে, আর ওর মাথার ওপরে নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য।

অথচ হাফ-ম্যারাথন রানার সুখরাম নস্কর এখন সেন্ট্রাল জেলের ট্রান্সপারেন্ট ফাইবারের পাঁচিলের ঘেরাটোপে বন্দি।

সুখারাম পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। একজন লং ডিসট্যান্স রানারের প্র্যাকটিসের অভ্যেস। এই জেলে আসার আগে, যখন ও স্বাধীন ছিল, তখন ও সপ্তাহে গড়ে ছাপ্পান্ন কিলোমিটার করে দৌড়ত। প্রতিদিন প্র্যাকটিসের সময় ওর কোচ বরাট স্যার স্টপ ওয়াচ হাতে লক্ষ রাখতেন। বলতেন, 'সুখা, অ্যাভারেজে তোর এক-একমাইল কভার করতে পঞ্চান্ন সেকেন্ড লেগে যাচ্ছে!' মাথা নাড়তেন বরাট স্যার : 'কমা, কমা। টাইম আরও কমা। অন্তত পঞ্চাশ সেকেন্ড কর...।'

বরাট স্যার কোচিং-এর জন্য সবার কাছ থেকে টাকা নিতেন—শুধু সুখারামের কাছ থেকে কিছু নিতেন না। কারণ, তিনি সুখারামের বাড়ির অবস্থা জানতেন। অসুস্থ বিধবা মা, আর স্কুলে পড়া একটা ছোট বোন। অভাব ছাড়া ওদের সম্বল বলতে আর কিছু ছিল না। তিনটে প্রাণীর দু-বেলার খোরাকি জোটাতে সুখারাম ওল্ড সিটিতে দিনে দশঘণ্টা করে সাইকেল ভ্যান টানত। বরাট স্যার ওকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'বাচ্চা, চালিয়ে যা। জানিস, লোড করা সাইকেল ভ্যান টানলে পায়ের কাফ মাসল কত ডেভেলাপ করে, কত স্ট্রং হয়!'

পঁচিশ বছরের সুখারাম সব বুঝত। বরাট স্যারের কথাগুলো মিথ্যে ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে একটা আক্ষেপ লুকিয়ে থাকত। নিজের সেরা ছাত্র সুখারামের জন্য তিনি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেননি।

সুখারামের তাতে দু:খ ছিল না। ও হাসিমুখে সাইকেল ভ্যান টানত। আর রোজ ভোরবেলা প্র্যাকটিসে আসত—একদিনও কামাই করত না। কারণ, দৌড়তে ওর দারুণ ভালো লাগত। ওর মনে হত, দৌড়টাই ওর জীবন।

সেইজন্যই সুখারাম ওর পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। জেলের ভেতরে এই বিশাল খোলা মাঠে ও ড্রিলের সময়টায় দৌড় প্র্যাকটিস করে। রোজ গড়ে আট কিলোমিটার করে ওর দৌড়নো চাই-ই চাই। তা হলে সপ্তাহে ছাপ্পান্ন কিলোমিটারের কোটা পূরণ হয়। বরাট স্যার যা বলেছিলেন।

এই মাঠে যখন ও দৌড়য় তখন ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও একজন সান্ত্রীকে ও বরাট স্যার বলে কল্পনা করে নেয়।

বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন। রোগা চেহারা। মাথায় অর্ধেকটা টাক। চোখে চশমা। গাল বসা। কপালে অনেক ভাঁজ। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ঢোলা ফুলপ্যান্ট। এবং সেই পাঞ্জাবি বা ফুলপ্যান্টের কোথাও না কোথাও অল্পবিস্তর ছেঁড়া থাকবেই। মানুষটা রেগে গিয়ে যখন চিৎকার করে ছাত্রদের গালিগালাজ করত তখন তার মুখ দিয়ে থুতু ছিটকে বেরোত।

বরাট স্যার বয়েসকালে লং ডিসট্যান্স রানার ছিলেন। তবে দৌড়ে খুব বেশি এগোতে পারেননি। এ-পাড়া সে-পাড়ায় দু-চারটে লোকাল কাপ জিতেছেন—ব্যস, এই পর্যন্তই।

অনেকে আড়ালে ওঁকে ব্যঙ্গ করে বলে, যারা অ্যাথলেটিক্সে আলটিমেটলি কিছু করতে পারে না, তারাই বয়েস হলে কোচ হয়ে ইয়াং অ্যাথলিটদের ওপরে মাতব্বরি করে আর পয়সা কামায়।

কথাটা কী করে যেন পাঁচকান হয়ে বরাট স্যারের কানে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা মাঠে এসে বরাট স্যার বলেছিলেন, 'শোন, আমি তোদের আর প্র্যাকটিস করাব না।'

সুখারামরা মোট পাঁচজন ছিল সেদিন। ওরা প্রায় একসঙ্গে জিগ্যেস করেছিল, 'কেন, স্যার? শেখাবেন না কেন?'

বরাট স্যার ওদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। ভাঙা গলায় জানতে চেয়েছিলেন, 'আমি তোদের ওপরে মাতব্বরি করি? তোদের কাছ থেকে পয়সা কামাই?'

বরাট স্যারের সেই অপমান মাখা কণ্ঠস্বর সুখারামের আজও মনে আছে। প্রশ্ন দুটো করার সময় বরাট স্যার কেঁদে ফেলেছিলেন। এবং সেই কান্না মেশানো গলায় একই প্রশ্ন বারবার করতে-করতে ভাঙাচোরা

মানুষটা পাশের একটা গাছের নীচে বসে পড়েছিলেন। আর সুখারামরা স্যারকে ঘিরে ধরে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিয়েছিল, আর বারবার বুঝিয়েছিল যে, কথাগুলো সব মিথ্যে।

প্রায় আধঘণ্টা পর চশমার কাচ মুছে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কোচিং শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ততটা মন দিয়ে শেখাতে পারেননি।

স্যারের কথা ভাবতে-ভাবতে সুখারাম নস্কর জেলের মাঠে শুয়ে পড়েছিল। ওর চোখে জলও এসে গিয়েছিল। বরাট স্যার এখন কী করছেন কে জানে! তিনি যদি জানতেন, সুখারাম একজন সান্ত্রীকে বরাট স্যার ভেবে নিয়ে সেন্ট্রাল জেলের এই মাঠে রোজ বিকেলে দৌড় প্র্যাকটিস করে তা হলে কী খুশিই না হতেন!

চোখ বুজে স্যারের কথা ভাবছিল সুখারাম, আর মনে-মনে রেসিং ট্র্যাকে দৌড়চ্ছিল। ট্র্যাকের এক-একটা পাক শেষ করার সময় ট্র্যাকের ঠিক পাশে ও বরাট স্যারকে দেখতে পাচ্ছিল। স্টপ ওয়াচ দেখছেন আর উত্তেজিত হাতের ইশারা করে বলছেন, 'চালিয়ে যা, সুখা! চালিয়ে যা!'

সুখারামকে স্যার খুব ভালোবাসতেন। সবসময় বলতেন, 'তুই আমার সেরা ছাত্র। আমি শিয়োর—তুই একদিন কিছু না কিছু করে দেখাবি...।'

তো রিজিওন্যাল মিটে সুখারাম নস্কর পাঁচ কিলোমিটার রেসে ফার্স্ট হয়েছিল। কাপ, ক্যাশ প্রাইজ আর সার্টিফিকেট নিয়ে ডায়াস থেকে নামতেই বরাট স্যার ওকে জাপটে ধরেছিলেন। আবেগে মানুষটা কোনও কথা বলতে পারছিল না। বারবার শুধু বলছিল, 'সুখা...সুখা...সুখা...।'

প্রাইজের টাকা দিয়ে বরাট স্যারকে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর একটা সস্তার ফুলপ্যান্ট কিনে দিয়েছিল সুখারাম। ওঁর বস্তির দেড়খানা ঘরে গিয়ে যখন ও উপহারের প্যাকেটটা স্যারকে দেয় তখন হতবাক মানুষটা আবার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর আবেগে কেঁপে যাওয়া গলায় বিড়বিড় করে বলছিল, 'এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি! তোর নিজেরই এত টানাটানি...।'

সুখারাম উত্তরে নীচু হয়ে স্যারের পা জড়িয়ে ধরেছিল। ভাঙা গলায় বলেছিল, 'এ আমার গুরুদক্ষিণা, স্যার...গুরুদক্ষিণা...।'

বরাট স্যার ওকে একহাতে ধরে দাঁড় করিয়ে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, সুখা। তুই আমার সেরা ছাত্র...।'

স্যারের পাঞ্জাবিতে মুখ গুঁজে সুখারাম বলেছিল, 'আমি শুধু ছুটতে চাই, স্যার। সারাজীবন ছুটতে চাই...।'

ওর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে স্যার বলেছিলেন, 'শুধু ছুটবি না—আমি জানি তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি। অনেক বড় কিছু...।'

আজ হঠাৎ বরাট স্যারের কথাগুলো খুব বেশি করে মনে পড়ছে।

স্যার বলতেন, 'শোন, পিচের রাস্তা কিংবা সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে কখনও দৌড়বি না। আর মাঠে যদি কোনও ঢাল টের পাস তো সেখানেও প্র্যাকটিস করবি না। সমান জায়গা চাই—সমান। আর শোন, ছোটার সময় পায়ের তলার মাটি স্প্রিং-এর কাজ করে। এই স্প্রিং অ্যাকশান সিমেন্টে কি অ্যাসফাল্টে পাবি না—।'

একদিন জুতোর ফিতে ঢিলে করে বাঁধা ছিল বলে ছুটতে-ছুটতে আচমকা ট্র্যাকে ছিটকে পড়েছিল সুখারাম। একইসঙ্গে সেই রেস থেকেও ছিটকে গিয়েছিল।

তাতে বরাট স্যার ব্যাপক রেগে গিয়েছিলেন। দু-চারটে অশ্লীল গালিগালাজও বয়স্ক লোকটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুখারামকে সেদিন স্যার মুখে তুলোধোনা করেছিলেন। কথার সঙ্গে-সঙ্গে সেদিন স্যারের মুখ থেকে থুতু ছিটকে বেরোচ্ছিল।

'আরে ছাগল, প্রিপ্যারেশানে ধেয়ান দে! তুই যখন ট্র্যাকে দৌড়স তখন কি আসলে তুই দৌড়স নাকি?'

সুখারাম প্রশ্নটার মানে বুঝতে না পেরে হাঁ করে স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাগে অগ্নিশর্মা মানুষটা তখন বলেছিল, 'শোন পাঁঠা, ট্র্যাকে যখন তুই দৌড়স তখন তুই না—আসলে তোর ভেতরে আমি দৌড়ই! আমি! আমি!'

এ-কথা বলতে-বলতে পাগলের মতো নিজের বুকে আঙুল ঠুকেছিল লোকটা।

'সুখা, তোকে নিয়ে আমার কত আশা! আর তোর এই ভুল! ছি:!' আপশোশে এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়েছিলেন বরাট স্যর : 'মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর—মন দিয়ে। আমি শিয়োর, তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি... বড় কিছু...।'

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত 'বড় কিছু একটা' করে দেখিয়েছে সুখারাম। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একা পাঁচ-পাঁচটা ক্রিমিনালকে খতম করে দিয়েছে। আর সেই 'বড়' কাজটা করার সময় ওকে দৌড়তে হয়েছিল। এমন দৌড় ও লাইফে কখনও দৌড়য়নি।

এই সাংঘাতিক ঘটনাটার খবর পেয়ে বরাট স্যার থানায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এসে প্রিয় ছাত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সেদিন স্যারের বুকে মুখ রেখে সুখারাম নস্কর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। আর একইসঙ্গে ও স্যারের খদ্দরের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ পেয়েছিল।

সেই গন্ধে এত আদর আর আন্তরিকতা মাখানো ছিল যে, সুখারামের মনে হয়েছিল এই গন্ধটা স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে।

•

রবিবারের সেই মেঘলা বিকেলটা সুখারামের স্পষ্ট মনে আছে। যে-বিকেল থেকে ওর জীবনটা বাঁক নেওয়া শুরু করেছিল।

কাঠ-মিলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ ছিল। সুখারামদের বস্তির সঙ্গে পোড়া বস্তির ছেলেদের।

কাঠ-মিলের মাঠটা মাপে বিশাল বড়। তার তিন দিক ঘিরে রয়েছে বড়-বড় স'মিল। তার মধ্যে গোটা ছয়েক চালু রয়েছে, আর বাকিগুলো গা-ছমছমে ভাঙাচোরা পোড়োবাড়ি। কাঠ-মিলগুলোর সামনে ছোট-বড় কাঠের গুঁড়ির স্তূপ। লম্বা করে শোয়ানো। একটার ওপরে একটা চাপিয়ে সার দিয়ে ছোট-ছোট পিরামিডের মতো সাজানো। ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে গুঁড়িগুলো ভেজা, বাতাসে ভেজা কাঠের ভুসির গন্ধ। ছোটবেলায় সুখারাম যখন বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ঝুলন সাজাত তখন এইসব মিল থেকে বিনাপয়সায় কাঠের ভুসি নিয়ে যেত।

কাঠ-মিলের মাঠের একদিকে ছাল-ওঠা এবড়োখেবড়ো পিচের রাস্তা। আর তারপরই নোংরা জলের সরু খাল।

খালের জল কালো, তেলচিটে—অনেকটাই কচুরিপানায় ঢাকা। খালের দু-পাড় থেকে কালো মাটি আর পাঁক ঢাল বেয়ে প্রায় মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে। খালের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে প্রবল দুর্গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারে। তার একটা বড় কারণ, কুকুর-বেড়াল গোরু-ছাগল মারা গেলে তাদের ডেডবডি ফেলার জায়গাও এই খাল।

খালপাড় ধরে একটানা ঝুপড়ি। বর্ষার আক্রমণ ঠেকাতে নীল, সবুজ, কালো কিংবা লালরঙের পলিথিনের টুকরোয় ঢাকা।

মাঠের কাছ থেকে প্রায় কিলোমিটারখানেক দূরে পোড়া বস্তি। সুখারামের খুব ছোটবেলায় খালধারের ওই বস্তিটায় আগুন লেগে গিয়েছিল। তার পর থেকেই ওটার নাম হয়ে গেছে পোড়া বস্তি।

পোড়া বস্তির বেশিরভাগ ছেলেই চুরি, ডাকাতি আর ছিনতাইয়ের কাজে জড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে খুন-জখমের খেলাও আছে। ওদের মধ্যে ফেরোশাস যে দু-চারজন, তারা ধীরে-ধীরে 'ভাইয়া' বনে গেছে। ফলে তারা পয়সা করেছে। বস্তিতে থেকেও ঠাটবাট বজায় রাখতে পারে। মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়ায়।

সুখারামের সঙ্গে পোড়া বস্তির কারও কোনওরকম দোস্তি ছিল না। তবে সুখারামদের বস্তির কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল। আর সেই যোগাযোগ থেকেই কীভাবে যেন ফুটবল ম্যাচটার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

সকাল থেকেই মেঘলা, আর আকাশ থেকে একঘেয়েভাবে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

বিকেল চারটের সময় দুটো দল দুটো ফুটবল নিয়ে কাঠ-মিলের মাঠে হাজির হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া মাঠে ছিল জনা তিরিশ কি চল্লিশজন দর্শক। কারও মাথায় ছাতা, কারও বা পলিথিন, আবার কারও মাথায় শুধুই ভেজা আকাশ। মাঠের পাশে রাখা ভেজা কাঠের গুঁড়ির গ্যালারিতে দর্শকরা যে-যার মতো বসে পড়েছিল। এ ছাড়া মাঠে» গোলপোস্টের পিছনে দাঁড় করানো ছিল বেশ কয়েকটা সাইকেল, মোটরবাইক, আর সাইকেল ভ্যান। তার মধ্যে সুখারামের সাইকেল ভ্যানটাও ছিল।

খেলা শুরু হওয়ার দু-পাঁচ মিনিট পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ফলে দর্শকের ভিড়টা আরও একটু বেড়ে গেল। হইচই চিৎকারের মধ্যে খেলা চলতে লাগল। মাঠ ভরতি জল-কাদায় বাইশজন প্লেয়ার আর একজন রেফারি বেদম ছুটোছুটি করতে লাগল।

প্লেয়ারদের কারও পায়ে কেডস, কারও পায়ে সস্তার স্নিকার, আর বেশিরভাগেরই খালি পা।

সুখারামের দু-জোড়া রানিং শু। একজোড়া নতুন, একজোড়া পুরোনো। ও পুরোনো জুতোটা পরেই মাঠে নেমেছিল। এ ছাড়া পোশাক বলতে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি।

সুখারাম ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে বিরাট কিছু নয়, তবে লং ডিসট্যান্স রানার হওয়ার সুবাদে ও অনায়াসে বলের পিছনে ছুটোছুটি করতে পারছিল। অন্যদের মতো সহজে হাঁপিয়ে পড়ছিল না।

খেলা যখন প্রায় শেষের দিকে তখনই গোলমালটা বাধল।

ম্যাচের রেজাল্ট তখন ফোর টু থ্রি। সুখারামদের টিম এক গোলে হারছিল।

সেই অবস্থায় হঠাৎই মিডফিল্ড থেকে সুখারাম পায়ে বল পেয়ে গেল এবং হরিণের মতো ছুটতে শুরু করল।

ছুটতে-ছুটতে ও ঢুকে গেল বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে। কিন্তু গোলে শট নেওয়ার মতো পজিশন তৈরি করার আগেই বিপক্ষের একজন ডিফেন্ডার পাশ থেকে ছুটে-এসে ওকে হাঁটুর নীচে লাথি মারল।

সুখারাম উলটে পড়ল এবং রেফারি বাঁশি বাজাল। পেনাল্টি।

ম্যাচ ড্র করতে পারার সুযোগ সামনে পেয়ে ওদের দলের সবাই 'পেনাল্টি! পেনাল্টি!' বলে চেঁচাতে লাগল। আর ওদের সাপোর্টাররা তার দশগুণ চিৎকারে মেঘলা আকাশ ফাটাতে লাগল।

সুখারাম সেরকম কোনও চোট পায়নি। পড়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মাথাটা পলকের জন্য গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজানোয় ও রাগটাকে সামলে নিয়েছিল। শুধু বেঁটে মোটা ডিফেন্ডারটার দিকে কটমট করে কয়েকবার তাকিয়েছিল।

রেফারির দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় বল বসিয়ে সুখারাম যখন পেনাল্টি শট নেওয়ার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সেই ডিফেন্ডার ছেলেটা ছুটে এসে এক লাথিতে বলটাকে উড়িয়ে দিল। তারপর সুখারামকে লক্ষ করে খিস্তির বন্যা ছুটিয়ে তেড়ে গেল ওর দিকে। জোড়া হাতের জোরালো ধাক্কায় ওকে ছিটকে ফেলে দিল।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রবল হট্টগোল আর হাতাহাতি। রেফারি গণ্ডগোল থামানোর চেষ্টায় ঘন-ঘন বাঁশি বাজাতে লাগল, কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছিল না।

একটু পরেই হাতাহাতিটা মারপিটে পৌঁছে গেল। তার সঙ্গে পরস্পরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চোখ রাঙিয়ে গলাবাজি করে তর্কাতর্কি।

মাঠের ধার থেকে, কাঠের গুঁড়ির 'গ্যালারি' থেকে, দর্শকরা নেমে এল মাঠের মধ্যে। তারপর ব্যাপারটা 'দুই বস্তির মধ্যে সংঘর্ষ' গোছের চেহারা নিল।

সংঘর্ষের নিউক্লিয়াসটা মাঠের মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে কী করে যেন মাঠের কিনারায় চলে এল।

বেঁটে ডিফেন্ডারটা বারবারই সুখারামের দিকে তেড়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু কয়েকজন ওর হাত-কোমর ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে ওকে বশে রাখছিল। যেটা বশে রাখা যাচ্ছিল না, সেটা হল ওর মুখ থেকে ফোয়ারার তোড়ে বেরিয়ে আসা অশ্রাব্য খিস্তি।

সুখারাম হাত-পা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, তবে বড় কোনও গোলমালে জড়াতে চাইছিল না।

হঠাৎই বেঁটে ডিফেন্ডারটা বুনো মোষের শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় সঙ্গীদের হাতের বাধন ছাড়িয়ে নিল। তারপর সুখারামের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখে একটার পর একটা ঘুসি বসাতে লাগল।

সুখারাম যতটা পারল সেগুলো এড়িয়ে গেল কিংবা মুখের সামনে হাতের ঢাল তৈরি করে আটকাল। তারপর অ্যাথলিটের ক্ষিপ্রতায় পাশে সরে গেল।

ঘুসিগুলো জুতসইভাবে প্রতিপক্ষের মুখে না লাগায় ডিফেন্ডার ছেলেটা খেপে গেল। ও ষাঁড়ের মতো একরোখাভাবে ছুটে গেল সুখারামের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ছেলেটার মাথায় বোধহয় একজোড়া শিং রয়েছে। সেটা দিয়ে ও সুখারামকে গুঁতিয়ে খতম করতে চাইছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সুখারাম ছেলেটার আক্রমণ-রেখা থেকে ছিটকে সরে গেল।

তিরবেগে ছুটে যাওয়া ছেলেটার মাথা কাঠের গুঁড়িতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল। সংঘর্ষের শব্দটা এমন জোরালো শোনাল যে, সবাই চমকে উঠল।

ডিফেন্ডার ছেলেটা ক্যারমের ঘুঁটির মতো কাঠের গুঁড়িতে রিবাউন্ড করে মাঠে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর আর একটুও নড়ল না।

এতক্ষণ ধরে যে-শোরগোলটা চলছিল সেটা হঠাৎই থেমে গেল।

দু-চারজন ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে ডাকতে লাগল : 'মদনোয়া! এ মদনোয়া! উঠ, সালে! উঠ জলদি...!'

কিন্তু মদন, অথবা মদনোয়া, সে-ডাকে সাড়া দিল না।

তখন দুজন ওর মাথার কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ওর কাঁধ আর বুকে হাত রেখে ওকে ঠেলতে লাগল আর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু মদনোয়া নড়ল না।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক লোক সামনে এগিয়ে এল। মিশকালো রং, গায়ে ময়লা প্যান্ট-শার্ট। গালে দু-চারদিনের না-কামানো সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

মদনোয়াকে ঘিরে থাকা ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ল লোকটা। মদনোয়ার মাথার কাছে বসে ওর কানের তিন আঙুল নীচে হাত রেখে কী যেন অনুভব করতে চাইল।

তারপর ওর নাকের খুব কাছে হাতের পিঠ রেখে বুঝতে চাইল নিশ্বাস পড়ছে কি না।

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর শেষতম পরীক্ষার জন্য উপুড় হয়ে মাথা পেতে দিল মদনোয়ার বুকে।

না:, হৃৎপিণ্ডের কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সব চুপচাপ।

বৃদ্ধ লোকটা মাথা তুলে চোখ বড়-বড় করে তাকাল চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে। ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'আরে, ইয়ে সালা তো মর গয়া!'

কথাটা শোনামাত্রই কোন এক আশ্চর্য ম্যাজিকে জমে থাকা ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করল। তিন-চারটে ছেলে মদনোয়ার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর শরীরটাকে পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করল, আর গলা ফাটিয়ে ওর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

সুখারাম একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কী করবে। তাই এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল।

ওর বস্তির দু-চারজন ছেলে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, 'সালা কেলো হয়ে গেল। মদনোয়ার দাদা বদনোয়া পোড়া বস্তির ভাইয়া। ও সালা বহুত খতরনাক তোলাছপ্পন মাল। এ কেস তো সহজে সালটাবে না...।'

আর-একজন বলল, 'সুখা, তুই হাপিস হয়ে যা। নইলে বদনোয়া তোকে পালিশ দিয়ে গিলে করে দেবে।'

সুখারাম অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আমি কী করেছি? কেসটা তো পাতি অ্যাক্সিডেন্ট! মদনোয়ার বুকে সালা খিঁচ ছিল—তাই টপকে গেছে...।'

'সে তো অ্যাক্সিডেন্ট আমরা সবাই জানি। কিন্তু বদনোয়ার গ্যাং সেটা মানবে না। সালারা বদলা নিতে আসবে—।'

কয়েকটা মোটরবাইক স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল। সুখারাম শব্দের উৎসের দিকে চোখ ফেরাল। গোল পোস্টের পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখা তিনটে মোটরবাইক ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে খালপাড়ের রাস্তায় পৌঁছে গেছে। ফটফট আওয়াজ তুলে বাইকগুলো পোড়া বস্তির দিকে ছুটে গেল। বোধহয় বদনোয়াকে খবর দিতে।

সুখারামকে ওর সঙ্গীরা নানান পরামর্শ দিতে লাগল। তার মধ্যে সংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বেশি যে-পরামর্শটা পাওয়া গেল সেটা হল, কোথাও পালিয়ে গিয়ে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা।

বিধবা মা আর বোনের কথা মনে পড়ল সুখারামের। ওদের ছেড়ে ও কোথায় যাবে? ওর তো যাওয়ার আর কোনও জায়গা নেই! এমন কোনও আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই যাদের কাছে গিয়ে এক-দু-সপ্তাহ গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।

তা হলে কোথায় পালাবে সুখারাম?

গিন্টি নামে একজন বন্ধুর কাছে মোবাইল ফোনটা জমা রেখে ও ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। গিন্টি বস্তিতে ওর পাশেই থাকে। ও গিন্টিকে ডেকে ফোনটা চেয়ে নিল। তারপর বাড়িতে একটা ফোন করল।

মা ফোন ধরল।

'মা, সুখা, বলছি।'

'বল—।'

'ফুটবল ম্যাচে একটা কেস হয়ে গেছে—।'

'কী হয়েছে?' মায়ের গলায় উদ্বেগ।

সুখারাম সব বলল।

বদনোয়া আর তার গ্যাঙের কথা শুনে মা একটু ভয় পেয়ে গেল।

'এখন কী করবি?'

'ক'টা দিন একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। গিন্টিরা সব তাই বলছে...।'

'সে কী রে!' মায়ের গলায় কান্না এসে গেল।

'হ্যাঁ। আমি এক্ষুনি বাড়ি যাচ্ছি। টুকটাক ক'টা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ব। তুই একদম চিন্তা করিস না, মা। সব সালটে যাবে—।'

ফোন কেটে দিয়ে সাইকেল ভ্যানের দিকে ছুটল সুখারাম। তারপর মজবুত পায়ে প্যাডেল করে সোজা বাড়ির দিকে।

মাঠে তখনও বেশ কিছু লোকের ভিড় ছিল। সুখারাম জানে, ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে একটু পরেই বদনোয়া আসবে, তারপর হয়তো পুলিশ। কিন্তু ওল্ড সিটিতে পুলিশের যা অবস্থা তাতে ওদের শুধু গায়ের পোশাক আর তকমাটুকুই আছে—বাকি সব গেছে।

বদনোয়াকে ওর বস্তির ছেলেরা নানারকম রং চড়ানো গল্প শোনাবে, ওকে ওসকাবে। তারপর ক্ষিপ্ত বদনোয়া সুখারামের পিছনে ছুটবে। তখন ওকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হবে। যেমন করে হোক প্রাণে বাঁচতে হবে। কারণ, সুখারাম প্রাণে না বাঁচলে ওর মা আর বোন বাঁচবে কেমন করে! সুখা বিনা ওরা ভুখা মরে যাবে।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডেল করছিল সুখারাম। ওর মনে হচ্ছিল যেন ও কোনও রেসিং ট্র্যাকে ছুটছে। তখনই ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ল। কাল ভোরবেলা ও প্র্যাকটিসে যেতে পারবে না ভেবে খারাপ লাগল। ক'টা ভোরবেলা এখন নষ্ট হবে কে জানে!

সন্ধের অন্ধকার নেমে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সাইকেল ভ্যান নিয়ে সুখা ওর বস্তিতে ঢুকে পড়ল।

নোংরা কাদা প্যাচপেচে রাস্তা, টিমটিমে আলো, দুপাশে আবর্জনার স্তূপ। দম আটকানো বাতাসে উৎকট দুর্গন্ধ। কিন্তু এসবই সুখারামের গা সওয়া। ওকে মোটেই নাক টিপে ধরতে হয় না। বরং এই দুর্গন্ধটা ওর অস্তিত্বের এক ধরনের পরিচয়পত্র। এই বিশেষ গন্ধটা নাকে এলেই ওর মনে হয় ও বাড়ি ফিরেছে। মা আর বোনের কাছে ফিরেছে।

সাইকেল ভ্যানটা ওদের ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করাল। মশার ঝাঁক ওকে ঘিরে ধরে পিনপিন শব্দে উড়তে লাগল।

দরজায় ধাক্কা দিতেই সুখারামের বোন চোলি দরজা খুলল। ওর পিছনে হ্যারিকেনের আলো থাকায় ওর মুখটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। কিন্তু সুখারাম জানে চোলিকে সুন্দর দেখতে, আর সেজন্য ওদের অনেক বাজে উৎপাত সহ্য করতে হয়।

সুখারাম ঘরে ঢুকতেই চোলি দরজাটা চটপট আবার বন্ধ করে দিল। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, দাদাভাই?'

মা ঝুপড়ি-ঘরের এক কোণে বসে ছিল। ঘরের মেঝেতে পলিথিনের চাদর পাতা, তার ওপরে চাটাই আর পুরোনো পিচবোর্ড। এক পাশে তেলচিটে বিছানা। মা আর চোলি ওই বিছানায় শোয়।

বিছানাটার পাশেই দরমার 'পাঁচিল'। সেই পাঁচিলের ওপারে সুখারামের বিছানা পাতা।

সুখারাম মায়ের পাশে গিয়ে পলিথিনের ওপরে বসে পড়ল। চোলিও ওর কাছ ঘেঁষে উবু হয়ে বসল।

সুখারাম মাঠের কাহিনি সংক্ষেপে আবার বলল।

বদনোয়ার নাম শুনে মা ডুকরে উঠল। চোলি কাঁদতে শুরু করল।

চোলির দিকে তাকিয়ে সুখারামের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

হলদে রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরে আছে। সেটা ময়লা হলেও ওকে বেশ মানিয়েছে। পোশাকটায় কোথাও না কোথাও ছেঁড়া-ফাটা নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

চোলির বয়েস উনিশ-কুড়ি। মাজা রং। ওকে দেখে মোটেই ঝুপড়িবাসী বলে মনে হয় না। বরং ঠিকঠাক পোশাক পরলে ওর সঙ্গে সুখারামদের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাবে।

চোলির জন্য মাঝে-মাঝে দু:খ হয় ওর। কেন যে এই সুন্দরী মেয়েটা এই বস্তিতে জন্মাতে গেল! ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। মা আর সুখারাম ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে, খোঁজখবর করছে—কিন্তু এখনও যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি।

সুখারাম ঠিক করেছে, ঝুপড়ির কোনও ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। তার জন্য যত কষ্ট করতে হয় হোক।

এখনও পর্যন্ত যে চোলির কোনও সম্বন্ধ ঠিক করা যায়নি তার একটা তুচ্ছ কারণ আছে : চোলির বাঁ-পাটা লম্বায় সামান্য খাটো—তাই ও একটু খুঁড়িয়ে চলে।

কিন্তু ওকে যে এত সুন্দর দেখতে, সেটা কিছু নয়!

চোলি আর মা-কে ক'দিন ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে সুখারামের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

ও বোনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মোবাইল ফোনটা ঠিকমতো চার্জ দিয়ে রাখিস, মা। আমি খুব ভোরবেলা আর রাত বারোটার পর ফোন করব...।'

বস্তির ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ না পৌঁছোলেও বস্তির ল্যাম্পপোস্টের গোড়ায় মোবাইল ফোন চার্জ করার সকেট লাগানো আছে।

চোলি আর মা-ও এবার উঠে পড়ল। সুখারামের দরকারি জিনিসগুলো ভরে দিল একটা নাইলনের থলেতে। বিছানার নীচ থেকে কিছু টাকা বের করে মা ছেলের হাতে দিল। তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করিস, সুখা...।'

'তুই কোনও চিন্তা করিস না। ক'টা দিনের তো ব্যাপার। সব্বাই দেখেছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট—আমি কিচ্ছু করিনি...।'

হঠাৎ করে সুখারামের কী মনে হল, ও ঝুঁকে পড়ে চট করে মা-কে প্রণাম করল। তারপর চোলির মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, 'বরাট স্যারকে আমি ফোন করে দেব যে, ক'দিন প্র্যাকটিসে যাব না। নইলে স্যার চিন্তা করবে...বাড়িতে খোঁজ নিতে চলে আসবে।' থলেটা হাতে তুলে নিল : 'তোরা সাবধানে থাকিস। কোনও প্রবলেম হলে আমাকে ফোন করবি। আমি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি...।'

চোলি কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতেই জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যাং বাড়িতে এসে হামলা করতে পারে। তখন আমার ঠেক জানার জন্যে তোদের জ্বালিয়ে খাবে—টরচার করবে।'

না, মা আর বোনকে সুখরাম ওর ভাবী আস্তানার কথা জানায়নি। যদিও ও মনে-মনে ওর লুকোনোর জায়গাটা ঠিক করে ফেলেছিল।

চোখে জল নিয়ে চোলি আর মা দরজার কাছে এল। অন্ধকারের মধ্যে সুখারামের ছায়া সাইকেল ভ্যানে উঠল। তারপর গাড়িটা চলতে শুরু করল।

এবড়োখেবড়ো পথে নেমে এসে সুখারাম ভাবল, এখন ওর আর মায়ের দুটো মোবাইল ফোনই সমস্ত ভরসা। সস্তায় কেনা এই সেকেন্ড হ্যান্ড কি থার্ড হ্যান্ড মোবাইল সেটগুলো ঠিকঠাক কাজ করলে হয়!

ঘোরালো নির্জন পথ ধরে সাইকেল ভ্যানটা ছুটে যাচ্ছিল। এই রাস্তাগুলো দিনের বেলাতেও কেউ ব্যবহার করে না। নেহাত রাস্তাগুলোর পালানোর উপায় নেই তাই ওরা চুপচাপ এখানে পড়ে আছে। নইলে ওরাও এই নির্জনতা ছেড়ে পালাত।

রাস্তার পাশে কখনও-সখনও ল্যাম্পপোস্ট চোখে পড়ছে এবং তার দু-একটায় মলিন বালব জ্বলছে। ভাঙাচোরা রাস্তার এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে।

সুখারাম জোরে-জোরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল আর ভাবছিল বরাট স্যারের কথা। ওর কাফ মাসল এখন প্রতি মুহূর্তেই শক্তিশালী হচ্ছে। ক'দিন প্র্যাকটিসে না যেতে পারার খামতিটা ওকে মাঝরাত্তিরে ভ্যান চালিয়েই পুষিয়ে নিতে হবে।

সুখরাম লুকিয়ে থাকার যে-জায়গাটা পছন্দ করেছে সেটা কাঠ-মিলের মাঠের পাশেই। যে-মিলগুলো বহু বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে তারই একটা ভাঙাচোরা গা-ছমছমে মডেল বেছে নিয়ে সুখারাম তার অন্দরমহলে আস্তানা গাড়বে। বদনোয়া বা ওর গ্যাং ভাবতেই পারবে না সুখারাম নস্কর অকুস্থলের এত কাছাকাছি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

না, এখন সুখারাম ওখানে যাচ্ছে না। কারণ, এখনও হয়তো মাঠে মদনোয়ার ডেডবডি পড়ে রয়েছে। এখনও হয়তো মাঠে গজল্লা চলছে।

তাই এখন ও সাইকেল ভ্যান নিয়ে খানাখন্দে ভরা অন্ধকার নির্জন রাস্তাগুলোয় ঘুরে বেড়াবে। কিংবা কোথাও গাড়ি লাগিয়ে বিশ্রাম নেবে। তারপর রাত অনেক গাঢ় হলে কোনও সস্তার হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে ওর নতুন আস্তানায় গিয়ে ঢুকবে।

অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালানোর পর একটা লোহালক্কড়ের স্তূপ দেখতে পেল সুখারাম। তার পাশে একটুকরো ফাঁকা জায়গা। কী ভেবে সেখানে একটু আড়াল করে গাড়িটা লাগাল। তারপর গাড়িতেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল, থলেটা মাথার নীচে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

মেঘ সরে গিয়ে তারা ফুটেছে। কালো আকাশে সোনার কুচি জ্বলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে যে-আনন্দ পাওয়া যায় সেটা সবার জন্য—সেখানে গরিব-বড়লোক কোনও ভাগাভাগি নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, ইস, ওরা যদি অল্প-অল্প বড়লোক হত তা হলে খুব ভালো হত। বেশ কিছুটা বরপণ দিয়ে চোলিটার বিয়ে দেওয়া যেত। তখন মায়ের দুশ্চিন্তা কমে যেত। সুখারামেরও।



হঠাৎই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। চমকে উঠল সুখারাম।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল। থলের ভেতরে হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নম্বরটা দেখল।

মা ফোন করেছে।

'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে 'হ্যালো' বলতেই চোলির গলা শুনতে পেল।

'দাদাভাই!'

'হ্যাঁ—বল।' চাপা গলায় বলল সুখারাম।

'তুই ঠিক আছিস তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। কিন্তু ফর নাথিং আমাকে ফোন করিস না। বিপদ হবে—।'

'মা ফোন করতে বলল। বলতে ভুলে গেছি...থলের মধ্যে ছ'টা রুটি, একটু আলুভাজা আর চিনি আছে—খেয়ে নিস। তার সঙ্গে দুটো জলের বোতলও আমি দিয়ে দিয়েছি...।'

অবাক হয়ে গেল সুখারাম। চোখে জল এসে গেল। এত তাড়াহুড়ো আর টেনশানের মধ্যেও মা ওর রাতের খাবারটা গুছিয়ে দিতে ভোলেনি!

হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। চোলিকে বলল, 'হ্যাঁ, খেয়ে নেব। তোরা চিন্তা করিস না...।'

'তুই সাবধানে থাকিস, দাদাভাই...।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল চোলি। তারপর কান্না-কান্না গলায় বলল, 'যেখানেই থাকিস না কেন...।'

'তোরাও সাবধানে থাকিস। রাখছি—।'

ফোন কেটে দিল সুখারাম।

আর ঠিক তখনই দূরে তিনটে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। সঙ্গে সাইলেন্সারের ফটফট শব্দ শোনা গেল।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় লাফাতে-লাফাতে তিনটে মোটরবাইক এগিয়ে আসছে। রাস্তার নানান গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জলে হেডলাইটগুলোর ছায়া থেকে-থেকেই ঝলসে উঠছে। তিনটে আলো সংখ্যায় চারটে, পাঁচটা কিংবা ছ'টা হয়ে যাচ্ছে।

সুখারাম নস্করের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

বদনোয়ার দল নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে, সুখারাম ওর ঝুপড়িতে নেই। তাই ওরা মোটরবাইকে করে সব রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়েছে। খ্যাপা নেকড়ের মতো সুখারামকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে সুখারামের মুখ শুকিয়ে গেল। ভীষণ জল তেষ্টা পেল ওর। ঝটপট সাইকেল ভ্যান থেকে নেমে লোহালক্কড়ের স্তূপের আড়ালে চলে গেল। বোতাম টিপে মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ করে দিল। নইলে ফোনটা আচমকা বেজে উঠলেই সর্বনাশ।

জং ধরা লোহালক্কড়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সুখারাম।

মোটরবাইকের আলোগুলো নাচতে-নাচতে ওর দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

•

সুখারাম ভয় পেল। না, শুধু এভাবে লুকিয়ে থাকলে চলবে না,—আরও কিছু করতে হবে। কারণ, ওর পায়ে রানিং শু, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর হাফপ্যান্ট। এগুলো ওর মাঠের পোশাক। এগুলো দেখলেই ওরা চিনে ফেলতে পারে।

সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইল ফোনটা লোহালক্কড়ের খাঁজে গুঁজে দিল সুখা।

চটপট পায়ের জুতো খুলে ফেলল। জুতো জোড়া ছুড়ে দিল গাঢ় অন্ধকারের দিকে। একটানে খুলে ফেলল স্যান্ডো গেঞ্জি। ওটা তালগোল পাকিয়ে রাস্তার গর্তে জমে থাকা জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাফপ্যান্টটার বোতাম খুলে কোমরের খানিকটা নীচে টেনে নামিয়ে দিল। এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়াল নোংরা রাস্তায়। ঠিক যেন চালচুলোহীন কোনও ভবঘুরে পথে মদ-টদ খেয়ে পড়ে আছে।

সুখারাম মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিল। মোটরবাইকে ছুটে আসা শয়তানগুলো যেন ওকে দেখতে না পায়। ওর বস্তির ঘরে এককোণে ছোট্ট ঠাকুরের আসন রয়েছে। সেখানে মা কালীর ফটো রয়েছে। মা সকাল-সন্ধে ধূপকাঠি জ্বেলে নকুলদানা আর জল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করে। এখন দু-চোখ বুজে সেই ফটোটাকেই দেখতে চাইছিল ও। আর আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলও। ওই তো মা কালী—নৃমুণ্ডমালিনী!

বাইকগুলো ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ও আড়চোখে দেখল, দুটো বাইকে পাঁচজন ছেলে বসে আছে। তার মধ্যে প্রথম বাইকটায় বসে আছে বদনোয়া। একা।

আবছা আলোতেও ওর মুখটা সুখারাম চিনতে পারল।

ভারী চেহারা। খানিকটা ভুঁড়ি রয়েছে। গালে চাপদাড়ি, মোটা গোঁফ। মাথার লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। ডানহাতে চকচকে সোনার বালা।

যেতে-যেতে একেবারে পিছনের বাইকটা হঠাৎই একটা গর্তে পড়ে টাল খেয়ে গেল। বাইকের আরোহী দুজন তাড়াতাড়ি রাস্তায় পা ফেলে পুরোপুরি পড়ে যাওয়াটা সামলে নিল। আচমকা এই দুর্ঘটনায় ওদের মধ্যে একজন গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সেটা কানে যাওয়াতে সামনের বাইক দুটো থেমে গেল। পিছনের বাইকটা তখন সুখারামের খুব কাছাকাছি।

পিছনে তাকিয়ে একজন বলল, 'দেখে চালা। রাস্তা তো নয় সালা—যেন গুটি বসন্তের ছল্লা লেগেছে—।'

কাত হয়ে যাওয়া বাইকটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা স্টার্ট দিয়ে আরোহী একদলা পিক ফেলল রাস্তায়। চেঁচিয়ে বোধহয় বদনোয়াকে উদ্দেশ করে বলল, 'বস, সুখারাম হারামির বাচ্চাটা কোথায় সেঁধিয়ে গেল বলো তো! ব্যাটা একেবারে লাপাতা হয়ে গেল দেখছি...।'

সামনের বাইক থেকে বদনোয়া হিংস্র গলায় বলল, 'লাপাতা হোকে জায়েগা কাঁহা! পাতালে গিয়ে ঢুকলেও শুয়োরের বাচ্চার চুলের গোছা ধরে টেনে তুলে আনব। মদনোয়ার দাম সুদে-আসলে চুকতা করব।'

ওদের বাইকের কাছ থেকে ছ'-সাত ফুট দূরে অন্ধকারে পড়ে থাকা সুখারামের বুক ঢিপঢিপ করছিল। মায়ের জন্য, চোলির জন্য ওর বুক কেঁপে উঠল।

ঠিক তখনই ওদের একজন হেসে বলল, 'সুখারাম পালালে কী হবে? ওর ঘর-বাড়ি তো আর জায়গা ছেড়ে পালাতে পারবে না! ওর মা আর ফুলটুসি বোনটাই বা কোথায় পালাবে?'

কথাটা শুনে সুখারামের শীত-শীত করে উঠল। ওর মনে হল, ও বিশাল এক বরফের স্ল্যাবের ওপরে শুয়ে আছে।

বাইক তিনটে আবার চলতে শুরু করল। শেষের বাইকটার চাকা আবার জল জমা গর্তে পড়তেই কাদাজল ছিটকে এল সুখার গায়ে। ওর মনের ভেতরে তখন স্টিম রোলার চলছিল।

বাইকগুলো চলে যেতেই মা কালীকে ডাকাডাকি করা থামিয়ে উঠে বসল। এখন ও কী করবে? কী করা উচিত?

মা আর চোলির কথা ভেবে ওর ভয় করতে লাগল। ওর ভেতরে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন শুরু হল। ওর ভেতরে একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে আর-একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন বাড়ি যাওয়া উচিত—মা আর চোলির ওকে ভীষণ দরকার।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝিকিয়ে উঠল। তারপরই মেঘের বাঘের ডাক।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সুখা। হে মা কালী, আমাকে বলে দাও আমি এখন কী করব। আমি কি মায়ের কাছে যাব?

অমনই আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে-সঙ্গে সুখারাম নস্করের মনে হল, এক মা ওকে বলছে আর-এক মায়ের কাছে যেতে। এই বৃষ্টি তারই সংকেত।

উঠে দাঁড়াল সুখা। প্যান্টটা ঠিকঠাক করে পরে নিল। সারা গায়ে কাদাজল লেপটে আছে। বৃষ্টি ওর গা ধুয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ও এগিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে। উবু হয়ে বসে ওর রানিং শু খুঁজতে লাগল।

একটু পরেই সেগুলো হাতে ঠেকল। রাস্তায় লেপটে বসে জুতো জোড়া তাড়াতাড়ি পরে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মোবাইল ফোন। সাইকেল ভ্যান। ছুট, ছুট, ছুট।

ভ্যান চালাতে-চালাতেই মা-কে ফোন করল।

ফোন ধরল চোলি।

'দাদাভাই! বল....।'

'শিগগির মা-কে ফোন দে।'

চোলি ঘাবড়ে গেল। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলে, 'কেন রে?'

'ও :, শিগগির মা-কে দে—।'

এক সেকেন্ড পরেই মায়ের গলা পাওয়া গেল।

'কী হয়েছে, সুখা?'

'মা, তুই আর চোলি এক্ষুনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যা—।'

'সে কী! কেন?'

'মা, বদনোয়ার গ্যাং আমাকে পাগলের মতো খুঁজছে। আমাকে হাতে না পেয়ে ওরা ঘরে গিয়ে তোদের অ্যাটাক করার কথা ভাবছে— তোকে আর চোলিকে। আমি নিজের কানে শুনেছি...।'

'কিন্তু এখন আমরা কোথায় পালাব? পালিয়ে কোথায় যাব?' হতভম্ব গলায় মা বলল।

'যেখানে হোক যা—' অধৈর্য গলায় বলল সুখারাম, 'গিন্টিদের ঘরে কি আর কারও ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাক। আমি ভ্যান নিয়ে এখুনি আসছি...।'

ফোনের লাইন কেটে দিল। পাগলের মতো সাইকেল ভ্যানের প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। বৃষ্টি, খানা-খন্দ —কিছুই ও টের পাচ্ছিল না।

মনে পড়ল, কয়েক ঘণ্টা আগে চোলি ওকে কাঁদতে-কাঁদতে জিগ্যেস করেছিল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

উত্তরে সুখা বলেছিল, 'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যাং...।'

তখন ও একরকম টরচারের কথা ভেবেছিল—আর এখন অন্যরকম।

সাইকেল ভ্যানটা বস্তির কাছাকাছি চলে এসেছিল। এখানটায় রাবিশের চাপান দেওয়া কাঁচা রাস্তা। তার একপাশে সরু নালা মতন। নালার ঢাল বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে নামছে।

একপাশে দুটো ভাঙাচোরা ঘর চোখে পড়ল। যারা থাকত তারা মাসকয়েক আগে আস্তানা ছেড়ে চলে গেছে। তাদের ফেলে যাওয়া ঘরের বাঁশ, চাটাই, ছেঁড়া পলিথিন—যে যা পেরেছে হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ঘর দুটো যে-অবস্থায় পড়ে আছে তাকে ঘরের 'কঙ্কাল' বললেও অনেকটা বাড়িয়ে বলা হয়। সুখারাম ওর সাইকেল ভ্যানটা সেই দুটো ঘরের একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে খুব সাবধানে ওর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বস্তির গলিপথে অন্য অনেক কিছুর মতোই আলোরও অভাব। তাই বৃষ্টি যে পড়ছে সেটা দেখা যাচ্ছিল না, তবে বস্তির ঘরগুলোর চাল থেকে হালকা শব্দ উঠছিল, আর গায়েও টের পাওয়া যাচ্ছিল।

ধীরে-ধীরে এগোতে-এগোতে সুখারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। না, তখনও ও কিছু দেখতে পায়নি—কিন্তু শুনতে পেয়েছে।

কারা যেন চিৎকার করছে। এবং সে-চিৎকারের যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তার বেশিরভাগটাই নোংরা গালিগালাজ।

ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে সেটা আঁচ করতে পারল। তাই একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল।

ওদের ঘরে পৌঁছনোর বাঁকটার মুখে একটা ফুটপাঁচেক চওড়া খাঁজ আছে। সেখানে ভাঙাচোরা ইটের টুকরো আর নানান আবর্জনা। তার একপাশে সাইকেল আর সাইকেল ভ্যানের বাতিল টায়ার-টিউব, সিট কভার ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সুখা জানে, ওজনদরে বিক্রি হয় এমন কোনও মেটাল পার্টর্স সেখানে নেই। শীতের সময় ওইসব টায়ার-টিউব টেনে নিয়ে বস্তির লোকরা ধুনি জ্বালিয়ে শীত তাড়ায়।

ওই খাঁজটাকে বস্তির সবাই বারোয়ারি বাথরুম হিসেবেও ব্যবহার করে। ফলে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে হাত চাপা দেওয়াটা নেহাতই প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা যেতে পারে।

তাই সুখারামও রোজকার অভ্যাসমতো বাঁকটা ঘোরার সময় নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়েছিল।

ভাগ্যিস দিয়েছিল, নইলে বাঁক ঘুরেই যে-দৃশ্য ওর চোখে পড়ল তাতে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জান্তব চিৎকারটা বদনোয়ার গ্যাং-এর কেউ না কেউ হয়তো শুনে ফেলত। কিন্তু নাক-মুখ হাতে ঢাকা থাকায় ওর চিৎকারটা ডুকরে ওঠা চাপা কান্নার মতো শোনাল। সুখরাম চট করে দুর্গন্ধময় খাঁজটায় ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে উঁকি মেরে ওর ঘরের সামনের দৃশ্যটা দেখতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যা দেখছে সেটা বাস্তব নয়—কোনও সিনেমার দৃশ্য। কিন্তু সেই সিনেমা দেখতে-দেখতে ওর বুকটা নিংড়ানো ভেজা গামছার মতো বারবার মুচড়ে উঠছিল। দম আটকে আসছিল। রাগ আর কান্না বুকের ভেতরে দাপাদাপি করছিল।

মা আর চোলি তা হলে পালাতে পারেনি!

সুখারামদের ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে নাইলনের দড়ি টাঙানো। বস্তির কয়েকঘর মানুষ ওই দড়িতে জামাকাপড় শুকোতে দেয়।

সেই জায়গাটায় বদনোয়াদের তিনটে মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে। সুখারামদের ঘরের দরজা তাক করে তিনটে বাইকের হেডলাইট জ্বালানো। ফলে জায়গাটায় বেশ আলো ছড়িয়ে আছে। বাইকগুলোর দুপাশে একরকম সার বেঁধে বদনোয়ারা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে। আলোর আওতার বাইরে থাকায় সুখারাম ওদের সিলুয়েট ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। আর হেডলাইটের আলোয় আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ওর স্পষ্ট নজরে পড়ছিল।

আরও নজরে পড়েছিল যে, ওদের ঘরের দরজাটা বন্ধ এবং সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুখারামের মা কান্না ভাঙা গলায় হাহাকার তুলে চিৎকার করছে।

মায়ের ওই ছোটখাটো রোগা শরীরে এত তীব্র চিৎকারের তেজ জমা থাকতে পারে তা সুখারাম স্বপ্নেও ভাবেনি। মা চিৎকার করছিল, কাঁদছিল, বদনোয়ার দলকে গালাগালিও দিচ্ছিল।

'দূর হ, হারামজাদার দল! সুখা কাউকে কিচ্ছু করেনি। ও খুব নেক আর সাচ্চা মানুষ। মদনোয়া অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। যা এখান থেকে। দূর হ! দরকার হয় থানায় যা! বলছি না, সুখা বাড়িতে নেই! ও কোনও মার্ডার করেনি। তোরা মার্ডারার—তোরা! যত্তসব ক্রিমিনালের হাড্ডি।'

মা চিৎকার করছিল। কিন্তু মায়ের চিৎকার ছাপিয়ে ওই পাঁচটা শয়তানের অন্তত দুজন তোড়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল। সেই গালিগালাজের মধ্যে সুখার মা-বাবা-ভাই-বোন কেউই রেহাই পাচ্ছিল না। ওর কোনও ভাই নেই। বাবা মারা গেছে সাড়ে চারবছর আগে। কিন্তু বদনোয়াদের তাতে কী!

সুখারামের ভেতরে আগুন জ্বলতে শুরু করল। ওর বাঁ-হাতটা থরথর করে কাঁপতে লাগল—যেন পিনাকেতে মহাদেব টংকার দেওয়ার পর তার তারে অনন্ত কাঁপন লেগেছে। কিন্তু ও কিছু করতে পারছিল না। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল।

সুখারাম যে কিছু করার কথা ভাবেনি, শুধু স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, তার কারণ, বদনোয়ার দল ওর দিকে পিছন ফিরে থাকলেও ও ওদের হাতের অন্তত দুটো অস্ত্র দেখতে পাচ্ছিল।

বদনোয়ার হাতের মুঠোয় ধরা একটা মোটা নলওয়ালা রিভলভার।

আর ওর এক শাগরেদের হাতে ঝোলানো দেড় হাত লম্বা একটা ঝকঝকে সোর্ড।

এই দুটো জিনিস সুখারামকে আটকে দিয়েছিল।

অস্ত্রধারী দুজনেই তাদের হাতের অস্ত্রগুলোকে বেপরোয়াভাবে নাচাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, এক্ষুনি সুখারামকে ওদের হাতে না তুলে দিলে ওরা 'নাকের বদলে নরুন' নিয়ে চলে যেতে পারে।

সুখারাম স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সেই 'নরুন' এখন ওদের বন্ধ দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া কবুতরের মতো কাঁপছে, বুক উঠছে, নামছে। পাগল-করা ছন্দে ধড়ফড় করছে।

বস্তির ভেতরে এত প্রবল চিৎকার, চেঁচামেচি—অথচ পাড়াপড়শিদের কোনও সাড়া নেই। সব ঘরেরই জানলা-দরজা বন্ধ। এখানে এত লোক গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, অথচ এখন সুখারাম, ওর মা আর চোলি একেবারে একা। হেডলাইটের জোরালো আলোয় সুখার মা হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছিল, তড়বড় করে লাফাচ্ছিল। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যতরকম ভাবভঙ্গি আর আস্ফালন করা সম্ভব সবই করছিল। সেটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ সুখার মনে হল, কোনও সিনেমার যেন শুটিং চলছে। সেখানে ওর মা স্পটলাইটের আলোয় শট দিচ্ছে। আর অন্ধকারের আড়ালে থেকে পরিচালক-সহ-পরিচালকের দলবল তাদর নির্দেশনামা শুনিয়ে চলেছে।

অসহায় সুখারাম কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। মা আর চোলিকে বাঁচাতে না পাবার কষ্টটা ওকে ধীরে-ধীরে অবশ করে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই শুটিং শুরু হল।

আওয়াজটা তেমন জোরে হয়নি, কিন্তু সুখারাম সেটাকে গুলির আওয়াজ বলে ভালোই চিনতে পারল।

চেনার আরও একটা কারণ, মায়ের প্রতিবাদের ফুলঝুরি আচমকা থমকে গেল, আর একইসঙ্গে ও দেখতে পেল মায়ের ময়লা শাড়ির বুকের কাছটা হঠাৎই লাল রঙে ভিজে উঠেছে, আর ওর মায়ের ছোট্টখাট্টো রোগা শরীরটা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সুখার ঝাপসা চোখের সামনে সেই পলকা তেজি শরীরটা পড়তেই লাগল। পড়তেই লাগল।

বদনোয়ার দল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'সালা, আমাদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া! গোটা ফ্যামিলিকে চুরচুর করে দেব!'

ওরা পাঁচজন বন্ধ দরজাটার দিকে এগোতে শুরু করল। অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। এ ওর দিকে তাকাচ্ছিল, বন্ধ দরজাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি করছিল।

সুখারাম এবার ওদের দেখতে পাচ্ছিল। চিনে নিতে পারছিল চেহারাগুলো। মনের মধ্যে সেগুলো গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

বদনোয়াকে ও চেনে। ভারী চৌকো, হিংস্র মুখ। কিন্তু বাকি চারটে মুখ ও নতুন দেখছে।

ওরা সবাই বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অনায়াসে সুখারামের মায়ের দেহটাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর খিস্তির পঞ্চব্যঞ্জন তারস্বরে উগরে দিয়ে ঘরের পলকা দরজাটা পিটতে শুরু করল।

ঘরের ভেতর থেকে এই প্রথম একটা ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। একটা কোণঠাসা মেয়ের চিৎকার।

চোলি।

সুখা এখন কী করবে? ছুটে যাবে ওই রিভলভার আর সোর্ডের মুখে? মায়ের মতো বেঘোরে প্রাণ দেবে?

তা হলে বদলা নেবে কে? ওপরওয়ালা?

না, সব কাজের দায়িত্ব ওপরওয়ালার ওপরে চাপাতে পারবে না সুখারাম।

এইসব ভাবছিল, থরথর করে ওর গোটা শরীর কাঁপছিল, ভয়ে মুখে কুলুপ আঁটা, কিন্তু দু-চোখ জল।

মা! মা রে! ওরা আসার আগে তোরা ঘর ছেড়ে পালাতে পারলি না? হা ভগবান!

সুখারামের মাথা ঘুরছিল, চোখে ঝাপসা দেখছিল। জীবনটা হঠাৎ করে কী থেকে কী হয়ে গেল!

অসহ্য টেনশানে মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হচ্ছিল। বদনোয়ার দলবলের দরজা পেটানোর আওয়াজ ওর কানে বোমার মতো ভয়ংকর এবং তীব্র শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি চোখে অন্ধকার নেমে আসবে, মাথার শিরাগুলো পটপট করে ছিঁড়ে যাবে।

এবং তাই হল।

ওদের ঘরের দরজাটা প্রথমে চিড় ধরে তারপর ভেঙে গেল। চোলির কানফাটানো আর্ত হাহাকার আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ভিজিয়ে দিল। আর সুখারামের চোখের সামনে একটা ভারী কালো পরদা নেমে এল।

ও আচমকা আবর্জনা, ইট, খোয়া আর রাবিশের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা শক্ত কিছুতে ওর মাথা ঠুকে গেল। নাকে এল জনতা-বাথরুমের ঝাঁজালো কটু গন্ধ।

তারপর সুখারাম নস্করের আর কিছুই মনে নেই।

•

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ও কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে। সেখান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা একঘেয়েভাবে নেমে আসছিল ওর মুখে, চোখে, শরীরে।

মাথায় অসহ্য ব্যথা, নাকে নোংরা গন্ধ।

হঠাৎই বমির ওয়াক বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ওর শরীরটা প্রবল দমকে ঝাঁকুনি খেল।

উঠে বসল সুখারাম। মাথার পিছনটা টনটন করছে। সেই অবস্থায় ওয়াক উঠল আরও কয়েকবার। শব্দ চাপা দিতে মুখে হাত উঠে গেল ওর।

একটু পরে হাত সরিয়ে হাঁ করে দু-চারবার শ্বাস নিল। তারপর ভালো করে চারপাশে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি সড়গড় করতে চাইল।

আরে! তিনটে বাইকের হেডলাইট তো এখনও জ্বলছে!

তা হলে বদনোয়া আর ওর দলবল গেল কোথায়?

উত্তর পেয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গেই।

সুখারাম দেখল, ওদের ঘরের ভাঙাচোরা দরজা দিয়ে শত্রুরা একে-একে বেরিয়ে আসছে।

প্রথমে বদনোয়া—আর ওর পিছনে-পিছনে বাকি চার শাগরেদ। হেডলাইটের আলোয় ওদের মুখগুলো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল।

মুখে অশ্লীল হাসি, তার সঙ্গে খিস্তিখেউড়, আর এলোমেলো পা ফেলে হাঁটা।

ঘরের ভেতর থেকে কোনওরকম চিৎকার-টিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না।

সুখারাম হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। যাতে শব্দ না হয় সেইজন্য দু-হাতের তালু চেপে ধরল মুখে। অসহায় বোবা মানুষের মতো গোঙাতে লাগল।

বসা অবস্থাতেই ও আরও অন্ধকার কোণে সরে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল সামনের একটা জোড়াতালি দেওয়া ঘরের দিকে।

ও কী করবে এখন? বাঁচবে? না মরবে?

আধো অন্ধকারের মধ্যেও ও দেখল সামনের ঘরটার একটা খুপরি জানলা অর্ধেকটা খুলে গেল। সেখানে উঁকি মারছে একজোড়া ভয় পাওয়া চোখ।

সুখারামের মনে হল, বস্তির অনেক ঘরের জানলা থেকেই হয়তো এরকম ভয় পাওয়া কৌতূহলী চোখ আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু সাহস করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। ওরা হয়তো বদনোয়ার গ্যাঙের এখনকার কীর্তিকলাপ অনেকটাই শুনেছে বা দেখেছে, কিন্তু আতঙ্ক ওদের সামনে আসতে দেয়নি, প্রতিবাদ করতে দেয়নি।

এমন সময় একটা ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল।

আড়াল থেকে উঁকি মারল। দেখল, বদনোয়ার রিভলভার শূন্যে উঁচিয়ে ধরা রয়েছে। আর ওর দুজন সঙ্গী খিস্তি দিয়ে সুখারাম এবং বস্তির লোকদের চেঁচিয়ে শাসাচ্ছে। একজনের হাতের সোর্ড শূন্যে আস্ফালন করে বৃষ্টির ফোঁটাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করছে।

ওরা চলে যাচ্ছে! চলে যাচ্ছে ওরা! যুদ্ধ জয় করে ওরা সিনা ফুলিয়ে চলে যাচ্ছে—পোড়া বস্তির দিকে, ওদের ঠেকের দিকে।

মোটরবাইকগুলো স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বাইকের হেডলাইটের আলো এলোমেলোভাবে নানান দেওয়াল আর গাছপালার ওপরে পড়ল। ফিরে যাবে বলে ওরা বাইকের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

কান্নার গোঙানি সুখারামকে চৌচির করে দিচ্ছিল। একটা অস্ত্র! একটা অস্ত্র যদি ও হাতে পেত তা হলে....।

ও পাগলের মতো আধখোলা জানলাটার ওপরে হামলে পড়ল।

বুঝতে পারল, জানলার চোখ দুটো একটা মেয়ের।

সুখারামকে হঠাৎ করে জানলার কাছে চলে আসতে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে জানলা থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সুখরাম কান্না মেশানো গলায় ডুকরে উঠল, 'বোন—যেয়ো না...।'

মেয়েটা থমকে গেল। ওর ঘরের ভেতরটা অন্ধকার থাকায় ওকে ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

'বোন...শোনো...প্লিজ...।' সুখারাম চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'শিগগির কিছু একটা আমাকে দাও....ছুরি-কাটারি-বঁটি...যা হোক। শয়তানের বাচচাগুলো আমার...আমার মা আর বোনকে...।' আর কোনও কথা বলতে পারল না—শুধু কাঁদতে লাগল।

দুবার ঢোক গিলে বলল আবার, 'প্লিজ...বোনটি আমার...।'

ছায়া-ছায়া মুখটা চট করে জানলার কাছ থেকে সরে গেল।

সুখারাম ভয় পেয়ে গেল। মেয়েটা গেল কোথায়? মোটরবাইকের আলো তো আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওর গায়ে এসে পড়বে!

ও একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে অন্ধকার জানলাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎই চোখ দুটো আবার দেখা গেল। জানলার কাঠের গরাদের ফাঁক দিয়ে 'ঠং' শব্দে কী একটা গলির রাবিশের ওপরে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে আধোআঁধারির মধ্যেও সুখারাম দেখতে পেল, কিছু একটা চকচক করছে।

জানলার চোখদুটো কয়েকপলক ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চাপা 'খট' শব্দ করে জানলার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

সুখারাম ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়াল। ওটাকে ব্যস্ত মুঠোয় ধরে একরকম ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে গেল নিজের আশ্রয়ে। দেওয়াল ঘেঁষে উবু হয়ে বসল।

আবর্জনা, বাথরুমের দুর্গন্ধ, ছেঁড়া-ফাটা পুরোনো টায়ার-টিউব।

বৃষ্টির মধ্যেই মুঠোটা চোখের কাছে নিয়ে এল।

প্রায় সাত-আট ইঞ্চি ফলার একটা জং ধরা ছুরি। তার কাঠের হাতলের বেশ খানিকটা ভাঙা।

সোর্ড এবং রিভলভারের সঙ্গে মোকাবিলায় এই ছুরি নিতান্তই একটা বিন্দু!

কিন্তু তা সত্বেও এই বিন্দু থেকেই একটা প্রতিঘাতের লড়াই শুরু করা যেতে পারে।

•

মোটরবাইকের আলোগুলো এগিয়ে আসছিল। তার ঠিক পিছনেই বসে আছে খতম স্কোয়াডের পাঁচজন সদস্য। ওদের দুজনের কাছে অস্ত্র রয়েছে। সেই দুজনকে নিয়েই সুখারামের বেশি দুশ্চিন্তা।

মায়ের কথা ভাবছিল সুখারাম। ভাবছিল চোলির কথা। এই দু:সময়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থেকেও ওর সুসময়ের কথা মনে পড়ছিল। অনেক অভাবের মধ্যেও মায়ের শাসন আর স্নেহ মাখানো দিনগুলো মনে পড়ছিল।

'সুখা, বৃষ্টিতে ভিজবি না। ঠান্ডা লাগলে জ্বর হবে, তারপরই ঝামেলা। ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও...সে-পয়সা কোথায়? যা, ঘর যা!'

'এই নে, সুখা, এই রসগোল্লাটা খা।' তারপর সুখারামের অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে: 'আজ তোর জন্মদিন রে পাগলা! তাই তিনটে রসগোল্লা কিনে এনেছি—আমাদের তিনজনের...।'

'দাদাভাই, দশটা টাকা দে তো—।'

'কেন রে?'

'খরচ করব—।'

'তার মানে? কীসে খরচ করবি?'

'কেন, সব কি তোকে বলতে হবে?'

'মা, শোন—চোলির কথা শোন—।

'ও ঠিকই তো বলেছে! ও বড় হয়েছে। ও নেলপালিশ কি কিরিম কিনবে সব তোকে বলতে হবে! শিগগির দশ টাকা দে! ও তোর ছোটবোন—তোর কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে?'

সুখারাম শুনতে পাচ্ছিল চোলির গলা : 'কী রে, দাদাভাই, বদলা নিবি না?'

চোলি বদলা চাইছে।

'ও তোর ছোটবোন—তোর কাছে চাইবে না তোর কার কাছে চাইবে?' মায়ের গলা।

সুখারামের ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল ঘরের দিকে, মায়ের দিকে, চোলির দিকে। ওরা কি এককণাও বেঁচে আছে? আছে?

থাক বা না থাক, সুখারামের খুব ইচ্ছে করছে ওদের কাছে যেতে। কিন্তু চোলি যে আবার আবদার করছে...কী যেন চাইছে...।

বাইকের আলোগুলো সুখারামের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ছুরিটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সুখারাম। হে ভগবান! একটা সুযোগ দাও। একটা সুযোগ! তা হলে বাকি কাজটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না—আমিই নিতে পারব। তাতে বাঁচি-মরি কোনও দু:খ নেই। কারণ, বেঁচে থাকার আর কোনও মানে নেই।

ওই দু-এক লহমার মধ্যেই নিয়তি একটা সুযোগ তৈরি করে দিল।

তিনটে মোটরবাইক ওকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একেবারে শেষের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইক চালাচ্ছিল যে-ছেলেটা সে একটা হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'বস, একবার লিক না করলে হবে না—তলপেট সালা বাস্ট করবে...।'

সামনের দুটো বাইক থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'সালা পেটে মাল পড়লেই জামিয়ার খালি এমার্জেন্সি হিসি পায়। যাকগে, আমরা ঠেকে যাচ্ছি, তুই লিক করে আয়। খাওয়াদাওয়া সেরে ওই হারামির বাচ্চাটাকে আবার পাত্তা করতে বেরোব...।'

পিছনের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার সামনের সিট থেকে শূন্যে পা ঘুরিয়ে নেমে পড়ল জামিয়া। তারপর সুখারামের অন্ধকার খুপরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বৃষ্টি আর আলো-আঁধারির মধ্যে ওকে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছিল না সুখা। শুধু বুঝতে পারছিল, জামিয়া লম্বা এবং ওর হাতে সোর্ডটা নেই।

জামিয়ার সঙ্গী বাইকের দুপাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ হয়নি, তাই ফটফট আওয়াজ হচ্ছিল, আর বাইকের হেডলাইটটা একবার উজ্জ্বল হচ্ছিল আর একবার মলিন হচ্ছিল।

না, ওই ছেলেটার কাছেও সোর্ডটা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওটা মনে হয় মাঝের বাইকের কারও কাছে আছে।

জামিয়া যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি পা ফেলছে। প্রকৃতির চাপ আর সইতে পারছে না।

হাতল ভাঙা ছুরিটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল। ওর আঙুলের হাড় ব্যথা করতে লাগল। আসুক জামিয়া—আরও কাছে আসুক। একজন-একজন করেই নিপাতের কর্মকাণ্ড শুরু হোক।

বাথরুম করার দুর্গন্ধ মাখা ছোট্ট এলাকাটায় ঢুকে পড়ার আগেই ব্যস্ত হাতে প্যান্টের 'জিপ' খুলে ফেলেছিল জামিয়া। তারপর ব্যস্তভাবে ঢুকে পড়েছে অন্ধকার খুপরিতে।

ভাঙাচোরা দেওয়াল আর ডাঁই করা আবর্জনার মধ্যে ঘাপটি মেরে কুঁকড়ে বসেছিল সুখারাম। নিয়তির অদ্ভুত খেলা দেখে ও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। গুহা থেকে বেরিয়ে ওকে আর দৌড়ে শিকার ধরতে হবে না। শিকার নিজেই চলে এসেছে গুহায়।

জামিয়া দু-পা ফাঁক করে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই সুখরামের ছুরি শঙ্খচুড়ের ঢঙে ওকে ছোবল মেরেছে। ছুরির জং ধরা ফলাটা জামিয়ার 'লেটার বক্স'-এর ভেতর দিয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে অন্ধকারে।

সজোরে আঘাত হেনেছে।

ছুরির ফলাটা কোনও বাধা পেল না দেখে সুখারাম খানিকটা আশ্চর্য হল। মনে হল, ও যেন একতাল মাখনের মধ্যে ছুরি চালিয়েছে।

জামিয়া যে-'ওঁক' শব্দটা করল সেটার ধরন অনেকটা মুরগির শেষ চিৎকারের কাছাকাছি। আর ওর দেহটা সামনে ভাঁজ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুখারামের গায়ের ওপরে।

কিন্তু সেসব তেমন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করার মতো অবস্থা সুখারামের ছিল না। কারণ, ওর ডানহাত তখনও একই কাজে ব্যস্ত ছিল। টিভিতে একঘেয়ে অ্যাকশন রিপ্লে দেখানোর মতো ও বারবার মাখনের তালে জং ধরা ছুরিটা বসিয়ে যাচ্ছিল। আর মনে-মনে বলছিল, 'মা-চোলি। মা-চোলি, মা-চোলি...।'

জামিয়ার চাপা আর্তনাদ ওর সঙ্গীর কানে পৌঁছয়নি। কারণ, আর্তনাদের তীব্রতা যথেষ্ট কম ছিল—আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাইক থেকে জামিয়ার দূরত্ব, বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং আশপাশের টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম।

কিন্তু জামিয়ার দেরি দেখে সে চেঁচিয়ে জামিয়ার নাম ধরে ডাকল। পরপর তিনবার। তাঁর মধ্যে শেষবারের ডাকটা যথেষ্ট অধৈর্য ভাব আর বিরক্তি মেশানো।

সুখারাম হাঁপাচ্ছিল। ওর বুকের ভেতরে ধকধক আওয়াজ হচ্ছিল। মনটা পাগলের মতো ছটফট করছিল। কিন্তু তাই বলে ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। নিশাচর চিতার মতো ও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল। ওর হাত, মুখ, বুক—সব ভিজে চটচটে হয়ে গিয়েছিল। এখন বৃষ্টির ফোঁটায় সেই চটচটে ভাবটা ধুয়ে যাচ্ছিল।

ও দেখল, বাইকে বসা ছেলেটা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল দুটো ধরল। অ্যাথলিটের ভঙ্গিতে পা ঘুরিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়ল। তারপর বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ও জামিয়ার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে সুখারামের আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আয়—এগিয়ে আয়। আরও কাছে আয়...।

সুখা মনে-মনে ওকে আর ভগবানকে ডাকতে লাগল।

ছেলেটা অকুস্থলের কাছাকাছি এসেই জামিয়াকে দেখতে পেল। নোংরা আর আবর্জনার মধ্যে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

ও জামিয়াকে কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। ওর গলার স্বর আলতো, স্তিমিত। তার মধ্যে অল্পস্বল্প সর্তকতা ঢুকে পড়েছে।

অন্ধকারে দম বন্ধ করে উবু হয়ে বসে রয়েছে সুখারাম। যেন একটা নিথর গোটানো স্প্রিং। যে-কোনও মুহূর্তে ছিটকে লাফিয়ে পড়বে শত্রুর ওপরে।

কিন্তু শত্রু আরও কাছে আসছে না কেন?

ছেলেটা আর-একটু কাছে এল। ঝুঁকে পড়ে হাত লম্বা করে জামিয়াকে ছুঁল। তারপর 'জামিয়া। আবে জামিয়া!' বলে ডাকল। ওর অসাড় শরীরটাকে কয়েকবার ঠেলা মারল।

ব্যস! তার পরই ও অনুসন্ধানী চোখে চারপাশে নজর চালাল। ওর চঞ্চল চোখ অন্ধকার খুপরির প্রতিটি আনাচকানাচ এক ঝলকে দেখে নিল।

আর তখনই দেখতে পেল কুঁকড়ে বসে থাকা শিকারি সুখারামকে।

দু-নম্বর জগতের অলিগলি ছেলেটার জানা। নানান ধরনের কাজিয়া, লড়াই, খুনোখুনির মধ্যে ও বড় হয়েছে। বদনোয়ার দলে থাকার মতো যোগ্যতা ওর যথেষ্ট আছে। তাই ও তক্ষুনি পরিস্থিতি আঁচ করে নিল। বুঝল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানোটাই এই মুহূর্তে সেরা স্ট্র্যাটেজি। তাই উলটোদিকে ছুট লাগাল।

ছেলেটা যেভাবে মোটরবাইকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল তাতে বোঝা গেল ও বাইক চালাতে জানে না।

চোখের পলকে গোটানো স্প্রিং-টা খুলে গেল। ছিটকে লাফিয়ে পড়ল গলির সিমেন্ট বাঁধানো জমির ওপরে। এবং ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে পালানো ছেলেটার পিছু নিল।

সুখারাম নস্করের খুব আনন্দ হচ্ছিল। কারণ, শত্রুকে এখন ও বাগে পেয়ে গেছে। ছেলেটা সুখার সঙ্গে রেসে নাম দিয়ে ফেলেছে। আর ওর ফেরার পথ নেই।

সুখারাম দৌড়চ্ছিল। খালি গা। হাফপ্যান্ট। আর পুরোনো রানিং শু।

বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় ছুটতে ওর খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। তবে ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ছিল। এই দৌড়টা জিততে হবে। জিততেই হবে!

বস্তির গলির ভাঁজগুলো পেরিয়েই বড় রাস্তা। রাস্তাটা গলির চেয়ে চওড়া বলেই এর নাম 'বড়' রাস্তা। কিন্তু আসলে ওল্ড সিটির অন্যান্য রাস্তার মতো এই রাস্তাটাও শতচূর্ণ।

রাস্তার শুরুর দিকটা সাপের মতো—আঁকাবাঁকা। তারপর খানিকটা অংশ সোজা—নাকবরাবর। সেই সোজা রাস্তায় এসে পড়তেই ছুটন্ত ছেলেটাকে দেখতে পেল সুখারাম। ওর সামনে—পঁচিশ কি তিরিশ মিটার দূরে—দৌড়চ্ছে।

সুখার ভেতরে তেজের ঝলকানি ঠিকরে বেরোল। ওর প্রতিটি স্নায়ুতে তেজস্ক্রিয় কণার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল। ট্র্যাক খারাপ হলেও ও মনের মতো করে দৌড়তে পারছিল। বেশ বুঝতে পারছিল। দুজনের মধ্যে দূরত্ব কমছে।

রাস্তার বাঁ-দিকে অবহেলায় পড়ে থাকা জমি। সেখানে ভাঙাচোরা বড়-বড় যন্ত্রপাতি, পুরোনো গাড়ি, দেওয়াল কিংবা ছাদ ভেঙে পড়া ঘর, আর গাছপালা তো আছেই! এ ছাড়া ডানদিকে ছোট-বড়-মাঝারি বিল্ডিং—আর তার লাগোয়া অসংখ্য ঝুপড়ি।

সুখারাম একমনে দৌড়চ্ছিল, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দও বেরোচ্ছিল না। শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দ আর হৃৎপিণ্ডের ধকধক শোনা যাচ্ছিল।

সামনের ছুটন্ত ছেলেটা কোনও আওয়াজ করেনি—শুধু প্রাণপণে ছুটছিল। একবার ও পিছনে তাকিয়ে সুখারামকে দেখেছিল—তারপর আর মুখ ফেরায়নি।

সাহায্যের জন্য কোনওরকম চিৎকারও করেনি ছেলেটা। কারণ, ও জানে চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। এত রাতে এই বৃষ্টিতে কেউই ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে না। অবশ্য বৃষ্টিহীন বিকেলবেলা হলেও কেউ আসত না। শুধু বিনিপয়সার মজা দেখত। এটাই ওল্ড সিটির দস্তুর।

সামনের ছুটন্ত ছেলেটা কী করে যেন বুঝতে পারল সুখারামের সঙ্গে ওর দূরত্বটা বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে। তাই ও ছুটতে-ছুটতেই ডানদিকে বাঁক নিল। হয়তো ভেবেছে ঝুপড়িগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার চেচামেচি করে সাহায্য চাইলে একটা হট্টগোল তো অন্তত হবে! তাতে যদি পিছন-পিছন ছুটে আসা কমবখত পাগলা কুত্তাটাকে রুখে দেওয়া যায়।

ছেলেটার ভাবনাটা ভাবনাই রয়ে গেল। কারণ, সেটা বাস্তবে অনুবাদ করার আগেই সুখারাম ওকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল এবং এক ধাক্কা দিল।

ছেলেটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। পড়ে কয়েক পাক গড়িয়ে চলে গেল রাস্তার ধারে মাটিতে।

সুখারাম ওর কাছে গিয়ে পড়তেই ছেলেটা শরীর বাঁকিয়ে সুখার পা চেপে ধরল। গোঙানির সুরে বলল, 'ছোড় দে, ভাইয়া, হমে ছোড় দে। ইয়ে সব বদনোয়াকা কাম হ্যায়। হাম কুছ নাহি কিয়া। আমি কিচ্ছু করিনি —বিশ্বাস কর...।'

ওপরদিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় ছেলেটার মুখে বৃষ্টির জল ঢুকে যাচ্ছিল—তাই ও বারবার ঢোক গিলছিল।

সুখারামকে প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল। বৃষ্টি ভেজা খালি গা। মাথার চুল কপালে লেপটে আছে। কাদা মাখা ভেজা হাফপ্যান্ট। আর ডানহাতের মুঠোয় হাতল ভাঙা জং ধরা ছুরি।

ছেলেটাকে এক ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দিল সুখা। তারপর ওর গায়ের ওপর 'ছপাৎ' শব্দে বসে পড়ল। ছুরি ধরা হাতটা শূন্যে উঁচিয়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ও হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল, 'বল, বাকি তিনটে হারামি কোথায় গেছে...।'

সুখারামের হাতের ছুরির চেহারাটা চটপট উত্তর পেতে সাহায্য করল।

'ওরা...ওরা পোড়া বস্তির ঠেকে গেছে—।'

ঘোড়ায় চড়ার মতো দুপাশে দু-পা রেখে ছেলেটার ওপরে সওয়ার হয়ে ছিল সুখা। চারপাশে ভিজে কাদা-মাটি। ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। অসহায়ের মতো ওপরদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

সেই অবস্থাতেই ও বলতে লাগল পোড়া বস্তির ঠেকটা ঠিক কোথায়। বাংলা হিন্দি মিশিয়ে গোঙানির সুরে কথা বলছিল ছেলেটা। আর তার ফাঁকে-ফাঁকেই বলছিল যে, ও নির্দোষ। সবকিছুর জন্য বদনোয়া দায়ী।

সুখরামের মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল, উথালপাথাল চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটার বলা জরুরি তথ্যগুলো ও স্মৃতিকোশে ঠিকঠাক গেঁথে নিতে পারছিল। ওর মনে হল, পোড়া বস্তির ঠেকটা ও অল্প-অল্প চিনতে পারছে। এই রাতের অন্ধকারে, এই বৃষ্টির মধ্যেও, সেটা চিনে নিতে ওর তেমন একটা অসুবিধে হবে না।

সুখরামের শরীরের নীচে ছেলেটা শান্তভাবে শুয়ে ছিল—শুধু বড়-বড় শ্বাস টানছিল। ওর চোখ সুখার হাতের ছুরিটার দিকে স্থির। ও বুঝতে পারছিল, ও বাঁচা-মরার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভয়ার্ত চোখে শুধু অপেক্ষা করছিল।

ওকে বারবার জেরা করে সুখারাম একসময় নিশ্চিন্ত হল যে, ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে। তখন ও বুঝল, ছেলেটাকে আর বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। একইসঙ্গে ওর মাথার ভেতরে চোলি আর মা যেন চিৎকার করে কিছু একটা করতে বলছিল।

কিছুক্ষণ ধরেই বৃষ্টিটা কমে আসছিল। এখন হঠাৎই থেমে গেল।

সুখারাম মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার দেখল। তারপর ছেলেটার দিকে।

এই ছেলেটা আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারত।

আচমকা ছুরিটা ওর গলার পাশে চেপে ধরল সুখা। ছেলেটা ভয়ার্ত জন্তুর মতো আওয়াজ করে উঠল।

সুখা হিংস্র গলায় বলল, 'হাঁ কর!'

ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। সুখার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

'হাঁ কর সালা। নইলে নলি ফাঁক করে দেব!'

ছেলেটা ধন্দে থাকলেও চটপট হাঁ করল এবার।

সুখা ছুরিটা ওর গলার পাশ থেকে সরিয়ে এনে গলার নলির ওপর চেপে ধরল।

ছেলেটা ভয়ে কঁকিয়ে উঠল।

ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল সুখারাম। ছেলেটা চুপ করে সিঁটিয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে সুখারাম এখন মানুষ নয়—কিলার রোবট। যে অকাতরে এক ছোবলে জামিয়াকে খতম করে দিয়েছে।

চোখের পলকে সুখারাম একটা কাণ্ড করে বসল। বাঁ-হাতে এক খাবলা কাদা-মাটি তুলে নিল। এবং সেটা থাবড়ে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটার হাঁ করা মুখে।

ছেলেটা হাত-পা ছুড়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল। সুখার হাত আঁকড়ে ধরল। ওর নখের আঁচড়ে সুখার হাত ছড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সুখা দ্বিতীয়বার মাটির খাবলা তুলে নিয়ে ছেলেটার মুখের ওপরে চাপড়ে দিয়েছে। আর একইসঙ্গে ছুরির কাঠের হাতলের ডগাটা হাতুড়ি পেটার মতো সজোরে বসিয়ে দিয়েছে শত্রুর বাঁ-রগে।

ছেলেটা এলিয়ে গেল। ওর ঝটাপটি স্তব্ধ হয়ে গেল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুখারাম ওর নাক টিপে ধরল। ছুরি ফেলে দিয়ে আর-এক খাবলা মাটি ঠেসে দিল ওর মুখে। ঝটকা দিয়ে একবার কেঁপে উঠল ছেলেটার দেহ। তারপর আর নড়ল না—মৃতদেহ হয়ে গেল।

সুখারাম টের পায়নি, কখন যেন ও কাঁদতে শুরু করেছিল। ওর গাল গড়িয়ে চোখের জল নামছিল। ও ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে শুরু করল। আর কান্না ভাঙা গলায় আর্ত হাহাকার করে

উঠল, 'মা! মা রে! চোলি! আমার চোলি...।'

বৃষ্টি ভেজা রাত ছাড়া আর কেউ সুখারাম নস্করের বুক ফাটা কান্না শুনতে পেল বলে মনে হল না। কিন্তু সুখারাম কেঁদেই চলল।

একসময় ও মৃতদেহটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছুরিটা হাতের মুঠোয়।

ওর মনে হল, প্রতিশোধের দুইয়ের পাঁচ অংশ শেষ হয়েছে—তিনের পাঁচ অংশ এখনও বাকি।

•

সুখারামের নিজের ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একটা জিন ঢুকে পড়েছিল ওর শরীরের ভেতরে। সে-ই যেন অন্তর থেকে নির্দেশ দিয়ে ওকে নানান কাজ করতে বলছিল, ওকে দিয়ে যা খুশি করাচ্ছিল।

সেই জিনের নির্দেশেই সুখারাম এখন দৌড়চ্ছিল। ছুরিটা হাফপ্যান্টের হিপ পকেটে গোঁজা। চোয়াল শক্ত। চোখে মরিয়া এক প্রতিজ্ঞা। ওর পায়ের প্রতিটি পেশি সেই প্রতিজ্ঞার শরিক হয়ে একমনে নিজেদের কাজ করে চলেছে।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় ওর ছুটন্ত পায়ের শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিধ্বনির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যেন আরও একজন সুখার সঙ্গে-সঙ্গে সমান তালে দৌড়চ্ছে।

সুখারামের মনে হল, সেটা বরাট স্যার।

এ-কথা মনে হতেই ওর শিরা-উপশিরায় নতুন তেজের স্রোত বয়ে গেল। ও আরও জোরে ছুটতে লাগল। ওর নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে শব্দ বেরোতে লাগল।

ছুটতে-ছুটতে সুখারাম খালধারের রাস্তায় চলে এল। আর একটু, আর একটু—তারপরই চলে আসবে পোড়া বস্তির এলাকা, তারপর বদনোয়াদের ঠেক। তারপর...

সুখারামের বুক লক্ষ্য করে বাতাস ছুটে আসছিল। বৃষ্টি ভেজা বাতাসে খাল থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধ।

খালের দিকে চোখ গেল ওর। কালো তেলচিটে জল। পাঁক আর যত রাজ্যের তরল আবর্জনায় অনেক ঘন আর ভারি হয়ে গেছে। রাস্তার কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো ছিটকে পড়েছে সেখানে। চকচক করছে। সুখারামের মনে হল, খালটা যেন একটা মোটা কালো অজগর—ধীরে-ধীরে এঁকেবেঁকে গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই শিকারকে ওটা গিলে নেবে।

ছুট, ছুট, ছুট।

পোড়া বস্তির এলাকায় ঢুকে পড়ল। এইবার বাঁ-দিকে, তারপর ডানদিকে পরপর দুবার।

ওই তো, সামনেই অন্ধকার বাতাবরণের মধ্যে একটা টিনের চালাঘর! মাপে বড়সড়। তবে তার দরজায় কোনও পাল্লা নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে। কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে হাসির শব্দ। ফুর্তির মজলিশ বসেছে। বদনোয়া আর তার খুচরো চামচামগুলী।

মরণাপন্ন অসহায় ছেলেটা যেমন-যেমন বলেছিল তার সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছে। আর তার ওপরে আগমার্কা সিলমোহর বসিয়ে দিয়েছে ঘরের বাইরে হেলিয়ে দাঁড় করানো দুটো বাইক।

পা টিপে-টিপে ঘরের কাছে এগিয়ে গেল। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। কোনও শব্দ নেই। শুধু ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা ওদের কথাবার্তা—আর সঙ্গে হিন্দি ঝিনচ্যাক গান। বোধহয় মোবাইলে বাজছে।

দরজার ফোকর দিয়ে উঁকি মারতেই কয়েকটা গ্লাস আর দুটো বোতল দেখতে পেল। সেইসঙ্গে কয়েকটা হাত-পা। কিন্তু কারও মুখ দেখতে পেল না।

বুকের ভেতরে নানান শব্দ টের পাচ্ছিল সুখারাম। একটা ঢিপঢিপ শব্দ। তার সঙ্গে চোলির গুঙিয়ে ওঠা কান্না আর মায়ের চিৎকার করা তেজি প্রতিবাদের বিনুনি।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বদনোয়ার গলা শোনা গেল।

'জামিয়া আর পিল্লের কী হল রে? ওরা কি আনচাক্কা খোপে আশনাইয়ে লটকে গেল?'

ওই ছেলেটার নাম তা হলে পিল্লে! ভাবল সুখারাম।

বদনোয়ার এক শাগরেদের গলা শোনা গেল : 'বারবার ফোন করছি—শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সালারা বিজি। যাকগে, যখন আসে আসবে। এসে দেখবে সব মাল খতম। তখন সালারা বোতল চাটবে।'

তারপরই খ্যা-খ্যা করে হাসি। আর কাচের গ্লাস কিংবা বোতলের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

ওরা কি কেউ ঘরের বাইরে আসবে না? যদি একজন-একজন করে শয়তানগুলো বাইরে আসে তা হলে খুব ভালো হয়। সুখারাম একে-একে ওদের মোকাবিলা করবে, একে-একে ওদের খতম করবে।

কিন্তু যদি না আসে?

দ্বিধা দ্বন্দ্বে কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই দরজায় এসে দাঁড়াল ওদের একজন। চোখের ওপরে হাতের আড়াল দিয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকাল ছেলেটা।

ওর রোগা চেহারা। চুলগুলো খাড়া-খাড়া। ডান হাতে তিনটে জ্যোতিষী আংটি। বাঁ-হাতটা কনুইয়ের কাছে ধনুকের মতো কিছুটা বাঁকা। চোখ ঢুলুঢুলু। চোখের নীচে ছোট-ছোট পাউচ।

দেখেই বোঝা যায়, ছেলেটা কমপক্ষে শতকরা আশি ভাগ মাতাল হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, 'নহী, বস—কোই নহী। না কোনও বাইক, না কোনও মানুষ!'

সুখারাম চালাঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। হিপ পকেটের ছুরিটা কখন যেন ওর হাতে উঠে এসেছে। বুকের ভেতরের বিচিত্র শব্দগুলো আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, আর একইসঙ্গে বিকৃত শোনাচ্ছে।

সুখার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। চোখের নজর ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ও মনের জোরে সেটাকে ঝাপসা হতে দিল না—ছেলেটার ওপরে ফোকাস করে রাখল।

বাইরের অন্ধকার সুখাকে সাহায্য করছিল, কিন্তু টিনের ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর কয়েকটা বর্শা অন্ধকারকে অল্পবিস্তর চিরে দিয়েছিল।

সুখা চেয়েছিল, ছেলেটার সামনে আচমকা গিয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে—কিন্তু বাস্তবে সেটা অল্পের জন্য হল না। ছেলেটার ছ'নম্বর ইন্দ্রিয় ওকে সাহায্য করল। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগের মুহূর্তে ছেলেটা সুখারামকে দেখতে পেয়ে গেল।

সুখারামের হাত তখন শূন্যে। বুকের মধ্যে লকলকে আগুন। ঠোঁট সরে গিয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতে ছুরিটা ধরা না থাকলে মনে হত, ও বোধহয় দাঁত দিয়েই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবে। দাঁতই ওর প্রাকৃতিক ধারালো অস্ত্র। ভ্যাম্পায়ারের মতো।

ছেলেটা অবাক হয়ে যাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠল : 'কওন হ্যায় বে তু?'

সুখারামের ছুরি ছেলেটার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ছেলেটাকে বুকে ছোবল মারল। একবার—দুবার—তিনবার।

সুখার ছুরি ধরা হাতের সঙ্গে বুকের সংঘর্ষের দাপটে ছেলেটা যেন স্লো মোশানে পিছনদিকে হেলে পড়তে লাগল। তারপর একসময় চিত হয়ে পড়ে গেল চালাঘরের মেঝেতে। ওর আঁকুপাঁকু হাতের ধাক্কায় একটা গ্লাস আর বোতল ছিটকে গেল। মদের গন্ধের ঝাপটা ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

ঘরের ভেতর থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। তারপরই হুড়মুড় করে খসে পড়া ছেলেটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল বদনোয়া আর ওর শাগরেদ।

সুখারাম দরজার বাইরে থেকে ওদের দেখতে পেল।

বুকে গাঁথা ছুরির বাঁটটা দেখেই বদনোয়া পলকে গল্পটা বুঝতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের রিভলভারটা খামচে ধরল ও। তারপর ওরা দুজনে দরজা লক্ষ্য করে পা ফেলতেই সুখারাম ছুটতে

শুরু করল। শুধু ছুট নয়—একেবারে হরিণের দৌড়। চালাঘরটার সঙ্গে ওর দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছিল।

সুখারাম বুঝতে পারছিল এখন কী হবে। বদনোয়া আর ওর শাগরেদ ছুটে এসে বাইকে উঠবে। বাইক স্টার্ট দিয়ে সুখারামকে ধাওয়া করবে। গুলি ছুড়বে। তারপর একসময়...।

ব্যাপারটা অনেকটা তাই হল।

দরজার কাছ থেকেই সুখারামের ছুটন্ত শরীরটা লক্ষ্য করে রিভলভার ফায়ার করল বদনোয়া। বোতলের কর্ক-ছিপি খোলার 'প্লপ' শব্দ হল। কিন্তু রাতের আড়ালে থাকা 'মুভিং টারগেট' সুখারাম নস্করকে সে-গুলি ছুঁতে পারল না।

বদনোয়া ছুটে গিয়ে বাইকে চড়ে বসল। বাইক স্টার্ট দিল। উৎকট শব্দ আর ধোঁয়ার ভলক। বাতাসে পোড়া গন্ধ। বাইকটা গুলতি থেকে ছোড়া গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল।

বদনোয়ার সঙ্গী এক ঝটকায় ঘরের ভেতরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। ওর হাতে এখন অস্ত্র। প্রায় দেড়হাত লম্বা একটা সোর্ড। বোঝা গেল, এই অস্ত্রটা ব্যবহারেই ও অভ্যস্ত এবং দক্ষ।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারে সোর্ডটা কীভাবে যেন আটকে দিল ছেলেটা। তারপর বাইক স্টার্ট দিয়ে দৌড়। ও বুঝতে পেরেছে কে এই আততায়ী। এই খ্যাপা কুত্তাটাকে নিকেশ না করে নিস্তার নেই। যেভাবেই হোক শুয়োরের বাচ্চাটাকে এখুনি খতম করতে হবে।

ভাঙাচোরা রাস্তা। যেখানে সেখানে খানাখন্দ। জল জমে আছে। আকাশে থমথমে মেঘ। কোথাও কালো, কোথাও লালচে, কোথাও বা গাঢ় ছাই রঙের। মেঘের স্তর ভেদ করে চাঁদ কিংবা তারা চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, যে-কোনও সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বদনোয়ার বাইক লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছিল। বাইকের হেডলাইট ওল্ড সিটির রাস্তায় সুখারামকে খুঁজছিল। কিন্তু ছুটন্ত কাউকে ও দেখতে পাচ্ছিল না।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। যে দু-একজনকে চোখে পড়ছে তারা নিশ্চয়ই সহজে-ভয়-পাওয়া ছাপোষা লোক নয়। কারণ, এত রাতে ওল্ড সিটির অলিগলি রাজপথে ছাপোষা লোকরা ঘুরে বেড়ায় না। যারা ঘুরে বেড়ায় তারা না-পোষা, বুনো, ভয়-দেখাতে-চাওয়া মানুষ।

বাইকের গর্জন এই নিশুতিতে খ্যাপা বাঘের গর্জনের মতো শোনাচ্ছিল। আর সেই গরজানো বাঘের পিঠে আরও একটা হিংস্র বাঘ বসে ছিল। বদনোয়া।

ওর রিভলভারটা প্যান্টের বাঁ-দিকের কোমরে গোঁজা। ওটা থেকে একটু আগে ফায়ার করা হয়েছে বলে এখনও গরম।

বেশ কিছুক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তায় ঘোরাঘুরির পর বদনোয়া একটা দেশি মদের ঠেকের কাছে বাইক থামাল।

তিনজন খদ্দের দোকানের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে বসে ছিল। তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আলুথালু, নিয়ন্ত্রণহীন। হাত-পা এদিক-সেদিক ছড়ানো, মাথা একপাশে হেলে আছে।

আর-একজনের অবস্থা তুলনায় অনেক উন্নত। হাতে বোতল এবং গ্লাস। সে মাঝে-মাঝে রোবটের ঢঙে বোতল থেকে গ্লাসে তরল ঢালছে এবং গ্লাসটা একদম ঠিকঠাক নিজের ঠোঁটে পৌঁছে দিচ্ছে।

তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বদনোয়া। কাঁধ ধরে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করল। তারপর হিন্দিতে সুখারামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ওর খোঁজ-খবর করতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা বদনোয়ার সব প্রশ্নের উত্তরেই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে লাগল।

একসময় বদনোয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডানপকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর লাগাল।

'ঝামসা, তু কঁহা হ্যায় রে?'

'তেজানি মোড়ে এসেছি, বস...।' ঝামসা জবাব দিল। ফোন বাজতেই ও বাইক থামিয়ে ফোন ধরেছিল। কিন্তু ওর চোখ চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক নড়ছিল। সুখারাম নস্কর নামে কুত্তাটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

'কোনও খবর পেলি?'

'না, বস। তবে এদিকটায় আসতে পারে। এখানে ছুপে যাওয়ার অনেক খোপ-খোপানি আছে। আমি ছানবিন করে রিপোর্ট দিচ্ছি—।'

বদনোয়া আপনমনে একটা খিস্তি দিল। ওর ভেতরে রাগ গরগর করছিল। এত বড় সাহস! বদলা নিতে বাঘের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে চাম্পুর বুকে ছুরি গেঁথে দেয়!

জামিয়া আর পিল্লের কথা ভেবে বদনোয়ার মনে কাঁটা খচখচ করে উঠল। ওরা এখনও ফিরল না কেন? এতক্ষণ ধরে একটাও ফোন করল না কেন? বদনোয়া আর ঝামসা যতবারই ফোন করেছে ওদের ফোন শুধু রিং হয়ে গেছে—কেউ ধরেনি।

'ঝামসা, শোন, তুই মালটাকে দেখতে পেলেই আমাকে ফোন লাগাবি। আমি ঝটসে স্পটে চলে যাব। তারপর দুজনে মিলে যা করার করব। তুই একা কোনও রিস্ক নিবি না, সমঝা? মালটা খতরনাক আছে—।'

ঝামসা হাসল—আত্মবিশ্বাসের হাসি। তারপর বলল, 'বেফিকর রহো, বস। সুখারামকে পেলে আমার দেড়-ফুটিয়া সোর্ড দিয়ে ওকে প্রথমে কিমা বানাব। তারপর তোমাকে তোফা দেব...।'

বদনোয়া হাসল না। আবেগহীন গলায় বলল, 'সে যা-ই কর—আমাকে ফোন করবি...।'

চাপদাড়িতে আঙুল ঘষতে-ঘষতে বদনোয়া বাইকের দিকে এগোল। একটা ঢেঁকুর তুলল। একঝলক মদের গন্ধ বেরিয়ে এল। এই গন্ধ ওর খুব চেনা হলেও এখন গন্ধটাকে একটু অচেনা মনে হল।

মনে হল, এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ মিশে আছে।

•

ঝামসা বাইক নিয়ে তেজানি মোড়ে ধীরে-ধীরে চক্কর কাটছিল। আর মনে-মনে হিসেব কষছিল, ও যদি সুখারাম হত তা হলে কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করত।

ঝামসা ঠান্ডা মাথার ছেলে—বদনোয়ার মতো রগচটা নয়। ও এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে সবই ঠান্ডা মাথায় করেছে। লড়াইয়ের সময় সোর্ডটা যখন ও হাতে নেয় তখন ওর মনে হয়, সোর্ডটা কোনও আলাদা অস্ত্র নয়—বরং ওর ডানহাতটা যেন কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় আরও দেড়-ফুট লম্বা হয়ে গেছে। যখন ঝামসা সোর্ড চালায়, তখন ওর মনে হয় ও হাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা ওর কাছে এতটাই সহজ আর স্বাভাবিক।

তেজানি মোড় থেকে দুটো চওড়া রাস্তা 'ওয়াই'-এর মতো দু-দিকে এগিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা রাস্তা চলে গেছে ট্রাক টার্মিনালের দিকে। কী মনে হওয়াতে ঝামসা সেই রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে দিল।

একটু এগোতেই রাস্তাটার চরিত্র পালটে গেল। ছেঁড়াখোড়া পিচের বদলে ইটের মাপের কালো পাথরের টুকরো শুরু হল। যেহেতু এ-রাস্তায় বেশিরভাগ সময় ভারী-ভারী ট্রাকের আনাগোনা, তাই এই ব্যবস্থা।

রাত দেড়টা বেজে গেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই। লাইটপোস্টের নিস্তেজ আলোয় ফাঁকা রাস্তাটা আরও বেশি ফাঁকা লাগছে।

ঝামসা বাইকের গতি কমাল। ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল।

রাস্তার ধারে নানান ধরনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটা খালি, কোনওটা ভরতি। লোড করা মালের ওপরে তেরপলের ছাউনি আর নাইলন-দড়ির বাঁধুনি। ট্রাকগুলোর ফাঁকফোকরে অন্ধকার।

চালাঘর থেকে বাইক নিয়ে রওনা হওয়ার পর থেকে সুখারামের খোঁজে ঝামসা এর মধ্যে অনেক এলাকাতেই ঘুরে বেড়িয়েছে। যেটা ওর জানা ছিল না, সুখারামও ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অথবা বদনোয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সুখারাম একসঙ্গে ওদের দুজনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায়নি। কারণ, তা হলে প্রতিশোধের দুইয়ের পাঁচ অংশ অপূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই সুখারাম একের পাঁচ অংশের ইনস্টলমেন্টে কাজটা শেষ করতে চাইছিল। তবে ইনস্টলমেন্ট হিসেবে বদনোয়া কিংবা ঝামসা নিয়ে ওর মধ্যে কোনও বাছবিচার ছিল না।

এ ছাড়া কিছুটা সময়ও সুখারাম হাতে চাইছিল—আর চাইছিল একটা অস্ত্র।

ঝামসা রাস্তা ধরে আরও এগোচ্ছিল। চোখে সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ও জানে, সুখারামের কাছে রিভলভার নেই। তাই চাম্পুকে ও দূর থেকে গুলি করেনি। ছুরি হাতে নিয়ে নিতান্ত দু:সাহসে বিপদসীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সেই ছুরিটাও গেঁথে আছে চাম্পুর বুকে। সুতরাং, ছেলেটার কাছে এখন কোনও অস্ত্র নেই।

এইসব অঙ্ক কষতে-কষতেই ঝামসা একটা ঘেরা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বারো ফুট উঁচু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল এলাকা। তার কোথাও-কোথাও জাল জং ধরে ছিঁড়ে গেছে। দরজা হয়তো এককালে ছিল—এখন সেখানে বিশ ফুট চওড়া হাঁ—কোনও পাল্লা নেই।

ঘোরা এলাকার একপ্রান্তে, অনেকটা দূরে, কয়েকটা ভাঙাচোরা ট্রাক দাঁড়িয়ে। তার পাশে টিনের চালে ছাওয়া কয়েকটা তালিমারা ঘর। ছিরিছাঁদহীন ঘরগুলো এ-ওর গায়ে হেলে আছে। কোনওটার চাল ভাঙা, কোনওটার বা দেওয়াল নেই।

ঘরগুলোর পাশে টিনের ড্রামের পাহাড়। তাদের তিনটে চূড়া দূর থেকেই চোখে পড়ছে।

ঝামসা ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জাল ঘেরা এলাকাটা দেখতে-দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই পিছন থেকে কে ওকে ডাকল।

'এই সালা, সুয়ার কা বাচ্চা!'

বাইক থামাল ঝামসা। শব্দ লক্ষ্য করে মাথা ঘোরাল।

সুখারাম নস্কর।

বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ সুখারাম একটু আগেই শুনতে পেয়েছে। তখনই ওর এলোমেলো খোঁজ শেষ হয়েছে। বুঝতে পেরেছে, ঘটনাচক্রে ওরা দুজন শত্রু কাছাকাছি চলে এসেছে।

এবার একের পাঁচ অংশের যুদ্ধ।

•

সুখারামের হাতে একটা ইট। আরও ভালো করে বলতে গেলে ইটের মাপের একটা পাথর। এটাই ওর অস্ত্র। পাথুরে রাস্তার পাশ থেকে ও কুড়িয়ে নিয়েছে।

ঝামসা সুখারামের ছায়া-ছায়া কালো চেহারাটা ভালো করে ঠাহর করে ওঠার আগেই সুখারাম হাতের ইটটা উঁচিয়ে ঝামসাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে।

ঝামসা বাইক থামালেও ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। সুখারাম কী করতে চলেছে আঁচ করে ও এক হ্যাঁচকায় বাইকটাকে সামনে এগিয়ে দিল, আর একইসঙ্গে মাথা নীচু করল। কারণ, ছুটন্ত অবস্থাতেই সুখা হাতের অস্ত্রটাকে ছুড়ে দিয়েছে।

ইটটা ঝামসার গায়ে লাগল না। লোহার জালে গিয়ে লাগল। তারপর পাথুরে জমিতে ছিটকে পড়ল। শব্দ করে দুবার লাফিয়ে তারপর থামল।

সুখারামের ভেতরে একটা অপার্থিব রাগ গরগর করছিল। ঝামসাকে যেমন করে হোক বাইক থেকে ফেলে দিতে পারলেই ওর অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যাবে। তারপর...।

সুখা ছুটতে শুরু করল। এখন কী করবে ও? কী করবে?

পিছনে বাইকের আওয়াজ পেল। ঝামসা তাড়া করে আসছে। কিন্তু সামনেই লোহার জালের দেওয়াল। ডানদিকে ঘুরে দৌড়তে পারলে বোধহয় ভালো হত। ওই ভাঙাচোরা ট্রাকগুলোর কাছে পৌঁছতে পারলে হয়তো কোনও অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যেত—লোহার কোনও রড বা গাড়ির পার্টস।

তাই ডানদিকে বাঁক নিল সুখারাম। আর তখনই দেখতে পেল ঝামসা দূরে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইকের ইঞ্জিন গরগর করছে।

ঝামসার কোনও তাড়া ছিল না। ও বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর জাল ঘেরা খাঁচায় বন্দি—তা সে-খাঁচা যতই বড় হোক না কেন। এই খাঁচা থেকে বেরোতে হলে ঝামসার বাইকের পাশ দিয়েই ওকে বেরোতে হবে।

ঝামসার ফোন বাজছিল। পকেট থেকে ফোন বের করে নম্বরটা দেখল ও।

বদনোয়া।

হাসল ঝামসা। ওর হাতে এখন খুব জরুরি কাজ। ওই হারামির পিল্লাটাকে কিমা বানাতে হবে। এখন কেউ ওকে ডিসটার্ব করুক ঝামসা চায় না।

বদনোয়ার কল কেটে দিয়ে মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করে দিল ঝামসা। আগে কাজ পরে ফোন।

সুতরাং, বাইকের কেরিয়ার থেকে সোর্ডটা ডান হাতে তুলে নিল। শরীর এবং হাত ঝুঁকিয়ে সোর্ডের ডগাটা মাটিতে ঠেকাল। তারপর বাইক ছুটিয়ে দিল সুখারামকে লক্ষ্য করে।

ঝামসার সোর্ডের ডগাটা পাথরে ঘষা খাচ্ছিল। ছুরিতে শান দেওয়ার সময় শানপাথর থেকে যেমন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়, ঝামসার সোর্ডের ডগা থেকে ঠিক সেরকম আগুনের ফোয়ারা ছিটকে বেরোচ্ছিল। আর শিকার ধরার আনন্দে ঝামসার চোখে-মুখে নৃশংস উল্লাসের জ্যোতি ধকধক করছিল।

সুখারাম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ওই তো, ঝামসার মোটরবাইক ওর দিকে ধেয়ে আসছে! তার পাশে-পাশে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে দিচ্ছে ঝামসার সোর্ড! এখন কী করবে সুখা?

বাইকটা যখন খুব কাছে এসে পড়েছে তখন সুখারাম জাল লক্ষ্য করে বনবেড়ালের মতো লাফ দিল। জালের তার আঁকড়ে ধরে টিকটিকির মতো ক্ষিপ্রতায় তরতর করে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল।

আর ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ঝামসার বাইক তারের জালে এসে ধাক্কা খেল। সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় ঝামসা বাইকসমেত ছিটকে পড়ল। নেহাত কপালজোরে বাইকের নীচে ওর পা চাপা পড়ল না।

ছিটকে পড়ে গেলেও সোর্ডের হাতল ঝামসার শক্ত মুঠোয় ধরা দিল। পাথুরে মেঝেতে শোওয়া অবস্থাতেই ও দেখতে পেল, সুখারাম জাল ছেড়ে লাফিয়ে পড়েছে নীচে। তারপর তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো ছুট লাগাল।

ঝামসার পাশ দিয়ে সুখা ছুটে পালানোর সময় পেশাদার খুনি ঝামসা শুয়ে-শুয়েই সোর্ড চালিয়ে দিল—যদি শুয়োরের বাচ্চাটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়।

না, পাওয়া গেল না।

তাই ঝামসা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাত হয়ে পড়ে থাকা বাইকটার পিছনের চাকা তখনও ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। সেটাকে টান মেরে তোলার জন্য হাতের সোর্ডটা আড়াআড়িভাবে দাঁতে কামড়ে ধরল। তারপর বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে তাতে সওয়ার হয়ে বসল।

স্টার্ট। গর্জন। ছুট।

সুখারাম তখন টিনের ড্রামের পাহাড়ের দিকে ছুটেছে। ওর শরীর ক্লান্ত, নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে শ্বাস বেরোচ্ছে, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু বুকের ভেতরের জ্বালা, রাগ, আর জেদ সবকিছু চাপা দিয়ে দিয়েছে।

তাই সুখারাম, লং ডিসট্যান্স রানার, দৌড়চ্ছে।

ঝামসার বাইক গোঁ-গোঁ করে ছুটে আসছিল। সোর্ডের ইস্পাতের ফলা পাথরে ঘষা খেয়ে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে চলেছে। অন্ধকারে সেটাকে ছুটন্ত তারাবাজি বলে মনে হচ্ছে।

সুখারাম ড্রামগুলোর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর পাগলের মতো একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

ড্রামগুলো সার বেঁধে শোয়ানো। একটা সারির ওপরে আর-একটা। তার ওপরে আবার একটা। সারিগুলো যত ওপরে উঠছে ততই একটা করে ড্রাম কমছে। সবমিলিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজের চেহারা নিয়েছে।

জায়গাটা তেলচিটে, পিছল। ড্রামগুলোও তাই। বোধহয় ওগুলো পোড়া মোবিল চালানের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জাল ঘেরা এলাকার বাইরে দুটো ল্যাম্পপোস্টে বালব জ্বলছে। সেই আলোর সামান্য ছটা নেহাতই দয়া করে ড্রামগুলোর আশেপাশে ছিটকে এসে পড়েছে। সেই আলোকে আঁকড়ে ধরে সুখারাম মাথা ঝুঁকিয়ে নজর চালাচ্ছিল।

কোথায় হাতিয়ার? কোথায়?

তাড়াহুড়োয় ইটের মাপের একটা কালচে পাথর খুঁজে পেল সুখা। কিন্তু ওটা হাতে তুলে নেওয়ার আগেই ঝামসার বাইক কাছে চলে এল।

সুখারাম বাইকের আওয়াজ পাচ্ছিল, চোখের কোণ দিয়ে আলোর ফুলকি দেখতে পাচ্ছিল, আর ছুটন্ত বাইকটাকে কীভাবে যেন অনুভবও করতে পারছিল।

ও চকিতে ড্রাম বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তিনটে ড্রামের জোটে একটা করে ছোট ত্রিভুজের মতো ফাঁক তৈরি হয়েছে। সেইসব খাঁজে থাবা আঁকড়ে, পায়ের পাতা ঢুকিয়ে ও সরীসৃপের মতো ওপরে উঠে গেল। আর ঝামসা ওকে লক্ষ্য করে সোর্ড চালাল।

সুখার পিঠে কেউ যেন আগুনের রেখা টেনে দিল। জ্বালা-পোড়া যন্ত্রণায় ওর পিঠের প্রতিটি পেশি কুঁকড়ে গেল। মুখ দিয়ে আহত জন্তুর গোঙানি বেরিয়ে এল। ঝামসার সোর্ড ওর নাগাল পেয়ে গেছে।

কিন্তু একইসঙ্গে ড্রামের পাহাড় নড়ে উঠল।

কারণ, সুখারামকে কিমা বানানোর নেশার ঘোরে ঝামসা এতই মাতাল ছিল যে, বাইকের সঙ্গে ড্রামের পাহাড়ের দূরত্ব যে বিপজ্জনকভাবে কমছে সেটা আর খেয়াল করেনি।

তাই ড্রামের স্তূপের সঙ্গে ওর ছুটন্ত বাইকের জোরালো সংঘর্ষ হল। বাইকের ধাক্কায় খালি ড্রামগুলোয় শুধু যে প্রচণ্ড শব্দ হল তা-ই নয়, তিনটে ড্রামকে সঙ্গে নিয়ে ঝামসার বাইক ড্রামের পাহাড়ের নীচে গুঁতিয়ে ঢুকে গেল। ফলে ওপরের ড্রামগুলো হুড়মুড় করে নীচে পড়তে লাগল। মেঘ ডাকার মতো গুড়গুড় শব্দ হতে লাগল।

একটা ড্রামের ঢাকনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঝামসার মুখ থেঁতলে গিয়েছিল। ওর কপালটা বাড়ি খেয়েছিল ড্রামের শক্ত গোল কানায়। ফলে ও যখন বাইক থেকে ছিটকে পড়ল তখন ওর কপাল ফেটে বীভৎসভাবে রক্ত পড়ছে। নাক-মুখ থেবড়ে গেছে। একটা দাঁত খসে গিয়ে মাড়ি থেকে কাঁচা রক্ত বেরোচ্ছে।

ঝামসা কোনও যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল না, কারণ সংঘর্ষের সঙ্গে-সঙ্গেই ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর মুখ-চোখ লাল রঙে মাখামাখি। ও চিত হয়ে তেলচিটে জমির ওপরে পড়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে দেড়ফুট সোর্ডটা তখনও ওর হাতের মুঠোয় ধরা।

সংঘর্ষের পর সুখারাম কাত হয়ে পড়তে-পড়তেও নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ওর হাতের থাবা সেরকম কিছু আঁকড়ে ধরতে পারেনি। তাই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনওরকমে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করতে-করতে ও নীচে খসে পড়ল। অল্পের জন্য ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া ড্রাম সরাসরি ওর মাথায় এসে লাগল না।

সুখারাম চিতপাত হয়ে পড়েছিল পাথুরে জমিতে। তারপর কিছুক্ষণ ওর আর কিছু মনে নেই।

একটু পরে চোখ যখন খুলল তখন ওর নজর গেল কালো আকাশের দিকে। আবার সেখানে মেঘ জমছে। তারারা একে-একে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

মাথার পিছনটা ব্যথা করছিল। দপদপ করছিল। একইসঙ্গে ডানহাতের ডানার কাছটায় ব্যথা। ডান পায়েও ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে। গায়ে ড্রামের তেল-কালি লেগে আছে।

ভগবানকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল সুখারাম, কারণ তিনি বেশিক্ষণের জন্য ওকে অজ্ঞান করে রাখেননি। সেটা হলে যে-কাজটা এখন ওর করার কথা সেই কাজটা বাকি থেকে যেত : আরও একের পাঁচ অংশের সেটলমেন্ট।

শুয়ে-শুয়েই পাশ ফিরে তাকাল।

ঝামসা পড়ে আছে—রঙিন ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি পুতুলের মতো। কপাল-মুখ সব রক্তে মাখামাখি। অস্ত্রটা হাতের মুঠোয় ধরা।

সুখারাম উঠে বসল। তখন বুঝল, ওর শরীরের ব্যথাগুলো গ্রাহ্য করার মতো বিরাট কিছু নয়। তার ওপর মা আর চোলির ডাক শুনতে পেল ও। একটা ধাতব টানেলের মধ্যে দিয়ে ওদের ফাঁপা চিৎকার প্রতিধ্বনি তৈরি করতে-করতে ছুটে আসছে।

সুখারাম উঠে দাঁড়াল। ভূতগ্রস্ত রোবটের মতো ঝামসার কাছে এগিয়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে দেড়ফুট সোর্ডটা ঝামসার অসাড় হাতের মুঠো থেকে এক হ্যাঁচকায় ছাড়িয়ে নিল। তারপর সোর্ডটাকে শূন্যে তুলে ঝামসার দেহটা নেই ভেবে ওটা সোজা গেঁথে দিল পাথরের জমিতে। একবার নয়—চার বার।

ঝামসা অজ্ঞান হয়ে ছিল বলে মরণ-ঝাটকা দিতে পারল না, কিন্তু সুখারাম বুঝল, একের পাঁচ অংশের সেটলমেন্ট হয়ে গেছে।

ঝামসার পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। ওটা একবার দেখে নিয়ে পকেটে ঢোকাল। এবার মোটরবাইকটা দরকার।

তাই হাতের সোর্ড মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাইকটার দিকে নজর চালাল সুখারাম। ড্রামের জটলার ভেতরে বাইকটা কাত হয়ে আটকে আছে। বাইকের ইঞ্জিন এখনও চাপা গর্জনে গরগর করছে।

একটা-একটা করে ড্রাম সরিয়ে বাইকের কাছে গেল। ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে পিঠের জ্বালাটা চারগুণ হয়ে গেল। কিন্তু সুখারাম সেটা ভ্রূক্ষেপ করল না। কারণ, বুকের জ্বালাটা এখনও এর শতগুণ।

অনেক কসরত করে বাইকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। এর আগে বারকয়েক ও বন্ধুবান্ধবের বাইক চালিয়েছে। সাইকেল চালানো দিয়ে ওর বালক-জীবন শুরু হয়েছিল। তারপর সময়ে-সময়ে বাইক চেখে দেখার সুযোগ হয়েছে। একসময় শখ করে পাঁউরুটি-বিস্কুটওয়ালাদের সাইকেল-ভ্যান দুষ্টুমি করে চালিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওপরওয়ালার দুষ্টুমিতে সেই সাইকেল-ভ্যান চালানোটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ আবার ও একটা গোটা মোটরবাইক হাতে পেয়েছে। এবার শুধু বদনোয়াকে হাতে পাওয়া বাকি।

সোর্ডটা বাইকের কেরিয়ারে আটকে দিয়ে বাইকে চড়ে বসল। তারপর কয়েক সেকেন্ড কী চিন্তা করে ঝামসার মোবাইলটা অন করে খুটুর-খাটুর করতে লাগল। বদনোয়ার ফোন-নম্বরটা ওর দরকার।

দু-চারবার বোতাম টিপতেই ফোন-নম্বরটা মোবাইল ফোনের পরদায় ভেসে উঠল।

সুখারামের রগের কাছে একটা শিরা দপদপ করছিল। রক্তের কণাগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। ওদের খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে।

'ডায়াল' বোতামটা টিপল সুখা। 'কলার টিউন'-এর ঝিনচ্যাক হিন্দি গান বেজে উঠল। গান দু-লাইন বাজতে না বাজতেই বদনোয়া ফোন ধরল।

'কেয়া রে? সালে কা কুছ পতা চলা?'

'হ্যাঁ, বস—।' মুখের কাছে কয়েকটা আঙুল রেখে একটু চাপা গলায় জবাব দিল সুখা। আঙুলের গরাদে ধাক্কা খেয়ে সুখারামের গলার স্বর খানিকটা বদলে গেল। তা ছাড়া গলা চেপে কথা বলায় বদনোয়া ওকে ঝামসা বলে ভুল করল।

'কাঁহা? কাঁহা হ্যায় উও গিদ্ধর কি আওলাদ?' বদনোয়ার গলা থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে।

'সালে কো জিন্দা লেকে আ রহা হুঁ—' জড়ানো চাপা গলায় বলল সুখা। কায়দা করে তার সঙ্গে একটু হাঁপানির হাঁসফাঁস জুড়ে দিল। তারপর : 'তুম কাঁহা হো, বস?'

'আমি টাওয়ার কোম্পানির গোডাউনের কাছে—খালধারে...।'

জায়গাটা সুখারামের চেনা।

পোড়া বস্তি থেকে খালধার বরাবর দেড় কি দু-কিলোমিটার উত্তরদিকে টাওয়ার নামে একটা বিয়ার কোম্পানির অফিস ছিল। তার পাশেই ছিল ওদের বিশাল গোডাউন।

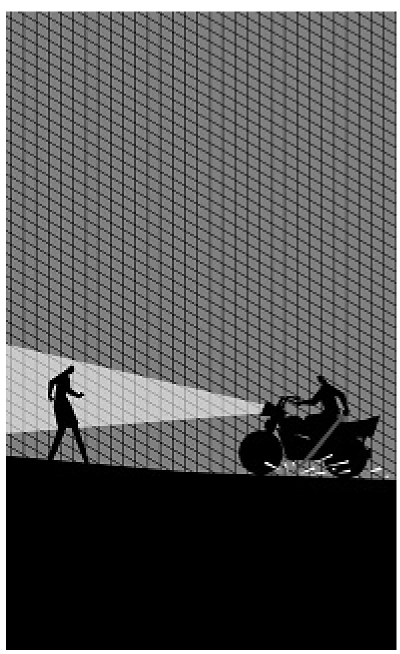
সবই 'ছিল', কারণ এখন আর কিছুই নেই। বছর দশেক আগে ওই গোডাউনে আগুন লাগে। সেই দাউদাউ আগুন সব গিলে ফেলেছিল। তারপর থেকে শুধু গোডাউনটার পোড়া কংকাল পড়ে আছে। শোনা যায়, গোডাউনের ওই কংকালের ভেতরে মানুষের কয়েকটা পোড়া কংকাল থাকলেও থাকতে পারে। রাতে ওটার পাশ দিয়ে গেলে নাকি এখনও আগুনে পোড়া মানুষের চিৎকার শোনা যায় আর মাংস পোড়া কটু গন্ধ পাওয়া যায়।

'ও. কে., বস—।' বলে ফোন কেটে দিল সুখারাম। বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল। বাইক ছুটতে শুরু করল।

সুখারামের বড় অদ্ভুত লাগছিল। মুখে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা, পিঠে জ্বালা, মাথায় আগুন, বুকে প্রতিশোধের বিষ, অথচ মনটা ঠান্ডা ইস্পাতের মতো শান্ত।

শরীরটা ক্লান্ত হলেও সুখারাম রোবটের মতো একগুঁয়েভাবে শরীরটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কোথায় তুই, বদনোয়া? কোথায়?



কয়েক মিনিটের মধ্যে খালধারের রাস্তায় এসে পড়ল। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বাইক লাফাতে-লাফাতে ছুটছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে, আকাশ জুড়ে টাওয়ার কোম্পানির পোড়া গোডাউনের কালো ছায়া। তার পাশে অনেক উঁচুতে টাওয়ার কোম্পানির লাল-নীল রঙের নিওন সাইন। এখনও সেটা জ্যান্ত—জ্বলছে-নিভছে। বোধহয় পোড়া গোডাউনের ডেডবডিটাকে পাহারা দিচ্ছে।

মোটরবাইকের হেডলাইটের আলোয় বদনোয়াকে দেখতে পেল। খালধারের ভাঙাচোরা রাস্তার একদিকে টাওয়ার কোম্পানির গোডাউন, আর অন্যদিকে মা-বোনের মহাঘাতক। বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

বাইকের গতি কমাতে লাগল সুখারাম। লক্ষ করল, বাইকটাকে দেখে বদনোয়া হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ডানহাতটা পকেটে ঢোকাল।

সুখারাম জানত বদনোয়া ঝামসার বাইকটা আগে চিনতে পারবে, তারপর—কয়েক সেকেন্ড পর—বুঝতে পারবে বাইকের ওপরে যে বসে আছে সে একা। এবং সে ঝামসা নয়—অন্য কেউ।

কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট। যে-কাজের জন্য ওই কয়েক সেকেন্ড যথেষ্ট সেই কাজটাই এখন শুরু করল সুখারাম।

আচমকা বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল। এক ঝটকায় বাইকটা গর্জন তুলে চিতাবাঘের গতি নিল। বদনোয়াকে লক্ষ্য করে পাগলের মতো ছুটে চলল।

বদনোয়া পকেট থেকে ওর রিভলভারটা বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরোপুরি বের করে ওঠার আগেই সুখারামের বাইক সরাসরি এসে ওর পেটে ধাক্কা মারল।

আত্মরক্ষার জন্য বদনোয়া বাঁ-হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষের অভিঘাতে ওর গোটা দেহটা সামনে ঝুঁকে পড়ল। সুখারামের মাথার সঙ্গে ওর মাথা ঠুকে গেল। যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল দুজনের মুখ থেকেই। কিন্তু শব্দগুলো এমন জড়িয়ে গেল যে, আলাদা করে চেনা গেল না।

সংঘর্ষের সময় স্থিতিজাড্য বদনোয়ার ওপরে কাজ করেছিল। তাই ডানহাতটা ও আর পকেটে ঢোকাতে পারেনি—রিভলভারটা পকেটেই থেকে গেছে। আর ওর ভারী শরীরটা শূন্যে তুলে নিয়েছে সুখারামের বাইক। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বদনোয়া বাইকের হাতল আঁকড়ে ধরেছিল। ওই অবস্থাতেই সুখার বাইক ওকে 'কোলে' করে ছুটে চলল।

মাথায়-মাথায় ঠুকে গিয়ে সুখারামের অসহ্য ব্যথা করছিল। মাথার ভেতরে পাগল করা দপদপানি। কিন্তু ওর হাত এক অমানুষিক জেদে অ্যাকসিলারেটর আঁকড়ে ধরে ছিল। গোঁ-গোঁ করতে-করতে বাইকটা ছুটে চলল খালের দিকে।

ইট-পাথরে ঠোকর খেয়ে বাইকটা লাফাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই দু-চাকাওলা গাড়িটা খালপাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

নামতে-নামতে নিয়ন্ত্রণহীন বাইকটা একটা তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের পাখির মতো শূন্যে ছিটকে গেল বদনোয়া আর সুখারাম। বাতাসে বৃত্তচাপ এঁকে ওদের শরীর দুটো খালের জলে গিয়ে পড়ল। কয়েক লহমার তফাতে দুটো 'ঝপাং শব্দ হল। খালের তেলচিটে কালো জল ওদের অজগর সাপের মতো গিলে ফেলল।

তেঁতুল গাছের গুঁড়ি আর একটা পাথরের ফাঁকে বাইকটা আটকে গিয়েছিল। বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ ক্ষয়ে আসছিল। হেডলাইটের আলোটাও মলিন হয়ে যাচ্ছিল। এদিক-ওদিক থেকে ছিটকে আসা ল্যাম্পপোস্টের আলো খালের জলে পড়ে চিকচিক করছিল। দুটো শরীর খালের জলে আলোড়ন তোলায় চিকচিক করা আলোর বিন্দুগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

একটু পরে সুখারামের কালো মাথাটা খালের জলের ওপরে ভেসে উঠল। ওর চোখ-মুখ-নাক জ্বালা করছে, নাকে আসছে কটু দুর্গন্ধ। চারপাশে নোংরা আবর্জনা আর পচা কচুরিপানা। জলের মধ্যে মিশে আছে

থকথকে পোড়া মোবিল আর কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। সুখারামরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে, এই খালের জলে কেউ ডুবে মারা যাবে না, মারা যাবে বিষাক্ত দূষণে। ব্যাপারটা যে আসলে ঠিক কী সেটা সুখা এখন আন্দাজ করতে পারল।

খালটা তেমন গভীর নয়। জলের নীচে সুখার পা পাঁকের মধ্যে বসে যাচ্ছিল। ও হাত দিয়ে চোখ-মুখের ওপর থেকে কালো চটচটে জল সরাল। তারপর এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে বদনোয়ার খোঁজ করতে লাগল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বদনোয়ার মাথা দেখা গেল জলের ওপরে।

প্রাণপণে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, বাতাস টানার জন্য হাঁকপাঁক করছে।

সুখারাম ওর মাথা নামিয়ে নিল, প্রায় নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল জলে। তারপর খালের ধার ঘেঁষে ছেয়ে থাকা কচুরিপানার ঝাঁকের দিকে সরে যেতে লাগল।

দুর্গন্ধে সুখারামের দম আটকে আসছিল। কিন্তু প্রতিশোধের আক্রোশ ওকে সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা জোগাচ্ছিল।

আকাশে মেঘ অনেক গাঢ় হয়েছিল। হঠাৎই ছোট-ছোট বিদ্যুতের টুকরো ঝলসে উঠল সেখানে। তার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চাপা গুড়গুড় আওয়াজ।

তখনই সুখারাম খেয়াল করল, বদনোয়ার ডানহাত উঁচিয়ে রয়েছে শূন্যে। সেই হাতের মুঠোয় ওর প্রিয় রিভলভার। ও এদিক-ওদিক নজর মেলে সুখারাম নস্করকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

জলে ভিজে যাওয়ার পর রিভলভার ঠিকঠাক কাজ করে কি না সুখা জানে না। তবে অনেক সিনেমায় ও নায়ককে জলের তলা থেকে গুলি ছুড়তে দেখেছে। তাই সাবধান থাকাটা দরকার।

কচুরিপানার ঝাঁককে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল সুখারাম। একইসঙ্গে গা গুলিয়ে ওঠা ভাবটাকে দমিয়ে রাখতে দাঁতে দাঁত চাপল। হালকাভাবে হাত চালিয়ে খালের পাড়ে পৌঁছল।

খালের পাড়ে প্রচুর পরিত্যক্ত জিনিস আর আবর্জনা। তারই মধ্যে একটা লম্বা গাছের ডাল খুঁজে পেয়ে গেল। ফুট পাঁচেক লম্বা, সামান্য আঁকাবাঁকা, শক্তপোক্ত আর ভারী।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ওটা আঁকড়ে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরে একধরনের আত্মবিশ্বাস আর শক্তি তৈরি হয়ে গেল। ডালটা ও নি:শব্দে জলের মধ্যে টেনে নিল। জলের ওপরে বিছিয়ে থাকা কচুরিপানার জালের তলায় ঢুকে পড়ল। মাথা সামান্য উঁচিয়ে কচুরিপানার ফাঁকফোকর দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাতে লাগল।

বদনোয়া সতর্কভাবে পাঁকের ভেতরে পা ফেলছিল আর এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছিল। কোথায় গেল হারামি কা অওলাদ?

সুখাকে খুঁজতে-খুঁজতে খালের কিনারার দিকে এগোচ্ছিল বদনোয়া। হঠাৎই কচুরিপানার জাল ঠেলে একটা ভূত মাথা তুলল। তার হাতে ধরা একটা আঁকাবাঁকা লাঠি। বদনোয়া রিভলভার চালানোর আগেই লাঠিটা নিষ্ঠুরভাবে ওর ব্রহ্মতালুতে এসে পড়ল। একবার—দুবার।

তারপরই আর-একটা আঘাত এসে আছড়ে পড়ল ডান চোয়ালে। এবং আবার।

কালো ভূতটা একের পর এক নিষ্ঠুর আঘাতে বদনোয়ার মুখ আর মাথা গুঁড়ো করতে লাগল। একইসঙ্গে খ্যাপা জানোয়ারের মতো অর্থহীন চিৎকার করতে লাগল।

একটু পরেই বদনোয়া খালের জলে তলিয়ে গেল। কালো গাঢ় জলে বুড়বুড়ি উঠল কিছুক্ষণ। তারপর সব শেষ।

লাঠিটা ফেলে দিয়ে খাল থেকে টলতে-টলতে উঠে এল সুখারাম। আবেগে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গায়ে কালো তেলচিটে আঠালো তরল আর কয়েকটা কচুরিপানা।

এলোমেলো পা ফেলে খালপাড়ের চড়াই বেয়ে ও কোনওরকমে উঠে এল রাস্তায়। মা, চোলি, তোরা দ্যাখ —আমার কাজ শেষ। খতমের খাতায় সবক'টা জানোয়ারের নাম তুলে দিয়েছি আমি।

রাস্তার ধারে টলে পড়ে গেল সুখারাম। সেই অবস্থাতেই মা আর চোলির সঙ্গে আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকাল সুখারাম। গায়ের জ্বালা-পোড়া কমাতে ও ভগবানের কাছে বৃষ্টি চাইল। একইসঙ্গে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুলিশের সাইরেন বাজানো টহলদারী জিপের জন্যও প্রার্থনা করল।

ভগবান ওর নীরব প্রার্থনায় সাড়া দিল।

প্রথমে বৃষ্টি এল।

তার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ।

•

নিউ সিটিতে সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। কারণ, সিন্ডিকেট কিল গেমের তারিখ ঘোষণা করেছে। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ, রবিবার।

সারা শহর জুড়ে জিশানের পাবলিসিটির হোর্ডিং। কোনও জায়গায় আবার জিশানের স্টিল ফটোগ্রাফের বদলে রঙিন ভিডিয়ো। সেইসব ভিডিওয়োতে জিশানের ট্রেনিং অথবা নানান গেমের রোমাঞ্চকর দৃশ্য : স্নেক লেকের দৌড়, কমব্যাট পার্কে কোমোডোর সঙ্গে লুকোচুরি, কিংবা জাব্বার সঙ্গে পিট ফাইট।

কিন্তু জিশানের সঙ্গে কিল গেমে লড়বে কারা? কোন তিনজন খুনিকে বেছে নেওয়া হবে জিশানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে?

না, সেটা এখনও জানায়নি সুপারগেমস কর্পোরেশন। তার বদলে ওরা টিভির দর্শকদের নিয়ে একটা কনটেস্ট শুরু করে দিয়েছে। সেন্ট্রাল জেলের বারোজন খুনের আসামিকে ওরা বেছে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ফেরোসিটি কোশেন্ট আটের ওপরে। টিভিতে সেই বারোজনের ক্রিমিনাল রেকর্ডস দেখানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে তাদের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আর অন্যান্য রেকর্ড।

এইসব দেখে বিচার করে দর্শকদের বলতে হবে, কিল গেমের জন্য এদের কোন তিনজনকে বেছে নেবে সুপারগেমস কর্পোরেশন। যদি কোনও দর্শক তিন জনের নাম ঠিকঠাক বলে দিতে পারে তা হলে সে পাবে সেরা পুরস্কার—পঁচিশ লক্ষ টাকা। তার নীচেই রয়েছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার। পনেরো এবং দশ লক্ষ টাকা। বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ীর সংখ্যা বেশি হলে পুরস্কারের টাকা তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।

দর্শকরা এই কনটেস্টে ফোন করে অথবা ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভির মাধ্যমে অংশ নিতে পারে।

এই প্রোগ্রাম চলার সময় দেখানো হচ্ছে প্রচুর বিজ্ঞাপন। তার মধ্যে কোনও-কোনও বিজ্ঞাপন জিশানকে নিয়ে। ফলে সেপ্টেম্বরের দু-তারিখকে নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে। আর দিন-কে-দিন দর্শকের সংখ্যা হাইপারবোলিক ফাংশানের ঢঙে বেড়ে চলেছে।

নিউ সিটির বড়-বড় রাস্তায় বিশাল মাপের অসংখ্য ডিজাইনার হোর্ডিং। তাতে শুধু লেখা : 'সেপ্টেম্বর দুই। কে জিতবে?'

শহরের নানান জায়গায় কিল গেমের গিফট আইটেমের স্টল বসেছে। সেখান থেকে সুপারগেমস কর্পোরেশনের এজেন্টরা গেম সিটির মডেল বিক্রি করছে, বিভিন্ন কম্পিটিশনে জিশান যেসব পোশাক পরেছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে, জিশানের লড়াইয়ের নানা ভঙ্গির মডেল বিক্রি হচ্ছে, কম্পিটিশনের বিভিন্ন মুহূর্তের ফটোগ্রাফ বিক্রি হচ্ছে, জিশান আর জাব্বার পিট ফাইটের ফাইবার পলিমারের মডেল বিক্রি হচ্ছে।

সারা শহর জুড়ে এককথায় টগবগে হইচই।

এসব দেখে ওল্ড সিটির সুপ্রাচীন জমকালো সময়ের দুর্গাপুজোর কথা মনে পড়ে যায়। সেই পুজোর পাঁচদিনের আনন্দকে একদিনে জড়ো করেও এই উল্লাসের তীব্রতা বোঝানো যাবে না।

জিশান গুনাজির সঙ্গে শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর শহরের প্রাণস্পন্দনটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করছিল। ও বুঝতে পারছিল, নিউ সিটিতে জন্মের উৎসবের চেয়ে মৃত্যুর উৎসব অনেক বড়।

কিল গেমের দিন যত কাছে আসছে জিশানের ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর তীব্রতা তত বাড়ছিল। এখন ওর একার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিম : অ্যানালগ জিম আর ডিজিটাল জিম। এই জিমে জিশান একা-একা প্র্যাকটিস করে। নানা ধরনের লড়াইয়ের অনেক কলাকৌশল এখন ওর আয়ত্তে। তার সঙ্গে রয়েছে মডার্ন আর্মামেন্ট ট্রেনিং-এর সাপোর্ট।

ঘাম-ঝরা শরীর নিয়ে জিমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জিশান। গায়ের রং আরও তামাটে হয়েছে। শরীরের সমস্ত পেশি উৎকটভাবে মাথাচাড়া দিয়ে আছে। সবমিলিয়ে ওকে দেখাচ্ছে দুর্গাপুজোর অসুরের মতো—পেশিসর্বস্ব একটা দানব।

অ্যানালগ জিমে জিশান ভ্যারিয়েবল ফোর্স নিয়ে ওয়ার্কআউট করে। আর ডিজিটাল জিমে ওর শরীরচর্চা ইমপ্যাক্ট ফোর্স নিয়ে। সেখানে আচমকা ঘুসি ছুড়ে দেওয়ার জন্য রয়েছে বক্সিং মেশিন। এই মেশিন থেকে দস্তানা পরা ধাতুর হাত আচমকা ছুটে আসে। শরীরের সঙ্গে এই যান্ত্রিক ঘুসির সংঘর্ষ হলেই সংঘর্ষের তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব ডিজিটাল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। তা ছাড়া চট করে কীভাবে ঘুসি এড়ানো যায় সেই কৌশলও শেখা যায় এই যন্ত্র থেকে।

জিশানের জিম দুটোর দেওয়াল মানেই আয়না। আর ঘরে সাজানো রয়েছে আধুনিক সব মেশিন। সবক'টা মেশনিই মিটারে-মিটারে ছয়লাপ।

জিশান রোজ এই দুটো জিমে যন্ত্রের সঙ্গে 'লড়াই' করে নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতার মান বিচার করে। একসময় ও শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে জিম থেকে বেরোয়। তারপর স্নান, খাওয়া আর বিশ্রাম।

রোজ বিকেলে গুনাজির গাড়ি করে বেরোয় জিশান। তারপর ইচ্ছেমতো সময় কাটিয়ে ঠিক রাত ন'টায় ও ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবে সুধাসুন্দরীর কাছে ফিরে আসে। ওর কন্ট্রোলড ফ্রিডম রিচার্জ করার জন্য। তখন ওর দেখা হয়ে যায় রোগা, লম্বা, ফরসা মেয়েটার সঙ্গে। যে-মেয়েটা উদ্ধত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। এবং শুধু বিজ্ঞানের চাকর—আর কারও নয়।

আজ ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় জিশানের মনে হল, সুধাসুন্দরীকে যে-প্রশ্নটা ও প্রথম দিন ম্যাজিক শট নেওয়ার সময় করেছিল সে-প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা হয়নি। সুধাকে যখনই ও প্রশ্নটা করেছে তখনই ও কোনও-না-কোনওভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে। আজ জিশানের মনে হল, অপেক্ষা অনেক হয়েছে—আর নয়। আজ জিশান জেদ ধরবে, বাচ্চা ছেলের মতো বায়না করবে।

ল্যাবে কাজকর্ম ঠিকমতোই এগোল। সুধা জিশানের শরীরের ভেতরে ঢোকানো সিলভার ক্যাপসুলটাকে রিমোট অপারেশানে রিচার্জ করে দিল। তারপর, যখন ল্যাব থেকে বেরিয়ে আসার পালা, তখন জিশান ওকে আলতো গলায় বলল, 'সুধা, প্রথম দিন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি বলেছিলে ''কাল বলব।'' কাল-কাল করে তো দু-সপ্তাহ কেটে গেল। সত্যি করে আমাকে বলো দেখি, তুমি কি উত্তরটা বলতে চাও—নাকি চাও না?'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুধা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ—বলতে চাই...।'

'তা হলে বলো। সেকেন্ড সেপ্টেম্বর আসতে আর মাত্র চব্বিশ দিন বাকি। আর...তার পর যদি বলতে চাও তা হলে...তা হলে আমার হয়তো...হয়তো আর শোনা হবে না।'

সুধাসুন্দরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জিশানের দিকে। ওর বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, জিশান যেন একটা খোলা বই—আর মেয়েটা সেই খোলা বইটা অনায়াসে পড়ে নিচ্ছে।

কয়েকসেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল সুধা। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। নীচু গলায় বলল, 'জিশান, তুমি কাল বিকেলে একবার আমার ল্যাবে আসতে পারবে? এই ধরো পাঁচটা নাগাদ?'

জিশান ঘাড় নাড়ল : 'হ্যাঁ, পারব—'

'তা হলে মনে করে এসো। পাঁচটা। তখন তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। সেকেন্ড সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তোমাকে আমি অপেক্ষা করাতে চাই না।' শেষ দিকে সুধাসুন্দরীর গলা ধরে এল। ও মুখ নামিয়ে নিল। আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের কোণ মুছে দিল।

'আমি কি তোমাকে হার্ট করলাম?' জিশান ইতস্তত করে জানতে চাইল।

'না, না—।' মাথা নেড়ে মেয়ে বলল, 'কাল এসো। পাঁচটা—। ও, ভালো কথা, তুমি আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দাও। রিমোট অপারেশানস ল্যাবের কাছে এসে আমাকে ফোন কোরো—আমি একমিনিটের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে আসব...।'

কথা শেষ করে ফোন-নম্বর বলল সুধা।

জিশান পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে সুধার নম্বরটা উচ্চারণ করল। নম্বর মেমোরিতে ট্রান্সফার হয়ে গেল।

সুধাসুন্দরীর ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল জিশান।

•

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে চারপাশে তাকাচ্ছিল জিশান। ঘরে বাড়তি কোনও আসবাব নেই, সাজসজ্জার বাড়তি কোনও উপকরণ নেই। এই ড্রয়িংরুমটার সঙ্গে 'ছিমছাম' শব্দটা বেশ মানানসই হয়। ঘরের মধ্যে রুম ফ্রেশনারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

জিশানের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিল সুধা। ওর হাতেও কফির কাপ। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছে।

'এই বাড়িটায় আমি থাকি। আমার যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে আছে। যদি নতুন কোনও কিছুর দরকার হয় মার্শাল স্যারকে একবার ফোন করে জানালেই হল—দ্য রিকোয়েস্ট উইল বি অনারড উইদিন আ হুইফ।

'এই ঘরটা ড্রয়িংরুম। এর পাশেই আছে আমার লাইব্রেরি কাম স্টাডি। এ ছাড়া ভেতরদিকে একটা বড় ঘর আছে—সেটা বেডরুম। কফিটা শেষ করে নাও—পরে তোমাকে গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি...।'

জিশান ওর কথা শুনছিল আর মনে-মনে একটু অবাক হচ্ছিল।

একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল জিশান। তার জন্য ওকে নিজের ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে এল কেন সুধা?

অবাক হলেও চুপ করে রইল জিশান। ওর মনে হল, সুধা ওকে যা-যা বলতে চায় বলুক। আজ জিশান শুধু শুনবে—কিছু বলবে না।

গুনাজির গাড়ি করে ঠিক পাঁচটার সময় রিমোট অপারেশানস ল্যাবে পৌঁছেছিল জিশান। তারপর সুধাসুন্দরীকে ফোন করে সেটা জানান দিতেই একমিনিটের মধ্যে ও এসে হাজির।

'তোমার গাড়ি ছেড়ে দাও। তুমি আমার গাড়িতে যাবে।'

সুধা কথাটা এমনভাবে বলল যে, সেটা অনুরোধের বদলে দাবির মতো শোনাল।

জিশান একটু ইতস্তত করছিল। তাই দেখে সুধা বলল, 'আমি তোমাকে ঠিক রাত ন'টার সময়ে আমার ল্যাবে নিয়ে আসব—তোমার ক্যাপসুল রিচার্জের জন্যে। তারপর তুমি তোমার গাড়িতে যেয়ো...।'

গুনাজিকে সেরকমভাবেই বলে দিল জিশান। রিমোট অপারেশানস ল্যাবের পার্কিং লটে গাড়ি রেখে গুনাজি জিশানের জন্য অপেক্ষা করবে।

তারপর সুধা ওর গাড়িতে গিয়ে বসল। জিশান ওর পাশে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর জিশান শুধু একবার জিগ্যেস করেছিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তোমার প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে—।' জিশানের দিকে তাকিয়ে হেসেছে সুধা।

পনেরো কি কুড়ি মিনিট চলার পর গাড়ি এসে থেমেছে একটা একতলা বাড়ির সামনে।

জিশান নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল। চওড়া রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে সাদা রঙের একতলা বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির মাথায় ডিশ অ্যানটেনা। বাড়িগুলোর স্টাইল খুব আধুনিক। বাড়ির সামনে আর পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। বাগান বলতে সবুজ লন, আর লনের কিনারায় ফুলগাছের সারি।

সুধা জানাল, এটা সায়েন্টিস্টদের ক্লাস্টার। নিউ সিটির সব সায়েন্টিস্ট এই এলাকাতেই থাকেন। নিউ সিটিতে কোনও সায়েন্টিস্টের নিজস্ব বাড়ি থাকলেও তাঁর এখানে থাকাটা জরুরি। এটাই নিয়ম।

জিশানের বাবার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, নিজেদের বাড়ির কথা।

সুধা বলল, 'আমার সেসব প্রবলেম নেই, কারণ, আমার এই একটাই থাকার জায়গা—।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ড্রয়িংরুম—যেখানে বসে এখন ওরা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

জিশান সুধাসুন্দরীকে দেখছিল।

কালো রঙের একটা সালোয়ার। তার সঙ্গে নীল, কালো আর সাদার নকশাকাটা একটা কামিজ। ফরসা বলে ওকে বেশ মানিয়েছে। তবে সবচেয়ে সুন্দর ওর বড় মাপের চোখ। ওগুলো এমন গভীর আর বুদ্ধিদীপ্ত যে, মনে হচ্ছে চোখ থেকে এক অদ্ভুত আলো ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ছে।

শর্মি নামের একটি মেয়েকে ডাকল সুধা। মেয়েটির বয়েস আঠেরো কি কুড়ি। শ্যামলা রং। রোগা, স্মার্ট।

ওকে কফি করতে বলল।

'শর্মি আমার কম্বাইন্ড হ্যান্ড। খুব চটপটে—অনেক কাজ করে। তার মধ্যে একটা হল রান্নাবান্না।'

কফি খাওয়া শেষ হলে সুধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। আমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট এই পোড়া নিউ সিটিতে কেন পড়ে আছে। তুমি শোনার জন্যে রেডি তো?'

জিশান কফির কাপ নামিয়ে রাখল সামনের টেবিলে। সুধার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, রেডি...।'

'আমি ইউ. এস. এ.-তে ছিলাম। নর্থ ক্যারোলাইনাতে। সেখানে স্টেট বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে চাকরি করতাম। "এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট" পোস্টে। আমি বেসিক্যালি একজন ডক্টর এবং পরে বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করেছি। তোমাকে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্টের কথা আগে বলেছি। সে ছাড়া আমার বাইশ-তেইশটা রিসার্চ পাবলিকেশান আছে—সবই ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে। আমার রিসার্চের এরিয়া হল, প্রোটিন, আর-এন-এ, ডি-এন-এ আর পলিফসফেট—এদের সিনথিসিস, স্ট্রাকচার এসব স্টাডি করা আমার কাজ।

'মা ছাড়া আমার ফ্যামিলিতে আর কেউ নেই। তাই নর্থ ক্যারোলাইনাতে আমি মা-কে নিয়েই থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাবল শুরু হল আমার একটা ডিসকাভারি নিয়ে। আমি চারবছর ধরে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের ওপরে গবেষণা করছিলাম। ব্যাপারটা জেরান্টোলজি ওরিয়েন্টেড...।'

'জেরান্টোলজি মানে?' জানতে চাইল জিশান।

'জেরান্টোলজি মানে জরাবিজ্ঞান। মানে, আমাদের যে বয়েস বাড়ে সেই ব্যাপার রিলেটেড সায়েন্স।...যাই হোক, জেরান্টোলজি বরাবরই আমার রিসার্চের সেকেন্ডারি ফোকাস। তো রিসার্চ করতে-করতে আমি এমন একটা কম্পাউন্ড আবিষ্কার করলাম যেটা কয়েকটা অ্যানিম্যালের এজিং প্রসেস স্লো করে দেয়। অর্থাৎ, তাদের বয়েস ধীরে-ধীরে বাড়বে।

'ব্যাপারটা খুব এক্সাইটিং বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া, যদি সত্যি-সত্যি এরকম একটা কেমিক্যালের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে সেটার ফরমুলা আর তৈরি করার সায়েন্টিফিক প্রসেস হাতে পাওয়ার জন্যে সারা পৃথিবী ছটফট করবে। ইন্টারন্যাশনাল কেয়স তৈরি হবে। কেজিবি, সিআইএ, র'—সমস্তরকম ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মাঠে নেমে পড়বে।

'সেইজন্যে রিসার্চের ভাইটাল ব্যাপারগুলো আমি কাউকে জানাইনি। নিজের কাছেই গোপন রেখেছিলাম। তবে ল্যাবের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে আমার নানান টেস্টিং আর এক্সপেরিমেন্টের কাজ চলছিল। কিন্তু এসব টেস্টের ঠিক কোন-কোন রেজাল্ট আমার কাছে জরুরি সেটা আমি কাউকে জানাইনি। জেরান্টোলজি রিলেটেড অবজারভেশানের কাজগুলো আমি একা-একাই করতাম।

'আমি ল্যাবে ইঁদুর, গিনিপিগ, বেড়াল আর কুকুরের ওপরে কেমিক্যালটা টেস্ট করেছি। তাতে অল্পবিস্তর পজিটিভ রেজাল্টও পেয়েছি। কেমিক্যালটা মানুষের ওপরে অ্যাপ্লাই করা তখনও বাকি। তা ছাড়া এজিং প্রসেস স্লো হওয়ার রেটটা ছিল বড্ড কম। আমি রিসার্চ করে সেই রেটটা বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আর কীভাবে কেমিক্যালটা নিয়ে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশানে যাওয়া যায় সে-কথা ভাবছিলাম...।'

'এরকম একটা সময়ে কীভাবে যেন রিসার্চ সেন্টারের কয়েকজন আমার রিসার্চের আসল ব্যাপারটা জেনে গেল। কয়েকজন আমাকে অভিনন্দন জানানোয় আমি বলেছি যে, এখনও অভিনন্দন জানানোর মতো কিছু আমি করে উঠতে পারিনি। প্রাণিদের এজিং প্রসেসের মিস্ট্রি নিয়ে আমি এখনও এক্সপ্লোর করে চলেছি এবং এখনও আমি অন্ধকারে। কিন্তু তাদের সবাই যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি সেটা তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

'এর মাসখানেক পর আমার কাছে একটা ফোন আসে। যে-লোকটা ফোন করেছিল তার গলাটা একটু ফ্যাঁসফেসে, জড়ানো। আমি ফোন ধরতেই শুনলাম...'

'ডক্টর সুধাসুন্দরী স্পিকিং?' ইংরিজিতে কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে 'সুধাসুন্দরী' শব্দটা লোকটাকে কয়েকটা হোঁচট খাইয়ে দিল।

'ইয়েস—।' সুধা জবাব দিল।

'কনগ্র্যাচুলেশানস। তোমার চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা আমরা জানতে পেরেছি। এতে সন্দেহ নেই, মানবজাতির অনেক কল্যাণ হবে—।'

সুধা অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'আপনি কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন?'

'এগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন, ম্যাডাম। আমি একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি। তোমার আবিষ্কারের জন্যে সারা পৃথিবী তোমাকে অভিনন্দন জানাবে, আশীর্বাদ করবে।'

'সেরকম কোনও আবিষ্কার তো আমি করিনি! আমি তো ছোট-ছোট কয়েকটা রুটিনমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি...।'

'আমরা সব জানি। তুমি আমাকে ভুল বোঝাতে পারবে না, ম্যাডাম। আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর আছে...।'

'আপনি আমাকে ফোন করেছেন কেন? কী দরকারে?'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে হাসল লোকটা : 'এখনও বুঝতে পারোনি? তোমার আবিষ্কারের সব কাগজপত্রের ফাইলটা আমাদের চাই। কারণ, আমরা মনে করি, এই আবিষ্কারটার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে থাকা দরকার। পৃথিবীর পক্ষে এই আবিষ্কারটা নিশ্চয়ই খুব উপকারী—তবে আমাদের মনে হয়, এই মুহূর্তে এই আবিষ্কারটার কথা জানাজানি হলে বিপদ হবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই লড়াই থেকে ব্যাপারটা হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোবে। আর সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ—যেটা পরমাণু-যুদ্ধ হবে বলেই আমাদের ধারণা—যদি হয় তা হলে মানবজাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।' একটু থামল লোকটা। তারপর : 'সুতরাং, ম্যাডাম, বুঝতেই পারছ, তোমার এই আবিষ্কারটা অত্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে থাকা দরকার...।'

সুধাসুন্দরীর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ হচ্ছিল। ভয়ডর ওর বরাবরই কম—কিন্তু, তা সত্বেও ওর একটু-একটু ভয় করছিল।

এই যে লোকটা ওকে ফোন করেছে, সে সুধার আবিষ্কারের ঠিক কতটুকু জানে? লোকটা আন্দাজে ব্লাফ দিচ্ছে না তো!

লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে সুধা বলল, 'আপনি আমার কোন আবিষ্কারের কথা বলছেন বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—।'

লোকটা হাসল—সবজান্তার ব্যঙ্গের হাসি। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'মানুষকে দীর্ঘায়ু করার আবিষ্কার। আমাদের শরীরে বার্ধক্য যে-গতিতে প্রভাব ফেলে, সেই গতি কমিয়ে দেওয়ার আবিষ্কার। তুমি আমাদের হোমওয়ার্কে কোনও ফাঁক পাবে না, ম্যাডাম।'

সুধাসুন্দরীর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। ও পাগলের মতো এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু পাচ্ছিল না।

লোকটা ধীরে-ধীরে বলল, 'আমি পরশুদিন তোমাকে আবার ফোন করব, ম্যাডাম। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

সুধা হঠাৎই সাহস জুগিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'আমি যা-ই আবিষ্কার করে থাকি না কেন, সেটা যাকে-তাকে দেওয়ার জন্যে নয়।'

'একদম ঠিক বলেছ, ম্যাডাম। কিন্তু তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে : হয় তুমি ওটা নিজে থেকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, নয় তো ওটা আমরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব। আর সেই কাড়াকাড়ির সময় অল্পবিস্তর কোল্যাটারাল ড্যামেজ হতে পারে—।'

'কোল্যাটারাল ড্যামেজ মানে?'

'তোমার মায়ের কথা ভুলে গেলে, ম্যাডাম?' হাসল লোকটা।

সুধাসুন্দরী পাথর হয়ে গেল। ওর মাথা আর কাজ করছিল না।

'উই উইল বি ওয়াচিং য়ু, ম্যাডাম। ওয়ান রং মুভ অ্যান্ড য়ু আর ডান অ্যালং উইথ ইয়োর মাম।'

লোকটা ফোন ছেড়ে দিল।

•

শরীরের ভেতরে বয়ে চলা একটা ঠান্ডা স্রোত টের পাচ্ছিল সুধা। আর তার সঙ্গে অদ্ভুত এক চিনচিন যন্ত্রণা।

মা! মায়ের কথা বলল লোকটা! আজকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী সুধাসুন্দরী যা কিছু, তার সবটাই ওর মায়ের জন্য। ওকে ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলার জন্য ওর মায়ের চেষ্টা আর পরিশ্রম এক কথায় উদাহরণ। সেই মায়ের ক্ষতি করবে ওরা! কোল্যাটারাল ড্যামেজ!

সুধা উদভ্রান্তের মতো হয়ে গেল। এই হুমকিটা ফাঁকা আওয়াজ, না কি সত্যি? লোকটার কথা বলার ঠান্ডা সুর সুধার মনে প্রতিধ্বনি তুলছিল। ওর মন বলছিল, কথাকে কাজে পালটে দিতে এই ধরনের লোকের কোনও সময় লাগে না।

ফোনটা এসেছিল রাত আটটা নাগাদ। তার পর থেকে সুধাসুন্দরীর মনের স্বস্তি উধাও হয়ে গেল। ওর উসখুস অস্থির ভাব দেখে মা বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে? তখন থেকে ওরকম ছটফট করছিস কেন?'

উত্তরে সুধা বলেছে, 'না, কিচ্ছু হয়নি—।'

রোজ ল্যাব থেকে বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ সময়টাই সুধা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আজ ও পড়াশোনাতেও মন বসাতে পারছিল না। একটা কাঁটা কোথায় যেন খচখচ করছিল।

ভয়ে-ভয়ে দিন কাটতে লাগল সুধার। মা-কে ও একা বেরোতে বারণ করে দিল। বলে দিল, সুধার ফোন ছাড়া অন্য কারও ফোন যেন মা কখনও না ধরে, সুধা ছাড়া আর কাউকে যেন কক্ষনো দরজা না খোলে।

এসব কথায় মা ভয় পেয়ে গেলেন। বারবার জিগ্যেস করলেন, এত সাবধান হওয়া কীসের জন্য।

উত্তরে সুধা শুধু বলল, 'আমাদের হয়তো এ-দেশ ছাড়তে হবে, মা।'

ও মনে-মনে বুঝতে পারছিল, শত্রু যারাই হোক, তার হুট করে কিছু করবে না। সুধার কাগজপত্রগুলো ওরা হাতে পাবে, নাকি পাবে না—সে-ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হয়ে ওরা চরম ব্যবস্থা নেবে না।

ল্যাবে সুধা একটা অদ্ভুত কাজ করল। ওর জেরান্টোলজি রিসার্চের যত কাগজপত্র ছিল সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কেমিস্ট্রির একটা করে ভুল সমীকরণ লিখল। তাও আবার পৃষ্ঠার নানান জায়গায়। তারপর সেই পাতাগুলো ওর অন্যান্য রাফ কাগজের পৃষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। ঠিক যেন তাস শাফল করে মেশাচ্ছে।

সবমিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এক 'পাহাড়' তৈরি হল। এর মধ্যে থেকে আসল কাগজগুলো একমাত্র সুধাসুন্দরীই খুঁজে বের করতে পারবে। ওই ভুল সমীকরণই ওর 'সংকেত'।

কাগজের স্তূপটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ল্যাবের মধ্যে নানান জায়গায় রেখে দিল।

মনে-মনে বেশ শান্তি পেল সুধা। এই ল্যাবে হানা দিয়ে কারও পক্ষে 'আসল' কাগজগুলো খুঁজে পাওয়া বোধহয় আর সম্ভব নয়।

এর চারদিন পরেই একটা ঘটনা ঘটল।

দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন বিকেলবেলা কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে পায়ে হেঁটেই ও রাস্তায় বেরিয়েছিল।

রাস্তায় লোকজন বেশি ছিল না। বয়স্ক দু-চারজন মহিলা কি পুরুষ চোখে পড়ছিল। দুজন মানুষকে চোখে পড়ল পোষা কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন।

রাস্তাটা ফাঁকা হলেও এখান দিয়ে ভালোরকমই গাড়ি যাতায়াত করে। থেকে-থেকে ছুটন্ত গাড়ি সুধাসুন্দরীর নজরে পড়ছিল।

সামনে একটা বাঁক ঘুরতেই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা মেয়ে পড়ে আছে। গায়ে লাল আর কালো রঙের সুন্দর ছাঁদের পোশাক।

সুধাকে দেখেই মেয়েটা 'হেলপ! হেলপ!' বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সুধা রাস্তার যেদিক ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, মেয়েটা পড়ে আছে তার উলটোদিকে। তাই সাবধানে রাস্তা পার হয়ে ওপারে পৌঁছল। তারপর অসহায়ভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে এগোল।

সুধা কাছে যেতেই মেয়েটি যন্ত্রণা মেশানো গলায় বলল যে, একটা গাড়ি ওকে ধাক্কা মেরে পালিয়েছে। ওর হাঁটু আর গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা। নিজে-নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সুধা যদি, প্লিজ, ওকে একটু হেলপ করে তা হলে ভালো হয়।

সুধা আর দেরি করল না। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে দুজন তরুণ এসে হাজির হল। সুধাকে এবং পড়ে থাকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'হোয়াটস দ্য ম্যাটার? হোয়াট হ্যাপেনড?'

সুধা সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। মেয়েটিও 'উ: ! আ:' করতে-করতে সাহায্য চাইল।

তক্ষুনি ছেলে দুটো কাজে নেমে পড়ল। আহত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রাস্তার পাশের ঘাসজমিতে শুইয়ে দিল। তারপর সুধাকে বলল, 'মিস, তুমি তোমার কাজে যাও—আমরা ওর মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের বন্দোবস্ত করছি—।'

আহত মেয়েটি সুধাকে দুবার 'থ্যাংকস' জানাল। সুধা সৌজন্যের দু-একটা কথা বলে রাস্তা পার হতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা ছাই রঙের পিক-আপ ট্রাক কোথা থেকে যেন দৈত্যের মতো ছুটে এল সুধার দিকে। ট্রাকটাকে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়তে দেখে সুধা হকচকিয়ে গেল। পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হল। ঠান্ডা ঘামের ফোঁটা আচমকা ওর কপাল, মুখ গলা ভিজিয়ে দিল। ও পাগলের মতো লাফ দিল একপাশে। ওর হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

ট্রাকটা ওকে চাপা দেওয়ার জন্য ছুটে গেল। তারপর চাপা দিতে-দিতে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁক নিয়ে ওর পড়ে থাকা শরীরটার গা ঘেঁষে ছুটে পালাল। চাকার মোচড়ের মিহি শব্দ ছিটকে উঠল বাতাসে। আর সুধাসুন্দরী রাস্তায় পড়ে দরদর করে ঘামতে লাগল। ওর আচ্ছন্ন চোখের সামনে রাস্তা, ঘর-বাড়ি, গাছপালা সব বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সেই অবস্থাতেই শরীরটাকে গড়িয়ে-গড়িয়ে রাস্তার কিনারায় নিয়ে এল। কোনওরকমে উঠে বসল। হাতে, কনুইয়ে আর হাঁটুতে ব্যথা। দু-জায়গায় ছড়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে ও বাড়ি ফিরতে পারবে তো? মোবাইল ফোনটা কোথায় গেল? এই রাস্তাটা যে এত দুর্ঘটনাপ্রবণ সেটা সুধা জানত না।

এমন সময় ওর চোখ পড়ল সেই দুটি ছেলে আর আহত মেয়েটির দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে ও তাজ্জব হয়ে গেল।

ওরা তিনজনেই সুধার দিকে তাকিয়ে হাসছে, বিদায়ের ইশারা করে হাত নাড়ছে।

সুধা হতবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই একটা সাদা রঙের স্পোর্টস কার ওদের পাশে এসে ব্রেক কষল। ওরা তিনজনে চটপট গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়িটা সাঁ করে উধাও হয়ে গেল।

টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে তিনজন পথচারী ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ওর মোবাইল ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল : 'তোমার মোবাইল ফোন, মিস। রাস্তার ওইখানটায় পড়ে ছিল...।'

সুধা চেতনাহীন রোবটের ঢঙে মোবাইল ফোনটা নিল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন?'

বাড়ি ফেরার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সুধাসুন্দরীর নার্ভাস ভাবটা গেল না। আজ যদি ওর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যেত তা হলে ওর মায়ের কী হত!

রাতে ওর মোবাইলে যে-ফোনটা এল তাতে ঠিক এই প্রশ্নটাই করল লোকটা। এই লোকটাই প্রথম ওকে ফোন করে জেরান্টোলজির বিষয় নিয়ে ওকে শাসিয়েছিল।

'যদি আজ তোমার কিছু একটা হয়ে যেত, ম্যাডাম, তা হলে তোমার মায়ের কী হত সেটা ভেবে দেখেছ। বয়স্ক মানুষ। এ-পৃথিবীতে একা-একা কী করে থাকতেন? হয়তো...হয়তো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত...।' কথা আর শেষ করেনি লোকটা।

সুধা ভয় পেলেও মনে-মনে সাহস তৈরি করছিল। ও বেশ বুঝতে পারছিল, ওকে মেরে এই লোকগুলোর কোনও লাভ নেই। তাতে ওরা যা চায় সেটা কোনওদিনও ওরা আর হাতে পাবে না। ওরা শুধু সুধাসুন্দরীকে নিয়মিত ভয় দেখাবে। ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে রিসার্চের কাগজপত্রগুলো আদায় করবে।

ও ঠান্ডা জেদি গলায় বলল, 'আমি ভয় পাইনি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

লোকটা হাসল : 'ভয় পাবে না মানে! ভয় তো তোমাকে পেতেই হবে। কেন, ম্যাডাম, কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা ভুলে গেলে? ওই পিক আপ ট্রাকটা আজ ইচ্ছে করলে তোমাকে পিষে দিতে পারত—কিন্তু দেয়নি। কারণ, এটা আমাদের একটা ওয়ার্নিং।

'এবার মনে করো, তোমার বদলে তোমার মা আমাদের টার্গেট হয়ে গেলেন। তারপর টার্গেট থেকে ভিকটিম। ভিকটিম থেকে মর্গ। তারপর মর্গ থেকে পোস্টমর্টেম....।' খুকখুক হাসি দিয়ে লোকটা কথা শেষ করল।

কেন জানি না, সুধাসুন্দরীর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। ও কেঁদে ফেলল। মা-কে ছেড়ে থাকার কথা ও কখনও ভেবে দেখেনি। কারণ, এটা ও কখনও ভাবতেই পারবে না।

ওর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পেল লোকটা। অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো অপরাধী গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, ম্যাডাম। আমি তোমার চোখে জল এনেছি। আসলে একটা কথা তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে চাই। তুমি, প্লিজ, এটা বোঝার চেষ্টা করো। তোমার জেরান্টোলজির রিসার্চ যতই ভ্যালুয়েবল হোক, তোমার মায়ের চেয়ে নিশ্চয়ই ভ্যালুয়েবল নয়। এই সিম্পল ট্রুথটা তুমি, ম্যাডাম, বোঝার চেষ্টা করো। গুড নাইট—।'

সুধা চুপ করে থেকেছিল। কোনও জবাব দিতে পারেনি। ওর চোখে তখনও জল। লোকটার শেষ কথাটা ওর কানে বাজছিল। লোকটা খুব সত্যি কথা বলেছে। সুধার জেরান্টোলজির গবেষণা ওর মায়ের চেয়ে অবশ্যই ভ্যালুয়েবল নয়।

এই কথাটা ওকে ভাবিয়ে তুলল বটে, কিন্তু গবেষণার জরুরি কাগজপত্রগুলো সরাসরি ওই লোকগুলোর হাতে তুলে দিতে ওর মন চাইল না।

সুধা ওর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে অন্তরের ঝড় তোলা টানাপোড়েনে প্রতিটি মুহূর্তে কষ্ট পেতে লাগল।

ও বেশ বুঝতে পারছিল, ল্যাবে যে-মনোযোগে ও সাধারণত কাজ করে, সেই মনোযোগে চিড় ধরছিল।

টেলিফোনের লোকটা কিন্তু ধৈর্য হারায়নি। সে পাঁচ-ছ'-দিন পরপরই সুধাকে ফোন করে। ঠান্ডা মাথায়, ঠান্ডা গলায়, সুধাসুন্দরীকে বশ করার চেষ্টা করে। সুধার কোনও কথাতেই সে রাগ করে না, উত্তেজিত হয় না। শুধু রোজ কথা শেষ করার আগে সুধাকে কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এইভাবে কাজ করতে সুধার ভালো লাগছিল না। ও বেশ বুঝতে পারছিল, ইনস্টিটিউট-এ ডেডিকেটেড রিসার্চার হিসেবে ওর যে আকাশ-চুমু-খাওয়া খ্যাতি, সেই খ্যাতিতে একটু-আধটু চিড় ধরছিল।

টেলিফোনে ভদ্র ভাষায় হুমকি দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও থানা-পুলিশ করতে পারেনি। কারণ, তার সঙ্গে ওর জেরান্টোলজির গবেষণার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। এই গবেষণা নিয়ে ও এখনই ঢাক পেটাতে চায় না।

রিসার্চ সেন্টারে ওর যারা কাছের লোক তারা শুধু লক্ষ করল যে, সুধাসুন্দরী আগের তুলনায় অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে। যে-মেয়েটা কথা বলতে ভালোবাসত সে আর কথা বলতে তেমন ভালোবাসে না।

আসলে একটা দমচাপা উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সুধার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া, ও এখানকার পাট গুটিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবে কি না, সেই চিন্তাটাও মাঝে-মধ্যেই ওর মাথায় খোঁচা মারছিল। সেইজন্য কখনও-কখনও ল্যাবের ওর কাজে ভুল হয়ে যেত, অনেক কথা ঠিক-ঠিক সময়ে মনে পড়ত না।

একদিন সন্ধেবেলা রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুধা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকল।

'ফোর স্কোয়ার' নামের এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা ওর খুব চেনা। এখানে ও নিয়মিত আসে। খাওয়াদাওয়ার নানান জিনিসপত্র থেকে শুরু করে তেল, মশলা, শ্যাম্পু, সাবান—সবই ও এখান থেকে কেনে।

আজ যখন ও ট্রলি ঠেলে নিয়ে বিভিন্ন লেনের র‍্যাক থেকে দরকারি জিনিসগুলো বেছে-বেছে ট্রলির বাস্কেটে তুলছে তখনই ওর ফোন বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। ছোট্ট আশঙ্কা নিয়ে 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে ফোন কানে দিল।

'হ্যালো—।'

ও-প্রান্ত থেকে একটা লোক কথা বলল। তার গলাটা সুধার ভীষণ চেনা।

'ম্যাডাম, আমাদের ব্যাপারটা কতদূর এগোল? তুমি কী ডিসাইড করলে?'

'কী ব্যাপার?' না বোঝার ভান করে জানতে চাইল সুধা।

লোকটা ছোট-ছোট শব্দ করে হাসল : 'জেরান্টোলজি, ম্যাডাম।'

সুধার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ও বলল, 'জেরান্টোলজি? জেরান্টোলজির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ও নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ করছি না।'

'কী দু:খের ব্যাপার, ম্যাডাম!' আক্ষেপ করে বলল লোকটা, 'তুমি পৃথিবীর সব মানুষের আয়ু বাড়াতে চেষ্টা করছ, অথচ তোমার আর তোমার মায়ের আয়ু কমাতে চেষ্টা করছ! ভেরি স্যাড। কিন্তু এটাই কী তোমার শেষ কথা?'

'আমার কাছে কোনও অপশান নেই।' চোয়াল শক্ত করে বলল সুধা, 'আমি বিজ্ঞান ছাড়া আর কারও চাকর নই...।'

•

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। সুধা যখন ভাবছে যে, লোকটা ফোন ছেড়ে দিয়েছে, তখনই লোকটা কথা বলল।

'গুড। গুড। সো উই অ্যাকসেপ্ট দ্য কোল্যাটারাল ড্যামেজ...।'

ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

নিজের টেনশন কাটাতে সুধা চুপচাপ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর আবার ওর কেনাকাটা শুরু হল। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও প্রাণপণে ছন্দে ফিরতে চাইছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর সুধাসুন্দরীর কেনাকাটার পাট শেষ হল। ও জিনিস ভরতি ট্রলি নিয়ে একটা ক্যাশ কাউন্টারে লাইন দিল। চারপাশের লোকজনকে ও দেখছিল বটে কিন্তু তাদের 'ছবিগুলো' ওর মাথায় ঢুকছিল না। ওর বারবার লোকটার শেষ মন্তব্যটা মনে পড়ছিল, আর মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা-কে ভীষণ দেখতেও ইচ্ছে করছিল। ওর মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া উথলে উঠল।

হঠাৎই বছর পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর একজন প্রৌঢ় সুধার ট্রলির কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে ওকে জিগ্যেস করল, 'এই দুধটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, মিস?'

সুধা একটু অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল।

গোলগাল বেঁটে চেহারা। লালচে সাদা গায়ের রং। মাথাজোড়া টাক। মুখটা ফোলা-ফোলা, গায়ে একটা স্ট্রাইপড কোট, পায়ে ময়লা সাদা প্যান্ট।

সুধা আজ তিনটে দুধের প্যাকেট কিনেছে—মায়ের জন্য। রোজ সকালে মা-কে একগ্লাস দুধ খেতে বাধ্য করে সুধা। মায়ের শরীর যা রোগা আর দুর্বল তাতে রোজ সকালে এই দুধটুকু দরকার। চারমাস আগে মা-কে হসপিটালে ভরতি করিয়ে সবরকম টেস্ট করিয়েছিল। সেইসব টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে মেডিসিনের নামি একজন ডক্টরকে দেখিয়েছিল। তাতে মা-কে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে রোজ হাফ লিটার করে দুধ খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ডক্টর। সেই পরামর্শটা মা-কে মানতে বাধ্য করেছে সুধা। মা-কে বলেছে, 'তুমি মাঝে-মাঝে ভুলে যাও কেন যে, আমিও একজন পাশ করা ডাক্তার!'

তারপর থেকে রোজ দুধ খাওয়ার নিয়মটা দাঁড়িয়ে গেছে।

সুধা নিজের চিন্তায় আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই ও খেয়াল করল, টাক মাথা ভদ্রলোক তখনও ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবং আবার জিগ্যেস করছেন, 'মিস, এই ব্র্যান্ডের মিলক কি হেলদি? গুড ফর পেশেন্টস?'

সুধা ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল, 'অ্যাঁ—হ্যাঁ। ইয়েস, ইয়েস—গুড ফর হেলথ।'

'থ্যাংকস—' ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমার ওয়াইফ খুব সিকলি। ডক্টর রোজ ওকে দুধ খেতে বলেছেন। কিন্তু এখানে এসে এতরকম ব্র্যান্ডের সুইট মিলক প্যাক দেখে আমি বেশ কনফিউজড। তখনই তোমাকে খেয়াল করলাম। ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে সাজেশান নিলে হয়। তাই তোমাকে বদার করলাম। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড...।'

'না, না—মনে করার কী আছে!'

ভদ্রলোক একটু অতি-বিনয়ের সঙ্গেই সুধাকে বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানালেন। দুধের প্যাকেটটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর ওটা সুধার ট্রলিতে রেখে দিয়ে আরও একবার 'থ্যাংকস' বলে চলে গেলেন।

ঘটনাটা ও বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু পরে ওর মনে হয়েছিল, ঘটনাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে ভুলে যাওয়াটা ওর মস্ত বড় ভুল ছিল।

বিপদটা হল চারদিন পরেই।

তখন দুপুর সওয়া দুটো। লাঞ্চব্রেক থেকে ল্যাবে ফিরে সবে কাজের ভেতরে আবার মাথা গলিয়েছে সুধা। এমন সময় ফোনটা এল।

মোবাইল কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলতেই চেনা গলা শুনতে পেল।

'আমরা খুবই দু:খিত, ম্যাডাম। তোমার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা চাইছি মানে? কীসের ক্ষমা? কী হয়েছে?'

লোকটা সুধার একটা প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি হলে ল্যাব থেকে এখুনি বাড়ি চলে যেতাম...।'

লোকটা কীসের ইশারা করছে? বাড়ি যেতে হবে মানে?

সুধাসুন্দরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। মা! মায়ের কিছু হল না কি? নাকি এটা নিছকই ওকে ভয় দেখানোর জন্য ফাঁকা আওয়াজ?

'কী বলতে চান সোজাসুজি বলুন!' অধৈর্য গলায় বলল সুধা।

লোকটা খুক-খুক করে হাসল : 'ম্যাডাম, আর বাচ্চা মেয়ে সেজে থাকার ভান কোরো না। তুমি বুঝতে পারছ না কী বলতে চাইছি?' একটু চুপ করে থেকে লোকটা প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ। তোমাকে প্রথম থেকেই আমরা সাবধান করেছিলাম। শুধু তোমার বোকা-বোকা জেদের জন্যেই এরকম একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গেল....।'

লোকটা তো অসহ্য! ভাবল সুধা। ওর গলা উঁচু পরদায় উঠে গেল: 'কী হয়েছে বলুন, প্লিজ!'

'কোল্যাটারাল ড্যামেজ—ডান বাই য়ু। তুমি এখন জলদি বাড়ি যাও—।'

আর দেরি করেনি সুধাসুন্দরী। ল্যাবের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে ছুটেছে বাড়ির দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলার আগে থেকেই সুধা 'মা! মা!' বলে চিৎকার শুরু করেছিল, কিন্তু কোনও সাড়া পায়নি। দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর সাড়া না পাওয়ার কারণটা বুঝতে পারল।

ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে একটা সোফায় মায়ের দেহটা এলিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো বোজা। ডান হাতে টিভির রিমোট। টিভি চলছে।

মেঝেতে দুধের গ্লাসটা ভেঙে চৌচির। দুধ ছড়িয়ে পড়ে কার্পেটের অনেকটা জায়গা ভিজে গেছে।

'মা!'

সুধাসুন্দরীর মুখ থেকে যে-চিৎকারটা বেরোল সেটা আর্ত হাহাকারের মতো শোনাল। তারপরই কান্নার ঢেউ ওর বুক ঠেলে উথলে উঠল। কোল্যাটারাল ড্যামেজ!

হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে ও ছুটে গেল মায়ের কাছে। মায়ের দেহটা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। না, মায়ের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি ও টের পাচ্ছে না। তখন শঙ্কা আর আশঙ্কা নিয়ে হাত বাড়াল মায়ের কবজির দিকে। পালস বিট দেখতে চাইল।

আছে! আছে!

আনন্দে খুশিতে সুধাসুন্দরীর ভেতরটা গলে গেল। ও যেন নতুন করে বুঝতে পারল, মা থাকা আর না থাকার মধ্যে কতটা তফাত। মা-কে জড়িয়ে ধরে ও আনন্দে কাঁদতে লাগল।

একটু পরেই ও নিজেকে সামলে নিল। মায়ের এখন চিকিৎসা দরকার। কী করে এমন হল, সেটাও জানা দরকার।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। মায়ের অচেতন দেহটা ঠিকঠাক করে শুইয়ে দিল সোফায়। রিমোটটা অসাড় হাতের মুঠো থেকে খুলে নিয়ে বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। রিমোট রেখে দিল টেবিলে।

ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুধা। সবকিছু জায়গামতোই রয়েছে। কোথাও কোনও হানাদারের ছাপ নেই।

আর দেরি না করে হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে ফোন করে দিল। পেশেন্টের কথা বলল। বাড়ির ঠিকানা আর লোকেশান বলল।

এবার অপেক্ষা।

সুধার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। মনের ভেতরে খারাপ-খারাপ স্মৃতির ছবিগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল। মাথার দুপাশে দপদপানি। এসি অন থাকা সত্বেও ঠোঁটের ওপরে ঘামের ফোঁটা।

ঝুঁকে পড়ে মা-কে পরীক্ষা করল—যন্ত্রপাতি ছাড়া যতটা করা যায়। ব্লাড প্রেশারটা মাপতে পারলে ভালো হত।

কী করে মায়ের এমন হল? হার্ট অ্যাটাক? না সেরিব্রাল অ্যাটাক? ঠিকমতো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এমন সময় সধাসুন্দরীর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

'ম্যাডাম, কেমন আছ?' মোলায়েম স্বরে প্রশ্নটা ভেসে এল।

উত্তরে একসঙ্গে অনেক কিছু বলতে চাইল সুধা। কিন্তু কথাগুলো ওর গলার ভেতরে আটকে গেল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

একটু পরে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মা...! মা...!'

'হ্যাঁ, তোমার মা—' একবার কাশল লোকটা : 'তোমার মা বেঁচে আছে, ম্যাডাম। আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি, তাই।'

'কী হয়েছে মায়ের? মা-কে কী করেছেন আপনারা?' উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠা গলায় জানতে চাইল।

'তোমার মায়ের হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়নি। তোমার মা দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে...।'

'দুধ!'

'হ্যাঁ—দুধ।' হাসল সে : 'তোমার মনে পড়ে, ম্যাডাম, কয়েকদিন আগে ''ফোর স্কোয়ার'' ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে তুমি তিন প্যাকেট দুধ কিনেছিলে?'

'হ্যাঁ—।'

'তখন একজন টাকমাথা লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করে কথা বলেছিল। তোমার ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে সেটার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। প্যাকেটটা অনেকক্ষণ তার হাতে ছিল। মনে আছে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—।' সুধার বুকের ভেতরের শব্দটা কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

'ওই ভদ্রলোক অ্যাকচুয়ালি আমাদের লোক।' খুক-খুক করে হাসল : 'তোমার ওই দুধের প্যাকেটে একটা হাই পোটেনশিয়াল টক্সিন ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ওই টাকমাথা লোকটার কাছে একটা

আলট্রা-থিন নিডলওয়ালা ইনজেকশান সিরিঞ্জ ছিল। খুব ছোট সিরিঞ্জ। তার মধ্যে ছিল ওই টক্সিন। তোমার দুধের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে তোমার চোখের আড়ালে ওই টক্সিনটা প্যাকেটের মধ্যে পুশ করে দেওয়া হয়েছিল...।'

সুধাসুন্দরী কোনও কথা বলতে পারছিল না। মোবাইল ফোনটা আর-একটু হলেই ওর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল।

অনেক চেষ্টায় ওর মুখ থেকে কয়েকটা অর্থহীন টুকরো শব্দ বেরোল শুধু।

লোকটা হেসে বলল, 'ইচ্ছে করলেই আমরা ওই প্যাকেটে স্ট্রং ডোজের পয়জন ইনজেক্ট করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। করলে তোমার মা ওপারে চলে যেত। সো কনসিডার ইয়োরসেলফ লাকি, ম্যাডাম। আসলে আমরা খুব দয়ালু...।'

সুধা চুপ করে রইল।

'বাট নেক্সট টাইম উই মে নট বি সো কাইন্ড। য়ু মে নট বি সো লাকি। এখন ছাড়াছি। পরে আবার ফোন করব। বাট ডোন্ট ফরগেট, উই উইল বি ওয়াচিং য়ু...।'

ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

মায়ের চিকিৎসা নিয়ে টানা দু-সপ্তাহ ব্যস্ত রইল সুধা। মা-কে সুস্থ করে তোলার জন্য হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্সরা প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগল।

হাই পোটেনশিয়াল টক্সিনটা মা-কে ভালোমতোই জখম করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার-নার্সরা জিতে গেল। ওদের সাহায্যে মা-কে শারীরিকভাবে সুস্থ করে তুলে বাড়িতে নিয়ে এল সুধা। তারপর থেকেই ভয় আর উৎকণ্ঠা ওর মনের ভেতরে বাসা বাঁধল। নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে পাট গোটানোর জন্য ও পাগলের মতো হয়ে উঠল। ওর বারবারই মনে হতে লাগল, আগে মা, পরে জেরান্টোলজি।

কয়েকদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সুধাসুন্দরী। ইন্টারনেটে নানান জায়গায় রিসার্চ সায়েন্টিস্ট পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে লাগল। আর সকলের চোখের আড়ালে জেরান্টোলজির রির্সাচের কাগজপত্রগুলো সালফিউরিক অ্যাসিডে পোড়াতে লাগল।

প্রায় দিনদশেক ধরে নিজের প্রাণের জিনিসগুলো ধীরে-ধীরে পুড়িয়ে শেষ করল সুধা। পোড়ানোর সময়ে ওর চোখে জল এসেছিল। কিন্তু মায়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে ও মন শক্ত করেছে, চোখের জল মুছে নিয়েছে।

ওর গবেষণার কেরিয়ারের জোরে পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকেই চাকরির অফার পেল। অফার এল নিজের দেশ থেকেও। মা বারবার দেশে ফিরতে চাইছিল। বলছিল, ওল্ড সিটিতে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওল্ড সিটির যা অবস্থা সেখানে না আছে সুধাসুন্দরীর মতো বিজ্ঞানীর জন্য কোনও চাকরি, না আছে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা!

তাই ওই ছন্নছাড়া বিপজ্জনক হতশ্রী শহরটায় না ফিরে সুধা ফিরে এল তার খুব কাছাকাছি—নিউ সিটিতে। চাকরির অফারটা নেওয়ার ফাইনাল স্টেজে ও কথা বলল সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে। স্পষ্ট বলল, স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য ওর কী-কী চাই। কোন-কোন ধরনের ল্যাব ওর দরকার, ক'টা 'ক্লিন' রুম দরকার, কী ধরনের ম্যানপাওয়ার ওর চাই।

শ্রীধর পাট্টা প্রতিভা চিনতে কখনও ভুল করেন না। তা ছাড়া সুধাসুন্দরীর সম্পর্কে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পর তিনি ওর কেরিয়ার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাই ওর সব কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, সুধাসুন্দরী নিউ সিটিতে রিসার্চ কেরিয়ার নতুন করে শুরু করছে মানে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ম্যাপে নিউ সিটি জায়গা করে নেবে। তাই সুধাকে অসম্ভব গুরুত্ব আর স্বাধীনতা উপহার দিলেন।

মা-কে নিয়ে দেশে ফিরে এল সুধা। শ্রীধর পাট্টার শহরে ও নতুন করে বিজ্ঞানী-জীবন শুরু করল। ওর তত্বাবধানে বেশ কয়েকটা ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল। সারা পৃথিবীর বায়োকেমিস্ট্রি ফিল্ডের বিজ্ঞানীরা এবার নিউ

সিটির দিকে চোখ ফেরাতে লাগল।

কয়েক বছরের মধ্যেই সুধাসুন্দরী নিউ সিটির অংশ হয়ে গেল।

ওর কাহিনি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সুধা। জিশানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর বড়-বড় চোখে প্রত্যাশার ছায়া। যেন বলতে চাইছে, এবার জিশান কিছু বলুক।

জিশান চটপটে তেজি বিজ্ঞানী মেয়েটাকে দেখছিল। ওর ভয়ংকর দিনগুলো ভাবতে চেষ্টা করছিল : জেরান্টোলজির গবেষণা, ওই ভয়-দেখানো টেলিফোন, মায়ের ওপরে ওইরকম নৃশংস অ্যাটেম্পট...। সত্যি, অনেক সইতে হয়েছে সুধাকে! যেমন, জিশান এখন সইছে।

জিশান হেসে বলল, 'তুমি একজন রিয়েল ফাইটার।'

'তোমার মতো নয়। তুমি এখন একজন আইকন—নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির সবার কাছে...।

'তোমার মা এখন কেমন আছেন?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল সুধাসুন্দরী। কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। টেবিলের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে জিশানের দিকে তাকাল : 'চলো, মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। মা বেডরুমেই থাকে—খুব একটা বেরোতে পারে না...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুধা। জিশানও।

সুধা ছোট্ট করে বলল, 'এসো...।'

সুধাসুন্দরীর পিছন-পিছন এগিয়ে চলল জিশান। সম্পর্কের টান আর তাকে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসার কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল মিনি আর শানুর কথা। মিনি দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখটার কথা প্লেট টিভির দৌলতে জেনেছে। জিশান যখন ওকে এম-ভি-পি-তে কিল গেমের তারিখটার কথা বলে তখন মিনি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল, 'জানি—।'

সেদিন মিনি বড্ড চুপচাপ ছিল। শুধু শানুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। হয়তো ভাবছিল, জিশান চলে গেলে ছোট্ট শানুকে ও একা-একা মানুষ করতে পারবে তো!

জিশান ওকে বলেছিল, 'দু-তারিখের ব্যাপারটা মিটে গেলে তিন তারিখ সকালে তোমাকে ফোন করব...।'

মিনির চোখের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হয়নি যে, মিনি ওর কথা বিশ্বাস করেছে।

সুধাসুন্দরীর বেডরুমের দরজায় দাঁড়াতেই ওষুধের মতো একটা গন্ধ জিশানের নাকে এল। সুধা তখন কাউকে লক্ষ্য করে একটু জোরালো গলায় ডেকে উঠেছে, 'মা!'

ঘরে ঢুকেই সুধার মা-কে দেখতে পেল জিশান।

ধপধপে সাদা বিছানায় বসে আছেন একজন ধপধপে সাদা মহিলা। পরনে ধপধপে সাদা শাড়ি।

সাদা বিছানার পটভূমিতে মহিলাকে প্রায় দেখাই যেত না, যদি না ওঁর মাথার চুলগুলো কালো হত।

রোগা ক্ষীণজীবী চেহারা। সামনে টিভি চলছে, কিন্তু সেদিকে ওঁর মন নেই। বিছানার চাদরের ওপরে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য দাগ টেনে কাটাকুটি খেলছেন। ওঁর গায়ের চামড়ায় এত ভাঁজ যে, জিশান অবাক হল। আগে কখনও কারও চামড়ায় এত ভাঁজ দেখেনি ও।

বিছানার কাছেই একটা সবুজ রঙের হেক্সাগনাল ব্লকের ওপরে শর্মি বসে ছিল। জিশানকে শোওয়ার ঘরে দেখে ও কেমন যেন একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল। চট করে উঠে দাঁড়াল।

'মা! এই দ্যাখো, জিশান তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। এই যে—তাকাও এদিকে...।'

সুধা গিয়ে মায়ের পাশে বসল। মায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরল। শর্মিকে ইশারা করতেই ও একটা নীল রঙের হেক্সাগনাল ব্লক বিছানার কাছে নিয়ে এসে রাখল।

'জিশান, এসো—বোসো—।' ব্লকটা জিশানকে ইশারা করে দেখাল সুধা।

জিশান বসল। সুধাসুন্দরীর মায়ের খুব কাছে—মুখোমুখি।

কাছ থেকে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে জিশান অবাক হয়ে গেল।

লোলচর্ম এই বৃদ্ধার দু-চোখের মণির ওপরে সাদা পরদার আস্তরণ। মনে হচ্ছে, ওঁর চোখের ওপরে কুয়াশা জমেছে।

'মা, এই যে, জিশান—' মায়ের হাতটা নিয়ে জিশানের হাত ছুঁইয়ে দিল সুধা : 'জিশান এখন নিউ সিটির সুপারহিরো। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখে গেম সিটিতে ওর লড়াই—কিল গেম—সকাল থেকে রাত পর্যন্ত...।'

বৃদ্ধার সাদা কুয়াশা ঢাকা চোখ জিশানের দিকে তাকাল। ভাঁজ পড়া গাল কাঁপল। জিশানের হাতের ওপরে আলতো করে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'সুধার খুব বিপদ। ওকে টেলিফোন করে সবাই ভয় দেখায়...।'

জিশান সুধার দিকে তাকাল। চোখে আবছা প্রশ্ন।

সুধা ওকে হাতের ইশারায় চুপ করে থাকতে বলল।

'তোমাকে কেউ ভয় দেখায় না তো, জিশান?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

'না, কাকিমা—কেউ ভয় দেখায় না। কারণ, আমি ভয় পাই না...।'

'খুব ভালো, খুব ভালো—' জিশানের হাতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আর শোনো, রাস্তাঘাট দেখে পার হবে—কোনও গাড়ি যেন তোমাকে ধাক্কা না মারে...।'

জিশান উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারছিল না।

সুধা ওর মায়ের পাশ থেকে উঠে জিশানের পাশটিতে এসে দাঁড়াল। জিশানের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'মা যা বলে চুপচাপ শুনে যাও আর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাও। পরে তোমাকে সব বলছি...।'

সুধা আবার ওর মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

বৃদ্ধা তখনও শূন্য চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলছেন, 'দেখে-শুনে রাস্তা পার হবে, বুঝলে। নইলে কোথা থেকে গাড়ি-টাড়ি ছুটে আসবে—হুট করে ধাক্কা মেরে দেবে...।'

বৃদ্ধার হাতে চাপ দিল জিশান। বলল, 'আজ আসি, কাকিমা। আশীর্বাদ করুন যেন কিল গেমে জিততে পারি...।'

'তুমি জিতবে...জিতবে...।'

বৃদ্ধার হাতটা আলতো করে ফিরিয়ে দিল জিশান। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সুধার দিকে চোখ গেল ওর। চোখের কোণ চিকচিক করছে। মুখে কাতর ছায়া।

জিশান একটু সরে আসতেই সুধাসুন্দরী উঠে দাঁড়াল। জিশানের খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'ওই মিসহ্যাপটার পর মায়ের ব্রেন খানিকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। বিশেষ করে অপটিক আর ভেগাস ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো। এ ছাড়া আর-একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়েছে। মায়ের এজিং প্রসেসে একটা ডিজর্ডার দেখা দিয়েছে—মা খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। মা-কে আর কতদিন ধরে রাখতে পারব জানি না...।' সুধার গলা ধরে এল।

ওর দিকে তাকিয়ে জিশান স্পষ্ট বুঝতে পারল ও প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

সুধা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ওর মা-কে লক্ষ্য করে নীচু গলায় বলল, 'মা, আসছি...।'

ইশারা করে শর্মিকে মায়ের কাছে এসে বসতে বলল সুধা। তারপর জিশানকে সঙ্গে নিয়ে বেডরুমের দরজার দিকে এগোল।

হঠাৎই পিছন থেকে কাঁপা গলায় ডেকে উঠলেন বৃদ্ধা, 'জিশান...।'

জিশান ঘুরে দাঁড়াল : 'বলুন, কাকিমা—।'

'তুমি কখনও দুধ খেয়ো না, জিশান...।'

•

গুনাজির কাছে নিয়মিত গাড়ি চালানো শিখছিল জিশান। এবং গাড়ির মধ্যে যেসব আধুনিক অটোমেটিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে গাড়ি চালানো শিখতে ওর সময় বেশি লাগল না। তারপর গুনাজি ওকে চালানোর নানান কায়দা, কসরত আর কেরামতি শেখাতে লাগল।

ঢাল বেয়ে নামার সময় কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়। সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে কীভাবে স্টিয়ারিং আর ব্রেককে কন্ট্রোল করতে হয়। যদি দেখা যায় যে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই—কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না—তখন কী-কী স্টেপ নিলে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। হঠাৎ করে গাড়ির ব্রেক ফেল হয়ে গেলে জিশান কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে। ব্যাক গিয়ার দিয়ে কীভাবে গাড়ি পিছনদিকে জোরে ছোটাতে হয়।

এইরকম আরও কত কী!

জিশান বাধ্য ছাত্রের মতো সব শিখে নিচ্ছিল আর মনে-মনে ভাবছিল, এতসব কায়দাকানুন ওর শেখার দরকারটা কী?

একদিন ও গুনাজিকে প্রশ্নটা করেই বসল।

'গুনাজি, তুমি আমাকে ড্রাইভিং-এর এতরকম মারপ্যাঁচ শেখাচ্ছ কেন বলো তো? আমি কি কার রেসিং-এ নাম লেখাতে যাচ্ছি নাকি?'

জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসল গুনাজি : 'দাদা, আপনাকে কার ড্রাইভিং-এর সঙ্গে-সঙ্গে এসবও শেখাতে হবে। কারণ, মার্শাল স্যার আমাকে সেরকমই অর্ডার দিয়েছেন...।'

গুনাজিকে ভালো করে লক্ষ করল জিশান।

মাথার চুলে জেল। চুলের সোনালি রং রোদে চকচক করছে। মুখে প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা। গা থেকে পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে।

'কেন, এরকম অর্ডার দিয়েছেন কেন?'

একটু চুপচাপ থাকার পর গুনাজি বলল, 'কিল গেমে যারা যায় তাদের এগুলো শিখে নেওয়া জরুরি, তাই। গেম সিটিতে দরকার পড়লে গাড়ি চালাতে হয়। আর সেটাও চালাতে হয় বেশ ডেঞ্জারাসভাবে...।'

জিশান গুনাজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছিল, গুনাজি জিশান নয়, অন্য কারও কথা বলছে। কিল গেমের অন্য একজন প্লেয়ারকে গুনাজি গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে, গাড়ি নিয়ে নানান কসরত রপ্ত করাচ্ছে—তারই কথা বলছে গুনাজি। আর জিশান শুনছে।

ইস, এমনটা যদি সত্যি হত!

গাড়িটা একপাশে পার্ক করে কথা বলছিল গুনাজি। জিশান গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বিশাল এলাকা জুড়ে নিউ সিটির এই ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার। নাম 'ফ্লাই বাই'। সুপারগেমস কর্পোরেশনের পার্টিসিপ্যান্টরাই একমাত্র এই ট্রেনিং সেন্টারে গাড়ি এবং মোটরবাইক চালানো শিখতে পারে। তাও আবার কর্পোরেশনের অর্ডার পেলে তবেই।

এখানে এক-এক ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য রয়েছে এক-একরকম ট্র্যাক। প্রতিটি ট্র্যাকের এলাকায় রঙিন এল-সি-ডি প্যানেলে নানান নির্দেশ লেখা। তার পাশে ছবি এঁকেও বোঝানো রয়েছে, এই এলাকাটা কোন ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া প্রতিটি এলাকার জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের লোগো। সেই লোগোটা এলাকার নানান জায়গায় বেশ পরিকল্পনা করে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কারও পক্ষে ভুল করে এক এলাকার বদলে অন্য এলাকায় ঢুকে পড়া মুশকিল।

কিন্তু তা সত্বেও যদি কেউ ঢুকে পড়ে তার জন্য রয়েছে বিপার এবং সিকিওরিটি গার্ড।

একটা গাড়ি যখন 'ফ্লাই বাই'-এর কোনও জোনে ঢুকতে চায় তখন সেই গাড়ির ড্রাইভারকে সেই জোনের একটা বড় মাপের লোগো কার্ড দেওয়া হয় : স্পেশালি কোডেড ম্যাগনেটিক কার্ড। সেটা উইন্ডশিল্ডে

লাগিয়ে নিতে হয়। এই লোগো কার্ড লাগানো অবস্থায় অন্য কোনও জোনে গাড়ি ঢুকলেই বিপার বেজে ওঠে আর লোগো কার্ডটা ফ্ল্যাশ করতে থাকে। তখন সিকিওরিটি গার্ডরা গাড়িটা থামিয়ে তার কন্ট্রোল হাতে নেয়।

'ফ্লাই বাই'-এর গার্ডদের পোশাকের রং নীল, তবে জোন অনুযায়ী তাদের পোশাকে নানান লোগো লাগানো রয়েছে।

গুনাজির কাছেই জিশান জেনেছে, এই ট্রেনিং সেন্টারের রাস্তাগুলো একটা স্পেশাল টাইপের সিনথেটিক অ্যাসফাল্ট দিয়ে তৈরি। এর ওপর দিয়ে যত জোরেই গাড়ি ছুটুক না কেন, তাতে রাস্তার ক্ষয় প্রায় হয় না বললেই চলে। অথচ গাড়ির টায়ারের গ্রিপের কোনও সমস্যা হয় না।

রাস্তা ছাড়াও ট্রেনিং-এর জন্য রয়েছে ধু-ধু মাঠ। এবড়োখেবড়ো, পাথুরে, আগাছায় ভরা। এ ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড ঢিবি আর গর্ত। সবমিলিয়ে রাফ অ্যান্ড টাফ হোস্টাইল টেরেন। গাড়ি চালানো শিখতে হবে সবরকম রাস্তা আর জমিতে।

'ফ্লাই বাই'-এর চারপাশটা দেখে জিশান স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর এবং আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার বুঝি স্বপ্নেই দেখা যায়! নাকি তাও দেখা যায় না?

কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা এই ট্রেনিং সেন্টার জীবন-মরণ নিয়ে জুয়া খেলার আধুনিক আয়োজন করে তা থেকে নিয়মিত কোটি-কোটি টাকা আয়ের কী চমৎকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর পাট্টা!

গুনাজির কাছে তিনদিন ট্রেনিং নেওয়ার পর জিশানের দায়িত্ব নিল অন্য একজন ট্রেনার—যদিও গুনাজি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সঙ্গে রইল।

এই ট্রেনিং-এর ধাপে জিশান যেটা শিখছিল সেটা হল, নিজেকে অক্ষত রেখে কী করে বেপরোয়াভাবে গাড়ি ড্রাইভ করতে হয়—তা সেটা সামনের দিকেই হোক বা পিছনের দিকেই হোক। তার সঙ্গে শেখানো হতে লাগল গাড়ি ছুটিয়ে 'র‍্যাম্প' বেয়ে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দেওয়া। ছুটন্ত গাড়ি জলের মধ্যে পড়ে গেলে ডুবে যাওয়া সেই গাড়ি থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসতে হয়। চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে গেলে কী করে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

সোজা কথায়, গাড়ি নিয়ে যতরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি হতে পারে তার মোকাবিলা করার ট্রেনিং চলতে লাগল।

জিশান বুঝতে পারছিল, ও একটা পেশিবহুল যন্ত্র থেকে ধীরে-ধীরে আরও নিখুঁত একটা পেশিবহুল যন্ত্রে পালটে যাচ্ছিল।

গাড়ি চালানোর ঘামঝরানো বেপরোয়া ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের কিন্তু ছুটি হল না। শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ওকে তুলে দেওয়া হল প্যাসকো নামের এক মোটরবাইক ওস্তাদের হাতে।

জিশানের সামনে অ্যাসফাল্টের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল 'বুলডোজার—ব্লু লাইন' মডেলের চার হাজার সি.সি.-র একটা বাইক। তার পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিল প্যাসকো।

কালো রঙের বাইকটাকে মনে হচ্ছিল একটা বুনো মোষ। আর তার বাঁকানো দুটো হাতল যেন মোষের শিং।

জিশানের মনে হল, প্যাসকোর মোটাসোটা ভারী চেহারাটাও বুনো মোষের চেহারার খুব কাছাকাছি।

গায়ে কালো চামড়ার স্লিভলেস জ্যাকেট। জ্যাকেটের গলার কাছটায় কয়েক খাবলা লোম উঁকি মারছে। গায়ের রং গাঢ় তামাটে। মোটা-মোটা হাত দুটো যেন ইস্পাতের থাম। হাতের সব জায়গায় লাল-কালো-সবুজ রঙের উলকি। মাথার ঝাঁকড়া চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখটা লাউয়ের মতো ভারী। বাঁ-কানে একটা সোনার মাকড়ি। থুতনিতে যে-দাড়িটুকু রয়েছে সেটা ফ্রেঞ্চকাট আর ছাগলদাড়ির মাঝামাঝি। তাতে আবার চকচকে রুপোলি রং মাখানো।

প্যাসকো কী যেন একটা চিবোচ্ছিল—কারণ, ওর চোয়াল নড়ছিল।

প্যাসকোকে দেখেই জিশানের মনে হল, প্যাসকো কিল গেমের একজন পার্টিসিপ্যান্ট। ওর চোখ দুটো ছোট-ছোট—ডুমো-ডুমো গালের কোলে ঢোকানো। দুটো চোখের মণি যেন বরফের টুকরো। ঠান্ডা, মরা মাছের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জিশানের দিকে।

প্রথম দিন সকাল ন'টার সময় জিশানকে মোটরবাইক ট্রেনিং জোনে পৌঁছে দিয়ে গুনাজি 'ভিজিটরস ওয়েটিং জোন'-এ চলে গিয়েছিল। সেখানে ও জিশানের জন্য বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

গাড়ি চালানোর কসরত শেখানোর সময় গুনাজি বলেছিল, 'দাদা, শুধু কার ড্রাইভিং নয়, আপনাকে মোটরবাইক চালানোও শিখতে হবে...।'

উত্তরে জিশান বলেছে, 'আমি মোটরবাইক চালাতে জানি, গুনাজি...।'

গুনাজি হেসে বলেছে, 'ওই শেখা দিয়ে কাজ হবে না, দাদা। গেম সিটিতে মোটরবাইক চালানো খুব সহজ নয়। অথচ সেখানে শত্রুকে প্রাণে মারার জন্যে...কিংবা নিজে প্রাণে বাঁচার জন্যে...মোটরবাইক চালানোয় ওস্তাদ হওয়া দরকার...।'

কথা বলতে-বলতে গুনাজি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কোনওরকমে চোখ মুছে নিয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'সেটা আপনি দু-তারিখেই বুঝতে পারবেন। গেম সিটির মধ্যে এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি, পাহাড়, নদী, জঙ্গল—সব আছে। আমাদের মার্শাল বলেন, এসব না থাকলে লুকোচুরি খেলা জমবে কী করে! টিভিতে কিল গেমের প্রোমোতে প্রায়ই এসব নিয়ে আলোচনা হয়, ছবি দেখায়। আমি দেখেছি...।'

কাঁধে হাত বুলিয়ে গুনাজিকে আশ্বাস দিল জিশান : 'তুমি আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারছ না, গুনাজি?'

'না, না—তা নয়...।' গুনাজি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল।

'তুমি চিন্তা কোরো না, গুনাজি। আমি খুব মন দিয়ে মোটরবাইক চালানো শিখব। খুব মন দিয়ে লড়ব...।'

গুনাজি কোনও কথা বলল না। শুধু চোখের জল মুছে চোয়াল চেপে ওপর-নীচে মাথা নাড়ল। তারপর গাড়িতে উঠে 'ভিজিটরস ওয়েটিং জোন'-এর দিকে রওনা হয়েছিল।

ওর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে জিশানের মনে হল, সত্যি কিল গেমের আর বেশি দিন বাকি নেই : মাত্র চোদ্দো দিন।

প্যাসকোর কাছাকাছি পৌঁছতেই ও হাত বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় জিশান টের পেল, ওর শক্তিও বুনো মোষের যথেষ্ট কাছাকাছি।

'ওয়েলকাম, জিশান, ওয়েলকাম—।' হেসে বলল প্যাসকো, 'তোমার কাণ্ডকারখানা টিভিতে রোজ দেখছি। তোমার জবাব নেই।'

জিশানের মনে হল, প্যাসকোর হাসিটা খুব সরল এবং আন্তরিক। তা ছাড়া, ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের ঠান্ডা মরা মাছের দৃষ্টিটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

ওর হাসির উত্তরে জিশান অজান্তেই হেসে ফেলল।

'সুপারগেমস কর্পোরেশন তোমার ডোসিয়ার আমাকে পাঠিয়েছে। সামনের মাসের দু-তারিখে তোমার কিল গেম। আমাদের এই ''ফ্লাই বাই''-এ ছ'-জন মোটরবাইক ট্রেনার আছে। তবে আমি শুধু কিল গেমের ক্যান্ডিডেটদের ট্রেনিং দিই। সুতরাং তুমি আমাকে মোটরবাইক ট্রেনিং-এর সুপার ট্রেনার বলতে পারো।...আচ্ছা, তুমি কি বাইক চালাতে জানো?'

প্রশ্নটা এমনভাবে হল যে, জিশান ঠিক তৈরি ছিল না। একটু থতমত খেয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ—জানি।'

'তা হলে আমাদের ট্রেনিং-এ অনেকটা সুবিধে পাওয়া যাবে—।'

'তোমার কাছে সুপার ট্রেনিং নিতে আমার ক'দিন লাগবে?'

জিশানের কথায় মজা পেয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে 'হা-হা' করে হেসে উঠল প্যাসকো : 'ভালো বলেছ! সুপার ট্রেনিং!...এই যে এই বাইকটা দেখছ...,' বলে কালো বাইকটার গায়ে হাত বোলাল প্যাসকো।

তারপর রেসে জেতা ঘোড়ার পিঠে অহঙ্কারের চাপড় মারার ঢঙে বাইকটার সিটে চাপড় মারল : 'বুলডোজার—ব্লু লাইন বাইক। চারহাজার সিসি। ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল স্পিডে ছুটতে পারে। এককথায় সুপারবাইক...।'

'তা হলে আর ভুল কী বলেছি, প্যাসকো! সুপার ট্রেনার আর সুপার বাইক—সুপার ট্রেনিং তো হবেই হবে।'

প্যাসকো বাইকে উঠে বসল। পিছনে উঠে বসার জন্য জিশানকে ইশারা করল।

জিশান চটপটে পা ফেলে বাইকটার কাছে এগিয়ে গেল। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে প্যাসকোর পিছনে চড়ে বসল। তারপর আবার জিগ্যেস করল, 'আমার ট্রেনিং ক'দিন চলবে?'

প্যাসকো ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'দ্যাখো, আমার সিটের দুপাশে গ্রিপার আছে। ও-দুটো শক্ত করে চেপে ধরো। হ্যাঁ, তোমার ট্রেনিং। আমার কাছে তোমার ট্রেনিং চলবে চারদিন। সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা। ঝোড়ো ট্রেনিং। ক্র্যাশ কোর্স—।'

জিশান কোনও কথা বলল না। একটু নজর করতেই ও কালো ফাইবারের গ্রিপার দুটো দেখতে পেল। শক্ত করে সে-দুটো চেপে ধরল। তখনই খেয়াল করল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন সিকিওরিটি গার্ড ওকে লক্ষ্য করে হাসছে।

ট্রেনিং-এ আসছে বলে জিশান টুপি বা কালো চশমা পরে আসেনি। তাই গার্ডটা ওকে চিনতে পেরেছে।

গার্ডটা হাত তুলে ওকে সেলাম জানাল।

জিশানও পালটা সেলাম ফিরিয়ে দিল।

তখন গার্ডটা দু-হাত শূন্যে তুলে দুটো 'ভি' অক্ষর দেখাল।

জিশান প্রথমটা ভাবল, গার্ডটা ওকে ডবল ভিকট্রি সাইন দেখাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই মনে হল, না, তা নয়। গার্ডের দেখানো প্রথম 'ভি'-টা আসলে দুই—সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ। আর দ্বিতীয় 'ভি'-টা ভিকট্রি।

বুলডোজার ছুটতে শুরু করেছিল। স্টার্ট দেওয়ার পর মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই বাইকটা হাই ভেলোসিটিতে পৌঁছে গিয়েছিল। জিশানের চুল বাতাসে উড়ছিল। বাইকের মসৃণ চলায় জিশান প্যাসকোর দক্ষতা টের পাচ্ছিল। ও ভেবেছিল, চারহাজার সিসি-র বাইক চলার সময় কানফাটানো আওয়াজ হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছিল না। বাইকের দুপাশে প্রকাণ্ড মাপের দুটো সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি সাইলেন্সার দুটোয় বড়-বড় খাঁজ কাটা, আর তাদের চেহারাও বিচিত্র। ওরাই বেশিরভাগ শব্দকে গিলে নিচ্ছিল।

পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মধ্যেই ওরা ট্রেনিং জোনে এসে পড়ল। ট্রেনিং জোন, তবে সেটা প্রকৃতির তৈরি একটা বিশাল এলাকা। গাছপালা, উঁচু টিলা, উঁচু-নীচু রুক্ষ জমি, খানা-খন্দ-ডোবা—সবই আছে সেখানে।

জোনের একপাশে প্যাভিলিয়ন। সেখানে সবার জন্য ড্রেসিংরুম, বাথরুম আর ক্যান্টিন রয়েছে।

জিশান জামাকাপড় পালটে তৈরি হয়ে নিল। তখন দেখল, সেখানে আরও কয়েকজন ট্রেনার আর ট্রেনি রয়েছে। এই ট্রেনিরা নিশ্চয়ই অন্যান্য গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

ওরা সবাই জিশানকে দেখতে লাগল, নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল, ট্রেনি কিংবা ট্রেনার, সবার চেহারাই সমীহ করার মতো। এদের মধ্যে যে-কেউই কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট হতে পারে। কিন্তু চেহারাই যে সব নয় সেটা জিশান এর মধ্যেই বেশ ভালো করে জেনেছে। তাই ও মনে-মনে হাসল। ও এখন জানে, কিল গেমের ফাইনালে উঠতে হলে ভালো চেহারা ছাড়াও আর কী-কী লাগে।

শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, উপস্থিতবুদ্ধি, প্রতিপক্ষের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, চুলচেরা বিচারের সূক্ষ্ম নজর, এক লহমায় পরিস্থিতি আঁচ করে নেওয়ার দক্ষতা, আর...।

আর পিছুটান। মিনি আর শানুর মতো জোরালো সুন্দর পিছুটান।

জিশান আগে ভাবত, যাদের কোনও পিছুটান নেই তারাই বোধহয় সবচেয়ে বেপরোয়া লড়তে পারে। এখন ও জানে, সেটা ঠিক নয়। বেপরোয়ার বেপরোয়া লড়তে পারে পিছুটানওয়ালা মানুষ। তার ভালোবাসার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য।

সারাদিনের ট্রেনিং যখন শেষ হল তখন জিশান সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছে। ও প্যাসকোর সঙ্গে ক্যান্টিনে গিয়ে বসল। আরামের গদিতে শরীরটাকে ছেড়ে দিল। তারপর গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যান্ডউইচ আর কনসেনট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

ট্রেনিং-এর মাঝে ব্রেকের সময় একবার ওরা ক্যান্টিনে এসেছিল বটে কিন্তু তখন আয়েস করার সময় ছিল না। সেকেন্ড হাফের ট্রেনিং শুরু করার চাপ ছিল।

কিন্তু এখন সে-টেনশান নেই।

প্যাসকোর ট্রেনিং-এর কথা জিশানের মনে পড়ছিল। ওর মোটরবাইক চালানো দেখে মনে হচ্ছিল বুলডোজার বাইকটা ওর শরীরেরই অংশ। বাইক নিয়ে যে এরকম বিপজ্জনকভাবে এত কিছু করা যায় তা জিশান আগে কখনও কল্পনা করেনি। ও মোটরবাইক চালাতে জানে বলে প্যাসকোর ট্রেনিং খুব দ্রুত এগোচ্ছিল।

আজ ট্রেনিং-এর প্রথম ধাপে জিশান প্যাসকোর পিছনে বসেছে।

দ্বিতীয় ধাপে প্যাসকো বসেছে জিশানের পিছনে।

আর তৃতীয় ধাপে জিশান একাই বুলডোজার চালিয়েছে। তখন জিশানের কানে ছিল ইয়ারফোন। বহুদূরে দাঁড়ানো প্যাসকোর ইনস্ট্রাকশন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জিশানের কানে এসেছে।

আজ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের মনে হচ্ছিল, ও যেন কতদিন ধরে 'ফ্লাই বাই'-এ মোটরবাইক চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে।

ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশান যে শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, ওর ভীষণ খিদেও পাচ্ছিল। ক্যান্টিনে এসে ওর খিদেটা কেউটের ফণার মতো ঝটকা দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

ক্যান্টিনটা নামেই ক্যান্টিন, কিন্তু চরিত্রে সুপার হাই-ফাই রেস্তরাঁ। নরম রঙিন আলোয় ভাসিয়ে দেওয়া ঠান্ডা মনোরম পরিবেশ। গোটা রেস্তরাঁর ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু রংহীন কাচ আর স্টেইনলেস স্টিল। রেস্তরাঁর সামনে সুন্দর করে সাজানো সবুজ মাঠ, আর তাকে ঘিরে রঙিন ফুলের বাগান।

রেস্তরাঁর কোথাও কোনও মেয়ের চিহ্ন নেই—চারিদিকে পুরুষ আর পুরুষ। তাদের বেশিরভাগই গেমস পার্টিসিপ্যান্ট এবং তারা ওল্ড সিটির পাবলিক।

প্যাসকো হালকা গল্প করছিল। ওর চেহারা দেখে মনে হয় না ও কখনও কারও সঙ্গে এরকম ভেসে যাওয়া মুডে গল্প করতে পারে।

খেতে-খেতে ও হঠাৎই মুখ তুলে তাকাল জিশানের দিকে। আচমকা বলে বসল, 'জানো তো, আমি কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট ছিলাম। চার বছর আগে। তোমার মতো ফাইনালেও উঠেছিলাম...।'

জিশান চমকে উঠল। ওর খাওয়া থমকে গেল।

অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি...।' প্যাসকো বলল।

'তারপর? তারপর কী হল? তুমি কিল গেমে জিতলে?'

'না:...,' মাথা নাড়ল প্যাসকো। 'ফোঁস' করে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, 'জিতিনি...।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। না জিতলে প্যাসকো ওর সামনে বসে আছে কী করে? বেঁচে আছে কী করে?

তিন চামচ গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যান্ডউইচ মুখে পুরে দিল প্যাসকো। সেটা চিবোতে-চিবোতে চুমুক দিয়ে কয়েক ঢোঁক এনার্জি ড্রিংক তাতে মিশিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আমার পিকিউলিয়ার একটা মিসহ্যাপ হয়েছিল...' একটু থেমে 'হুঁ:' করে বিরক্তির একটা শব্দ করল। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার : 'কিল গেমের ঠিক

দুদিন আগে আমি হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে গেলাম। আমাকে নিউ সিটির সেন্ট্রাল নার্সিং ইউনিটে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফেরার পর নার্সদের মুখে শুনলাম, হাইপারটেনশান আর হাই প্রেশার আমাকে আচমকা ধাক্কা দিয়েছে। কিল গেমের দিন যত এগিয়ে আসছিল আমার টেনশান নাকি ততই বাড়ছিল। তারপর আমি আর চাপ নিতে পারিনি...।'

'কিল গেমের কী হল?'

'কী আবার হল! শ্রীধর পাট্টা আমার বদলে অন্য একজন পার্টিসিপ্যান্টকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। ছেলেটা দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই বডি হয়ে গেল। গেমস-এর অনেকগুলো রাউন্ডে ও জিতেছিল...কিন্তু সেরকম টাফ ছিল না।'

জিশান এনার্জি ড্রিংক শেষ করে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। হ্যাঁ, কিল গেমে চব্বিশ ঘণ্টা লড়তে গেলে টাফ হওয়া দরকার। প্যাসকোর গা থেকে টাফনেসের গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই সঙ্গে ঘামের গন্ধও।

একটু দূরে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচজন ট্রেনির একটা দল বসে ছিল। নিজেদের মধ্যে ওরা গল্পগুজব করছিল, খাওয়াদাওয়া করছিল। আর থেকে-থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানকে দেখছিল।

জিশানকে ওরা চিনতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা এতবার তাকাচ্ছিল যে, জিশানের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, শুধু তাকানো নয়, ওকে নিয়ে কিছু একটা আলোচনাও চলছে। তা ছাড়া মাঝে-মাঝেই ওরা জিশান আর প্যাসকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় কীসব বলাবলি করছে।

জিশান ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় প্যাসকোর দিকে তাকাল। যে-প্রশ্নটা কিছুক্ষণ ধরে ওর মনে খোঁচা মারছিল সেটাই করল ওকে।

'কিন্তু এই চাকরিতে তুমি ঢুকলে কেমন করে? আর এইরকম ব্যাপক বাইক চালাতেই বা শিখলে কী করে? মার্শাল তো আর এমনি-এমনি তোমাকে সুপার ট্রেনারের চেয়ারে বসাবেন না...।'

হাসল প্যাসকো। বলল, 'ঠিকই বলেছ। সে অনেক গল্প। তোমার ট্রেনিং তো এখন চলবে। কাল শুনো...।'

'ঠিক আছে—তাই হবে।'

ক্যান্টিন থেকে বেরোনোর সময় প্যাসকো জিশানের পিঠে চাপড় মেরে বলল, 'তোমার মোটরবাইকের হাত ভালো—শিখছও তাড়াতাড়ি। একটা কথা মনে রেখো, জিশান। গেম সিটিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। খুব পাওয়ারফুল ওয়েপন। এটাকে ঠিকঠাক ইউজ করতে পারলে তুমি জিতবে—।'

জিশান প্যাসকোর চোখের দিকে তাকাল। একটা দিনের পরিচয়েই লোকটাকে ওর বন্ধু বলে মনে হল।

•

পরদিন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনেই ঘটনাটা ঘটল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে প্যাসকো আর জিশান ক্যান্টিনে বসে রিল্যাক্স করছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা কনসেনট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছিল। তখনই জিশান গতকালের ট্রেনির ঝাঁকটাকে লক্ষ করল।

আজ ওরা বসেছে জিশানদের টেবিলের একটা টেবিল পরেই—ফলে গতকালের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। সুতরাং ওদের কথাবার্তার টুকরো জিশান আর প্যাসকোর কানে আসছিল। সেই টুকরোগুলোর মধ্যে ওদের নামও শোনা যাচ্ছিল। এ ছাড়া, গতকালের মতোই, ছেলেগুলো বারবার মুখ ফিরিয়ে জিশানদের দিকে দেখছিল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল।

জিশান উশখুশ করছিল। প্যাসকোও জিশানের সঙ্গে মন দিয়ে গল্প করতে পারছিল না—ওর তাল কেটে যাচ্ছিল।

জিশান ভাবছিল যে, উঠে গিয়ে ওদের জিগ্যেস করবে, ব্যাপারটা কী? ঠিক তখনই ওদের দল থেকে লম্বা মতন একটা ছেলে উঠে এল, জিশানদের টেবিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

জিশান বসেই রইল। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছেলেটা কোন গেমের পার্টিসিপ্যান্ট কে জানে! তবে পেটানো চেহারা। রং ময়লা। মুখের পেশি শক্ত। ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফ। গোঁফের দুপাশে ক্যালিপার্স-রেখা। আবছা ভেলভেট দাড়ি। চোখ দুটো টানা-টানা হলেও তাতে অভিসন্ধির ছাপ আছে।

'তুমি তো জিশান—' ছেলেটা প্যান্টের পকেটের কাছটায় হাত ঘষতে-ঘষতে বলল।

জিশান কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, কেন?'

ছেলেটা হাসল : 'আমরা তোমাকে আর ওকে নিয়ে কাল থেকে ডিসকাস করছিলাম...।' প্যাসকোর দিকে আঙুলের ইশারা করল ছেলেটা।

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। প্যাসকো কুতকুতে চোখে ঠান্ডা দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

জিশানদের টেবিল ঘিরে দুটো খালি চেয়ার ছিল। কিন্তু জিশানরা ছেলেটাকে বসতে বলেনি।

তা সত্বেও ছেলেটা হঠাৎ 'বসছি—' বলে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল।

প্যাসকোর ধৈর্য বোধহয় জিশানের চেয়ে কম। ও মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটাকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কী দরকার তাড়াতাড়ি বলো। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাইভেট কথা বলছি...।'

ছেলেটা আবারও হাসল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বন্ধুদের দিকে। ওরা বেশ আগ্রহ নিয়ে জিশানদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটা জিশানের দিকে চোখ ফেরাল। হেসে বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাল থেকে আমরা তোমাদের নিয়ে ডিসকাস করছি...' সরু গোঁফের ওপরে আঙুল বোলাল : 'আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে, তোমাদের দুজনের মধ্যে ফাইট হলে কে জিতবে...।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ও কোনও কথা বলতে পারল না। প্যাসকোর অবস্থাও তাই।

আরও দুজন ট্রেনি ততক্ষণে নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। জিশানদের টেবিলের কাছে এগিয়ে আসছে।

প্যাসকো ছেলেটির দিকে জরিপ নজরে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল, ছেলেটি কোনও নোংরা রসিকতা করতে চাইছে কি না।

জিশান ঠান্ডা গলায় ছেলেটাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ বলো তো?'

ছেলেটার মুখে তখনও হাসিটা লেগে রয়েছে। ও বলল, 'আমরা তোমাদের একটা ফ্রি স্টাইল ফাইট দেখতে চাইছি। আমরা পাঁচজন সে নিয়ে বাজিও ধরতে রাজি। সুপারগেমস কার্পোরেশনের নানান গেমে আমরা বেশ কয়েকটা রাউন্ডে কোয়ালিফাই করেছি। তাতে অনেক টাকাও পেয়েছি। তাই...।'

প্যাসকো সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর ডানহাতটা ছেলেটার দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল, জিশান সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় প্যাসকোর হাত চেপে ধরল। হাতের ওপরে আলতো করে চার আঙুলের চাপড় মেরে ওকে শান্ত হতে ইশারা করল।

বাকি দুজন ট্রেনি এখন ওদের বন্ধুর দুপাশে দাঁড়িয়ে। মুখে কৌতূহল, উত্তেজনা।

প্রথম ছেলেটা দু-বন্ধুর দিকে একে-একে তাকিয়ে ইশারায় বোঝাতে চাইল যে, ব্যাপারটা সে জিশানকে বলেছে।

জিশান বলল, 'যদি ঠিক বুঝে থাকি তা হলে তোমরা চাইছ, আমি আর প্যাসকো ফ্রি স্টাইল ফাইটে মোকাবিলা করি—।'

উত্তরে তিনজনেই বলল, 'ইয়েস! ইয়েস!'

প্রথম ছেলেটা বলল, 'আমরা পাঁচজনে মিলে তোমাদের ভালো টাকার প্রাইজ মানি দেব, জিশান—।'

প্যাসকো চট করে উঠে দাঁড়াল।

জিশানও উঠে দাঁড়াল : 'প্যাসকো, প্লিজ...।' প্যাসকোকে শান্ত হতে ইশারা করল।

জিশান ছেলেটাকে বলল, 'তোমরা একটা ছোট্ট ভুল করছ। আমরা বন্ধু। আর জানোই তো, ফ্রেন্ডস ডোন্ট ফাইট।'

এ-কথায় ছেলেটার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তবে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'জিশান, তুমি কিল গেমে কোয়ালিফাই করেছ বটে, বাট য়ু ডোন্ট লুক সো টাফ। তোমার এই যে বন্ধু—প্যাসকো না কী নাম বললে—ও তোমার চেয়ে অনেক বেশি টাফ...।'

ওদের দলের বাকি দুজনও কখন যেন জিশানদের টেবিলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওদের আর-একজন বলল, 'জিশান, লড়ে যাও! প্যাসকোকে দেখিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে কে বেশি টাফ। কিল গেমে তুমি যখন কোয়ালিফাই করেছ তখন নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে একটা কিলার রয়েছে—।'

বন্ধুর কথার খেই ধরে নিয়ে প্রথম ছেলেটা বলল, 'কাম অন, কিলার, শো আস হু ইজ দ্য বস। কাম অন...।'

ছেলেটা কথাগুলো ইংরেজিতে বললেও তার মধ্যে যে লড়াইয়ের ওসকানি রয়েছে সেটা জিশান ভালোই বুঝতে পারছিল। তা সত্ত্বেও ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'বললাম তো, বন্ধুরা কখনও ক্ষমতা দেখানোর জন্যে লড়াই করে না। অনেক কষ্ট করে একজন ভালো বন্ধু পাওয়া যায়...।'

ওদের মধ্যে একটা ছেলে বেশ মোটাসোটা, পালোয়ান গোছের। তার ঘাড়ে লাল-কালোয় মেশানো উলকি আঁকা। সেই ছেলেটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে কয়েন টস করার ভঙ্গি করে বলল, 'আরে ভাই, ঠিক আছে—আমরা পাঁচজন মিলে ফিফটি থাউজ্যান্ড দেব। ছোট করে একটা ফাইট হয়ে যাক...।'

'রেস্টুরেন্টের বাইরে ওই খোলা জায়গাটায় ফাইটটা হতে পারে—' ওদের মধ্যে উৎসাহী একজন রেস্তোরাঁর বাইরের মাঠটা আঙুল তুলে দেখাল।

প্রথম ছেলেটা জিশান আর প্যাসকোকে হাতের ইশারা করে ডাকল : 'চলো, জিশান—ফাইট গেম শুরু করে দেওয়া যাক।'

যেটা জিশানকে অবাক করছিল সেটা হল, ছেলেগুলো শুধু নিজেদের কথা বলেই যাচ্ছিল—জিশানের কথাকে একফোঁটাও পাত্তা দিচ্ছিল না। ওরা হয়তো ওল্ড সিটি থেকে এসেছে—পুরস্কার জেতার লোভে। কিন্তু এর মধ্যেই নিউ সিটির রীতিনীতির সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেইজন্যই বন্ধুত্বকে টাকা দিয়ে টেক্কা দিতে চাইছে।

'কাম অন, প্যাসকো! কাম অন, জিশান! লেটস গো—।' প্রথম ছেলেটা অধৈর্যভাবে প্যাসকো আর জিশানকে তাড়া লাগাল।

প্যাসকো অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছিল। ওর ভেতরে একটা ভূমিকম্প তৈরি হয়ে সেটা রিখটার স্কেলে ক্রমশ বাড়ছিল।

এবার বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

চোখের পলকে ছেলেটার মাথার চুল বাঁ-হাতে খাবলে ধরল প্যাসকো। এবং ডানহাতে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল গালে।

পাইপগানের গুলি চালানোর মতো তীক্ষ্ণ শব্দ হল। আর শব্দের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে ছেলেটার গালের ক্ষতি হল।

ওর ডান গালটা আড়াই ইঞ্চি লম্বা হয়ে ফেটে গেছে। লালচে গালের ওপরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে-ধীরে।

ওর চারজন সঙ্গী নানারকম চিৎকার করে উঠল। ওদের মধ্যে একজন প্যাসকোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু জিশান কী এক কায়দায় যেন লাথি চালাল। ছেলেটা রেস্তরাঁর মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

বাকি তিনজন বুদ্ধিমান। ওরা প্যাসকো আর জিশানের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল।

প্যাসকো কিন্তু প্রথম ছেলেটার চুলের মুঠি ছাড়েনি—এখনও খামচে ধরে রেখেছে। ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। হাউমাউ করে চিৎকার করছে। অসহায়ভাবে শূন্যে দু-হাত নাড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে, বাতাসে সাঁতার কাটছে।

রেস্তরাঁয় আর যারা ছিল, তারা গোলমাল দেখে চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রেস্তরাঁর ম্যানেজার এবং কর্মীরা একপাশে এসে জড়ো হয়ে গেছে।

জোকারের মতো তিড়িংবিড়িং করা ছেলেটার গালে কয়েকটা আলতো চাপড় মারল প্যাসকো। মুখে 'চুক-চুক' শব্দ করে বলল, 'যা:, পালা। আমাদের দোস্তি বিক্রি নেই। আবার এরকম দুষ্টুমি করলে একেবারে ফারফোর করে দেব...।'

কথা শেষ করে হতভাগা ছেলেটাকে পিছনে ঠেলে দিল প্যাসকো। ছেলেটা উলটো ডিগবাজি খেয়ে ছ'-সাত হাত দূরে পৌঁছে গেল। ওর সঙ্গীসাথীরা ওকে তাড়াতাড়ি আগলে ধরল। সোজা করে দাঁড় করাল। কাটা গালে রুমাল চেপে ওকে মেরামত করতে চেষ্টা করল। তারপর ক্যান্টিনের বাইরে পা বাড়াল। যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে জিশান আর প্যাসকোকে বারবার দেখছিল ওরা।

এত হইচই হুজ্জুতির মধ্যেও রেস্তরাঁর ডেকরেশান বা ফার্নিচারের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্যাসকো হাত-পা নেড়ে ম্যানেজারকে ঘটনাটা সবিস্তারে বলছিল।

জিশান রওনা হওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যানেজারের সঙ্গে প্যাসকোর কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ক্যান্টিনের কাচের দেওয়ালের বাইরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। খুব হালকাভাবে মোটরবাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। দূরে আধোআঁধারির মধ্যে হেডলাইটের ছুটে যাওয়া আলো দেখা যাচ্ছে।

ম্যানেজার চলে যেতেই প্যাসকো জিশানকে বসতে ইশারা করল : 'আর একটু বসে মেজাজ ঠান্ডা করে তারপর যাব। তোমার সঙ্গে কথা আছে—।'

জিশান বসল। প্যাসকো ওর মুখোমুখি বসে পড়ল আবার। দু-হাতের চেটো চামড়ার জ্যাকেটে কয়েকবার ঘষে নিয়ে বলল, 'নিউ সিটিটা একদম গেছে! খুব কম সময়ে একটা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। পলিউশান।'

বেয়ারাকে ইন্ডিকেটর ল্যাম্প জ্বেলে কাছে ডাকল জিশান। দুটো এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

প্যাসকো ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'জিশান, আমি চাই তুমি কিল গেমে জিতে যাও। তা হলে যদি সুপারগেমস কর্পোরেশনকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' সামনে ঝুঁকে এল প্যাসকো। নীচু গলায় বলল, 'কিল গেমের সব পার্টিসিপ্যান্টকেই আমি খুব খেটে মন দিয়ে মোটরবাইক চালাতে শেখাই। এই আশায় যে, ওরা কিল গেমে জিতে যাবে...' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'কিন্তু সেটা হল কই? আমি আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু টিভিতে তোমার অ্যাকশান দেখে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। মনে হল তুমিই পারবে। তুমিই শালা পারবে—।'

বেয়ারা এনার্জি ড্রিঙ্ক সামনে রেখে গেল।

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

প্যাসকো মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদটা নিল। তারপর বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, গেম সিটিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। খুব পাওয়াফুল ওয়েপন। তোমাকে আমি জান দিয়ে শেখাব, জিশান।'

জিশান এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিল। প্যাসকোও।

জিশান হেসে বলল, 'সে তো শেখাবে। তার আগে বলো দেখি, তুমি এরকম সুপার বাইক চালাতে শিখলে কোত্থেকে?'

প্যাসকো ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। বলল, 'ছোটবেলা থেকেই আমি মোটরবাইকের পোকা। কেন জানি না, শালা বাইক ব্যাপারটাই আমাকে টানত। কিন্তু বাইক কেনার পয়সা ছিল না—কোত্থেকে থাকবে! বাপটা চাকরি করত বাড়ির কাছেই—নালাগড় কটন মিলে। আর আমরা চার-চারটে ভাই-বোন। ভাত-রুটি আর আলুসেদ্ধ—এই ছিল বলতে গেলে ডেইলি মেনু।

'আমার মোটরবাইক কেনার পয়সা না থাকলে কী হবে, সুযোগ পেলেই পাড়ার দাদাদের বাইকের পেছনে চড়ে বসতাম। ওদের বাইকগুলো ধোয়া-মোছা করতাম। ওরা আমাকে হাত খরচের পয়সা দিত। তাই দিয়ে সিগারেট-বিড়ি ফুঁকতাম, নেশা করতাম।' একটা বড় শ্বাস ছাড়ল প্যাসকো। ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি। ও এখন ফিরে গেছে জীবনখাতার অতীতের পাতায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্যাসকো বলল, 'জানো, জিশান—আমি গরিব ছিলাম—তবে বেশ ছিলাম। বিনাপয়সায় মোটরবাইক চড়তাম, গলা ছেড়ে গান গাইতাম, আর সকালবেলায় কটনমিলের মাঠে বন্ধুরা মিলে লোহালক্কড় নিয়ে ব্যায়াম করতাম।

'বাইকের দেখভাল করতে-করতে আমি বাইক চালানো শিখে গিয়েছিলাম। নিজের খেয়ালেই বাইক নিয়ে নানান কসরত ট্রাই করতাম। তখন আমার কত আর বয়েস? বড়জোর ষোলো-টোলো হবে। পাড়ার দাদারা আমার বাইক চালানোর তারিফ করত, আর আমি ভেতরে-ভেতরে ফুলে যেতাম।

'ওরা আমাকে একটা বাইক ধরিয়ে দিয়ে নানান ফরমাশ করত : এখান থেকে ওখানে কোনও চিঠি বা প্যাকেট পাঠানো, কাউকে বাস স্ট্যান্ডে কিংবা স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া, মালের বোতল কিনে আনা—আরও কত কী! আমি বাইক চালানোর সুযোগ পেয়ে মনের আনন্দে কাজগুলো করতাম।

'তবে একটা ব্যাপার, জিশান—যতই অভাব থাক, আমি কখনও চুরি করিনি—না বাইকের পার্টস, না বাইকের তেল। শুধু এক বার বাইক চালানোর সুযোগের জন্যে মনটা ছটফট করত।'

'কিন্তু তুমি নিজের মোটরবাইক কিনলে কেমন করে?' জিশান জিগ্যেস করল।

হাসল প্যাসকো : 'সেটা একটা থ্রিলিং ব্যাপার। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে...।'

•

'কীরকম?' কৌতূহলে প্রশ্ন করল জিশান।

'আমাদের এলাকায় অনেক দাদা ছিল। তাদের বেশ কয়েকজনের বাইক ছিল।' টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল প্যাসকো। পুরোনো কথা মনে করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : 'আর...কী বলব তোমায়...বাইকওয়ালা দাদা হলেই আমি যেন তার কেনা গোলাম হয়ে যেতাম। ওই বাইক চালানোর মওকার লোভে আর কী!

'তবে দাদাগুলো সবই দু-নম্বরি লাইনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। বন্ধ কারখানার স্ক্র্যাপ যখন নিলামে উঠত তখন দাদারা সেখানে ডাক চড়াত। সেখান থেকে ভালো নোট আমদানি হত। আমদানির রাতগুলোতে ফুর্তি-ফার্তা হত। ওরা সব বোতলবাজি করত, সঙ্গে কষা মাংস, পরোটা। মদে আমার কোনও টান ছিল না। মদের গন্ধে আমার উলটি আসত। এর আসল কারণ কী জানো?' প্রশ্নটা করে মুখে বিরক্তির 'হুঁ:' শব্দ করল প্যাসকো। তারপর বলল, 'ছোটবেলা থেকে দেখছি আমার বাপটা মাল-টাল টেনে প্রায়ই আমার মা-কে পেটাত। আমার বেচারি মা!...ওই কাণ্ড দেখে ছোটবেলা থেকেই মদের ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। তো দাদারা ওসব খেত, নিজেদের মধ্যে হইচই করত...আর আমি এককোণে বসে কষে কষা মাংস আর পরোটা খেতাম। বাড়িতে তো এসব খাবার কখনও জুটবে না!

'শুধু স্ক্র্যাপের ডাক নয়, আমাদের পাড়ার বেশিরভাগ দাদাই আর-পাঁচটা কর্ডলাইনে লেনদেন করত। যেমন, ছুরি-বাটলি চালাচালি, ফোর শটার, সাদা গুঁড়ো, চরস, গাঁজা—আরও কতরকম জিনিসের কারবার!

এ নিয়ে অন্য এলাকার দাদাদের সঙ্গে দুশমনি ছিল। দু-চারজন মার্ডারও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুরা লাইনে এসব ঝগড়া কাজিয়া তো থাকবেই!

'বুরা লাইনে লেনদেনের কাঁচা পয়সা আমাকে টানেনি। কেন জানো? আমার বাবাটা মাল খেত, মা-কে পেটাত, কিন্তু বহুত সৎ ছিল, খাঁটি মাল ছিল। হেভি বড়-বড় স্বপ্ন দেখত। কিন্তু একটা স্বপ্নও সত্যি হয়নি। লাইফে ফেল মেরে গিয়েছিল। তাই হয়তো নিজের ওপরে খেপে থাকত। সেই খ্যাপা রাগটা আমার বেচারি মায়ের ওপরে ঝাড়ত।

'যাই হোক, আমার অনেক দাদার মধ্যে একজন ছিল রিয়েল দাদা। তার নাম ছিল লালানি। আমরা সবাই লানিদা বলতাম। বড়রা বলত, লানি। লানিদা খুব ডেয়ারডেভিল ছিল। দারুণ মোটরবাইক চালাত। ওকে আমি বাইক চালানোয় আমার গুরু বলে মানতাম।

'লানিদা যেটায় বেশি ইনভলভ ছিল সেটা হল আর্মসের বিজনেস। অনেক সময় সেই বিজনেসের কাজে কারও সঙ্গে ভেট করতে গেলে মোটরবাইকের পেছনে আমাকে বসিয়ে নিত।

'লানিদার অনেক দুশমন ছিল। তাই সবসময় কোমরের পেছনদিকে মেশিন গুঁজে রাখত। ঢোলা জামা পরত—বাইরে ঝুলিয়ে।

'লানিদা আমায় খুব ভালোবাসত। কখনও চাইত না, আমি ওদের মতো খারাপ লাইনে নামি। তাই সবসময় বলত, ''তুই কখনও আমাদের এসব বাজে লাইনে আসবি না। তুই ঠিকঠাক একটা বিজনেস করবি, নয়তো কোনও দোকান বসাবি। আমি তোকে কিছু টাকা দেব—।''

'আমি লানিদাকে বলতাম, আমি মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ করব। এ-কথায় লানিদা হেসে বলত, ''একদম ঠিক বলেছিস। বাইক সারানোর গ্যারেজ। নাম হবে 'প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ'। কী বলিস?''

'আমি হাসতাম। বলতাম, ''তোমার বাইক আমার গ্যারেজে সারাতে দেবে তো লানিদা?''

''দেব না মানে!'' তারপরই লানিদার একগাল হাসি।

'একদিন সন্ধের পর লানিদার সঙ্গে বাইকে বসে বেরোলাম। লানিদা খুব সিগারেট খেত। কিন্তু কখনও সিগারেটের প্যাকেট কিনত না। দুটো করে সিগারেট কিনত। তার মধ্যে একটা ধরাত, আর অন্যটা জামার বুকপকেটে রেখে দিত।

'লানিদার এই হ্যাবিটের কথা সবাই জানত। এটা নিয়ে সিনিয়ার কি জুনিয়ার ইয়ারদোস্তরা লানিদাকে মাঝে-মাঝে চাটত। তো বাইক নিয়ে বেরোলে লানিদার সিগারেট এনে দিতাম আমি। মাঝরাস্তায় কোথাও সিগারেটের তেষ্টা পেলে লানিদা প্রথমে জামার পকেটের ওপরে হাত চাপা দিত। তারপর সিগারেট নেই বুঝলে বাইক থামাত। আমার হাতে পয়সা দিয়ে বলত, ''প্যাসকো, দুটো উইলস ফিলটার।''

'লানিদা কোন সিগারেট খায় আমি ভালো করেই জানতাম। কিন্তু দাদার ওই অভ্যেস—সবসময় ব্র্যান্ডের নামটা বলত।

'সেদিন পাড়া থেকে অনেক দূরের একটা বাস-স্ট্যান্ডের কাছে লানিদা একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লানিদা যখন ফোনে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল তখন কিছু টুকরো কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। তাতে বুঝতে পারছিলাম যে, তিরিশটা ফোর শটার কেনাবেচার ব্যাপারে কথা হচ্ছে।

'বাস-স্ট্যান্ডটা আমি তখন চিনতাম না। পরে জেনেছি ওটা ছিল নাগরা বাস-ট্যান্ড। ওখান থেকে সব দূরপাল্লার বাস ছাড়ে।

'তো বিজনেসের কথাবার্তা বলতে লানিদা বাস-স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটা গলিতে একটা পুরোনো বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আমাকে বাইরে বাইকের কাছে রেখে গেল।

'ঘণ্টাখানেক পর দাদা ফিরে এল। দেখলাম খুব বিরক্ত আর রাগ-রাগ ভাব। বাইকে বসে লানিদা আপনমনেই গজগজ করছিল। তার কিছু-কিছু কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

''আমার সঙ্গে ছকবাজি করলে আমিও ছাড়ব না। আমার ফোর শটারের বিজনেসে যে পা বাড়াবে তার ঠেংরি আমি কেটে নেব।...আমাকে বুরবাক পেয়েছে!''

'আমি পেছনের সিট থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, ''কী হয়েছে, লানিদা? এত খেপে গেছ কেন?''

'''ও কিছু না। ছাড়...।'' বলে বাইকে স্টার্ট দিল।

'বাইক ছুটছিল। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। হাওয়ায় চুল উড়ছে। চারপাশে রাত। বাতাসে কারখানার ধোঁয়ার গন্ধ। ছুটে যাওয়া গাড়ির হর্ন। ঝরঝরে রাস্তায় চাকার শব্দ।

'একটা কালো রঙের বাইক আর একটা সাদা প্রাইভেট মাঝে-মাঝেই আমাদের ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার পিছিয়ে পড়ছিল। বাইকে বসা লোক দুটোর মাথায় হেলমেট।

'বারতিনেক এমনি হওয়ার পর আমার একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু লানিদার মেজাজের অবস্থা দেখে কিছু বলিনি।

'হঠাৎই লানিদা বুক পকেটের ওপরে হাত বোলাল। তারপরই বাইকের স্পিড কমিয়ে রাস্তায় ধারের একটা সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকের দোকানের কাছে বাইক সাইড করল। প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়ে বলল, ''দুটো উইলস ফিল্টার নে—।''

'আমি বাইক থেকে নেমে সিগারেট কিনতে গেলাম। আর ঠিক তখনই কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ কানে এল।

'আমি চমকে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে ফিরে তাকালাম। দেখি লানিদা রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। বাইকটা কাত হয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। ওটার ইঞ্জিন গরগর করছে। আর কালো বাইক আর সাদা গাড়িটা ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে।

'আমি ''লানিদা'' বলে চিৎকার করে উঠলাম। গোল্লায় যাক উইলস ফিল্টার। ছুটে চলে এলাম লানিদার কাছে।

'লানিদার গায়ে অন্তত তিনটে গুলি লেগেছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই লানিদা উঠে বসেছে। ডানহাত পেছনদিকে বাড়িয়ে কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করছে।

'আমি আর দেরি করলাম না। প্রথমে লানিদাকে টেনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। ''লানিদা! লানিদা!'' বলে বারবার ডাকতে লাগলাম। কেন জানি না, আমি লানিদার জন্যে কাঁদতে শুরু করেছিলাম।

'দু-বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে কয়েকবার টানাহ্যাঁচড়া করতেই লানিদা অতিকষ্টে ''উঃ! আঃ!'' করতে-করতে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম, ওর কোমরে আর পাঁজরে রক্ত।

'তাড়াতাড়ি মোটরবাইকটার কাছে গেলাম। ওটাকে খাড়া করে চেপে বসলাম। লানিদাকে বললাম, পেছনের সিটে চড়ে বসতে। বললাম, শক্ত করে আমাকে জাপটে ধরতে।

'ব্যস, বাইক স্টার্ট দিলাম। তখনই দেখলাম, কালো মোটরবাইক আর সাদা গাড়িটা ইউ-টার্ন নিয়ে আমাদের দিকে আবার ফিরে আসছে। তিনটে হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলছে।

'আমার মাথার ভেতরে কে যেন বলে উঠল, ''লানিদাকে বাঁচাতেই হবে।'' আর একইসঙ্গে মোটরবাইক দেবতা আমার মাথার ওপরে সওয়ার হয়ে বসল। আমি বাইক ছুটিয়ে দিলাম। আমার দিকে তেড়ে আসা গাড়ি আর বাইকের দিকে। কারণ, ওটাই আমাদের এলাকায় ফেরার পথ। তা ছাড়া তখন ইউ-টার্ন নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় এক সেকেন্ড বাড়তি সময়ও আমার কাছে মারাত্মক জরুরি।

'যে-আঁকাবাঁকা রেখায় আমার বাইক ছুটাছিল তাতে সাপের চলার ঢঙও লজ্জা পেয়ে যাবে।

'রাস্তার পাশের পাথর, গর্ত, ঢিবি এসবের ওপর দিয়ে আমি বাইক চালাচ্ছিলাম। কারণ, মনে হচ্ছিল, এতে আমার বাইক এলোমেলোভাবে লাফাবে, ডানদিকে বাঁ-দিকে ছিটকে যাবে। তাতে ওদের ফায়ারিং-এর নিশানা ফসকে যাবে।

'ঠিক তাই হল। আমাদের লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাতে লাগল। বাইকে বসা লোকদুটো ফায়ার করতে লাগল। আর গাড়ির ভেতরে বসা দুজন জানলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে মেশিনের ঘোড়া টিপতে লাগল।

'গুলির ঘন-ঘন আওয়াজে চারপাশটা কেঁপে উঠল বারবার। আমি সবকিছু ভুলে বডিটাকে বাইকের হাতলের গায়ে প্রায় সেঁটে দিয়ে পাগলের মতো বাইক ছোটাতে লাগলাম। হঠাৎই মনে হল আমার ডান পায়ে একটা গরম ছ্যাঁকা লাগল। জায়গাটা জ্বলতে লাগল। কিন্তু তখন আর পরীক্ষা করে দেখার মতো পরিস্থিতি নেই। শুধু জানি, আমাকে বাইক ছুটিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে।

'আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পর আমাদের এলাকায় বাইক ঢোকাতে পেরেছিলাম। অন্য দাদারা আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এসে ঘিরে ধরল। তখনই জানা গেল, লানিদা অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

জিশান মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্যাসকোর কাহিনি শুনছিল। আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিনের সেই সতেরো বছরের কিশোরকে খুঁজছিল।

প্যাসকো যে শক্তিশালী সেটা ওকে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু ওর মধ্যে যে সততা আর অন্য গুণগুলো রয়েছে সেগুলোও জিশান এখন দেখতে পাচ্ছিল।

ও যেন নেশার ঘোরে জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

'তারপরই তো আসল ব্যাপার—' হাসল প্যাসকো। জ্যাকেটে হাত ঘষল কয়েকবার। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'প্রায় একমাস ধরে হাসপাতাল নার্সিংহোম করে লানিদা সেরে উঠল। ওর বডিতে তিনটে গুলি লেগেছিল। আর আমার পায়ে একটা। আমার সেরকম কোনও চোট লাগেনি—শুধু চামড়া আর মাংস ছিঁড়ে গিয়েছিল। সাত-দশ দিনের মধ্যেই আমার পা ঠিক হয়ে গেল। শুধু একটা দাগ থেকে গেল।

'হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। লানিদা সেরে ওঠার পর ওর বাইকটা আমাকে গিফট করে দিল। আমি আমার জীবনে প্রথমে মোটরবাইকের মালিক হলাম। সব দাদাদের সামনে লানিদা বলেছিল, ''প্যাসকো সেদিন আমার জন্যে যা করেছে সে শালা শোধ হওয়ার নয়। ওকে দেখলেই সবসময় আমার মনে পড়বে, আমি ওর জন্যে বেঁচে আছি।''

'জিশান, এই হল আমার মোটরবাইক কেনার কাহিনি। লানিদা আমার একটা স্বপ্নকে সত্যি করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, লানিদা আমাকে চল্লিশ হাজার টাকাও দিয়েছিল—মোটরবাইকের গ্যারেজ খোলার জন্যে। আমি পাড়ার মধ্যেই একটা জায়গা খুঁজে বের করে ভাড়া নিয়েছিলাম। তারপর সেখানে সত্যি-সত্যি একটা মোটরবাইক সারাইয়ের গ্যারেজ খুলেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম ''প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ''।

'কিন্তু সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কী হয়েছিল জানো? যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?'

'কী?'

'ওই অ্যাকশানের পর লানিদা খারাপ লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। থানকাপড়ের ব্যাবসা স্টার্ট করেছিল। ব্যাবসা ওপেনিং-এর দিন লানিদা সবাইকে কবজি ডুবিয়ে খাইয়েছিল।'

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে-মনে ভাবছিল, মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ খুলে একটা ইয়াং ছেলে দিব্যি করে খাচ্ছিল। দশ-বারো বছর পর সে হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন ফ্ল্যাশ করে উঠল। গুনাজি ফোন করছে। দেরি হচ্ছে বলে ও চিন্তায় পড়ে গেছে।

জিশান ফোন ধরে ওকে বলল যে, আর দশ মিনিট—তার মধ্যেই ও 'ভিজিটরস ওয়েটিং জোন'-এ গুনাজির কাছে পৌঁছে যাবে।

ক্যান্টিনের বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ক্যান্টিনের লোকজনও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্যাসকো উঠে দাঁড়াল : 'চলো, জিশান—লেটস গো...।'

জিশানও উঠে দাঁড়াল। ক্যান্টিন থেকে বেরোতে-বেরোতে বলল, ' ''প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ'' তো ঠিকঠাকই চলছিল। তা হলে তার মালিক দশ-বারো বছর পর হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?'

বেশ জোরে হেসে উঠল প্যাসকো। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল 'জিশান, ওই ওয়ার্কশপের মালিকটা ছাব্বিশ বছর বয়েসে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল—সংসারী হল—তোমার মতো...।'

'তারপর?'

'হুঁ:।' আক্ষেপের একটা শব্দ করল প্যাসকো। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে তখন কয়েকটা তারা ফুটছে। ওই তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও কী খুঁজল কে জানে! তারপর আলতো গলায় ধীরে-ধীরে বলল, 'তারপর...তারপর...বিয়ে করার বছরখানেক পর...ওই লোকটার জীবনে একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। সব...কেমন যেন...পালটে গেল।'

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপ করে রইল।

প্যাসকো পায়ে চলা পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল তোমাকে সব বলব। আজ, এখন, বলতে গেলে ভীষণ কষ্ট হবে—বিশ্বাস করো...।'

কোনও কথা না বলে জিশান প্যাসকোর হাত ধরল। আলতো করে চাপ দিয়ে বোঝাল, ও বিশ্বাস করেছে।

•

আমার প্যাসকো ওয়ার্কশপ ভালোই চলছিল। আর কাজে-অকাজে বাইক চালানোর সুযোগও মিলছিল প্রচুর। কাজ নিয়ে আমি বেশ খুশি ছিলাম। পাশাপাশি ব্যায়াম-ট্যায়ামও চলছিল।

আমরা বন্ধুরা মিলে প্লেট টিভিতে নিউ সিটির মারকাটারি খেলাগুলোর লাইভ টেলিকাস্ট দেখতাম। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বাজিও ধরতাম।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর আমাকে ট্যাটুর নেশা পেয়ে বসল। সেই শখে হাতে-গায়ে নানান রঙের উল্কি আঁকলাম। দু-হাতে উল্কি আঁকা অবস্থায় যখন স্লিভলেস জ্যাকেট পরে বাইক চালাতাম তখন নিজেকে বেশ একজন কেউকেটা বলে মনে হত।

আমার বন্ধুদের আরও অনেকে হাতে-পায়ে-বুকে-পিঠে উল্কি আঁকিয়েছিল। তাদের কেউ-কেউ আবার মোটরবাইকও চালাত। আমরা বন্ধুরা যখন চার-পাঁচজন মিলে বাইক নিয়ে বেরোতাম তখন ওল্ড সিটির লোকরা আমাদের দেখে ভয় পেত। ভাবত আমরা 'মোটরবাইক গ্যাং'।

কিন্তু কেন সেটা ভাবত আমি জানি না। কারণ, মোটরবাইক গ্যাংগুলোর দু-একটা বাইকে একটা করে প্ল্যাকার্ড থাকত। সেই প্ল্যাকার্ডে গ্যাং-এর নাম কিংবা লোগো আঁকা থাকত—কিংবা দুটোই। আমার মনে হয়, তুমিও এটা দেখেছ। তো আমাদের দলের কারও বাইকে সেরকম কোনও লোগো আঁকা প্ল্যাকার্ড ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও অনেকে ভুল বুঝত।

তুমি তো জানো, জিশান, ওল্ড সিটির নানা জায়গায় এরকম মোটরবাইক গ্যাং ঘুরে বেড়ায়। তারা পারে না এমন কোনও খারাপ কাজ নেই। লুঠপাট, ডাকাতি, ছিনতাই, রেপ, মার্ডার—এদের কাছে এসব নেহাতই মামুলি ব্যাপার। ওরা সাংঘাতিক বেপরোয়া, কাউকে ভয় পায় না। খোলা রাস্তায় দিনদুপুরেও ওদের নৃশংস তাণ্ডব চলে।

এই ধরনের খতরনাক গ্যাং-কে সবাই এড়িয়ে চলে। তাই আমরাও এড়িয়ে চলতাম।

আমার বিয়ের প্রায় মাস ছয়েক পর একবার আমরা চারজন দোস্ত একটা মোটরবাইক গ্যাং-এর মুখোমুখি পড়ে যাই। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরেই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। সোজা রাস্তায় থাকলে আমাদের এই প্রবলেমটা হত না। দূর থেকে ওদের দেখামাত্রই আমরা চারজন বাইক ঘুরিয়ে সরে পড়তে পারতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হল না। আমরা মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

গ্যাংটাতে প্রায় আট-দশজন ছিল। তাদের নানারকম বাইক, নানারকম চেহারা। তার মধ্যে তিনটে বাইকের সামনে প্ল্যাকার্ড লাগানো ছিল। প্রায় দেড়ফুট লম্বা স্টিলের রডের মাথায় একটা ছ'ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি

চৌকো মেটাল প্লেট। তার ওপরে লাল রঙের একটা মড়ার খুলি আঁকা। তার নীচে ইংরেজিতে লেখা 'HELL'

আমাদের চারজনকে দেখেই দলটা বাইক থামাল—কিন্তু ইঞ্জিন থামাল না। ওদের ইঞ্জিনগুলো গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। যেন অনেকগুলো বাঘ গজরাচ্ছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুকের ভেতরে একটা ঠান্ডা স্রোত টের পেলাম।

•

ওদের দলের যে-লোকটা সবার সামনে বাইক এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার চেহারা চোখে পড়ার মতন।

লোকটা যে লম্বা সেটা বোঝা যায় ওর পা দেখে। বাইকের ওপরে বসেও ও অনায়াসে দুটো পা পৌঁছে দিয়েছে মাটিতে—যেন খাটো টুল কিংবা মোড়ায় বসে আছে।

লোকটার মাথায় কদমছাঁট চুল। ধবধবে ফরসা মুখে এককণাও গোঁফ-দাড়ি কিংবা ভুরু নেই। সারা মুখটা মসৃণ, তেলতেলে, সাদা—বেগুনের পোকার মতো। ঠোঁটের জায়গায় একটা চেরা দাগ। গায়ে লাল টি-শার্ট—তাতে এলোমেলো কালচে ছোপ। তারই মাঝে ইংরেজিতে '১৩' লেখা। পায়ে শতচ্ছিন্ন ব্লু জিনস আর কালো স্নিকার। ডান পায়ের জুতোর ওপরে মলের মতো একটা স্টেইনলেস স্টিলের বালা।

লোকটির গলায় কালো সুতোয় গাঁথা নখ আর হাড়ের টুকরোর মালা। অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আদতে সেগুলো নকল, প্লাস্টিকের তৈরি হলেও হতে পারে। দুটো মালার মধ্যে একটা মালায় লকেট লাগানো—স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি একটা মড়ার মাথা।

লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও-ই হচ্ছে 'হেল' গ্যাঙের লিডার।

লিডারের বাইক ঘা খাওয়া জন্তুর মতো গোঁ-গোঁ করছিল। আর থেকে-থেকেই ও বাইকের সামনের চাকাটা শূন্যে তুলে দিচ্ছিল—ছটফটে তেজি ঘোড়া যেমন মাঝে-মাঝে সামনের পা দুটো শূন্যে ছুড়ে দেয়।

'হেল' গ্যাঙের অন্য বাইকগুলোও গোঁ-গোঁ করছিল। ওদের সবক'টা বাইকের একঘেয়ে আওয়াজে আমার বিরক্ত লাগছিল। মনে-মনে চাইছিলাম, আমাদের মতো ওরাও নিজেদের বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে দিক। তারপর আমাদের কিছু বলার থাকলে বলুক। এবং বলার কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাই যার-যার পথে চলে যাক।

ওদের একজন বোধহয় লিডারকে লক্ষ্য করেই বলল, 'থার্টিন, এখন কী করব?'

বুঝলাম, লিডারটার নাম 'থার্টিন'। সেইজন্যেই ওর ময়লা ছোপ লাগা টি-শার্টে '13' লেখা।

থার্টিন ছোট করে ডানদিক-বাঁ-দিক মাথা নাড়ল। আমি ভাবলাম বোধহয় মাথা নেড়ে 'না' বলছে কাউকে—কিংবা হয়তো আমাকেই। কিন্তু একটু পরে বুঝলাম, না, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াটা ওর মুদ্রাদোষ।

আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল থার্টিন। ওর ছোট-ছোট চোখ অনেকটা সাপের চোখের মতো লাগছিল।

তারপর থেমে-থেমে জিগ্যেস করল, 'তোমরা কোন গ্যাং?'

আমি বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'আমরা কোনও গ্যাং নই। আমরা চারজন বন্ধু। আমরা এমনি বাইক নিয়ে বেরোই...।'

বিকট শব্দ করে রাস্তায় থুতু ফেলল থার্টিন। বাইকের ইঞ্জিন অফ করে বাইক থেকে নেমে পড়ল। ওটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এবার ঠিকঠাক বোঝা গেল ও কতটা লম্বা এবং চওড়া।

নিজের বুকে হাত ঘষল থার্টিন। ওর ডান হাতের আঙুলে তিনটে মেটালের আংটি চোখে পড়ল।

কয়েকটা পা ফেলে ও আমার বাইকের কাছে এগিয়ে এল।

আমি বাইকে বসেই ছিলাম—বাইক ছেড়ে নামিনি।

ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থার্টিন বলল, 'গ্যাং তৈরি করেছ, কোনও নেমপ্লেট লাগাওনি।'

আমি কোনও ঝগড়াঝাঁটি কিংবা মারপিট চাইছিলাম না। আর সেরকম কিছু হলে আমরা পেরেও উঠতাম না। কারণ, আমরা চারজন আর ওরা ন'জন। তা ছাড়া, এই মোটরবাইক গ্যাংগুলোর সঙ্গে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র থাকে। তাই ওদের বাইকের কেরিয়ার কখনও খালি থাকে না। উলটোদিকে আমরা নেহাতই নিরস্ত্র নিরীহ পাবলিক। হিসেবমতো হেল গ্যাং-কে আমাদের ভয় পাওয়ার কথা।

কিন্তু আমি মোটেই ভয় পাইনি। আমার বাকি তিন বন্ধুও তাই। আমরা বাইক চালানোর আনন্দে, পথে ঘুরে বেড়ানোর খুশিতে, ঘুরে বেড়াই। এটাই আমাদের স্বাধীন পাগলামো।

যে-মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল ওর নাম ছিল মেহেন্দি। আমি ওকে 'মাহি' বলে ডাকতাম। ওকে যখন বিয়ে করি তখন কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে কখনও আড়ি করব না। আর ও যদি কখনও কোনও কারণে আমার সঙ্গে আড়ি করে, তা হলে আমি জোর করে ভাব করে নেব।

আমার বাইকের নেশার কথা মাহি ভালো করেই জানত। তাই বিয়ের পরেও আমার এই স্বাধীন পাগলামোয় কখনও ও বাধা দেয়নি। তবে সবসময় বলত, রাস্তাঘাটে ঝামেলা মারপিট এড়িয়ে চলতে। তা না হলে ও আমার সঙ্গে আড়ি করে দেবে।

হেল গ্যাঙের লিডারের সঙ্গে কথা বলার সময় মাহির কথা আমার মনে ছিল। তাই খুব শান্তভাবে জবাব দিলাম, 'বললাম যে, আমরা কোনও গ্যাং নই। তাই আমাদের কোনও নাম নেই। কোনও নেমপ্লেট নেই...।'

আমার কথা শুনে থার্টিনের ঠোঁটের চেরা দাগটা একটু চওড়া হল। নাকের দুপাশে দুটো ভাঁজ পড়ল। তার মানে থার্টিন হাসছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'স-সালা ডরপোক!'

ওর গলার আওয়াজটা কেমন যেন চাপা ফ্যাঁসফেসে।

উত্তরে আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। একটা কথা যদি সত্যি হয় তা হলে যে সেটা অনেকবার বলতে হবে, এমনটা আমার জানা ছিল না। তাই চুপ করে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার তিন বন্ধুও চুপ করে রইল।

সময়টা বিকেল। রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে। গাড়ি, সাইকেল, বাস, সাইকেল ভ্যান ব্যস্তভাবে ছুটে যাচ্ছে। যদিও রাস্তার করুণ অবস্থার জন্য 'ছুটে' যাওয়াটা অনেকটা 'হেঁটে' যাওয়ার মতো দেখাচ্ছে। কোনও গাড়ি জোরে ছোটার চেষ্টা করলে তাকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাশুল গুনতে হচ্ছে।

রাস্তায় এতগুলো বাইক জড়ো হয়ে যাওয়ায় বেশ ভিড় জমে গেছে। কিন্তু ভিড়ের লোকজন মোটরবাইক গ্যাংদের ভালো করে চেনে। তাই ওরা একটা ভয়-পাওয়া দূরত্ব বজায় রেখেছে।

জায়গাটা যানজটের চেহারা নিয়েছিল। বেশ কয়েকটা গাড়ি আর বাস অধৈর্য হয়ে হর্ন বাজাচ্ছিল। কোনও-কোনও গাড়ি ফাঁকফোকর দিয়ে পথ তৈরি করে জটলাটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাদের চারপাশে জমায়েত হওয়া লোকজনের বেশিরভাগই ভিখিরি কিংবা ঝুপড়িবাসী। অন্তত তাদের পোশাকআশাক দেখে তাই মনে হল। তুমি তো জানো, জিশান, শতচ্ছিন্ন শহরটায় এরকম বাসিন্দাই বেশি। হয়তো আমিও তার মধ্যেই পড়ি।

জটলার বৃত্তে একটা ইয়াং মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফরসা, ছিপছিপে। পরনে হলদে আর বাদামি রঙের নকশা কাটা চুড়িদার। সঙ্গে একজন ছেলে-বন্ধু।

ছেলেটার চুল জেল মাখিয়ে এমনভাবে সেট করা যে, প্লাস্টিকের নকল চুল বলে মনে হচ্ছে। গায়ে একটা কালো টি-শার্ট আর ব্লু জিনস।

হেল গ্যাঙের সবচেয়ে পেছনে থাকা লোকটা হঠাৎই ওর বাইকটা নিয়ে মেয়েটাকে তাক করে তেড়ে গেল।

মেয়েটা চমকে লাফিয়ে সরে যেতে চাইল। সরে ও গেল বটে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সরতে গিয়ে রাস্তায় পড়েও গেল।

মেয়েটার করুণ অবস্থা দেখে হেল গ্যাঙের চার-পাঁচজন হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতেই লাগল। ইঞ্জিনের গরগর ছাপিয়ে ওদের হাসির হররা চলতে লাগল।

আমি ওদের কদাকার বিচিত্র চেহারাগুলো দেখছিলাম। কারও মাথা ন্যাড়া, কারও মাথায় খাবলা-খাবলা চুল। ভুরুতে, কানে, চোখের নীচে সোনার আংটা লাগানো। ঘাড়ে, গলায়, হাতে নানান উলকি আঁকা। তার মধ্যে একজনের গলায় আবার একটা খয়েরি রঙের সরু সাপ জড়ানো।

যে-লোকটা বাইক নিয়ে অসভ্যতা করেছিল সে বাইকের ওপরে প্রায় শুয়ে পড়ে ঝুঁকে ওর লোমশ হাত বাড়াল মেয়েটার দিকে। হাসতে-হাসতে বলল, 'এসো, হাত ধরো, সোনামণি...।'

মেয়েটার ছেলে-বন্ধু কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেনি। মেয়েটাকে তোলার জন্যে ও উদ্যোগ নিয়েছিল। বাইক গ্যাঙের নোংরা লোকটাকে ওর বান্ধবীর দিকে হাত বাড়াতে দেখে ও খেপে গেল। একটা গালাগাল দিয়ে লোমশ হাতটাকে ও এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি ঘটনাগুলো ঘটে গেল।

লোমশ হাতের মালিক এক ছোবলে ছেলেটার চুলের মুঠি চেপে ধরল। তারপর বাইক চালিয়ে দিল।

বাইকের গর্জন, ছেলেটার চিৎকার সবার কানে তালা ধরিয়ে দিল। মেয়েটাও কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছিল। কিন্তু আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে কোনও হেলদোল ছিল না। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিল।

একটা বাইক-গুন্ডা বাইক নিয়ে মেয়েটার দিকে তেড়ে গেল। মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বোধহয় পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

এদিকে ছেলেটার বডি রাস্তায় ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। কখনও-কখনও গরম সাইলেন্সার পাইপ ওর গায়ে ঠেকে যাচ্ছিল। তাই ওর যন্ত্রণার চিৎকার কিছুতেই থামছিল না।

এতসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করল। পেছন থেকে এত চিৎকার, চেঁচামেচি, হইচই শোনা গেলেও থার্টিন একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি—ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার গোটা শরীরটা জ্বালা করছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম। গায়ের চামড়া যতটা মোটা হলে এসব নোংরা ঘটনা চোখের সামনে দেখেও দিব্যি নির্বিকার থাকা যায়, আমার চামড়া ততটা মোটা নয়।

আচ্ছা, মেহেন্দি যদি এখানে হাজির থাকত তা হলে কী হত?

কী হত আমি জানি। কোনও বিপদ-আপদ কিংবা ভয়ের তোয়াক্কা না করে ও মেয়েটাকে বাঁচাতে দস্যুগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

থার্টিনের সাদাটে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মাথার ভেতরে একটা সুইচ হঠাৎই অন হয়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেল।

আমি বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ-গিয়ার দিকে যন্ত্রটাকে ছুটিয়ে দিলাম।

এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে, থার্টিন থতমত খেয়ে গেল। আমার এই বোকা-বোকা সাহস আর আস্পর্ধার জন্যে ও মোটেই তৈরি ছিল না।

আমার বাইক ছুটে গিয়ে যে ওর তলপেটে আঘাত করল শুধু তাই নয়, বাইকের গতি আর সংঘাত ওর লম্বা শরীরটাকে উঠিয়ে দিল আমার বাইকের হাতলের ওপরে।

সেই অবস্থাতেই আমি জোরে বাইক চালিয়ে দিলাম। থার্টিনের মুখ দিয়ে এককণা শব্দও বেরোল না। নিজেকে বাঁচাতে ও একহাতে বাইকের হাতল আঁকড়ে ধরল, আর-এক হাতে আমার শরীর আর পোশাক খামচে ধরতে চাইল।

জনতার মুখ থেকে তুমুল হইচই শোনা গেল। থার্টিনের দলের অন্য বাইক-গুন্ডাগুলো চুপচাপ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যে-বাইক-গুন্ডাটা নিরীহ ছেলেটাকে চুলের মুঠি ধরে ঘোরাচ্ছিল, সে সর্দারের এই অবস্থা দেখে বাইক থামিয়ে ফেলেছে এবং ছেলেটাকেও ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমি ছাড়িনি। থার্টিনকে বাইকে চাগিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলেছি। ওদের সবার চোখের সামনে—রাস্তার এদিক থেকে সেদিকে।

প্রায় কয়েক মিনিট এরকম চলার পর আমি বন্ধুদের বাইকের কাছে এসে আচমকা ব্রেক কষলাম। থার্টিনের বডিটা সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

তখনই আমার প্রথম মনে হল, এ আমি কী করলাম। আবেগের মাথায় সাহস দেখাতে গিয়ে আমি বোধহয় নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে বসে আছি।

একটু পরে বুঝলাম, মৃত্যু পরোয়ানা নয়, অর্ধ-মৃত্যু পরোয়ানা।

থার্টিন আর তার আট সঙ্গী মিলে আমাদের চারজনকে প্রচণ্ড মারধোর করল। ওদের সঙ্গে লোহার রড আর স্টিলের পাঞ্চ ছিল। সেই অস্ত্রগুলো ওরা আমাদের ওপরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করল। নেহাতই দয়া করে ছুরি-টুরি কিংবা রিভলভার ব্যবহার করেনি।

আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, আমার এক বন্ধু জনার্দনও সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ফেলে রেখে হেল গ্যাঙের গুন্ডাগুলো চলে যাওয়ার পর পাবলিক আমাদের হেলপ করার জন্যে হাত বাড়ায়। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করে ওরা আমাদের পাড়ায় পৌঁছে দেয়।

থার্টিনদের রোষে পড়ে আমাদের বাইকগুলোও অল্পবিস্তর ড্যামেজ হয়েছিল। সেগুলো সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে পাড়ায় নিয়ে আসতে হয়।



না, জিশান, এভাবে মারধোর খেয়ে আমরা কিন্তু ভেঙে পড়িনি। বরং আমার মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল। অবশ্য স্বপ্ন না বলে সেটাকে দু:স্বপ্নও বলা যায়।

ঠিক করলাম, আমরা বন্ধুরা মিলে একটা মোটরবাইক গ্যাং তৈরি করব। তার নাম হবে 'অ্যান্টি-মোটরবাইক গ্যাং'—সংক্ষেপে এ-এম জি। আমাদের গ্যাঙের কাজ তো তার নামেই স্পষ্ট! অর্থাৎ, আমাদের

কাজ হবে মোটরবাইক গ্যাঙের গুন্ডাগর্দি রুখে দেওয়া, ওদের টরচার আর ক্রাইমের হাত থেকে ওল্ড সিটির মানুষকে বাঁচানো।

আমরা প্রায় ছ'মাস সময় নিলাম। ওই সময়ে নিজেরা তৈরি হলাম। কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করলাম। আরও চারজন বন্ধু দলে জুটে গেল। সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, আমাদের এ-এম-জি দলের লক্ষ্য কী। কী হতে পারে তার ম্যানিফেস্টো।

এ-শহরের নানান জায়গায় আমরা টহল দিয়ে বেড়াব। কোনও মোটবাইক গ্যাংকে ক্রাইম করতে দেখলে আমরা রুখে দাঁড়াব, বাধা দেব। এ-কাজে অতি অবশ্যই আমরা পাবলিকের সাপোর্ট পাব।

প্রথমে আমরা প্রচুর ঘোরাঘুরি করে শহরের মোটরবাইক গ্যাংগুলোকে চিনে নিলাম। মোটরবাইক গ্যাঙের কোনও ক্রাইমের খবর পেলেই সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তথ্য জোগাড় করতে লাগলাম। এইভাবে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর আমরা তৈরি হয়ে রাস্তায় নামলাম।

না, আমাদের কোনও নেমপ্লেট ছিল না। তবে আমাদের আটজনের পোশাক ছিল একইরকম—সবুজ টি-শার্ট, আর কালো প্যান্ট।

আমরা সপ্তাহে দু-তিনদিন রাস্তায় টহল দিতে বেরোতাম। আমাদের টহলের নির্দিষ্ট কোনও রুট ছিল না, সময়ের নিয়ম ছিল না কোনও। আমরা আটজন যখন একসঙ্গে সময় মেলাতে পারতাম, তখনই আমরা নজরদারিতে বেরোতাম।

মেহেন্দি আমাকে এ-কাজে ভীষণ সাপোর্ট দিয়েছিল। থার্টিনদের সঙ্গে অ্যাকশনের পর যখন বাড়ি ফিরেছিলাম তখন আমার অবস্থা দেখে মাহি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সেরে ওঠার পর ও বলেছিল, 'তুমি প্রোটেস্ট করে ঠিক করেছ। প্রোটেস্ট করার লোকজন তো দিন-কে-দিন কমে যাচ্ছে...।'

মাহির কাছ থেকে আর পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে ব্যাপারটা নিয়ে এত সাপোর্ট পেলাম যে, আমাদের আটজনের কেউই পেছিয়ে আসার কথা আর ভাবল না। সুতরাং ছ'টা মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর এ-এম-জি মাঠে নামল। আমার 'প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ' যেমন চলতে লাগল, তার পাশাপাশি এটাও। আমরা আটজন সব লোকজনকে জানান দিয়ে সবুজ 'জার্সি' পরে অপারেশানে বেরিয়ে পড়তে লাগলাম। কখনও সকালবেলা, কখনও দুপুরে, কিংবা বিকেল, সন্ধে, অথবা রাতে।

এইরকমভাবে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় দু-মাস পর থার্টিনদের সঙ্গে আমাদের দেখা হল।

সময় তখন সকাল সাতটা। ওল্ড সিটি থেকে বাইরে চলে যাওয়ার যে-তিনটে ইন্টারসিটি রাস্তা আছে তার দু-নম্বর সড়কটায় আমরা টহল দিচ্ছিলাম।

এর প্রথম কারণ দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়েটার একটু বেশি বদনাম আছে। এই রাস্তাটায় খুন-জখম-রাহাজানির মাত্রাটা বড্ড বেশি। আর সবক্ষেত্রেই ক্রিমিনাল হচ্ছে কোনও-না-কোনও মোটরবাইক গ্যাং।

দু-নম্বর সড়কটা যে মোটরবাইক গ্যাংদের বেশি পছন্দ, তার কারণ আছে। সেটা হল, সড়কটার একদিকে ঘন জঙ্গল, আর অন্যদিকে নদী। এতে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ারও যেমন সুবিধে, তেমনই লাশ লোপাট করতেও ঝামেলা কম। অনেক সময়েই দেখা যায় নীচে, নদীর খাতে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি উলটে পড়ে আছে।

দু-নম্বর সড়কটা যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম, তার আরও একটা কারণ ছিল। সেটা হল, গত একমাসে এই রাস্তায় মোটরবাইক গ্যাংরা সাত-সাতটা ভয়ংকর ক্রাইম ঘটিয়েছে। তার মধ্যে চারটে হয়েছে ভোরের দিকে—ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তা ছাড়া সেদিন সকালে রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, একটা মোটরবাইক গ্যাং ভোরবেলার দিকে দু-নম্বর ইন্টারসিটির দিকে গেছে।

দু-নম্বর সড়কে ঢুকেই চোখে পড়ল কতকগুলো রং-চটা হোর্ডিং। তাতে সাবধানে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সতর্কতার কথা লেখা রয়েছে। আর জ্ঞানসূচক বাণীমালার একেবারে নীচে বড়-বড় হরফে

লেখা : গাড়িকে অবশ্যই মানুষ মারার অস্ত্র ভাববেন। বাক্যটির শেষে নিশ্চয়ই 'না' কথাটা লেখা ছিল, কিন্তু রং চটে যাওয়ায় সেই গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

একটা সুদীর্ঘ ময়াল সাপের মতো হাইওয়েটা শুয়ে আছে। তার জায়গায়-জায়গায় ছোট-বড় ক্ষতচিহ্নগুলো ময়াল সাপের গায়ের নকশা।

বাঁ-দিকে তাকালে চোখে পড়ে সূর্য। সেই আলো নদীতে পড়েছে, রাস্তায় এসে পড়েছে। ডানদিকে চোখ ফেরালে ঘন জঙ্গল। মনে হচ্ছে, গাছপালাগুলো হেঁটে এগোতে গিয়ে রাস্তাটাকে সামনে পেয়ে বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। নইলে ওরা হেঁটে-হেঁটে নদীর ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াত।

হাইওয়ের পাশে কোথাও-কোথাও বিকল ট্রাক দাঁড়িয়ে। আবার কখনও চোখে পড়ছে অ্যাক্সিডেন্টে বেঁকেচুরে তুবড়ে যাওয়া গাড়ি। এ ছাড়া রয়েছে পরিত্যক্ত কয়েকটা টিনের চালাঘর—হয়তো কোনওকালে দোকান-টোকান ছিল।

রাস্তা ধরে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর দূরে একটা নীল রঙের গাড়ি চোখে পড়ল।

হাইওয়েতে গাড়ি চোখে পড়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে, মাটির ঢালের ওপরে। যে-ঢালটা জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

গাড়িটাকে ঘিরে কয়েকটা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কয়েকটা বাইক গাড়িটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আহত শিকারকে ঘিরে চিতাবাঘ যেমন ঘুরপাক খায়।

আমি হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করলাম। তারপর আমরা বাইক সাইড করে ঢাল বেয়ে নামিয়ে দিলাম। জঙ্গল ঘেঁষে যন্ত্রগুলো দাঁড় করালাম।

•

গাছের আড়াল থেকে আমরা ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম নীল গাড়িটাকে ঘিরে কোন কর্মকাণ্ড চলছে।

শুধু তাই নয়। বিরাট লম্বা আর চওড়া একটি লোককে চোখে পড়ল। গাড়ির বেশ কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় কদমছাঁট চুল। গায়ে লাল টি-শার্ট—তার ওপরে এলোমেলো কালচে ছোপ।

লোকটাকে আমি অল্পবিস্তর আঁচ করতে পারছিলাম। আর ঠিক তখনই 'হেল' গ্যাঙের সাইনবোর্ডটা আমার চোখে পড়ল।

থার্টিন আর তার দলবল দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়ের ওপরে শিকার ধরেছে।

চাপা গলায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিলাম।

আমরা আটজন বাইক নিয়ে থার্টিনদের ওপরে ঝোড়ো বাতাসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ব। ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেব। আর বাইক থেকে কিছুতেই যেন আমরা না নামি—বা পড়ে না যাই। কারণ, আমাদের সঙ্গে কোনওও অস্ত্রশস্ত্র নেই—গতিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।

আমাদের আটটা বাইক প্রায় একইসঙ্গে স্টার্ট নিল। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে উঠে এল হাইওয়ের ওপরে। তারপর 'অকুস্থল' লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল।

হাই এনার্জি সাইক্লোনের মতো আমাদের আটটা বাইক চোখের পলকে থার্টিনের দলের ওপরে আছড়ে পড়ল। ওদের মধ্যে একজন একটা মোটা নলের শটগান বের করে ফায়ার করল। আমার দলের একজন 'ও : !' আর্তনাদ করে চলন্ত বাইক থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ওর বাইকটা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে নীল গাড়িটার বাঁ-দিকের হেডলাইটের কাছে ধাক্কা খেল। লাফিয়ে দুবার পালটি খেয়ে থার্টিনের দলের একটা বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাল। তারপর দুটো বাইক লাট খেয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে পড়ে গেল।

নীল গাড়িটাকে ঘিরে একটা ডামাডোল শুরু হয়ে গেল। বাইকের গোঁ-গোঁ শব্দে সকালবেলার বাতাস অস্থির হয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

থার্টিন আত্মরক্ষার চেষ্টায় ছুটে ওর বাইকের কাছে গেল। বাইকটা রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে ছিল। সেটাকে দাঁড় করিয়ে লাফিয়ে বাইকে উঠে বাইক ছুটিয়ে দিল।

আমি বুকের ভেতরে গনগনে রাগ নিয়ে ওকে তাড়া করলাম। তার আগে একঝলক দেখলাম, থার্টিনের দলের অন্যান্যরা হঠাৎ এই ঝোড়ো আক্রমণের চাপে পড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। ওদের একটা সোর্ড আর একটা শটগান রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। নীল গাড়িটা সুযোগ বুঝে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে। গাড়ির ভেতরে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে চার-পাঁচজন বসে আছে।

থার্টিনের বাইকের স্টিয়ারিং-এ বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। কারণ, ওর বাইকটা বারবার টাল খেয়ে মাতালের মতো এঁকেবেঁকে ছুটছিল। আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমছিল।

উলটোদিক থেকে দুটো গাড়ি আসছিল। একটা কালোরঙের প্রাইভেট কার, আর তার খানিক পেছনে বিচ্ছিরিরকম লোড করা একটা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক।

রাস্তায় গর্ত আর খানাখন্দ থাকায় ট্রাকটা বিপজ্জনকভাবে ডানদিক বাঁ-দিকে টাল খাচ্ছিল। ট্রাকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হলে হাইওয়ের একেবারে বাঁ-দিক ঘেঁষে বাইক চালাতে হয়। তো আমি তাই করলাম। যতটা পারলাম বাঁ-দিকে সরে গেলাম। কিন্তু বেশি সরে গেলেই হালকা আগাছার ঝোপ আর ঢাল—নীচে নদীর দিকে গড়িয়ে গেছে।

থার্টিনও আমার মতো সাবধান হয়েছিল। তাই ওর বাইকটা ক্রমশ বাঁ-দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর কাছাকাছি এসে যাওয়া ফুল পাঞ্জাব ট্রাকটা হঠাংই খাড়া অবস্থা থেকে দশ-পনেরো ডিগ্রি হেলে গেল।

থার্টিন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর বাইক বাঁ-দিকে আগাছার ঝোপের দিকে ছুটে গেল। শুধু ছুটে গেল নয়, তার ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঢাল বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। ও প্রাণপণ চেষ্টা করেও বাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাইকটাকে সামাল দিতে পারছিল না।

আমিও ঢাল বেয়ে বাইক নামিয়ে দিলাম। গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে আমার মোটরবাইক থার্টিনের মেশিনের দিকে ছুটে চলল। তারপর আমি যা চাইছিলাম তাই হল। দুটো মেশিনে প্রবল সংঘর্ষ হল। ওর বাইকের পেটের কাছাকাছি জায়গায় ধাক্কাটা লাগল।

থার্টিনের বাইক কাত হয়ে গেল। আপন খেয়ালে অদ্ভুত বৃত্তচাপ এঁকে ঢালের ওপরে ছুঁচোবাজির মতো খানিক ছুটল। তারপর লাট খেয়ে ঢাল বেয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নদীর পাথর আর পলিমাটির পাড়ে।

সংঘর্ষের সঙ্গে-সঙ্গেই থার্টিনের দেহটা শূন্যে ছিটকে উঠেছিল। সেখান থেকে জমিতে পড়ে ওর অবস্থাও হল ওর বাইকের মতন। গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে।

আমার বাইক কিন্তু তখনও দু-চাকার ওপরে ছিল। আমি কসরত করে ওটাকে ঢালের ওপরে চালাচ্ছিলাম। আঁকাবাঁকা পথে ওটাকে নদীর পাড়ে নামিয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানে মোলায়েম মাটি আর ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় নুড়ি পাথর।

থার্টিন যে তেমন চোট পায়নি সেটা বুঝতে পারলাম তখনই। দেখলাম, ও উঠে দাঁড়িয়েছে এবং নদীর পাড় ধরে ছুটছে।

আমি বাইক নিয়ে ওকে তাড়া করলাম।

ও ছুটতে-ছুটতে একবার থামল। ঝুঁকে পড়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। তারপর আবার দৌড়তে লাগল।

পাথরটা আমার বেশ কয়েক হাত দূর দিয়ে ছিটকে গেল। আমি বাইক থামালাম না। ছোট-বড় নানান মাপের পাথর কাটিয়ে ডিঙিয়ে কোনওরকমে গাড়িটা চালাতে লাগলাম।

যখন আমি থার্টিনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি তখন ও একটা কাণ্ড করল। চট করে ঘুরে নদীর জল লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল।

আমিও স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ওর পিছু নিলাম বটে, কিন্তু বুঝলাম, ওর বুদ্ধির কাছে আমি হেরে গেছি।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। থার্টিন নদীর জলে নেমে পড়ল। ছপছপ করে পা ফেলে প্রায় কোমর জলে চলে গেল।

আমার বাইকের চাকা নদীর জল ছুঁয়ে ফেলতেই আমি গাড়ি থামালাম।

দৃশ্যটা আমার খুব অলৌকিক লাগছিল।

আমার গায়ে মাথায় রোদ। নদীর জলের গন্ধ। হালকা বাতাস। দূরের গাছপালার সারি। নাম-না-জানা পাখির ডাক। মাথার ওপরে আকাশের নীল।

এই রোমান্টিক পরিবেশে আমার পাশে মাহি যদি থাকত তা হলে দারুণ লাগত।

কিন্তু তার বদলে আমার সামনে একজন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর শত্রু। যার সারা গায়ে কাটা-ছেঁড়া দাগ, গালে-কপালে রক্ত লেগে আছে। যে এখন আমাকে তাক করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে।

আমি অসহায়ভাবে বাইকে বসে রইলাম। থার্টিন তখন মুখ বিকৃত করে বলছে, আমাকে কবজায় পেলে ও কী হাল করে ছাড়বে। আমার নকশা ও বদলে দেবে। আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

আমি শুধু ওকে বললাম, যেখানেই তোমার গ্যাং-কে আমরা পাব, সেখানেই রুখে দেব। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—যেখানেই হোক।

থার্টিনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও রিভলভার কিংবা শটগান ছিল না। থাকলে ও অবশ্যই আমাকে খতম করে দিত। তাই ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ আমরা একইভাবে স্থির রইলাম। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এখন কী করব। আমার বন্ধুরা যদি আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে নেমে আসে তা হলে হয়তো কিছু একটা করার কথা ভাবা যায়।

আমার পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বাজছিল। কিন্তু আমার তখন ফোন ধরতে ইচ্ছে করছিল না। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে থার্টিনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎই পেছন থেকে বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে চিৎকার।

থার্টিন সঙ্গে-সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর ওপার লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কতকগুলো সবুজ টি-শার্ট আর মোটরবাইক। ওপরে হাইওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ডাকছে, হাত নাড়ছে।

'প্যাসকো! প্যাসকো!'

আমি হাত নেড়ে ওদের নেমে আসতে বললাম। একইসঙ্গে থার্টিনের আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণও বুঝতে পারলাম।

বন্ধুদের কাছে জানতে পারলাম, আজকের অপারেশানে এ-এম-জি জিতেছে। আমাদের দলের দুজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছে—তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়। আর 'হেল' গ্যাঙের একজন গুন্ডা ভালোরকম চোট পেয়েছে। তার বডিটা জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে শোয়ানো আছে। আর বাকি গুন্ডাগুলো পালিয়েছে।

থার্টিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও তখন সাঁতরে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমরা বাইক নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

হাইওয়েতে উঠে দেখি সেই ফুল লোড ট্রাকটা রাস্তার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে। তার মালপত্র ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেছে : ইস্পাতের তৈরি ছোট-ছোট মেশিনারি পার্টস। সেগুলোর ওপরে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। কাত হয়ে থাকা ট্রাকটার জন্যে ইন্টারসিটি হাইওয়ে জ্যাম হয়ে গেছে।

আমরা সবাই বাড়ি ফিরলাম বটে, কিন্তু থার্টিনের হুমকির কথা আমি ভুলতে পারছিলাম না।

রাতে মেহেন্দিকে আমি সকালের সব ঘটনা খুলে বললাম। ও শুনে আমার গালে একটা চুমু গেল। বলল, 'ঠিক করেছ। লাইফে পজিটিভ কিছু করা দরকার—।'

কিন্তু থার্টিনের একটা কথা আমার মনে কাঁটা হয়ে খচখচ করছিল: আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

•

বিয়ের আগে মেহেন্দির সঙ্গে আমি প্রায় দু-বছর মিশেছি। আমার পছন্দ-অপছন্দ অভ্যাস সবই ওর জানা। সবকিছু জেনেই ও আমার সঙ্গে মিশেছিল। আমার বন্ধুদের সবাইকেই ও চিনত। আমাদের ঘরে কখনও-কখনও চায়ের আসর বসত। সেই আসরে নানান বিষয়ে তর্কাতর্কি হত। যেমন, কোন উলকির নকশা ভালো, আর কোনটা খারাপ। নিউ সিটির হাইফাই রিসকি গেমগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে খতরনাক। নিউ সিটির গেমে নাম লিখিয়ে টাকা জেতার চেষ্টা করা উচিত কি না। মোটরবাইক গ্যাংগুলোর সঙ্গে ঠিক কীভাবে আমাদের ফাইট করা উচিত।

এইসব আলোচনার সময় মেহেন্দিও আমাদের সঙ্গে গলা ফাটাত, মতামত দিত।

সেইসব হুল্লোড় আর তর্কাতর্কির সময় একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম : নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার ব্যাপারে ওর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ও বলত, মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে তাকে নিয়ে নানান ডেঞ্জারাস খেলা খেলিয়ে মজা লোটার এই কায়দাটা ভীষণ জঘন্য আর নোংরা। ও কোনওদিনই নিউ সিটির মার্শালকে ক্ষমা করতে পারবে না।

আমার বন্ধুদের কেউ-কেউ ওইসব গেমে নাম দিয়ে 'জুয়াখেলা'য় জেতার কথা বললে মেহেন্দি তাদের বেধড়ক ঝাড়ত। আমি অনেক সময় ওকে খ্যাপানোর জন্যে নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার কথা বলতাম, ওর সঙ্গে মজা করতাম। কিন্তু তাতে ও জেনুইনলি হেভি চটে যেত।

তখন জানতাম না, এই আমি সত্যি-সত্যি সুপারগেমস কর্পোরেশনের কোনও গেমে নাম দেব।

আমার জীবনে চরম দুর্ঘটনাটা একদিন ঘটল।

দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়েতে থার্টিনদের সঙ্গে এনকাউন্টার হওয়ার পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। আমার জীবনের সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। সপ্তাহের ছ'টা দিন বাইক ওয়ার্কশপের কাজ, আর একটা দিন নিজের জন্যে। আমার আর মাহির জন্যে।

একরমই একটা ছুটির দিনে—দিনটা রবিবার ছিল—আমি আর মাহি মোটরবাইক চেপে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

আমার আস্তানা থেকে সাত কি আট কিলোমিটার দূরে একটা পার্ক ছিল। নাম হেক্সাগন পার্ক। বুঝতেই পারছ, পার্কের চেহারাটা হেক্সইগনের মতো বলেই ওই নাম।

পার্কটা মাপে প্রকাণ্ড। আর তার ঠিক মধ্যিখানে হেক্সাগন চেহারার একটা লেক ছিল। এ ছাড়া প্রচুর গাছপালা।

কিন্তু পার্ক বলতে যেরকম ছবি মনের ভেতরে ভেসে ওঠে, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। অবহেলা আর অযত্নে পার্কের এককালের সুন্দর বাগান আর সাজানো গাছপালা অনেকটা জঙ্গলের চরিত্রে বদলে গিয়েছিল। লেকের নীল জলে একসময় লাল-নীল সব মাছ খেলা করত। কালে-কালে লেকের জলের রং বদলে শ্যাওলা ধরে ঘোলাটে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। একসময়ে পার্কের যে-আলোকসজ্জার আমরা প্রশংসা করতাম, তখন সেই সজ্জার জাঁকজমক মৃত্যুশয্যায়।

তবুও সেখানে লোকজন যেত। বিশেষ করে আমার মতো গরিব। কারণ, হেক্সাগন পার্কে ঢোকার জন্যে কোনও টিকিট কাটতে হত না।

পার্কের ভেতরে লেকের চারদিকের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার খারাপ লাগত না। আর আমার যেটা পছন্দের সেটা মাহিরও পছন্দের ছিল। তা ছাড়া আমাদের গোটা শহরের যেরকম দশ দশা, তাতে ওই হতমান হেক্সাগন পার্কই ছিল আমাদের এলাকার অক্সিজেন সেন্টার। তাই ছুটির দিনে দুপুরে বা বিকেলে মোটামুটি ভিড় হত সেখানে।

পার্কটা হতমান হলেও সেখানে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার আর মেহেন্দির ভালো লাগত। এলোমেলো বেহিসেবি গাছপালা, শান্ত লেকের ঘোলাটে জল, তাতে বুড়বুড়ি কাটা চানাচুনো আর তেলাপিয়া মাছ—তার মধ্যেই আমরা আমাদের অল্প-অল্প ভালো লাগা খুঁজে পেতাম।

তো অভ্যাসমতো সেই ছুটির দিনটায় আমি আর মেহেন্দি হেক্সাগন পার্কে গিয়েছিলাম।

সন্ধের মুখে আমি আর ও হাসাহাসি করতে-করতে পার্কের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎই একটি সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এল। রোগাটে মুখ, চাপদাড়ি, বাঁ-দিকের গালে শ্বেতীর দাগ।

ছেলেটা জিগ্যেস করল, 'দাদা, ক'টা বাজে?'

আমি বাঁ-হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বললাম, 'পৌনে ছ'টা—।'

কথাটা বলতে না বলতেই ছেলেটা চকিতে ছোবল মেরে আমার জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিল। তারপরই দে ছুট।

আমি আগুপিছু চিন্তা না করেই ছেলেটাকে ধরতে তাড়া করলাম। তখনই লক্ষ করলাম, ছেলেটার ডানহাতের কবজিতে একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটা আমি কেন যে আগে খেয়াল করিনি!

আমি 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করছিলাম, কিন্তু তাতে আশপাশের লোকজন তেমন গুরুত্ব দিল বলে মনে হল না। কারণ, ওল্ড সিটিতে 'চোর! চোর!' চিৎকারটা এত বেশি চেনা যে, বলার কথা নয়।

কিছুক্ষণ ছোটার পরই বুঝলাম, আমার ভারী শরীর নিয়ে ওই রোগা দৌড়বাজ ছেলেটাকে আমার পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমি থেমে গেলাম। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগলাম।

এমন সময় মেহেন্দির চিৎকার শুনতে পেলাম।

ও আমার নাম ধরে ডেকে উঠেছে। এই ডাকটা ভয়ের ডাক। বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়ার ডাক।

আমি ঘুরে মেহেন্দির দিকে তাকালাম। তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে একটা বরফের সাপ আমার শিরদাঁড়া পেঁচিয়ে নেমে গেল। মাথাটা টাল খেয়ে গেল পলকে।

তিন-চারটে মোটরবাইক মেহেন্দিকে ঘিরে ফেলেছে। একটা লম্বামতন লোক ওকে টেনেহিঁচড়ে একটা বাইকে তুলছে। আর মেহেন্দি আমার নাম ধরে চিৎকার করে চলেছে।

আমি শয়তানগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু ততক্ষণে ওকে বাইকে বসিয়ে বাইক গতি নিয়েছে।

বাইকটা চালাচ্ছে একজন। তার পেছনে মাহি। আর মাহিকে প্রাণপণে জাপটে ধরে ওর পেছনে চেপে বসেছে আরও একজন। দুটো পুরুষের মাঝে মাহি স্যান্ডউইচ হয়ে আছে।

লম্বা মতন যে-ছেলেটা বাইক চালাচ্ছে, ছুটতে-ছুটতেই ওর পায়ের দিকে চোখ গেল আমার। ছেলেটার বুট পরা পায়ের গোড়ালির কাছে কী যেন একটা চকচক করছে। ওর জিনস-এর পায়াটা তার ভেতরে গোঁজা।

একটা স্টিলের বালা। ওর ডান পায়ে। থার্টিন। বলেছিল, আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

থার্টিনকে চিনতে পারামাত্রই আমার মুখ দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। কসাইখানায় শুয়োর কাটার সময় যে-ধরনের চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়।

জন্তুর মতো চিৎকার করতে-করতে আমি থার্টিনের মোটরবাইকের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভটভট গর্জন তুলে দুশমনের বাইকটা দূরে মিলিয়ে গেল। সেইসঙ্গে মাহির চিৎকারও।

আমি রাস্তায় বসে পড়লাম। মাটি চাপড়ে কপাল চাপড়ে অসহায়ের মতো অনেক কান্নাকাটি করলাম। রাস্তার লোকজন হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবল, একটা ভবঘুরে পাগল নিজের সুস্থতা ফিরে পাওয়ার জন্যে হা পিত্যেশ করে কাঁদছে।

একটু পরে কান্নাকাটি থামিয়ে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। তারপর আমার বাইকে উঠে থার্টিনদের খোঁজে বেরোলাম।

দিশেহারাভাবে সারাটা রাত ওদের খুঁজে বেড়ালাম আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার হাত শূন্য রয়ে গেল। ক্লান্ত শরীরে শূন্য হাতে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে এলাম।

তারপর সারাদিন ধরে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করলাম। ওদের কথায় থানা-পুলিশ নিয়ে প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করলাম। কিন্তু মেহেন্দির খোঁজ পেলাম না।

তবুও আমি খুঁজে চললাম। ওল্ড সিটির সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় চষে বেড়ালাম।

না, মেহেন্দি কোথাও নেই।

কয়েকদিন পর আমার কিছু বন্ধু হাল ছেড়ে দিল, কিন্তু আমি জেদ ছাড়িনি। মাত্র তিনজন বন্ধুকে সঙ্গী করে খোঁজ চালাতে লাগলাম।

আরও কিছুদিন পর বন্ধুর সংখ্যা কমে দাঁড়াল মাত্র একজন। কিন্তু তাও আমি খোঁজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

শেষে, আরও পনেরোদিন পর, আমি একা। তখন আমি প্রায় পাগল হয়ে গেছি। কখন চান করি, কখন খাই, আর কখন ঘুমোই—কিছুই মনে থাকে না। শুধু খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ।

তবুও মাহিকে পেলাম না।

এইভাবে টানা একবছর কাটিয়ে তারপর বুঝলাম, মাহিকে আর কোনওদিনই আমি ফিরে পাব না।

ব্যস, তারপরই আমি কেমন যেন শান্ত পাথর হয়ে গেলাম। একা-একা চুপচাপ সময় কাটাতে লাগলাম। জীবন সম্পর্কেই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

সেরকমই একটা সময়ে ঠিক করলাম, আমি নিউ সিটির কিল গেমে নাম দেব। যদি কিল গেমে জিততে পারি তা হলে সুপারগেমস কর্পোরেশনের সব খেলা আমি খতম করে দেব। ওদের কোম্পানির ঝাঁপ বন্ধ করে চিরকালের জন্যে তালা লাগিয়ে দেব।

কারণ, মেহেন্দি এই খেলাগুলো একটুও পছন্দ করত না।

তো আমি কিল গেমে নাম দিলাম।

প্যাসকোর কাহিনি যখন শেষ হল তখন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনের বাইরে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে।

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষটার জীবনের ওঠা-পড়া কল্পনায় দেখতে চাইছিল।

প্যাসকো হঠাৎ বলল, 'একটা জিনিস দ্যাখো...।' বলে পকেট থেকে একটা চ্যাপটা ছোট ডকুমেন্ট বক্স বের করল। সেটা খুলে একটা রঙিন ফটোগ্রাফ বের করে নিল। তারপর ফটোটা বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে।

জিশান দেখল।

একটা অল্পবয়েসি রূপসি মেয়ে। চোখে অনেক স্বপ্ন।

প্যাসকো বলল, 'মেহেন্দি...মাহি...।'
মুখ তুলে তাকাল জিশান।
প্যাসকোর বাঁ-চোখে একফোঁটা জল।

•

৩১ আগস্ট। শুক্রবার। মাঝে আর একটা দিন—তারপরই রবিবার। কিল গেম।

শ্রীধর পাট্টা জিশানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চারজন গার্ড জিশানকে গ্রানাইট পাথরে ঢাকা করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জিশান ওদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওরা কেউই সেরকমভাবে কোনও জবাব দিচ্ছিল না। শুধু ছোট্ট করে 'হু-হাঁ' করছিল।

জিশান বেশ অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী! নিউ সিটির গার্ডরা তো সবসময়েই জিশানের সঙ্গে কথা বলেছে, গল্প করেছে—এমনকী কেউ-কেউ ওকে হিরোর সম্মান পর্যন্ত দিয়েছে।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে জিশান জিগ্যেস করেই ফেলল, 'কী ব্যাপার বলো তো! তোমরা কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না?'

জিশানের ডানপাশে যে-গার্ডটি হেঁটে যাচ্ছিল সে বলল, 'না, স্যার। আসলে মার্শাল নিয়ম করেছেন, কিল গেমের আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেউ ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।'

জিশান হেসে বলল, 'কিল গেমের পরে কেউ কি আর আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

গার্ড মাথা নীচু করল। কোনও কথা বলল না।

ততক্ষণে ওরা একটা বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে গেছে।

একজন গার্ড পকেট থেকে রিমোট বের করল। দরজার দিকে তাক করে বোতাম টিপল।

স্লাইডিং ডোর। দরজার পাল্লা নি:শব্দে পাশে সরে যাচ্ছিল।

গার্ড চারজন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'গুডবাই, স্যার—।'

তখন থেকে ওরা 'স্যার-স্যার' শুরু করেছে কেন? অবাক হয়ে ভাবল জিশান। কারণ, গার্ডদের মধ্যে অন্তত দুজন জিশানের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। তার মধ্যে আবার একজনের গোঁফে পাক ধরেছে।

সামান্য হেসে 'স্যার-স্যার' রোগের কারণটা জানতে চাইল জিশান।

একজন গার্ড মুখ নামিয়ে বলল, 'যে যাই বলুক, স্যার। আমাদের কাছে আপনি ''স্যার''। আপনার মুখের দিকে আমরা সবাই চেয়ে আছি।'

আর-একজন গার্ড পাশ থেকে বলল, 'আমরা এখানে ভালো নেই, স্যার...।'

ওরা আর দাঁড়াল না। অ্যাবাউট টার্ন করে চটপট হাঁটা দিল।

ঠিক তখনই শ্রীধর পাট্টার অভ্যর্থনা শুনতে পেল জিশান।

'এসো, এসো, জিশান / এখন বুদ্ধিতে দাও শান।' একটু হেসে বাঁ-হাতটা শূন্যে তিরিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে : 'পরশু কিল গেম / কী পাবে, শেম, না ফেম?'

জিশান কোনও উত্তর দিল না। ওর মধ্যে কেমন একটা থম-মেরে-যাওয়া ভাব কাজ করছিল। শ্রীধর পাট্টার ব্যঙ্গের ছুরি ওর গায়ে আঁচড় কাটতে পারছিল না।

শ্রীধর ছোট ঘেরওয়ালা একটা সাদা প্যান্ট পরে ছিলেন। প্যান্টটা এমন যে, পায়ের সঙ্গে চোস্তাই পাজামার মতো লেপটে আছে।

গায়ে প্যান্টের সঙ্গে মানানসই খাপি সাদা কোট। শ্রীধরকে যেন আদর করে জড়িয়ে ধরেছে। কোটের কলারে আর হাতায় কবজির কাছে সোনালি রঙের পটি। বুকে মাঝারি মাপের সোনালি বোতাম।

জিশান ভাবলেশহীন মুখে ঘরে ঢুকল। ওর আবেগ আর অনুভূতির জানলা-দরজা ও বন্ধ করে দিয়েছিল। নিজেকে পুরোপুরি একটা পোজিট্রনিক রোবট বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

বিশাল ঘর। ঘরের সাজসজ্জা সবই সাদার কাছাকাছি রঙের। একদিকের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটার স্ক্রিন। ওটা খুলে মেঝেতে পেতে দিলে ডাবল বেড বিছানার ইলেকট্রনিক সংস্করণ বলে মনে হতে পারে।

কম্পিউটার স্ক্রিনের বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে বসে আছেন দুজন সাজুগুজু করা লোক—তাঁদের সামনে দুটো আর্ক কম্পিউটার। আর তাঁদের পাশে সার বেঁধে সাজানো চারটে সাদা সোফা।

ঘরের এসি এমন সেট পয়েন্টে চলছিল যে, জিশানের মনে হল ঋতুটা শীতকাল।

ইশারায় জিশানকে ডেকে নিলেন শ্রীধর। নিজে একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। পাশেরটায় জিশানকে বসতে বললেন।

'জিশান, তোমাকে এখন ডেকেছি গেম সিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। তুমি তো জানো, পরশু কিল গেম খেলাটা গেম সিটিতে-ই হবে।' শ্রীধর ডানপাশে ফিরে ওঁর চাকরবাকর দুজনকে হাতের ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটারের মেগা স্ক্রিন জীবন্ত হয়ে উঠল। সেখানে ধীরে-ধীরে গুগল ম্যাপের মতো একটা রঙিন মানচিত্র ফুটে উঠল।

চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা চৌকো এলাকা। তার মধ্যে গাছপালা, নদী, ঘরবাড়ি—এরোপ্লেন থেকে নীচের দিকে তাকালে ঠিক যেমন দেখায়।

শ্রীধর বললেন, 'এটা আমাদের গেম সিটি—টুয়েন্টি কিলোমিটার বাই টুয়েন্টি কিলোমিটার। চারশো স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা। পরশুদিন ভোর ছ'টা থেকে পরদিন ভোর ছ'টা পর্যন্ত—মানে, চব্বিশ ঘণ্টা—এটা তোমার এলাকা।' ছোট্ট করে মুচকি হেসে আরও যোগ করলেন : 'এই এলাকায় ওই চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি যা খুশি করতে পারো—আর তোমার যা খুশি হতে পারে...।'

শ্রীধরের কথার নিহিত অর্থ বুঝতে জিশানের এতটুকুও অসুবিধে হল না। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল, শ্রীধর ঠান্ডা চোখে জিশানের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু ওঁর ঠোঁটের কোণে হাসি।

কয়েক সেকেন্ড পর শ্রীধর কম্পিউটার অপারেটরদের দিকে তাকিয়ে আঙুলে টুসকি দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একজন অপারেটর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। একটা ক্যাবিনেটে-র ভেতর থেকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে নিল। অন করে নানান বোতাম টিপে সেট করে দিল। ট্যাবলেটের স্ক্রিটে গেম সিটির হাই রিজোলিউশন কালার ইমেজ ফুটে উঠল।

লোকটি জিশানের কাছে এল। পাশে বসে ট্যাবলেটটা ওর হাতে দিল। ঠিক যেন ষোলো ইঞ্চি ডায়াগনালের একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটো।

শ্রীধর পাট্টা বললেন, 'এটা তোমার। তোমার কাছেই থাকবে। সোমবার ভোর ছ'টা পর্যন্ত। এতে গেম সিটির যে-কোনও অংশের ছবি দেখতে পাবে। ছবি তোমার ইচ্ছেমতো জুম করতে পারবে। তা ছাড়া ছবিগুলো সবই থ্রি ডায়মেনশন্যাল ইমেজ। তাই হাই-ফাই ভিডিয়োগেমের মতো তুমি যে-কোনও অবজেক্টের—মানে, ঘরবাড়ি, গাছপালার চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে পারবে। কোনও বাড়ির জানলা কিংবা দরজা দিয়ে খুশিমতো ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে। বাড়ির ভেতরের লোকজন, সিচুয়েশান, সবই দেখতে পাবে। ফলে তোমার কিলাররা যদি কোনও বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকে, তুমি ইচ্ছে করলেই তাদের খুঁজে বের করতে পারো...।'

লোকটি তখন জিশানকে ট্যাবলেটের অপারেশন দেখিয়ে দিচ্ছে। জিশান ওর রোববারের 'এলাকা'-র রঙিন ছবি খুঁটিয়ে দেখছিল। কী স্পষ্ট, নিখুঁত ছবি! হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে, এমন বাস্তব!

শ্রীধর খুকখুক করে কাশলেন।

'তবে, জিশান—মনে রেখো, একইরকম অপটিক্যাল ট্যাবলেট ওই তিনজন কিলারের কাছেও থাকবে। ওরাও তোমাকে সবসময় ওয়াচ করবে, চোখে-চোখে রাখবে। তা না হলে খেলাটা ঠিক জমবে না—সমানে-সমানে হবে না। কী বলো?' প্রশ্নটা করে হাসলেন। তবে হাসিতে কোনও শব্দ ছিল না।

জিশান কোনও কথা বলল না। রোবটের মতো মুখ করে বসে রইল। আড়চোখে একবার শ্রীধর পাট্টার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তখন শ্রীধরের চোখে ও বিকৃত উল্লাস দেখতে পেয়েছিল।

অপটিক্যাল ট্যাবলেটের ডেমো চলছিল। জিশান ওর সমস্ত মনোযোগ একজোট করে ট্যাবলেটের অপারেশন শিখছিল। ওর মস্তিষ্কের সব নিউরোন সজাগ হয়ে সমস্ত তথ্য স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে নিচ্ছিল।

জিশান সত্যি-সত্যি নিজেকে একটা রোবট বলে ভাবছিল, এবং রোবটের দক্ষতায় ও অপটিক্যাল ট্যাবলেটের অপারেশন নিখুঁতভাবে শিখতে চাইছিল।

ট্যাবলেটের অপারেশন শেখার কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হওয়ার পর কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটটা অফ করে একটা ছোট ম্যানুয়াল জিশানের হাতে দিলেন। বললেন, 'এই টার্বো ম্যানুয়ালটা সঙ্গে নিয়ে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক এই ট্যাবলেটটা অপারেট করেন তা হলে এর নানান অপারেশান আপনার চটজলদি রপ্ত হয়ে যাবে।'

জিশান শুধু ছোট্ট করে মাথা নাড়ল—কিছু বলল না।

টেবিলে নীল রঙের একটা পলিব্যাগ রাখা ছিল। তার গায়ে সুপারগেমস কর্পোরেশনের লোগো। ট্যাবলেটের ম্যানুয়ালটা সেই পলিব্যাগে ঢোকানোর জন্য অপারেটর ভদ্রলোক জিশানকে ইশারা করলেন।

ম্যানুয়ালটা ব্যাগে ঢোকানোর পর জিশান ট্যাবলেটটাও সেখানে ঢোকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্রীধর পাট্টা ওকে থামতে ইশারা করলেন।

'ট্যাবলেটের কাজ এখনও বাকি আছে, জিশান।'

জিশানের হাত থমকাল। শ্রীধরের মুখের দিকে তাকাল ও।

'ট্যাবলেটটা উলটে দ্যাখো—তা হলেই বুঝতে পারবে...।' ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকালেন শ্রীধর। আঙুল নাচিয়ে তাঁকে জিশানের কাছে আসতে বললেন।

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। একইসঙ্গে প্রথম অপারেটর জিশানের পাশ থেকে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

শ্রীধর কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলেন—ওঁর নেশার শিশি। ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে দু-ফোঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে শব্দ করলেন দুবার। ওঁর গাল আর নাকের ডগা লালচে হয়ে উঠল। চোখে ঝলসে উঠল নতুন দীপ্তি।

জিশান ট্যাবলেটটা উলেটে ফেলেছিল। অবাক হয়ে দেখল, উলটোদিকেও একটা পরদা। তবে সেটা এখন অন্ধকার।

ট্যাবলেটের দু-দিকেই পরদা থাকার ব্যপারটা জিশানকে বেশ চমকে দিয়েছিল। এরকম 'দু-মুখো কম্পিউটার' ও আগে কখনও দেখেনি। ওল্ড সিটির মিউজিয়ামে একবার ও একটা জিনিস দেখেছিল। খুব পুরোনো কালের একটা রাইটিং গ্যাজেট—বাচ্চাদের লেখার জন্য। গ্যাজেটটার নাম 'স্লেট'। তার ওপরে সাদা রঙের একটা রাইটিং স্টিক দিয়ে লেখা যায়। ব্ল্যাক স্লেটের ওপরে হোয়াইট মার্ক পড়ে। সেইসব লেখা আবার ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা যায়।

এই ট্যাবলেটের ব্যাপারটা ঠিক যেন সেই স্লেটের মতো।

দ্বিতীয় কম্পিউটার অপারেটর ততক্ষণে জিশানের পাশটিতে এসে বসে পড়েছেন। রোগা, বেশ লম্বা, চোখে চশমা, গালে চাপদাড়ি।

'জিশান, ট্যাবলেটের এই দিকটা হচ্ছে একটা ট্র্যাকার...' ভদ্রলোক শান্ত মিহি গলায় বললেন, 'হাই-ফাই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার...।'

'ট্র্যাকার?' জিশানের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ—ট্র্যাকার।' ভদ্রলোক ঠোঁটের কোণে হাসলেন : 'স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি। কিল গেমের সময় এই ডিভাইসটা আপনাকে দারুণ হেলপ করবে। গেম সিটিতে যখন গেম স্টার্ট হবে তখন থেকেই এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এর এল.সি.ডি. স্ক্রিনে গেম সিটির টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ফুটে উঠবে। তার ওপরে সুপারইমপোজড থাকবে কো-অর্ডিনেট গ্রিড...।' কথা বলতে-বলতে জিশানের হাতে ধরা ট্যাবলেটের একটা বোতাম টিপে দিলেন ভদ্রলোক।

একটা ছোট্ট 'বিপ' শব্দ করে ট্র্যাকার অন হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল গেম সিটির রঙিন ম্যাপ—তার ওপরে সাদা উজ্জ্বল রেখা দিয়ে ছক কাটা গ্রিড ম্যাট্রিক্স। ফলে গেম সিটির ছবিটা দাবার ছকের মতো চৌষট্টিটা চৌকো খোপে ভাগ হয়ে গেল।

ঠিক একই ছবি দেওয়ালের জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটে উঠল। জিশান সেদিকে একপলক তাকিয়ে আবার হাতের ডিভাইসটার দিকে চোখ রাখল।

ভদ্রলোক ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন।

'এটা টাচ স্ক্রিন অপারেটেড। স্রেফ আঙুলে ছুঁয়ে আপনি এর যে-কোনও একটা স্কোয়ার টাইলকে জুম করে ক্লোজ-আপ ভিউ পেতে পারেন। আবার ইচ্ছেমতো নরমাল সাইজে ফেরাতে পারেন।' ভদ্রলোক আঙুল ছুঁইয়ে ছবির দুটো স্কোয়ার ব্লককে ক্লোজ-আপ-এ নিয়ে এলেন, আবার নরমাল সাইজে ফিরিয়ে দিলেন।

জিশান খুঁটিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। রঙিন ম্যাপের নানান জায়গায় নানান রং। যেখানে গাছপালা জঙ্গল সেখানে সবুজ আর গাঢ় সবুজের বহুরকম শেড দিয়ে গাছপালার ছবি আঁকা আছে। পাহাড়ের জায়গায় ধূসর আর সবুজে আঁকা রয়েছে পাহাড়। এ ছাড়া রয়েছে নদী, বাড়ি-ঘর, রাস্তা, পার্ক, পুকুর, আরও কত কী!

সবমিলিয়ে কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার একটা মিনি শহর।

জিশানের পাশে বসা ভদ্রলোক প্রায় সবক'টা খোপ জুম করে-করে জিশানকে সব বুঝিয়ে বলছিলেন। জিশান মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিল। ও খেয়াল করল, গেম সিটির নানান অঞ্চল সুন্দরভাবে ছবি এঁকে বোঝানো থাকলেও বাড়তি সুবিধে হিসেবে নীচে এক কোণে লেজেন্ড টেবল রয়েছে—ম্যাপে যেমন থাকে।

ট্র্যাকারটা দেখতে-দেখতে জিশান শুধু একটা কথাই ভাবছিল : ছবিটা তো গেম সিটির ইলেকট্রনিক ম্যাপ —এর মধ্যে ট্র্যাকিং-এর ব্যাপারটা কোথায়, আর কিল গেমের সময় ডিভাইসটা কীভাবেই বা ওকে হেলপ করবে?

জিশান যেন একটা হেলিকপটার থেকে গেম সিটিকে দেখতে পাচ্ছিল। একইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল, গেম সিটিতে ও ছুটছে—ছুটে পালাচ্ছে—তিনজন কিলারের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে।

ভদ্রলোকের দেওয়া ডেমো শেষ হলে পর জিশান ওঁকে প্রশ্নটা করল।

'ডিভাইসটার নাম ট্র্যাকার কেন? ওটা কী ট্র্যাক করবে?'

'তোমাকে ট্র্যাক করবে, জিশান/তুমি হবে তিনজন খুনির প্রাণ।' কথাগুলো বলতে-বলতে আচমকা উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর পাট্টা। ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

আয়েশি পা ফেলে টেবিলের ওপাশে চলে গেলেন। জিশানের ঠিক বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'রোবট' জিশান শ্রীধরের দিকে তাকাল। কারণ, শ্রীধরের বলা কথার মধ্যে থেকে কিল গেমের দরকারি তথ্যগুলো ছেঁকে নেওয়া দরকার এবং ঠিকঠাকভাবে সেগুলো মাথায় রাখাটা জরুরি।

শ্রীধর বলতে শুরু করলেন। ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকে গিয়ে একটা তেরছা হাসির আভাস তৈরি করেছে।

'আসলে, জিশান, তোমার প্রাণ ওই তিনজন খুনির প্রাণ। মানে, তোমার প্রাণ নিতে পারলে ওরা তিনজনে প্রাণ ফিরে পাবে। ওদের ডেথ সেন্টেন্স মকুব করে দেওয়া হবে। ওদের হাতে বাইশ ঘণ্টা সময় আছে তোমাকে মারার জন্যে। আর তোমার হাতেও সেই বাইশ ঘণ্টা—তবে বাঁচার জন্যে।' অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাতাসে

হাত নাড়লেন শ্রীধর। তারপর : 'এবার ভালো করে শোনো। কিল গেম শুরু হওয়ামাত্র এই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। তখন গেম সিটির ওই রঙিন ম্যাপের ভেতরে একটা সবুজ আলোর ফুটকি দেখা যাবে। ফুটকিটা কম্পিউটারের কারসরের মতো দপদপ করবে।

'ওই সবুজ আলোর ফুটকিটা হলে তুমি। তুমি গেম সিটির ঠিক যে-লোকেশানে আছ ফুটকিটা ম্যাপে ঠিক সেই খোপের মধ্যে দপদপ করে জ্বলবে। তুমি চলতে শুরু করলে হুবহু তোমার চলার পথ ধরে ফুটকিটাও চলতে শুরু করবে। মানে, ওই গ্রিন ডটটা তোমার পজিশানকে ট্র্যাক করবে। দারুণ টেকনোলজি, না?' শব্দ করে হাসলেন মার্শাল। তারপর চুপচাপ টেবিলের দৈর্ঘ্য বরাবর আলতো পায়চারি করে চললেন।

কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটের বোতাম টিপে একটা ডেমো প্রোগ্রাম চালু করে দিলেন। একটা সবুজ আলোর ডট ব্লিংক করতে-করতে ট্র্যাকারের পরদায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দুবার কাশির শব্দ করে জিশানের মনোযোগ চাইলে শ্রীধর।

জিশান ওঁর দিকে তাকালে আবার বলতে শুরু করলেন।

'এইরকম ট্র্যাকার তিনজন খুনির হাতে একটা করে থাকবে। ওরা এই ট্র্যাকারে তোমার ডায়ানামিক পজিশান সবসময় জানতে পারবে। তোমার পজিশান জেনে নিয়ে ওরা ট্র্যাকারের উলটোদিকের অপটিক্যাল ট্যাবলেট অপারেট করবে। এবং তখনই ওরা তোমাকে ছবিতে ধরে ফেলবে।

'ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশান...আমাদের গেম সিটিতে এক লক্ষ চার হাজার তিনশো বত্রিশটা ক্যামেরা ফিট করা আছে, আর সেগুলো স্মার্ট নেটওয়ার্কিং-এ কানেক্টেড। গেম সিটির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে ক্যামোরা নেটওয়ার্কটা অপারেট করা হয়। এসব এতই হাই-টেক ব্যাপার যে, তুমি কখনওই ক্যামেরার চোখ অ্যাভয়েড করতে পারবে না। কোনও না কোনও ক্যামেরা তোমাকে ক্যাচ করবেই।'

জিশানের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে শ্রীধর তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বুঝেছ, জিশান। ওই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। উই ওয়ন্ট য়ু অন ক্যামেরা অ—ল দ্য টাইম। কারণ, সেই সময়টা নিউ সিটির শো-টাইম।'

জিশান কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

শ্রীধর হাতে হাত ঘষে শীত তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন। তারপর আড়চোখে নাটকীয় নজরে জিশানকে দেখলেন।

'তোমাকে এখনও লাল ডটের কথা বলিনি, জিশান। গেম সিটিতে ঢোকার পর থেকেই ওই তিনজন খুনির পজিশানও ধরা পড়বে এই ট্র্যাকারে। তিনটে লাল ডট—দপদপ করে জ্বলবে-নিভবে। তিনজন মার্ডারারের ডায়নামিক পজিশান। তার মানে কী দাঁড়াল?' দু-হাতের আঙুল ডগায়-ডগায় ঠেকালেন শ্রীধর। কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে অপারেটর ভদ্রলোক ট্র্যাকারের আর-একটা বোতাম টিপে দিলেন। আর-একটা ডেমো প্রোগ্রাম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। তিনটে লাল ডট জন্ম নিল পরদায়। এবং সেগুলো ধীরে-ধীরে সবুজ ডটটার দিকে এগোতে লাগল।

'আমাদের কিল গেম খুব ফেয়ার গেম। তাই তুমিও সবসময় খুনিদের পজিশান জানতে পারবে। অর্থাৎ, মোট চারটে ব্লিংকিং ডট ঘোরাফেরা করবে এই ট্র্যাকারে—তিনটে লাল, আর একটা সবুজ। কী পছন্দ?' মুচকি হেসে সরাসরি জিশানের দিকে তাকালেন মার্শাল।

ফেয়ার গেমই বটে! যার নকল সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.07 আর আসল সারভাইভ্যাল ফ্যাক্টর 0.0! চমৎকার! তার ওপর আবার একজনকে খুন করার জন্য তিনজন খুনি। একটা ইঁদুর ধরতে তিন-তিনটে বেড়াল!

যা বোঝার জিশান বুঝে গিয়েছিল। তাই মার্শালের উৎসাহে টুসটুসে মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল—কোনও কথা বলল না।

শ্রীধর আবার নিজের আরামের সোফায় ফিরে গেলেন। অপারেটর দুজনকে বললেন, আরও অন্তত আধঘণ্টা ওঁরা যেন জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেটের আর ট্র্যাকারের ট্রেনিং দেন।

শ্রীধর সোফার হাতলে বসানো একটা ছোট্ট বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে খুব আলতো ভলিয়ুমে মিউজিক বাজতে শুরু করল। বিলম্বিত লয়ের বিষণ্ণ সুর।

সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন শ্রীধর। কিল গেম আসছে। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে তার আগমনী বার্তা টের পাচ্ছেন। প্রতিটি রক্তকণিকায় যেন ফাগুনের আগুন—অথচ ফাগুন এখনও অনেক দূরে।

বড় করে শ্বাস টানলেন। চোখ বুজেও গেম সিটিকে দেখতে পেলেন। যেন খুন-খুন খেলা চলছে চোখের সামনে। আর শুনতে পেলেন উত্তেজিত জনতার উত্তেজনা উল্লাসের চিৎকার।

এবারের কিল গেমে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি শ্রীধর। প্রচারের জন্য সবরকম মিডিয়াকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে বিজ্ঞাপনও পেয়েছেন প্রচুর—কম করেও কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। তার পাশাপশি দর্শকদের প্রত্যাশাও পৌঁছে গেছে তুঙ্গে। এর আগে কোনও কিল গেমে প্রত্যাশার পারদ এতটা ওপরে চড়েনি। বিজ্ঞাপনের আয়ও হয়েছে এবারের তুলনায় অনেক কম।

শ্রীধরের ধারণা এবারের কিল গেম হতে চলেছে সবার সেরা। এবারের কিল গেম ইতিহাস তৈরি করবে।

তার একটা বড় কারণ অবশ্যই জিশান। জিশান পাল চৌধুরী।

চোখ খুলে জিশানের দিকে তাকালেন। কিল গেমের জনপ্রিয়তার কিস্তিমাতের ঘুঁটি।

কম্পিউটার অপারেটর দুজন সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জিশানের আধঘণ্টার ট্রেনিং কয়েক মিনিট হল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওঁরা মার্শালের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। মার্শালের চোখ খোলার অপেক্ষা করছিলেন।

শ্রীধর ইশারায় ওদের ছুটি দিলেন। ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর সব ম্যানুয়াল পলিব্যাগে ঢুকিয়ে নিল।

'জিশান, তুমি এবার আমার কাছে এসে বোসো—প্লিজ।' মার্শাল ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন, 'তোমার সঙ্গে অনেকগুলো জরুরি কথা সেরে নেওয়ার আছে।'

জিশান পলিব্যাগটা সাবধানে টেবিলের ওপরে রাখল। তারপর শ্রীধরের কাছে গিয়ে বসল।

আবার হাতে হাত ঘষলেন শ্রীধর। তারপর ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালের পাশে কয়েকবার চাপ দিলেন।

'তোমার সঙ্গে আজকে আমার শেষ মিটিং, জিশান...' একটু থামলেন। তারপর : '...কিল গেমের আগে। আর...মানে...কিল গেমের পর দেখা হবে কি না সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি যদি গেম সিটিতে চব্বিশ ঘণ্টা টিকে যাও তা হলে দেখা হবে। এ ছাড়া তুমি যদি তিনজন কিলারকে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই খতম করতে পারো তা হলে আরও আগে আমাদের দেখা হতে পারে।'

জিশান চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শ্রীধর পাট্টা আবার বলতে শুরু করলেন।

'ট্র্যাকারের লাল ডট আর সবুজ ডটের ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এটা বলিনি যে, তোমাদের ডায়নামিক পজিশন ওই ওয়ারলেস ট্র্যাকারে ধরা পড়বে কেমন করে।

'আসলে ব্যাপারটা খুব সিম্পল। আগামীকাল তোমাদের চারজনের বডিতে একটা করে মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তারই সিগন্যাল ট্র্যাকারে ধরা পড়বে। তবে চিন্তার কিছু নেই। খুব ছোট্ট অপারেশান। কী, ঠিক আছে?'

জিশান কোনও কথা বলল না। শ্রীধরের ঠান্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁচদিন আগেই ওর কন্ট্রোল ফ্রিডমের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর একইসঙ্গে শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। জিশানকে কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্টারে শিফট করে দেওয়া হয়েছে।

সিকিওরিটি গার্ডরা ওকে রাউন্ড দ্য ক্লক প্রোটেকশন দিচ্ছে, যাতে কেউ ওর কোনওরকম ক্ষতি করতে না পারে। সকাল-বিকেল ওর অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিম আর মেডিক্যাল চেক আপ চলছে। ট্রেনাররা ওকে ট্রেইন করছে। ডায়েটিশিয়ানদের পরামর্শ মতো ওর খাওয়ার মেনু ঠিক করা হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় চলছে সবকিছু।

'শোনো, জিশান। তোমার ওই ছোট্ট অপারেশানটা করা হবে কাল বিকেল চারটের সময়। অপারেশানটা এমন যে, তুমি কিছু টেরই পাবে না। তাঁর ব্যথা-ট্যাথাও কিছুই হবে না। তারপর আমাদের টেকনিক্যাল টিম আর মেডিক্যাল টিম ট্র্যাকিং-এর ব্যাপারটা চেক করে দেখবে। ব্যস, তারপর তুমি রেডি!' কথাটা বলে পাতলা ঠোঁটের ওপরে আঙুল বোলাতে লাগলেন শ্রীধর। মনে-মনে বোধহয় তিনি ছুটন্ত জিশানকে গেম সিটিতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

'রোববার ভোর চারটের সময় কিল গেম অপারেশান টিম তোমার কোয়ার্টারে যাবে। তোমাকে ওরা নিয়ে যাবে আরমারি ইউনিটে। সেখানে তুমি তোমার পছন্দসই অস্ত্রশস্ত্র বেছে নেবে—যা তোমার প্রাণ চায়। আর বেছে নেবে তোমার মনের মতো পোশাক।

'তারপর তুমি গিয়ে হাজির হবে "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে। গেম সিটিতে ঢুকে পড়ার আগে তুমি যাদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে চাও তারা সেখানে আসবে তোমাকে উইশ করতে। তারপর আবার ফাইনাল মেডিক্যাল চেক আপ। সেটা শেষ হলেই তুমি গেম সিটিতে ঢুকে পড়বে।' শ্রীধর পাট্টা উঠে দাঁড়ালেন। হাতের একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'তুমি কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে তোমার দেখা করতে চাওয়ার উইশ লিস্টটা সিকিওরিটি চিফের হাতে দিয়ে দিয়ো। রোববার ভোর পাঁচটার সময়ে তাদের "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে হাজির করানোর জন্যে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করব। তবে হ্যাঁ—নো ফ্যামিলি।' হাসলেন শ্রীধর : 'কারণ, তোমার ওয়াইফ আর ছেলেকে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে ওল্ড সিটি থেকে নিয়ে আসা হয় তা হলে, আই অ্যাম শিয়োর, তোমার পক্ষে সেটা ডেঞ্জারাসলি হার্মফুল হবে—কারণ, তোমার কনসেনট্রেশান নষ্ট হবে...অ্যান্ড দ্যাট মে কিল য়ু আর্লিয়ার ইন দ্য গেম।' শ্রীধর হাসলেন।

জিশান উইশ লিস্টটা মনে-মনে তৈরি করা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীধরের শেষ কথাটা শোনামাত্র ও থমকে গেল। লিস্টের গোড়া থেকে মিনি আর শানুর নামটা ও মনে-মনে কেটে দিল।

পরপর অনেক নামই ওর মনে পড়তে লাগল। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ, পান্ডা, মূর্তি, রিমিয়া, গুনাজি, ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস, প্যাসকো, সুধাসুন্দরী, আর খেলার মাঠে আলাপ হওয়া সেই গার্ড—যার বাড়ি নাহাইতলা গ্রামে।

তবে এদের মধ্যে কেউ আছে, কেউ নেই। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ...আরও কে-কে আছে বা নেই কে জানে!

জিশানের মনে পড়ল, গার্ড বলেছিল, ওর গ্রাম ছবির মতো—সুন্দর, শান্ত, নরম।

ছেলেটা আরও বলেছিল, ভগবানের ভরসায় বসে থাকলে হবে না। যা করার মানুষকেই করতে হবে।

তেইশ-চব্বিশের ছেলেটার মুখটা জিশানের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সত্যি, ও যদি শেষবারের মতো দেখা করতে আসে—শেষ সময়ে—তা হলে জিশানের খুব ভালো লাগবে। আর এই ভালো লাগাটা ওকে কিল গেমে লড়াই করার শক্তি জোগাবে।

একইসঙ্গে জেহাদি সিকিওরিটি গার্ড পান্ডার মুখটাও দেখতে পেল জিশান। বড়-বড় নেশাতুর চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে পান্ডা বলেছিল, 'জিশানের শেষ নেই।'

•

১ সেপ্টেম্বর। শনিবার। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তারপরই শুরু হবে জিশানের তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটের লড়াই। অথবা তেইশ ঘণ্টা ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ডের লড়াই।

কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্টারে চুপচাপ বসে ছিল জিশান। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশটাকে এক মনে উপভোগ করছিল।

আকাশটা কী শান্ত, মসৃণ, নীল! কী সুন্দর!

জিশানের অবাক লাগছিল। আকাশটাকে কখনও ও এত মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করেনি। আজ মনে হচ্ছে, আকাশটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকলেও ওর দেখা ফুরোবে না। আজ ওর ঘণ্টা, মিনিট গোনা হয়ে গেছে। গোনা হয়ে গেছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও। তাই হয়তো আজ এই মুহূর্তের ভালো লাগাটা অফুরান।

বিছানায় এসে বসল জিশান। এমন আরামের বিছানা, যেন মেঘ দিয়ে তৈরি। আরাম আর বিনোদনের সমস্ত উপকরণ ঘরের মধ্যে হাজির। কী নেই এখানে! মাত্র সাতদিনের অতিথিশালা হলেও এখানে প্রকাণ্ড মাপের প্লেট টিভি রয়েছে। আর তার সঙ্গে কালার প্রিন্টার।

এই কোয়ার্টারে কোনও ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের কোনও সুইচ নেই। সবই ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড। ঠিকঠাক সেন্সরের সামনে গিয়ে 'অন' কিংবা 'অফ' বললেই কাজ হয়ে যায়।

এই সাতদিন এই স্পেশাল কোয়ার্টারের আরাম, বিলাস বোধহয় শুধু রূপকথাতেই পাওয়া যায়! আর আগামীকালের ভয়ঙ্কর রুক্ষ নিষ্ঠুর লড়াই—সেটাও বোধহয় আর-এক রূপকথা।

স্পেশাল কোয়ার্টারের চারিদিকে, আনাচেকানাচে, চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। এই মনোরম মোলায়েম স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের নামই কি সুখ? না, নিশ্চয়ই নয়। তাই যদি হত, তা হলে ওল্ড সিটির গরিব মানুষের বস্তিতে জিশান, মিনি আর শানু যেখানে থাকে, সেখানে সুখ থাকত কেমন করে! 'থাকত', কারণ, এখন আর নেই। যেহেতু জিশান মিনি আর শানুর কাছে এখন নেই।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ল জিশানের। মাত্র দুটো লাইন :

'সুখ পড়ে আছে এখানে-ওখানে ঘরের কোণে,
খুঁজে নিতে হয় তাকে জেনো অতি সঙ্গোপনে।'

বস্তির সেই হতদরিদ্র ঘরে ঠিক এইভাবেই সুখ খুঁজে নিত জিশান আর মিনি। কালকের চব্বিশ ঘণ্টার দিনটা পার করে আবার ওল্ড সিটিতে ফিরবে জিশান। তারপর আবার ওরা দুজনে রোজ খুঁজে নেবে সুখের মণিকণা।

গতকাল রাতে মিনির সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলেছে জিশান। কথা বলেছে শানুর সঙ্গেও।

মাইক্রোভিডিয়োফোনে অনেক টকটাইম তিল-তিল করে জমিয়ে রেখেছিল। মনে-মনে ভেবে রেখেছিল, কিল গেমের আগে শেষবারের মতো যখন মিনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে, তখন এই জমানো টকটাইম প্রাণ ভরে খরচ করবে।

গতকাল সকালে শ্রীধর পাট্টা জানিয়ে দিয়েছিলেন, শুক্রবার রাত বারোটার মধ্যে এম-ভি-পি শেষবারের মতো ব্যবহার করতে হবে। আর শনিবারটা হচ্ছে 'লাল পিরিয়ড'—সাইক্লোনের আগে খানিকটা সময় যেমন গুমোট থাকে, থাকে থমথমে স্তব্ধতা, ঠিক সেইরকম। তারপরই রবিবার, কিল গেমের সাইক্লোন।

শ্রীধর আরও বলেছিলেন, শনিবার দিনটা জিশানের মনোসংযোগের জন্য। মন থেকে সমস্ত আজেবাজে চিন্তা সরিয়ে ওকে শুধুই কিল গেমের কথা ভাবতে হবে।

অথচ এখন, কাল রাতে মিনির সঙ্গে কথা বলার সময়টুকুর ছবি জিশানের মনে ভেসে উঠছিল।

'মিনি!'

মাইক্রোভিডিয়োফোনের পরদায় মিনিকে দেখতে পাচ্ছিল জিশান। মিনিকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর কোলে বসে আছে শানু। সেই কারণেই হয়তো মিনিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

শানু কত বড় হয়ে গেছে! আধো-আধো কথার টুকরো বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

জিশান ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠল : 'শানু! শানু!'

শানু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বুড়ো আঙুল চুষছিল। জিশানের ডাকে ঘুরে তাকাল।

এম-ভি-পি-র পরদায় বাবা আর ছেলের চোখাচোখি হল। জিশান আবেগে কেঁপে উঠল। ছেলের চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে আদরের অর্থহীন শব্দ করতে লাগল। শানুও বাবার অর্থহীন শব্দের উত্তরে আরও অর্থহীন, আরও দুর্বোধ্য সব শব্দ ফিরিয়ে দিল।

মিনির চোখ ভিজে উঠেছিল। ওড়না দিয়ে চট করে চোখ মুছে নিল ও।

জিশানও চোখ মুছল। বলল, 'শানু কীসব বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মিনি অল্প হেসে বলল, 'ও বলছে, কিল গেমে তোমাকে জিততে হবে। তারপর কিল গেমকে চিরকালের মতো খতম করতে হবে...।'

জিশান ধরা গলায় বলল, 'তুমি মনে-মনে আমার সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই পারব...।'

'শানু তোমাকে কাঁদতে বারণ করছে।'

জিশান চোখ মুছল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করল।

'না, আর কাঁদব না। শ্রীধর পাট্টা ঠিকই বলেছে : এতে আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হবে। কিল গেমে ভালো করে লড়তে পারব না...।'

আচমকা মিনি বলল, 'জিশান, আজ আর কথা নয়...তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব...।'

জিশান তাড়াতাড়ি বলে উঠল : 'মিনি, মিনি! কিল গেমের আগে আজই তোমার সঙ্গে শেষ কথা। শ্রীধর আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। কাল তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে দেবে না—।'

'জানি। সুপারগেমস কর্পোরেশন আমাকেও ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে।' নিজেকে শক্ত করল মিনি : 'সেইজন্যেই আমি অনেক কথা বাকি রাখতে চাইছি। বাকি কথাগুলো আমি বলতে চাই কিল গেমের পর...।'

জিশান প্রথমটায় ব্যথা পেলেও পরে বুঝতে পারল মিনি আসলে কী বলতে চাইছে।

'আমি এখন কানেকশন কেটে দিচ্ছি, জিশান। সোমবার যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে জীবনে তোমার মুখ দর্শন করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

তারপর সত্যি-সত্যিই কানেকশন কেটে দিল মিনি।

মিনির না বলা গোপন কথা জিশান বুঝতে পারল। এম-ভি-পি-র শূন্য পরদার দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, মিনি শেষ কথাটা যা বলল তার বদলে এ-কথাও বলতে পারত : '...সোমবার যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে তোমার মরা মুখ দেখব।'

না, জিশান নিজের মরা মুখ মিনিকে দেখাতে চায় না। আর সেইজন্যই দরকার মনোযোগ—সূচিতীক্ষ্ণ মনোযোগ। যে-মনোযোগ থাকলে ওর সারভাইভাল ফ্যাক্টরটা 0.5-এর বেশি হতে পারে।

এখন বসে-বসে সেই কথাই ভাবছিল জিশান।

মিনি। অর্কনিশান। জিশান। কনসেনট্রেশন। কনসেনট্রেশন।

এই পাঁচটা শব্দ জিশানকে মনের ভেতরে সাইক্লিক অর্ডারে ঘুরছিল। আর বারবার ভেবে মরছিল, ওই তিনজন খুনিকে ও কীভাবে বাইশ ঘণ্টা ধোঁকা দেবে।

সকাল ছ'টা থেকে আটটা—এই দু-ঘণ্টা—গেম সিটি থাকবে জিশানের একার দখলে। তারই মধ্যে জিশানের লড়াইয়ের ময়দানটা দেখেশুনে নিতে হবে।

শ্রীধর পাট্টা বলেছেন, গেম সিটির নানান জায়গায় দাঁড় করানো থাকবে অনেক গাড়ি আর মোটরবাইক। সেগুলোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরতি থাকবে। ট্যাঙ্কের ঢাকনা সিল করা থাকবে। ইগনিশনে লাগানো থাকবে গাড়ির চাবি—সে-চাবি এমনই যে, কি-হোল থেকে কখনও বের করা যাবে না। সোজা কথায়, তেল না ফুরোনো

পর্যন্ত ওই গাড়ি আর বাইকগুলো ওরা চারজন ব্যবহার করতে পারবে। চারজন মানে জিশান, আর তিনজন কিলার।

গেম সিটিতে যেসব মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার 'সিটিজেন' হয়ে আসবে তারা থাকবে যার-যার নির্দিষ্ট বাড়িতে বা দোকানে। তাদের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো বারণ। যদি কেউ সে-নিয়ম না মানে তা হলে তার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে সে-দায়িত্ব মোটেই সুপারগেমস কর্পোরেশনের নয়। তবে যদি কখনও কোনও বাড়ি বা দোকানের ভেতরে জিশান এবং তার শত্রুদের কোনও মোকাবিলা হয় তা হলে সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রহীন মোকাবিলা। এ-নিয়ম না মানলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও মারাত্মক।

শ্রীধর এইসব নিয়মের কথা বারবার করে চারজনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'মনে রাখবে, লক্ষ ক্যামেরা প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের লক্ষ করছে। সেইসঙ্গে রয়েছে দেশবিদেশের কোটি-কোটি দর্শক।'

জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা হাতে নিল। ওটা 'অন' করে গেম সিটির আনাচকানাচ ভীষণ মনোযোগে দেখতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেই চলল। পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মতো গেম সিটির ভূগোল মুখস্থ করে চলল। কারণ, লড়াইয়ের সময় বারবার ট্যাবলেট দেখে ও দামি সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই গেম সিটিকে ও মনের মধ্যে গেঁথে নিতে চায়।

গতকাল শ্রীধরকে জিগ্যেস করেছিল, 'ওই চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে জল আর খাবার কি সঙ্গে নিতে হবে?'

শ্রীধর হেসে বলেছেন, 'না। আমি কোয়ালিটি টাইম নষ্ট করতে চাই না। তোমাদের চারজনের জন্যে জল আর খাবারের ব্যবস্থা করেছি ভারী অভিনব কায়দায়, বুঝলে বাবু জিশান! একেবারে হাই-ফাই সুপার-ডুপার টেকনোলজি...।'

'তার মানে?' জিশান ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। মনে-মনে ভাবল, এই পাগল স্যাডিস্ট লোকটা হয়তো গেমের ফান আর এক্সাইটমেন্ট ফ্যাক্টর বাড়ানোর জন্য জল আর খাবারের কোনও ব্যবস্থাই রাখেনি। গেম সিটির জঙ্গলের গাছের ফল, পাতা আর কচি ডালপালা হচ্ছে খাবার, আর জল খাওয়ার জন্য রয়েছে নদীর অগাধ জল।

কিন্তু জিশানকে ভুল প্রমাণ করে শ্রীধর পাট্টা অন্যরকম উত্তর দিলেন। অপটিক্যাল ট্যাবলেটের একটা লালরঙের চৌকো বোতাম দেখিয়ে বললেন, 'জিশান, এই বোতামটা হচ্ছে ফুড বাটন। এটা টিপলেই তুমি দেখতে পাবে ফুড ম্যাপ। গেম সিটির কোন-কোন পয়েন্টে তোমার ফুড আর ড্রিঙ্কের প্যাক রাখা আছে সেগুলো লাল ব্লিঙ্কিং ডট হিসেবে স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। তুমি ইচ্ছে করলেই পিকচার জুম করে পয়েন্টগুলোর ডিটেইলড লোকেশান দেখে নিতে পারবে...।'

'কিন্তু কিলাররাও তো এই ম্যাপ দেখতে পাবে। তখন ওরা...।'

হাত তুলে জিশানকে থামতে ইশারা করলেন মার্শাল। হেসে বললেন, 'আমাকে তুমি বোকা ভাব কেন, জিশান? আমি থ্রিলিং ফাইট দেখতে চাই—খাবার চুরির কায়দা-কানুন দেখতে চাই না—' জিভটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার বের করলেন, ঢোকালেন। সাপের মতো। তারপর : 'তোমার ফুড ম্যাপ কিলাররা কেউ দেখতে পাবে না। আর ওদের ফুড ম্যাপ ওরা তিনজন দেখতে পেলেও তুমি দেখতে পাবে না—অলরাইট?'

জিশান স্তম্ভিত হয়ে শ্রীধর পাট্টার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা একইসঙ্গে শয়তান এবং জিনিয়াস।

ফুড ম্যাপের ব্যাপারটা জিশানকে জলের মতো বুঝিয়ে দেওয়ার পর শয়তান এবং জিনিয়াসটা ওকে একটা ফাইল দেখিয়েছিল। সেটা আরমারি ইউনিটের হরেকরকম অস্ত্রশস্ত্রের চেক লিস্ট।

এক-একটা অস্ত্রের এক-একরকম কোড নম্বর। নম্বরের পাশে রয়েছে অস্ত্রের রঙিন ছবি আর বিবরণ। তাতে লেখা আছে কোন অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার মাপ কত, ওজন কত, আর মারণ ক্ষমতাই বা কত।

সেই লিস্টের মধ্যে আরও রয়েছে নানান যন্ত্রপাতির খোঁজখবর। যেমন, অটোফোকাস ডায়মন্ড লেন্স, হাই পাওয়ার টেলিস্কোপ, সাউন্ড রিকগনিশন অডিয়োগ্রাফি সিস্টেম, বহু রকমের নাইট-ভিশন ইন্সট্রুমেন্ট, আরও কত কী!

এগুলোর সঙ্গে আগেই জিশানের পরিচয় ছিল। ওর ট্রেনিং-এর সময় যখন ওকে নানান ধরনের লড়াইয়ের কায়দাকানুন শেখানো হচ্ছিল তখন একটু-একটু করে আরমারি ইউনিটের যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ওকে খুব হিসেব করে যন্ত্র আর অস্ত্র বেছে নিতে হবে। কারণ, এগুলোর সংখ্যা যত বাড়বে, ওজন তত বাড়বে। আর ওজন যত বাড়বে, জিশানের ছোটাছুটি করতে ততই অসুবিধে হবে।

শ্রীধরের কথা মতো আরমারি ইউনিটের চেক লিস্টটার সফট কপি ট্যাবলেটের মেমোরিতে সেভ করে নিয়ে এসেছিল জিশান। আজ রাতে ও আরমারির চেক লিস্টে 'টিক' মারতে বসবে। তারপর সেই 'টিক' মারা লিস্টটা শ্রীধর পাট্টার কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠিয়ে দেবে। তা হলে কাল ভোরে আরমারি ইউনিটে ওর অস্ত্র আর যন্ত্রপাতি বেছে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ইউনিটের অফিসাররা আগে থেকেই সব বাছাই করে রাখবেন।

শ্রীধরের চেম্বার থেকে চলে আসার সময় মার্শাল ওকে পিছু ডেকেছেন, 'জিশান—!'

জিশান পিছন ফিরে তাকিয়েছে ওঁর দিকে।

'তোমার স্যাটেলাইট ফোন কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকবে—আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। শুধু আমি তোমাকে ফোন করতে পারব, আর তুমি আমাকে—আর কেউ নয়। ওকে?' হাসলেন : 'আসলে কিল গেমের প্রতিটি মোমেন্টে তোমার আর আমার যোগাযোগ থাকা দরকার—তাই না?'

উত্তরে জিশান শুধু মাথা নেড়েছে। কোনও কথা না বলে চলে এসেছে।

সন্ধে ছ'টার সময় একটা মেডিকেল টিম জিশানের কোয়ার্টারে এল।

মোট চারজন লোক। প্রত্যেকের গায়ে সাদা ইউনিফর্ম। তার ওপরে বড়-বড় হরফে 'মেডিক' কথাটা লেখা।

ওদের প্রত্যেকের হাতে পোর্টেবল যন্ত্রপাতি। তার কয়েকটার মধ্যে মনিটর লাগানো রয়েছে।

ওদের একজন জিশানকে সামান্য তোতলা স্বরে বলল, 'গু-গুড ইভনিং, মিস্টার পাল চৌধুরী। মা-মার্শাল স্যারের ইনস্ট্রাকশনে আ-আমরা একটা ছো-ছোট্ট অপারেশান করতে এসেছি। আ-আপনার বডিতে একটা মা-মা—...।

'মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার?' জিশান হেসে খেই ধরিয়ে দিল।

'হ-হ্যাঁ। ছো-ছোট্ট অপারেশান। কিল গেমের জন্যে এ-এ-এসেনশিয়াল।'

জিশান জিগ্যেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'আ-আপনি কাইন্ডলি বিছানায় শু-শুয়ে পড়ুন—।'

জিশান বিছানার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর ওরা চারজন মিলে ওর বাঁ-হাতের ওপরদিকটায় কী যে করল জিশান তার কিছুই টের পেল না, শুধু প্রথমে একটা আলতো পিন ফোটানোর ব্যাপার টের পেয়েছিল।

ঘড়ি ধরে ঠিক কুড়ি মিনিট। তারপরই প্রথম লোকটি জিশানকে বলল, 'অ-অ-পারেশান কমপ্লিট, মিস্টার পাল চৌধুরী। এবারে আপনি সোজা হয়ে বসতে পা-পারেন।'

জিশান বিছানায় উঠে বসল। অপারেশনের জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল। না:, কোনও ব্যথা-ট্যাথা নেই। তবে টিপলে একটু শক্ত লাগছে।

সেটা লক্ষ করে লোকটি বলল, 'স্টেট অফ দ্য আ-আর্ট টে-টেকনোলজি। কোনও ব্যথা পাবেন না।'

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিতে-নিতে লোকটি নীচু গলায় বলল, 'আ-আমাদের ক্ষ-ক্ষমা করবেন। মার্শাল স্যারের অর্ডার। আমাদের কিছু করার নেই—।'

জিশান শুধু বলল, 'থ্যাংক যু—।'

ওরা চলে যেতেই জিশান আবার 'পড়াশোনা' শুরু করল। এখনও ওর পড়া শেষ হয়নি। হাতে আর সময় বেশি নেই। সময় ক্রমশ কমছে।

অনেক রাতে জিশানের 'পরীক্ষার পড়া' শেষ হল।

ঘড়ির দিকে তাকাল জিশান : ঘড়ির অর্ধবৃত্তাকার কালো অংশে ছোট কাঁটাটা একের দাগে। রাত একটা বাজে।

জিশানের হাই উঠল। উইশ লিস্টের কথা মনে পড়ল ওর।

কাল রাতে সিকিওরিটি চিফের হাতে ও উইশ লিস্টটা তুলে দিয়েছে। 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে লিস্টের 'বন্ধুদের' দেখা পেলে ওর খুব ভালো লাগবে। কিল গেমে আরও, আরও, বেশি করে জিততে ইচ্ছে করবে।

জিশান আবার হাই তুলল। পায়ে-পায়ে খোলা জানলার কাছে গেল।

ওই তো আকাশে চাঁদ—দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীর। কী অপরূপ লাগছে দেখতে! সকালের নীল আকাশের মতো চাঁদকে উপভোগ করতে লাগল জিশান। একইসঙ্গে মনে হল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যখন গোনা হয়ে গেছে তখন সেটাকেও তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করা যাক।

জিশান বেশ ধীরে-ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার প্রক্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিল। একইসঙ্গে ভাবতে লাগল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোটা যদি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আয়ু একধাপ-একধাপ করে কমছে।

জিশান মনে-মনে বেশ অবাক হল। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও আগে কখনও এমন করে ভাবেনি। কিন্তু ভাববেই বা কেন? ওর জীবনে আগে তো কখনও কিল গেম আসেনি।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, বাকি যে-তিন ঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে, সে-সময়টা ওর ঘুমোনো দরকার। কারণ, ভোর চারটে থেকে কিল গেমের তোড়জোড় শুরু। বলির পাঁঠাকে তখন তৈরি করে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে এই হাড়িকাঠটা হাড়িকাঠের মতো দেখতে নয়, আর এটার মাপ চারশো বর্গ কিলোমিটার। তফাত শুধু এইটুকুই।

কিন্তু ঘুম আসবে কি না তা নিয়ে জিশানের বেশ সংশয় ছিল। বাবার কাছে শুনেছিল, মৃত্যুদণ্ডের আসামি শাস্তি পাওয়ার আগের রাতটায় কখনও ঘুমোতে পারে না। ওর বেলাতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই।

সে-কথা ভাবতে-ভাবতে আরও একবার হাই তুলল জিশান।

•

আরমারি ইউনিটে এসে মনের মতো পোশাক বেছে নিল জিশান। তারপর নিজের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরে নিল। পায়ে পরে নিল কালো রঙের স্নিকার।

পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের। ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্ট—কোমরে কাপড়ের বেল্ট। চকচকে কালো রঙের সিনথেটিক মেটিরিয়ালের তৈরি। খুব চাপা নয়, খুব ঢোলাও নয়। প্যান্টটায় ছ'টা নানান মাপের পকেট। আর টি-শার্টের চারটে—দুটো বুক পকেট, দুটো সাইড পকেট।

পোশাক পরে নেওয়ার পর বাছাই করা অস্ত্রশস্ত্র একটা বড়সড় রুকস্যাকে ভরে নিল। জামা-প্যান্টের পকেটও বাদ গেল না। অস্ত্রগুলো মারাত্মক হলেও ওজনে বেশ হালকা।

জামার বাঁ-পকেটে জিশান রাখল মিনি আর শানুর রঙিন ফটো। এই ছবিটা ও এম-ভি-পি-র মেমোরি থেকে নিয়ে ওর স্পেশাল কোয়ার্টারের কালার প্রিন্টারে প্রিন্ট করে নিয়েছিল। তাই মিনি আর শানু এখন

থাকবে ওর হৃদয়ের কাছাকাছি।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম ট্র্যাকারটা জিশান হাতেই রাখল। গেম সিটিতে ঢোকামাত্রই ওটা কাজে লাগবে।

আরমারি ইউনিটের একজন কর্মী একটা বড় মাপের কালো রিস্টওয়াচ জিশানের বাঁ-হাতের কবজিতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল। কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচ। ও গেম সিটিতে ঢোকামাত্রই ওকে ঘড়ির একটা নীল বোতাম টিপতে হবে। তা হলেই চব্বিশঘণ্টা থেকে কাউন্টডাউন শুরু হবে। আর তার পাশাপাশি স্বাভাবিক ঘড়িও চলতে থাকবে। এই কাউন্টডাউন দেখে জিশান বুঝতে পারবে কিল গেম শেষ হতে আর কতক্ষণ বাকি।

তৈরি হয়ে নিজেকে আয়নায় দেখল জিশান। নিজেকে চিনতে পারল না। তবে ওর মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এই লোকটার ওপরে বাজি ধরা যায়। কিল গেমে এই লোকটা সহজে হারবে না।

ও তৈরি হয়ে যখন 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে, তখন আরমারি ইউনিটের সাতজন কর্মী আর অফিসার ওকে উইশ করল। জিশান হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

পিস ফোর্সের চারজন গার্ড ওকে রোবটের ভঙ্গিতে নিয়ে গেল 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে। ওদের মুখে কোনও কথা নেই। কালো কাচের মেঝেতে পা ফেলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল।

জিশান ব্যাপারটা বুঝতে পারল—তাই ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল না।

চুপচাপ হেঁটে ওরা একটা বিশাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘষা কাচের তৈরি দরজার পাল্লায় সোনালি হাতল বসানো। একটা চওড়া এল-সি-ডি ডিসপ্লে প্যানেলে ইংরেজি হরফে লেখা : লাস্ট স্টপ।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জিশান। পিছনে তাকিয়ে দেখল, চারজন গার্ড নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। ওরা জিশানকে বিদায় জানাচ্ছে, নাকি শোকপ্রস্তাব জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করছে?

একা-একা কয়েক পা হাঁটতেই একটা কাচের ঘরে পৌঁছে গেল জিশান। ফ্লুওরেসেন্ট আলোয় ঘরটা ঝকঝক করছে। সেখানে টিপটপ ড্রেস পরে দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখে একজন অফিসার বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেকে দেখা করতে এসেছেন। ওঁরা একজন-একজন করে ওই কিউবিকলে আসবেন। আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার কথা বলার টাইম লিমিট হচ্ছে একমিনিট...।'

কিউবিকলটার দিকে তাকিয়ে দেখল জিশান।

ওর কাচের ঘরের লাগোয়া আর-একটা ছোট কাচের ঘর। দু-ঘরের মাঝের দেওয়ালে একটা ছোট জানলা—বড়জোর আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি।

এসেছে? সবাই এসেছে? সিকিওরিটি চিফের হাতে যে-উইশ লিস্টটা ও গত পরশু তুলে দিয়েছে তারা সবাই এসেছে?

ঘড়ির দিকে তাকাল জিশান। সাড়ে পাঁচটা বাজে।

ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা টাচ স্ক্রিন প্যানেল ছিল। বেঁটে মতন আর-একজন অফিসার প্যানেলের একটা বোতামে আঙুল ছোঁয়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা মিষ্টি ইলেকট্রনিক সুর বেজে উঠল। আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই ছোট কাচের ঘরটায় এসে দাঁড়াল প্যাসকো। ওর চোখে ঘুম লেগে আছে।

জিশানের চোখে তাকিয়ে প্যাসকো একগাল হাসল : 'হাই, জিশান!'

'হাই!'

তারপর প্যাসকো অনেকক্ষণ জিশানের দিকে চেয়ে রইল। দুজনেই চুপচাপ।

একসময় ছোট জানলার ভেতর দিয়ে হাত বাড়াল প্যাসকো। জিশান ওর হাত ধরল। চাপ দিল। উষ্ণতার আদানপ্রদান হল।

প্যাসকো বলল, 'শালারা ঢোকার সময় এক্স-রে আর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে হেভি ছানবিন করেছে। যাকগে, শোনো ব্রাদার, ছোট্ট একটা টিপস। কিল গেমের আসল অস্ত্র হচ্ছে মোটরবাইক। এটা ভুলো না।

সবসময় ভাববে, বাইকটা কোনও ভেহিকল নয়—ওটা তোমার বডির একটা পার্ট —হাত-পায়ের মতো...।'
জিশান সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।
'গেম সিটিতে ঢুকেই আগে একটা বাইক হাতিয়ে নেবে। তারপর ওই চারশো স্কোয়ার কিলোমিটার তোমার—একা তোমার...।'
জিশান আবার ঘাড় নাড়ল।
একজন অফিসার টাচ স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেন। মিষ্টি সুর বেজে উঠল আবার।
'টাইম শেষ।' অন্য অফিসার বলে উঠলেন।
প্যাসকো বলল, 'গুড লাক।' তারপর 'থামস আপ'-এর ভঙ্গিতে ডানহাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।
জিশান 'বাই—' বলল বটে, তবে ওর ঠোঁট নড়ল শুধু—কোনও শব্দ শোনা গেল না।
প্যাসকো চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকল সুধাসুন্দরী। জিশানের চোখে তাকিয়ে চুপ করে রইল।
জিশান লক্ষ করল, ও ঠোঁট চেপে আছে। হয়তো কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।
সুধা খোপ দিয়ে হাত বাড়ল। জিশানও। প্রায় পাঁচ-সাত সেকেন্ড ওরা একে অপরের হাত ধরে রইল। তারপর সুধা মাথাটা ওপর-নীচে নাড়াল শুধু। জিশানের হাতটা ছেড়ে দিয়ে ও আবার জিশানের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। একসময় আচমকা মুখটা এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে কিউবিকল থেকে চট করে চলে গেল।
জিশান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকল গুনাজি।
ছেলেটা জিশানের হাত চেপে ধরে শুধু 'দাদা! দাদা!' বলে কাঁদতে লাগল।
গুনাজির পর পান্ডা এল কিউবিকলে। ওর চোখ লাল। শরীরটা অল্প-অল্প টলছে।
ও জিশানের দিকে তাকিয়ে একটু জড়ানো গলায় বলল, 'জয় হো!'
তারপর একটা সেলাম ঠুকল।
পান্ডার পর মূর্তির পালা। মূর্তি মাথা নীচু করে কাঁদছিল। কোনও কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পর, চলে যাওয়ার সময়, জিশানকে বুক চিতিয়ে ভেজা চোখে স্যালুট করল।
মূর্তির পর 'লাস্ট স্টপ' চেম্বারে ঢুকল সেই নাম-না-জানা গার্ড—যার বাড়ি নাহাইতলা গ্রামে।
গার্ড ছোট খোপের ভেতর দিয়ে ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।
জিশান হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে দেখল, গার্ডের হাতে একটা লাল টুকটুকে আপেল।
গার্ড বলল, 'নাও, তোমার জন্যে এনেছি—।'
জিশান আপেলটা নিল। তারপর ওপর হাতে হাত মেলাল।
গার্ড বলল, 'ভগবানের ভরসায় থেকো না। মনে রেখো, ভাই, তোমাকে ছেলের কাছে ফিরে যেতে হবে...।'
জিশান ওপর-নীচে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ওর মনে থাকবে—গার্ডের দুটো কথাই।
জিশানের দিকে তাকিয়ে গার্ড চেষ্টা করে হাসল। বলল, 'যদি তুমি সুযোগ দাও তা হলে তোমাকে আমার দেশের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাব—।'
'যাব।' জিশান বলল।
একটু পরেই ইলেকট্রনিক ঘণ্টা বেজে উঠল। গার্ড কিউবিকল থেকে চলে গেল।
একজন অফিসার বললেন, 'আর কোনও ভিজিটর নেই। চলুন, এবার ফাইনাল মেডিকেল চেক আপ...।'
অফিসারের দেখানো করিডর ধরে জিশান এগিয়ে চলল।
একটা ছোট ঘরে ওর মেডিকেল চেক আপ হল। মাত্র সাত মিনিটেই হাই-টেক চেক আপ শেষ। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়া হল একটা দরজার সামনে। দরজাটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। দেখেই বোঝা যায়, যথেষ্ট

শক্তপোক্ত এবং ভারী।

একজন অফিসার একমনে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

হঠাৎই দরজার ওপরে লাগানো একটা প্লেট টিভি চালু হয়ে গেল। টিভি-টা যে ওখানে বসানো আছে সেটা জিশান আগে খেয়ালই করেনি।

টিভি থেকে শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। তবে ওঁর চোয়ালের রেখাগুলো নিষ্ঠুর।

শ্রীধর বললেন, 'বেস্ট অফ লাক, জিশান...।'

সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় যেন একটা সুরেলা ঘণ্টি বেজে উঠল। আর স্টেইনলেস স্টিলের ভারী দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যেতে লাগল।

সকাল থেকে এই প্রথম প্রকৃতির আলো দেখতে পেল জিশান।

শ্রীধর পাট্টা টিভি থেকে আবার বললেন, 'দ্য গেম সিটি ইজ ইয়োরস—।'

খোলা দরজা পেরিয়ে জিশান গেম সিটিতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের নীল বোতাম টিপে দিল।

•

মাথার ওপরে ভোরের নরম আকাশ। আর সামনে মসৃণ পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে নীলচে মোলায়েম ভোরের আলো। কারণ সূর্য এখনও ওঠেনি।

রাস্তার ডানদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা সুন্দর-সুন্দর বাড়ি : কোনওটা গোলাপি, কোনওটা হালকা বাদামি, কোনওটা হালকা নীল অথবা চোখ-ধাঁধানো রুপোলি।

আর বাঁ-দিকে বড়-বড় গাছের বাগান। সেই বাগান যতই ছড়িয়েছে ততই ঘন চেহারা নিয়েছে।

চোখের সামনে এই দৃশ্যটা দেখে জিশানের মনে হচ্ছিল যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা সুন্দর ছবি। যেন কোনও অলীকনগরীতে পা দিয়েছে ও। অথচ এখানেই মৃত্যু লেখা আছে।

জিশানের হাতে গার্ডের দেওয়া আপেলটা ছিল। একহাতে আপেল, অন্য হাতে অপটিক্যাল ট্যাবলেট। চারপাশের সুন্দরকে দেখতে-দেখতে ও আপেলটায় কামড় বসাল।

কী মিষ্টি!

একইসঙ্গে ওর মনে হল,লড়াইয়ের জন্য জরুরি এক জীবনীশক্তি ওর শরীর আর মনে ঢুকে পড়ল। আপেলটা খেতে-খেতে ও রাস্তা ধরে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। ওর দু-চোখ একটা মোটরবাইক খুঁজছিল—কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছিল না।

আপেলটা খাওয়া শেষ হতেই জিশান ছুটতে শুরু করল। তখনই ঠিকঠাক টের পেল স্নিকারটা কত আরামে ওর পা-কে জড়িয়ে রেখেছে।

ছুটতে-ছুটতেই বাড়িগুলোর কাছাকাছি চলে এল জিশান। তখনও ও মোটরবাইকের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, তাই বাড়িগুলোর দিকে ততটা মনোযোগ দেয়নি।

একটা হইচই চিৎকার কানে যেতেই ও ওপরদিকে মুখ তুলল। কয়েকটা বাড়ির বারান্দা আর ছাদে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—জিশানের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে, হাত নাড়ছে। ওরা জানে, ভোর ছ'টাতেই কিল গেম শুরু হয়ে গেছে।

ছুটতে-ছুটতে পালটা হাত নাড়ল জিশান। তারপর একটা বাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ট্যাবলেটটা বগলে চেপে মুখের কাছে দু-হাতের তালুর চোঙা তৈরি করে চেঁচিয়ে বলল, 'মোটরবাইক! মোটরবাইক!'

সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা হাত একটা দিক দেখাল। চিৎকার করে বলল, 'ওইদিকে—ওইদিকে!'

জিশান হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানাল। এবং ছুটতে শুরু করল।

দশ-বারো সেকেন্ড পেরোতে না পেরোতেই ও মোটরাবইকগুলো দেখতে পেল। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাত-আটটা রঙিন বাইক দাঁড় করানো রয়েছে। যেন সাত-আটটা রঙিন চিতাবাঘ। তারপাশে ছ'টা প্রাইভেট কার। মাপে ছোট, তবে নিশ্চয়ই হাই-টেক।

দৌড়ে গিয়ে একটা কালো চিতাবাঘের পিঠে চড়ে বসল জিশান, অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা কেরিয়ারে রাখল। তারপর চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল। ছুটতে শুরু করল।

এর মধ্যেই কখন যেন সূর্য উঠে গেছে। বাড়ির মাথায়, গাছের মাথায় রোদের ছোঁয়া লেগেছে।

জিশান পিচের রাস্তা ধরে বাইক চালাতে লাগল। দেখা যাক এই রাস্তাটা কোথায় গেছে!

বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বারান্দা কিংবা ছাদের দিকে তাকিয়ে উৎসাহী লোকজনকে দেখতে পাচ্ছিল। তারা হাত নাড়ছে। জিশানকে দেখার আশায় ভোর ছ'টা থেকেই অপেক্ষা করছে। টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেলেও খালি চোখে সরাসরি দেখতে পাওয়ার আনন্দই আলাদা।

বাড়ির সারির ফাঁকে-ফাঁকে বেশ কয়েকটা টিভি ক্যামেরা জিশানের চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে তাকিয়ে একইরকম দৃশ্য দেখতে পেল জিশান। গাছে-গাছে লাগানো টিভি ক্যামেরার চোখ। না:, শ্রীধর পাট্টার প্ল্যানিং-এ কোনও গণ্ডগোল নেই!

প্রায় পনেরো মিনিট বাইক চালানোর পর গেম সিটির একটা বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। কালো পাথরে তৈরি শক্তিশালী পাঁচিল। দেখামাত্রই জেলখানার কথা মনে পড়ে।

রাস্তাটা বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে। জিশানও রাস্তা ধরে বাইক ঘোরাল। একপলক হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা পঁচিশ। জলতেষ্টা পাচ্ছে—তার সঙ্গে খিদেও।

একটু পরে রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করাল। কেরিয়ার থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে লাল রঙের চৌকো বোতামটা টিপল। পরদায় কতকগুলো লাল ব্লিংকিং ডট ফুটে উঠল। জিশানের ফুড ম্যাপ। পটাপট বোতাম টিপে সবচেয়ে কাছাকাছি ফুড পয়েন্টটা কোথায় দেখে নিল জিশান। তারপর ট্যাবলেট কেরিয়ারে ঢুকিয়ে আবার বাইকে চড়ে দৌড়।

ট্যাবলেটের নিশানা বারবার চেক করে রাস্তা ছেড়ে গাছপালার মধ্যে ঢুকতে হল জিশানকে। আলোছায়ার কাটাকুটির মধ্যে সাপের মতো এঁকেবেঁকে বাইক চলছিল। চারিদিকে সবুজ আর বাদামি পাতার ছড়াছড়ি। বাইকের আওয়াজ পেয়ে গাছের পাখিরা ডেকে উঠল। এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল।

একটা ফুড পয়েন্টের কাছে পৌঁছে বাইক থামাল। নেমে পড়ল বাইক থেকে।

চারপাশে বড়-বড় গাছ। তাদের ঘিরে ছোট-বড় আগাছা। চোখে পড়ল, প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।

ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে ফুড পয়েন্টটার ব্লিংকিং ডটে আঙুল ছোঁয়াল জিশান। সঙ্গে-সঙ্গে খুব কাছাকাছি কোনও লুকোনো জায়গা থেকে পিপ-পিপ শব্দ শোনা গেল। চারপাশে তাকাল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা?

ট্যাবলেট হাতে নিয়ে শব্দের উৎসের খোঁজ করতে লাগল। এবং একমিনিটের কম সময়েই খোঁজ পেয়ে গেল।

একটা বিশাল গাছের গোড়ার কাছ থেকে শব্দটা আসছে। পিপ-পিপ, পিপ-পিপ।

দৌড়ে সেখানে গেল জিশান। হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। পড়ে থাকা কয়েকটা পাতা সরাতেই চোখে পড়ল ঝুরো মাটি।

পকেট থেকে একটা অস্ত্র বের করল : হান্টিং নাইফ। টেম্পারড স্টিলের সাত ইঞ্চি লম্বা ব্লেড। একদিক ধারালো, অন্যদিকে কুমিরের পিঠের মতো খাঁজকাটা। ছুরিটা বাগিয়ে ধরল। তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

একটু পরেই দেখা গেল একটা স্টিলের বড় বাক্স। তার গায়ে অদ্ভুত ধরনের সব ভাঁজ। সেটা টেনে বের করল। ঝুরো মাটি ঝেড়েঝুরে বাক্স খুলল।

ওর খাবার দেখতে পেল জিশান।

ছ'টা চিকেন স্যান্ডউইচ। চারটে ডিমের ওমলেট। আর দু-লিটার জলের একটা বোতল।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। চটপট খাওয়া শুরু করল।

খেতে-খেতেই জিশানের মাথায় একটা আইডিয়া এল। আচ্ছা, ফুড পয়েন্টগুলোকে আর্মস পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়!

কথাটা মাথায় আসামাত্রই জিশান দুরন্ত স্পিডে খাওয়া শেষ করল। বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেল। ছিপি টাইট করে এঁটে বোতলটা আবার রেখে দিল বাক্সের ভিতরে।

জিশান চারটে স্যান্ডউইচ খেয়েছিল। দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। কারণ, ওর মনে হয়েছিল, বাক্সের খাবার শেষ করে দিলে ফুড ম্যাপে এই নির্দিষ্ট ফুড পয়েন্টটা ব্লিংকিং ডট হিসেবে আর নাও দেখা যেতে পারে। শ্রীধর পাট্টার দুষ্টু বুদ্ধিকে বিশ্বাস নেই।

কিন্তু এই ব্লিংকিং ডটগুলো জিশানের কাছে এখন ভীষণ জরুরি। কারণ, ও ঠিক করেছে এই পয়েন্টগুলোতে ও রুকস্যাকে ভরা নানান আর্মস লুকিয়ে রাখবে। তা হলে ফুড ম্যাপের বোতাম টিপলেই ও একইসঙ্গে ফুড পয়েন্ট আর আর্মস পয়েন্ট দেখতে পাবে। অথচ ওর শত্রুরা এই লোকেশনগুলোর একটাও দেখতে পাবে না।

সুতরাং কাজ শুরু করল জিশান।

রুকস্যাক থেকে বের করে নিল লেজার পয়েন্টার লাগানো হাই-রেঞ্জ টুয়েন্টি শুটার অটোমেটিক পিস্তল। সেটাকে মাটির নীচে ফুড বক্সের পাশে শুইয়ে দিল। তারপর মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে আগের মতোই ছড়িয়ে দিল।

জিশানের হঠাৎই মনে পড়ল টিভি ক্যামেরার কথা। ক্যামেরার চোখগুলো নিশ্চয়ই ওর ওপরে সর্বক্ষণ নজর রাখছে। তা হলে কোটি-কোটি মানুষের কাছে জিশানের এই কাণ্ডকারখানা লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে এই মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে!

সে যায় যাক! তা না হলে ইঁদুর আর বেড়ালের লুকোচুরি খেলা জমবে কেমন করে! তা ছাড়া ওর তিন শত্রু কখনওই জিশানের এই কৌশলের কথা জানতে পারবে না। কারণ, ওরা কোনওভাবেই টিভির লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে পাবে না। জিশানের হিসেব অন্তত তাই বলছে।

গেম সিটির 'নাগরিকরা' তখন কিল গেমের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছিল। চলমান ছবির পাশাপাশি চলছিল উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার মশলা ঠাসা ধারাভাষ্য। ধারাভাষ্য যিনি দিচ্ছিলেন তিনি আবেগ মাখানো জোরালো গলায় জিশানের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন। বলছিলেন, কিল গেম শুধু শারীরিক শক্তি আর দক্ষতার মোকাবিলা নয়, বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর ধারেরও লড়াই।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল জিশান। চারপাশে তাকাল। গাছপালা, আলোছায়া। শোনা যাচ্ছে দু-তিনরকমের পাখির ডাক।

হঠাৎই অদ্ভুত একটা শব্দ জিশানের কানে এল। কেউ যেন মিহি গলায় কাশছে। অথবা হাসছে।

একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। কই, কেউ তো কোথাও নেই!

শব্দটা আবার শোনার জন্য জিশান দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎই বাঁ-দিকের একটা নড়াচড়া ওর চোখের কোণে ধরা পড়ল। চকিতে চোখ ফেরাল জিশান। সঙ্গে-সঙ্গে আশঙ্কার ঠান্ডা ছোবল টের পেল বুকের ভেতরে।

একটু দূরে দুটো মোটা-মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে তিনটে হায়েনা ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

বাদামির ওপরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। কুকুরের চেয়েও বড়সড় চেহারা। কানগুলো ভোঁতা। গলার বেশ কিছুটা জায়গায় কালচে রং।

এমনিতে হায়েনা যে মানুষকে আক্রমণ করে না সেটা জিশান জানে। কিন্তু এই তিনটে লোভাতুর প্রাণীকে দেখে ও তেমন একটা ভরসা পাচ্ছিল না।

গত কয়েক মাসে জিশান বহুবার গেম সিটি নিয়ে শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু শ্রীধর একটিবারের জন্যও ওকে বলেননি যে, গেম সিটির জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী রয়েছে।

তা হলে কি হায়েনার চেয়ে বড়সড় প্রাণীও থাকতে পারে এই জঙ্গলে?

তা ছাড়া এই হায়েনাগুলো স্বাভাবিক হায়েনা কি না কে জানে! হয়তো শ্রীধরের পোষা বিজ্ঞানীরা এদের শরীরে নানান কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে এদের আরও হিংস্র, আরও বেপরোয়া করে তুলেছে।

জিশান আড়চোখে দেখল, বাইকটা ওর যথেষ্ট কাছাকাছি রয়েছে। সুতরাং আর দেরি না করে ও দু-লাফে বাইকের কাছে পৌঁছে গেল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বাইকে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

আশ্চর্য! হায়েনা তিনটে লাফ মেরে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। এবং রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতো জিশানের বাইকটাকে তাড়া করতে শুরু করল। যদিও জিশানের বাইকের হাই মোটিভ পাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হায়েনাগুলোকে পিছনে ফেলে দিল।

জিশান ঠিক করল দু-ঘণ্টার মধ্যে যেটুকু সময় হাতে আর বাকি আছে তার মধ্যে ও যতগুলো ফুড পয়েন্ট পারবে কভার করবে।

গেম সিটির মধ্যে জিশানের বাইক ছুটে বেড়াতে লাগল। কখনও জঙ্গলে, কখনও রাস্তায়, কখনও বা নদীর ওপরে ফ্লাইওভারে। আবার কখনও পাহাড়ে।

যতই ঘুরে বেড়াচ্ছিল ততই অবাক হচ্ছিল জিশান। চারশো বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কীভাবে একটা বিচিত্র শহর তৈরি করেছেন শ্রীধর! এখানে বাড়ি-ঘর আছে, নদী আছে, জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে—এমনকী বন্যপ্রাণীও ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের আড়ালে! এরকম নকল শহর সিনেমার শুটিং-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা অবসর বিনোদনের রিসর্ট হিসেবে। কিন্তু শ্রীধর পাট্টা এই শহরটা তৈরি করেছেন বধ্যভূমি হিসেবে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা রোজগারের জন্য বিনা ঝুঁকির বিনিয়োগ।

রাস্তা ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল জিশান। পথ ঘেঁষে অনেকগুলো বাড়ি আর দোকান। একটু দূরেই সার বেঁধে দাঁড় করানো রয়েছে অনেকগুলো গাড়ি আর মোটরবাইক।

কয়েকটা বাড়ির দরজায় লোকের ভিড় চোখে পড়ল। ওরা বোধহয় টিভির লাইভ টেলিকাস্টে দেখতে পেয়েছে জিশান এই পথ দিয়েই আসছে।

জিশানকে দেখামাত্রই ওরা সবাই হইচই করে উঠল, হাত নাড়তে লাগল। হঠাৎই ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা ছোট মেয়ে। ছেলেটার বয়েস বোধহয় ছয় কি সাত, আর মেয়েটার ন'দশ। ওদের বাবা-মা আর অন্যান্য মানুষজন দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওদের ডাকছিল, 'রাস্তায় যাস না! চলে আয়! শিগগির ফিরে আয়!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটা আর মেয়েটা একেবারে জিশানের বাইকের পথ আটকে দাঁড়াল। 'জিশান! জিশান!' বলে চিৎকার করতে লাগল।

জিশান ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি। এই কুড়ি মিনিট গেম সিটির পথঘাট নিরাপদ—কারণ, কিলাররা এখনও মাঠে নামেনি।

জিশান ইচ্ছে করলে ওদের পাশ কাটিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সেটা করল না। ও বাইক থামাল। কী বলতে চাইছে বাচ্চা দুটো? ছেলেটার মুখের সঙ্গে ছেলে শানুর মুখের মিল খুঁজে পেল। জামার বাঁ-পকেটের ওপরে হাত ছোঁয়াল। মিনি আর শানুর ফটো অনুভব করল।

জিশান বাইক থেকে নামল। বাচ্চা দুটো তিরবেগে ছুটে চলে এল ওর কাছে। একসঙ্গে বলে উঠল, 'অটোগ্রাফ দাও, জিশানকাকু—অটোগ্রাফ।'

তখনই খেয়াল করল, দুজনের হাতেই একটা করে পাতলা খাতা, আর পেন।

জিশান ফুটফুটে বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে তাকাল। তারপর পেন নিয়ে খাতা দুটোর পাতায় পরপর সই করল। তারপর বড় করে লিখে দিল, 'ভালোবাসা নাও—।'

বাড়িগুলোর দরজার কাছে আর দোকানের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন চিৎকার করতে লাগল, 'জি—শান! জি—শান!'

জিশান সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। তারপর বাচ্চা দুটোকে নাম জিগ্যেস করল।

মেয়েটার নাম টুকটুকি, আর ছেলেটার নাম কাঞ্চন।

কাঞ্চন বলল, 'জিশানকাকু, আমরা তোমার সঙ্গে ফটো তুলব—।'

এ কী আবদার! সময় যে বড় কম! আর-একটু পরেই কিলাররা গেম সিটিতে ঢুকে পড়বে!

টুকটুকি জিশানের হাত ধরে টানতে শুরু করল : 'এসো না! এসো! ওইখানটায় দ্যাখো—টিভিতে তোমাকে দেখাচ্ছে। চলো, দেখবে চলো...।'

জিশান দোটানায় পড়ল। ওর মনে হল, শানু টুকটুকির মতো বড় হয়ে গেছে। ওর হাত ধরে টানছে।

জিশান যেন কোন এক জাদুমন্ত্রে অবশ হয়ে গেল। নাকি বলা ভালো, বশ হয়ে গেল। টুকটুকির ওপরে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে ছেড়ে দিল। পায়ে-পায়ে এগোতে শুরু করল রাস্তার ধারের একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের দিকে।

আশপাশের ভিড় করা জনতা হইহই করে উঠল। 'জিশান! জিশান!' বলে চিৎকার করতে লাগল। টুকটুকি আর কাঞ্চন জিশানের দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। ক্যামেরার আলোর ঝলক দেখা গেল বারবার। ওদের ফটো উঠতে লাগল।

দোকানের কাছে যেতেই জিশানকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। ওকে একবার ছোঁয়ার জন্য লোকজন পাগলামি শুরু করে দিল। টুকটুকি দোকান থেকে একটা কেক নিয়ে জিশানকে দিল : 'কাকু, এটা খেয়ে নাও—প্লিজ!'

জিশান ছোট মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল। ওর চোখে মায়ের মমতা।

জিশান 'না' বলতে পারল না। কেকটা খেতে লাগল। তখনই কে একজন একটা জলের বোতল বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

জিশান জল খেল। তখনই ওর প্লেট টিভির দিকে চোখ গেল। দোকানের একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড মাপের প্লেট টিভি। সেখানে জিশানকে দেখা যাচ্ছে। চারপাশে মানুষজনের ভিড়।

টিভির কমেন্টেটর তখন বলছেন, '...আপনারা দেখুন, একটা ছোট্ট মেয়ে ওর ''জিশানকাকু''-কে একটা কেক খাওয়াল। আমরা এই মেয়েটিকে তিরিশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেব। যারাই আমাদের সুপারহিরো জিশানকে সাপোর্ট দেবে, হেলপ করবে, তাদের জন্যে রয়েছে নানা অ্যামাউন্টের প্রাইজ মানি। ওয়েল ফোকস, আর-একটু পরেই শুরু হবে কিল গেমের অ্যাকশন...।'

নিজেকে টিভির পরদায় লাইভ টেলিকাস্টে দেখতে পেয়ে জিশানের বেশ মজা লাগছিল। ও ঝুঁকে পড়ে এক হ্যাঁচকায় কাঞ্চনকে কোলে তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে টিভির পরদায় সেই ছবি চলে এল। ছবির পাশাপাশি ধারাবিবরণী।

'দেখুন—আপনারা জিশানকে দেখুন! কী পারফেক্ট! কী সাংঘাতিক কুল!' এবার কমেন্টেটরকে দেখা গেল। চশমা চোখে পোড়খাওয়া একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক। কপালে ভাঁজ, মাথায় টাক। গলায় একটা সোনার চেন। তাঁর পাশেই বসে আছে অল্প পোশাকের একজন তরুণী। মুখে চড়া মেক-আপ।

কমেন্টেটর তখন বলছিলেন, 'আমার পাশেই বসে রয়েছেন কিল গেম আরকাইভের সিইও শবনম। ঠিক-ঠিক সময়ে শবনম আপনাদের পুরোনো কিল গেমের নানান ক্লিপিংস দেখাবেন, যাতে পুরোনো কিল গেমের সিচুয়েশানের সঙ্গে আপনারা নতুন কিল গেম—মানে, জিশানের কিল গেম কমপেয়ার করতে পারেন...।

'এখন তাকিয়ে দেখুন, জিশানের মুখে কী সুন্দর স্নেহ আর মমতা মাখানো। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ওর বছর দেড়েকের একটা ছেলে রয়েছে—ভালো নাম অর্কনিশান। আর ডাকনাম শানু। দেখুন, দেখুন, কোলে

তুলে নেওয়া বাচ্চা ছেলেটিকে জিশান কীভাবে আদর করছে। অথচ....অথচ এই জিশান—জিশান পাল চৌধুরী—একটু পরেই হয়ে উঠবে নির্মম, নিষ্ঠুর। ঠান্ডা মাথায় ও তখন কিল গেমের তিন-তিনজন কিলারের সঙ্গে সশস্ত্র মোকাবিলা করবে।

'আটটা বাজতে এখন পাঁচমিনিট। আর পাঁচমিনিট পরেই খুনিরা পা রাখবে গেম সিটিতে। শুরু হবে ইঁদুর আর বেড়ালের লড়াইয়ের খেলা। কিন্তু কে ইঁদুর আর কে বেড়াল সেটাই প্রশ্ন। এখন নিচ্ছি একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি। চারমিনিট পরেই আবার ফিরে আসছি। টিভির সামনে থেকে কোথাও যাবেন না, প্লিজ...।'

শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞাপন।

জিশান ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বাজতে চার মিনিট।

না, আর দেরি করা যাবে না। কাঞ্চনকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। তবে তার পশ্চিমদিকে হালকা মেঘের চাদর। বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। জিশানের শ্বাস নিতে ভালো লাগছিল।

ও চারপাশের ভিড়ের দিকে তাকাল। মানুষগুলোকে দেখেও ওর ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে ও জীবনের অনেক কাছাকাছি রয়েছে।

কিন্তু না। এখনই ওকে মোটরবাইকে চড়ে ছুট লাগতে হবে। আর এই মানুষগুলোও দৌড়ে চলে যাবে ওদের বাড়ি কিংবা দোকানের ভেতরে—ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ঝুঁকে পড়ে কাঞ্চন আর টুকটুকির মাথায় চুমু গেল জিশান। আর তারপরই দৌড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওর বাইকের দিকে।

ভিড় থেকে দু-তিনজন চিৎকার করে বলল, 'জিশান, আমরা তোমার পাশে আছি। আমরা তোমার ফ্যান!'

ততক্ষণে জিশানের বাইক ছুটতে শুরু করেছে।

কিন্তু কিছুটা পথ গিয়েই একটা ফাঁকা মাঠে পৌঁছে গেল। ধু-ধু প্রান্তর। ঢেউখেলানো উঁচু-নীচু মাঠ। আর কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও ধুলো আর মাটি। এ ছাড়া কয়েকটা বড়-বড় গাছ—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে।

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বেজে এক মিনিট।

বাইক থামাল জিশান। বাইকের আওয়াজ থেমে যাওয়ামাত্রই চারপাশে স্তব্ধতা নেমে এল। শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা পাখির ডাক।

বাইকের কেরিয়ার থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করল জিশান। তারপর ট্র্যাকার অন করল।

ওই তো দেখা যাচ্ছে তিনটে লাল ডট! যে-দরজা দিয়ে জিশান গেম সিটিতে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়েই তিনজন কিলার গেম সিটিতে ঢুকেছে। তবে তিনটে ডট এখনও খুব কাছাকাছি। তার মানে, ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গেম প্ল্যান তৈরি করছে।

জিশান টাচ স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়াল। লাল ডট তিনটে যে-স্কোয়ার টাইলের মধ্যে ছিল সেটা বড় হয়ে ক্লোজ আপ ভিউ দেখাল।

জিশান ঠিকই ভেবেছে। গেম সিটিতে ঢুকে ওরা এখন পিচের রাস্তায় রয়েছে। ট্র্যাকারে জিশানের সবুজ ডটটা ওরা দেখতে পাচ্ছে। হয়তো ভাবছে, রাস্তায় পার্ক করা গাড়ি আর বাইকগুলোর মধ্যে কোনটা নেবে এবং ক'টা নেবে।

ইস, জিশানের সঙ্গে একটা প্লেট টিভি থাকলে ভালো হত! ও সরাসরি কিলারদের দেখতে পেত। ওরা কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে চলেছে সেটাও জানতে পারত।

আপনমনেই মাথা নাড়ল জিশান। না:, একটা প্লেট টিভি দরকার। কিন্তু কীভাবে সেটা পাওয়া যায়?

আচ্ছা, একটু আগেই যেসব মানুষজনের সঙ্গে ওর দেখা হল তাদের কাছে চাওয়া যায় না? একটা ছোট টিভি চাইলে জিশানকে ওরা দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে।

জিশান বাইক ঘোরাল। এখন শুধু দরকার স্পিড...স্পিড।

•

ধু-ধু ফ্লাইওভারের ঠিক মাঝখানটিতে পৌঁছে মোটরবাইক থামাল জিশান।

বেলা বেড়েছে। রোদ অনেক চড়া হয়েছে। বাতাস বইছে। জিশানের লম্বা চুল উড়ছে।

ফ্লাইওভারের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। অনেক নীচে ঠান্ডা জলের নদী। কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দেখলেই মনে হয়, এ জগতে সবকিছু শান্তি-কল্যাণ হয়ে আছে।

ফ্লাইওভার বরাবর দু-দিকে তাকাল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ফ্লাইওভারের মাঝখানটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু হওয়ায় নজর চালানোর সুবিধে হয়েছে। বাইক নিয়ে গেম সিটির সর্বত্র দুরন্ত ছুটোছুটি না করে কোথাও-কোথাও বাইক দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়াটা অনেক বেশি কাজের। তাতে হাঁপিয়ে যাওয়া শরীরে নতুন শক্তি ফিরে আসে। আর একইসঙ্গে কিল গেমের সময়টাকে ধীরে-ধীরে পার করে দেওয়া যায়। তবে মাঝে-মাঝেই ট্র্যাকারের দিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে—কিলারদের কাছ থেকে জিশানের দূরত্ব খুব বেশি কমে না যায়।

নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর চোখ মেলে দিল জিশান। কী নাম এই মিষ্টি নদীটার? কে জানে! যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু গাছপালা। তারই মাঝে হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিয়েছে দুটো পাথুরে পাহাড়। আবার ডানদিকে চোখ সরালেই চোখে পড়ছে ঘর-বাড়ি—যে-ঘর-বাড়িগুলো শুধু আজকের জন্য মানুষে-মানুষে জমজমাট। কাল সকালের পর আবার সব ফাঁকা! তখন এই গেম সিটিটা খাঁ-খাঁ করবে।

আকাশে কয়েকটা চিল উড়ছিল। ওরা বাঁশি বাজনোর শব্দ করে ডাকছিল। সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল জিশান। হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর বাইকের কেরিয়ার থেকে ট্র্যাকারটা বের করে নিল।

ওই তো তিনটে লাল ডট! একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

জিশান বুঝতে পারল, তিনজন কিলার কী করতে চাইছে। ওরা তিনদিক থেকে সবুজ ডটটাকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। যাতে সবুজ ডটটা সবসময় তিনটে লাল ডট দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের মধ্যে থাকে। তারপর তিনটে লাল ডট ক্রমশ ত্রিভুজটাকে মাপে ছোট করতে থাকবে। একসময় লাল ডটগুলো হিংস্রভাবে সবুজের ঘাড়ে এসে পড়বে।

ফ্লাইওভারের যা কো-অর্ডিনেট তাতে লাল ডটগুলো এদিকটায় সরে আসতে বেশ সময় নেবে। আর যদি আচমকা ওরা এসেও পড়ে তা হলে জিশান ফ্লাইওভারের উত্তর দিকের রাস্তা ধরে নেমে আসবে। ফ্লাইওভার শেষ হওয়ার পাঁচ-ছ' হাত পরেই একটা কাঁচা রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বাঁ-দিকে। তারপর সোজা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। জিশান সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়বে জঙ্গলে—গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দেবে।

এবার টিভিটা একবার সুইচ অন করে দেখা যাক।

যে-প্লেট টিভিটা গেম সিটির 'সিটিজেন'রা জিশানকে হইহই করে গিফট করেছে সেটার মাপ মাত্র আট ইঞ্চি। জিশান ইচ্ছে করেই সবচেয়ে ছোট মাপের টিভিটা চেয়েছে। ওটা দেখারও সুবিধে, ক্যারি করাও সুবিধে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে আবার প্লেট টিভিটা বের করে নিল জিশান। তারপর সুইচ অন করল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রঙিন ছবি ফুটে উঠল টিভিতে। আর সেই ছবি দেখামাত্রই জিশান হতবাক হয়ে গেল।

কারণ, টিভির পরদায় তখন অপাশি কানোরিয়াকে দেখা যাচ্ছে। নিষ্পাপ, গোলগাল ফরসা মুখ। গাল আর থুতনিতে হালকা দাড়ি। এই খুনিকে জিশান টিভির পরদাতে আগেও দেখেছে। কিল গেমের তিনজন কিলারের পরিচয় নিয়ে যখন কম্পিটিশন চলছিল তখন।

সেই প্রতিযোগিতার শেষে দুজন কিলারের পরিচয় দর্শকদের জানানো হয়েছিল। আর তিন নম্বর কিলারের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল—শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে। ফলে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি, আর পুরস্কারও মুলতবি রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিল গেমের সময়েই তিন নম্বর কিলারকে প্রথম দেখা যাবে, আর তখনই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিজেতাদের নাম টিভিতে ঘোষণা করা হবে। সারপ্রাইজ।

না, এসব ব্যাপারের জন্য জিশান অবাক হয়নি। কারণ, এসব তথ্য ওর আগে থেকেই জানা।

ও অবাক হয়েছে, কিলার অপাশি কানোরিয়ার হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোন দেখে। যে-ফোনে অপাশি এখন কথা বলছে আর-একজন কিলার সুখারাম নস্করের সঙ্গে।

তিনজন খুনি যে নিজেদের মধ্যে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করবে এ-কথা শ্রীধর পাট্টা জিশানকে জানাননি। কারণ, সারপ্রাইজ!

জিশান বুঝতে পারল, স্যাটেলাইট ফোনের একটানা সাহায্য নিয়ে তিনটে লাল ডট অত্যন্ত সাবলীলভাবে সবুজ ডটের নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর জিশানের স্যাটেলাইট ফোনটা শুধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে কথা বলার জন্য। অনেকটা যেন শ্রীধর আর ওর মধ্যে ইন্টারকম ফোন।

কিলার অপাশি গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ি চালাতে-চালাতেই ফোনে কথা বলছিল।

আর কিলার সুখারাম একটা চলন্ত বাইকের পিঠে বসে আছে। লাল আর কালো রঙের বাইক। বাঁ-হাতে একটা হাতল ধরে রয়েছে। ডানহাতে ফোন।

টিভিতে ধারাবিবরণী চলছিল।

পোড়খাওয়া মোটাসোটা কমেন্টেটর তখন বলছেন, 'কিলারদের কথাবার্তা আমরা ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না, তবে ওদের প্ল্যানটা মোটামুটি গেস করা যাচ্ছে। ওরা জিশানকে ট্রায়াঙ্গুলার ট্র্যাপে ফেলতে চায়। তাড়াহুড়োর কোনও ব্যাপার নেই...ওদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে...।'

এবার টিভির ক্যামেরা অপাশি কানোরিয়ার সিটের ওপরে ফোকাস করল।

কানোরিয়ার পাশেই সিটের ওপরে রাখা আছে কয়েকটা অস্ত্র। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের বন্দুক। রিভলভারের চেয়ে মাপে একটু বড়, তবে নলটা একটু বেশি মোটা আর লম্বা। ধারাভাষ্যকার অস্ত্রটার পরিচয় দিল : মিসাইল গান। এ থেকে যে-বড় মাপের বুলেট বা শেল বেরোয় সেটা ইনফ্রারেড রশ্মির উৎস লক্ষ্য করে ছুটে যায়। জীবন্ত মানুষের শরীর হল তাপের উৎস। সেই উৎস থেকে অবলোহিত রশ্মি বেরোয়। ফলে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে পালানো একজন মানুষকে এই মিসাইল গানের বুলেট আঁকাবাঁকা পথে তাড়া করে হিট করতে পারে।

মিসাইল গানের পাশেই রয়েছে নানান মাপের তিনটে চপার। কানোরিয়ার 'বাউন্ডারি' মারার 'ব্যাট'। কিন্তু আজ ওর সামনে বাউন্ডারি মারার সুযোগ নেই। আজ শুধু জিশান—মানে, একটা 'শর্ট রান'। কিন্তু এই শর্ট রান নিতে গেলে শত্রুর কাছে পৌঁছতে হবে। দুশমনটাকে পেতে হবে চপারের নাগালে।

কানোরিয়া সম্পর্কে টিভিতে অনেক কথাই শুনেছে জিশান। জেনেছেও অনেক কথা। কিন্তু সেইসব ভয়ংকর তথ্য জানার পরেও ওর কোনও হেলদোল হয়নি। কারণ, ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা জিশানের মধ্যে থেকে কয়েক মাস আগেই উধাও হয়ে গেছে।

কিলার অপাশির সঙ্গে কিলার সুখারামের ফোনে কথাবার্তা চলছিল। টিভি ক্যামেরা পালা করে একবার একে আর-একবার ওকে দেখাচ্ছিল—ঠিক সিনেমার মতন।

ছোটমাপের এই প্লেট টিভিটা হাতে না পেলে জিশান খুনিদের স্যাটেলাইট ফোনের ব্যাপারটা জানতেই পারত না। ভাগ্যিস একটা টিভি জোগাড় করার কথা ওর মনে হয়েছিল!

টিভির খোঁজ করতে কাঞ্চন আর টুকটুকিদের বাড়ির কাছেই আবার ফিরে গিয়েছিল জিশান। ওকে ফিরে আসতে দেখে জনতা হইহই করে উঠেছিল। ওর মোটরবাইক ঘিরে ধরেছিল চোখের পলকে।

দু-হাত তুলে ওদের হুল্লোড় আর উৎসাহ থামিয়ে একটা ছোট টিভির জন্য আবেদন করেছিল জিশান। ব্যস, তাতেই কাজ হল। এক মিনিটের মধ্যেই নানান মাপের ছ'-ছ'টা প্লেট টিভি এসে হাজির হল ওর সামনে। তার মধ্যে থেকে আট ইঞ্চি ডায়াগনালের ছোট প্লেট টিভিটা জিশান বেছে নিয়েছিল।

জিশান আর দেরি করল না। ট্র্যাকার আর টিভি গুছিয়ে রেখে বাইকে স্টার্ট দিল। ফ্লাইওভার পেরিয়ে বাঁ-দিকের ঢালু রাস্তা ধরে নেমে গেল।

একটু পরেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে প্যাঁচালো সুঁড়িপথ। তার ওপর পথটা আবার ডাল, পাতা আর আগাছায় ঢাকা। তারই ওপর দিয়ে জিশানের বাইক কোনওরকমে এগিয়ে চলল।

বাইকের গর্জনে গাছে বসে থাকা পাখিরা চঞ্চল হয়ে ডাকতে লাগল, ডানা ঝাপটে এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল। ছোট চেহারার গোলাপি বানরের দল চিঁ-চিঁ শব্দ করে ডালে-ডালে ছোটাছুটি করতে লাগল। ছাইরঙের দুটো খরগোশ চমকে উঠে ছুটে পালাল।

জিশান বেশ বুঝতে পারছিল, বাইকের শব্দটা ওর শত্রু। এই নির্জন শহরে বহু দূর থেকে ওর বাইকের আওয়াজ শোনা যাবে। তা ছাড়া বাইকটা কোথাও রেখে ও যে কোনও একটা গোপন আস্তানায় লুকিয়ে পড়বে তারও উপায় নেই। ট্র্যাকারের সবুজ ডট ওর নিখুঁত কো-অর্ডিনেট শত্রুদের জানিয়ে তো দেবেই, উপরন্তু ওর ছেড়ে যাওয়া বাইকটা নি:শব্দ চিৎকারে জানিয়ে দেবে যে, ও কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে।

তা হলে শত্রুদের চোখে ধুলো দেওয়ার উপায় কী?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে জিশান বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই ও দূরে গাছের আড়ালে দুটো হরিণ দেখতে পেল। হরিণ দুটোর গায়ের রং সোনালি-বাদামি আর সাদা। পেটের কাছ বরাবর লম্বা গাঢ় বাদামি দাগ। মোটরবাইকের আওয়াজে ওরা চমকে তাকিয়েছে জিশানের দিকে। তারপরই জঙ্গলের মধ্যে ছুট লাগিয়েছে।

জিশান বাইক থামাল। আর কতক্ষণ ও এই বাইকটা নিয়ে ছুটবে? কারণ, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো এই মেশিনটার তেল ফুরিয়ে যাবে। তখন?

জিশানের বিভ্রান্ত লাগল। নানান চিন্তা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

একটু পরেই ট্র্যাকারটা বের করে দেখল ও। একটা লাল ডট ওর সবুজ ডটের বেশ কাছে এসে গেছে। সেটা কে? অপাশি কানোরিয়া? না সুখারাম নস্কর? নাকি তিন নম্বর কিলার?

আর ভাবার দরকার নেই। ট্র্যাকার উলটে অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেখল। ওর মনে হল, ঘর-বাড়ির এলাকায় গেলেই ওর লড়াইয়ের কাজটা সহজ হবে। সুতরাং ও সেদিকে বাইক ছুটিয়ে দিল।

কিছুটা পথ চলার পরই জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। জায়গাটা গাছের পাতায় ঢাকা। টাটকা আর শুকনো গাছের পাতা কেউ যেন সেখানে ঝেঁটিয়ে এনে জড়ো করেছে।

জিশান বাইক চালাতে-চালাতেই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

ওর বাইক চলে এসেছিল গাছের পাতায় ঢাকা জায়গাটার ওপরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে গাছের পাতাগুলো চোরাবালির মতো বাইকসমেত জিশানকে গিলে ফেলল।

জিশান নীচের দিকে পড়তে লাগল। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির মতো ওর শরীরের ওপরে ঝরে পড়ছিল। একটু পরেই নরম মাটিতে ও বাইকসমেত আছড়ে পড়ল। এবং বাইক থেকে ছিটকে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোমরে ব্যথা। ডানহাতের কনুইয়েও সামান্য লেগেছে। গা থেকে কয়েকটা শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলল ও। বাইকটাকে সোজা করে দাঁড় করানোর আর চেষ্টা করল না। কারণ, বাইক নিয়ে এই গর্ত থেকে বেরোনোর কোনও গল্প নেই।

গর্তটা অনেকটা গন্ডার বা হাতি শিকারের ফাঁদের মতো। শুধু গর্তের নীচে শূলের মতো কাঠের গজাল পোঁতা নেই এই যা! কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এরকম ফাঁদের ব্যবস্থা কেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরল জিশান। শ্রীধর পাট্টা।

'এই গর্তটা সারপ্রাইজ, জিশান। গেম সিটিতে এরকম আরও অনেক সারপ্রাইজ তোমার জন্যে ওয়েট করছে...।'

জিশান বিরক্তভাবে 'থ্যাংক য়ু ভেরি মাচ' বলে ফোন কেটে দিল। এখন এই সাইকোপ্যাথটার সঙ্গে বাজে বকার সময় নেই। আগে এই গর্তটা থেকে বেরোনো দরকার। কে জানে, হয়তো কোনও কিলার এই মুহূর্তে ওকে খতম করতে গর্তটার দিকেই এগিয়ে আসছে। প্লেট টিভিটা একবার দেখা যাক। সেই সঙ্গে ট্র্যাকারটাও।

পড়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারের দিকে হাত বাড়াল। যন্ত্র দুটো এখনও ঠিকঠাক আছে তো!

ট্র্যাকারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জিশান। একটা লাল ডট সবুজ ডটের মারাত্মক কাছাকাছি। সঙ্গে-সঙ্গে ট্র্যাকার রেখে প্লেট টিভি অন করল।

পরদায় অপাশি কানোরিয়ার মুখ। কী যেন একটা করছে ও।

একটু পরেই দেখা গেল ও কী করছে। একটা বড়সড় জেরিক্যান থেকে জলের মতো কী যেন ঢালছে জঙ্গলের ঘাস-পাতার ওপরে। একটু দূরে একটা মোটরবাইক দাঁড় করানো রয়েছে।

কমেন্টেটর তখন বলছেন, 'ফোকস, শিকার আর শিকারি এখন অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। পরিভাষায় যাকে বলে স্ট্রাইকিং ডিসট্যান্স। জিশানকে জঙ্গলের মধ্যে ট্র্যাক করার জন্যে কিলার অপাশি কানোরিয়া একটু আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটরবাইক নিয়েছে। এখন ও বাইক থেকে নেমে অভিনব অপারেশান শুরু করেছে। জেরিক্যান থেকে অপাশি কী একটা লিকুইড যেন ঢালছে...।'

তখনই পেট্রলের গন্ধ পেল জিশান। শুকনো গাছের পাতা ভেজাতে-ভেজাতে তরল জ্বালানি নেমে আসছে গর্তের ভেতরে। জিশানের মরণকূপে। এরপর শুধু দরকার একটা দেশলাই-কাঠি।

অপাশি তা হলে অস্ত্র হিসেবে পেট্রল ভরতি কয়েকটা জেরিক্যানও নিয়েছিল!

জিশান ক্ষিপ্রগতিতে ট্র্যাকার আর টিভি ঢুকিয়ে দিল ওর রুকস্যাকে। তারপর হাঁচড়পাঁচড় করে গর্ত বেয়ে উঠে আসতে চাইল। কিন্তু বারবার হাত-পা স্লিপ করতে লাগল। তবে চারবারের চেষ্টায় খানিকটা উঠতে পারল। আর তখনই পেট্রলের ভেজা পথ ধরে আগুনের লকলকে শিখা ছুটে এল গর্তের দিকে।

জিশান একটা গাছের শিকড় ধরে এক হ্যাঁচকায় শরীরটাকে টেনে তুলল ওপরে। তখনই দাউদাউ শিখা ডিঙিয়ে অপাশি কানোরিয়াকে দেখতে পেল। নির্বিকার শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে লম্বা একটা চপার। তার চকচকে ফলা থেকে কমলা রঙের আগুনের ছায়া ঠিকরে বেরোচ্ছে। অপাশির বেশ কিছুটা পিছনে দাঁড় করানো রয়েছে একটা মোটরবাইক।

আগুনের তাপ আর শিখায় ভয় পেয়ে গেল গাছের পাখিরা। ওরা গাছের আশ্রয় ছেড়ে ছিটকে গেল আকাশে। একটা খরগোশ আর একটা বনবেড়াল কোন আড়াল থেকে বেরিয়ে দিগভ্রান্তের মতো ছুট লাগাল।

জিশানও ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ওর মনে পড়ল, অপাশি কানোরিয়ার ফেরোসিটি কোশেন্ট 9.4

'জিশা—ন!' বলে মিহি গলায় ডেকে উঠল অপাশি। আর একইসঙ্গে আদিবাসী যোদ্ধাদের ক্ষিপ্রতায় ওর হাতের চপারটা জিশানকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। ইস্পাতের অস্ত্রটা শূন্যে লাট খেয়ে তিরবেগে ছুটে এল জিশানের দিকে।

ছুটতে-ছুটতেই জিশান আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। চপারটা ওর শরীরের ইঞ্চিছয়েক ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। গেঁথে গেল একটা গাছের গুঁড়িতে। থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আবার উঠল জিশান। আবার ছুট। গাছপালার আড়ালে-আড়ালে, এঁকেবেঁকে। নাকে আসছে গাছ-পাতা পোড়ার গন্ধ। সেইসঙ্গে শরীরে টের পাচ্ছে গরম বাতাসের ছোঁয়া।

ছুটতে-ছুটতেই পকেটে হাত ঢোকাল। টেনে বের করে নিল মিসাইল গান। থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপাশিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। এক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে অপাশি সরে গেল একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে। ও যে শুধু সেজন্য বেঁচে গেল তা নয়। এখানে-সেখানে আগুন তখনও জ্বলছিল। ফলে মিসাইলের ইনফ্রারেড ট্র্যাকিং সিস্টেম বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। মিসাইলটা জলন্ত গাছ-পাতার আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এ-অঞ্চলের বাড়ি-ঘরগুলো কোনদিকে আছে জিশানের সেটা ভালোই আন্দাজ ছিল। ও মোটামুটি সেদিক লক্ষ্য করেই দৌড়তে লাগল। এক্ষুনি আর-একটা মোটরবাইক ওর দরকার। এক্ষুনি।

পিছন থেকে অপাশির মোটরবাইক স্টার্ট করার শব্দ কানে এল। সঙ্গে-সঙ্গে জিশান দৌড়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। ও এটুকু বুঝেছিল, গাছপালার গোলকধাঁধার মধ্যে অপাশি কখনই খুব জোরে বাইক ছোটাতে পারবে না।

একটু পরেই জিশান বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা রাস্তায়।

বেলা প্রায় দশটা। কংক্রিটের রাস্তা রোদে ঝকঝক করছে। রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান। তাতে ছবির মতো ফুল। সেই ফুলের টানে বেশ কয়েকটা প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে।

রাস্তা ধরে একটু এগোতেই বেশ কিছু দোকানপাট আর অনেকগুলো বাড়ির ব্লক। বাড়িগুলোর সামনে সার বেঁধে গাড়ি আর বাইক পার্ক করা রয়েছে।

জিশান ছুটতে-ছুটতে একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কংক্রিটের রাস্তা ধরে অপাশির বাইক ছুটে আসছে।

শ্রীধরের কথা জিশানের মনে পড়ল : কোনও বাড়ি কিংবা দোকানের ভেতরে যদি জিশান আর কিলারদের কোনও মোকাবিলা হয় তো সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রহীন মোকাবিলা। অপাশির যা চেহারা জিশান দেখেছে তাতে খালি হাতের লড়াইয়ে ও জিশানের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। সেটাই এবার পরখ করে দেখা দরকার।

জিশান ঢুকে পড়ামাত্রই বাড়িটায় হইচই হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। এ-ঘর সে-ঘর থেকে 'জিশান! জিশান!' রব উঠল। কেউ-কেউ আনন্দে সিটি বাজাল।

কিন্তু জিশানের কোনওদিকে নজর ছিল না। ও লোকজনকে ঠেলে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'অপাশি কানোরিয়া আমার পেছনে তাড়া করে আসছে। আমি ছাদে যাচ্ছি —।'

'চারতলায়! ছাদ চারতলায়!' ওপরদিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দুজন 'সিটিজেন'।

গেম সিটিতে যেসব 'সিটিজেন'রা আজ হাজির রয়েছে তারা প্রত্যেকেই হাজিরা দেওয়ার জন্য পুরস্কার পাবে। এ ছাড়াও নানান অ্যাক্টিভিটির জন্য রয়েছে 'সারপ্রাইজ প্রাইজ মানি'। তাই এই মানুষজনের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

জিশান তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একবার ছাদে পৌঁছতে পারলে ও অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেখানে ও অনেকটা খোলা জায়গা পাবে। তা ছাড়া মার্শালের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। সুতরাং ছাদে শেষ পর্যন্ত যেটা হবে সেটা অপাশির সঙ্গে ওর হাতাহাতি লড়াই। সে-লড়াইয়ে অপাশি নস্যি।

ছাদে এসে পৌঁছল জিশান। বিশাল বড় খোলা ছাদ। আকাশের দিকে মুখ করে বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপরে সূর্য ঠিক-ঠিকভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। আলো আর উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে।

জিশান ছুটে গেল বাঁ-দিকের পাঁচিলের কাছে। ঝুঁকে পড়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকাল। অপাশি এখন কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর দিল মিসাইল গান। অপাশি মিসাইল গান হাতে তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই বসে পড়েছিল জিশান। তাই ছাদের পাঁচিল বর্ম হয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু বিকট শব্দ হল। পাঁচিলের একটা অংশ ভেঙে চৌচির হয়ে খসে পড়ল। জিশান ছুটে সরে এল ছাদের ঠিক মাঝখানে। এখান থেকে ছাদের দরজার দূরত্ব অনেকটাই। ফলে অপাশি ছাদে এলে ও তৈরি হওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাবে।

তারপর হাতাহাতি লড়াই।

রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামাল জিশান। চটপট ট্র্যাকার আর টিভি বের করে দেখল।

ট্র্যাকারে একটা লাল ডট সবুজ ডটের খুব কাছাকাছি। ওটা বোধহয় অপাশি কানোরিয়া। বাকি দুটো ডট তার তুলনায় মোটামুটি দূরে।

এবার টিভি অন করল জিশান। অপাশি একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে—সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। কিন্তু ওর হাতে ওগুলো কী?

শ্রীধর পাট্টা তো নিয়ম করেছেন বাড়ির ভেতরে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না! কারণ, তাতে গেম সিটির 'সিটিজেন'দের বিপদ হবে। তা হলে অপাশির দু-হাতে দুটো অস্ত্র কেন? বাঁ-হাতে একটা ধারালো চপার, আর ডানহাতে টুয়েন্টি এমএম টেন শটার নিউক্লিয়ার পিস্তল।

টিভি আর ট্র্যাকার চটপট রুকস্যাকে ঢুকিয়ে নিল জিশান। পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। স্পিড ডায়াল মোড়ে শ্রীধর পাট্টাকে ফোন করল।

ও-প্রান্তে একবার রিং বাজতেই শ্রীধর ফোন ধরলেন।

'বলো, জিশান—হাউ আর য়ু?'

'এসব কী হচ্ছে! বাড়ির মধ্যে আর্মস নিয়ে ঢুকেছে অপাশি। গেমের রুলে তো এটা বারণ ছিল!'

'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' ও-প্রান্তে চিবিয়ে হাসলেন শ্রীধর : 'তা ছাড়া কানোরিয়া বিল্ডিং-এ শুধু আর্মস নিয়ে ঢুকেছে—ইউজ তো করেনি। তাই অফিশিয়ালি ও এখনও ক্লিন। আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হল, তোমাদের মোকাবিলা যদি হয় তো সেটা হবে ছাদে। সেটাও অফিশিয়ালি ''বাড়ির ভেতরে'' হল না।' শ্রীধর ছোট করে দুবার কাশলেন : 'সুতরাং এসব ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লড়াই করো, জিশান। ফাইট। সারভাইভ।' আচমকা ফোন কেটে দিলেন শ্রীধর।

আর তখনই জিশান টিভিতে দেখতে পেল, অপাশি ছাদের দরজা ডিঙিয়ে ছাদে পা দিচ্ছে। টিভি থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকিয়েও দেখতে পেল একই দৃশ্য।

সঙ্গে-সঙ্গে রুকস্যাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিশান। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা মিনি গ্রেনেড বের করে নিল। তারপর শোওয়া অবস্থাতেই সেটার পিন দাঁতে টেনে অপাশিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

জিশানকে অবাক করে ওই মোটা শরীর নিয়েও অপাশি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় বাঁ-দিকে লাফিয়ে পড়ল। নিউক্লিয়ার পিস্তল ফায়ার করল জিশানকে তাক করে।

আপেক্ষিক গতিবেগের জটিলতায় স্বাভাবিক কারণেই অপাশির নিশানা তাকছুট হয়ে গেল। আর জিশানের মিনি গ্রেনেডও অপাশির গায়ে লাগেনি। তবে বিকট শব্দ, আগুন আর ধোঁয়া বাড়ির সবাইকে বিস্ফোরণের খবর পাঠিয়ে দিল।

অপাশি তখনও ছাদের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর জিশান সবে হাঁটুগেড়ে উঠে বসেছে। হঠাৎই ছাদের দরজা দিয়ে পাঁচ-ছ'জন 'সিটিজেন' ঢুকে পড়ল খোলা ছাদে। ওরা ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে অপাশির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে এলোপাতাড়ি কিল-চড়-ঘুসি মারতে লাগল।

ওদেরই মধ্যে দুজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'জিশান, পালাও! পালাও!'

জিশান রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে ছুট লাগাল ছাদের দরজার দিকে।

সিঁড়ি নামতে-নামতে জিশান সদ্য-হওয়া অভিজ্ঞতাটার কথা ভাবছিল। এই আবেগমাখানো সমীকরণটার কথা নিশ্চয়ই শ্রীধর পাট্টা ভাবতে পারেননি। জিশানের পাবলিক ইমেজ আসল জিশানের চেয়ে বোধহয়

অনেক বড়। নইলে এইরকম নিয়ম-ভাঙা ঘটনা কখনও ঘটে!

শ্রীধরকে ফোন করে জিশানের বলতে ইচ্ছে করল, 'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!'

দোতলা থেকে একতলার দিকে নামতে-নামতে টিভির ধারাবিরণী কানে এল ওর : 'আশ্চর্য! অবাক কাণ্ড! চমকে দেওয়া ঘটনা। গেম সিটির ছ'জন ''সিটিজেন'' কিলার অপাশির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রবল পেটাচ্ছে। জিশানকে ওরা নিউক্লিয়ার পিস্তলের মুখ থেকে কান ঘেঁষে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আপনারা তো জানেন, বন্ধুগণ, কিল গেমের দিন গেম সিটিতে যেসব মক ''সিটিজেন'' হাজির থাকে তারা প্রত্যেকেই পুরস্কার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। কিন্তু এই মুহূর্তে জিশানকে বাঁচানোর জন্যে ওরা প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার পাবে। কিল গেম জমে উঠেছে, বন্ধুগণ—দারুণ জমে উঠেছে...।'

বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে এসেই আবার ছুট, ছুট, ছুট। একটা মোটরবাইক চাই। এক্ষুনি। ওই তো, দেখা যাচ্ছে!

রাস্তা পেরিয়ে জিশান ছুটে গিয়ে চড়ে বসল একটা মোটরবাইকে। পুশবাটন স্টার্ট দিতেই বাইকটা গর্জন করে উঠল। সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরোল। তারপর 'হুউশ' করে ছুটে গেল সামনের দিকে।

নিউক্লিয়ার পিস্তল আর চপারের ভয় দেখিয়ে অপাশি 'সিটিজেন'দের জটলা থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে এল।

রাগে ওর ভিতরটা গরগর করছিল। তিনতলার একটা ঘরের ভিতর থেকে টিভির আওয়াজ ছুটে আসছিল : 'অপাশি কানোরিয়া ব্যর্থ হয়েছে। দ্য সুপার কিলার হ্যাজ ফেইলড। এখন অপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামছে...তাড়া করছে জিশানকে। কিন্তু মনে হয় না এ-দফায় ও কিছু করতে পারবে। কারণ, জিশান এখন বাইক নিয়ে ছুটছে...।'

কানোরিয়া ঢুকে পড়ল ঘরটার ভেতরে। সেখানে দুজন বয়স্ক পুরুষ প্লেট টিভির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। হাতে ফ্লাফি কুকিজের প্যাকেট। ওদের হাত আর মুখ চলছিল।

একটা নোংরা গালাগাল দিল অপাশি। তারপর এক ঝটকায় টিভির কাছে গিয়ে যন্ত্রটার ওপরে চপারের কোপ বসিয়ে দিল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরোল টিভি থেকে। শর্ট সার্কিটের 'ফটফট' শব্দ হল। টিভির পরদা দপ করে আঁধার হয়ে গেল।

'সিটিজেন' দুজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অপাশি সেটাকে আমল না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল বাইরে। ওর পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে শুরু করল। জিশান—জিশানকে এখন ওর চাই। জিশানের রক্ত চাই।

জিশান বাইক ছুটিয়ে দিয়েছিল নদীর দিকে। সেখানে ফ্লাইওভার পেরিয়ে ও চলে যেতে চায় গেম সিটির পশ্চিমদিকে। সেখানে একটা বিশাল এলাকা জুড়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। দিনেরবেলাটা ও জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সময়টা কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর সন্ধে হলে, অন্ধকার নামলে, ওর লুকিয়ে থাকার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পথে বাইক দাঁড় করিয়ে ও একবার ট্র্যাকার দেখে নিয়েছে। তিনটে লাল ডটের অবস্থান এখন খানিকটা এলোমেলো। কারণ, জিশানের গতিবিধি ওদের হিসেবকে গুলিয়ে দিয়েছে। তাই ওরা চক্রব্যূহের মতো সবুজ ডটটাকে ঘিরে ধরতে পারেনি।

আরও কিছুক্ষণ বাইক ছোটানোর পর জিশানের টিভি দেখতে ইচ্ছে করল। তিনজন কিলার এখন কী করছে?

কৌতূহল মেটাতে বাইক দাঁড় করাল জিশান। টিভি বের করে অন করল।

পরদায় ভেসে উঠল একটু অদ্ভুত মুখ। মুখ না বলে মুখোশ বলাটাই বোধহয় বেশি ভালো। মাথায় চুলের ধাঁচে তৈরি একটা চকচকে কালো টুপি। মাথায় এমনভাবে এঁটে বসেছে যে, সেটা আদতে টুপি নাও হতে

পারে—হয়তো চুলের একটা অদ্ভুত স্টাইল। তবে দেখে মনে হচ্ছে, চুলটা প্লাস্টিক অথবা মেটালের তৈরি। কিংবা প্লাস্টিক আর মেটালের প্লাজমা মিক্সচার ব্যবহার করা হয়েছে।

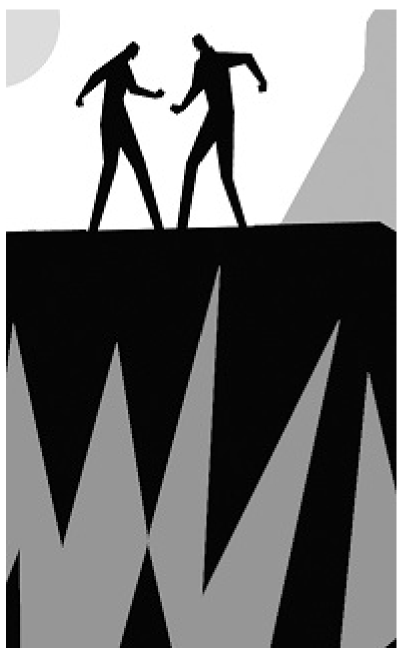
চোখে কালো চশমা। চশমার কাচ অথবা পলিমার যেন ছোট-ছোট দুটো আয়তক্ষেত্র—চোখ দুটোকে রোদ কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। দু-কানে মেটালের মোটা রিং। ভাঙা চোয়াল। ফিনফিনে পাতলা ঠোঁট—ঠিক যেন মসৃণ চামড়াকে ব্লেড দিয়ে চিরে মুখের রেখা তৈরি করা হয়েছে।

লোকটির গায়ে পলিমারের তৈরি আঁটোসাঁটো চকচকে ফুলহাতা পোশাক—যেন দ্বিতীয় চামড়া, অনেকটা স্কুবা ডাইভারদের মতন। দু-হাতে কালো দস্তানা। পায়ে কালো স্নিকার। আর পিঠে একটা কালো রুকস্যাক।

ক্যামেরা একটু দূরে সরে যেতেই লোকটার পুরো চেহারাটা দেখা গেল: ছিপছিপে, লম্বা—চাবুকের মতো।

টিভির ভাষ্যকার তখন বলছে, 'বন্ধুগণ, আসুন—কিলার প্রোটনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রোটনের রক্ত ঠান্ডা, বরফের মতো। চোখের নজর দিনে শকুনের মতো, রাতে প্যাঁচার মতো, কারণ, ওর আই গিয়ারে নাইটভিশান ইন্সট্রুমেন্ট ফিট করা আছে। ওর হাতের নখ চোখা এবং শক্ত। বাঘ এবং সাপের সঙ্গে এই নখের মিল রয়েছে, কারণ, ওই জোরালো এবং ধারালো নখের ডগায় বিষ মাখানো আছে। ওই নখের এক আঁচড়ে একটা জোয়ান মানুষ পলকে ছটফটিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

'কিলার প্রোটন এতক্ষণ ধরে জিশানের স্ট্র্যাটেজি ওয়াচ করছিল, আর নিজের স্ট্র্যাটেজি ক্যালকুলেট করছিল, তৈরি হচ্ছিল মনে-মনে। এবার কিলার প্রোটন অ্যাকশানে নেমেছে। সো কনটিনিউ ওয়াচিং দ্য কিল গেম, ফোকস। খেলা ক্রমশ আরও এক্সাইটিং হয়ে উঠছে...।'



জিশান দশ-পনেরো সেকেন্ড ধরে কিলার প্রোটনকে দেখল। যে বারোজন সুপারকিলারের ছবি নিয়ে টিভিতে 'সুপারকিলার কনটেস্ট' শুরু হয়েছিল তাদের মুখগুলো জিশানের আবছাভাবে মনে আছে। কিন্তু এই মুখটা সেই বারোজনের মধ্যে ছিল বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য এই লোকটার পোশাক-আশাক মেকাপ এমন যে, আসল চেহারাটা ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

জিশানের বেশ মনে আছে, 'সুপারকিলার কনটেস্ট' প্রতিয়োগিতায় প্রথম পুরস্কার ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা। ওর আরও মনে আছে, কনটেস্টের বারোজন খুনির মধ্যে আটজন পুরুষ, আর চারজন মেয়ে ছিল। কিন্তু প্রোটনের সঙ্গে তাদের কোনও মিল...না:, মাথা নাড়ল জিশান। টিভির সুইচ অফ করে দিল।

টিভি রুকস্যাকে রেখে আবার ট্র্যাকার দেখল জিশান। একটা লাল ডটের সঙ্গে ওর দূরত্ব বেশ কমে এসেছে। মনে হয় অপাশি মরিয়া হয়ে বাইক চালিয়ে ওকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে।

ট্র্যাকার রেখে বাইক ছোটাল জিশান। রিয়ারভিউর কনভেক্স মিরারে ওর নজর বারবার ছিটকে যাচ্ছিল। না:, এখনও কোনও গাড়ি বা বাইক দেখা যাচ্ছে না।

চড়া রোদে জিশান ঘামছিল। বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। এখনও অনেক সময় বাকি। আজ মনে হচ্ছে, সূর্য খুব ধীরে আকাশপথে হাঁটছে—সন্ধে হতে আজ অনেক দেরি হবে।

ফাঁকা রাস্তায় বাইকের গোঁ-গোঁ আওয়াজ ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। কোথা থেকে শব্দগুলো ধাক্কা খেয়ে আবার কানে ফিরে আসছে কে জানে!

হঠাৎই রিয়ারভিউ মিরারে একটা বাইক দেখতে পেল। একটা কালো ফুটকি। ফুটকিটা ক্রমশ মাপে বড় হচ্ছিল।

জিশান অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। বাড়তি আওয়াজ তুলে ওর বাইক এক ঝটকায় আরও জোরে পিছলে গেল সামনের দিকে।

বাঁ-দিকে জঙ্গল, ডানদিকে কয়েকটা বাড়ি-ঘর। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে পিছনে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দূরে ফ্লাইওভারটা দেখা গেল। উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠেছে।

জিশান ঠিক করল, ফ্লাইওভার পেরিয়ে ও বাঁ-দিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। তারপর ট্র্যাকার দেখে ফুড পয়েন্ট বের করবে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। জল তেষ্টাও।

বাইক ফুলস্পিডে ছুটছিল। বাতাসের টুকরো দুরন্ত বেগে ছুটে এসে জিশানের মুখে গায়ে বিঁধছিল।

ফ্লাইওভারে পৌঁছে গেল জিশান। তখনই ও আকাশের দিক থেকে ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ পেল। ওপরদিকে তাকাতেই একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল। অনেক উঁচুতে পাক খাচ্ছে।

তা হলে আকাশ থেকেও কিল গেমের দিকে নজর রাখার বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর!

বাইক চালাতে-চালাতেই মুখ তুলে গোটা আকাশটায় চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। উত্তরের আকাশে অনেক দূরে আর-একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল। এত দূরে যে, ওটার আওয়াজ ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। উড়ন্ত মেশিনটার আশেপাশে কয়েকটা চিল উড়ছে। অন্তত প্রক্ষিপ্ত দর্শনে আকাশের পটভূমিতে সেরকমই মনে হচ্ছে।

আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে সামনে তাকাতেই জিশান ব্রেক কষতে বাধ্য হল। দূরে চোখে পড়ছে একটা নীল রঙের অটোমোবিল। পাগল করা গতিবেগে ফ্লাইওভারের দিকেই ধেয়ে আসছে।

কে আছে ওই গাড়িতে? কিলার সুখারাম? নাকি প্রোটন?

রিয়ারভিউ মিরারে তাকাল জিশান। ও ব্রেক কষার ফলে পিছনে ছুটে আসা ফুটকিটা এখন মাপে অনেক বড় দেখাচ্ছে। অপাশি কানোরিয়াকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারাটা উত্তল দর্পণে আরও মোটা আর বিকৃত দেখাচ্ছে।

ঝটিতি সিদ্ধান্ত নিল জিশান। সামনে থেকে ছুটে আসা অটোমোবিলটার সঙ্গে যদি ওর কলিশন হয় তা হলে মোটরবাইকটার আস্ত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তার সঙ্গে জিশানেরও।

তার চেয়ে বরং অপাশির মোটরবাইকের সঙ্গে কিছু একটা করার চেষ্টা করা অনেক ভালো।

সুখারাম নস্কর এর মধ্যেই বাইক পালটে গাড়ি নিয়েছে।

নীল গাড়িটার জানলা দিয়ে একটা আলট্রা হাই-পাওয়ার রাইফেলের নল বেরিয়ে এল। তারপর জিশানের বাইক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কিলার সুখারাম। 'ক্র্যাক' এবং 'সাঁই' শব্দ হল। হেভিওয়েট বুলেট ছুটে গেল জিশানের দিকে।

ব্রেক কষলেও জিশান একটিবারের জন্যও বাইক থামায়নি। প্যাঁচালো পথে নকশা বুনে ফ্লাইওভারের ওপরে বাইকটাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিল। কারণ, 'সিটিং টারগেট'-এর চেয়ে 'মুভিং টারগেট' অনেক ভালো। ও বেশ বুঝতে পারল, একটা গরম বুলেট ওর বাইকের কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তারপরই ও রাইফেলের শব্দটা শুনতে পেল।

সঙ্গে-সঙ্গে অপাশিকে লক্ষ্য করে বাইক ছোটাল জিশান। ইঞ্জিনে 'গোঁ-ওঁ-ওঁ' শব্দ তুলে বাইকের স্পিড তুলে দিল চরমে। তারপর স্টিয়ারিঙের কায়দায় সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে ছিটকে গেল অপাশির দিকে।

কিলার অপাশি মিসাইল গান ফায়ার করতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ, যদি ও টার্গেট মিস করেও তা হলে মিসাইলের ইনফ্রারেড ট্র্যাকার ওর বাইকের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে ছুটে আসতে পারে।

সুতরাং ও চলন্ত অবস্থাতেই বাইকের কেরিয়ার থেকে মেশিন পিস্তল বের করে পরপর দুবার ফায়ার করল।

কিন্তু মিস করল। কারণ, জিশানের বাইক বলতে গেলে সার্কাসের কসরত দেখাতে-দেখাতে এদিক-ওদিক হেলে অপাশির দিকে ছুটে আসছিল।

মেশিন পিস্তল ফেলে একটা চপার তুলে নিল ও। ততক্ষণে লং রেঞ্জ পিস্তল তুলে নিয়ে অপাশিকে লক্ষ্য করে দুবার ফায়ার করেছে জিশান। কিন্তু দুটো ছুটন্ত মোটরবাইকের বিচিত্র আপেক্ষিক গতিবেগ জিশানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল।

ততক্ষণে অপাশির ছুড়ে দেওয়া চপার বাতাসে লাট খেয়ে জিশানের দিকে ছুটে আসছে। জিশান নিমেষের মধ্যে ছুটন্ত বাইকটাকে কাত করে একটা চোখা বাঁক নিল। অপাশির চপার ওর পিছনের সিটে কেটে বসে গেল।

অপাশি দাঁত খিচিয়ে মিহি চিৎকার করে উঠল। আবার মেশিন পিস্তল তুলে নিল হাতে। শত্রুকে এত কাছে পাওয়া গেছে! এইবার খতম।

আর উত্তরে জিশান নিখুঁত লক্ষ্যে ওর বাইকের চাকা দিয়ে অপাশির বাইকের পিছনের চাকায় আড়াআড়ি ধাক্কা মারল।

দুরন্ত গতির সংঘর্ষ। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

অপাশির বাইক লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেতে-খেতে শূন্যে উঠে পড়ল। সরাসরি গিয়ে ধাক্কা খেল ফ্লাইওভারের রেলিঙে। 'দড়াম' শব্দ হল। রেলিং আর বাইকের মাঝে পড়ে অপাশির মাথা থেঁতলে গেল। ওর হাতে তখনও মেশিন পিস্তল ধরা রয়েছে।

একটা মিহি আর্ত চিৎকার শোনা গেল। অপাশি এবং ওর বাইক ছিটকে গেল আকাশে। তারপর অদ্ভুত এক কক্ষপথে বাতাস কেটে পড়তে লাগল নদীর দিকে।

সংঘর্ষের পর জিশানের বাইকও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। অপাশির বাইকের সংঘর্ষের জায়গা থেকে প্রায় বারো-তেরো ফুট বাঁ-দিকে ওর বাইক ফ্লাইওভারের রেলিঙে ধাক্কা মারল। ঠিক তার আগের মুহূর্তে জিশান বাইক ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। বাইকটা রেলিঙের খানিকটা অংশ ধসিয়ে দিয়ে বোমার সপ্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল বাতাসে। জিশান তখন ওর বাইক থেকে কয়েক হাত দূরে বাতাস কেটে নদীর দিকে পড়ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর কোনও ওজন নেই। আর সেই অদ্ভুত সময়ে প্যাসকোর কথা মনে পড়ে গেল ওর।

অপাশির বাইকটা নীচে পড়তে-পড়তে আচমকাই শূন্যে বোমার মতন ফেটে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। বাইক আর অপাশির ছোট-বড় টুকরো ভয়ংকর গতিতে ঠিকরে গেল চারিদিকে। বিস্ফোরণের আগুনের তেজ আর ঝলক জিশানের চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

বাতাসে পোড়া গন্ধ, কালো ধোঁয়া। ও চোখ বুজে ফেলল। ভাসতে-ভাসতেই হাঁটু মুড়ে দু-হাতে হাঁটুজোড়া জাপটে ধরল। ওর শরীরটা শূন্যে কয়েকবার লাট খেল। তারপরই চোখ খুলল জিশান। দেখল, নদীর ঘোলাটে জল ওর দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষ ডাইভারদের মতো হাত দুটো সামনে টান-টান করে বাড়িয়ে ধরল। এবং শরীরটাকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করতেই ওর হাত দুটো বর্শার ফলার মতো নদীর জল চিরে ঢুকে গেল। তার পিছন পিছন ঢুকে পড়ল জিশানের শরীর।

একটা চাপ। একটা ঠান্ডা অনুভূতি। চোখের নজর ঘোলাটে। মুখে কিছুটা জল ঢুকে গেল। নদীর জলের ঘাত-প্রতিঘাতে জিশানের শরীরটা বেসামাল হয়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই জলের ওপরে 'ভু-উ-স' করে ভেসে উঠল জিশান। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল। বেশ কিছুটা ভিজে গেছে। অকেজো হয়ে গেল কি না কে জানে!

ফোনটাকে ডানহাতে শূন্যে তুলে ধরল। জল ঝরানোর জন্য ওটা কয়েকবার জোরে-জোরে ঝাঁকাল। তারপর চোখ তুলল ফ্লাইওভারের দিকে। সেখানে একটা মানুষের সিলুয়েট দেখতে পেল। ভাঙা রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হয়, জিশানকে দেখছে কিলার সুখারাম।

মানুষটার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নীল রঙের গাড়ি।

জিশান লক্ষ করল, আকাশের দুটো হেলিকপ্টার এখন মাথার ওপরে ব্যস্তভাবে চক্কর কাটছে। বোধহয় ওরা অপাশি আর জিশানের মোকাবিলাটা দেখতে পেয়েছে।

নদীর স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে জিশান সাঁতার কাটতে লাগল। একইসঙ্গে ও নিজের বেখাপ্পা অবস্থাটার কথা ভাবতে লাগল।

ওর কাছে এখন অপটিক্যাল ট্যাবলেট নেই। ট্র্যাকার নেই। ফুড ম্যাপ নেই। মোটরবাইক নেই। অস্ত্র নেই—যা-ও বা আছে, জলে ভেজা। আর স্যাটেলাইট ফোনটার কী হাল কে জানে!

এখন ও খাবার খুঁজে পাবে কোথায়?

তবে ভালো খবর হল, এখন ওকে তিনজনের বদলে দুজন কিলারের সঙ্গে লড়তে হবে। লড়াই করে বাঁচতে হবে।

মিনি নিশ্চয়ই ওর লড়াই দেখেছে—দেখছে।

জিশান একটা হাত আর দুটো পা ব্যবহার করে কোনওরকমে সাঁতার কাটছিল। চেষ্টা করছিল, নদীর বাঁ-দিকের পাড়ের কাছে সরে যেতে। তখনই ও দেখতে পেল লম্বা ছিপের মতো অনেকগুলো মেটাল লিভার নদীর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সেগুলোর ডগায় ক্যামেরা বসানো। অর্থাৎ, জিশান সবসময় লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি দর্শকের চোখের সামনে রয়েছে।

একটু পরেই নদীর পাড়ে উঠে এল। হাতে-পায়ে কোথাও-কোথাও বোধহয় কেটে-ছড়ে গেছে, কারণ, জ্বালা করছে।

ধপ করে বসে পড়ল আগাছা আর বুনো ঘাসের ওপরে। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। ভেজা রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে রাখল পাশে। ওটা আয়তনে বড় হওয়ায় ওকে জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করেছে।

এবার স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে পড়ল। শ্রীধর পাট্টাকে এখুনি ফোন করা দরকার।

ফোনের বোতাম টিপতে লাগল জিশান।

•

ডায়াল করতেই একটা ঘড়ঘড় শব্দ জিশানকে অভ্যর্থনা জানাল। তার ওপরে সুপারইমপোজড হয়ে রিং বাজতে লাগল।

এক হাতে ফোন কানে চেপে ধরে অন্য হাতে রুকস্যাকের কভার ফ্ল্যাপ খুলতে লাগল জিশান।

ফোনটা এখনও ঘড়ঘড় ফাটা আওয়াজে বাজছে। শ্রীধর ফোন ধরতে এত দেরি করছেন কেন?

ভেজা, সপসপে রুকস্যাক থেকে ট্যাবলেট বেরোল। ছোট টিভিটাও বেরোল। সব ইলেকট্রনিক পরদা অন্ধকার। কোনও আলোর চিহ্ন নেই সেখানে।

জিশানের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চারিদিক যেন ইলেকট্রনিক পরদার মতোই অন্ধকার দেখাল। কী করে এখন ও লড়াই চালাবে! কী করে কিলারদের লোকেশান ট্র্যাক করবে! কী করে খাবার খুঁজে পাবে?

ফোন কানে চেপে ধরে জিশান অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। মনে-মনে শ্রীধরকে বলছিল, 'শ্রীধর...ধর...ধর...।'

একটু পরেই শ্রীধর পাট্টার গলা পাওয়া গেল : 'জি-জি-শ-শান!'

শ্রীধরের গলায় স্বর কেটে-কেটে যাচ্ছিল।

স্যাটেলাইট ফোনটা যে অল্পবিস্তর কাজ করছে সেই প্রমাণটুকু জিশানকে আশাভরসা দিল। ও ফোনের সনিক রিসিভারের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমাকে এখুনি একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন, ট্র্যাকার দিন। আমার ট্যাবলেট, ট্র্যাকার, টিভি, সব জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে—।'

ও-প্রান্তে খলখল করে হাসলেন শ্রীধর। আওয়াজটা ফাটা ডায়াফ্রামের কাঁপুনির মতো শোনাল। তার ওপরে ফোনের কথা কেটে-কেটে যাওয়ায় শ্রীধরের হাসি শুনে মনে হচ্ছিল কোনও পিশাচের হাসি।

এরপর শ্রীধর কথা বলতে শুরু করলেন। বারবার ইলেকট্রনিক হোঁচট খেলেও কথাগুলো বুঝতে পারছিল জিশান।

'সরি, জিশান। কিল গেম ইজ আ ভেরি ফেয়ার গেম। নো এক্সট্রা সাপোর্ট। নো এক্সট্রা ব্যাক-আপ। নো এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ...। এই গেমটার নাম কিল গেম—কোনও ছেলেখেলা নয়।'

জিশান বুঝতে পারছিল হাতে সময় কম। কিলার প্রোটন আর কিলার সুখারাম হয়তো এই মুহূর্তে নির্ভুল লক্ষ্যে ওর দিকে কনভার্জ করছে, ওর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনছে।

জিশানের প্রচণ্ড রাগ হল। শ্রীধর পাট্টাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। আচমকা খেপে গিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'শ্রীধর....পাট্টা! এই মুহূর্তে কোটি-কোটি মানুষ টিভিতে আমাকে দেখছে। আমি জানি, ওরা আমার সঙ্গে আছে। আমার অপটিক্যাল ট্যাবলেট চাই, চাই, চাই! এটা আমাকে না দিলে কিল গেমের সারভাইভাল ফ্যাক্টর জিরো হয়ে যাবে। তাই আমি নিউ সিটির জনতার আদালতে বিচার চাইছি।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল জিশান। দু-হাত শূন্যে তুলে টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট দেখা দর্শকদের উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন! আপনাদের কাছে আমি বিচার চাইছি! আপনারা মার্শালকে বলুন, যেন উনি এক্ষুনি আমাকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেন...এক্ষুনি...!'

ভেজা রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল জিশান। এবার গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। টিভির দর্শকরা নিশ্চয়ই ওর আবেদন ঠিকঠাক শুনতে পেয়েছে, ওকে সরাসরি দেখতেও পেয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়।

•

সঙ্গে-সঙ্গে যেটা হল সেটা শ্রীধর পাট্টাকে একটা বিশাল ধাক্কা দিল।

সুপারগেমস কর্পোরেশনের কিল গেম কন্ট্রোল রুমের হেলপলাইনে একের পর এক ফোন আসতে লাগল। নিউ সিটির সিটিজেনরা সবাই যেন জিশানের জন্য পাগল হয়ে গেছে। ওরা শুধু ফোনের বোতাম টিপছে। কন্ট্রোল রুমে কেউ ফোন ধরামাত্রই শুনছে, 'এক্ষুনি জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর ট্র্যাকার দিন। ডোন্ট স্পয়েল দ্য গেম, য়ু ড্যাম ফুল!'

হুড়মুড়িয়ে ফোন আসতে লাগল আর ফোনের ভাষা ক্রমশ রুক্ষ আর নোংরা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই, ভাষাটা কাঁচা খিস্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

শুধু যে ভয়েস কল তা নয়। তার সঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে ই-মেল আর ভিডিয়ো কল। কন্ট্রোল রুমের সব কর্মীর একবারে পাগল হওয়ার জোগাড়।

বেগতিক দেখে কন্ট্রোল রুমের চিফ অফিসার সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এ শ্রীধর পাট্টাকে ফোন করলেন।

সেখানে শ্রীধরের তখন প্রায় একই অবস্থা। ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের সুনামিতে একেবারে খাবি খাচ্ছেন। সবাই একই দাবি জানাচ্ছে : 'জিশানকে এক্ষুনি অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন। কিল গেমের থ্রিল আর স্ট্যান্ডার্ড নষ্ট করবেন না।' অসংখ্য ই-মেল আর কলের মধ্যে কেউ-কেউ শ্রীধরকে দু-চারটে বাজে কথাও বলেছে। কিন্তু এই চাপের সময়ে সেইসব নচ্ছার মানুষগুলোকে লোকেট করে শায়েস্তা করা অসম্ভব। তবে শ্রীধর অবাক হয়ে মানুষগুলোর মাথাচাড়া দেওয়া স্পর্ধার কথা ভাবছিলেন। জিশান ছেলেটা নিউ সিটির সিটিজেনদের স্পর্ধা উসকে দিয়েছে। জিশানের জনপ্রিয়তার যে এরকম মাশুল দিতে হবে সেটা শ্রীধর পাট্টা ভাবেননি।

শ্রীধরের একটা বড় গুণ হচ্ছে, পরিস্থিতি আঁচ করে তিনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এখনও তাই নিলেন। স্যাটেলাইট ফোন তুলে পরপর তিনজন কর্তাকে ফোন করলেন। চটপট কতকগুলো ইনস্ট্রাকশন দিলেন। তারপর ফোন পকেটে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অন্যান্য কিল গেমে কখনও এরকম ব্যাপার হয়নি। শ্রীধরের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। যাক, এখনকার মতো তো কেসটাকে সামলে নেওয়া গেছে। জিশানের দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন। জিশানের জন্য নতুন একটা স্যাটেলাইট ফোন আর অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম ট্র্যাকার নিয়ে একটা শুটার রওনা হচ্ছে। তাও আবার একটা ট্যাবলেট নয়—দু-দুটো ট্যাবলেট। কারণ, এই মুহূর্তে পাবলিক আনরেস্ট শুরু হয়ে গেলে কিল গেমের তেরোটা বেজে যাবে। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়ে যাবে।

শ্রীধর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তাঁর ডায়রেক্টিভ পাওয়ামাত্র সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে শুটার রওনা হয়ে গেছে। দুটো ফ্যালকন হেলিকপ্টার অনেকক্ষণ ধরেই গেম সিটির ওপরে কড়া নজরদারির কাজ চালাচ্ছে। ওদের সঙ্গে শুটারের সিকিওরিটি অফিসার ওয়াকিটকিতে কথা বলে নেবে। জিশানের এগজ্যাক্ট লোকেশন কো-অর্ডিনেট জেনে নেবে।

টেনশনে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলেন। দু-হাত মুঠো করলেন, খুললেন। পরপর কয়েকবার। তারপর ভাবলেন, শুধু তো আজকের রাতটা! কাল সকালে জিশান থাকবে কি না ঠিক নেই। তারপর ধীরেসুস্থে পাবলিক আনরেস্ট প্রবলেমটার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন।

পকেট থেকে ফোন বের করলেন শ্রীধর। জিশানের নম্বর লাগালেন। খেয়াল করলেন, ওঁর আঙুলগুলো অল্প-অল্প কাঁপছে।

'জিশান!'

উত্তরে কয়েক সেকেন্ড ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেলেন। সেই আওয়াজটা কমতেই প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'জিশান! তোমার অপটিক্যাল ট্যাবলেট শুটারে করে রওনা হয়ে গেছে। একটা নয় দুটো। তার সঙ্গে একটা নতুন স্যাটেলাইট ফোন। ডোন্ট উয়ারি...।'

ও-প্রান্তে জিশানের হাসির শব্দ শোনা গেল। হয়তো জিশানের হ্যান্ডসেটের সমস্যার জন্য শব্দটা খুব চাপা শোনাল। হাসির শেষে উনতিরিশ বছরের লড়াকু ছেলেটা যে-ভঙ্গিতে 'থ্যাংক...য়ু।' কথাটা উচ্চারণ করল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, কথাটার ওপরে ব্যঙ্গের নুন-মরিচ বেশ ভালো করেই ছেটানো রয়েছে।

•

জিশানের বাঁ-হাতে লাগানো মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল ট্র্যাক করে শুটারটা খুব সহজেই জিশানকে খুঁজে পেল। ওর বেশ কাছাকাছি একটা ছোট্ট মাপের ফাঁকা জায়গায় আকাশযানটা শিস দিয়ে ভারটিক্যালি ল্যান্ড করল। জিশান সেদিকে এগিয়ে গেল।

অফিসারটির সঙ্গে ওর কোনও কথা হল না—শুধু জিনিস বিনিময় হল। ভেজা রুকস্যাক, বিকল অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর স্যাটেলাইট ফোন চলে গেল শুটারে। আর শুটার থেকে পাওয়া গেল নতুন রুকস্যাক—যার ভেতরে রয়েছে একজোড়া নতুন অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর স্যাটেলাইট ফোন।

শুটারটা শূন্যে উঠে পড়তেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ক্যামেরার লেন্সকে আড়াল করে সিকিওরিটি অফিসার জিশানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে মাথা নেড়ে চোখ মারল। যার অর্থ একটাই : 'লড়ে যাও, ভাই।'

জিশানের শরীরে নতুন শক্তি ঝলসে উঠল। ও জঙ্গলের গভীরে ছুট লাগাল। ছুটতে-ছুটতেই অপটিক্যাল ট্যাবলেটের লাল চৌকো বোতামটা টিপল। ফুড ম্যাপ ফুটে উঠল পরদায়। খাবার চাই, খাবার। জিশানের পাগলের মতো খিদে পাচ্ছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে নিয়ারেস্ট ফুড পয়েন্টের দিকে ছুটল। মাটি খুঁড়ে খাবারের বাক্স বের করে ফেলল চটপট।

খেতে-খেতে জিশানের মনে হল, খিদের শক্তি অন্যান্য অনেক শক্তির চেয়ে জোরালো।

একটু পরে খাওয়া প্রায় শেষ করে ট্র্যাকারে দুজন কিলারের পজিশন দেখল। মোটামুটি দূরে রয়েছে ওরা। তা ছাড়া ওরা সংখ্যায় একজন কমে যাওয়ায় 'ত্রিভুজ' ফাঁদে জিশানকে আর ফেলতে পারবে না। ওদের কাছ থেকে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য জিশান জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকতে লাগল। তখনও ওর চোয়াল নড়ছে—খাওয়া তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

এদিকটা শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। সূর্যের আলো ভেতরে প্রায় ঢুকতেই পারছে না। শুধু গাছের পাতা থেকে ঠিকরে আসা অথবা ঈষদচ্ছ পাতা ভেদ করে আসা মোলায়েম এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও-কখনও পশু-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘুঘুর ডাকও শুনতে পেল জিশান। ডাকটার মধ্যে কেমন যেন দুপুর-দুপুর গন্ধ।

ঘড়ি দেখল। আর তিন কি চার ঘণ্টা। তারপরই আঁধারের ছায়া নামবে আকাশে।

ঠিক তখনই মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পেল জিশান। শব্দটা ভয়ংকর রকমের কাছাকাছি।

অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি ট্র্যাকার দেখল। না:, কিলার দুজন তো বেশ দূরে। তা ছাড়া ওরা রয়েছে একেবারে অন্যদিকে।

জিশান গাছের আড়ালে-আড়ালে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ডানহাতে তুলে নিল মিসাইল গান। জলে ভিজে গেলেও অস্ত্রটা দিব্যি ঠিকঠাক আছে। কারণ, এর বুলেটগুলোর প্রোপালসিভ ফোর্স বারুদের বদলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার থেকে তৈরি হয়।

খানিকটা পথ পেরোতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মোটরবাইকটাকে দেখতে পেল জিশান। কালো আর হলদে রঙের গাড়িটার ওপরে সওয়ার হয়ে রয়েছে একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক। মোটাসোটা। মাথায় টাক। গালে চাপদাড়ি। গায়ে হালকা নীল রঙের ফুল স্লিভ শার্ট আর গাঢ় নীল জিনস। মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে জঙ্গলের এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, উঁকিঝুঁকি মারছে।

আড়াল থেকে লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কে এই লোকটা? কিলার অপাশির রিপ্লেসমেন্ট কিলার? শ্রীধরের নতুন সারপ্রাইজ?

না:, সেরকম মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটির সঙ্গে কোনওরকম অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে ঠাহর হচ্ছে না।

গাছের আড়াল থেকে প্রকাণ্ড এক লাফ দিল জিশান। মাটিতে একবার পাক খেয়ে বলের মতো গড়িয়ে লোকটির কাছে পৌঁছে গেল। বাঁধন ছেড়া গোটানো স্প্রিং-এর মতো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং

মিসাইল গানের লম্বা নলটা লোকটার মাথার পিছনে ঠেকাল। থেমে-থেমে বলল, 'ট্রিগার টেপামাত্রই তোমার কপাল ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে চলে যাবে...।'

লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'জিশান ভাইয়া, ম্যায় তেরেকো হেলপ করনেকো আয়া। তেরে লিয়ে টিভি লায়া...।'

কথাটা শোনামাত্রই জিশান ব্যাপারটা বুঝতে পারল। লোকটা লাইভ টেলিকাস্ট থেকে জানতে পেরেছে, জিশানের টিভি অকেজো হয়ে গেছে। তাই ওর জন্য টিভি নিয়ে এসেছে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে একটা ছোট টিভি বের করল চাপদাড়ি লোকটা। জিশানকে দিল। জিশান ওটা তাড়াতাড়ি রুকস্যাকে ঢুকিয়ে নিল।

কিন্তু লোকটা জিশানকে খুঁজে পেল কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা হিন্দিতে যা বলল, তার সারাংশ হল এই :

লাইভ টেলিকাস্টে জিশানের টিভির সমস্যা জানার পর গেম সিটির 'মক' সিটিজেনরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন একটা বাড়িতে জড়ো হয়ে জিশানকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইশ জন সিটিজেন বাইশটা মোটরবাইকে চড়ে বসে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে টিভি। ওরা ঠিক করে যে, পুরো গেম সিটি চষে বেড়িয়ে যে করে হোক জিশানকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বাইশজনের মধ্যে যে প্রথমে জিশানের দেখা পাবে, সে ওর হাতে কালার টিভিটা তুলে দেবে।

লোকটির নাম রউফ লালা। রউফ সবার আগে জিশানকে খুঁজে পেয়েছে বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছে। যে-বাইশজন জিশানের খোঁজে বাইক নিয়ে বিপজ্জনক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে সুপারগেমস কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই তাদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আর রউফ যেহেতু জিশানের দেখা পেয়েছে, ওর হাতে টিভিটা দিতে পেরেছে, তাতে মনে হয় রউফের জন্য আরও উঁচুদরের বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

রউফ লালা জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল : 'জিশান ভাইয়া, ম্যাঁয় বহত লাকি হুঁ। কিঁউ কে তেরে সাথ আচানক মেরা সবসে পহেলে ভেট হো গিয়া...।'

এমন সময় গাছের পাতায় আওয়াজ তুলে একটা বড়সড় ইটের টুকরো অথবা পাথর ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে এসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। এবং কয়েকটা গাছে আগুন ধরে গেল। শুরু হল পাখপাখালি আর নানান প্রাণীর চিৎকার।

জিশানের মনে হল, এটা বোধহয় হাই-এনার্জি রকেট লঞ্চারের কীর্তি। ও রউফকে কিছু বলে ওঠার আগেই রউফ বলল, 'ডেঞ্জার, জিশান ভাইয়া! জলদি! তু মেরা বাইক লেকে জলদি নিকল যা। মেরা ফিকর মত কর...।'

পলকে তাই হল। জিশান রউফের বাইকে চড়ে এঁকেবেঁকে রওনা দিল। আর রউফ একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে জিশানের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে বিড়বিড় করে বলল, 'সরফরোশি কি তমন্না অব হামারে দিল মে হ্যায়/দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু-এ কাতিল মে হ্যায়...।'

আগুন এর মধ্যেই বড়সড় চেহারা নিয়েছে। রউফ সতর্কভাবে চারপাশে তাকাল। গাছের আড়ালে-আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ও ফেরার পথ খুঁজতে লাগল।

কয়েক পা যেতে না যেতেই কী একটা যেন আচমকা ছুটে এসে ওর বুকে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল। পিছনদিকে ছিটকে পড়ার সময় ও অবাক হয়ে দেখল, ওর বুকে হঠাৎ করে একটা প্রকাণ্ড গর্ত গজিয়ে উঠেছে। গর্তের ভেতরটা টকটকে লাল।

রউফ লালা মারা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ওর সবচেয়ে প্রিয় নামটা ধরে চিৎকার করে উঠল : 'আ—ল—লা—আ...আ...আ...!'

ওর মুখ দিয়ে শব্দ আর রক্ত একইসঙ্গে বেরিয়ে এল।

ঠিক তখনই দূরের একটা পিপুল গাছের আড়াল থেকে কিলার প্রোটনের মুখটা দেখা গেল। চোখে আইগিয়ার থাকায় চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নজরে পড়ছে।

•

জঙ্গল পেরিয়ে জিশান আবার রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরেই ও বাতাসে পোড়া গন্ধ পাচ্ছিল। জঙ্গল পুড়ছে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা জঙ্গলকে না শেষ করে দেয়!

ও রউফ লালার কথা ভাবছিল। হাসতে-হাসতে ঝুঁকি নেওয়া এক আশ্চর্য মানুষ! জিশানকে একবার সামনাসামনি দেখতে পেয়েই যে-মানুষটা নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারে। ওর 'তুই-তুই' সম্বোধনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ভালোবাসার, আন্তরিকতার, টান ছিল।

ওই ভাগ্যবান মানুষটা ভালো থাকুক। মনে-মনে বলল জিশান। তারপর রাস্তা ধরে বাইক ছোটাল।

খাঁ-খাঁ গেম সিটির সব জায়গা যেন একইরকম। ধুধু পথঘাট। কোথাও খোলা মাঠ, কোথাও গাছপালা জঙ্গল। আবার কোথাও থোকা-থোকা ফুলের মতো দশ-বিশটা বাড়ি। কখনও চোখে পড়ছে পাথুরে পাহাড়, কখনও-বা নদী।

শহরটায় সব আছে, শুধু প্রাণ নেই। নিউ সিটির অবস্থাটাও যেন অনেকটা তাই। শুধু অল্প কিছু মানুষের বুকের ভেতরে সত্যিকারের মানুষ রয়েছে।

জিশান ভীষণ জোরে বাইক চালাচ্ছিল। কখনও রাস্তায়, কখনও খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, কখনও গেম সিটির সিটিজেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে, কখনও টিলার ওপর দিয়ে, কখনও-বা ফ্লাই ওভারের ওপর দিয়ে। তবে পথ চলার ফাঁকে-ফাঁকে ও থামছিল। ফুড ম্যাপ দেখছিল, ট্র্যাকার দেখছিল, টিভি দেখছিল। আর খিদে পেলে খেয়ে নিচ্ছিল।

টিভিতে ভাষ্যকারদের গলায় স্বরে উত্তেজনার পারদ বেশ কয়েক ধাপ চড়ে গেছে। কিল গেমের ইঁদুর-বেড়াল খেলা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নানান মতামত শোনানো হচ্ছে। তারই মাঝে-মাঝে ঢুকে পড়ছে পুরোনো সব কিল গেমের ক্লিপিংস। আর এসবের ফাঁকফোকরে রুটিনমাফিক বিজ্ঞাপনের ব্রেক তো আছেই!

মাথার ওপরে সূর্য অন্তত পনেরো ডিগ্রি হেলে গেছে পশ্চিম দিকে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা—তারপরই অন্ধকার। যেটা ভগবানের দেওয়া জিশানের কালো পোশাক। তখন ওকে সুখারাম আর প্রোটন দেখতে পাবে না। অবশ্য জিশানও ওদের দেখতে পাবে না। কিন্তু তা সত্বেও জিশান মাথা তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। সূর্যদেবকে তাড়াতাড়ি অস্ত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

এক ঝাঁক বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে জিশানের বাইক ছুটে যাচ্ছিল। সিটিজেনদের হইচই জিশানের কানে এল। ওদের অনেকেই এখন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কিল গেমের রোমাঞ্চ আরও ভালো করে অনুভব করছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের সাহসও বেড়েছে।

জিশানের বারবার মিনি আর শানুর কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু ও জোর করে ওদের মন থেকে সরিয়ে রাখতে চাইছিল। ওদের নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবলেই জিশান দুর্বল হয়ে পড়বে। ও চায় না, টিভির লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি দর্শক ওর দুর্বলতা দেখে ফেলুক।

জিশান মনকে শক্ত করছিল। বলছিল, মনে-মনে, 'আর তো মাত্র পনেরো ঘণ্টা!' কিন্তু ওর ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সেই ভোর ছ'টা থেকে ও ছুটছে, শুধু ছুটছে। মোটরবাইকের ইঞ্জিনের তাপ ওর শরীরের সমস্ত রস যেন ক্রমাগত শুষে নিচ্ছে। হয়তো সেইজন্যই ওর এত বেশি ক্লান্ত লাগছে, একটু-আধটু ঘুমও পাচ্ছে।

কিন্তু এখন ঘুম পেলে চলবে না। পনেরো ঘণ্টা পর ও ঘুমোবে।

বাইক চালাতে-চালাতে নকল পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। পাশাপাশি দুটো নকল পাহাড়—দেখতে হুবহু আসল পাহাড়ের মতো, তবে উচ্চতায় বড়জোর একশো মিটার। প্রথম পাহাড়টার পাকদণ্ডী বেয়ে জিশানের

বাইক ওপরে উঠতে লাগল।

সরু এবড়োখেবড়ো পথ। তার একপাশে ঝোপঝাড় কাঁটাগাছ। আর অন্যদিকে নকল পাথরের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ফাটল থেকে ছোট-বড় গাছ গজিয়েছে। সেই গাছে ফুটে রয়েছে গোলাপি, সাদা আর কমলা রঙের অসংখ্য ছোট-ছোট ফুল।

জিশানের মনে হল, কতদিন পর একজন মানুষ ফুলগুলোকে দেখতে এল। তাও আবার ওল্ড সিটির দূরের শহর থেকে। ওর আরও মনে হল, ওকে দেখে ফুলগুলো যেন খুশিতে হাসছে, অল্প-অল্প দুলছে।

অপাশিরা কথাও মনে পড়ছিল জিশানের। অপাশিকে ও চেনে না, জানে না—কিন্তু তা সত্বেও ওকে খুন করে বসল! যে-মানুষ দুটো পরস্পরের অচেনা, যাদের মধ্যে এককণাও ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা বিনিময় হয়নি, তারা একে অপরের প্রাণের জন্য পাগল!

নিজেকে ধিক্কার দিল জিশান। ওর সান্ত্বনা শুধু এটুকুই যে, অপাশি কানোরিয়ার জন্য সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা করছিল। আর প্রোটন কিংবা সুখারামের ক্ষেত্রেও তাই।

পাহাড়ে অনেকটা উঠে আসার পর জিশান থামল। এই উচ্চতা থেকে শহরটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! রাস্তার পাশে বাইক থামিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় ঘাস আর আগাছার ওপরে ও বসে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিল গেমের কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল, ওর নাম কী, ও কোথায়, কী করতে এই পাহাড়ে বসে আছে।

চোখের সামনে সাদা আর নীল মেশানো আকাশ। কয়েকটা কালো পাখি। চিড়িক-চিড়িক করে ডাকতে-ডাকতে জিশানের চোখ বরাবর উড়ে গেল। শব্দ করে বাতাস বইছে। জিশানের মনে হচ্ছিল, বাতাস ওর সঙ্গে কথা বলছে।

জিশান কেমন উদাসীন হয়ে গেল, আনমনা হয়ে গেল।

হঠাৎই একটা চিলের চিৎকারে ও বাস্তবে ফিরে এল। পোশাকের হাতা দিয়ে কপাল আর গালের ঘাম মুছল। বাঁ-হাতের অপারেশনের জায়গাটা অল্প-অল্প ব্যথা করছে। ট্র্যাকারের মাইক্রোট্রান্সমিটারটা এই জায়গায় মাংসের আড়ালে আস্তানা গেড়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত পায়ে রুকস্যাকের দিকে এগোল। হাত দুটো শূন্যে তুলে কয়েকবার ঘোরাল। পা টানটান করে কাল্পনিক শত্রুর দিকে কয়েকবার লাথি ছুড়ল। জড়তা কাটিয়ে চাঙ্গা হওয়া দরকার।

রুকস্যাক থেকে টিভি বের করল। অন করামাত্রই উত্তেজনাময় রানিং কমেন্ট্রি। আর ক্লোজ-আপ ছবিতে প্রোটন। পাথর খোদাই করা নিষ্প্রাণ মুখ।

'...ফোকস, হাই অ্যাড্রিনালিন গেম এখন পিক-এ পৌঁছে গেছে। কারণ, সুপারহিরো জিশান এখন জোড়া পাহাড়ের হিল নাম্বার ওয়ান-এ, এইটি মিটার লেভেলে, আর কিলার প্রোটন হিল নাম্বার ওয়ানের বেস-এ পৌঁছে গেছে।

'হিল নাম্বার ওয়ান থেকে নামার পথ তিনটে। তার মধ্যে দুটো রাস্তা প্রোটন গাড়ি দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে। আর অন্য রাস্তা ধরে ও এখন মোটরবাইক নিয়ে পাহাড়ে উঠবে। সো, হেড টু হেড এনকাউন্টার ইজ ইনএভিটেবল। মোকাবিলা হচ্ছেই...।'

কিন্তু গাড়ি দিয়ে প্রোটন দুটো রাস্তা ব্লক করল কেমন করে! ও একা দুটো গাড়ি আর একটা মোটরবাইক হিল নাম্বার ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে এল কেমন করে! সুখারাম বা আরও কেউ কি ওকে হেলপ করেছে? এটাও কি শ্রীধর পাট্টার একটা সারপ্রাইজ?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে জিশান চটপট ট্র্যাকার বের করল। তারপর ট্র্যাকারের দিকে চোখ রেখেই হান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান বের করে নিল রুকস্যাক থেকে।

ট্র্যাকারে সবচেয়ে কাছের লাল ডটটা ওর কাছ থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে রয়েছে। না, 'দূরে' রয়েছে না বলে 'কাছে' রয়েছে বলাটাই বোধহয় ভালো।

জিশান পাহাড়ের কিনারায় এসে খাদের দিকে তাকাল। পাহাড়ে ওঠার রাস্তাগুলোর শুরুর দিকটা দেখতে চাইল। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে না। গাছপালায় আড়াল হয়ে গেছে।

টিভিতে তখন জিশানের ছবি। পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সঙ্গে রানিং কমেন্ট্রি চলছে : '...নিজের মোটরবাইকের সঙ্গে দুটো গাড়ি চেন দিয়ে বেঁধে প্রোটন টো করে হিল নাম্বার ওয়ান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। তারপর রোড ব্লক করেছে। ঠিক যেন কোনও মানুষের মেইন আর্টারি ব্লক করে দেওয়া। সত্যি, বন্ধুগণ মানতেই হবে প্রোটনের ব্রেন সুপারকুল...।'

জিশানের ঠিক পিছনে পাহাড়ের পাথুরে দেওয়ালে সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।

ওর কানে তালা লেগে গেল। পাথরের ছোট-বড় টুকরো সপ্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল চারিদিকে। ও চট করে একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল। প্রোটনের অস্ত্রটা কী হতে পারে? লেসার টেলিশটার? নাকি হালকা, লং ডিসট্যান্স রাইফেল?

কয়েক সেকেন্ড পর গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখতে চেষ্টা করল। সঙ্গে-সঙ্গে 'ক্র্যাক' আওয়াজ। জিশান এক ঝটকায় মাথা নামাল। ওর পিছনের পাথর থেকে আবার স্টোন চিপস উড়ে গেল নানান দিকে।

জিশানও পালটা জবাব দিল মিসাইল গান দিয়ে। নীচের দিকে আন্দাজ করে চকিতে পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল। তারপর ছুটে চলে গেল টিভি সেটের কাছে। হ্যাঁ, ওর আর প্রোটনের অ্যাকশনের লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। প্রোটনের কানে স্যাটেলাইট ফোন। বোধহয় সুখারামের সঙ্গে কথা বলছে। প্ল্যান আঁটছে।

এবার জিশানের ক্লোজ-আপ দেখা যাচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। কোথাও-কোথাও রক্তের ছিটে। চুলে ধুলোর আস্তরণ।

কিন্তু সুখারাম এখন কোথায়? কতটা দূরে?

ট্র্যাকার দেখল। সুখারামের লাল ডটটা বেশ কিছুটা দূরে, কিন্তু এগিয়ে আসছে সবুজ ডটের দিকেই।

না, আর দেরি নয়। চটপট রুকস্যাকে ট্র্যাকার, টিভি সব গুছিয়ে নিল। হান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান কোমরে গুঁজে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে বেঁধে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করল। ছোট-বড় বোল্ডারকে ডিঙিয়ে বা পাশ কাটিয়ে, গাছের ঝুঁটি ধরে নিজেকে সামলে জিশান নামতে লাগল। নামার সময় প্রোটনের পজিশন আন্দাজ করে নিজেকে পাথর কিংবা গাছের আড়ালে-আড়ালে রাখতে লাগল।

নামতে-নামতে ভাবছিল জিশান। পথ দিয়ে নয়, বিপথ দিয়েই ওকে পালাতে হবে, কিলার প্রোটনকে এড়াতে হবে। তারপর অন্ধকারের অপেক্ষা।

কিন্তু জিশান যেরকম ভাবল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হল না।

নামার সময় বেশ বিপজ্জনক ঢাল ওকে ম্যানেজ করতে হচ্ছিল। ওর হঠাৎই মনে হল, যদি কোনওভাবে ওর পা স্লিপ করে তা হলে বিপদ তো হবেই, তার ওপর রুকস্যাকের টিভি, ট্র্যাকার, স্যাটেলাইট ফোন সবকিছুর বারোটা বাজবে। নতুন করে টিভি আর ট্র্যাকার জোগাড় করার ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারটা মনে-মনে ভাবল। তারপর রুকস্যাকটা খুলে নামিয়ে দুটো বড় পাথরের খাঁজে লুকিয়ে ফেলল। জায়গাটা ভালো করে নোট করে মাথায় গেঁথে নিল। এবার মিসাইল গান আর হান্টিং নাইফ সম্বল করেই নামা যাক।

জিশান নামতে লাগল। পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলাতে লাগল বারবার। আর দু-চোখ সরু করে প্রোটনকে খুঁজতে লাগল।

প্রোটনও জিশানকে খুঁজছিল। কিন্তু ও ভেবেছিল, জিশান তিনটে পাকদণ্ডীর একটা বেয়ে নামবে। ও যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার ঝুঁকি নেবে সেটা ভাবেনি। তাই জিশানকে প্রোটন ট্র্যাক করতে পারেনি। মিনিট কয়েক খোঁজাখুজির পর প্রোটন চুপ করে ভাবতে শুরু করল। জিশানের বুদ্ধির সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাপ খাওয়াতে লাগল। জিশানের স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে সেটা আঁচ করতে লাগল। আর চিবুক তুলে শকুনের চোখে পাহাড়ের ঢালের প্রতিটি কণা ছানবিন করতে লাগল।

প্রোটন ভাবতে লাগল, 'আমি জিশান হলে কোন এসকেপ রুট ব্যবহার করতাম?' এবং মনে-মনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলল।

একটু পরেই প্রোটন যে-উত্তরটা খুঁজে পেল সেটা জিশানের সঙ্গে মিলে গেল। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে প্রোটন উঠতে শুরু করল। পিঠে রুকস্যাক। স্যাটেলাইট ফোনটা রুকস্যাকে চালান করে দিয়েছে। লেসার টেলিশটার আড়াআড়িভাবে দাঁতে চেপে ধরা। চোয়ালের রেখা উঁচু হয়ে চেয়ে আছে। লম্বা-লম্বা হাত-পা ব্যবহার করে এমনভাবে ও পাহাড় বেয়ে উঠছে যেন একটা কালো রঙের মাউন্টেন লায়ন।

পাহাড়ের কালচে পাথরের মাঝে কালো পোশাক পরা প্রোটনকে খুঁজে পাচ্ছিল না জিশান। তাই ও সামান্যতম নড়াচড়া দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু হঠাৎই একটা অঘটন ঘটল।

পাহাড়ের পাথরের খাঁজে বোধহয় একটা চিল বাসা বেঁধেছিল। জিশান আচমকা ওটার সামনে হাজির হয়ে পড়তেই মা-চিলটা ডানা ঝপটে তেড়ে এল ওর দিকে। এবং সাপের ছোবল মারার ক্ষিপ্রতায় জিশানের কপালে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিল।

জিশানের কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। শক্ত ঠোঁটের আঘাতে কপালে বেশ ব্যথাও টের পেল। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি হল অন্যভাবে।

জিশান ব্যালান্স হারিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়তে লাগল।

পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে নেমে আসা শরীরটাকে প্রোটন সহজেই দেখতে পেল। একটা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে ও জিশানকে তাক করে লেসার টেলিশটার পরপর দুবার ফায়ার করল।

মুভিং টারগেট। তাই প্রোটন লক্ষভ্রষ্ট হল। আশপাশের পাথরের ছিলকা উড়ে গেল। এবং জিশানের গড়িয়ে পড়া শরীর একেবারে প্রোটনের ঘাড়ে এসে পড়ল।

দুটো শরীর জড়াজড়ি করে নীচে পড়ছিল, কিন্তু একটা পাথরের চাতাল ওদের বাঁচিয়ে দিল।

ওদের সংঘর্ষের জায়গা থেকে কয়েক মিটার নীচে একটা পাথরের চাতাল ছিল। তার শরীরে অনেক ছোট-বড় ফাটল, কিন্তু পাথরটা চেহারায় ঠিক যেন একটা বড় মাপের ডাইনিং টেবিল। তার গায়ের চারপাশে আর নানান ফাটলে শুধু আগাছা আর ঘাস।

জিশান আর প্রোটন সেখানে এসে পড়ল। একটা শাখামুটি সাপ চাতালটায় শুয়ে বোধহয় রোদ পোহাচ্ছিল, চমকে উঠে সড়সড় করে একটা ফাটলে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিতে জিশানের এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি। আর প্রোটনের পেট লক্ষ্য করে লাথি চালাতে সময় লাগল বাড়তি আরও একটা সেকেন্ড।

প্রোটনের লেসার টেলিশটার ওর হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। পাহাড়ের ঢালের পাথরে-পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ওটা নীচে পড়ে গেছে। রুকস্যাকের দশাও তাই। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে কখন যেন আশপাশে ছিটকে পড়েছে।

আর জিশানের হালও একইরকম। ওর কোমরে গোঁজা মিসাইল গান চিলের আচমকা আক্রমণে নীচে পড়ার সময় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শুধু হান্টিং নাইফটা কোমরে তখনও ছিল। ওটার ফলার খোঁচা খেয়ে কোমরের বাঁ-দিকটায় কোথাও একটা চোট লেগেছে। জায়গাটা বেশ জ্বালা-জ্বালা করছে।

প্রোটনের ক্ষিপ্র প্রতিবর্তী ক্রিয়া জিশানকে অবাক করে দিল। বেজির তৎপরতায় ও জিশানের লাথির সংঘাতটা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ এড়িয়ে গেল। সার্কাসের পেশাদার অ্যাক্রোব্যাটদের মতো দুবার সামারসল্ট খেয়ে পলকে চলে গেল জিশানের হাত-পায়ের নাগালের বাইরে।

এরপর যে-লড়াইটা হল সেটা কারাটে আর কিক বক্সিং-এর অদ্ভুত মিশেল। এই সব লড়াইয়ের আধুনিক নাম জিশান না জানলেও লড়াইটা জানে। আর প্রোটনও তার চেয়ে কিছু কম জানে না।

ওদের দুজনের হাত-পা চলতে লাগল বিদ্যুৎগতিতে। আর সংঘর্ষের চোখাচোখা শব্দ হতে লাগল। ওর ছিপছিপে লম্বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে জিশান তার শক্তি যতটা হওয়া উচিত বলে আঁচ করেছিল, এখন বুঝতে

পারছিল প্রোটনের শক্তি তার চেয়ে অনেকটা বেশি।

ঘুরন্ত চাকার মতো শরীরটাকে শূন্যে পাক খাইয়ে দিল প্রোটন। একইসঙ্গে ওর ডান-পা একটা বৃত্তচাপ এঁকে দিল বাতাসে। আর পায়ের গতিপথে জিশানের চোয়ালকে পেয়ে গেল।

জিশান একটা ঝটকা দিয়ে মাথাটা সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সেটার টাইমিং যে ঠিক হয়নি সেটা চোয়ালের আঘাত ওকে জানিয়ে দিল। ও পিছনদিকে টাল খেয়ে পড়ে গেল পাথরের দেওয়ালে। কিন্তু এক সেকেন্ডের মধ্যেই নিজেকে আবার সামলে নিল।

প্রোটন ওর পোশাকের কোনও একটা পকেট থেকে একটা ইস্পাতের স্টার বের করে নিয়েছিল। সেটার প্রান্তগুলো ক্ষুরের মতো ধারালো। স্টারটা মাপে একটা বিস্কুটের মতো। সেটা ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমার মাঝে চেপে ধরল—যেন জিনিসটা একটা চ্যাপটা সিগারেট।

জিশান হান্টিং নাইফটা কোমর থেকে খামচে বের করে নিল। কিন্তু ততক্ষণে প্রোটন পা ভাঁজ করে সামান্য কুঁজো হয়ে ইস্পাতের ঝকঝকে তারাটা ফ্রিসবি ছোড়ার ভঙ্গিতে জিশানের ডানহাত লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

ছোট্ট অস্ত্রটা বাতাস চিরে ধেয়ে গেল জিশানের দিকে, ওর ছুরি ধরা হাতের পিঠে গিয়ে প্রথম আঘাত করল, কিন্তু সেখানেই থামল না। দুরন্ত গতিতে চাকার মতো গড়িয়ে হাত বেয়ে ছুটে গেল। তারপর ছুঁচোবাজির মতো এলোমেলো বাঁক নিয়ে জিশানের বুকের ওপরে আড়াআড়িভাবে ধারালো ফলার দাগ টেনে দিল।

জিশানের হাত, বুক, জ্বলে গেল। রক্তের রেখা ফুটে উঠল হাতে, বুকে। হান্টিং নাইফ হাত থেকে খসে পড়ে গেল।

আচমকা আঘাত আর যন্ত্রণায় জিশান হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাবু হয়েছিল, সেই ফাঁকে প্রোটন এক ঝাঁক ইস্পাতের পিন জিশানের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিয়েছে।

পিনগুলো মাপে ইঞ্চিচারেক। চকচকে। ডগাগুলো সূক্ষ্ম।

জিশান ঝটিতি বসে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও ও সবক'টা পিন এড়াতে পারল না। তিনটে ইস্পাতের পিন ছুটে এসে ওর কপালে আর গালে বিঁধে গেল।

সেই অবস্থাতেই জিশান একটা মাঝারি মাপের বোল্ডার তুলে নিয়ে শট পাটের ভঙ্গিতে ছুড়ে দিল। ওর শরীরটা চক্কর খেয়ে দেড়পাক ঘুরে গেল। এবং ভারি পাথরটা প্রচণ্ড ভরবেগ নিয়ে প্রোটনের পেটে গিয়ে ধাক্কা মারল। সংঘর্ষের অভিঘাতে প্রোটন পিছনদিকে টাল খেয়ে গেল। ব্যালান্স রাখার জন্য ও দু-হাত চরকির মতো শূন্যে ঘোরাতে লাগল। এই পড়ো-পড়ো অবস্থায় তিন-চার সেকেন্ড বাতাসে চিত-সাঁতার কাটল। তারপর টলে পড়ে গেল পাথরের চাতাল থেকে।

জিশান এত সব কাণ্ড দেখার জন্য মোটেই অপেক্ষা করেনি। মসৃণ পাথরটা শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝতে পেরেছিল লক্ষ্যভেদ হবেই। নিউ সিটির সুদীর্ঘ ট্রেনিং ওর আত্মবিশ্বাসকে অকল্পনীয় ভিতের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের ঢালের দিকে। তারপর শুধু হাতে রক ক্লাইম্বিং শুরু করে দিয়েছে। মাকড়সার মতো তরতর করে বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

ও জানে, প্রোটনের হাতে এই মুহূর্তে কোনও লং ডিসট্যান্স অস্ত্র নেই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে হবে। জলদি! জলদি!

প্রোটন চাতাল থেকে প্রায় দশ-বারো ফুট নীচে পড়ে গিয়েছিল। ওর মাথা ঠুকে গিয়েছিল একটা বড় বোল্ডারে। ওর শরীরটা সেই বোল্ডারের খাঁজে আটকে গিয়ে ওর প্রাণ বাঁচাল বটে, কিন্তু ও অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর চোখের আইগিয়ার আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে—তাতে এতটুকু চিড় ধরেনি। তাই চিত হয়ে পড়ে থাকা প্রোটনকে বিকেলের রোদে ভারি বিচিত্র দেখাচ্ছিল। ওর দুটো কালো 'চোখ' নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে।

জিশান পাগলের মতো ওর মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে চাইছিল। ওর এখন মোটরবাইকটা দরকার। ওটাই এখন ওর সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে জিশান সুখারাম নস্করের কথা ভাবছিল। সুখারাম এখনও অকুস্থলে এসে পৌঁছতে পারল না কেন? ওর তো এতক্ষণ দেরি হওয়ার কথা নয়! তা হলে কি ও ট্র্যাকার দেখে জিশানের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে, কিন্তু পাহাড়ের ঢালে সঠিক জায়গাটা খুঁজে পায়নি?

আর বেশি ভাবার দরকার নেই! হাঁপাতে-হাঁপাতে জিশান ওর পুরোনো জায়গাটায় বেয়ে উঠল। ওই তো ওর রুকস্যাক! ওই তো ওর মোটরবাইক!

বিকেলের আলোয় জিশানকে ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ওর মুখে, গালে, চিবুকে ঘাম আর রক্ত। হাত আর বুকের ওপরে আঁকা হয়ে গেছে রক্তের রেখা। সারা শরীরে জ্বালা-পোড়া। তিনটে ইস্পাতের পিন লম্বভাবে বিঁধে রয়েছে কপালে আর বাঁ-গালে। এতক্ষণ পিনগুলো খোলার কথা মনে হয়নি। এখন টান মেরে খুলে ফেলল। নতুন জ্বালার অনুভূতি হুল ফোটাল তিনটে বিন্দুতে। ভাগ্যিস এগুলোর ডগায় বিষ মেশানো নেই! আর হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় প্রোটনের নখের আঁচড় থেকে ও নিতান্ত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।

রুকস্যাক পিঠে নিয়ে মোটরবাইক ছুটিয়ে দিল জিশান। তার আগে বাইকের কেরিয়ারে রাখা প্লেট টিভিটা অন করে দিল। ছবি দেখা না যাক, অন্তত রানিং কমেন্ট্রিটা শোনা যাক। তা থেকে যতটুকু খবর পাওয়া যায়।

'এইমাত্র আপনারা যা দেখলেন সেটা একটা অবিশ্বাস্য লড়াই। এইরকম থ্রিলিং টেবল-টপ ফাইট এর আগে কোনও কিল গেমে দেখা যায়নি। কিলার প্রোটন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও জ্ঞান ফিরে পাবে। তারপর আবার নতুন এনার্জি নিয়ে লড়াইয়ে নামবে।

'বন্ধুগণ, আপনাদের জানিয়ে রাখি কিল গেমের নানানরকম ইভেন্ট নিয়ে যেসব ''ফোরসি দ্য আউটকাম''-এর সুইপস্টেক-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত বাজি ধরেছেন চোদ্দোশো তিরিশ মিলিয়ন দর্শক। এরকম বিশাল নাম্বারের পার্টিসিপেশান আগে কখনও কোনও কিল গেমে দেখা যায়নি। দিস ইজ অ্যান অল টাইম রেকর্ড, ফোকস, অল টাইম সুপারডুপার হিট!

'ওই দেখুন, জিশান এখন পাহাড় থেকে নামছে। কিন্তু রাস্তার শেষে রোড ব্লক রয়েছে। একটা গাড়ি সেখানে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে গেছে কিলার প্রোটন। দেখা যাক, আমাদের সুপারহিরো কী করে! আপনারা ভুলে যাবেন না, জিশান এখন উন্ডেড আর টায়ার্ড। সেটা ওকে দেখেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

'আর-একটা প্লাস পয়েন্ট ফর জিশান। কিলার প্রোটন এখন টেম্পোরারিলি ডি-অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্বেও জিশান ওর মোটরবাইকের কাছে এসে রুকস্যাক থেকে ওয়েপন নিয়ে আবার প্রোটনের কাছে ফিরে যায়নি। ওকে পারমানেন্টলি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেয়নি। সো, ফোকস, থ্রি চিয়ার্স ফর জিশান, থ্রি চিয়ার্স ফর হিজ সফট হার্ট—।'

জিশান এসব শুনতে পাচ্ছিল আর পাকদণ্ডী বেয়ে নামছিল। একইসঙ্গে ভাবছিল, কী করে ও রোডব্লকটা পেরোবে। ওর সামনে পশ্চিমে ঝুঁকে পড়া সূর্য। সরাসরি যেন তাকিয়ে আছে জিশানের দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও পাহাড়ের প্রায় নীচের দিকে চলে এল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, সরু রাস্তায় প্রায় আড়াআড়িভাবে একটা রুপোলি রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার দুপাশে এমন কোনও ফাঁক নেই যা দিয়ে একটা মোটরবাইক গলে যেতে পারে।

জিশান বাইকের গতি কমাতে বাধ্য হল। এবং থামল। রুপোলি গাড়ির 'পাঁচিল'টার দিকে তাকিয়ে রইল।

•

সুখারাম নস্করের ভালো লাগছিল না। ও জানে, ওর ফেরোসিটি কোশেন্ট 4.9 জানে, ও বেজির মতো ক্ষিপ্র, চন্দ্রবোড়ার মতো সতর্ক, তৎপর। আর ছুটতে পারে হরিণের মতো—সেটাও আবার একটানা, অনেকক্ষণ ধরে।

নিয়মিত শরীরচর্চা করাটা সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদের রুটিনের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া দৌড়ের অভ্যেসটা ও জেলের মধ্যেও বজায় রেখেছে। ফলে এখন ও বদনোয়ার গ্যাঙের তিন-চারজনের সঙ্গে খালি হাতে দিব্যি মহড়া নিতে পারে। তা সত্ত্বেও শ্রীধর পাট্রা ওর সারা শরীরে নানান মারণাস্ত্র সাজিয়ে দিয়েছেন। আর বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দিয়েছেন স্যাটেলাইট ফোন।

কারণ একটাই : গেম সিটির সীমানার মধ্যে ওকে জিশানকে শিকার করতে হবে।

এইখানেই হয়েছে যত মুশকিল!

কিল গেমে নামার আগে জিশানের নানান গেমের ক্লিপিংস সুখারাম দেখেছে। দেখেছে ওর আরও অন্যান্য ক্লিপিংস। সেইসব দেখার পর থেকেই ওল্ড সিটির এই লড়াকু ছেলেটার প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। বারবার মনে হয়েছে, জিশান ওর ভাই—ওরা একই শহরে মানুষ হয়েছে। এই নিউ সিটিতে আসার পর থেকে জিশান ওর শহরের হয়ে লড়াই করছে, ন্যায়ের হয়ে লড়াই করছে।

সুখারামের মনে পড়ল, মনোহর সিং-এর হয়ে জিশান রুখে দাঁড়িয়েছে, জাব্বাকে পিট ফাইটে নিকেশ করতে-করতেও ও ছেড়ে দিয়েছে, অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেনি।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে সুখারামের মনের ভেতরে শ্রীধর পাট্রার মুখটা বদনোয়ার মতো হয়ে গেল, আর জিশানের মুখটা ওর মতো। সুখারামও তো ন্যায়ের জন্যই লড়াই করেছিল!

সুখারাম যদি জিশানকে খতম করতে পারে তা হলে তার বিনিময়ে ও কী পাবে? মৃত্যুদণ্ড রদ। সেইসঙ্গে মুক্তি। আর হয়তো অনেক টাকা পুরস্কার। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ও করবে কী? কোথায় যাবে? মা নেই। চোলিও নিশ্চয়ই আর নেই। তা হলে ও যাবে কোথায়? অনিশ্চিত জীবনের পথে শুধু দৌড়বে, আর দৌড়বে!

বরাট স্যারের কথা মনে পড়ল। স্যারের খদ্দরের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ ভেসে এল ওর নাকে। স্যার প্রায়ই বলতেন, 'তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি....।' বদনোয়া আর ওর চারটে চুন্নুকে খতম করে ও পৃথিবী থেকে পাঁচ-পাঁচটা পাপীকে মুক্তি দিয়েছিল। একটা 'বড়' কাজ করে দেখিয়েছিল।

আজ আবার একটা সুযোগ এসেছে—একটা 'বড়' কিছু করে দেখানোর। তাই ও শ্রীধরের পোষা অন্ধ কুকুরের মতো জিশানকে তাড়া করে ছুটে বেড়াতে পারছিল না। ওর ভেতরে ভীষণ তীব্র একটা অনিচ্ছার ঝোঁক কাজ করছিল। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আর জিশানের মধ্যে দূরত্বের ফারাক তেমন একটা কমছিল না।

এর জন্য বেশ কয়েকবার শ্রীধর ওকে ফোন করে ধমক দিয়েছেন : 'কী ব্যাপার, সুখারাম? তুমি কি ভুলে গেলে তোমার ফেরোসিটি কোশেন্ট 4.9? তোমার অ্যাক্টিভিটি দেখে তো মনে হচ্ছে ওটা 2.5-এরও কম!'

শুধু শ্রীধর পাট্রা নয়, টিভির কমেন্টেটররাও ওকে ঘন-ঘন সমালোচনা করেছে। ও গেম সিটির কয়েকটা দোকানে দাঁড়িয়ে দোকানের টিভিতে নিজের কানে সেইসব সমালোচনা শুনেছে। কমেন্টেটররা কখনও ওকে 'সুখী সুখারাম' বলে সম্বোধন করেছে, আবার কখনও বা বলেছে, 'ওর নাম মনে হয় সুখারাম নস্কর নয়, সুখারাম গদাইলশকর!'

কিন্তু না—তাতেও সুখারামের ভেতরের ইচ্ছেটা, কিংবা অনিচ্ছাটা, পালটায়নি। কিল গেমটা ও জিশানের সঙ্গে লড়তে চায় না, শ্রীধরের সঙ্গে লড়তে চায়। ওর আবার একটা 'বড়' কাজ করে দেখাতে ইচ্ছে করছে। বরাট স্যার যেখানেই থাকুন, নিশ্চয়ই ওর এই কাজের কথা জানতে পারবেন।

ওর নাকে স্যারের ঘামের গন্ধটা আবার ভেসে এল।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সুখারাম। হাতে ধরা হাই-ফাই ইলেকট্রনিক ট্র্যাকার। একটা সবুজ ডট, আর দুটো লাল ডট। সবুজ ডটটা নড়ছে বটে, কিন্তু লাল ডট দুটো স্থির।

অপাশি যে আর নেই সেটা সুখারাম জানে। সুতরাং দুটো লাল ডটের একটা ও নিজে, আর অন্যটা প্রোটন। সুখারাম চুপচাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই ওর লাল ডট স্থির। কিন্তু প্রোটনও কি তা হলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু কেন?

প্রোটনকে ফোন করল সুখারাম। রিং বাজতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বাজতেই থাকল—কেউ ধরল না। অবশ্য ধরলেও প্রোটন এত কম কথা বলে যে, সেগুলোকে 'কথা' না বলে 'হু-হাঁ' গোছের 'শব্দ' বলাই ভালো।

ফোন কেটে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। সন্ধে নেমে আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই—অন্তত আকাশ তাই বলছে। একটা হেলিকপ্টার আকাশ চিরে উড়ে গেল। ওটার 'ভোমরার ডাক' হালকাভাবে ভেসে এল।

সুখারাম এবার নড়েচড়ে উঠল। ছল-ছুতোয় ও অনেক সময় 'নষ্ট' করেছে। আরও বেশিরকম গা ঢিলে দিলে শ্রীধর পাট্টা হয়তো তিতিবিরক্ত হয়ে শুটারে করে রিপ্লেসমেন্ট কিলার পাঠিয়ে দেবেন।

সুখারাম জঙ্গলের বাইরে পা চালাল। কাছেই পিচের রাস্তা। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সোনালি রঙের হাই-স্পিড অটোমোবিল। চ্যাপটা, ছ'চাকাওয়ালা। আগের নীল গাড়িটা সুখারাম বদলে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল সুখারাম নস্কর। শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন, জিশানের সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটা দরকার—ভীষণ দরকার।

•

জিশান বাইক থামাল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ও প্যাসকোর কথা ভাবল। ভাবল রুপোলি গাড়ির 'পাঁচিল' ডিঙোনোর একটা স্ট্র্যাটেজির কথা। তারপর বাইকে আবার স্টার্ট দিল। এবং ওই 'পাঁচিল' লক্ষ্য করেই গোঁ-গোঁ করে বাইক ছুটিয়ে দিল।

কিছুটা পথ গিয়েই বাইক তুলে দিল পাহাড়ের ঢালে। এবড়োখেবড়ো জমি, বড়-বড় ঘাস আর আগাছা, সঙ্গে ছোট-বড় পাথর—তার ওপর দিয়েই ওর বাইক কোলাব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলল। পাহাড়ের ঢালে বাইকটা হেলে থাকলেও ওটার স্পিড মাধ্যাকর্ষণের টানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। জিশানের বারবার মনে পড়ছিল প্যাসকোর কথা : গেম সিটিতে মোটরবাইকটা একটা অস্ত্র। এখন জিশান সেই অস্ত্র ব্যবহার করছে।

গাড়িটার কাছে পৌঁছে জিশান মোটরবাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেমে পড়ল গাড়ির বনেটের ওপরে। তারপর সেখান থেকে বাইকের চাকা লাফিয়ে-লাফিয়ে রাস্তায়। তারপর জিশানের বাইক স্বচ্ছন্দে ছুটে চলল।

একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে বাইক থামল। বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জমি। তার পরেই একটা বিশাল জলা। এদিক-ওদিক তাকালে চোখে পড়ে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

বিকেলের ঢলে পড়া আলোয় জায়গাটা কী সুন্দর, শান্ত আর নির্জন!

রুকস্যাক থেকে ট্র্যাকার বের করে দেখল জিশান। দুটো লাল ডটই এখন নড়ছে। তার মানে, কিলার প্রোটন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

ইস, এই ট্র্যাকারটা যদি না থাকত।

তা হলে জিশান ওই জলার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে থাকত। সুখারাম আর প্রোটনের চোখে ধুলো দিয়ে রাত কাবার করে দিত।

হঠাৎই ওর মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল : ওর বাঁ-হাতের যে-জায়গায় শ্রীধর পাট্টার মেডিকরা অপারেশন করে মাইক্রোট্রান্সমিটারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে-জায়গার মাংস খুবলে ট্রান্সমিটারটাকে বের করে

এখানকার জমিতে কোথাও পুঁতে দিলে হয় না! তা হলে দুই কিলারের ট্র্যাকারে দেখাবে জিশান এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে, অথচ জিশান তখন এখান থেকে অনেক দূরে কোনও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

সুতরাং বাইক থেকে নেমে পড়ল জিশান। রুকস্যাকে ট্র্যাকার রেখে দিয়ে বের করে নিল হান্টিং নাইফ। আর প্যান্টের পকেট থেকে বের করল স্পার্কার। এর বোতাম টিপলেই ছিটকে বেরোবে আগুনের নীল শিখা।

স্পার্কার অন করে হান্টিং নাইফের ইস্পাতের ফলাটা ও গরম করতে শুরু করল। শরীরে ঢোকানোর আগে ছুরির ফলাটাকে স্টেরিলাইজ করে নেওয়া দরকার।

জিশান চারপাশে একবার তাকাল। তারপর বাইকের পাশে রাস্তায় বসে পড়ল। ডানহাতে ছুরিটা বাগিয়ে ধরে বাঁ-হাতটা উঁচিয়ে ধরল চোখের সামনে। অপারেশন করে ট্রান্সমিটার ঢোকানোর জায়গাটা জিশানের স্পষ্ট মনে আছে। এই তো! এই জায়গাটায়! টি-শার্টের কালো চকচকে সিনথেটিক মেটিরিয়ালের ঠিক পিছনেই।

টিভির লাইভ টেলিকাস্টে জিশানকে কি এখন দেখা যাচ্ছে? কেউ কি বুঝতে পেরে গেছে ওর প্ল্যান?

এমন সময় জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোনের আওয়াজে জিশান চমকে উঠল। ওর ছুরি ধরা হাত থমকে গেল। বাঁ-হাত এগিয়ে গেল বাইকে রাখা রুকস্যাকের দিকে।

ফোন বের করে কলটা রিসিভ করতেই চেনা গলা শোনা গেল।

'বাবু জিশান, কোনও দুষ্টুমি কোরো না।' খুকখুক হাসি : 'তা হলে আমাকেও দুষ্টুমি করতে হবে—।'

'আমি...মানে...।'

'হ্যাঁ, জানি। তুমি গরম হান্টিং নাইফ দিয়ে বগল চুলকোতে যাচ্ছিলে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'আমি ওল্ড সিটিতে ফোর্স পাঠাচ্ছি—তোমার বউ আর ছেলেটাকে নিউ সিটিতে তুলে আনার জন্যে। ওরা হবে আমার সিকিওরিটি ডিপোজিট। তোমার কোনও দুষ্টুমি দেখলেই আমি ওদের নিয়ে অল্পস্বল্প দুষ্টুমি করব...।'

শ্রীধরের ঠান্ডা গলা শুনে জিশানের হাত থেকে হান্টিং নাইফ পড়ে গেল। ওর গলা চিরে একটা যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল, 'না! না! আমার ওয়াইফ আর ছেলেকে আপনি টাচ করবেন না। প্লিজ! প্লিজ...!'

ততক্ষণে শ্রীধর ফোনের লাইন কেটে দিয়েছেন।

জিশান কয়েক সেকেন্ড হাঁটুগেড়ে বসে রইল। ওর চোখে জল এসে গেল। শ্রীধর পাট্টা ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। শালা, বাস্টার্ড!

হঠাৎই জিশানের খেয়াল হল, লাইভ টেলিকাস্টে দর্শকরা ওর চোখের জল দেখতে পাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। চটপটে ভঙ্গিতে হান্টিং নাইফ রুকস্যাকে ঢুকিয়ে বাইকে চড়ে বসল।

বাইক চালাতে-চালাতেই টের পেল, ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে ওর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইরকম একটা সময়ে মিনি আর শানুর কথা তুলে শ্রীধর পাট্টা সত্যি-সত্যি ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।

ঝকঝকে মসৃণ রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে যাচ্ছিল—লাল ডট দুটোর কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে। রাস্তার দুপাশে গাছপালা আর উঁচু-নীচু প্রান্তর। জিশানের ক্লান্ত লাগছিল। শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় জ্বালা করছিল। মুখে, হাতে ধুলোর আস্তর—তার সঙ্গে ঘাম। ও বেশ বুঝতে পারছিল, এখন ওর একটু বিশ্রাম দরকার।

হঠাৎই ওর চোখে পড়ল, দূরে রাস্তার ধারে দুটো বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো বাড়িই দোতলা। একটা হালকা ছাই রঙের, আর তার পাশেরটা আবছা নীল। বাড়ি দুটো তীব্র গতিতে ক্রমশ ওর কাছে এগিয়ে আসছে।

জিশান লক্ষ করল, বাড়ি দুটোর বারান্দা কিংবা জানলায় কোনও উৎসুক মানুষের ভিড় নেই। ব্যাপারটা ওকে একটু অবাক করল। গেম সিটির কোনও মক সিটিজেন কি এ-দুটো বাড়িতে নেই?

জিশানের বাইক বাড়ি দুটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির একতলার দুটো দোকানঘর খাঁ-খাঁ করছে। জানলা আর বারান্দাও তাই।

জিশান বাইকটা একটা দোকানঘরে ঢুকিয়ে আড়ালে দাঁড় করাল। রুকস্যাক পিঠে নিল। বাইকের কেরিয়ার থেকে তুলে নিল ট্র্যাকার। তারপর মিসাইল গান হাতে বাগিয়ে ধরে খুব সাবধানে ধীরে-ধীরে পা ফেলে ঢুকে পড়ল একটা বাড়িতে।

বাড়িটার সবক'টা ঘর ঘুরে দেখল। আশ্চর্য! বাড়িতে কেউ নেই!

এই বাড়িটায় কোনও মক সিটিজেন নেই কেন? অপটিক্যাল ট্যাবলেট থেকে বাড়িটার লোকেশন দেখল। গেম সিটির পশ্চিম প্রান্তের দিকে। হয়তো মক সিটিজেনের তুলনায় বাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। তাই পশ্চিমদিকের এই দুটো বাড়ি সুনসান—খাঁখাঁ।

ঠিক তখনই পাশের বাড়ি থেকে টিভির কথাবার্তা শুনতে পেল। দোতলার একটা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পাশের বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একটা ঘরের ভেতরে নজর চালাল জিশান। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

তখন ও চটপট সিঁড়ি নেমে রওনা হল পাশের বাড়ির দিকে।

নতুন বাড়িটায় ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ করে কাউকে না পেয়ে জিশান উঠে গেল দোতলায়। টিভির শব্দ লক্ষ্য করে পৌঁছে গেল একটা ঘরে।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল।

আশি কি নব্বই বছর বয়েসি একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ একটি আরাম-চেয়ারে বসে রঙিন টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরসা মানুষটার চোখে কোনও চশমা নেই। মাথায় অল্পবিস্তর টাক—বাকিটা শোনপাপড়ির আঁশের মতো লম্বা-লম্বা চুল। গালে আর থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ের চামড়া গিলে করা। পরনে একটা সাদা কুর্তা আর ছাই রঙের পাজামা।

জিশান ঘরে ঢোকার সময় দরজায় শব্দ হয়েছিল। বৃদ্ধ টিভি থেকে চোখ সরিয়ে জিশানের দিকে তাকালেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'এসো, জিশান...।'

জিশান ঘরের ভেতরে দু-পা ঢুকে জিগ্যেস করল, 'বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না, নেই। আমি একা—ভীষণ একা।' একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানুষটা : 'তুমি হঠাৎ এলে। আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে...।' একটু চুপ করে থেকে ডানহাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'একটু বোসো ওখানে—।'

কী যে হল জিশানের—বৃদ্ধের অনুরোধ ফেলতে পারল না। হঠাৎ বাবার মুখটা ভেসে উঠল সামনে। ও চেয়ারটায় বসে পড়ল। মিসাইল গানটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

তারপর অবাক হয়ে বলল, 'ফাঁকা বাড়িতে আপনি একা-একা বসে টিভি দেখছেন!'

'দেখছি আর কোথায়! শুনছি—' করুণ হাসলেন : 'আমি চোখে দেখতে পাই না। ছানি...ছানি...।'

জিশান বৃদ্ধকে দেখছিল। দুটো চোখের মণিই ঘোলাটে—যেন চোখের মণির ওপরে মাছের আঁশ বসানো। চোখের কোণে পিচুটি। ওপরের ঠোঁট বসে গেছে ভেতরে। বোধহয় ওপরের পাটির সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। দুটো ঠোঁটই থরথর করে কাঁপছে। ঠোঁটের একপাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

লক্ষ করল, ওর চেয়ারের পাশে একটা ছোট টেবিলে অনেক ওষুধপত্র।

জিশান জিগ্যেস করল, 'আপনার এত বয়েস! চোখে দেখতে পান না! তা সত্বেও গেম সিটিতে মক সিটিজেন হয়ে এসেছেন!' একটু থেমে তারপর : 'যদি আপনার কোনও বিপদ-আপদ হয়!'

হাসলেন বৃদ্ধ। কয়েকটা দাঁত দেখা গেল। কয়েকটা নেই। খসখসে কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার তিন কুলে আর কেউ নেই। এই বয়েসে তাই আমার আর কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া...তা ছাড়া...আমার ছেলে সংগ্রামজিৎ—আমার বৃদ্ধ বয়েসের ছেলে—এই কিল গেমে হেরে গিয়েছিল। শেষ সংগ্রামটায় আর জিততে পারেনি বেচারা...।' কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। তারপর : 'কিল গেমের আগে অনেকগুলো গেমের রাউন্ড জিতেছিল সঙ্গু—সঙ্গু ওর ডাকনাম।'

'আপনি...আপনি কি ওল্ড সিটিতে থাকতেন?'

'হ্যাঁ—' ধীরে-ধীরে ওপরে-নীচে মাথা নাড়লেন। কাশলেন দুবার। ঘোলাটে দু-চোখ মেলে জিশানের চোখে তাকালেন : 'সংগ্রাম হেরে যেতেই ওর মা চোখ বুজল—ধাক্কাটা নিতে পারল না। ফলে সংসারে আমি একা হয়ে গেলাম। সে বহুদিন আগের কথা...।

'সংগ্রামের পাওয়া প্রাইজ-মানি নেহাত কম ছিল না। তাই একা আমি একটা ডিসিশান নিলাম—নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের পাঁচিল ডিঙিয়ে গেছি বলে ওল্ড সিটি ছেড়ে এখানে চলে এলাম। তারপর থেকে প্রত্যেকটা কিল গেমে আমি মক সিটিজেন হয়ে পার্টিসিপেট করি। একটা নিরিবিলি ফাঁকা বাড়ি দেখে তাতে ঢুকে পড়ি। আর সঙ্গুর কথা ভাবি...' বৃদ্ধ কথা বলতে-বলতে হাঁপাচ্ছিলেন : 'আমি...আমি এই...গেম সিটির সিনিয়ারমোস্ট সিটিজেন...।'

জিশান বৃদ্ধের কথা শুনছিল আর মাঝে-মাঝেই টিভির দিকে তাকাচ্ছিল। টিভিতে কমেন্টেটররা জিশানের লোকেশনের কথা বলছিল। আর এও বলছিল যে, দুজন কিলার ক্রমশ জিশানের কো-অর্ডিনেটের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুতরাং হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।

জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সূক্ষ্ম শব্দ হলেও বৃদ্ধ সেটা টের পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে...তোমাকে তো আবার...ছুটতে হবে।'

চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিশানের কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, 'সঙ্গু খুব চেষ্টা করেছিল...কিন্তু পারেনি। আমার খুব আশা...কেউ না কেউ পারবে। এই বয়েসে মরার ভয় করি না। তাই...আশায়-আশায় আসি...।'

আন্দাজে ভর করে জিশানের গায়ে হাত দিলেন বৃদ্ধ। সেখান থেকে হাতড়ে-হাতড়ে ওর মুখে চলে গেলেন। তারপর ওর চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'সঙ্গু, এবার তোকে জিততেই হবে! মনে থাকে যেন...।'

জিশান বৃদ্ধকে দেখছিল। ভাঁজে-ভাঁজে ঝুলে পড়া চামড়ায় তৈরি এক প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি। সেই মূর্তির ছানি পড়া চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

জিশান আলতো গলায় বলল, 'চেষ্টা করব...খুব চেষ্টা করব...।' তারপর পকেট থেকে মিসাইল গান বের করে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আবার পথ চলা। তবে আশার কথা, সূর্য এখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। একটু পরেই নেমে আসবে অন্ধকার। প্রিয়তম অন্ধকার।

•

অন্ধকার যখন জিশানকে কালো চাদরে জড়িয়ে নিল তখন জিশান নতুন করে আবার অবাক হল। ওর গায়ের ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্টের কালো কাপড়ের ওপরে জ্বলজ্বল রঙিন রেখায় ফুটে উঠেছে নানান হিজিবিজি নকশা। এরকম লুকোনো ফ্লুওরেসেন্ট কালারের কথা জিশান কখনও শোনেনি। এটা শ্রীধর পাট্টার আরও একটা সারপ্রাইজ। অন্ধকারের মধ্যেও জিশানকে তাক করে গোলাগুলি ছুড়তে প্রোটন বা সুখারামের

কোনও অসুবিধে হবে না। আর জিশান শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত যে, প্রোটন এবং সুখারামের পোশাকে এরকম কোনও হিডন ফ্লুওরেসেন্ট কালারের নকশা নেই।

অন্ধকার নেমে আসার পর আরও একটা ঘটনা ঘটল গেম সিটিতে: গেম সিটির নানান জায়গায় জোরালো আলোর বন্যা বয়ে গেল—রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে, নদীর দু-পাড়ে, ফ্লাইওভারে, পাহাড়ে, এমনকী জঙ্গলেও।

তবুও তারই মধ্যে জিশান ছোটখাটো ছায়ার আড়াল খুঁজতে লাগল।

ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখল, দু-একটা জন্তু-জানোয়ার উদভ্রান্তের মতো ছুটে পালাচ্ছে অন্ধকার অঞ্চলের দিকে।

জিশান একটা ছোট্ট আঁধারি অঞ্চল বেছে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে ঝোলানো অবস্থায় একটা ঝুপসি গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

অনেকটা ওপরে ওঠার পর ও একটা শক্তপোক্ত 'ওয়াই'-এর মতো ডালের খাঁজ খুঁজে পেল। শরীরটাকে ভাঁজ-টাজ করে মানিয়ে সেই খাঁজে জুত করে বসল। রুকস্যাক থেকে বের করে নিল ট্র্যাকার আর প্লেট টিভি।

জঙ্গলের বুনো গন্ধ জিশানের নাকে ঝাপটা মারছিল। কানে আসছিল পাখির ডাক, অজানা পশুর ডাক। আর সব ছাপিয়ে ঝিঁঝির ডাক।

ট্র্যাকার দেখল জিশান। লাল ডট দুটো সবুজ ডটের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই। কিন্তু জিশান কী করবে? এই ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে আর কত দৌড়বে? সাংঘাতিক খিদে না পেলে ও কখনও ফুড পয়েন্টের খোঁজে যায়নি। একটু আগেই ও ফুড পয়েন্ট থেকে খেয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে পেট ভরে জল খেয়েছে। ঘাড়ে মাথায় ভালো করে জল দিয়েছে। আশায়-আশায় বারবার ভেবেছে, রাত পোহালেই লড়াই শেষ। তখন ওর, মিনির আর শানুর জীবনে সত্যিকারের ভোর আসবে।

কিন্তু এই গাছে ও কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে? লাল ডটগুলো আরও কাছে এগিয়ে এলে ও তখন বরং গাছ পালটে নেবে। কিংবা ভেবে-টেবে যা হোক কিছু করবে।

ট্র্যাকার রেখে প্লেট টিভি অন করল জিশান। ভলিয়ুম খুব কমিয়ে দিল। দেখল, টিভিতে ও আর সংগ্রামজিতের বৃদ্ধ বাবা। তার সঙ্গে ধারাভাষ্য চলছে। আর মাঝে-মাঝে জাম্প কাট করে ঢুকে পড়ছে সংগ্রামজিতের কিল গেমের ক্লিপিংস।

একটু পরেই বৃদ্ধের মুখের ক্লোজ আপ দেখা গেল। জিশানের মনে হল, বৃদ্ধ যেন ঘোলাটে চোখ মেলে সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

•

টিভি অফ করে নিজের দিকে তাকাল জিশান।

ও লুকোবে কী! ওর সারা গায়ে রঙিন আলোর নকশা জ্বলজ্বল করছে। এরকম 'ব্রাইট টারগেট' একজন কালার ব্লাইন্ড শুটারও মিস করবে না। আর সুখারাম এবং প্রোটন তো সুপারকিলার!

হঠাৎ জিশানের মনে হল টি-শার্টটা খুলে ফেললে কেমন হয়! তা হলে অন্তত রঙের রোশনাইয়ের হাত থেকে বাঁচা যাবে। তারপর প্যান্টের পালা।

টি-শার্টের বুকপকেট থেকে মিনি আর শানুর ফটোটা বের করে নিল। অন্ধকারে ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে প্যান্টের কোমরের পটি টেনে ঢিলে করে জাঙিয়ার ইলাস্টিকের পিছনে ফটোটা চালান করে দিল। এটাই এখন সবচেয়ে সেফ জায়গা।

তারপর রুকস্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে টি-শার্টের চার-পাঁচ জায়গায় লম্বা করে ছুরি টেনে দিল। হাতের কয়েক টানে টি-শার্টের খোসা চটপট ছাড়িয়ে ফেলল। কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো ছুড়ে দিল

অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু একইসঙ্গে জিশান চমকে উঠল।

ফুল স্লিভ টি-শার্টের নীচে ওর আর কোনও পোশাক ছিল না। ও অবাক হয়ে দেখল, ওর গায়ে ঠিক জামাটার মতোই ফ্লুওরেসেন্ট রঙের জ্বলজ্বলে ডিজাইন আঁকা। টি-শার্টটা ও না ছিঁড়ে ফেললেই পারত। কিন্তু এই নকশা ওর গায়ে কে, কখন আঁকল? কেউ তো আঁকেনি!

শ্রীধর পাট্টা বোধহয় জিশানের দিকে লক্ষ রাখছিলেন, মজা দেখছিলেন। কারণ, তখনই জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে নিষ্ঠুরতার হিংস্র কারিগর বলে উঠলেন : 'সারপ্রাইজ, জিশান—আবার সারপ্রাইজ...।'

জিশান চুপ করে রইল। ওর অবাক ভাবটা তখনও কাটেনি।

'শোনো, জিশান / এই রঙের ফান। এই রঙে আঁকা ড্রেস এক ঘণ্টা গায়ে দিয়ে থাকলেই তোমার বডি টেম্পারেচারে রঙের কেমিক্যালটা অদ্ভুত এক রিয়্যাকশন ইনিশিয়েট করে তোমার ড্রেসের ফ্যাব্রিক চুঁইয়ে তোমার গায়ে চলে যাবে। তোমার পোশাকের নকশার ফোটোকপি এঁকে দেবে তোমার চামড়ায়।' হাসলেন : 'এক্সট্রিমলি সুপার-সারপ্রাইজিং টেকনোলজি—তাই না?'

জিশান চুপচাপ ভাবছিল। তাই শ্রীধরের কথাবার্তার সময় একটুকরো জবাবও দিচ্ছিল না। এখন ওর সামনে আর কী-কী পথ খোলা রয়েছে সেটাই চিন্তা করছিল। আধো-আঁধারিতে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে রঙিন উলকি আঁকা আদিবাসী বলে মনে হচ্ছিল।

'থ্যাংক—ইউ—মার্শাল।' কাটা-কাটা সুরে বলল জিশান এবং ফোন রিসেট করে দিল।

জিশান বুঝতে পেরেছিল, খানিকক্ষণ পরপরই ওকে লুকোনোর জায়গা পালটাতে হবে। তবে ও জঙ্গলের মধ্যেই থাকতে চায়—খোলা জায়গায় যেতে চায় না। কারণ, খোলা জায়গায় গেলে ওর একটা বাহন দরকার—গাড়ি কিংবা মোটরবাইক। সেটা কীভাবে খুঁজে পাবে ও জানে না। গেম সিটিতে এখন কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার।

গাছ থেকে নেমে পড়ল জিশান। জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে আস্তানা পালটাতে লাগল। কখনও গাছের ওপরে, কখনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে, কখনও বা এবড়োখেবড়ো পাথর কিংবা টিবির খাঁজে।

উড়ন্ত জোনাকির আলো ওর চোখে পড়ছিল। চোখে পড়ছিল জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ।

নানান জায়গায় আলো জ্বলে ওঠায় জঙ্গলটা ভারী অদ্ভুত লাগছিল। দুটো লাইটেড জোনের মাঝামাঝি জায়গাটা অনেক বেশি গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বলে মনে হচ্ছিল।

জিশানের কবজিতে বাঁধা কাউন্টডাউন ওয়াচে সময় ক্রমেই জিরো আওয়ারের দিকে এগোচ্ছিল—সেটাই জিশানের একমাত্র আশা-ভরসা-আনন্দ। তবে ও বুঝতে পারছিল, এভাবে পালিয়ে-পালিয়ে লাল ডটজোড়ার হাত থেকে ও বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না। কিছু একটা ওকে করতে হবে—এবং সেই 'করা'টা শ্রীধর পাট্টার পছন্দ হোক বা না হোক।

জঙ্গলের মধ্যে ছুটে-ছুটে নতুন একটা আস্তানা খুঁজে পেল। একটা বেঁটে মোটা গাছ। সার্চলাইটের আলো ছিটকে পড়েছে তার গুঁড়িতে, পাতায়। গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। শরীরে আর কতটুকু শক্তি বাকি আছে কে জানে!

রুকস্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে নিল। পকেট থেকে স্পার্কার বের করে হান্টিং নাইফের ফলাটা গরম করতে শুরু করল। হ্যাঁ, মাইক্রোট্রান্সমিটারটা এবার শরীর থেকে ও বের করবেই। লাল ডটজোড়ার সঙ্গে সবুজ ডটটা আর লুকোচুরি খেলতে পারছে না।

জিশানের চোয়াল শক্ত হল। যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য তৈরি হল।

বাঁ-হাতের বিশেষ জায়গাটার দিকে তাকাল। ওর শরীরটা হাঁটুর পর থেকে নীচের দিকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আলোয় আলো। ওপরদিকটা অন্ধকারে ঢাকা—তবে সে-অন্ধকার আলোর ছটায় কিছুটা ফিকে।

বিশেষ জায়গাটা অনুমান করতে জিশানের খুব একটা অসুবিধে হল না। কিন্তু হান্টিং নাইফের ফলা সেখানে বসাতে না বসাতেই ওর ফোন বাজতে শুরু করল।

শ্রীধর পাট্টার ফোন নিশ্চয়ই।

জিশান গাছের আড়ালে রাখা রুকস্যাকের দিকে তাকাল। কিন্ত স্যাটেলাইট ফোনটা বের করার জন্য একটুও ব্যস্ত হল না। বরং ওর ডানহাত কসাইয়ের কাজ করে চলল।

ও:! আ:! মিনি! শানু!

মিনি আর শানুর কথা ভেবে জিশান যন্ত্রণাটাকে মনে-মনে কমাতে চেষ্টা করল। একইসঙ্গে মাইক্রোট্রান্সমিটারের খোঁজে বাঁ-হাতের মাংস খুঁড়তে লাগল।

একটু পরেই ছুরির খোঁচায় চটচটে আঠালো লাল রঙের তরল মাখা ট্রান্সমিটারটা বেরিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। হাতড়ে-হাতড়ে সেটাকে তুলে নিল জিশান। ওটাকে গাছের গুঁড়ির গায়ে চেপে ধরে হান্টিং নাইফের ধারালো ফলার পোচে দু-টুকরো করে দিল।

এখন ওই খুদে যন্ত্রটা কাউকে আর কোনওরকম সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না। সুখারাম আর প্রোটনের ট্র্যাকার থেকে সবুজ ডটটা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে নিভে গেছে।

আ—আ—:!

যন্ত্রণার মধ্যেও জিশানের বুকে ঠেলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ও রুকস্যাক খুলে একটা 'ফার্স্ট এইড' প্যাক বের করে নিল। প্যাকের বোতাম খুলে চটপট বের করে নিল একটা কেমিক্যালের গুঁড়ো—'ব্লাড কোয়াগুলেটর'। সেটা একখাবলা তুলে নিয়ে চেপে ধরল বাঁ-হাতের ক্ষতস্থানে। সঙ্গে-সঙ্গে টের পেল, যন্ত্রণা কমতে শুরু করেছে। একটু পরে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

রুকস্যাকের ভেতরে স্যাটেলাইট ফোন তখনও একঘেয়েভাবে বেজে যাচ্ছিল। শ্রীধর পাট্টা সহজে ক্ষান্ত হওয়ার পাত্র নন।

জিশান যখন ফোন ধরল ততক্ষণে প্রায় দশমিনিট কেটে গেছে। এবং ফোন ধরামাত্রই শোনা গেল শ্রীধর পাট্টার হিংস্র হুঙ্কার।

'জিশান, য়ু বাস্টার্ড! সন অফ আ বিচ! হাউ ডেয়ার য়ু...!'

জিশান উত্তরে শব্দ করে হাসল : 'এ ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই রে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'তুই তোর বউ আর ছেলের কথা কি ভুলে গেছিস?' একটা খিদে পাওয়া বাঘ যেন গর্জন করে প্রশ্নটা করল।

'না, ভুলিনি—।'

'ঠিক আছে। তুই যেভাবে খেলতে চাস সেভাবেই খেলব। আমি তোর বউ আর ছেলেকে ওল্ড সিটি থেকে এখুনি তুলে নিয়ে আসছি। তারপর দেখি...তোর পাগলামো বন্ধ করা যায় কি না!'

শ্রীধর হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জিশান ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে।

ও রুকস্যাক গুছিয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আবার পথ চলতে শুরু করল। অন্ধকার এলাকা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ও একেঁবেঁকে ছুটতে লাগল। এখন ওর 'হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। কারণ, খুনিদের ট্র্যাকারে আর কোনও সবুজ ডট নেই। আর টিভির কমেন্টেটররা কখনও ওর পজিশন কো-অর্ডিনেট কমেন্ট্রিতে বলবে না। সেটাই নিয়ম। তবুও শ্রীধর যদি ওদের নিয়ম ভাঙতে বলেন, তা হলে আর-এক মুশকিল। কারণ, লক্ষ-হাজার ক্যামেরার নম্বর আর লোকেশন চেক করে, সেখান থেকে জিশানের পজিশন কো-অর্ডিনেট ব্লক কম্পিউট করে, রানিং কমেন্ট্রিতে বলতে-বলতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবে—ততক্ষণে জিশান হয়তো অন্য

কোথাও ছিটকে যাবে। তা ছাড়া কমেন্টেটররা এত টেকনিক্যাল কারিকুরিতে অভ্যস্ত নয়। ফলে ওরা খুনিদের সাহায্য করার বদলে বিভ্রান্ত করবে, এই সম্ভাবনাটাই বেশি।

সুতরাং, হাতে বেশ যন্ত্রণা হলেও জিশানের নিজেকে এখন 'স্বাধীন' মনে হচ্ছিল।

একটা ঘন গাছগাছালির অন্ধকারে আস্তানা গেড়ে প্রথমে ট্র্যাকার খুলল জিশান। শুধুমাত্র দুটো লাল ডট ট্র্যাকারের মানচিত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে ওরা যে ঠিক কোথায় সেটা বোঝা গেল না। আর সবুজ ডট থেকে ওদের দূরত্বই বা কত কে জানে!

এই অসুবিধেটার কথা জিশান ভাবেনি।

একটু পরেই টিভি খুলল।

'...স্টানিং নিউজ, ফোকস। কিলারদের ট্র্যাকার থেকে জিশান পালচৌধুরী হারিয়ে গেছে। ওই দেখুন—প্রোটনের ট্র্যাকার! স্ক্রিনে কোনও গ্রিন ডট নেই! এবার দেখুন কিলার সুখারামের ট্র্যাকার—নো গ্রিন ডট। তা হলে তো কিলার দুজন এখন অন্ধ! ওরা জিশানকে কী করে ট্র্যাক করবে কে জানে!

'নিশ্চয়ই জিশান মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটারটা কোনও না কোনওভাবে অকেজো করে দিয়েছে। তখন জিশান নিশ্চয়ই আমাদের ক্যামেরা নেটওয়ার্কের ''ব্লাইন্ড স্পট''-এ ছিল। তাই টিভিতে ব্যাপারটা আপনাদের আমরা দেখাতে পারিনি। তবে আমাদের মাননীয় মার্শালের কন্ট্রোল রুমে অনেক হাই পাওয়ার ক্যামেরা নেটওয়ার্কের কানেকশান রয়েছে। ফলে জিশানের কীর্তি মাননীয় মার্শালের চোখ এড়ানোর কথা নয়। মার্শালের কন্ট্রোল রুম থেকে ফিডব্যাক পেলেই আমরা সেই পোরশানের—মানে, যে-পোরশানটা আমরা দেখাতে পারিনি—সেটার ভিডিয়ো ফুটেজ আপনাদের দেখিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, জিশান কীভাবে কিলারদের ট্র্যাকারকে ফাঁকি দিয়েছে...।'

একটু পরেই জিশান সেই ফুটেজ দেখতে পেল। এবং আরও দেখতে পেল, অগ্নিশর্মা শ্রীধর পাত্রা হিংস্রভাবে পিস ফোর্সের কমান্ডারদের নির্দেশ দিচ্ছেন। বলছেন, এই মুহূর্তে ওল্ড সিটিতে ফৌজ পাঠাতে। সেই ফৌজ জিশানের বউ আর ছেলেকে অ্যারেস্ট করে শুটারে উড়িয়ে দশ মিনিটের মধ্যে নিউ সিটিতে নিয়ে আসবে—শ্রীধর পাত্রার কাছে।

টিভিতে শ্রীধরের পাগল করা চিৎকার শোনা গেল : 'গো! গো! গো!...গো-ও-ও-ও!'

তারপরই পরদায় ভেসে উঠল ওল্ড সিটির ছবি। ভাঙাচোরা নোংরা পথঘাটের নানান জায়গায় মানুষের ভিড় আর জটলা। সবাই প্লেট টিভিতে কিল গেম দেখছে। এত রাতেও ওল্ড সিটির সব দোকানপাট খোলা—বিশেষ করে খাবারের দোকান। ফুটপাথের এখানে-সেখানে তেলেভাজা, ঝালমুড়ি, শোনপাপড়ি, মালাই বরফ নিয়ে বসে আছে বহু হকার। মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে জনতার উত্তেজনা আর উল্লাসের চিৎকার।

দৃশ্য বদলে গেল।

রাতের আকাশে ছিটকে লাফিয়ে উঠল আটটা শুটার। দুরন্ত গতিতে শুটারবাহিনী ছুট লাগাল ওল্ড সিটির আকাশের দিকে।

জিশানের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। রক্তের অণুতে-অণুতে ঘটে গেল আণবিক বিস্ফোরণ।

ও এরপর যা করল শ্রীধর পাত্রা সেটা ভাবতে পেরেছিলেন কি না কে জানে!

রুকস্যাকে সব গুছিয়ে নিল—হাতে রইল শুধু প্লেট টিভি। তারপর ও ছুট লাগাল।

আলো আর অন্ধকার দাবার ছকের মতো চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজতে লাগল জিশান। এমন একটা জায়গা যেখানে আলো কটকট করছে—আলোয়-আলোয় জায়গাটা প্রায় দিনের মতো।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সেরকম একটা জায়গা খুঁজে পেল। তখন লাইটেড জোনের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ, ও জানে, এখানে অনেক ক্যামেরা লাগানো আছে। টিভির লাইভ টেলিকাস্ট কোটি-কোটি দর্শক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সুতরাং এইবার!

জিশানের খালি গা। আলোর তেজে শরীরের ফ্লুওরেসেন্ট রঙের ডিজাইন বেশ ফিকে দেখাচ্ছে। ওর বুকে, হাতে, এখানে-সেখানে রক্তের দাগ। গায়ে ঘামের পরত। তাতে শুকনো পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর বাঁ-হাতের বাহু গড়িয়ে রক্তের ধারা নামছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের গায়ে লাগানো বেশ কয়েকটা ক্যামেরা নজরে পড়ল। সুতরাং...।

এইটাই ঠিক জায়গা, এইটাই ঠিক সময়।

প্লেট টিভিটা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে শূন্যে দু-হাত ছুড়ে দিল জিশান। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে কথা বলতে শুরু করল।

'আমার ওল্ড সিটি আর আর নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! কিল গেমের খেলার নিয়মে কোথাও লেখা নেই যে, হাতের মাংস কেটে মাইক্রোইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে দেওয়া যাবে না! নিয়মে এ-কথা বলা নেই যে, কিল গেমে কোনও পার্টিসিপ্যান্ট যদি এই ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে খুনিদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে নিউ সিটির মার্শাল শ্রীধর পাট্টা সেই খেলোয়াড়ের বউ আর ছোট্ট ছেলেকে ওল্ড সিটি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসবেন। তারপর তাদের টরচার করার ভয় দেখিয়ে কিল গেমের সেই প্লেয়ারকে ব্ল্যাকমেল করে খতম করার চেষ্টা করবেন।

'আমার নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির বন্ধুরা, আমিই সেই হতভাগ্য প্লেয়ার। ওই দেখুন, আটটা শুটার রওনা হয়ে যাচ্ছে ওল্ড সিটির দিকে—আমার বউ মিনি, আর ছোট্ট ছেলে শানুকে তুলে নিয়ে আসার জন্যে।

'এতদিন ধরে টিভিতে, রোলার সাইন আর মুভি-বোর্ডে, মার্শাল প্রচার করে এসেছেন যে, কিল গেম ভীষণ ফেয়ার গেম। এই সেই ফেয়ারনেসের নমুনা! এই ফেয়ারনেসের মুখে আমি পেচ্ছাপ করে দিই!'

টিভি সেন্টার তখন দারুণ তৎপরতায় আটটা শুটারকে দেখিয়ে চলেছে। যেন আটটা হানাদার বাজপাখি। শুটারগুলো ওল্ড সিটির আকাশে পৌঁছে গেছে। ওরা একসঙ্গে শিস দিয়ে ধেয়ে চলেছে নীচের দিকে। ওরা নামছে।

সেই ছবিতে জাম্প কাট করে ঢুকে পড়ছে জিশানের চলচ্চিত্র এবং মার্শালের মুখ—শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ। আর তার ফাঁকে-ফাঁকে মিনি আর শানুর সুন্দর মিষ্টি ছবি।

'আমার ওল্ড সিটির বন্ধুরা, আমার নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন। অবিচারের এগেইনস্টে আপনারা রুখে দাঁড়ান! আপনাদের ঘরেও তো মা, বাবা, বোন, ভাই, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। আপনারা এই নোংরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান! আপনাদের কাছে আমি...আমি...আমার বউ আর ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইছি। ওদেরকে বাঁচান! আমাকে...আমাকে...সৎভাবে লড়তে দিন! প্লিজ! ওদের বাঁচান! আর কিছু আমি চাই না...কিচ্ছু চাই না...।'

কথা বলতে-বলতে জিশান প্যান্টের কোমরের আড়াল থেকে মিনি আর শানুর ফটোটা শূন্যে তুলে ধরল। কান্না ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'ওদের আপনারা বাঁচতে দিন! সৎ আর সুন্দরভাবে বাঁচতে দিন! পৃথিবী এখনও আমাদের সবার কাছে সুন্দর। প্লিজ, ওদের...ওদের বাঁচতে দিন...!

জিশান কান্না চাপতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। মিনি আর শানু যে ওর সবচেয়ে বড় দুর্বল জায়গা!

কিন্তু একইসঙ্গে ও চোয়াল শক্ত করে রেখেছিল। চোয়ালের রেখা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কিল গেমে ও মোটেই হারতে চায় না।

•

জিশানের মরিয়া আবেদন লক্ষ-লক্ষ টিভি দর্শকের কাছে পৌঁছে গেল। গেল শুধু নয়, তাদের অনেকেরই বুকে গিয়ে বিঁধল। তারা ওল্ড সিটির মানুষ। তারা নিউ সিটির মানুষ।

নিউ সিটিতে যে-ঘটনা ঘটল সেটা এককথায় অভিনব। যেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ ব্যাপারটা দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে, হঠাৎই তারা আবেগের একটা ঢেউ টের পেল। সেই ঢেউটা যেমন বিশাল, তেমনই শক্তিশালী।

আর যেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ-টাবেগ খুব একটা বেশি-টেশি নেই-টেই...নিউ সিটিতে থাকতে-থাকতে সেই ব্যাপারটা বলতে গেলে শুকিয়ে-টুকিয়ে গেছে, তারাও হঠাৎ টের পেল তাদের শরীরে, মনে কিংবা মাথায় একটা হিমশীতল পোকা কী এক অলৌকিক ম্যাজিকে আচমকা যেন নড়ে উঠল।

নিউ সিটির মানুষদের অনেকেই ফোন তুলে নিয়ে তাদের চেনা বৃত্তের মানুষজনকে ফোন করতে শুরু করল। কিল গেম খেলায় এই অবিচার কিংবা ব্যভিচার তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। শ্রীধর পাট্টা যতই ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্ট আর পিস ফোর্সের মার্শাল হোন না কেন এই অন্যায় তিনি করতে পারেন না।

নিউ সিটির মানুষদের মধ্যে শুধু কথার দেওয়া-নেওয়া চলতে লাগল। অন্ধকার রাতের সাইবারস্পেসে মানুষের ক্ষোভ আর অসন্তোষের ঝাঁজ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুপারগেমস কর্পোরেশনের কন্ট্রোল রুমের হেলপলাইনে ফোনের সুনামি ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পাশাপাশি ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের বন্যা। আগের বারের তুলনায় এবারের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বোধহয় কম করেও একশো গুণ বেশি।

সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এ শ্রীধর পাট্টা রাগে দাউদাউ করে জ্বলছিলেন। দুটো আর্ক কম্পিউটার মাথায় ওপরে তুলে সপাটে আছড়ে মারলেন মার্বেল মোড়া মেঝেতে। ওঁর শরীর রাগে থরথর করে কাঁপছিল।

নিউ সিটির সব হতচ্ছাড়া মানুষগুলো হঠাৎই যেন যক্ষ্মা-পাগল হয়ে গেছে। ওদের টেলিফোন, ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের ভাষা এতটাই নোংরা হয়ে গেছে যে, শ্রীধরের মাথার শিরা দপদপ করছিল—সেইসঙ্গে বুকে আর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। এই বুঝি হার্টফেল হয়ে যাবে!

আকাশ থেকে নিউ সিটির দিকে তাকালে তখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য শ্রীধর দেখতে পেতেন। রাতের রাস্তায় ক্রমশ গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, অসংখ্য নেংটি ইঁদুর মুখে মিনি টর্চ কামড়ে ধরে ছুটে চলেছে।

কিন্তু ওরা ছুটে চলেছে কোনদিকে?

কিছু গাড়ি ছুটে যাচ্ছে গেম সিটির দিকে, কিছু গাড়ি ছুটে চলেছে সুপারগেমস কর্পোরেশনের বিল্ডিং-এর দিকে, আর বাকি গাড়ির ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে সিন্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে।

নিউ সিটির বেশ কয়েকটা রাস্তায় গাড়ির ঢলের এই অস্বাভাবিক দৃশ্য পিস ফোর্সের নাইটগার্ডদের নজর এড়ায়নি। তারা খবরটা ফোন করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিচ্ছিল। সেখান থেকে খবর পৌঁছে যাচ্ছিল ওপরের স্তরে, তারপর আরও ওপরের স্তরে, এবং আরও ওপরে...।

শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্তরে—অর্থাৎ, শ্রীধর পাট্টার কানে—খবরটা পৌঁছে গেল। কানে শুধু নয়—চোখেও পৌঁছল। কারণ, ওঁর ঘরের তিনটে টিভিতে তখন এই বিচিত্র 'কার র‍্যালি'-র ফুটেজ দেখানো হচ্ছিল।

ব্যাপারটা কী? একটা মানুষের আবেদনে এত মানুষের চঞ্চল হয়ে ওঠার ঘটনা নিউ সিটির ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

এটাকে কি 'বিপ্লব' বলা যেতে পারে? কীভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই চঞ্চলতা?

•

ওল্ড সিটিতে সেই সময়ে যা ঘটছিল, ওল্ড সিটির ইতিহাসে কখনও সেরকম ঘটেনি।

ওল্ড সিটির হাজার-হাজার মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে, 'শ্রীধর পাট্টা, মুর্দাবাদ! জিশান, জিশান, জিন্দাবাদ! শ্রীধর পাট্টা, মুর্দাবাদ!...।' আর অন্ধকার খানাখন্দে ভরা রাস্তা ধরে তারা হইহই করে ছুটে চলেছে জিশানের বস্তির দিকে। তাদের কারও-কারও হাতে জ্বলন্ত মশাল। মাঝে-মাঝে তাদের কেউ-কেউ আকাশের দিকে চোখ তুলে শুটারবাহিনীর দিকে দেখছে। দেখছে ওদের লেজ থেকে বেরোনো আগুনের হলকা। শুনছে ওদের তীক্ষ্ণ শিস।

জিশানের বস্তির এলাকা তখন ছায়া-ছায়া কালো-কালো মানুষে-মানুষে ছয়লাপ। তাদের সমবেত স্বরে জিশানের জয়ধ্বনি, আর শ্রীধরের নৃশংসতার প্রতিবাদ।

'শ্রীধর পাট্টা, নিপাত যাক!'

'আমার ভাই, তোমার ভাই / জিশানকে ফেরত চাই!'

'নিউ সিটি, মুর্দাবাদ!'

'ওল্ড সিটি, জিন্দাবাদ!'

'কিল গেম / শেম-শেম!'

'কিল গেম, নিপাত যাক! শ্রীধর পাট্টা নিপাত যাক!'

ফেটে পড়া আওয়াজে স্লোগান চলতেই লাগল। রাতের ওল্ড সিটি জনতার রাগী চিৎকারে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল।

শুটারগুলো যখন জিশানের বস্তির কাছাকাছি ল্যান্ড করতে চাইল, তখন ওরা কোনও জায়গা খুঁজে পেল না। রাস্তার ওপরে শুধু মানুষের মাথা আর মানুষের মাথা! আর তারই মাঝে-মাঝে মশালের আলোর এলোমেলো যতিচিহ্ন।

শিস দিয়ে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করল ওরা। স্যাটেলাইট ফোনে ঘন-ঘন খবর পাঠাতে লাগল ওপরওয়ালাকে।

'এখন কী করব, স্যার?'

'শুট ডাউন দ্য ব্লাডি ক্রাউড, য়ু মোরন! শুট রাইট নাও! ওদের ছড়িয়ে ছিটকে ছত্রখান করে দাও! চুরচুর করে দাও! যেভাবে হোক জিশানের ওয়াইফ আর সানকে আমাদের চাই-ই চাই! আমাদের মার্শালের স্পেশাল অর্ডার। গো অ্যাহেড...রাইট নাও!'

একটা শুটারের একজন গার্ড জনতার দম আটকানো ভিড় লক্ষ্য করে ওর অটো-পিস্তল ফায়ার করল।

কয়েক ঝলক আলো। কয়েকটা 'ফট-ফট' শব্দ।

জনতার ভিড়ে কারও গায়ে গুলি লাগল কিনা না বোঝা গেল না। তবে দশ-বিশজন মানুষ চিৎকার করে ভয়ে ছুটে পালাল। বাকি কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু নড়ল না। দু-চারজন চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়োরের বাচ্চাদের কাছে কত গুলি আছে? একশো? দু-শো? আর আমরা হাজার-হাজার। মিনি আর শানুকে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না!'

'ছাড়ব না, ছাড়ব না!' জনসমুদ্রগর্জনে সেই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

আর একইসঙ্গে জনতার ঝাঁক থেকে বেশ কয়েক ডজন গুলি ছুটে গেল শুটারবাহিনী তাক করে। দুজন গার্ডের হাতে আর কোমরে গুলি লাগল। বাকি গুলিগুলো ছিটকে গেল আকাশে। আর কয়েকটা শুটারের মেটাল বডিতে ধাক্কা খেয়ে 'ঠং' শব্দ তুলে দিগভ্রান্তের মতো ঠিকরে গেল।

বেশ বোঝা গেল, ওল্ড সিটির জনগণ মোটেই নিরস্ত্র নয়।

এটা ঠিকই যে, ওল্ড সিটির রিভলভারের মডেলগুলো বেশ পুরোনো, কিন্তু তা থেকে এখনও ঠিকঠাক গুলি বেরোয়, আর সে-গুলি কারও গায়ে লাগলে সে আহত কিংবা নিহত হতে পারে।

সুতরাং, আটটা শুটার মুখ ঘোরাল। উড়ে গেল জিশানের বস্তি থেকে অনেকটা দূরে। ওরা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে ফোনে কথা বলেই যাচ্ছিল।

মিনি বাড়ির কাছেই একটা সরু গলিতে দাঁড়িয়ে প্লেট টিভিতে জিশানের কিল গেম দেখছিল। মরণ খেলাটা শেষ হতে আর দু-ঘণ্টা মতন বাকি। একটু পরেই হয়তো ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠবে। তাই বারবার মুখ তুলে আকাশের দিকে দেখছিল ও।

ও : ভগবান! আর একটু! আর একটু!

অর্কনিশান বাড়িতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বস্তিরই একটি কিশোরী মেয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে। মেয়েটি জানে যে, মিনিবউদির আজ সারারাত টিভি দেখা দরকার। তাই ও মিনির হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে।

হঠাৎই জনতার গর্জনের বিস্ফোরণে বস্তির সবাই চমকে উঠল। মিনিও।

ও এতক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল, কাঁপছিল। শুটারের শিসের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে ছিল। কিন্তু সেই শব্দটা শুনতে-না-শুনতেই ভেসে এল ক্ষিপ্ত জনতার ভয়ংকর গর্জন।

তারপর খুব দ্রুত কীসব যে ঘটে গেল!

ফিসফাস। কানাকানি। কথা চালাচালি।

তারপরই মিনিকে আর শানুকে পিস ফোর্সের হাত থেকে বাঁচাতে অসংখ্য জেহাদি নারী-পুরুষ মিনির ঘর আর মিনিকে ঘিরে বস্তির সব অলিগলিতে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা যে যেমন পেরেছে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ওদের ঠোঁটে উত্তেজনা আর প্রতিরোধের জিগির। দূর থেকে কানে আসা জনতার গর্জনের সঙ্গে ওদের গর্জন মিলে গেল। যেন দু-দুটো সমুদ্রের দুরন্ত ঢেউ হাতে হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করল। ওদের স্লোগান শুনতে-শুনতে মিনির চোখে জল এসে গেল।

জিশানকে এত মানুষ ভালোবাসে!

ওরা বলছে, 'জান দেব, তবু জিশানকে দেব না! জিশান জিন্দাবাদ! জিশান আমাদের ছিল, আমাদের থাকবে!...।'

ওল্ড সিটির বড়-বড় রাস্তাগুলোয় তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য : কাতারে-কাতারে মানুষ ছুটে চলেছে মাস্টার ব্রিজের দিকে—যে-ব্রিজ নিউ সিটি আর ওল্ড সিটিকে আলাদা করে রেখেছে। জিশান-পাগল মানুষের দল এখন আর পিস ফোর্সের গার্ডদের গুলির পরোয়া করে না। ওরা পরিখার পরোয়া করে না। পরোয়া করে না পিরানহা মাছ কিংবা বিষধর সাপের। ওরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে যে, আজ ওরা মাস্টার ব্রিজের প্রতিরোধ ভাঙবেই।

আজ ওরা জনসমুদ্রের জোয়ারে রাতের নিউ সিটি ভাসিয়ে দেবে। দেবেই।

নিউ সিটি আর ওল্ড সিটিতে দু-রকমের দুটো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বেরিয়ে এল দু-রকমের দুটো লাভাস্রোত।

কিন্তু সেই লাভাস্রোত দুটো ধীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে।

একটু পরেই দুটো স্রোতকে আর আলাদা করে চেনা গেল না।

•

জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল।

এরপর কী? এরপর কী?

বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল ও। কালো আকাশটাতে খুব সামান্য হলেও ধূসরের ছোঁয়া লেগেছে না? হে ভগবান! আর কিছুটা সময় আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। মিনি আর শানুকে আমি একবার দেখতে চাই। একবার—মাত্র একবার...।

যন্ত্রণা আর ক্লান্তির সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করছিল আর এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। তখনই জিশান দেখতে পেল, গেম সিটির ভেতরে একটা ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। অনেক মোটরবাইক আর

গাড়ি নানান দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কিছু চিৎকার চেঁচামেচি।

বাইকের কয়েকজন মানুষকে লক্ষ করল জিশান। ওদের গায়ে কোনও স্পেশাল ইউনিফর্ম নেই। ওরা বোধহয় সিভিলিয়ান—গেম সিটির মক সিটিজেন।

কিন্তু ওরা এভাবে গেম সিটির রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কেন?

একটু পরেই প্লেট টিভির পরদায় এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। গেম সিটির সিটিজেনরা জিশানকে খুঁজে বের করে আগলে রাখতে চাইছে। ওরা চাইছে জিশানের গায়ে আর যেন আঁচড়টিও না লাগে। তাই ওরা নিয়ম ভেঙে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পথে নেমে পড়েছে।

রউফ লালার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। কিন্তু ওর বেলায় তবু একটা প্রাইজ-টাইজের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল! এখানে তো তা নেই—বরং কুটিল শাস্তিই হয়তো ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তা হলে এই মানুষগুলো এরকম পাগলামো করছে কেন? ওদের ভয়ডর নেই!

জঙ্গলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছিল জিশান। কখনও গাছের আড়ালে, বা কখনও গাছের ওপরে বেয়ে উঠে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে গাছ বেয়ে ওঠার কাজটা মারাত্মকরকম কঠিন হয়ে পড়ছে।

ঘাম আর রক্ত মিশে গিয়ে জিশানের কাটা জায়গাগুলো জ্বলছিল। ও বারবার সেগুলোর ওপরে হাত বোলাচ্ছিল। আলো আর অন্ধকারের জাফরির মধ্যে দিয়ে এদিক-ওদিক নজর চালাচ্ছিল।

হঠাৎই ও দেখতে পেল দুটো হলদেটে সবুজ চোখ। তাদের ঘিরে গাঢ় কালো ছায়া।

জিশান একটুও দেরি না করে হাঁটুর কাছে লাগানো হোলস্টার থেকে লেজার ব্লাস্টার বের করে নিল। এবং ফায়ার করল।

কালো ছায়াটা শূন্যে লাফ দিয়েছিল। একইসঙ্গে চাপা গর্জন করে উঠেছিল। সেটা এখন 'উড়ে' এসে জিশানের কাছাকাছি আছড়ে পড়ল। ওটার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে হিংস্র গজরানি।

প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ। আক্রোশে লেজ আছড়াচ্ছে। পাগলের মতো থাবা ছুড়ছে শূন্যে। ফুঁসছে।

কালো বাঘ যে এত বড় মাপের হয় জিশান জানত না। আর ও এও জানত না, এরা এত জানদার।

তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাঘটা বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

জিশান বাঘটাকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই একটা গরম কিছু ওর বাঁ-কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। আর সেই 'ছোঁয়ার' অভিঘাতটা এতই মারাত্মক হল যে, জিশানের দেহটা পলকে দুটো পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওর বাঁ-কাঁধটা আগুনের আঁচে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল।

তখনই প্রোটনকে জিশান দেখতে পেল। ওর কাছ থেকে প্রায় সাত-আট হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরু ছিপছিপে একটা ইস্পাতের চাবুক। চোখের ওপরে ঢাকা কালো কাচ থেকে জঙ্গলের আলোর ঢেউ ঠিকরে পড়ছে। ওর দু-হাতে দু-দুটো অস্ত্র।

জিশানের মনে হল, এইমাত্র প্রোটন দুটো অস্ত্রই ব্যবহার করেছে : একটা জিশানের ওপরে, আর-একটা কালো পশুটার ওপরে।

এবার তা হলে সব শেষ। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত লড়াই—সব শেষ! জিশানের শরীরের এখন যা অবস্থা তাতে ও কী পালটা কিছু করে প্রোটনকে ঘায়েল করতে পারবে? ওর হাত আর কাঁধের যন্ত্রণাটা এখন এত বেড়ে গেছে যে মনে হচ্ছে, কেউ যেন মাংসের ভেতরে তুরপুন গেঁথে নিষ্ঠুরভাবে মোচর দিচ্ছে।

কিন্তু প্রোটন কী করে ওকে খুঁজে পেল? ট্র্যাকারে তো ওর পজিশন প্রোটন দেখতে পায়নি!

সেটা দেখতে না পেলেও প্রোটন হাল ছাড়েনি। বুদ্ধি খাটিয়েছে, পরিশ্রম করেছে, আর ওর আই গিয়ারে লাগানো নাইটভিশান ইন্সট্রুমেন্টের সাপোর্ট নিয়েছে। তার ওপরে ভাগ্যও ওকে সাহায্য করেছে।

প্রোটনের জায়গায় জিশান থাকলেও ঠিক একইরকম মরিয়া চেষ্টা করত।

আর সুখারাম? ও-ও কি জিশানকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে না? ও কি জিশানদের ফায়ারিং-এর শব্দ শুনতে পায়নি?

জিশানের নজর মাঝে-মাঝেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ও জোর করে নিজেকে আবার সজাগ করে তুলেছিল। মিনি, শানু...আর সবার জন্য ওকে যে লড়তে হবে! যে করে হোক, লড়তে হবে।

মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় শরীরটাকে কয়েক ডিগ্রি ঘোরাল জিশান। ডানহাতের আঙুলগুলো গুটিগুটি ব্লাস্টারের হাতলের দিকে এগোতে লাগল।

প্রোটন চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিশানকে দেখছিল। ওর ঠোঁটের রেখাটা সামান্য চওড়া হল। তারপর ডানহাতে ধরা লং রেঞ্জ মালটিশুটার পিস্তলটা জিশানের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আহত কালো বাঘটা সবাইকে চমকে দিয়ে বিদ্যুতের মতো প্রোটনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রোটন ফায়ার করল বটে, কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হল না। কারণ, বাঘটা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রোটনকেও ছিঁড়ে-খুঁড়ে রেখে দিয়ে গেল।

গাছপালার গন্ধের সঙ্গে বারুদের গন্ধ মিশে গেল। ফায়ারিং-এর শব্দে অন্ধকারের পশুপাখিরা চঞ্চল হয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। কয়েকটা জন্তুজানোয়ারের ছুটোছুটির শব্দও পাওয়া গেল যেন।

জিশান অতি কষ্টে উঠে বসল। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে কোনওরকমে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাঘটার দিকে একবার তাকাল। একেবারে নিথর, স্পন্দনহীন।

তারপর জিশান তাকাল প্রোটনের দিকে। পায়ে-পায়ে সেদিকে এগোল।

প্রোটন চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে ওর মাথাটা একপাশে ঘুরে গেছে। দু-হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। পোশাক ছিঁড়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়। কোমরের কাছ থেকে বাঁ-পাটা খানিকটা যেন খুলে বেরিয়ে এসেছে। মুখটা অল্প খোলা—বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছে। গায়ে নানা জায়গায় রক্ত লেগে রয়েছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। যেন রাতের জঙ্গলের রূপ দেখে হতবাক হয়ে গেছে।

হঠাৎই জিশান খেয়াল করল, প্রোটনের বাঁ-পায়ের একটা জায়গায় চামড়া উঠে গেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে চকচকে ধাতু—হয়তো স্টেইনলেস স্টিল কিংবা অন্য কিছু।

ঠিক একইরকম ব্যাপার দেখা গেল ডান কাঁধে আর গালে। তা ছাড়া জিশান লক্ষ করল, প্রোটনের ঘাড়ের পাশে দুটো ছোট লাল বাতি দপদপ করছে।

জিশানের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। চামড়া, রক্ত, মাংস, মেটাল, লালবাতি...এসবের মানে কী?

যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠা গলায় প্রোটন প্রায় ফিসফিস করে বলল,' জিশান... তুমি জিতে গেলে। আমি...আমি...।'

প্রোটনের কথা ভালো করে শোনার জন্য জিশান ওর মাথার কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ব্লাস্টারটা শক্ত মুঠোয় ধরা রইল।

'আমি...আমি...শেষ। বোনাস লাইফ নিয়ে অনেকদিন টিকে ছিলাম। আর...আর এটাই স্যাটিসফ্যাকশন যে...যে মানুষের হাতে আমাকে মরতে হল না...।'

সব জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে জিশান প্রোটনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

প্রোটনের গলা একেবারে মেয়েদের মতো। চোখ-মুখের আদলটাও সেরকমটাই লাগছে না কি?

এই মেয়েটাই একজন সুপারকিলার! যার আসল পরিচয় মিডিয়া শেষ দিন পর্যন্ত গোপন রেখেছে!

'তুমি...তুমি...মেয়ে?' জিশান জিগ্যেস করল। বাঁ-হাতের গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিল।

'হ্যাঁ, শুরুতে তো তাই ছিলাম। খেলাধুলো ভীষণ ভালোবাসতাম...।'

প্রোটনের স্যাটেলাইট ফোন বাজতে শুরু করল। বাজতেই থাকল। প্রোটন ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই। ও মলিন চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আস্তে-আস্তে কথা বলছিল।

জিশান শুনতে লাগল প্রোটনের কথা।

ছোটবেলা থেকেই অ্যাথলেটিকসে টান ছিল। প্রাইজও পেয়েছে অনেক। খানিকটা ডানপিটে গোছের হওয়ায় বেশিরভাগ সময় ছেলেদের দঙ্গলে ভিড়ে থাকত। তা ছাড়া, ছিপছিপে চেহারা, বয়কাট চুল এসব দেখে অনেকে ওকে ছেলে বলেও ভুল করত।

বয়েস বাড়তে লাগল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রোটন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে-ধীরে ছোটখাটো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়তে লাগল। আঠেরো বছর পেরোতে না পেরোতেই ও প্রথম খুন করে বসল। কিন্তু পুলিশ ঠিকমতো কেস সাজাতে পারেনি বলে ও তিন বছর জেল খেটে রেহাই পায়।

এরপর ও একটা মারাত্মক গ্যাং ওয়ারে জড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ি এলাকার সেই গ্যাং ওয়ারে প্রচুর গোলাগুলি চলে। সেখান থেকে পালানোর সময় প্রোটনদের জিপ একটা বাঁকের মুখে রাস্তা ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় শূন্যে।

জিপের সবাই মারা গিয়েছিল—একমাত্র প্রোটন ছাড়া।

তবে ওর অবস্থা যা হয়েছিল তাতে ওকে বাঁচানো যাবে বলে কেউ ভাবেনি। ওর গোটা শরীরটা দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল। চোখ ঢুকে গিয়েছিল গর্তে, মাথার খুলির খানিকটা অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় নিউ সিটির বারোজন বিজ্ঞানী একটা কোর রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করে রোবোটিক্স আর অ্যানড্রয়েড টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের নানান পরীক্ষার জন্য 'সাবজেক্ট' দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই প্রোটনকে তাঁরা 'সাবজেক্ট' হিসেবে চেয়ে বসেন। নিউ সিটির সিন্ডিকেট সেই অনুরোধে সায় দেয়।

তারপর বছরের পর বছর চিকিৎসা আর গবেষণা চলতে থাকে। রোবোটিক্স, আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স আর বায়োটেকনোলজি হাত ধরাধরি করে প্রোটনের ওপরে কাজ করতে থাকে। রক্ত, মাংস, হাড়ের সঙ্গে মিশে যায় স্টিলের প্লেট, ব্যাটারি, তার, সুইচ, অপটিক্যাল সেন্সর, এল. ই. ডি. বাতি আর অসংখ্য মাইক্রোচিপ।

শেষ পর্যন্ত তিন বছরের চেষ্টায় তৈরি হয় সুপারকিলার প্রোটন। শ্রীধর পাট্টা ওকে 'সুপারহিউম্যান কিলিং মেশিন' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু...।

প্রোটনের কথা শুনতে-শুনতে খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছিল জিশান। তবে ওর চোখ আর কান সাজাগ ছিল। ও শুনতে পেল বেশ কয়েকটা চপারের শব্দ। তার সঙ্গে শুটারের শিস।

কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল জিশান। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট! গত কয়েকটা ঘণ্টা কী করে এত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল কে জানে! জিশান অবাক হয়ে ভাবল, সত্যি-সত্যি কি কিল গেমের চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হতে চলেছে? না কি ও স্বপ্ন দেখছে?

একবার প্রোটনের দিকে তাকাল। এখন ওর বুকের কোনও ওঠা-নামা নেই—কালো বাঘটার মতোই স্থির।

কিন্তু জিশান এখন কী করবে? জঙ্গলের মধ্যেই এলোমেলো ছুটে বেড়াবে? না কি খোলা রাস্তায় বেরিয়ে মক সিটিজেনদের আস্তানায় গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করবে? ওদের কাছে আশ্রয় চাইবে?

জিশানের মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। কিলার সুখারাম এখন কোথায় আছে? কতদূরে?

আন্দাজে জিশানের মনে হল, বেশি দূরে নয়। সুখারামের ট্র্যাকারে জিশানের সবুজ ডট দেখা যাচ্ছে না বটে তবে প্রোটনের লাল ডটটা নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, এই অবস্থায় সেরা স্ট্র্যাটেজি হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুজন কিলারের একজোট হয়ে যাওয়া। তার মানে, সুখারাম নিশ্চয়ই প্রোটনের লাল ডট লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

প্রোটনের ফোন আবার বেজে উঠল। বাজতেই থাকল।

জিশানের মনে হল, সুখারাম ফোন করে প্রোটনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, আর কথা বলতে না পেরে মরিয়া হয়ে ধেয়ে আসছে প্রোটনের খোঁজে—জিশানের খোঁজে।

রুকস্যাকে সব গুছিয়ে নিয়ে টলতে-টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শুধু ডানহাতের মুঠোয় ধরা রইল ব্লাস্টার গান। ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে সুখারামের মুখোমুখি হলে কতটা মোকাবিলা করতে পারবে সেটাই প্রশ্ন।

পথ চলতে শুরু করল জিশান। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে খিদে আর ঘুম। কিন্তু তা সত্বেও আরও কিছুক্ষণ অন্তত ওকে শরীরটাকে সচল রাখতে হবে।

রুকস্যাক থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে ফুড ম্যাপ দেখল। তারপর সবচেয়ে কাছের ফুড পয়েন্টে গিয়ে চটপট কিছুটা খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নিল। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিল।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেখে নিজের অবস্থানটা বুঝতে চাইল জিশান। তারপর পুবদিক লক্ষ্য করে হাঁটা দিল। ও জানে, কিছুটা পথ গেলেই মেটাল রোড পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটা গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিয়ে নেবে। তারপর আবার দৌড়...দৌড়...দৌড়...।

মেটাল রোডের কাছাকাছি আসতেই অনেক আলো দেখতে পেল। সেইসঙ্গে চপারের ইঞ্জিনের শব্দ, শুটারের শিস, আর মানুষজনের হইচই।

হঠাৎই পিছন থেকে ফিসফিস করে কে যেন ডেকে উঠল : 'জিশানদা!'

জিশান চমকে উঠল। এক ঝটকায় পিছন দিকে ঘুরে গেল। লেজার ব্লাস্টার তাক করল অন্ধকারের দিকে। দেখল, সেই অন্ধকারের গায়ে সার্চলাইটের টুকরো-টুকরো আলো জোনাকির মতো বিচিত্র নকশা কেটে দিয়েছে।

সেই নকশা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছ'ফুটের বেশি লম্বা মানুষ—যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে। যে অনায়াসে পাঁচ-পাঁচটা খারাপ মানুষকে খতম করতে পারে।

'সুখারাম নস্কর....।' প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করল জিশান।

'হ্যাঁ—সুখারাম, জিশানদা।' জিশানের আরও কাছে এগিয়ে এল ও : 'আমি তোমাকে কিছুতেই মারতে পারব না। কেন না ভালো মানুষদের আমি মারতে পারি না। তাতে মার্শালের হাতে আমাকে মরতে হয় মরব—।'

জিশান কী বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর কেন এতক্ষণ ধরে ওকে 'খুঁজে' পায়নি।

সুখারাম জিশানের হাত চেপে ধরল : 'এসো, জিশানদা। জলদি। আর সময় নেই।'

ওরা ঘুরপথে মেটাল রোডের দিকে এগোল। সুখারাম খুব নীচু গলায় কথা বলছিল। ও জিশানের ওপরে অনেকক্ষণ ধরেই নজর রাখছে, যাতে জিশানের কোনও বিপদ না হয়। জিশানকে বাঁচানোর জন্য খেলার সব নিয়মকানুন ভেঙে প্রোটনকেও ও শেষ করে দিত। কিন্তু তার আগেই কালো বাঘ সেজে নিয়তি হাতে লাগাম তুলে নিয়েছে।

দুটো আগুনের তির কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ওদের কাছাকাছি গাছপালার ওপরে ঠিকরে পড়ে কানফাটানো বিস্ফোরণ ঘটাল। কালো ধোঁয়া, পোড়া গন্ধ।

শ্রীধর পাট্টা নিশ্চয়ই এয়ার অ্যাটাকের নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ এ-নির্দেশ কেন?

জিশান আর সুখারাম দৌড়তে শুরু করল।

একটু পরেই ওরা গাছপালা পেরিয়ে মেটাল রোডে পৌঁছে গেল। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে বসল। তারপর সুখারামের হাতে গাড়ি চলতে শুরু করল।

ওদের ছুটন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে মিসাইল ছুটে আসছিল বারবার। চোখে পড়ছিল আগুনের রেখা আর শব্দ। কিন্তু সুখারাম কুশলী হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল, অ্যাক্সিলারেটরের কন্ট্রোল সুইচ অপারেট করছিল।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই ওদের থামতে হল।

কারণ, সামনের রাস্তা জুড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

জায়গাটা আলোয় আলো। চওড়া রাস্তার মাঝে চারটে শুটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার ঠিক মাঝখানে একটা চপার—তার ইঞ্জিন চলছে। চপারটার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাট্টা। আর কোনও উপায় না দেখে নিজেই গেম সিটিতে চলে এসেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাস্তার দুপাশে বহু মানুষের ভিড়। মনে হচ্ছিল যেন গেম সিটির সব মক সিটিজেন শ্রীধর পাট্টাকে ঘিরে জড়ো হয়ে গেছে। ওরা হইচই করছে, জিশানের নাম ধরে চিৎকার করছে।

সব চিৎকার হইচই ছাপিয়ে হঠাৎই শ্রীধরের গলা শোনা গেল। একটা মেগাফোন ব্যবহার করে তিনি কথা বলছেন।

'সব খেলা শেষ, জিশান! আর পালানোর পথ নেই। তুমি কিল গেমের নিয়ম ভেঙেছ—তাই সব খতম। এক্ষুনি নেমে পড়ো গাড়ি থেকে। নইলে আমি শুট করার অর্ডার দেব...।'

ভিড় করে থাকা জনতা প্রতিবাদের চিৎকার করে উঠল।

জিশান গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলল, 'এটা অন্যায়। এ-অন্যায় আপনি করতে পারেন না, মার্শাল—।'

নিজস্ব ঢঙে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন শ্রীধর : 'জিশান, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, নিউ সিটিতে আমিই শেষ কথা।'

'মোটেই না!' চিৎকার করে বলল জিশান, 'সবসময় জনগণই শেষ কথা বলবে। সবাই জানে, আমি কোনও দোষ করিনি...।'

জনতা আবার চেঁচিয়ে উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকটা বাক্স, কৌটো আর ইট-পাটকেল ছিটকে গেল শ্রীধরের শুটার-বাহিনীর দিকে।

দুজন গার্ড শূন্যে ফায়ার করে জনতাকে 'ধমক' দিল।

জিশান বলল, 'মার্শাল, ভুলে যাবেন না, লাইভ টেলিকাস্ট এখনও চলছে। সবাই আপনার এই অন্যায় দেখছে...।'

হাসলেন শ্রীধর। মাটির দিকে থুতু ছেটালেন। তারপর মুখ খিঁচিয়ে বললেন, '...ইয়োর লাইভ টেলিকাস্ট! সবাই এবার ডেড টেলিকাস্ট দেখবে।' ডাইনে-বাঁয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মার্শাল। তারপর : 'নাউ, কাম অন। হাত মাথার ওপরে রেখে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসো আমাদের কাছে। আমি দশ পর্যন্ত গুনব। ওয়ান...টু...থ্রি...।'

হঠাৎই জিশানকে অবাক করে দিয়ে সুখারাম এক হ্যাঁচকায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এবং জিশান বা অন্যান্য কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গাড়ি মিসাইলের মতো ধেয়ে গেল শ্রীধর পাট্টার দিকে।

জনতা চিৎকার করে উঠল। গার্ডরা সুখারামকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার ফায়ার করল বটে, কিন্তু তাতে কাজ হল না।

সুখারামের গাড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে শ্রীধরের চপারে সরাসরি ধাক্কা মারল।

সংঘর্ষ, বিস্ফোরণ, আগুন, ধোঁয়া।

শ্রীধর পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। আর একইসঙ্গে জনগণ গার্ডদের ওপরে জলপ্রপাতের মতো লাফিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ। প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দও শোনা গেল।

তখনই লাইভ টেলিকাস্টে জানা গেল, জনস্রোতের বন্যা সব প্রতিরোধ ভেঙে গেম সিটিতে ঢুকে পড়েছে।

জিশান বুঝতে পারছিল, জনতার রোষে পড়লে শ্রীধর পাট্টা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবেন—ওঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর সেই মৃত্যুটা জিশানের চোখে মোটেই ন্যায়বিচার নয়।

সুতরাং, ও শ্রীধরকে লক্ষ্য করে দৌড়ল। ওঁকে আপাতত আগলে রাখা দরকার। পরে ওঁর অন্যায়ের বিচার করা যাবে।

শ্রীধর পাট্টা গায়ের সাদা কোট খুলে ফেলেছিলেন, যাতে কেউ ওঁকে সহজে চিনে ফেলতে না পারে। কিন্তু জিশান ওঁকে চিনতে পারল। রাস্তার পাশের একটা গাছের আড়ালে বসে থরথর করে কাঁপছেন।

একটা শুটারকে কোনওরকমে দখল করল জিশান। ক্ষিপ্ত জনগণ শুটারটাকে ঘিরে ছিল। কিন্তু জিশানকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দিল।

সেই শুটারটায় শ্রীধরকে টেনে তুলল জিশান। সঙ্গে উঠল আরও দুজন মানুষ। তা ছাড়া শুটারের পাইলট তো আছেই!

শ্রীধর কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আমাকে...আমাকে কো-কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, জিশান?'

শুটারে উঠতে-উঠতে জিশান বলল, 'এখানে থাকলে আপনি খতম হয়ে যাবেন...।'

শুটার শিস দিয়ে আকাশে উঠল। আদিগন্ত নতুন ভোরের আলো। কিল গেমের চব্বিশ ঘণ্টা শেষ।

শ্রীধর তখনও থরথর করে কাঁপছিলেন। অর্থহীন শব্দ করে গুঙিয়ে উঠছিলেন। ওঁকে দেখিয়ে একজন যাত্রী জিগ্যেস করল, 'জিশান, এই...এই জানোয়ারটাকে আপনি... আপনি ছেড়ে দেবেন?'

জিশান তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব—মানুষের মধ্যে ছেড়ে দেব। যাতে মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের সঙ্গে মিশে, এই জানোয়ারটা আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা শুরু করতে পারে।'

নীচ থেকে আবছাভাবে জনতার স্লোগান শোনা যাচ্ছিল, 'নিউ সিটি জিন্দাবাদ! ওল্ড সিটি জিন্দাবাদ!'

সামনের ভোরের দিকে চোখ মেলে দিয়ে জিশান আপনমনেই বলল, 'আর নিউ সিটি, ওল্ড সিটি নয়—দুটো শহর মিলেমিশে এখন থেকে একটাই নাম হবে ও আওয়ার সিটি—আমাদের শহর।'

জিশান চোখ মেলে নতুন সূর্য ওঠা দেখতে লাগল।

